অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

[অখণ্ড সংস্করণ]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

এবং

আমার মাকে

প্রথম খণ্ড

সোনালী বালির নদীর চরে রোদ হেলে পড়েছে। ঈশম শেখ ছইয়ের নিচে বসে তামাক টানছে। হেমন্তের বিকেল। নদীর পাড় ধরে কিছু গ্রামের মানুষ হাট করে ফিরছে। দূরে দূরে সব গ্রাম মাঠ দেখা যাচ্ছে। তরমুজের লতা এখন আকাশমুখো। তামাক টানতে টানতে ঈশম সব দেখছিল। কিছু ফড়িং উড়ছে বাতাসে। সোনালী ধানের গন্ধ মাঠময়। অঘ্রানের এই শেষ দিনগুলিতে জল নামছে খাল-বিল থেকে। জল নেমে নদীতে এসে পড়ছে। এই জল নামার শব্দ ওর কানে আসছে। সূর্য নেমে গেছে মাঠের ওপারে। বটের ছায়া বালির চর ঢেকে দিয়েছে। পাশে কিছু জলাজমি। ঠাণ্ডা পড়েছে। মাছেরা এখন আর শীতের জন্য তেমন জলে নড়ছে না। শুধু কিছু সোনাপোকার শব্দ। ওরা ধানখেতে উড়ছিল। আর কিছু পাখির ছায়া জলে। দক্ষিণের মাঠ থেকে ওরা ক্রমে সব নেমে আসছে। এ সময় একদল মানুষ গ্রামের সড়ক থেকে নেমে এদিকে আসছিল—ওরা যেন কি বলাবলি করছে। যেন এক মানুষ জন্ম নিচ্ছে এই সংসারে, এখন এক খবর, ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তার আঘুনের শেষ বেলাতে ছেলে হয়েছে।

ঈশম শেষ কথাটা শুনেই হুঁকোটা ছইয়ের বাতায় ঝুলিয়ে রাখল। কলকে উপুড় করে দিল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বের হল। উপরে আকাশ নিচে এই তরমুজের জমি আর সামনে সোনাল। বালির নদী। জল, স্ফটিক জলের মতো। ঈশম এই ছায়াঘন পৃথিবীতে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। বলল, সোভান আল্লা। শেষে আর সে দাঁড়াল না। নদীর পাড় অতিক্রম করে সড়ক ধরে হাঁটতে থাকল। ধনকর্তার পোলা হইছে—বড় আনন্দ, বড় আনন্দ। সব খুদার মেহেরবানি। সড়কের দু'ধারে ধান, শুধু ধান—কত দূরে এইসব ধানের জমি চলে গেছে। ঈশম চোখ তুলে দেখল সব! বিকেলের এইসব বিচিত্র রঙ দেখতে দেখতে তার মনে হল, পাশাপাশি এইসব গ্রাম—তার কত চেনা, কত কালের মেমান সব—নিচে খাল, মাছেরা জলে লাফাচ্ছে। সে সড়কের একধারে গামছা পাতল। নিচে ঘাস, গামছা ঘাসের শিশিরে ভিজে উঠছে। সে এসব লক্ষ করল না। সে দু'হাঁটু ভেঙে বসল। খালের জল নিয়ে অজু করল। সে দাড়িতে হাত বুলাল ক'বার। মাটিতে পর পর ক'বার মাথা ঠেকিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। অঘ্রানের শেষ বেলায় ঈশম নামাজ পড়ছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে ওর ছায়াটা কত দূরে চলে গেছে।

খালের জল কাঁপছিল। ওর ছায়াটা জলে কাঁপছে। কিছু হলদে মতো রঙের ফড়িং উড়ছে মাথার উপর। সূর্যের সোনালী রঙে ওর মুখ আশ্চর্যরকমের লাল দেখাচ্ছিল। যেন কোন ফেরেস্তার অলৌকিক আলো এই মানুষের মুখে এসে পড়েছে। সে নামাজ শেষ করে হাঁটতে থাকল। এবং পথে যাকে দেখল তাকেই বলল, আঘুনের শেষ ফজরে ধনকর্তার পোলা হইছে। ওকে দেখে মনে হয় তরমুজ খেত থেকে অথবা সোনালী বালির চর থেকে একটি খবর সকলকে দেবার জন্য সে উঠে এসেছে। সে সড়ক অতিক্রম করে সুপারি বাগানে ঢুকে গেল। বৈঠকখানাতে লোকের ভিড়। বাইরে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সে প্রায় সকলকেই আদাব দিল এবং ভিতরে ঢুকে নিজের জায়গাটিতে বসে তামাক সাজতে থাকল।

সোনালী বালির নদীতে সূর্য ডুবছে। কচ্ছপেরা ধান গাছের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। এইসব কচ্ছপ এখন একটু শক্তমতো মাটি পেলেই পাড়ে উঠে ডিম পাড়তে শুরু করবে। অনেকগুলি শেয়াল ডাকল টোডারবাগের মাঠে। একটা দুটো জোনাকি জ্বলল জলার ধারে। জোনাকিরা অন্ধকারে ডানা মেলে উড়তে থাকল। পাখিদের শেষ দলটা গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে গেল। নির্জন এবং নিরিবিলি এইসব গ্রাম মাঠ। অন্ধকারেও টের পাওয়া যায় মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে। সে জানে ওরা কোথায় যায়। ওরা হাসান পীরের দরগাতে যায়। পীরের দরগায় ওরা রাত যাপন করে। শীতের পাহাড় নেমে এলে ওরা তখন দক্ষিণের বিলে চলে যাবে। ঈশম এবার উঠে পড়ল।

ঈশম ডাকল, ঠাইনদি আমি আইছি।

দরজার বাইরে এসে ছোটকর্তা দাঁড়ালেন।—ঈশম আইলি?

—হ, আইলাম। ধনকর্তারে খবর দিতে পাঠাইছেন? না পাঠাইলে আমারে পাঠান। খবর দিয়া আসি। একটা তফন আদাই কইরা আসি।

ছোটকর্তা বললেন, যা তবে। ধনদাদারে কবি, কাইলই যেন রওনা দেয়। কোনও চিন্তার কারণ নাই। ধনবৌ ভাল আছে।

—তা আর কমু না! কি যে কন! ঠাইনদি কই?

—মায় অসুজ ঘরে। তুই বরং বড় বৌঠাইনরে বল তরে ভাত দিতে।

ঈশম নিজেই কলাপাতা কাটল এবং নিজেই এক ঘটি জল নিয়ে খেতে বসে গেল।

বড়বৌ বলল, পাতাটা ধুয়ে নাও।

ঈশম পাতাটার উপর জল ছিটিয়ে নিল। বলল, দ্যান।

বড়বৌ ঈশমকে খেতে দিল। ঈশম যখন খায় বড় নিবিষ্ট মনে খায়। ভাত সে একটাও ফেলে না। এমন খাওয়া দেখতে বড়বৌর বড় ভাল লাগে। ঈশমকে দেখতে দেখতে ওর বিবির কথা মনে হল। ঈশমের ভাঙা ঘর, পঙ্গু বিবি, নাড়ার বেড়া এবং জীর্ণ আবাসের কথা ভেবে বড়বৌ-এর কেমন মায়া হল। অন্যান্য অনেকদিনের মতো বলল, পেট ভরে খাও ঈশম। একটু ডাল দেব, মাছ? অনেক দূর যাবে, যেতে যেতে তোমার রাত পোহাবে।

ঈশম নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে, আর হাত দশেক দূরের অসুজ ঘরটা দেখছে। সেখানে ধনমামি আছেন, ঠাইনদি আছেন, ঈশম ঘরের কোণায় কোণায় বেত পাতা ঝুলতে দেখল। মটকিলা গাছের ডাল দেখল দরজাতে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। বাচ্চাটা দুবার ট্যাও ট্যাও করে কাঁদল, ভিজা কাঠের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ, ধূপের গন্ধ মিলিয়ে এ বাড়িতে একজন নবজাতকের জন্ম। টিনকাঠের ঘর, কামরাঙা গাছের ছায়া—ধনমামি বড়মামি—এবং এ-বাড়ির বড়কর্তা পাগল, একথা মনে হতেই ঈশম বলল, বড়মামি, বড়মামারে দ্যাখতাছি না।

বড়বৌ বড় বড় চোখ নিয়ে ঈশমকে শুধু দেখল। কোনও কথা বলল না। বললেই যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। ঈশম যেন এই চোখ দেখে ধরতে পেরেছে বড়মামা এখন বাড়িতে নেই। অথবা কোথায় থাকে, কই যায় কেউ খোঁজখবর রাখে না। রাখবার সময় হয় না। অথবা দরকার হয় না। ঈশম ডাল দিয়ে সবক'টা ভাত হাপুস করে মাকড়সার মতো গিলে ফেলল। বড়মামি এখন কাছে নেই। বৈঠকখানায় লোক পাতলা হয়ে আসছে। বড়মামির বড় ছেলে, ধনমামির বড় ছেলে রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছে।

ঈশম বৈঠকখানা থেকে লাঠি নিল একটা, লণ্ঠন নিল হাতে। ঈশম মাথায় পাগড়ি বাঁধল গামছা দিয়ে। এই আঘুন মাসের ঠাণ্ডায় কাদাজল ভাঙতে হবে। খাল পার হতে হবে, বিল পার হতে হবে। গামছা মাথায় সে পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটবে। কোথাও খালের পাড়ে পাড়ে কোথাও পুলের উপর দিয়ে, কখনও চুপচাপ, কখনও গাজির-গীত গাইতে গাইতে ঈশম দীর্ঘপথ হাঁটবে। ঈশম রান্নাঘর অতিক্রম করবার সময় দেখল কুয়োতলার ধারে বড়মামি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কার জন্য যেন প্রতীক্ষা করছেন। ঈশমকে দেখে বড়বৌ বলল, ঈশম, দেখবে তো তোমার বড়মামাকে ট্যাবার বটতলায় পাও কিনা, তুমি তো বটতলার পথেই যাবে।

ঈশম বাঁশঝাড় অতিক্রম করে মাঠের অন্ধকারে নেমে যাবার সময় বলল, আপনে বাড়ি যান। যাইতে যাইতে যদি পাই—পাঠাইয়া দিমু। এই বলে ঈশম ক্রমে অন্ধকার মাঠে মিশে যেতে থাকল। ঈশমকে আর দেখা যাচ্ছে না, শুধু মাঠের ভিতর লণ্ঠন দুলছে।

ঈশমের ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতে লণ্ঠন। অঘ্রান মাস। শিশির পড়ছে। এখনও ভাল করে ধানখেতের ভিতর আল পড়েনি। সরু পথ খেতের পাশে পাশে। পথ থেকে বর্ষার জল নেমে গেছে পথের মাটি ভিজা, কাদামাটিতে পা বসে যাবার উপক্রম। অথচ পা বসে

যাচ্ছে না- কেমন নরম তাল তাল মাটির উপরে দিয়ে ঈশম হেঁটে যাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার বলে ঈশম চারদিকে শুধু লণ্ঠনের আলো এবং তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারল না। এ অঞ্চলে হেমন্তে শীত পড়তে আরম্ভ করে। শীতের জন্য ঝোপজঙ্গলের কীট-পতঙ্গরা কেমন চুপচাপ হয়ে আছে। ঈশম লণ্ঠন তুলে এবার উঁচু জমিতে উঠে এল। পাশে করলার জমি। উপরে ট্যাবার পুকুর আর সেই নির্দিষ্ট বটগাছ। এখানে অনেক রাত পর্যন্ত বড়কর্তা বসে থাকেন। এখানে বড় কর্তাকে অনেকদিন গভীর রাতে খুঁজে পাওয়া গেছে। ঈশম লণ্ঠন তুলে ঝোপে-জঙ্গলে বড়কর্তাকে খুঁজল। ঝোপে ঝোপে জোনাকি। বটের জট মাটি পর্যন্ত নেমেছে। পুরানো জট বলে জটসকল ভিন্ন ভিন্ন ঘরের মত ছায়া সৃষ্টি করছে। সে ডাকল, বড়মামা আছেন? সে কোনও উত্তর পেল না। তবু লণ্ঠন তুলে গাছটার চারধারে খুঁজতে থাকল—তারপর যখন বুঝল তিনি এখানে নেই, তিনি অন্য কোথাও পদযাত্রায় বের হয়েছেন, তখন ঈশম ফের নিচু জমিতে নেমে হাঁটবার সময় দূরে দূরে সব গ্রাম, গ্রামের আলো, হাসিমের মনিহারি দোকানে হ্যাজাকের আলো দেখতে দেখতে নালার ধারে কেমন মানুষের গলা পেল।

সে বলল, কে জাগে?

অন্ধকার থেকে জবাব এল, তুমি ক্যাডা?

—আমি ঈশম শেখ। সাকিম টোডারবাগ। ঈশম যেন বলতে চাইল, আমি গয়না নৌকার মাঝি ছিলাম। এখন ঠাকুরবাড়ির খেয়ে মানুষ। অন্ধকার মানি না। বাবু ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বাস। নদীর চরে তরমুজ খেত পাহারায় থাকি। ঠাকুরবাড়ির বান্দা আমি। বয়স বাড়ছে, গয়না নৌকা চালাতে আর পারি না।

—আমি আনধাইর রাইতে হাসিম ভুইঞা জাগি। সাকিম কলাগাইছা।

—অঃ, হাসিম ভাই। তা কি করতাছ?

—মাছ ধরতাছি। দ্যাখছ না জল নামতাছে। আমি কৈ মাছের জাল পাইতা বইসা আছি। ঘুটঘুইটা আনধাইরে কই রওনা দিলা?

—যামু মুড়াপাড়া। ধনকর্তার পোলা হইছে। সেই খবর নিয়া যাইতাছি।

—ধনকর্তার কয় পোলা য্যান?

—এরে নিয়া দুই পোলা। তোমার কাছে কাঠি আছে, বিড়িটা আঙ্গাইতাম।

ঈশম বিড়ি ধরাল। ওর বড়কর্তার জন্য মনটা খচখচ করছে। বড়কর্তা রাতে বাড়ি না ফিরলে বড়মামি অন্ধকারে মানুষটার জন্য জেগে থাকবে। সে বলল, বড়মামারে দ্যাখছ?

—দুফরে দ্যাখছিলাম—নদীর চরে হাঁইটা যাইতাছে।

ঈশম কেমন দুঃখের গলায় বলল, ভাইরে, তোমার আমার ছোটখাটো দুঃখ। ঠাকুরবাড়ির দুঃখে চক্ষে পানি আসে। ঈশম ফের হাঁটতে থাকল। সে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে। ফাওসার খাল পার হবার জন্য সে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে। হাট ভাঙার আগে যেতে পারলে সে গুদারাঘাটে মাঝি পাবে। নতুবা এই শীতে সাঁতার কেটে খাল পার হতে হবে। ঠান্ডার কথা ভাবতেই ওর শরীরটা কেমন কুঁকড়ে গেল।

ইচ্ছা করলে ঈশম একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আরও আগে খালের পাড়ে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু একটি অজ্ঞাত ভয়, বিশেষ করে বামন্দি-চকের বুড়ো শিমুল গাছটা এবং ওর বাজে-পোড়া মরা ডাল বড় ভয়ের কারণ। নিচে কবর, আবহমানকাল ধরে মানুষের কবর, হাজার হবে, বেশিও হতে পারে—ঈশম ভয়ে সেই পথে খালের পাড়ে পৌঁছাতে পারছে না।

ঈশম হাতের লাঠিটা এবার আরও শক্ত করে ধরল। সে ভয় পেলেই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়। আল্লা মেহেরবান। সে যেন আসমানে তার সেই মেহেরবানকে খুঁজতে থাকে। অজস্র তারা এখন বিন্দু বিন্দু হয়ে জ্বলছে। নিচে সেই এক শুধু গাঢ় অন্ধকার। দূরে দূরে সব গ্রামের আলো, হ্যাজাকের আলো—গাছের ফাঁকে এবং ঝোপজঙ্গলের ফাকে এখনও দেখা যাচ্ছে। পরাপরদীর পথ ধরে কিছু লোক যাচ্ছিল জল ভেঙে—ওদের হাতে কোনও আলো নেই—জলে ওদের পায়ের শব্দ। কিছু কথাবার্তা ঈশমের কানে ভেসে আসতে থাকল।

সে ক্রমে খালের দিকে নেমে যাচ্ছিল। ওর হাঁটু পর্যন্ত ধানগাছ শিশিরে ভিজছে। ঈশম পরাপরদীর পথ থেকে ক্রমশ ডাইনে সরে যাচ্ছে। এ অঞ্চলে সে কোন মানুষের সাড়া পাচ্ছে না। নীরবে যেন একটা মাঠ গাভীন গরুর মতো অন্ধকারে শুয়ে আছে। পথ ধরে কোনও হাটুরে ফিরছে না। ফসলের ভারে গাছগুলি পথের উপর এসে পড়েছে। সে লাঠি দিয়ে গাছগুলি দুদিকে সরিয়ে দিচ্ছে এবং পথ করে নেমে যাচ্ছে। খালের পাড়ে গিয়ে দেখল গুদারা বন্ধ। মাঝি এপারে নৌকা রেখে চলে গেছে। নৌকাটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ পাশে সে কয়েক কদম হেঁটে গেল। অদূরে মনে হল আকাশের গায়ে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ঈশম জানত, এ সময়ে জেলেনৌকা থাকবে—বর্ষার জল খাল বিল ধরে নেমে যাচ্ছে। যে জল এ অঞ্চলে উঠে এসেছিল জোয়ারে—আঘুন মাসের টানে তা নেমে যাবে। জলের সঙ্গে মাছ এবং কচ্ছপ। জেলেরা এসেছে, খড়া জাল নিয়ে খালের ভিতর জাল পেতে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে। ঈশম খালের পাড়ে সেই লণ্ঠনের আলো পর্যন্ত হেঁটে গেল। পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, আমি ঈশম। আমারে পার কইরা দ্যাও। আমি যাইতাছি এক খবর নিয়া। ধনকর্তার পোলা হইছে। তারপর সে কেন যে হঠাৎ ডাকল, বড়মামা আছেন, বড়মামা! বড়মামি আপনের লাইগা জাইগা বইসা আছে, বাড়ি যান। কোনও উত্তর এল না। শুধু একটা নৌকা ওপার থেকে ভেসে এল। বলল, ধনকর্তার পোলা হইছে?

ঈশম বলল, হ।

—তবে কাইল যামু, একটা গরমা মাছ লইয়া যামু। মাছ দিয়া একটা পিরান চাইয়া নিমু। বলে সে পাটাতন তুলে অন্ধকারে একটা বড় মাছ টেনে বের করল। ঈশম লণ্ঠনের আলোতে নীল রঙের তাজা মাছটা পাটাতনে লাফাতে দেখল। চোখ দুটো বড় অবলা। যেন এক পাগল মানুষ নিরন্তর এইসব মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুল-ফল পাখি দেখে বেড়াচ্ছে—এই চোখ দেখলে, পাগল মানুষটার চোখ শুধু ভাসে। বড়মামি বড় বড় চোখ নিয়ে প্রত্যাশায় বসে আছে, কখন ফিরবে মানুষটা। সে বলল, বড়মামারে দ্যাখছ?

মানুষটা বলল, বড়কর্তারে আইজ দেখি নাই।

ঈশম আর কোনও কথা বলল না। এই সব মাঠে পাগল মানুষ দিনরাত ঘুরে বেড়ান। কোন অন্ধকারে, কোথায় তিনি কার উদ্দেশে হেঁটে যান ঈশম টের করতে পারে না। তাকে খাল পাব করে দিলে, সে মাঠ ধরে হাঁটতে থাকল শুধু।

এখন সে পাটের জমি ভাঙছে। এখানে এখন কোনও ফসল নেই। কলাই, খেসারি এসব থাকার কথা—কিন্তু কিছুই নেই। শুধু ফসলহীন মাঠ। শুধু খোঁচা খোঁচা দাড়ির মতো পাট গাছের গোড়া উঁকি মেরে আছে। যোগী-পাড়াতে এত রাতেও তাঁত বোনা হচ্ছে। মাঠেই সে তাঁতের শব্দ পেল। সে গ্রামে উঠে যাবার মতলবে কোনাকোনি হাঁটছে। জেলেদের নৌকাগুলি এখন আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু খড়া জালের মাথায় বাঁশের ডগাতে লণ্ঠনের আলো প্রায় যেন এক ধ্রুবতারা—ওকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে। সে কতটা পথ হেঁটে এল, এবং কোনদিকে উঠে যেতে হবে—অন্ধকারে সেই এক আলো তাকে সব বাৎলে দিচ্ছে। এ মাঠের শেষেই সেই বুড়ো শিমুল গাছটা যেন ক্রমে অবয়ব পাচ্ছে। দিনের বেলাতে এ-জমি থেকে গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। সেই গাছটার পাশের গ্রামে একবার মড়ক লেগেছিল—ঈশন কেমন ভয়ে ভয়ে হাঁটছে! শিমুলগাছটার দূরত্ব ঈশমকে কিছুতেই ভয় থেকে রেহাই দিচ্ছে না। সে যত দূর দিয়ে যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে গাছটা ওর দিকে হেঁটে আসছে। ডান পাশে প্রায় আধ ক্রোশ হেঁটে গেলে সেই গাছ এবং নিচে তার কবরভূমি—যেহেতু টিলা জমি থেকে একবার সে গাছটাকে দেখতে পেয়েছিল, একদিন হাট ফেরত রাতে গাছটার মাথায় সে আলো জ্বলতে দেখেছিল সেজন্য ঈশম ভয়ে ভয়ে দ্রুত পা চালিয়ে যোগীপাড়াতে উঠে এল। কেউ দেখে ফেললেই বলবে, এলাম সেই কবর ভেঙে—কারণ ঈশমের মতো সাহসী পুরুষ হয় না—এ তল্লাটে সে এমন একজন সাহসী মানুষ। কিন্তু ঈশম কোনওকালে তার ভয়ের কথা খুলে বলে না। সাহসী বলে সে রাতেবিরেতে পরাণের ভিতরে ভয় লুকিয়ে রেখে চোখ বুজে চলে যেতে থাকে। যোগীপাড়াতে উঠতেই মানুষের শব্দে, চরকার শব্দে এবং শানা মাকুর শব্দে ভয়টা কেটে গেল। তারপর পরিচিত মানুষের গলা পেয়ে বলল, আমীর চাচার গলা পাইতাছি।

—তুমি...?

—আমি ঈশম।

—এত রাইতে!

—যামু মুড়াপাড়া। ধনকর্তার পোলা হইছে—খবর লইয়া যাইতাছি। আপনার শরীর ক্যামন?

—ভাল নারে বাজান। ভাল না। একটু থেমে বলল, বড়কর্তার মাথাটা আর ঠিক হইল না?

—না চাচা।

—শোনলাম বুড়া কর্তা চক্ষে দেখতে পায় না।

—না। সারাদিন ঘরে বইসা থাকে। বড়মামি, বুড়া ঠাইরেন দেখাশুনা করে।

—পোলাটা পাগল হইল আমার কর্তার-অ চক্ষু গেল।

—হ চাচা।

—তা একটু বইস। তামাক খাও।

—আর একদিন চাচা। আইজ যাইতে দ্যান। ঈশম কথা বলতে বলতে সৈয়দ মিস্ত্রির শোলার মাচান অতিক্রম করে রামপদ যোগীর আমবাগানে ঢুকে গেল। তার পর গ্রামের মসজিদ পার হয়ে মাঠে পড়তেই শিমুল গাছটার কথা মনে হল। সে জোরে জোরে মনের ভিতর সাহস আনার জন্য বলল, এলাহী ভরসা। গাছটা যেন ক্রমে শয়তান হয়ে যাচ্ছে। শয়তানের মতো পিছু নিয়েছে। মাঝে-মাঝে হাতের লাঠিটা লণ্ঠনটা ভয়ানক ভারী ভারী মনে হচ্ছে। সে ভাবল—এমন তো হবার কথা নয়। সে ভাবল, অনেক রাত, অনেক দূরে সে কত মানুষের সুসংবাদ, দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে গেছে—অথচ আজ এখনও সে ফাওসার চক ভাঙতে পারেনি। শিমুল গাছটা বড় কাছে মনে হচ্ছে। কখনও পেছনে তাড়া করছে, কখনও সামনে! সে দু'বার লাঠিটা মাথার উপর বন বন করে ঘোরাল। ওর পাইক খেলার কথা মনে হল—লাঠি খেলায় ওস্তাদ ঈশম এই মাঠে গাছটাকে প্রতিপক্ষ ভেবে মাঝে মাঝে লাঠি ঘোরাতে থাকল। লণ্ঠনটা সে বাঁ হাতে রেখে ডান হাতে লাঠি মাথার উপর ঘোরাচ্ছে এবং নিচের দিকে নেমে ধানগাছ সরিয়ে ফের হাঁটছে। সে যাচ্ছে। যখন ধানগাছগুলো পা জড়িয়ে ধরেছে, সে লাঠি দিয়ে লাঠি দিয়ে মাঝে মাঝেই ধান গাছ সরাচ্ছিল—কিছুটা নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য, কিছুটা পথ পরিষ্কার করার জন্য। মাঠে নেমেই শরীরটা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। ভয়ানক শক্ত সমর্থ শরীর ঈশমের। এই বুড়ো বয়সেও সে ঘাড়-গলা শক্ত রাখতে পেরেছে। অথচ এই রাত, অন্ধকার, বিশাল বিলেন মাঠ এবং যে শিমুল গাছটা এতক্ষণ ওকে তাড়া করছে—এই সব মিলে তাকে কেমন গোলমালের ভিতর ফেলে দিয়েছে। ঈশম লণ্ঠনের আলোতে যেন পথ দেখতে পাচ্ছে না। এই বিল ভেঙে উঠতে পারলেই ফের গ্রাম, ফের গ্রামের পথ, গোলাকান্দালের ভুতুড়ে পুল এবং পুরীপূজার মাঠ।

ফের গ্রামের পর গ্রাম, তারপর বুলতার দিঘি এবং নমশূদ্রপাড়া পেড়াব পোনাব, মাসাব গ্রাম।

অন্ধকার বলেই আকাশে এত বেশি তারা জ্বলজ্বল করছিল। বিলেন জমি নিচে নামতে নামতে যেন পাতালে নেমে গেছে। আলপথগুলি এখনও ঠিক মতো পড়েনি, অঘ্রান গেলে, পৌষ এলে এবং ধানকাটা হলে পথগুলি স্পষ্ট হবে। এই বিলে পথ চিনে অন্য পারে উঠে যাওয়া এখন বড় কষ্টকর।

অনেকক্ষণ ধরে ঈশম একটি পরিচিত আল পথের সন্ধান করল। যারা মেলাতে যায়, অথবা বান্নিতে, তারা এই আলপথে বিলের অন্য পাড়ে উঠে যায়, ধানজমির ফাঁকে ফাঁকে কোথায় যেন পথটা লুকিয়ে আছে। সে সন্তর্পণে গাছ তুলে তুলে দেখছে আর এগুচ্ছে। এই বুঝি সেই পথ, কিছু দূরে গেলেই মনে হচ্ছে, না সে ঠিক পথে আসেনি—পথটা ওকে নিয়ে বিলের ভিতর লুকোচুরি খেলছে। তারপর ভাবল, বিলের জমির ধারে ধারে হাঁটতে থাকলে সে নিশ্চয়ই পাশের গ্রামে গিয়ে উঠতে পারবে। মনে মনে আবার উচ্চারণ করল, এলাহী ভরসা। তাকে এ-রাতে, এ-বিল, এ-মাঠ অতিক্রম করতেই হবে। অন্ধকারে পথ যত অপরিচিত হোক, শয়তানের চোখ যত ভয়ঙ্কর হোক—সে এ-মাঠ ঠেলে অন্য মাঠে গিয়ে পড়বেই। ধনকর্তাকে খবর দেবেই।

সে কখনও দৃঢ় হল। অথবা কখনও সংশয়ে ভুগে সে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে যেন ক্রমে এই বিলের ভিতর ডুবে যাচ্ছে। এবং মনে হচ্ছে তার, সে একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে। সে আদৌ এগুতে পারছে না। সে এবার বলল, খুদা ভরসা। সে যে ঘুরে ফিরে একই জায়গায় ফিরে আসছে পরখ করার জন্য হাতের লাঠিটা ধানগাছ সরিয়ে কাদামাটিতে পুঁতে দিল। সে সেই নির্দিষ্ট স্থানটি চিনে রাখার জন্য কিছু গাছ উপড়ে ফেলল। একটা কাকতাড়ুয়ার মতো করে গাছগুলিকে বেঁধে রাখল লাঠিতে তারপর গোলমতো চারপাশে একটা দাগ দিল।

অনেকক্ষণ ধরে এই বিল এবং পথ ওর সঙ্গে রসিকতা করছে। সে একটু সময় বসল। বিশ্বচরাচর নিঝুম। মনে হয় ঠিক যেন এই বিল সেই পাগল ঠাকুরের মতো রহস্যময়। সে নিজের মনে হাসবার চেষ্টা করল। অথচ গলা শুকনো। ওর সামান্য কাশি উঠে এল গলা থেকে। দ্রুত সেই শব্দ বিলের চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। অপরিচিত শব্দ কোথাও। সে কান পেতে রাখল। এখন এই মাঠ আর তার কাছে পাগল ঠাকুরের মতো রহস্যময় নয়, নিঃসঙ্গ মাঠ অঘ্রানের শিশিরে ভিজে ওর পঙ্গু স্ত্রীর মতো ঘুমাচ্ছে অথবা রাতের কীটপতঙ্গ সকল, ঝিঁঝিপোকা সকল শীতের মরসুমের জন্য আর্তনাদ করছে। কবে শীত আসবে, কবে শীত আসবে, মাঠ ফাঁকা হবে, শস্যদানা মাঠে পড়ে থাকবে, আমরা উড়ে উড়ে খাব, ঘুরব-ফিরব, নাচব-খেলব। সে যত এইসব শুনতে থাকল, যত এইসব চিন্তায় বিষণ্ণ হতে থাকল তত সেই ভয়াবহ শিমুল গাছটা মাথায় আলো জ্বেলে ওর দিকে যেন এগিয়ে আসছে।

শিমুল গাছটার মাথায় আলোটা জ্বলছে আর নিভছে। অথবা নিভে গিয়ে আলেয়া হয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে যেন বিলের এ-মাথা থেকে অন্য মাথায় আলেয়াটা ওকে নেচে নেচে খেলা দেখাচ্ছে। সে বলল, ভালরে ভাল! এভাবে বসে থাকলে ভয়টা ওকে আরও পঙ্গু করে দেবে। সে দ্রুত উল্টো মুখে ছুটতে পারলেই কোন-না-কোন গ্রামে উঠে যেতে পারবে।

সুতরাং সে হাতের লণ্ঠন নিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকল। হাতের লণ্ঠনটা দু'বার দপদপ করে জ্বলে উঠল। লণ্ঠনটা নিভে যাবে ভয়ে সে দ্রুত ছুটে যেতে পারল না। সে দু'হাঁটুতে আর শক্তি পাচ্ছে না। বার বার কেবল পিছনের দিকে তাকাচ্ছে। সে এবার দেখল, স্পষ্ট দেখতে পেল, শিমুল গাছটা যথার্থই এগিয়ে আসছে। সে দেখল গাছের মাথায় আলো আর ডালে ডালে মড়কের মৃতদেহ ঝুলছে। সে ধানগাছ দিয়ে কাকতাড়ুয়া জায়গাটায় ফিরে এসেছে। শিমুল গাছটা সহসা জীবন্ত হয়ে গেল। এতক্ষণ তবে সে একই বৃত্তে ঘুরছে! ভয়ে বিবর্ণ ঈশম দস্যুর মতো লাথি মারল কাকতাড়ুয়াকে। উপড়ানো গাছগুলি অন্ধকারে বিলের প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়তে থাকল।

সে বলল, শয়তানের পো ভাবছটা কি শুনি! বিলের পানিতে আমারে ডুবাইয়া মারতে চাও। বলেই সে লাঠিটা তুলে উপরের দিকে ঘোরাল। যেমন সে মহরমের দিন বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সামনে-পিছনে অথবা উপরে-নিচে, ডাইনে-বাঁয়ে লাঠি ঘোরাতো, লাঠি এগিয়ে দিত, পিছিয়ে আনত, সে উপরের দিকে উঠে যাবার সময় তেমন সব খেলা দেখাতে থাকল। এই বিলের জমি এবং শিমুল গাছটার ভয়ে সে এখন মরিয়া। কিন্তু খেলা দেখালে হবে কি-কারা যেন ওকে পেছনে টানছে। চারপাশে হাঁটছে কারা। মনে হচ্ছে সারা বিলে মানুষের পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। একদল অবয়বহীন শয়তান ওর সঙ্গে হাঁটছে অথচ কথা বলছে না। অন্ধকারে সে কেবল উপরে ওঠার পরিবর্তে নিচে নেমে যাচ্ছে। এবারে সে চিৎকার করে উঠল, খুদা এইটা কি হইল! ধনকর্তা গ, আমারে কানাওলায় ধরছে। সে লণ্ঠন ফেলে লাঠি ফেলে বিলের আলে আলে ঘুরতে থাকল। ধান পাতা লেগে পা কেটে যাচ্ছে। সে বার বার একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে এসে হাজির হচ্ছে। আর এ সময়ই সে দেখল ভুতুড়ে আলোটা একেবারে চোখের সামনে জ্বলছে নিভছে। সেই আলোর হাজার চোখ হয়ে গেল, অন্ধকারের ভিতর ভূতের মতো চোখগুলো জ্বলছে। ঈশম আর লড়তে পারল না, ধীরে ধীরে আলের উপর সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল।

আগে সুন্দরআলি লণ্ঠন হাতে। পিছনে ধনকর্তা। তিনি চারদিন আগে ধনবৌর চিঠি পেয়েছেন। ধনবৌ লিখেছে—শরীরটা আমার ভাল যাচ্ছে না, এ সময় তুমি যদি কাছে থাকতে। ধনবৌর চিঠি পেয়ে চন্দ্রনাথ আর দেরি করেন নি। বড় কাছারি বাড়িতে মেজদা থাকেন, তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, দাদা, আমি একবার বাড়ি যামু ভাবছি। আপনের বৌমা চিঠি দিছে। অর শরীর ভাল না—একবার তবে ঘুইরা আসি। ভূপেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে সুন্দরআলিকে দিয়েছেন। রাত হয়ে যাবে যেতে। সেরেস্তায় কাজের চাপ পড়েছে—নতুবা তিনি নিজেও বাড়ি যেতেন। ছেলে হয়েছে এমন খবর জানা থাকলে চন্দ্রনাথ এতটা

বোধহয় উদ্বিগ্ন হতেন না। তিনি দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছেন। সুন্দরআলিকে নিয়ে লণ্ঠন হাতে নেমে এসেছেন। শীতলক্ষ্যার পাড়ে পাড়ে এসে বাজার বাঁয়ে ফেলে মাসাব পোনাব হয়ে বুলতার দিঘি ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন। পেয়াদা সুন্দরআলি মাঝে মাঝে কাশছিল। নির্ভয়ে নিঃশব্দে তাঁরা এ মাঠে এসে নেমেছেন। মাঠ পার হলেই ফাওসার খাল, তারপর দু'ক্রোশ পথ। বাড়ি পৌঁছাতে দেরি নেই। এমন সময়ে সুন্দরআলি চিৎকার করে উঠল, নায়েব মশাই, খুন। হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে যাবে যাবে ভাব হল সুন্দরআলির। সুন্দরআলি পেছনের দিকে ছুটে পালাতে চাইল।

ধনকর্তা হকচকিয়ে গেলেন, এখানে খুন-ডাকাতি!

সুন্দরআলি বলল, মাঠের উপর দিয়া আসেন কর্তা। নিচ দিয়া আমি যামু না।

ধনকর্তা এবার জোরে ধমক দিলেন, আয় দ্যাখি, কি খুন কে খুন দ্যাখি। ধনকর্তা লণ্ঠন তুলে সন্তর্পণে মানুষটার মুখের উপর ধরলেন। মানুষটা বড় চেনা যেন। তিনি নাড়তে থাকলেন ওকে। দেখলেন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। তিনি ডাকলেন, ঈশম, তর কি হইল? ঈশম, অঃ ঈশম! ঈশমের শরীরে কোনও আঘাত চিহ্ন নেই—তিনি খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সব।

ঈশমের পাশে বসে ধনকর্তা চোখ টেনে দেখলেন। না সবই ঠিকঠাক আছে। এবার মনে হল—বিলেন মাঠে এমন আঁধারে ঈশম পথ হারিয়েছে। তিনি বিল থেকে জল আনলেন। রুমালে ভিজিয়ে ভিজিয়ে জল দিলেন চোখেমুখে এবং একসময় জ্ঞান ফিরলে বললেন, কিরে তর ডরে ধরছে। আমি তর ধনমামা।

ঈশম চোখ মেলে ধীরে ধীরে দেখল। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না। তারপর কেমন অবিশ্বাসের গলায় ডাকল, ধনমামা! আপনে ধনমামা! ধনকর্তাকে দেখে সে কেঁদে ফেলল। মামাগ, আমারে কানাওলায় ধরছে! সারাটা মাঠ, বিল, জমি ঘুরাইয়া মারছে। শরীরটা আর শরীর নাইগ মামা।

—আস্তে আস্তে হাঁট। বিলে তুই আইছিলি ক্যান?

এতক্ষণ পর ঈশমের সব মনে হল। কেন এসেছিল এই মাঠে, কোথায় যাবে, কী করবে, কী খবর দিতে হবে সব এক এক করে মনে পড়ল। ধনমামা, আপনের পোলা হইছে। আমিও আপনের কাছে যামু বইলা বাইর হইছি। পথে এই কাণ্ড—কানাওলা।

ধনকর্তা বিশাল বিলেন মাঠে আলো-আঁধারে দাঁড়িয়ে কি জবাব দিতে হবে ভেবে পেলেন না। আকাশে তেমনি হাজার নক্ষত্র জ্বলছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ধানের গন্ধ বয়ে আনছে। ঈশম সে সময় বলল, চলেন মামা আস্তে আস্তে হাঁটি। যেতে যেতে খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, আমারে একটা তফন দিতে হইব।

ওরা হেঁটে হেঁটে একসময় ট্যাবার পুকুর পাড়ে এল। অশ্বত্থ গাছ পার হতে গিয়ে ঈশম ডাকল, বড়মামা আছেন, বড় মামা! কোনও উত্তর এল না। পুকুর পাড়ে গভীর ঝোপ-জঙ্গল। এত রাতে এই জঙ্গলে বসে থাকলে কিছুতেই কেউ টের পাবে না। ভিতরে কেউ আছে কি নেই—দিনের বেলাতেও টের পাওয়া যায় না। ঈশম অথবা চন্দ্রনাথ বৃথা আর ডাকাডাকি করল না। করলা খেত পার হয়ে ধানের জমিতে নেমে আসতেই টের পেল যেন খেতের ভিতর খচখচ শব্দ হচ্ছে। ধান খেতে সামান্য জল। পায়ের পাতা ডোবে কি ডোবে না। ঈশম লণ্ঠন তুলতেই দেখল—বড়কর্তা। ধান খেতের ভিতর বড়কর্তা কেমন উবু হয়ে বসে আছেন। ঈশম খেতের ভিতর ঢুকে বলল, উঠ্যান। বাড়ি যাইতে হইব। বড়মামি আপনের লাইগা জাইগা আছে। কিন্তু বড়কর্তার মুখে কোনও কথা ফুটে উঠল না। যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে থাকলেন। কিছুতেই উঠছেন না কিসের উপর চেপে বসে আছেন। পায়ের নিচে অন্ধকার এবং ধান গাছ। খচখচ শব্দ। গাছগুলি নড়ছে। সে লণ্ঠনটা নিচে নামাতেই দেখল একটা বড় কাছিম। একটা প্রকাণ্ড কাছিম চিৎ করে তিনি তার উপরে বসে আছেন। কাছিমটা পা'গুলি বের করে মুখ বের করে কামড়াতে চাইছে। কিন্তু তাঁর হাত পা নাগাল পাচ্ছে না। কেবল গাছগুলি নড়ছে। ঈশম কি বলতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কাছিমের বুকে বসে বড়কর্তা হেঁকে উঠলেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

ঈশম বলল, বড়মামা, এইটা আপনে কি করছেন? এতবড় একটা কাছিম ধইরা বইসা আছেন? তারপর সে বলল, আপনে বাড়ি যান। ধনমামায় আইছে। ধনমামার পোলা হইছে।

ধনকর্তা বললেন, উইঠা আসেন বড়দা। কাছিমটা ঈশম লইয়া যাইবখন।

বড় কর্তা ভাল মানুষের মতো ধনকর্তাকে অনুসরণ করলেন। বড়কর্তা কখন ছুটতে থাকবেন কখন হাতে তালি বাজাবেন—এই সব ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ধনকর্তা সন্তর্পণে পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকলেন। বড়কর্তা অন্ধকারে ছুটতে চাইলে ধনকর্তা বললেন, আমার হাতে লাঠি আছে বড়দা। ছুটবেন তো বাড়ি মারমু। ঠ্যাঙ ভাইঙ্গা দিমু।

চন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে বড়কর্তা ঘুরে দাঁড়ালেন। আমাকে তুমি ভর্ৎসনা করছো চন্দ্রনাথ!

এমন এক করুণ মুখ নিয়ে চন্দ্রনাথকে দেখতে থাকলেন। তিনি যেমন কোনও কথা বলেন না, এখনও তেমনি কোনও কথা না বলে অপলক চেয়ে থাকলেন। এমন চোখ দেখলেই মনে হয় এই উত্তর চল্লিশের মানুষ বুঝি এবার আকাশের প্রান্তে হাত তুলে তালি বাজাবেন। চাঁদের কাকজ্যোৎস্না এখন আকাশের সর্বত্র। যথার্থই এবার বড়কর্তা দুহাত উপরে তুলে হাতে তালি বাজাতে থাকলেন, যেন আকাশের কোন প্রান্তে তাঁর পোষা হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখি হারিয়ে গেছে। হাতের তালিতে তাদের ফেরানোর চেষ্টা। আর ধনকর্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু নতুন করে লক্ষ করলেন—বড়দার বড় বড় চোখ, লম্বা নাক, প্রশস্ত কপালের পাশে বড় আঁচিল, সবচেয়ে সেই সূর্যের মতো আশ্চর্য রঙ শরীরের

এবং সাড়ে ছয় ফুটের উপর শরীরে ঋজুতা। দেখলে মনে হবে মধ্যযুগীয় কোন নাইট রাতের অন্ধকারে পাপ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন! চন্দ্রনাথ দেখলেন, বড় এবং গভীর চোখ দুটো সারাদিন উপবাসে কোটরাগত। দুঃখে চন্দ্রনাথ চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। বললেন, বড়দা আপনে আর কত কষ্ট পাইবেন, সবাইরে আর কত কষ্ট দিবেন!

বড়কর্তা ওরফে মণীন্দ্রনাথ শুধু বললেন, গ্যাংচোরেৎশালা। ফের তিনি আকাশের প্রান্তে তালি বাজাতে থাকলেন। সেই তালির শব্দ এত বড় মাঠে কেমন এক বিস্ময়কর শব্দ সৃষ্টি করছে। এইসব শব্দ গ্রাম মাঠ পার হয়ে সোনালী বালির চর পার হয়ে তরমুজ খেতের উপর এখন যেন ঝুলছে। মণীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা, জীবনের হারানো সব নীলকণ্ঠ পাখিরা ফিরে এসে রাতের নির্জনতায় মিশে থাক—কিন্তু তারা নামছে না—বড় কষ্টদায়ক এই ভাবটুকু। তিনি এবার চন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ঘরের দিকে চলতে চলতে যেন বলতে চাইলেন, চন্দ্র, তোমার ছেলে হয়েছে, বড় আনন্দ! অথচ কথার অবয়বে শুধু এক প্রকাশ, গ্যাৎচোরেৎশালা। এবার তিনি নিজের এই অপ্রকাশের দুঃখে কেমন দুঃখিত হলেন—এত নক্ষত্র আকাশে অথচ তাঁর পাগল চিত্তার সমভাগী কেউ হতে চাইছে না। সকলেই যেন তাঁর ঠ্যাঙ ভেঙে দিতে চাইছে। মণীন্দ্রনাথ আর কোনও কথা না বলে সেজভাইকে শুধু অনুসরণ করে হাঁটতে থাকলেন।

ঢাক-ঢোলের বাজনা শোনা যাচ্ছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে কেউ—মনে হয় কেউ দামামা বাজাচ্ছে। একদল লোক ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গোপাট ধরে উঠে আসছে। শচীন্দ্রনাথ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনছিলেন। বুঝি ফেলু ফিরছে নারাণগঞ্জ থেকে। ফেলুর গলায় কালো তার বাঁধা। সে হা-ডু-ডু খেলে ফিরছে। কাপ-মেডেল কালো একটা কাপড়ে ঢাকা।

এবারেও ফেলু তবে গোপালদির বাবুদের বিপক্ষে খেলে এসেছে। মুখের উপর ফেলুর চাপদাড়ি আছে বলে আর কাঁধে সব সময় গামছা ফেলে রাখে বলে গেঞ্জির উপর বুকের ছাতিটা কাছিমের মতো, কত প্রশস্ত মাপা যায় না। কিন্তু কাছে এলে দলটা মনে হল—না, ফেলুর দল নয়, অন্য দল। তবে কি ফেলু এবারে হেরে এল! ওর দলবল ফিরছে না কেন? এই প্রথম তবে ফেলু হেরে গেছে। ফেলুর যৌবন চলে যাচ্ছে তবে। যখন ওর যৌবন ছিল—তখন এই তল্লাটে দুই আদমি ফেলু আর সাবু—দুই বড় খেলোয়াড়, হা-ডু-ডু খেলোয়াড়। তখন এই তল্লাটে বিশ্বাস পাড়া, নয়াপাড়া, এমন কি দশ-বিশ ক্রোশ দূরে

অথবা গোপালদির মাঠ পার হয়ে সেই মেঘনার চরে ওদের খেলা দেখার জন্য কাতারে কাতারে লোক- ফেলু হ্যা রে...রে...ডু...ডু বলে যখন দাগের উপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ত—যখন ফাইনাল খেলার দামামা বাজত, ব্যাগপাইপ বাজত, তখন ফেলুর মুখ দেখলে মনে হতো ফেলু বড় কুশলী খেলোয়াড়। তখন কত মেডেল গলায় ঝুলত তার।

কত কাপ এনে দিয়েছে সে তার দলের হয়ে! দিন নাই রাত নাই, ফেলু বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ হেঁটে খেলতে চলে গেছে। একবার বড় শহরে খেলতে গিয়েছিল, ফেরার পথে পালকিতে। জয়জয়কার ফেলুর। পালকির দুপাশে দু'মানুষের মাথায় দুই বড় কাপ, ডে-লাইট জ্বালিয়ে দামামা বাজিয়ে ওরা শহর থেকে গ্রামে ফিরেছিল। নাঙলবন্দের মাঠ এবং নদী পার হলে গ্রামের মানুষেরা বৌ-বিবিরা সেই যে দাঁড়িয়ে গেল দেখতে, তার আর শেষ নেই। ওরা ফেলুকে দেখছিল, দুই বড় কাপ দেখছিল, কালো তার গলায় দলের হা ডু-ডু খেলোয়াড়দের দেখছিল—য্যান ঢাকার ঝুলনযাত্রা যায়। সেই ফেলু তবে এবারে হেরে গেছে! অন্য দলের মানুষেরা, জয় গোপালদির বাবুদের কি জয়...বলতে বলতে যাচ্ছে। শচীন্দ্রনাথের কেন জানি এ সময়ে ফেলুর মুখটা দেখতে ইচ্ছা হল। ফেলু হয়তো হেরে গিয়ে আগে বাড়ি চলে এসেছে। আর কিছু না পেয়ে হয়তো বিবি আনুকে ধরে পেটাচ্ছে।

চন্দ্রনাথ এ-সময় তাঁর জাতক দেখছেন। আঁতুড়ঘরে শশীবালা চন্দ্রনাথকে আর একটু ঝুঁকতে বললেন। ধনবৌ পান খেয়েছে। ঠোঁট লাল। এ-ক'দিন সিঁদুর দিতে নেই কপালে—কপাল সাদা। ঘরের ভিতরে ভিজা কাঠ জ্বলছে। কিছু শতচ্ছিন্ন নেকড়া। এক কোনায় আগুনটা গনগন করছিল। দু-হাতে ধনবৌ জাতককে সামনে তুলে ধরল, চন্দ্রনাথ ছেলে না দেখে ধনবৌর মুখ দেখলেন, কেমন সাদা হয়ে গেছে মুখটা—শালুক পাতার মতো রঙ মুখে। ধনবৌর চোখ, আবার মা হতে পেরেছে বলে জ্বলজ্বল করছিল। হাতের নোয়া, লালপেড়ে কাপড়, দুহাতে জাতককে তুলে ধরার ভঙ্গি, সবটুকু মিলে ফিসফিস করে বলার মতো—কেমন দ্যাখছ। কার মতো হইব! তোমার মতো, না আমার মতো?

তখন মণীন্দ্রনাথ একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। এই পথ দিয়ে হা-ডু-ডু খেলার দলটা চলে গেছে। তিনি কাপ মেডেল এবং মানুষের উল্লাস দেখার জন্য ওদের পিছনে পিছনে বের হয়ে পড়েছিলেন—এখন তারা নয়া পাড়ার মাঠে নেমে গেছে। তিনি তাদের সঙ্গে অতদূর গেলেন না। এই অশ্বত্থ গাছটার নিচে এলেই দূরের এক যেন দুর্গ দেখতে পান। দুর্গে হয়তো অশ্বারোহী কিছু যুবক এখন কদম দিচ্ছে। দুর্গের দরজা খুলে গেলে যেমন হাজার সেনা বের হয়ে মাঠে চত্বরে খেলা দেখায়—এখন যেন তেমনি গাছের উপরে হাজার গাঙশালিক মাথার উপর উড়ে-উড়ে খেলা দেখাচ্ছে! যারা নদী থেকে ফিরে আসেনি, যারা খুঁটে খুঁটে নদীর চরে অথবা বিলে পোকা-মাকড় খাচ্ছে, তারা এবারে ফিরে আসবে। ফিরে এলেই তিনি এই গাছের নিচে বসে আপন মনে এক মনোরম জগৎ বানিয়ে বসে থাকবেন।

গাছটার নিচে কিছু মটকিলার গাছ, কিছু বেতপাতার ঝোপ এবং বনকাশের জঙ্গল। কিছু ছাতার পাখি অনবরত ঝোপে-জঙ্গলে নেচে বেড়াচ্ছে। মণীন্দ্রনাথ গাছটাকে প্রদক্ষিণ করার মতো ঝোপ-জঙ্গলের চারপাশে ঘুরতে থাকলেন। এত বড় গাছ! ঈশ্বরের মতো এই গাছ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন। এবং তিনি ঈশ্বরকেই যেন প্রদক্ষিণ করছেন এমন একটা ভাব তাঁর চোখে মুখে। মুখ উঁচু করে গাছটা দেখছেন আর কি যেন বিড়বিড় করে বকছেন। তখন মুসলমান গ্রামের পুরুষেরা যেতে যেতে আদাব দিল। বলল, কি মানুষ কী হইয়া গ্যাল! ওরা বলল, বাড়ি চলেন—দিয়া আসি। মণীন্দ্রনাথ ওদের কথায় বালকের মতো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন। তারপর ওরা যেই চলে গেল—সন্তর্পণে ঢুকে ঝোপের ভিতর বসে গেলেন। চুপচাপ ঝোপের ভিতর বসে মটকিলার ডাল ভেঙে দাঁত মাজতে থাকলেন। কতদিন যেন দাঁত মাজেননি, কতকাল সব ভুলে বসেছিলেন যেন—তিনি মুখে দুর্গন্ধ দূর করার নিমিত্ত দাঁত ঘষে ঘষে সাদা করে তুলছেন। আবেদালি উঠে আসছিল গ্রামে, সে দেখল ঝোপের ভিতর পাগল ঠাকুর। সে বলল, কর্তা বাড়ি যান। আসমানের অবস্থা ভাল না।

মণীন্দ্রনাথ ঝোপের ভিতর থেকে আবেদালির কথা শুনেও হাসলেন। মুসলমান বিবিরা শালুক তুলে বাড়ি ফিরছিল। ওরা ঝোপের ভিতর খচখচ শব্দ শুনে উকি দিল। শিশুর মতো পাগল ঠাকুর ঝোপের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে কি যেন অন্বেষণ করছেন। বিবিরা বলল, কর্তা গ, বাড়ি যান। মা-ঠাইরেন চিন্তা করব—আসমান বড় টান-টান ধরছে।

আবেদালি বাড়ি উঠে ভাবল—কর্তারে ধইরা নিয়া গ্যালে হয়। কিন্তু বুড়ো ঠাকুরুণ শশীবালার কথা মনে করে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, যদি বলেন, তুই ক্যান অরে ধইরা আনলি। আবার অরে সান করান লাগব, এই সব ভেবে উঠোনে আর দাঁড়াল না। সে চন্দদের নৌকায় কাজ করে। নদীতে নৌকা থাকে। ক'দিন পর বাড়ি ফিরছে—ক্লান্ত এবং অবসন্ন তবু কী এক কষ্টের কথা ভেবে আসমানের দিকে তাকিয়ে ওর ডর ধরে গেল। ঝড়-জল আসমান ফেটে নামলে মানুষটা ভিজে ভিজে মরে যাবে। সে মাঠে নেমে গেল। এবং নদীর চরে ঈশমের ছই, সে ছইয়ের দিকে হাঁটতে থাকল। ঈশমকে খবরটা দিয়ে ঘরে ফিরবে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আকাশের অবস্থা দেখে মাঠ থেকে মানুষেরা গ্রামে উঠে গেল। গরু-বাছুর নিয়ে গৃহস্থেরা ফিরে এল বাড়ি। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে, শিলাবৃষ্টি হতে পারে, আকাশটা ক্রমে কালো হয়ে গেল। দুটো-একটা সাদা বক ইতস্তত উড়ে উড়ে নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছিল! খুব থমথমে ভাব। ডাল পালা একটাও নড়ছে না। মুসলমান গ্রামে মোরগেরা ডাকতে থাকল। যত আকাশ কালো হচ্ছে, যত এই পৃথিবী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে মণীন্দ্রনাথ তত উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। কি উল্লাস, কি উল্লাস! তিনি যেন ঘুরে-ফিরে নাচছিলেন। তিনি আকাশ দেখে, পাগলপারা আকাশ দেখে যেমন খুশি হলে তালি বাজান, ভুবনময় তালি বাজে—তিনি নেচে নেচে তালি বাজাতে থাকলেন! টুপটাপ বৃষ্টি, গাছপাতা ভিজে যাচ্ছে। গরমে মাথা শক্ত হয়ে যাচ্ছে—এই টুপটাপ বৃষ্টি,

আকাশের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব ওঁকে সামান্য সহজ করে তুলছিল। কিন্তু এক্ষুনি শচী আসতে পারে, চন্দ্রনাথ আসতে পারে। ওরা এসে তাঁকে জোর করে নিয়ে যেতে পারে। ঈশ্বরের মতো গাছটার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে ভাবতেই তিনি কাপড়ের আঁচলে গাছের ডালে নানা রকমের গিঁট দিতে থাকলেন। ঝড়ে ওঁকে ঠেলতে পারবে না, গ্রামের মানুষেরা ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি কাপড়টা গোটা খুলে গাছের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললেন।

টোডারবাগ থেকে নেমে আবেদালি সড়ক ধরে হাঁটতে থাকল। বাড়ির কাজ ফেলে, নামাজ ফেলে সে ঈশমের জন্য নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। ছইয়ের নিচে কোনও লণ্ঠন জ্বলতে দেখল না। সে আলে দাঁড়িয়ে ডাকল, অ ঈশম চাচা, আছেন নাকি? বৃষ্টি পড়ায় আবেদালির শরীর ভিজে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য শীত করছে। সুতরাং সে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না। সে নিজের গাঁয়ে ফিরে ঘরে ওঠার মুখে ডাকল, জব্বরের মা, আমি আইছি দরজা খোল্। অথচ কোনও সাড়া না পেয়ে সে কেমন ক্ষেপে গেল। সে চিৎকার করে ডাকল, তরা মইরা আছস নাকি।

বৃষ্টির শব্দের জন্যই হোক অথবা অন্য কোনও কারণে—জব্বর দরজা খুলতে দেরি করছে। আবেদালি বার বার ঝাঁপের দরজায় ধাক্কা মারতে থাকল। জব্বর দরজা খুললে সে কেমন পাগলের মতো চিৎকার করে বলল, তর মায় কই রে?

—মায় গ্যাছে সামুগ বাড়ি।

—ক্যান গ্যাল। আবেদালি তফন দিয়ে শরীর মুখ মুছল।

—সামুগ বাড়িতে জালসা আছে।

আবেদালি তিন-চারদিন পর বাড়ি ফিরেছে। সুতরাং গ্রামের কোথায় কি হচ্ছে জানার কথা নয়। আবেদালি চন্দদের বড় নৌকা নিয়ে নারাণগঞ্জে সওদা করতে গিয়েছিল। দন্দির বাজারে চন্দদের মুদির দোকান! আবেদালি চন্দদের বড় নৌকার মাঝি। ঘরে ফিরে সে কেমন শান্তি পাচ্ছিল না। ওর মনটা কেবল খচখচ করছে। এখনও হয়তো বড়কর্তা ঝোপে বসে আছেন। বাড়ির মানুষেরা বড়কর্তার জন্য ভাবছে। হয়তো কেউ কেউ খুঁজতে বের হয়ে গেছে। সে এবার ছেলের দিকে তাকাল—বলল, জব্বর, একটা কাম করবি বা'জান।

জব্বর কেমন ঝাঁঝের গলায় বলল, কারণ এখন কত কথা এই বয়স্ক মানুষটা তাকে বলতে পারে, যাও মাঠর খেড় তুইলা আন। পানিতে ভিজা গেলে গরুতে খাইব না!—কী করতে কন!

প্রথম ভাবল বিবির কথা বলবে। সে এসেছে—কোথায় বিবি এসে তাকে এখন খানাপিনার অথবা মর্জি মোতাবেক কিছু কথাবার্তা—তা না জালসায় পরাণ খুইলা দিছে। সে বিরক্ত হয়ে বলল, তর মায়েরে ডাক দিনি।

—মায় কি অখন আইব?

—আইব না ক্যান রে। তিনদিন ধইরা লগি বাইছি—এই জানডার লাগি তগ মায়া-মমতা নাই রে!

—আর বেশিদিন কষ্ট করতে হইব না বা'জান।

এমন কথায় আবেদালি কি যেন টের পেয়ে বলল, হ, চুপ কর।

জব্বর চুপ করে ছেঁড়া মাদুরটার এক পাশে বসে থাকল সহসা বলল, হুঁকা খাইবেন বা'জান?

আবেদালি বুঝল, জব্বরও এসময় একটু হুঁকা খেতে চায়। মনটাতে খোশ মেজাজ এনে দেবার জন্য বলল, সাজা।

জব্বর হুঁকা সাজাল। বাপকে দিল। তারপর নিজেও দু'টান দিয়ে বলল, আপনে নামাজ পড়েন, আমি ভাতটা বাড়তাছি।

—নামাজ পড়মু না! আবেদালি এবার উঠল। বৃষ্টির জলে বদনা ভরল। এবং হাতে মুখে জল দিল। বাইরে জোর বর্ষণ হচ্ছে। মাঝে মাঝে আকাশটা চিরে যাচ্ছে। যেন কে মাঝে মাঝে আসমানের গায়ে স্বর্ণলতা ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে—ফালা ফালা আকাশে গর্জন উঠছিল—আবেদালির ঘরটা যেন পড়ে যাবে। শণের চাল পচে গেছে। টুই দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে। পাটকাঠির বেড়া পচে গেছে। বাঁশের উপর ছেঁড়া পাটি এবং কাঁথা বালিশ, নিচে ছেঁড়া চাটাই। আবেদালি ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর খেতে বসল। বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া দিচ্ছে, মাদার গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। আবেদালি ডাকল, অ, জব্বর! জব্বর! খুব ধীরে এবং সে সোহাগের গলায় ডাকল।

—কিছু কন আমারে?

—একটা কাম করতে পারস?

—কী কাম?

—তুই একবার বা'জান ঠাকুরবাড়িতে গিয়া ক'দিনি, বড়কর্তা গোরস্থানের বটগাছটার নিচে বইসা আছে। বা'জানরে, বড় কষ্ট বড়কর্তার—যা, একবার গিয়া কর্তার বাড়িতে খবর দে।

—আমি পারমু না বা'জান। আমারে অন্য কামের কথা কন! আবেদালি এবার খাবার ফেলে উঠে পড়ল। সে জব্বরের মুখের সামনে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠলয়েন যেন সে কে জব্বরকে মেরেই ফেলবে—পা'টা পিঠের কাছে নিয়ে কি ভেবে সরিয়ে আনল। বলল হালার পো হালা, তুমি আমার বাপজান। তোমার কথায় আমি চলুম!

জব্বর তেমনি মাথা নিচু করে বসে থাকল।—আমারে অন্য কামের কথা কন। সে যেন কি স্থির করে রেখেছে মনে-মনে। সুখে এবং স্বচ্ছন্দে দিন যায় না—বাপ তার কত দিন পরে ঘরে ফিরে এসেছে। এসে কোথায় মিষ্টি কথা বলবে-তা না কেবল খ্যাক খ্যাক করছে খাটাশের মতো। সে ভিতরে-ভিতরে এতক্ষণ যা প্রকাশ করতে চাইছিল না, বাপের মর্জি দেখে, এই নিষ্ঠুর চেহারা দেখে মরিয়া হয়ে উঠল—যেন বাপ ফের বললে সে মুখের উপরে বলেই দেবে।

—কি যাবি না।

—না। আমারে অন্য কামের কথা কন।

—তা হইলে আমার কথা থাকব না!

—না।

—ক্যান, কী হইছে! আবেদালি এবার স্বর নামাল।

—আমি লীগে নাম লেখাইছি।

—ত হইছে ডা কি! হইছে ডা কী ক? নাম লেখাইয়া বা'জানের কোরান শরিফ শুদ্ধ কইরা দিছ!

—কী হইব আবার। হিন্দুরা আমাগ দ্যাখলে ছ্যাপ ফালায়, আমরা-অ ছ্যাপ ফ্যালামু।

—জাল্সাতে বুঝি এডাই হইতাছে!

জব্বর এবার চুপ করে থাকল।

বাপ বেটা এবার দু'জনেই চুপ গেল। আবেদালি ফের খেতে বসে গেল। মাথা নিচু করে খেতে বসে গেল। ঝালে—কি ছেলের কথায় চোখ ছলছল করছে বোঝা যাচ্ছে না। সে নিজের এই দুঃখটুকু সামলাবার জন্য জল খেতে থাকল। তারপর খুব ধীরে ধীরে যেন অনেক দূর থেকে বলার মতো বলল, বড়কর্তা পানিতে ভিজতাছে, তুই না গেলে আমি যামু। আবেদালি বদনার নল মুখে পুরে দিল এবং হাঁসের মতো কোৎ করে জলটা যেন গিলে ফেলল। তারপর বাকি জলটা মুখে রেখে অনেকক্ষণ কুলকুচা করল। দাঁতের ফাঁকে যা কিছু ভোজ্য দ্রব্য—যেখানে যেমন যে-ভাবে দাঁতের ফাঁকে লেগে আছে—সে জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে বাকি খাদ্যবস্তুর স্বাদ নিতে নিতে কেমন নিষ্ঠুর চোখে ফের জব্বরের দিকে তাকাল। বলল, তুমি আমার ভাত পাইবা না, কাইল থাইকা তোমার ভাত বন্ধ। আবেদালি মরিয়া হয়ে উঠল। পুত্রের এমন সম্মান-অসম্মানবোধ ওর ভাল লাগল না। তিন দিনের পরিশ্রম এবং এ-সময়ে ঘরে বিবির অনুপস্থিতি ওকে পাগল করে দিল। একবার

ইচ্ছা হল ঘরের কোণ থেকে সড়কিটা নিয়ে পেটে খোঁচা মারে—কিন্তু কি ভেবে সে বলল, আল্লা, দ্যাশে এটা কী শুরু হইল!

আবেদালির কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কুপির আলোতে আবেদালির মুখ ভয়ানক উদ্বিগ্ন। ঢাকায় রায়ট লেগেছ—এসব কথা কেন জানি বার বার মনে পড়ছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই জবাই হচ্ছে। সব কচুকাটা। মুসলমান জবাই হলেই সে কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে কিন্তু বড়কর্তা ধনকর্তার এবং পাশের গ্রামের অন্যান্য অনেক হিন্দুর উদারতা, পুরুষানুক্রমে আত্মীয় সম্পর্ক সব দুঃখ, উত্তেজনা মুছে দেয়। দরজার ভিতর থেকেই হাত বাড়াল আবেদালি। একটা মাথলা মাথায় টেনে অন্ধকার পথে নেমে গেল।

শচী হাঁটছিলেন। আগে ঈশম যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে, সংসারে নানা রকমের দুঃখ জেগে থাকে—এই যে বড়কর্তা বিকেল থেকে নিরুদ্দেশে চলে গেল—কই গেল-ঝড়ে জলে এখন কোথায় আছে—এসব বলছিলেন। শত্রুর য্যান এমন না হয়! অশান্তি, অশান্তি! মারা গ্যালে-অ ভাবতাম, গ্যাছে। কতকাল এই দেখতে হবে ঈশ্বর জানে!

শচী এই ঝড়-বৃষ্টিতে এবং শীতের হাওয়ায় কাঁপতে থাকলেন। ঈশমও শীতে কাঁপছে। ঝড়জলের ভিতর দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছিলেন। ওরা অনেকগুলি জমি অতিক্রম করে মুসলমান পাড়ার ভিতর ঢুকতেই দেখলেন, ইস্মতালির বড় ছেলে মনজুর বারান্দায় বসে আছে। সামনে কোরানশরিফ—উপরে দড়ি দিয়ে বাঁধা লণ্ঠন। ঝড়জল কমে গেছে। সে যেমন সাঁজ হলে রোজ পড়তে বসে তেমনি পড়তে বসার সময় দেখেছে—ঝড়জলে গ্রাম ভেসে যাচ্ছে। সে গরুগুলি গোয়ালে তুলে, হাঁসগুলি খোঁয়াড়ে রেখে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসেছিল। ঝড়জল থামতেই দরজা জানালা খুলে দিয়েছে। আকাশ তেমন গর্জন করছে না। সুতরাং সে পা দুটো ভাঁজ করে অনেকটা নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে বসার সময় দেখল লাউমাচানে আলো এসে পড়ছে। তারপর আলোটা বাড়ির দিকে উঠে এলে দেখল—ঠাকুরবাড়ির ছোটকর্তা—শচী ঠাকুর। সঙ্গে ঈশম। ওরা এত রাতে—এ পাড়ায়! সে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। বলল, কর্তা এই ম্যাঘলা দিনে বাইরে বাইর হইছেন!

—বড়দারে দ্যাখছস এদিকে?

—না-গ কর্তা তাইনত আইজ ইদিকে আসে নাই।

মনজুর হ্যারিকেনটা হাতে নিল। বলল, আপনে বসেন। আমরা পাড়াটা খুঁইজা দ্যাখতাছি।

শচী বললেন, তুই আবার এই বৃষ্টিতে যাবি কি করতে। সকলে কষ্ট কইরা লাভ নাই। বলে হাঁটতে থাকলেন। মনজুর কোনও কথা বলল না। শুধু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকল। এ-সময়ে গ্রামে কিছু কুকুর ডেকে উঠল। ফেলুর বাড়িটা বাঁশঝাড়ের নিচে অন্ধকারে ডুবে আছে। শচীর ইচ্ছা হল বলতে, ফেলু কি হাইরা গ্যাছে। ফেলুর বাড়িতে এত অন্ধকার! কুপি জ্বালাইয়া অর বিবিটা ত নলীতে সূতা ভরে। আইজ সাড়াশব্দ পাই না

ক্যান। কিন্তু বলতে পারলেন না। কুল গাছে ফুলের গন্ধ। বৃষ্টি এবং ঝড়ের জন্য কিছু ফুল মাটিতে পড়ে আছে। শচী এসব মাড়িয়ে সহসা দেখতে পেলেন বড় একটা ডে-লাইট জ্বলছে সামুদের বাড়ি। বড় টিন-কাঠের ঘর, চওড়া বারান্দা, মুলি বাঁশের বেড়া, এবং ঠিক দরজার মুখে বাঁশে আলোটা ঝুলছে। সামনে সামিয়ানা টাঙানো ছিল, খুলে ফেলা হয়েছে। ঝড়জল একেবারে থেমে গেলে ফের সামিয়ানা টাঙানো হবে। এখন লোকগুলি ঘরে বারান্দায় এবং বৈঠকখানায় গিজগিজ করছে। অন্ধকারে গ্রামে সহসা এই আলো শচীকে বিস্মিত করে।

মনজুর যেন বের হয়ে গেছে। কর্তার মনে সংশয়। কর্তা কি যেন ভাবছেন। সে বলল, খুলেই বলল, জাল্সা কর্তা। শুনছি ইখানে সামসুদ্দিন লীগের একটা অফিস খুলব। ঢাকা থাইকা আইসা সামু আমাগ লীগের পক্ষ হইয়া গ্যাল।

শচী কোন উত্তর করলেন না। সামুর এই ব্যাপারটা শচীর ভাল লাগল না।

মনজুর বলল, সামুরে ডাকি কর্তা। আপনে আইছেন।

শচী বললেন, না দরকার নাই। ব্যস্ত আছে, ডাইকা ব্যতিব্যস্ত কইরা লাভ নাই।

তবু খবর দিল মনজুর। ছোটকর্তা তোমার বাড়ির পাশ দিয়া যাচ্ছে তুমি বসে বসে জাল্সা করছ, একবার যাও। কর্তারে কও বইতে, পান-তামুক খাইতে।

খবর পেয়ে সামসুদ্দিন তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল। বলল, আদাব কর্তা।

—ক্যামন আছ সামু?

—ভাল নাই কর্তা। ধনকর্তার নাকি পোলা হইছে?

—হ।

—তবে মিষ্টি খাওয়ান লাগব। যামু একদিন।

শচী এতক্ষণ যা বলবেন না ভাবছিলেন, অন্য কথা বলবেন ভাবছিলেন, কিন্তু মনের ভিতর কি রকম গোলমাল শুরু করে দিল। বললেন, চ্যালা ফ্যালা যোগাড় হইছে। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বললেন শচী। হঠাৎ পাণ্ডা সাজলা। আগে না আজাদের খুব ভক্ত আছিলা।

সামসুদ্দিন খুব বিব্রত বোধ করল। সে অন্য কথায় চলে আসতে চাইল। বলল কর্তা, বইসা যান।

মনজুর বলল, বড় কর্তারে খুঁজতে বাইর হইছে।

এবার সামসুদ্দিন শচীর সঙ্গে হাঁটতে থাকল। যেন একটা কী নৈতিক দাযিত্ব আছে এইসব মানুষের ভিতর। সংসারে এ যে এক মানুষ, অমন মানুষ হয় না-পাগল হয়ে যাচ্ছে। সব ফেলে—যা কিছু প্রিয়, যা কিছু সুখের সব ফেলে মানুষটা কেবল নিরুদ্দেশে চলে যেতে চাইছে। সবাই সুতরাং চুপচাপ হাটছে। ঘরগুলি পরস্পর এত বেশি সংলগ্ন যে শচীকে প্রায় সময়ই নুয়ে পথ পার হতে হচ্ছিল। একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালেই ঘরের সনচা এসে মাথায় ঠেকছে। এই বাড়িঘরের যেন কোনও নির্দিষ্ট সীমানা নেই-একটা বাড়ির সঙ্গে আর একটা বাড়ি লেগে আছে—কার কোন ঘর, কে কোন বাড়ির মালিক মাঝে মাঝে শচীর পক্ষে নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ বাড়িটা আাবেদালির। বাড়ির উঠোনে আর একটা ঘর উঠছে। শচী ভাবলেন, আবেদালির দিদি জোটন নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। ঘরটা দেখলেই তিনি টের করতে পাবেন। টের করতে পারেন কিছুদিন আগে জোটন বিবি ছিল, এখন বেওয়া হয়েছে। জোটনের সব সমেত তিনবার নিকাহ্। শচী হিসাব করে দেখলেন—এবারটা নিয়ে চারবার হবে। তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর জোটন প্রতিবার আবেদালির কাছে চলে আসে। আবেদালি তখন লতা এবং খড়ের সাহায্যে উত্তর দুয়ার ছোট্ট খুপরি ঘরটা তুলে দেয়—এই পর্যন্ত আবেদালির সঙ্গে জোটনের সম্পর্ক। তারপর কিছুদিন ধরে জোটনের জীবনসংগ্রাম। ধান ভেনে দেওয়া, চিঁড়া কুটে দেওয়া পাড়াপ্রতিবেশীদের এবং যখন বর্ষাকাল শেষ হয়, যখন হিন্দু গৃহস্থের পূজা পার্বণ শেষ তখন জোটন অনেক দুঃখী ইমানদারের সঙ্গে ভাতের হাড়িটা ধুয়ে পাকলে জলে নেমে পড়ে। এবং সব পাট খেত চষে বেড়াতে থাকে শালুকের জন্য। শালুক শেষ হলে আবেদালির কাছে নালিশ-দ্যাশে কি পুরুষমানুষ নাইরে আবেদালি। সেই জোটন উঠানের উপর আলো দেখে মুখ বার করল। দেখল, শচীকর্তা হাঁইটা যান উঠানের উপর দিয়া। সে একবার ডাকবে ভাবল, কিন্তু বড় মানুষকে ডাকতে সাহস পেল না।

শচী নেমে যাচ্ছিলেন, তখন আবেদালির দরজা খুলে গেল। ওরা পা টিপে-টিপে হাঁটছিল। জব্বর দরজা খুলতেই শচী দাঁড়ালেন। সব মাতব্বরদের দেখে জব্বর কিঞ্চিৎ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। প্রথমে কী বলবে ভেবে পেল না। পরে সামুকে দেখে যেন সাহস পেল। বলল, বা'জী আপনেগ বাড়ি গেছে কর্তা।

—ক্যান রে?

—বড়কর্তার খবর দিতে। বড়কর্তা গোরস্থানে বইসা আছে। ওরা আর দেরি করল না। তাড়াতাড়ি উঠোন থেকে নেমে সড়কের উদ্দেশে হাঁটতে থাকল। জব্বর সকলকে দেখে ঘরে আর থাকতে পারল না। সে-ও ওদের পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকল। বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঝ'ড়ো হাওয়া আর বইছে না। গাছের মাথায়, ঝোঁপে-জঙ্গলে আবার তেমনি জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। রাতের অন্ধকারে এই পাঁচটি প্রাণী মাঠে নেমে সেই গোরস্থানের বট গাছটার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

ঈশম যেন সকলের আগে পৌঁছাতে চায়। সে বলল, কর্তা, পা চালাইয়া হাঁটেন।

অঘ্রানের প্রথম শীত বলেই জোনাকির এই অল্প-অল্প আলো, প্রথম শীত বলেই কোড়া পাখি এত রাতেও ডাকছে না, ঘাস মাটি, বৃষ্টিতে ভিজে সব জল শুষে নিয়েছে। শক্ত মাটি। সড়কে কোথাও পথ পিচ্ছিল নয় বরং শান্ত স্নিগ্ধ এক ভাব। অনেকদিন পর বৃষ্টি হওয়ায় ধানের পক্ষে ভালো হবে—সুদিন আসবে, দুর্দিন থাকবে না। ঈশম বড় বড় পা ফেলে হাঁটছে। কেউ কোনও কথা বলছিল না, যেন শচী ওদের সব দুষ্টুবুদ্ধি ধরতে পেরেছেন—যেন পুরুষানুক্রমিক আত্মীয়বোধটুকুতে দুঃখ ও বেদনা সঞ্চারিত হচ্ছে।

সামসুদ্দিন মনে মনে কেমন এক অপরাধবোধে পীড়িত—যার জন্য সে প্রায় চুপচাপ হাঁটছিল।

লণ্ঠন তুলে বট গাছটার নিচে খুঁজতেই দেখল, বড়কর্তা ফাঁসির মতো ঝুলে আছেন। ফাঁসটা গলায় নয় কোমরে। ধনুকের মতো বেঁকে আছেন। অথবা সার্কাসের তাঁবুতে খেলোয়াড় যেমন খেলা দেখায় তেমনি তিনি পিককের খেলা দেখাতে চাইছেন। ঝড়, শিলা-বৃষ্টি শরীরের উপর কি ক্ষত চিহ্ন রেখে গেছে। শরীরের ভিতর কোথাও এক যন্ত্রণা, ভালোবাসার যন্ত্রণা অথবা স্বপ্নের ভিতর এক মঞ্জিল আছে, মঞ্জিলে জাদুর পাখি আছে-সেই পাখি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন তিনি তার সন্ধানে আছেন। মনে হয় পাখি উড়ে গেছে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সওদাগরের দেশ পেরিয়ে কোথায় জলপরীদের দেশ আছে, পাখি এখন সেখানে দুঃখী রাজপুত্রের মাথায় বসে কাঁদছে। তখনই ভিতরে বড়কর্তার কী যেন কষ্ট হয়—নিজের হাত নিজে কামড়াতে থাকেন। ওরা দেখল মানুষটা হাত কামড়ে ফালা-ফালা করে দিয়েছেন। এবং জঙ্গলের উপর ঝুলে আছেন।

ঈশম মটকিলার জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। সে এ-গাছ ও-গাছ করে বড়কর্তাকে জঙ্গলের ভিতর থেকে মুক্ত করল। ঠাণ্ডায় বড়কর্তার চোখ-মুখ কাতর। অথবা যেন তিনি নিশিদিন জলের নিচে ডুবে ছিলেন—জল থেকে কারা তাঁকে তুলে এনে ঝোপে-জঙ্গলে ফেলে গেছে। হাত-পা সাদা ফ্যাকাসে। ঈশম জঙ্গল থেকে বের করে কাপড়টা ভালো করে পরিয়ে দিল। বড়কর্তা নিজের কব্জি থেকে নিজের মাংস তুলে নিয়েছেন। হাত মুখ রক্তাক্ত, বড়কর্তার শরীর মুখ এ-মুহূর্তে বীভৎস দেখাচ্ছে। চাপ চাপ রক্তের দাগ। গাছের ডালে-ডালে পাখিদের আর্তনাদ—নির্জন মাঠ, সকলকে সহসা বড় ক্লান্ত করছে যেন।

শচী লণ্ঠন তুলে মুখ এবং কব্জি দেখতেই বড়কর্তা হেসে দিলেন। শিশুর মতো সরল হাসি। শচী তাকাতে পারছেন না। তাড়াতাড়ি এখন বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। দূর্বা ঘাস তুলে শচী ক্ষতস্থানে রস ঢেলে দিলেন। জ্বালা এবং যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে। তিনি কিছু বলছেন না। চিৎকার করছেন না। সবার সঙ্গে এখন আউলের মতো হেলে-দুলে হাঁটছেন শুধু।

সামসুদ্দিন হাঁটতে হাঁটতে বলল, কর্তারে লইয়া কাশী, গয়া, মথুরা ঘুইরা আইলেন—কেউ কিছু করতে পারল না! ভাল করতে পারল না!

মনজুর বলল, কইলকাতায় লইয়া গেলেন—বড় ডাক্তার দেখাইলেন, কেউ কিছু করতে পারল না?

শচীর গলাতে অন্ধকারেও হতাশা ফুটে উঠতে থাকল! বললেন, কেউ কিছু করতে পারল না। দশ-বারো বছর ধইরা কত দেশ-বিদেশ করলাম!

মনজুর বলল, হাসান পীরের দরগায় সিন্নি দিলাম—না, কিছু হইল না।

শচী আর কথা বলছেন না। সকলেই এ দুঃখে যেন কাতর। যেন এই দুঃখ পাশাপাশি সব গ্রামকে বিপর্যস্ত করছে। বড়কর্তাকে নিয়ে একদা এই সব পাশাপাশি গ্রামের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা। কত দিন থেকে বড়কর্তার অবিস্মরণীয় মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে এ-অঞ্চলের মানুষেরা গৌরব বোধে আচ্ছন্ন। আমাদের অঞ্চলেও একজন আছেন, আমরা একজনকে সবার সামনে রাজকীয় সম্মানে হাজির করতে পারি। সবার প্রীতি এবং স্নেহ যেন এই ক্ষণজন্মা পুরুষকে অতি আদরে মনের ভিতরে সংগোপনে লালন করছে—সেই মানুষ দিন-দিন কী হয়ে যাচ্ছেন!

মনজুর এ-সময়ে শচীকে প্রশ্ন করল, আইচ্ছা কর্তা, বা'জী আমারে কয়, বুড়াকর্তা নাকি জীবনে মিছা কথা কয় নাই!

শচী বললেন, শুনছি, লোকে তাই কয়।

—তবে এত বড় একটা তাজা শোক পাইল ক্যান?

শচী উত্তর করতে পারলেন না। আকাশে যে মেঘ ছিল বাতাসে কেটে যাচ্ছে। ওরা গোপাট ধরে পুকুরপাড়ে উঠে এল না, ওরা নরেন দাসের গয়া গাছটার নিচ দিয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করল। নরেন দাসের উঠোনে উঠে দেখল, কোনও আলো জ্বলছে না। নরেন দাসের তাঁতঘরেও কোনও শব্দ নেই। এত তাড়াতাড়ি সকলে শুয়ে পড়েছে! সামসুদ্দিন ভাবল নরেন দাসের বোনটা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে—সুতরাং শোক এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে ছমছম করছে। সে একদিন দূর থেকে মালতীকে দেখেছে। বিধবা হবার পর থেকে মালতী ব্লাউজ পরে না। মালতীর কোনও সন্তান নেই। যে সালে বিলের জলে কুমীর আটকা পড়ল সে সালেই মালতীর বিয়ে হল। নরেন দাস বিয়েতে খরচ-পত্তর করেছিল। সুতরাং পাঁচ সাত বছর হবে মালতী এই গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিল। ফুটফুটে রাজপুত্রের মতো বর। ছোটোখাটো মানুষের চোখ দুটো ইচ্ছে করলে সামু এখনও মনে করতে পারে। নরেন দাস নসিন্দি থেকে চারটে ডে-লাইট এনে ঘরে-বাইরে সকল স্থানে আলো জ্বেলে, আলোময় করে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছিল বরের হাত ধরে, মালতীর মা নাই, বাপ নাই, তুমি ওর সব। নরেন দাস অনেকক্ষণ চৌকিতে পড়ে কেঁদেছিল। সকলে চলে গেল, বাড়ি ফাঁকা ঠেকল। তবু নরেন দাস দু'দিন তক্তপোশ থেকে উঠল না। ছোট বোনটা এ-বাড়ির যেন প্রজাপতির মতো ছিল। শুধু সারা দিন উড়ত, উড়ত। গাছের ছায়ায়, পুকুরের পাড়ে পাড়ে লটকন গাছের ডালে-ডালে মেয়েটা যেন নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়াত।

সামু, রঞ্জিত ছিল বড় কাছের মানুষ তখন। ওরা কত দিন চুকৈর আনতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। মালতী বিধবা হয়ে ফিরলে সে আর কথা বলতে পারেনি। কারণ ঢাকার রায়টে স্বামী তার কাটা গেছে।

বাড়িতে ঢুকে শচী ডাকলেন মা জল দ্যাও।

কাকার গলা পেয়ে লালটু বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে এল। চন্দ্রনাথ বের হয়ে এলেন। শশীবালা স্বামীর পায়ের কাছে বসেছিলেন এতক্ষণ, উঠোনে শচীর গলা পেয়েই নেমে এলেন। মহেন্দ্রনাথ ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। আজকাল মণির নূতন উপসর্গ হয়েছে। কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া। এতদিন সে বৈঠকখানায় শুধু বসে থাকত অথবা পুকুর পাড়ে পায়চারি করতে করতে গাছপালা পাখির সঙ্গে কী যেন বিড়বিড় করে বকত। ছেলে ফিরেছে শুনেই কম্বলটা হাতড়ে মুখের উপর টেনে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। ভিতরে যে উৎকণ্ঠা ছিল সেটা কেটে গেছে।

শশীবালা উঠোনে নেমে অনেক লোক দেখতে পেয়ে বললেন, তরা!

—আমি সামু ঠাইরেন।

—আমি মনজুর, ঠাইরেন।

বড় বৌ জানালা দিয়ে সব দেখছে। স্বামীর দীর্ঘ চেহারা এবং বলিষ্ঠ মুখ আর কি যেন তার ভিতরে এক আত্মপ্রত্যয়ের ছবি—সে ছবি মাঝে মাঝে হাওয়ায় দুলতে থাকলে—বড় বৌ হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—ঈশ্বর আমার এই মানুষকে তুমি দেখে রেখো, উঠোনে মানুষ জন বলে সে নেমে আসতে পারল না।

শশীবালা সকলকে বসতে বলে ঘরে ঢুকে গেলেন। সামান্য জল, তুলসীপাতা এবং চরণামৃত এনে শচী আর মণির শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। জল আনালেন এক বালতি। চন্দ্রনাথ পাট ভাঙা কাপড় বের করে আনলেন। ক্ষতস্থানে গাঁদা পাতার রস দিয়ে হাতটা বেঁধে দিলেন।

সামসুদ্দিন বলল, ঠাইরেন, আমরা যাই।

—যাও। রাইত অনেক হইছে। সাবধানে যাইও। তারপর কি ভেবে শশীবালা উঠোনের মাঝখানে এসে বললেন, সামু, চাইর পাঁচদিন ধইরা তর মায়রে দ্যাখি না।

—মার কমরে ব্যাদনা হইছে। উঠতে পারতাছে না। বাতের ব্যাদনা মনে হয়।

—খাড়। বলে তিনি ঘরে ঢুকে একটা পুরনো শিশি বের করে আনলেন। বললেন, শিশিডা নিয়া যা সামু। কমরে ত্যাল মালিশ করতে কবি।

ওরা চলে গেল। ঈশম লণ্ঠন হাতে তরমুজ খেতে নেমে গেল। সোনালী বালির নদীর চরে তরমুজ খেতে ছইয়ের ভিতর সারা রাত সে বসে থাকবে। খরগোশ অথবা ইঁদুর কচি তরমুজের লতা কেটে দেয়। রাতে সে বসে টিনের ভিতর ডংকা বাজাবে। অনেক দূর থেকে কেউ প্রহরে জেগে গেলে সেই ডংকা শুনতে পায়, শুনতে পেলেই ধরতে পারে ঈশম, ঠাকুরবাড়ির বান্দা লোক, ঈশম এখন তরমুজ খেতে ডংকা বাজাচ্ছে। ডংকা বাজিয়ে ইঁদুর বাদুড় সব তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ছোটকর্তা শচীন্দ্রনাথ নিজের ঘরে বসে তখন দৈনন্দিন হিসাব লিখছেন। বড়কর্তাকে হাতমুখ পরিষ্কার করে রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি ডাল দিলে ডাল খেলেন, ভাত দিলে শুধু ভাত, মাছ অথবা মাংস খাওয়ার সময় হাড়গুলি গিলে ফেললেন। কেমন বড় বড় চোখে তিনি রান্নাঘরটা দেখতে থাকলেন। তখন শশীবালা বললেন, মণিরে আর কষ্ট দিও না। তরকারী ভাতের লগে মাইখা দাও।

মার এমন কথায় মণীন্দ্রনাথ কীটসের একটি প্রেমের কবিতা পূর্বাপর ঠিক রেখে গভীর এবং ঘন গলায় আবৃত্তি করে শোনালেন। মা অথবা চন্দ্রনাথ কেউ তার একবর্ণ বুঝল না। বলতে বলতে তিনি বড়বৌর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকলেন। যেন নিদারুণ কোন যন্ত্রণার কথা তিনি বার বার এইসব কবিতার ভিতর পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন। যেন এই পৃথিবী নিরন্তর অসহিষ্ণুতায় ভুগছে। মণীন্দ্রনাথ এ সময়ে নিজের কপালে এবং মাথায় হাত বোলাতে থাকলেন, মাগো, তোমরা আমাকে আদর করো, এমন ভাব মণীন্দ্রনাথের চোখে মুখে। তাঁর অপলক দৃষ্টি যেন বলছে—আমার বড় কষ্ট বড় যন্ত্রণা!

সম্পর্কে জোটন বিবি আবেদালির দিদি হয়।

সেই জোটন শোলার ছোট্ট ঝাঁপটা টেনে ঘর থেকে মুখ বার করল। এখনও ভোর হয়নি। সারা রাত জোটনের চোখে ঘুম নেই। মসজিদে সামু আজান দিচ্ছে, জোটন ঘরে বসে অন্ধকারে ছেঁড়া হোগলা এবং ছেঁড়া কাঁথাটা ভাঁজ করে এক পাশে রেখে দিল। অন্ধকার কাটছে না, সুতরাং ঘরের আসবাবপত্র অস্পষ্ট—শিকাতে দুটো হাঁড়ি, দুটো সরা—দু'দিন থেকে জোটনের ভাত নেই, দু'দিন ধরে জোটন শালুক সিদ্ধ করে খাচ্ছে। সে অন্ধকারে বসে শালুকগুলি খেতে থাকল। শুকনো বলে গলায় আটকাচ্ছে—একটু জল খেল

জোটন। আবার দরজা ফাঁক করে যখন আকাশ দেখল-আকাশ পরিষ্কার, মোরগেরা ডাকছে—জোটন দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

মসজিদের ওপাশটায় সূর্য উঠছে। আবেদালি বদনা হাতে মাঠ থেকে উঠে এল। আবেদালির বিবি জালালি পাতা দিয়ে উঠোনের এক কোনায় ভাত রান্না করছে। আবেদালিকে দাওয়ায় বসতে দেখে জোটন বলল, কি রে, মানুষটা ত কাইল আইল না।

না আইলে আমি কি করমু! আবেদালি জোটনের এই ইচ্ছায় বিরক্ত। তিন তিনবারের পর ফের নিকাহের শখ!

দু'দিন না খেয়ে জোটনও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। সে আবেদালিকে বলল, দন্দি যাওনের সময় মানুষটার খোঁজ কইরা যাবি। মানুষটা বাঁইচা আছে, না, মরছে কবি আইয়া।

কমু গ কমু! আবেদালি দেখল জোটনের মুখ ভয়ানক শুকনো। দু'দিন না খেতে পেয়ে জোটনের চোখ কোটরাগত। বলল—তুই দুফরে আমার ঘরে খাইস। আবেদালি এবার জালালির মুখটা দেখল। সূর্য উঠছে বলে রোদের রঙ জালালির খড়খড়ে মুখটা আরও খড়খড়ে করে দিচ্ছে এবং আবেদালির এমত কথায় জালালির মুখটা রাগে ফোটকা মাছের মতো ফুলতে থাকল।—আরে, আরে, করতাছস কি। তর গাল যে ফাইট্টা যাইব!

জোটন বুঝতে পেরে বলল, না রে থাউক। আমার খাওনের লগে কি আছে!

আবেদালি বুঝল জোটন খাবে না। সে দেখল, জোটন উঠোন থেকে নেমে যাচ্ছে। জোটন রাস্তায় নেমে গেল এবং সড়ক ধরে হাঁটল না। যেখানে এখনও ধান খেতে জল আছে অথবা খেতের আল জাগছে সেই সব পথ ধরে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে চলেছে।

জোটন এই সব নরম মাটির আশ্রয়ে কচ্ছপের ডিম খুঁজছে। এ সময়ে কচ্ছপেরা ডিম পাড়বে মাটির আলে। জোটন এসময়ে এই সব মাটির আশ্রয় থেকে ডিম বের করে পশ্চিমপাড়া উঠে যাবে ভাবল এবং ডিমগুলি দিয়ে বলবে, আমারে এক টুকরি চাইল দিয়েন। সে এক দু'করে বিলের জমির অনেক আল ভাঙতে থাকল। সূর্য বিশ্বাস পাড়ার ফাঁক দিয়ে অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে। ধান গাছের শিশির, ঘাসের শিশির, কলাই খেতের শিশির সব বিন্দুবৎ হয়ে পড়েছে এবং ইতস্তত রোদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মানুষটা গতকাল এল না, সে পুঁটলি বেঁধে বসে ছিল, মৌলভি সাবকে বলা ছিল, সাক্ষী ঠিক ছিল—অথচ মানুষটা এল না। মুশকিলাসান নিয়ে মানুষটা উঠোনে উঠে ডেকেছিল একদিন, এটা আবেদালির বাড়ি না? আবেদালি, জালালি এবং সকলে ফোঁটা নিয়েছিল—জোটনও উঠেছিল, ফোঁটা নিয়েছিল পীরের দরগায় লোকটা থাকে। উঁচু, লম্বা গোটা গোটা চোখ—নাভির নিচে দাড়ি নেমে গেছে, গায়ে শতচ্ছিন্ন জোব্বা, মাথায় ফেটি এবং গলায় বিচিত্র রকমের মালা-তাবিজ। জোটন ফকির মানুষটার মহব্বতের জন্য প্রথম দর্শনে বিস্মিত এবং শীতের নরম রোদ যেন তাকে গভীর রাত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেদিন।

জোটন আলের ধারে ধারে তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটছে। কচ্ছপের ডিম এখানে নেই, সে হাঁটতে থাকল। সে ইতস্তত তাকাল এবং কয়েকগুচ্ছ ধানের ছড়া শামুকে কেটে কাপড়ের নিচে লুকিয়ে ফেলল। ওর পাশ দিয়ে কামলারা অন্য জমিতে উঠে যাচ্ছে—জোটন বসে পড়ল—যেন সে যথার্থই কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করছে। সে উঠছে না। কামলারা অন্য জমিতে এখন ধান কাটছে। জোটন ধান কাটছে না। হাতের ধারালো শামুকটা সে পেটের নিচে গুঁজে রেখেছে। জোটন অন্য জমিতে কামলাগুলিকে দেখার জন্য গোড়ালিতে ভর করে উকি দিল—জমিটা কার স্থির করার ইচ্ছায়। দূরে গরুগুলিকে জলে নেমে যেতে দেখল—মানুষটা এল না, সেই মুশকিলাসানের মানুষটা। তেরটি সন্তানের জননী জোটন আবার মা হবার জন্য এই আলে দাঁড়িয়ে কেমন ছটফট করতে থাকল। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের রমণী জোটন খোদাকে যেন এই ধানের জমিতে খুঁজছে—খোদার মাশুল উঠছে না গতর থেকে এমন ভাব এখন।

দু'দিন পেটে ভাত নেই—আফসোস। দু'দিন হাইজাদির বিলে গ্রামের অন্য অনেকে দুঃখী ইমানদারদের সঙ্গে শালুক তুলেছে, দুঃখী হলেই ইমানদার হবে, খোদাকে স্মরণ করবে—এমনও একটা বিশ্বাস আছে জোটনের। এই যে এখন জোটন শামুকের ধারালো মুখটা দিয়ে কট করে আর একটা ধানের ছড়া কাটল এবং কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলল—যেন পেটের খিদে ভয়ানক দুঃসহ, খোদার কাছে নিজের গোনাগারের জন্য জোটন মোনাজাত করল—হায়রে খোদা, পেটের জ্বালায় সব হয়। সুতরাং জমির মালিককে যেন বলার ইচ্ছা, ভয় করার কিছু নেই, আর কিছু না হোক, জোটনের ইমান আছে। তোমার শক্ত ধানের ছড়া কাটছি না, আলের উপর যেসব ছড়া নুয়ে আছে শামুকের ধারালো মুখে তাই কেটে নিচ্ছি। হাসিমের বাপ নয়াপাড়ার নিমগাছ অতিক্রম করলে জোটন কট করে আরও একটা ধানের ছড়া কেটে কোঁচড়ে লুকাল। এবং এ-সময় মালতীর কথা মনে হল। নরেন দাসের ছোট বোন মালতী বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। বিধবা মালতীর টানে জোটন পুবের বাড়ির বোন্না গাছটার ফাঁক দিয়ে নরেন দাসের তাঁতঘর দেখল। তাঁতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে—মাকুর শব্দ এবং চরকার শব্দ। জোটন কট করে তার ধানের ছড়া কাটতেই পিছন থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল—এই জুটি, মাথার খুলি ভাইঙ্গা দিমু।

জোটন মুখ ঘুরিয়ে দেখল ঈশম আসছে। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, না ঈশম ভাই, আমি এহানে কিছু করতাছি না।

—তুমি আসমান দ্যাখতাছ। যা বাড়ি যা। কথা বাড়াইস না। সুতরাং বাড়ি উঠে যাওয়ার মতো করেই জোটন হাঁটতে থাকল, কিন্তু যেই ঈশম মসজিদের কুয়াতে জল তোলার জন্য বালতি নামাল—জোটন টুক করে আলের পরে বসে গাছের ছায়ায় নিজেকে ঢেকে ফেলল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে যেতে দেখল এক জায়গায় হাত লেগে মাটি সরে গেছে এবং সাদা গোল গোল ডিম বের হয়ে পড়ল। জোটন কী খুশি! সব আল্লার মর্জি। জোটন এবার উঠে দাঁড়াল। ইমান এবং মুশকিলাসানের লম্ফটা ওকে উষ্ণ করছে। দূরে দূরে সব ধান কাটা হচ্ছে। ধানের আঁটি বাঁধছে মুনিষেরা, ওরা গাজীর গীদ গাইছে।

দূরে দূরে গানের স্বর তরঙ্গ, নরেন দাসের বিধবা বোন মালতী এবং গতরাতের নিষ্ফল প্রতীক্ষা জোটনকে কাতর করছে। মালতীর বিয়ে হবে না, বাকি জীবন গতর কোনও মাশুল দেবে না—আল্লা নারাজ হবে। এই গতর মাটির মতো পতিত ফেলে রাখলে গুনাহ্। জোটন এই জন্যই মালতীর জীবনকে, ধর্মকে না-পাক কাফেরের মতো ভাববার ইচ্ছায় শরীরের জড়তা কাটাতে গিয়ে দেখল, বোন্না গাছের নিচে মালতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওর শরীরে সাদা থান ভোরের হাওয়ায় উড়ছে। জোটন মালতীকে দেখে তাড়াতাড়ি সব ক'টা ডিম ভিজা মাটির ভিতর থেকে তুলে আঁচলে বেঁধে ফেলল।

অন্যদিন হলে জোটন মালতীর সঙ্গে অন্তত কিছু কথা বলত। কিন্তু আজ মালতীর এই নিঃসঙ্গতা যথার্থই ওকে পীড়িত করছে। এক অহেতুক অপরাধ বোধে মালতীর সঙ্গে সে কোনও কথাই বলতে পারল না। জোটন এই পথ ধরেই গেল—অপরিচিতের মতো তামুকের খেতে উঠে গেল। দেখল, মালতী বোন্না গাছ পার হয়ে লটকন গাছের নিচ দিয়ে পুকুর পাড়ে দাঁড়াল এবং হাঁসগুলিকে জলে সাঁতার কাটতে দেখে কেমন আনমনা হয়ে গেল।

জোটন আর দাঁড়াল না। এখানে দাঁড়ালে কষ্টটা বাড়বে। তারপর শালুক খেয়ে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি নরেন দাসের বাড়ি পার হয়ে গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে থাকল। বকুল গাছটা অতিক্রম করে ঠাকুরবাড়ির সুপারি বাগান। সে সন্তর্পণে বাগানে ঢুকে গাছতলায় সুপারি খুঁজতে থাকল। সে খুঁজে খুঁজে কোথাও যখন একটাও সুপারি পেল না, সে গাছের মাথার দিকে তাকাল এবং প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, আল্লা একটা গুয়া দ্যা। সব গাছগুলির মাথায় সুপারি ঘন এবং হলুদ রঙের। হলুদ রঙের এই সুপারির খোসা ছাড়িয়ে একটা পান মুখে দেবার বড় শখ জোটনের। সে দেখল একটা কাঠঠোকরা পাখি এ-গাছ ও-গাছ করছে। আহা রে, আল্লা রে, একটা দ্যা না রে। তখনই বুড়ো ঠাকরুণের গলা শুনতে পেল সে। জোটন চুপচাপ বাগানের পাশে ঘন লটকন গাছের জঙ্গলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। জোটন অনেকক্ষণ এই ঝোপের ভিতর পাখিটার বদান্যতার জন্য বসে থাকল। পাখিটা উড়ছে, জোটন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে দেখতে উত্তেজিত হতে থাকল। পাখিটা সুপারির ওপর এবার ঘন হয়ে বসল, দুটো ঠোকর মারল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন চারটা সুপারি গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে পড়ল—য্যান মাণিক্য। যেন জোটনের সমস্ত দিনের ইচ্ছা এখন এই গাছটার ছায়ায় রূপ পাচ্ছে। জোটন চারপাশটা ভালো করে দেখল! পুকুরঘাটে বুড়ো ঠাকরুণ স্নান করছে। সে সব দেখছে, অথচ তাকে কেউ দেখতে পেল না। সে তাড়াতাড়ি গাছটার নিচে ছুটে গেল। সুপারি তিনটা আঁচলে বেঁধে সে হাঁটছে। সে বৈঠকখানা পার হয়ে ঠাকুরবাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। ডাকল—বড় মামি আছেন নাকি? বলতে বলতে সে পাছদুয়ারে ঢুকে আঁতুড়ঘরের সামনে দাঁড়াল। বলল, ধনমামি, একবার মানিক রে দ্যাখান। মানিকের লাইগ্যা কাছিমের ডিম আনছি। বড়মামিকে দেখে বলল, কাছিমের ডিম রাইখ্যা এক টুকরি চাইল দ্যান। চাল পেলে বলল, দুইডা পান নিমু বড়মামি।

—নে গা। গাছতলায় মেলা পান পইড়া আছে।

জোটন চালগুলি আঁচলে বাঁধল। এবং বড়ঘরের পিছনে ঢুকে আলকুশী লতার কাঁটা ঝোপ পার হয়ে একটা শ্যাওড়া গাছের নিচে দাঁড়াল। পানের লতা গাছটাকে জড়িয়ে আছে, সে দুহাতে যতটা পারল পান কুড়িয়ে নিল, ছিঁড়ে নিল। সে বাড়ির ওপর দিয়ে গেল না। সে আলকুশী লতার ঝোপ ভেঙে মাঠে নেমে গেল। জল-কাদা ভেঙে ফের পুবের বাড়ির পুকুরপাড় ধরে ধান খেতের আলে উঠে যাবার সময় দেখল, মালতী আকাশ দেখছে। জোটন এবার মালতীকে ফেলে চলে যেতে পারল না। সে একটু হেঁটে এসে মালতীর পাশে চুপ করে বসল। ডাকল—মালতী!

মালতী কথা বলল না। মালতী কাঁদল। জোটন মালতীর মুখ দেখতে পাচ্ছে না অথচ বুঝল মালতী চোখের জল ফেলছে। জোটন ফের ডাকল, মালতী কান্দিস না। কাইন্দা কি করবি। সব নসিব মালতী।

জোটন উঠে পড়ল। মেয়েটা শোকে কাঁদছে, কাঁদুক। ওর তিন নম্বর খসমের কথা স্মরণ করতে গিয়ে গলা বেয়ে একটা শোকের কান্না উঠে আসতে থাকল। বেলা বাড়ছে। পেটে প্রচণ্ড খিদে। যে চাল আছে জোটনের দু'ওক্ত হয়ে যাবে। সে হাঁটবার সময় গোপাট থেকে কিছু গিমা শাক সংগ্রহ করল। তারপর আবেদালির ঘর অতিক্রম করে উঠোনে উঠেই তাজ্জব বনে গেল—যে মানুষটা কাল রাতে আসেনি, যে মানুষটার জন্য সে প্রায় সমস্ত রাত জেগে বসে ছিল, সেই মানুষটা ছেঁড়া মাদুরে নামাজের ভঙ্গিতে বসে তফন সেলাই করছেন। নীল কাঁথার মতো ঝোলা, মুশকিলাসানের লম্ফ, ভিন্ন ভিন্ন সব তাবিজের মালা, কুচ ফলের মালা, এবং পুঁতির হার—এই সব বিচিত্র বস্তুর সমন্বয়ে এখন ফকির সাব যেন ঘোড়দৌড়ের পীরের মতো।

জোটন ফকির সাবকে দেখে বলল, সালেমালেকুম।

ফকির সাব এতক্ষণে জোটনকে দেখতে পেলেন এবং বললেন, ওয়ালেকুম সেলাম।

জালালি ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বসে আছে। জোটনেরও ইচ্ছা হল এ সময় বড় ঘোমটা টেনে ছোট ঘরটায় বসে থাকে। কিন্তু খিদমতের অসুবিধা হবে ভেবেই যেন শরমের জন্য দিল খুলে দিতে পারল না। সেই জালালির ঘরে ঢুকে বলল, মানুষটা খাইব, কি যে খাওয়ামু!

জোটনের ফিসফিস কথা ফকির সাব শুনতে পেলেন।—আমার জন্য ভাইবেন না। দুইডা শাক-ভাত কইরা দ্যান। দেখেন, নিশ্চিন্তে ক্যামনে খাইয়া উঠি।

জোটন বলল, জালালি, দুইটা পুটির সুঁটকি দ্যা।

জোটন রান্নার জন্য, শোলার-পারা থেকে এক আঁটি শোলা নামিয়ে আনল। ঘরের পিছনে শোলাগুলিকে মড়মড় করে ভাঙল এবং ভাঁজ করে ঘরে ঢুকতে দেখল—ফকির সাব

তখনও তফনে তালি মারছেন বসে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে জোটন ফকির সাবের প্রশস্ত বুক এবং কব্জি দেখে—গতরে খোদার মাশুল উসুল হতে বেশি সময় নেবে না—সুতরাং সুখী মনে জোটন রান্না করতে বসল। দু'সাল হল গতর বেশরমভাবে প্রায় রাতে বেইমানি করতে চাইছে। রাতে যতবার এমন হতো জোটন ছেঁড়া মাদুরে বসে আল্লাকে স্মরণ করে গতরের এই সব বেওয়ারিশ ইচ্ছাকে তাড়াতে চাইত। তিন তিনবার তালাক পেয়ে জোটন যেন বুঝতে শিখেছে ওর শরীরের খাক মেটাবার শক্তি পুরুষমানুষের ছিল না।—সুতরাং তালাক দিল—বলল, ইবলিশের গতর কেবল খাই-খাই। সে ফের উনুনে কিছু শোলা গুঁজে দিল এবং ফকির সাবের শরীর দেখল বেড়ার ফাঁক দিয়ে। সমস্ত চালটাই সে রান্না করছে। দু'জনের মতো ভাত। সে সুঁটকি মাছ দুটোকে আগুনে পুড়িয়ে নিচ্ছে, সে অনেকগুলো লাল চাঁটগাই লঙ্কা বেঁটে নিচ্ছে পাথরে, বড় বড় দুটো পেঁয়াজ কেটে সুঁটকি দুটোকে মড়মড় করে সানকির এক পাশে গুঁড়ো করে রাখল। তারপর লঙ্কা, পেঁয়াজ, নুন এবং সুঁটকির বর্তা বানাতে গিয়ে জিভে জল এল, এখন সে ইচ্ছা করলে দু'জনের ভাত যেন একা খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু বাড়িতে মেহমান—সে তার ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করল কিছুক্ষণের জন্য। ভাতের ফ্যানা টগবগ করে ফুটছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভাতের। সে ফ্যানটা গেলে একটা সানকিতে যত্ন করে রাখল, নুন মেশাল—সবটা ফ্যান পিছন ফিরে চুকচুক করে গিলতে থাকল—আহাঃ, এতক্ষণে যেন চোখ তার দৃশ্যমান বস্তুগুলিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ফকির সাহেবকে পীরের মতো মনে হল—দরগার পীর এই ফকির সাহেব। জোটন নিজের শরীরের দিকে নজর দিয়ে বুঝল, এ শরীরও ভয়ানক শক্তসমর্থ। ফকির সাবকে কাবু করতে খুব একটা আদা নুন লাগবে না। জোটন মনে মনে হাসল! বেড়ার ফাঁক দিয়ে ডাকল, ফকির সাব, সান করতে যান। আমার খানা, পাকান হইয়া গ্যাছে।

ফকির সাব সব তল্পিতল্পা সঙ্গে নিয়েই ঘাটে গেলেন, এমন কি মুশকিলাসানের আধারটাও। জোটন এই ঘরে বসে কাকের শব্দ পেল, আকাশে রোদ, গাছে এবং শাখা প্রশাখায় রোদ। জাফরি রঙের ছায়া ঘরের পিছনে। বেত ঝোপে বোলতার চাক—নিচে বোন্না গাছের ঘন জঙ্গল, ফকির সাব হাসিমদের পুকুরে স্নান করতে গেছেন। জোটন বিবি গাজীর গীদ ধরল গুনগুন করে। জোটন বিবির স্বপ্ন জাগছে চোখে, বেত ঝোপে বেথুনের মতো এই স্বপ্ন কবে টসটস করে পাকবে...জোটন স্বপ্নের কথা ঠিকঠাক ভাবতে পারছে না...স্বপ্নটা গাজীর গীদে গায়ানদারের হাতের ছড়ি য্যান; চাঁদের মতো মুখ করে চ্যাপ্টা নাকে চোখে জোটনের সকল সুখকে দ্যাখতাছে।

জোটন তাড়াতাড়ি পাশের একটা গর্ত থেকে ডুব দিয়ে এল। চুলের জল ঝেড়ে ভাঙা আয়নায় ডুরে শাড়ি পরে নিজের সুন্দর মুখটি দেখল। উজ্জ্বল দাঁতের পাটি দেখে রাতে পীরের দরগায় সুখের হীরামন পাখির কথা মনে করে কেমন বিহ্বল হতে থাকল।

ফকির সাহেব ছেঁড়া মাদুরে বেশ পরিপাটি করে খেতে বসলেন। ভিজা লুঙ্গি সিম লতার মাচানে শুকোচ্ছে। তিনি খেতে বসে দু'বার আল্লা উচ্চারণ করে আকাশ দেখলেন—আকাশ পরিষ্কার, বড় তকতকে এই উঠোনে ঝকঝকে আকাশের নিচে বসে গবগব করে

খেতে পারলেন না। যেমন পরিপাটি করে বসেছেন তেমন ধীরে সুস্থে এক সানকি মোটা ভাত সুঁটকির বর্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ মেখে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকলেন। নিচে দুটো-একটা ভাত পড়ছে—তিনি আঙুলের ডগায় তুলে সন্তর্পণে মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যেন এই মোটা ভাত ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না—আল্লার বড় অমূল্য ধন। সানকির ভাতটা শেষ করতেই দেখলেন, জোটন আর এক সানকি ভাত এনে সামনে রেখেছে। তিনি সে ভাতটাও পরিপাটি করে শেষ করলেন। এবং ভাতের অপেক্ষায় ফের বসে থাকলেন। সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে তিনি মাদুরের এবং সানকির সংলগ্ন ভাতটিও আঙুলের চাপে মুখে তুলে দিয়ে বসে থাকলেন। নামাজের ভঙ্গিতে এই বসে থাকা ভাবটুকু সাবের বড় আরামদায়ক। এই সব জোটন ঘরের ভিতর থেকে লক্ষ করে শরমে মরে যাচ্ছে। সে হাঁড়ির ভিতর হাত দিল। শেষ দু'মুঠো ভাত সানকিতে তুলে শেষ বর্তাটুকু তার কিনারে রেখে মাদুরের উপর রেখে দিল। ফকির সাব বললেন, বস্ হইব। ইবারে আপনে গিয়া খান।

জোটন ঘরের এক কোনায় বসে থাকল। ওর মাথাটা ঘুরছে। সে খুঁটিতে হেলান দিল। কোমর থেকে ডুরে শাড়িটা খসে পড়ছে। আবেদালি নেই, জব্বর নেই, থাকলে বলত, আমার ঘরটা বন্ধক রাইখ্যা এক প্যাট ভাত দ্যা। সে ক্ষুধায় যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে গিমা শাকগুলো সিদ্ধ করল এবং খেল। সে কিছু কাঁচাপাকা বেথুন এনে খেল। এ সময়ে উঠোনে গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। কাক, শালিকরা প্রায় সকলে ডালে, ঝোপে জঙ্গলে যেন ঝিমোচ্ছে। ফকির সাব ছেঁড়া মাদুরে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। জোটন আর বসে থাকতে পারল না। শরীরের জড়তায় সে ডুরে শাড়ির আঁচল পেতে মেঝের ওপর পেট রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেল বেলাতে যখন উঠোনের ওপর দিয়ে পাখিরা ডেকে গেল, যখন সাত ভাই চম্পা পাখিরা লাউ মাচানের নিচে কিচমিচ করল অথবা ধানের আঁটি নিয়ে কামলারা সড়কের ওপর কদম দিচ্ছে তখন জোটন ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটাকে টেনে টেনে তুলল। ফকির সাব হুঁকা খাচ্ছেন বসে। সব পোঁটলা-পুঁটলি যত্ন করে বাঁধা, যেন তিনি এখন উঠবেন, শুধু হুঁকা খাওয়াটা বাকি। জোটন আর অপেক্ষা করতে পারল না। ঘর থেকেই বলল, ফকির সাব, আমারে লইয়া যাইবেন না?

ফকির সাব ঝোলাঝুলি কাঁধে নিতে নিতে বললেন, আইজ না। অন্যদিন হইব। কোরবান শেখের সিন্নিতে যামু। কবে ফিরি ঠিক নাই। উঠোন থেকে নেমে যাওয়ার সময় দরজার ফাঁকে জোটনের শীর্ণ মুখে আশ্চর্য বিষাদ ধরতে পেরে উচ্চারণ করলেন, আল্লা রসুল, আহা এই ইচ্ছার সংসারে আমরা কতদূর যাব, আর কতদূর যেতে পারি। ফকির সাহেব ওইমত চিন্তা করলেন। তিনি হাঁটতে হাঁটতে ধরতে পারলেন, জোটনের চোখ দুটো এখনও ওকে অনুসরণ করছে অথবা যেন জোটন দেখল হাঁসের পালক মালতীর শরীরে—ইচ্ছার জল গড়িয়ে পড়ছে অথবা পীরের শরীর গাজীর গীদের গায়ানদারের লাঠি য্যান..হাঁটতাছে...হাঁটতাছে... চাঁদের মতো মুখ করে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা নাকে চোখে জোটনের

সকল দুঃখকে দ্যাখতাছে। জোটন এবার ডুকরে কেঁদে উঠল—আল্লারে, তর দুনিয়ায় আমার লাইগ্যা কেউ বুঝি নাই রে।

একটা হাড়গিলে পাখি অনবরত সেই থেকে ডাকছে। বাড়িটার উত্তরে মোত্রা ঘাসের জঙ্গলে। এখন সেখানে নানারকমের কীটপতঙ্গ উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় বড় কুমীরের মতো দুটো গোসাপ ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল। পাখিটা তবু ডাকছে, অনবরত ডাকছে। মালতী আতাফল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সব শুনল। সে জঙ্গলের কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। একাদশীর পরদিন, বেশ ঝালটাল খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। বেতের ডগা সেদ্ধ খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। নরম নরম ডগা একটু সর্ষের তেল এবং কাঁচা লঙ্কা হলে তো কথাই নেই। মালতী নরম বেতের ডগা কাটার জন্য আতাফল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। বেতঝোপে বোলতার চাক, ঝোপের ভিতর পাখিটা ডাকছে অথবা সাপে যদি ছানা খায়, পাখি গিলে খায়—এমন ভয়ে মালতী গাছটার নিচে থেকে নড়তে পারল না। মালতীর হাতে একটা লম্বা বাঁশ। বাঁশের ডগায় সে একটা পাতলা দা বেঁধে রেখেছে। সে কেবল ইতস্তত করছিল। গাছে আতাফুলের গন্ধ।

ছোট একটা বেগুন খেত অতিক্রম করে আভারানীর রান্নাঘর। নরেন দাসের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁতের ঘরে অমূল্য তাঁত বুনছে। মাঝে মাঝে ওর মেঘভাসি গান ভেসে আসছিল। নরেন দাসের বৌ আভারানী বারান্দায় বসে ডাঁটা কুটছে। মালতী এখনও বেতের ডগা নিয়ে ফিরছে না—সে ডাকল, মালতী, অ মালতী, ব্যালা বাড়ে না কমে!

মালতী আতাফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কেমন বিভোর। ঝোপের ভিতর পাখিটার কেমন থেকে থেকে কান্না। দূরে জব্বর হাল চাষ করছে জমিতে। এটা কি মাস, ফাল্গুন হতে পারে, মাঘের শেষ হতে পারে। মালতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসেব করল। এখন জব্বর অকারণে উঠে আসতে পারে, এসে বলতে পারে, মালতী দিদি এক বদনা পানি দ্যান। মালতী এমন সব দৃশ্য দেখতে দেখতে অথবা শুনতে শুনতে হাঁকল, বৌদি, আমার জঙ্গলে ঢুকতে ডর করে। হাড়গিলা পাখিটা সেই থাইকা ডাকতাছে।

—হাড়গিলা পাখি ডাকতাছে ত তর কি?

—মনে হয় পাখিটারে সাপে গিলতাছে।

—তরে কইছে?

মালতী আর কথা বাড়াল না। দেখল মালতী, গোপাট পার হয়ে সামু এদিকে হেঁটে আসছে। এসে একটা কাগজের মতো কিছু ফেলুকে দিয়ে গাছের গুঁড়িতে সেঁটে দিচ্ছে। মালতী ডাকল সা...মু...উ..., অ...সা. . মু ..উ।

সামু বুঝল মালতী স্বামীর শোক ভুলে যাচ্ছে। বুঝল শৈশবে মালতী যেমন ওকে দিয়ে ঝোপজঙ্গল থেকে চুকৈর ফল আনিয়েছে, বেত ফল আনিয়েছে অথবা শাপলা-শালুকের দিনে যেমন সামু কত ফুল ফল তুলে দিত, তেমনি আজ হয়তো কিছু তুলে আনতে বলবে—সে গাছের নিচ থেকেই হাত তুলে জবাব দিল। বলল, আইতাছি। ইস্তাহারটা ঝুলাইতে দে।

মালতী সেই আগের মতো গলা ছেড়ে কথা বলল, কিসের ইস্তাহার রে সামু?

—লীগের ইস্তাহার।

—আরে আমার লীগ। আগে শোনত, পরে লীগ করবি।

সামু কাছে এলে বলল, দুইটা বেতের ডগা কাইটা দে। বলে, দা এবং বাঁশটা সে সামুকে এগিয়ে দিল।

সামসুদ্দিন দাটা বাঁশের আগায় শক্ত করে বাঁধল। তারপর ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হাড়গিলা পাখিটা আর ডাকতে পারছে না। কেমন নিভে আসছে। থেকে থেকে অনেকক্ষণ পর পর ডাকছে। ঝোপজঙ্গল ভেঙে ভিতরে ঢুকলে কিছু পোকা উড়ল এবং মুখে শরীরে বসল। সে পোকামাকড় শরীর থেকে উড়িয়ে দিয়ে দুটো কচি বেতের ডগা কেটে আনল। —দ্যাখ আর লাগব নাকি?

—না। মালতী দা-টা এবং বাঁশটা সামুকে মাটিতে রাখতে বলল।

সামু বাঁশটা মাটিতে রেখে দিল। মালতী আলগা করে তুলে নিয়ে হাঁটছে। সামু পেছনে পেছনে আসছে, মালতী মুখ না ঘুরিয়েও তা টের পেল। দা-টা সামু বাড়ি রেখে যাক—মালতীর এমন ইচ্ছা। যেতে যেতে মালতীর মনে হল শরীরে ব্লাউজ নেই—খালি গা, পিঠ বুক খালি, বার বার সে কাপড় সামলেও যেন শরীর ঢেকে রাখতে পারছে না। মানুষটা পেছনে আসতে আসতে ওর শরীর থেকে আতাফুলের সুবাস নিচ্ছে, সুবাস নিতে নিতে মানুষটা কতদূর পর্যন্ত যাবে টের পাচ্ছে না। মালতী তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচলটা চাদরের মতো করে শরীর ঢেকে দিল। পেছনে সামু আসছে ভাবতেই, শরীরে কী যে এক কোড়া পাখি আছে—সময়ে অসময়ে কেবল ডাকে, কোড়া পাখিটা ডেকে উঠতেই মালতীর গা কাঁটা দিল। সুতরাং সে পিছনের দিকে না তাকিয়েই বলল, সামুরে, সামু, তর আর আসতে হইব না। তুই বাড়ি যা।

সামু নিঃশব্দে দা-টা নরেন দাসের বারান্দায় রেখে মাঠে নেমে গেল। মালতী বেতের খোল তুলতে তুলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কচি কচি নরম শাঁস। সেদ্ধ দিলে একেবারে মাখনের মতো নরম। আতপ চালের সুগন্ধ, সামান্য ঘি আর বেতের ডগা সেদ্ধ বৈধব্যের এক মনোরম ভোজ্যদ্রব্য। একাদশীর পরদিন এমন নরম ডগা পেয়ে মালতীর জিভে জল এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের কিছু ছবি ওর চোখের উপর ভেসে উঠল। সামসুদ্দিন, রসো, রঞ্জিত কতদিন মালতীকে মাঠ থেকে মেজেন্টা রঙের চুকৈর ফল এনে দিয়েছে। তারপর কোন কোন ঋতুতে বেতফল, লটকন ফল, এমনকি বকুল ফল সংগ্রহের জন্যে ওরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করত। এমন সব সুখ-স্মৃতিতে দিনটা কাটলেও রাত কাটতে চায় না মালতীর। জানালা খোলা রেখে কেবল সাদা জ্যোৎস্নায় মাঠ দেখতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে সেই জ্যোৎস্নায় এক দানবের মতো মহাকাল—কি যে এক মহাকাল, কি যে তার মুখব্যাদান, রাঙা জবার লাখান চক্ষে ঠোঁট ব্যাদান কইরা রাখে—রাক্ষুসি এক তারে তাড়া কইরা মারে। সারারাত তখন ঘুম আসে না মালতীর। শেষ রাতের দিকে ঘুম আসে। যখন ঘুম ভাঙে তখন ভোরের সূর্য অনেক উপরে। আভারানী ডেকে ডেকে হয়রান। নরেন দাস তাঁতঘর থেকে হাঁকবে—অরে ঘুমাইতে দ্যাও। এতবড় শোকটা অরে ভুলতে দ্যাও। ঘুমের ভিতর এক সুখপাখি মালতীর কেবল কাইন্দা কাইন্দা মরে—জলে নাও ভাসাওরে, আমারে লইয়া যাও বিলের জলে, ডুইবা মরি আনধাইরে।

মালতী আতা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখল, সামু নিঃশব্দে কখন চলে গেছে। তাঁত ঘরে চরকার শব্দ, মাকুর শব্দ। উঠোনে ধানের মলন দিচ্ছে মনজুর। চারটা বড় বড় মেলার গরু মলনে তুলে দিচ্ছে।

দীর্ঘ দু'মাস পর মালতীর চোখ এই আকাশ এবং ধরণীকে প্রীতিময় ভেবে খুশি। ভোরে সেজন্য সামুকে চিৎকার করে ডাকতে পারল। কতকাল পর যেন সে এই মাটির মতো ফের সুজলা সুফলা অথবা যেন দুঃখের ভারে নিয়ত ভুগতে নেই—সে খুব খুশি খুশি মুখে অনেকদিন পর আঁচলে মুখ মুছল। অনেকদিন পর সে ছুটে গেল পুকুরের পাড়ে, পেয়ারা গাছের নিচে। গাব গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখল গাছে কোনও পাকা গাব আছে কিনা—থাকলে সে কোটা দিয়ে গাব পাড়বে, তারপর গাবের বিচি চুষতে চুষতে স্বামীর ঠোঁট অথবা জিভে কি ভয়ঙ্কর স্বাদ—সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটা পাকা গাব খুঁজে পেলে ফুৎফাৎ বিচি বাতাসে ওড়াবে। গাবের পাকা পিছল বিচি আর স্বামীর ঠাণ্ডা জিভ চুষতে যেন এক রকমের। একটা পাকা গাব খাবার জন্য ওর সুন্দর কচি মুখটা কেমন লাল হয়ে উঠল। বিধবা মালতী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এখন গাছ দেখছে কি পাখি দেখছে বোঝা যাচ্ছে না।

না, গাছে একটাও পাকা গাব নেই। শীতকাল শেষ হলে পাকা গাব আর গাছে থাকে না। সে বাড়ি উঠে এলে দেখল আভারানী, মালতী কি খাবে, কি খেতে ভালবাসে—বিধবা মানুষের কি আর রান্না, তবু যত্ন নিয়ে সাদা পাথরে মালতীর জন্য তরকারী কেটে রাখছে।

মালতী চুপচাপ বৌদির পাশে ঘন হয়ে বসল, বলল—সামু আগের মতই আছে বৌদি। ডাকলাম আর দৌড়াইয়া আইসা পড়ল। বেতের ডগা কাইটা দিল।

আভারানী বলল, সামু কি একটা পাস দিল না ল?

—সামু অর মামার বাসায় থাইকা পাস দিল। তোমাগ জামাইর কাছে কত দিন ঘুরছে একটা চাকরির লাইগা। চাকরি একটা দেখছিল, কিন্তু বৌদি কি যে হইল...মালতী এই পর্যন্ত বলে আর প্রকাশ করতে পারল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল—বৌদি আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না।

আভারানী বলল, কান্দিস না।

বৌদিকে মালতী কাজে সাহায্য করছে। ধীরে ধীরে সে কিছু বেতের ডগা কুচি করে দিল। এইসব করতে করতে মনের ভিতর সেইসব বিসদৃশ ঘটনা উঁকি মারলে চুপচাপ হয়ে যায় মালতী। বড় বড় চোখে সংসারের সব কিছু দেখে। এবং বড় অর্থহীন মনে হয়। চুপচাপ বসে থাকলেই স্বামীর নানারকমের ছোটখাটো মান-অভিমানের কথা মনে হয়। জলে চোখের কোণটা ভিজে যায়। মালতীর এখন আর কিছুই ভালো লাগল না। সুতরাং বারান্দা থেকে উঠে ফের বেগুন খেত অতিক্রম করে যেখানে হাড়গিলে পাখিটা ডাকছিল সেদিকে হেঁটে গেল। নির্জন এই জায়গাটুকু ওর ভালো লাগছে। সে অন্যমনস্কভাবেই লেবু গাছ থেকে দুটো পাতা ছিঁড়ল। পাতাদুটো মুচড়ে গন্ধ নিল। এবং অকারণ জঙ্গলে বসে প্রিয়তমের চোখ মুখ ভাবতে ভাবতে, আহাঃ, কত বিচিত্র সব মধুর স্মৃতি—শেষে আরও কী সব ভেবে ভেবে উদাস।

এখান থেকে হিজল গাছটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পথ ধরে যারা গেল তারা সকলেই ইস্তাহারটা ঝুলতে দেখল। যারা পড়তে পারছে, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইস্তাহারটা পড়ছে। সামু বেকার, সুতরাং লীগের পাণ্ডা। সামু গাছে গাছে মুসলমান গাঁয়ে গাঁয়ে এই ইস্তাহার ঝুলিয়ে শান্তি পাচ্ছে। মালতীর বড় ভয়ঙ্কর ইচ্ছা ইস্তাহারটা পড়ে দেখে—সামু ইস্তাহারে কী লিখেছে অথবা ধীরে ধীরে গিয়ে সকলের অলক্ষে সন্তর্পণে ছিঁড়ে দেয়। ছিঁড়ে দিলে কেউ টের পাবে না। সামু টের পেলে শুধু বলবে, এডা করলি ক্যান?

—ক্যান করুম না। দেশটা কেবল তর জাতভাইদের?

—ক্যান আমার জাতভাইদের হইব। দেশডা তর আমার সকলের।

—তবে কেবল ইসলাম ইসলাম করস ক্যান?

—করি আমার জাতভাইরা বড় বেশি গরু-ঘোড়া হইয়া আছে। একবার চোখ তুইল্যা দ্যাখ, চাকরি তগ, জমি তগ, জমিদারী তগ। শিক্ষা দীক্ষা সব হিন্দুদের।

—হইছে। মনে মনে মালতী ফয়সালা করে ইস্তাহারটার দিকে হাঁটতে থাকল। ইস্তাহারটা ঝুলছে। সামনের দুটো ধানজমি পার হলেই গাছটা। গাছটা নরেন দাসের। যেন এই গাছে ইস্তাহার ঝোলানোর উদ্দেশ্য, মালতীও একবার পড়ে দেখুক—ইসলাম বিপন্ন। এই বিপন্ন সময় থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হবে।

এখন মাঠ ফাঁকা। ধান গাছ, কলাই গাছ, এমন কি মটরের জমি ফাঁকা। কিছু তামাকের খেত, পেঁয়াজের খেত। সে হেঁটে যাবার জন্য আলে আলে গেল না। সবাই জমি চাষ করে রেখেছে। শুকনো জমি। বড় বড় ডেলা মাটির। জমি ভেঙে সে সোজা হেঁটে গেল। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, দ্রুত গাছটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাটিতে পায়ের ছাপ, এবং আকাশ কতদিন পর নীল স্বচ্ছ। মালতী গাছটার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় চুল উড়ছে। পাশের জমিতে একদা রসো এবং বুড়ি ডুবে মরেছিল এমন এক স্মৃতির উদয় হতে সে স্বল্প সময়ের জন্য এখানে দাঁড়াল। যেন কোনও এক অশ্রুজল নিরপেক্ষ ভালোবাসার বৃত্ত এই জমিতে দীর্ঘদিন পত্তন করে রেখেছে মানুষেরা।

সে হাঁটতে থাকল। ইস্তাহারটা এখনও বাতাসে নড়ছে। গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে মালতী ইস্তাহারটা পড়তে পড়তে উত্তেজিত। হক সাহেব নতুন নতুন কথা বলছেন। নাজিমুদ্দিন সাহেবের একটা ছবি ইস্তাহারের এক কোণে। মালতী এ-সময়ে দেখল দূরের সব জমিতে হাল চাষ হচ্ছে। ওরা হাল চাষ করছে এবং গান গাইছে সামসুদ্দিনের এই বিদ্বেষ মালতীর ভালো লাগল না। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে ইস্তাহারটা গাছ থেকে টেনে তুলে ফেলল। তারপর হনহন করে বাড়িতে উঠে এসে যেখানে হাড়গিলে পাখিটা সেই সকাল থেকে ডাকছে—সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। স্বামীর মুখ মনে হতেই সে চিৎকার করে বলতে চাইল—আমি ঠিক করছি। সামুরে, তর সর্দারি আমার ভাল লাগে না। তুই তো ভাল মানুষ আছিলি রে!

হাড়গিলে পাখিটা আবার ডাকতে শুরু করেছে। কুহক্ কুহক্ ডাকছে। ঝোপের কোথায় যে শব্দটা উঠছে—কিসের জন্য যে পাখিটা অনবরত ডাকছে মালতী বুঝতে পারল না। শব্দটা মনে হয় বড় দূর থেকে ভেসে আসছে। মোত্রাঘাসের জঙ্গলে জল নেই। জল নেমে গেছে, গাছের গুঁড়িতে হলদে মতো দাগ। সে, ডাকটা কোথায় উঠছে, কেন পাখিটা নিরন্তর ডেকে চলেছে দেখার জন্য বেগুন খেতে বসে ঝোপের ভিতর উঁকি দিল। পাখিটা ডাকছে, অনবরত ডাকছে—নিশ্চয়ই ওর কোনও অসহ্য কষ্ট। সে নানাভাবে উঁকি দিতে থাকল—কখনও বেত পাতা সরিয়ে কখনও জঙ্গল ফাঁক করে, কখনও মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ঝোপে জঙ্গলে পাখিটা কোথায় আছে দেখার জন্য উদগ্রীব হল। সে মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গোড়ালি তুলে উঁকি দিল—ওখানে নেই পাখিটা, শব্দটা যেন ঝোপের গহন অবস্থান থেকে আসছে। সে বাড়ি থেকে কোটা এনে ভিতরটা খোঁচা দিয়ে দেখবে এই ভেবে চোখ ফেরাতেই দেখল ভীষণ কালো রঙের একটা পানস সাপ ঠেলে ঠেলে ঘন ঝোপে ঢুকে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু নড়তে পারছে না। কেমন লাল ঠিক বেদানার কোয়ার মতো চোখ নিয়ে মালতীকে দেখছে। পাখিটার প্রায় অর্ধেকটা শরীর সাপটার মুখে

এবং গলায়। এতবড় পাখিটাকে কি করে গিলছে দ্যাখ! মালতী ভয়ে চিৎকার করে উঠল, বৌদি, দ্যাখেন আইসা কাণ্ড! হাড়গিলা পাখিরে পানস সাপটা কি কইরা গিলতাছে।

—আ ল মরা, তরে খাইব! বলে আভারানী ছুটে এসে হাত ধরে টেনে আনল মালতীকে। আর মালতী জমিতে উঠেই দেখল সামু এদিকেই হনহন করে আসছে। মুখে ওর কার্তিক ঠাকুরের মতো সরু গোঁফ এবং সমস্ত অবয়বে অভিমানের চিহ্ন। সামসুদ্দিন মালতীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। নরেন দাসের বৌ অদূরে ভীত-সন্ত্রস্ত। অথচ দেখল সামু অত্যন্ত বিনীত। ক্ষত-বিক্ষত, এমন স্বর গলায়—বলছে, তুই ইস্তাহারটা ছিঁড়লি ক্যান মালতী?

—ছিঁড়লাম, হইছেডা কি?

—তুই জানস না, ঢাকা থাইকা কত কষ্ট কইরা এগুলি আনাইতে হয়। কোন দিন আর ছিঁড়বিনা!

—ছিঁড়ুম, একশবার ছিঁড়ুম, এমন কথা বলার ইচ্ছা হল মালতীর। কিন্তু সামুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারল না। সে এবার কি ভেবে বলল, দ্যাখছস কতবড় হাড়গিলা পাখিটারে সাপটা ধইরা খাইতাছে।

সামসুদ্দিন তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এবং দেখল সাপটা এবার পাখিটাকে প্রায় গিলে এনেছে এবং গিলে ফেলতে পারলেই টেনে টেনে শরীরটা এদিকে নিয়ে আসবে। আর যদি কোনও কারণে সাপের মুখ থেকে পাখি ফসকে যায়—তবে আর নিস্তার নেই। সামু এবার ধমক দিল, এই ছেরি, ভয়-ডর নাই? যা বাড়ি যা!

—আরে আমার শাসকরে। মালতী কিঞ্চিৎ দজ্জাল মেয়েমানুষের মতো গলার স্বর করতে চাইল। কিন্তু না পেরে হোহো করে হেসে দিল।

—হিটকানি থাকব না মালতী। মুখ থাইক্যা আহার ছুইটা গেলে সাপের মাথা ঠিক থাকে না!

—মানুষের মাথা ঠিক থাকে?

সামসুদ্দিন কেমন চোখ ছোট করে তাকাল। মালতীকে দেখল। মালতীর শরীরে পুবের দেশ থেকে বন্যা আসার মতো অথবা উজানি নদীর মতো রূপলাবণ্যে ঢল নেমেছে। বিধবা হলে কি যুবতী মাইয়ার শরীর রূপের সাগরে ভাইস্যা যায়! মালতীকে সামু শেষ পর্যন্ত বলল, যা বাড়ি যা। জঙ্গলে আর খাড়াইয়া থাকতে হইব না।

মালতী নড়ল না। মালতী ফের ঝোপটার ভিতর উঁকি দিল। একটা শুকনো ডালে সাপটা শরীর পেঁচিয়ে রেখেছে। লাল চোখ দুটো বেদানার কোয়ার মতো উজ্জ্বল। ওরা একটু দূরে এসে দাঁড়াল। ওরা এখন কথা বলছে না—পাখিটাকে সাপের গলায় অন্তর্হিত

হতে দেখছে। গলাটা ফুলে ফুলে সহসা সরু হয়ে গেল। তারপর সাপটা মৃতের মতো ডালে ঝুলতে থাকল একসময়।

পরদিন ভোরে মালতী সকালে উঠে হাঁসগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে পুকুরে ফেলল। একটা গাছের গুঁড়িতে বসে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। শরীরে সাদা থান, শরীরের লাবণ্য এই কাপড়ের বিসদৃশ রঙে চাপা পড়ছে না। মালতীর সোনার শরীর—প্রজাপতির মতো মন অথচ রাতে গভীর ঘুমের জন্য এ-সময় গাছের গুঁড়িটার মতো মনটা বড় নির্বোধ। পায়ের পাতা ডুবিয়ে গাছের গুঁড়িতে বসে আছে। হাঁসগুলি জলে নেমেই এখন সাঁতার কাটবে, এবং এক রকমের খেলা—ওরা জলে ভেসে অথবা ডুবে ডুবে অনেক নিচে চলে যাচ্ছে এবং ভেসে উঠেই পুরুষ হাঁসটা অন্য হাঁসগুলোকে তাড়া করছে অথবা পুরুষ হাঁসটা ছুটে ছুটে—যেমন তার মানুষ তাকে ছুটে ছুটে ঘরের ভিতর অথবা বাগানের ভিতর এবং রাত গভীর হলে লুকোচুরি খেলা—ছুঁই-ছুঁই খেলা—খেলতে খেলতে যখন আর ছুটতে পারত না তখন মানুষটা তাকে সাপ্টে ধরত এবং পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেন কোন এক পাহাড়ে অথবা নদীর পাড়ে চলে যেতে চাইত—কী যে সুখ সুখ খেলা—হাঁসগুলি এখন তেমনি সুখ সুখ খেলা খেলছে। মালতীর পা ক্রমে স্থির হয়ে আসছে—শরীর শক্ত হয়ে আসছে। সুন্দর পা ওর জলের নিচে মাছরাঙার মতো ক্রমে ডুবে যাচ্ছিল। কেবল থেকে থেকে রঞ্জিতের কথা মনে পড়ছে। সে তখন বালক ছিল। ঠাকুরবাড়ির বড়বৌর ছোট ভাই। সে এখন কোথায় আছে কে জানে। শুনেছে সে এখন নিরুদ্দেশ। কেউ তার খোঁজ রাখে না।

পুকুরের ও-পাশের ঝোপটায় একটা বড় মাছ নড়ে উঠল। কৈশোরে মালতী মাছ ধরত—যখন বর্ষাকাল, যখন গয়না নৌকায় বাদাম উড়ত, ঝোপেজঙ্গলে টুনি ফুল ফুটে থাকত, তখন এই ঘাটে কত যে চেলা মাছ, ডারকীনা মাছ এবং শাড়ি-পরা পুঁটি মাছ—মালতী সরু ছিপ দিয়ে বর্ষাকালে শাড়ি-পরা পুঁটি মাছ ধরত। একদিন নির্জন বিকেলে রঞ্জিত পাশে দাঁড়িয়ে মাছ ধরতে ধরতে ফিসফিস করে বলেছিল—যাবি? যাবি মালতী?

মালতী জানত রঞ্জিত এই কথায় কী বলতে চায়। সে অবুঝের মতো চোখে মুখে এক বোকা ভাব ছড়িয়ে রাখত। রঞ্জিত আর বলতে সাহস পেত না।

মালতী গাছের গুঁড়িতে বসে থাকল। উঠতে ইচ্ছা করছে না। পুকুরের জল নিচে নেমে গেছে। সুতরাং গাছের গুঁড়িটাকেও গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নামানো হয়েছে। গাছের গুড়িটা ছিল সিঁড়ির মতো—সেই কবে গুঁড়িটা এখানে ছিল। রসো, রঞ্জিত, সামু বর্ষায় গুঁড়ি থেকে জলে লাফ দিয়ে পড়ত, ডুবত, ভাসত অথবা সাঁতার কেটে বর্ষার জলে ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে মালতীকে ভয় দেখাত। রাতের কিছু কিছু স্বপ্ন, পুকুরের জল, হাঁসগুলির সুখী জীবন, সামনের মাঠ এবং যব-গমের খেত, কিছু কৃষকের এক সুরে ফসল কাটার গান সব মিলে মালতীকে কেমন আচ্ছন্ন করে রাখছে। রাতের কিছু স্বপ্ন অস্পষ্ট স্মৃতির মতো—প্রিয়তমের মুখ গন্ধপাদালের ঝোপ থেকে যেন উঁকি মারছে। প্রকৃতির নীরবতা

এবং ভোরের এই মাধুর্য মালতীকে ক্লিষ্ট করছে—হিজল গাছে সামু ইস্তাহার ঝোলাল। দেশটা দিন দিন কি যে হয়ে যাচ্ছে! মালতী এবার পুকুর থেকে হাতমুখ ধুয়ে উঠে এল। প্রিয়তমের মুখ স্মৃতির অতল থেকে তুলে এনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে গিয়ে দেখল চোখে জল মালতীর।

নরেন দাস ফিরছে পশ্চিমপাড়া থেকে। ওর হাতে গলদা চিংড়ি। সে দেখল, মালতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন নিবিষ্ট মনে হাঁস গুলির সাঁতার কাটা দেখছে। কেমন অন্যমনস্ক মালতী। নরেন দাস ইচ্ছে করেই গলায় এক রকমের উপস্থিতির শব্দ করল এবং যখন দেখল সংকোচে মালতী এতটুকু হয়ে গেছে—কি যেন তার ধরা পড়ে গেছে ভাব—এই যে খেলা, হাঁসের খেলা—খেলা তার ইহজীবনে আর বুঝি হবে না—সব শেষ। কেমন সে বিহ্বলভাবে তাকাল। নরেন দাসও কেমন সরল বালকের মতো, যেন কিছু বুঝতে পারেনি এমন এক চোখ নিয়ে তাকাল। বলল, দ্যাখ দ্যাখ, কতবড় ইছা মাছ ধইরা আনলাম। মাছগুলি ভাতে সিদ্ধ দেইস। কিন্তু তখনই মনে হল, দাসের বোন মালতী বিধবা। সে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস চেপে বাড়িতে উঠে গেল।

মালতী দাদার সঙ্গে পুকুর পাড় থেকে উঠে যাবার সময় বলল, দাদারে, সামু হিজল গাছটাতে ইস্তাহার ঝোলায়, অরে বারণ কইরা দেইস।

—বারণ কইরা দিলে অন্যখানে ঝোলাইব।

মালতী বুঝল প্রতিবাদে নরেন দাস যথার্থই অক্ষম। সুতরাং মাসখানেক পর সামসুদ্দিন যখন ফের ইস্তাহার ঝোলাতে এল, মালতী মাঠ পার হয়ে নেমে গেল। বলল, ইস্তাহার ঝুলাইবি না।

—ক্যান?

—গাছটা আমার দাদার।

—তা হয়েছে কি!

—তর গাছ থাকলে সেখানে ঝুলাইয়া দে।

—আমার গাছ এডা। তুই যা করতে পারিস করবি।

—বড় বড় কথা কইবি না সামু। অদিনের পোলা, অখনই মাতব্বর হইয়া গেছস! নাকে তর দুধের গন্ধ আছে।

—তর নাকে কিসের গন্ধ ল ছেরি। বলে ইস্তাহারটাকে গাছে উঠে অনেক উপরে ঝুলিয়ে দিল। —নে পাড়। কত তর ক্ষ্যামতা দেখি।

—আইচ্ছা! মালতী হনহন করে বাড়ি উঠে গেল। গাব গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল।

সামু মালতীর এই রাগ দেখে মনে মনে হাসল। মালতী আগের মতই জেদী একগুঁয়ে মালতী। কিন্তু মনের ভিতর কী এক শপথ সব সময় কাজ করছে। গাঁয়ে উঠে যাবার সময় ওর চোখমুখ দৃঢ় দেখাল। অথচ গাঁয়ের সবুজ বন ঝোপ দেখে মনটা আর্দ্র হয়ে উঠেছে। মালতীর শস্যদানার মতো রঙ শরীরের—তাছাড়া শৈশবের কিছু কিছু প্রীতিপূর্ণ ঘটনা, স্বামীর সাম্প্রদায়িক মৃত্যু এবং বৈধব্য বেশ, সব মিলে মনে এক অপার বেদনা সঞ্চার করছে সামুর। এই উগ্র জাতীয়তাবোধ ওর ভাল লাগল না। সে ছুটতে থাকল। সে আর হিজল গাছে ইস্তাহার ঝোলাবে না, অন্য কোনখানে গিয়ে ইস্তাহারটা টাঙিয়ে দেবে। সে ছুটে মাঠে নেমে দেখল, হিজল গাছের নিচে মালতী—একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে—মনে হয় ওর সেই বাঁশটা, যা দিয়ে বেতের ডগা কেটে দিয়েছিল— মালতী টেনে ইস্তাহারটা নামাচ্ছে। কেমন পায়ের রক্ত সব সামুর মাথায় উঠে এল। উত্তেজনায় অধীর সামু স্থির থাকতে পারল না। কাছে এসে রুষ্ট মুখে দাঁড়াতেই মালতী হেসে দিল।

—কি দ্যাখলি, পাড়তে পারি কিনা।

মালতীর এই উচ্ছলতাকে অপমান করার স্পৃহা সামুর। এই প্রবঞ্চনামূলক ঘটনাতে সে নিজের দুর্বলতাকে দায়ী করে অত্যন্ত দৃঢ় এবং রুক্ষ কণ্ঠে বলল, তুই না বিধবা হইছস মালতী। এই হাসি ত তর মুখে ভাল লাগে না।

—সামু... রে! মালতী, ইস্তাহারসহ ঢলে পড়ার মতো গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল! এক শিশুসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বিধবা মানুষের হাসতে নেই। মালতী বিধবা, সামু বার বার কথাটা যেন মনে করিয়ে দিল। সামু মালতীর এমন চোখমুখ সহ্য করতে না পেরে গাঁয়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। মালতী ক্রমে শান্ত হয়ে এল। পায়ের কাছে ইস্তাহার। মাঠ ফাঁকা। সে এবার মুখ তুলে দেখল সামু নেই—দূরে সে গ্রামের দিকে উঠে যাচ্ছে। কিছু মেলার গরু যাচ্ছে! গলায় ওদের ঘণ্টা বাজছে। কিছু লটকন গাছ, এখন বসন্তকাল বলে গাছে কোনও ফল নেই। নানারকম পাখি উড়ে এসেছে এ দেশটায়। বিলের জল কমে গেছে, সেই বড় বিলে, বাবুদের হাতি আসার কথা, কারণ এ-সময়ে বিলের জলে নানারকমের হাঁস উড়ে আসবে। ওর মনে হল, অনেক দিন ধরে সে সেই হাতি, মুড়াপাড়ার হাতির গলায় ঘণ্টা বাজতে শুনছে না। এই হাতি দেখলে সে সাহস পায়।

তারপর এ অঞ্চলের ঘাস ফুল পাখি চৈত্রের গরম বাতাস সহ্য করে কাল-বৈশাখীর অপেক্ষাতে থাকল। এখন মাঠ খাঁ খাঁ করছে। আকাশ কাঁসার বাসনের মতো রঙে ধূসর হয়ে আছে। কিছু পাখ পাখালি আকাশে উড়লে মনে হয় খড়কুটো উড়ছে। যেন এই মাঠ এবং নদী আর তরমুজ খেত সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। সূর্যের রঙ কমলার খোসার মতো। পলাশ গাছ নেড়া নেড়া। শিমুল গাছে নতুন পাতা এসেছে। ধানের খেত, কলাইর খেত সব এখন চাষবাসের উপযোগী। এ সময়ে চাষ দিয়ে রাখলে ফলন ভালো হবে, আগাছা জন্মাবে না। ঠাকুরবাড়ির ছোট ঠাকুর জমিতে হালচাষ কেমন হচ্ছে দেখে

ফিরছেন। মালতী, ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তার ছোট ছেলে সোনাকে কোলে নিয়ে অ আ করে তু তা করে, কি আমার সোনারে ধনরে বলে, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিকেলের হাওয়া খাচ্ছিল। মাঝিবাড়ির শ্রীশ চন্দ দন্দির হাটে যাবে, নরেন দাসকে এক বাণ্ডিল সূতা কিনে দেবে—সেসব জেনে যাবার জন্য এদিকে হেঁটে আসছে। মালতীকে দেখে বলল, তর দাদায় কই। মালতী বলল, দাদায় তানা হাঁটতাছে। আপনের শরীর ভাল ত কাকা?

জবাবে শ্রীশ চন্দ বলল, এই আছে একরকম। হাটের সুখ এখন নাই ল মা। পরাপরদীর বাজারের সব মুসলমানরা এককাট্টা। অরা ঠিক করছে হিন্দুগ দোকান থাইকা আর কিছু কিনব না।

—কি যে হইল দেশটাতে! মালতী একটা পলাশ গাছ দেখতে দেখতে এমন ভাবল। সোনা ওর বুকে লেপ্টে আছে। ঘুমাবে বোধ হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে সর্বত্র। শরীর ঠাণ্ডা হচ্ছে। শরীর এবং মন দুই-ই হালকা বোধ হচ্ছে। সামু ঢাকা গেছে। এ-পাড়াতে সামু অনেকদিন আসছে না। হয়তো অনুশোচনার জন্য আসছে না। এমন যখন ভাবছিল মালতী তখনই দেখল একজন মিঞা মাতব্বর গোছের মানুষ হিজল গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। লম্বা একটা ইস্তাহার গাছে ঝুলিয়ে দিল।

মিঞার পরনে তফন, গায়ে জোব্বা এবং গালে দাড়ি। মালতী বাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত এল অথচ মাঠে নেমে যেতে সাহস পেল না। ইস্তাহারটা ঝুলিয়ে মানুষটি নিজের গাঁয়ে উঠে গেল না। কে এই মানুষ! মালতী দূর থেকে কিছুতেই চিনতে পারল না। ইস্তাহারটি এখন গাছের উপর নিশানের মতো উড়ছে। মানুষটা মালতীদের বাড়ির দিকে উঠে আসছে। নরেন দাসের ভিতর বাড়ির রাস্তা ধরে উঠে আসছে। মালতী ভাবল, দাদাকে ডাকবে। বলবে, দ্যাখছস দাদা, একটা মিঞা মানুষ বাড়িতে উইঠা আইতাছে। কিন্তু কাছে আসতেই—ওমা! একি তাজ্জব! সামু ওর কার্তিক ঠাকুরের মতো গোঁফ চেঁচে ফেলে গোটা গালে মৌলবী-সাবের মতো দাড়ি রেখেছে। মালতী সহসা কোনও কথা বলতে পারল না। সামুকে আর সামু বলে চেনা যাচ্ছে না। সে যেন কেমন ওর কাছে একেবারে অপরিচিত মানুষ হয়ে গেছে। সামু পর্যন্ত মালতীকে চিনছে না এমন ভাব চোখেমুখে। সে সোজা উঠে আসছিল, কথা বলছিল না; চোখমুখ শান্ত। সে কেমন বুক ফুলিয়ে হেঁটে গেল। মালতী এবার রাগে দুঃখে চিৎকার করে উঠল, দাদারে দেইখ্যা যা— কোনখানকার এক মিঞা বাড়ির ভিতর দিয়া যাইতাছে।

নরেন দাস দূরে তানা হাঁটছিল। সে দূর থেকে কে মানুষটা চিনতে পারল না। সে ফ্রেমটা মাটিতে রেখে গাবগাছটার নিচে তাকাতেই দেখল, যথার্থই একজন মিঞা মানুষ মোত্রাঘাসের জঙ্গল পার হয়ে বাড়ির দিকে উঠে আসছে। সে চিৎকার করে ডাকল, অঃ মিঞা, ঠ্যাং ভাইঙা দিমু। পথ দেইখা হাঁটতে পার না। সদর অন্দর নাই তোমার!

আর মালতী গাবগাছটার গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে হা হা করে হেসে উঠল। মালতী প্রতিশোধের ভঙ্গিতে গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে মনে

প্রতিশোধের স্পৃহা। সোনা সেই হাসি শুনে কেমন চমকে গেল ঘুমের ভিতর। সে কোলের ভিতর ধড়ফড় করে জেগে উঠল। সোনা এখন কাঁদছে। এবং কয়েক মাস আগে এই জঙ্গলে একটা পানস সাপ একটা হাড়গিলে পাখিকে গিলে অনেকক্ষণ শুকনো ডালে মৃতের মতো পড়েছিল। এইসব দৃশ্য মনে হওয়ায় মালতীর আকাশ দেখার ইচ্ছা হল—নিচে এই মাঠ, ধরণীর সুখ-দুখ, মৃত পলাশের ডাল আর কোলে ধনকর্তার ছোট ছেলে সোনা সব মিলে মালতীকে কেমন অসহায় করে তুলছে। সামসুদ্দিন ততক্ষণে সদর রাস্তায় উঠে গেছে। সে একবার ফিরে পর্যন্ত তাকাল না। মালতীর মনে হল অনেকদিন পর বড় মাঠ পার হতে গিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

এভাবে এ-দেশে বর্ষাকাল এসে গেল। বর্ষাকাল এলেই যত জমি-জায়গা খাল-বিল সব জলে ডুবে যায়। শুধু গ্রামগুলো দ্বীপের মতো ভাসতে থাকে। বর্ষাকাল এলেই গ্রাম থেকে বড় বড় নৌকা যায় উজানে। খাল-বিল-মাঠে বড় বড় মাছ উঠে আসে। ধানখেতে কোড়া পাখি ডিম পাড়ার জন্য বাসা বানায়; আত্মীয় কুটুম যা কিছু এ অঞ্চলের, এ-সময় বাড়ি বাড়ি আসতে থাকে। শাপলা শালুক ফুটে থাকে জলে। জলপিপি শালুক ফুলের উপর সন্তর্পণে এক পা তুলে শিকারের আশায় জলের দিকে চেয়ে থাকে।

বর্ষাকাল এলেই বুড়োকর্তা মহেন্দ্রনাথ ঘরে আর বসে থাকতে পারেন না। তিনি ধীরে ধীরে বৈঠকখানার বারান্দায় এসে বসেন। একটা হরিণের চামড়ার উপর বসে বিকেলবেলাটা কাটিয়ে দেন। বয়স তাঁর আশির উপর। চোখে আজকাল আর একেবারেই দেখতে পান না। তবু বাড়ির উঠোনে, শেফালী গাছে এবং বাগানে যে সব নানারকম গাছ আছে, কোথায় কোন গাছ আছে, কি ফুল ফুটে আছে তিনি এখানে এসে বসলেই তা টের পান। তিনি এখানে বসলেই ধনবৌ সোনাকে রেখে যায় পাশে। একটা মাদুরের উপর সোনা হাত পা নেড়ে খেলে। মহেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা বলেন। ওর কোমরে রুপোর টায়রা, হাতে সোনার বালা, এই ছেলে হেসে হেসে বৃদ্ধকে নানা বয়সের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি এই অতি পরিচিত বিকেলের গন্ধ নিতে নিতে সোনার সঙ্গে বিগত দিনের গল্প করেন—প্রায় যেন সমবয়সী মানুষ, একে অপরের অসহায় অবস্থা বোঝে! সোনা অ...আ...ত-ত করে আর বুড়ো মানুষটা তখন যেন দেখতে পান, পাট কাঠির আঁটি উঠোনের উপর দাঁড় করানো। উঠোন পার হলে দক্ষিণের ঘর। তার দরজা। ফড়িঙেরা নিশ্চয়ই এ বাদলা দিনে উড়ছে। এটা শরৎকাল। শরৎকাল এলেই ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠাবে মুড়াপাড়া থেকে। অষ্টমীর দিন সে মহাপ্রসাদের আস্ত একটা কাটা পাঁঠার ছাল ছাড়ানো ধড় নিয়ে আসবে।

তখন বড়বৌ এদিকে এল। হাতে গরম দুধ। শ্বশুরের সামনে দুধের বাটি রেখে পায়ের কাছে বসল। সামনে পুকুর। আম-জাম গাছের ছায়া। তারপর মাঠ। বর্ষাকাল বলে শুধু জল আর জল। যেখানে পাটের জমি—পাট কাটা হয়ে গেছে বলে সমুদ্রের মতো অথবা বড় বিলের মতো, যেন সেই এক বিল—রূপকথার রাজকন্যা জলে ভেসে যায়। বড়বৌ নদী মাঠ এবং জল দেখলে এইসব মনে করতে পারে। বড় বিলের কথা মনে হয়।

— বিয়ের দিন বড় নৌকা করে সে এ-অঞ্চলে এসেছিল। এত বড় বিলে পড়ে বড়বৌর বুকটা ধড়ফড় করে উঠল, কারা যেন এ-বিলের কথা বলতে বলতে যায়—কিংবদন্তীর পাঁচালীর মতো বলতে বলতে যায়—এক সোনার নৌকা রূপোর বৈঠা এ-বিলের তলায় ডুবে আছে। রাজকন্যার নাম সোনাই বিবি। বড়বৌ মেঘলা আকাশ দেখতে দেখতে সেই প্রথম দিন স্বামীর মুখে বিলের গল্প মনে করতে পেরে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। স্বামীর মাথার ভিতর কি গণ্ডগোলের পোকা তখনই ঢুকে গেছিল। নতুবা বাদলা দিনে হাটুরে মানুষের মতো এমন গল্প বলবেন কেন!

বড়বৌ সোনার মুখের আদলটা দেখল ভাল করে। দেখতে দেখতে মনে হল এই মুখ ধনকর্তার মতো নয়, ধনবৌর মতো নয়। এ-মুখ বাড়ির পাগল মানুষটার মতো। বড়বৌ কলকাতায় বড় হয়েছে, কিছুকাল কনভেন্টে পড়েছে। পাগল ঠাকুরকে তার এখন আর পাগল বলে মনে হয় না যেন সে তার কাছে এখন প্রায় মোজেসের মতো অথবা কোন গ্রীক পুরাণের বীর নায়ক—যুদ্ধক্ষেত্রে হেরে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বড়বৌ বলল, সোনার মুখ আপনার বড়ছেলের মতো হবে বাবা।

মহেন্দ্রনাথ একটু হাসলেন! তারপর কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। বললেন—মণির সাড়াশব্দ পাইতাছি না।

—পুকুরপাড়ে বসে আছে।

মহেন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই একটা কথা বলবেন বলে ভাবছিলেন। বড়বৌকে কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। যেন বড়বৌর বাপের বাড়ির দিকের মানুষদের একটা ধারণা—হয়তো মনে মনে বড়বৌ নিজেও সেটা বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি তো জীবনে মিছা কথা কই নাই, তঞ্চকতা করি নাই। আমি এই বয়সে তোমারে একটা কথা কই—বিশ্বাস কর, না কর, কই! এমন ভেবে বললেন, বড়বৌমা, আমার ত সময় ফুরাইছে। তোমারে একটা কথা কমু ভাবছিলাম বৌমা।

বড়বৌ সামান্য হাসল। বলল, বলুন না।

—জান বৌমা, মণি যখন ছুটি নিয়া বাড়ি আসত আমি গর্বে বুক ফুলাইয়া থাকতাম। এ-তল্লাটে এমন উপযুক্ত পোলা আর কার আছে কও। সুতরাং আমি তোমার বাবারে কথা দিলাম। মাইনসে কয় আমার পোলা পাগল হইছে আমি নাকি বিয়ার আগেই জানতাম।

বড়বৌ কোনও জবাব দিল না। সে বুড়ো মানুষটার পাশে সোনাকে কোলে নিয়ে বসে থাকল।

—বোঝলা বৌমা, মণি যে-বারে এন্ট্রাস পরীক্ষায় জলপানি পাইয়া প্রথম হইল—সব্বাইরে কইলাম, নারায়ণ আমার মুখ রাখছে। আর বিয়ার পরই যখন পাগল হইল তখন

কইলাম নারায়ণ আমার তামাশা দেখছে। তিনি যেন এ-সময় কি খুঁজতে থাকলেন হাত বাড়িয়ে।

চক্ষু স্থির, ঘোলা ঘোলা চোখ। চুল এত সাদা, গালের দাড়ি এত সাদা যে মানুষটাকে সান্তাক্লজের মতো মনে হয়। চামড়া শিথিল। বড়বৌ বলল, আপনার লাঠিটা দেব?

—না বৌমা, তোমার হাতটা দ্যাও।

বড়বৌ হাতটা বাড়িয়ে দিলে বৃদ্ধ সেই দু'হাত চেপে ধরে বললেন, বৌমা, তুমি অন্তত বিশ্বাস কইর মণি তোমার বিয়ার আগে পাগল হয় নাই। জাইনা শুইনা আমি পাগলের সঙ্গে তোমারে ঘর করতে আনি নাই। বলে বৃদ্ধ একেবারে চুপ মেরে গেলেন। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখের রেখাতে এতটুকু ভাজ নেই। এক ভাবলেশহীন মুখ, মুখে কোনও আর ইচ্ছার রেখা ফুটে নেই, শুধু উদাস আর উদাস। মহাকালের যাত্রী হবার জন্য যেন পৃথিবীর এক পান্থশালায় জলছত্র খুলে বসে আছেন, সারাজীবন ধরে সকলকে জল দিয়েছেন, অবশেষে সেই জলের তলানিটুকু দিয়ে হাতমুখ প্রক্ষালন করে দূরের তীর্থযাত্রী হবার জন্য উন্মুখ। বৃদ্ধ অনেক দূর থেকে যেন কথা বলছেন, মণির মার কথা শুনলে বুঝি এমন হইত না! দ্যাখ বড়বৌ, আমি বাড়ির কর্তা, মণি আমার বড় পোলা —সে কিনা ভাব কইরা ম্লেচ্ছ মাইয়া বিয়া করব—ঠিক না বৌমা! এইটা ঠিক কথা না।

বড়বৌ এ-সব কথা শুনলে আর স্থির থাকতে পারে না। চোখ ভার হয়ে আসে। সোনার টুকরো ছেলে ভালবেসে পাগল। কথা বললেই যেন এখন দরদর করে চোখে জল চলে আসবে। সে অন্য কথা বলল, চলুন বাবা, আপনাকে ঘরে দিয়ে আসি।

—আমি আর একটু বসি বৌমা। বসলে মনটা ভাল থাকে। বারান্দায় বইসা থাকলে বর্ষার শাপলা শালুকের গন্ধ পাই। মনে হয় তখন ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি আছি। তোমার মায় কই?

—মা গেছেন পদ্মপুরাণ শুনতে। আপনার পদ্মপুরাণ শুনতে ইচ্ছে হয় না বাবা?

—পদ্মপুরাণ ত আমি নিজেই। মাগো—সারাজীবন আমি চাঁদ সদাগরের পাঠ করছি, তুই বেহুলার। বৃদ্ধ টেনে টেনে বললেন, যেন এই বয়সে কেবল বর দেওয়া যায়—এখন এমন এক বয়স আর এমন এক মানুষ তিনি—সংসারে, এ-মানুষ প্রায় ঈশ্বরের শামিল যেন—তিনি টেনে টেনে যেন অনেক দূর থেকে বলছেন— বৌমা, তুমি আমার সতী সাবিত্রী। শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হউক মা তর।

গভীর রাতে বড়বৌ ঘুমে আচ্ছন্ন। একটা আলো ঘরে নিবু নিবু হয়ে জ্বলছে। জানালা খোলা। বর্ষার জলজ বাতাস ঘরে ঢুকে বড়বৌর বসনভূষণ আলগা করে দিচ্ছে। বড়বৌ হাত দুটো বুকের উপর প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে রেখেছে। দেখলে মনে হবে, সে ঘুমের ভিতরও তার মানুষের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। তখন মণীন্দ্রনাথ ঘরে পায়চারি

করছিলেন। ওঁর চোখে ঘুম নেই। তিনি দরজা খুলে ফেললেন সহসা। নদীর ওপারে তিনি কাকে যেন ফেলে এসেছেন মনে হল।

আকাশে এখনও কিছু কিছু নক্ষত্র জেগে আছে। ঠাকুরঘরের পাশেই সেই শেফালি গাছ, ফুলেরা ঝরছে, ঝরে আছে, এবং কিছু কিছু বোঁটায় সংলগ্ন। ওরা ভোরের জন্য অথবা রোদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। মণীন্দ্রনাথ দুই হাতে গাছের নিচ থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে বোঁটার হলুদ রঙ হাতে মাখলেন। রাত নিঃশেষ হয়ে আসছে। তিনি কি ভেবে এবার বাঁশঝাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালেন। সামনে ঘাট—বর্ষার জল উঠোনে উঠে আসবে বুঝি, তিনি ছোট কোষা নৌকায় উঠে লগিতে ভর দিতেই নৌকাটা জলে নেমে গেল—কিছু গ্রাম মাঠ ঘুরে সেই নদীর পাড়ে চলে যাবেন—যেখানে তাঁর অন্য ভুবন নিঃসঙ্গ নির্জন নদীতীরে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

মাথার ভিতর এক অ-দৃষ্ট যন্ত্রণা মণীন্দ্রনাথকে সর্বদা নিরুপায় করে রাখে। মণীন্দ্রনাথ কেবল নির্জনতা চান।

কোষা নৌকা ক্রমশ গ্রাম মাঠ এবং ধানখেত অতিক্রম করে বিশাল বিলের জলে অদৃশ্য হচ্ছে। চারিদিকের গ্রামগুলি খুব ছোট মনে হচ্ছে। আকাশের সঙ্গে সব গ্রামগুলি যেন ছবির মতো হয়ে ফুটে আছে। কোনও শব্দ নেই—ভয়ানক নির্জন নিঃসঙ্গ প্রান্তর। দূরে সোনালী বালির নদীর রেখা অল্পে অল্পে দৃশ্যমান হচ্ছে। মণীন্দ্রনাথ পদ্মাসন করে বসে থাকলেন—সাধুপুরুষের মতো ভাব চোখে-মুখে। বিলের জমিতে গভীর জল—এক লগির চেয়ে বেশি হবে। মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে এই জলের ভিতর পলিনের মুখ যেন দেখতে পাচ্ছেন। পলিন কি করে যেন তার নদীর জলে হারিয়ে গেল। নদীর পাড়ে খেলা ছিল, কত খেলা! হায়, তখন কেবল সেই দুর্গের কথা মনে হয়! বড় মাঠ, মাঠের পাশে দুর্গ, দুর্গে কেবল থেকে থেকে জালালি কবুতর উড়ত। মণীন্দ্রনাথ এবার মুক্ত কণ্ঠে পরমপুরুষের মতো কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন। কবিতার অবয়বে সেই এক স্মরণচিহ্ন—কীটস নামে এক কবি ছিলেন—তিনি বেঁচে নেই। পলিন মণীন্দ্রনাথের মুখে কবিতার আবৃত্তি শুনতে শুনতে এক সময় দুর্গের গম্বুজের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

কিছু হিজল গাছ অতিক্রম করলে নন্দীদের ঘাট। ঘাট পার হলে মুসলমান গাঁ। অনেকদিন পর যেন তিনি ঘাটে নৌকা বাঁধলেন। সর্বত্র গ্রামের ঘাটে ঘাটে পাট পচানো হয়েছে—পচা গন্ধ উঠছে, ইতস্তত কচুরিপানার ঝাঁক—নীল সাদা রঙের কচুরি ফুল এবং পাতিহাঁস ঘাটে নড়ছে। ঘাটে ঘাটে কুমড়োর মাচান, মাচানের নিচে কুমড়োলতা নেমে গেছে। তিনি সব কিছু দেখে শুনে সতর্ক পা ফেলে উপরে উঠে গেলেন। এক তকতকে উঠোনে উঠে যেতেই ধান গোলার ফাঁক থেকে হামিদ বের হয়ে এল। বলল—সব বলাই অবশ্য নিরর্থক, তবু এত বড় মানুষটা, মানুষটার আর বয়স কত, সেই যে, যবে একবার হামিদ, হাসান পীরের দরগাতে এই মানুষকে বসে থাকতে দেখেছিল—মানুষটা যেন

চোখের ওপর শৈশব পার করে যৌবনে পা দিয়েছে, যৌবন থেকে কিছুতেই নড়ছে না, শক্ত বাঁধুনি, শরীরের গঠন একেবারে আস্ত একটা দ্রুতগামী অশ্বের মতো— সে বলল, আমাগ কথা এতদিনে মনে হইল বড়ভাই!

মণীন্দ্রনাথ বড় বড় চোখে হামিদকে দেখলেন। একটু হাসলেন।

হামিদ বলল, একটু বইসা যান বড়ভাই।

মণীন্দ্রনাথ ওর উঠোনে উঠে গেলে হামিদ একটা জলচৌকি দিল বসতে।—বসেন বড়ভাই।

সে সকলকে ডেকে বলল, কে কোন খানে আছ দ্যাখ আইসা, বড়ভাই আইছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে হামিদের মা এল, হামিদের দুই বিবি এসে হাজির হল। বেটা, বিবিরা সকলে। এবং গ্রামে যেন বার্তা রটি গেল—সকলে এসে ঘিরে দাঁড়াল মণীন্দ্রনাথকে। সকলে আদাব দিল। মণীন্দ্রনাথ কোনও কথা বলছেন না, যতক্ষণ না বলেন ততক্ষণই ভালো। একসময় হামিদ ভিড়টাকে সরে যেতে বলল। মণীন্দ্রনাথ সকলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। হামিদ তখন তার ছোট বিবিকে বলল, বড়ভাইয়ের নৌকায় একটা কুমড়া তুইলা দিঅ। যেন গাছের যা কিছু ভালো, নতুন যা কিছু, এই মানুষকে না দিয়ে খেতে নেই।

গ্রামের উপর দিয়ে এক সময় হাঁটতে থাকলেন মণীন্দ্রনাথ। পিছনে গাঁয়ের ছোট বড় উলঙ্গ শিশুরা এবং বালক বালিকারা আখ খেতে খেতে মণীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করছে। তিনি ওদের কিছু বলছেন না। ছোট-বড় গর্ত, বাঁশঝাড় এবং কর্দমময় পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে তিনি হাজি সাহেবের বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ হাজি সাহেব হুঁকোর নলে মুখ রেখে কোলাহল শুনে ধরতে পারলেন, পাগল ঠাকুর আজ এ-গাঁয়ে অনেকদিন পর উঠে এসেছে। হাজি সাহেব হুঁকো ফেলে ছুটে এলেন। বললেন, ঠাকুর বইসা যাও। এদিকে আর আস না। হাজি সাহেব জানেন, এইসব কথা পাগল ঠাকুরের সঙ্গে নিরর্থক তবু এত বড় মানী ঘরের ছেলে—কোনও কথা বলবেন না তিনি—পাগল ঠাকুর এই পথ ধরে চলে যাবে—কেমন যেন ঠেকছে।

মণীন্দ্রনাথ এখানে বসলেন না। কয়েকবার চোখ তুলে হাজি সাহেবকে দেখলেন তারপর সেই এক উচ্চারণ—গ্যাংচোরেৎশালা।

হাজি সাহেব হাসলেন এবং চাকরকে ডেকে বললেন, পাগল ঠাকুরের নৌকায় দুই ফালা সবরীকলা রাইখা আসবি। হাজি সাহেব মণীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে যেন বলতে চাইলেন—ঠাকুর কলাগুলি নিয়া যাও, পাকলে খাইয়। গাছের কলা—তোমারে না দিয়া খাইলে মনটা খুঁতখুঁত করবে। তারপর হাজি সাহেব আল্লার কাছে যেন নালিশের ভঙ্গিতে বলতে থাকলেন, বুড়া কর্তার কপালে এই আছিল খোদা!

বর্ষাকাল। ঘন ঘন বৃষ্টি হচ্ছিল বলে পথ ভয়ানক কর্দমাক্ত। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে—সুতরাং মণীন্দ্রনাথের কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে। পথের দু'পাশে আবর্জনা, মলমূত্রের দুর্গন্ধ। মণীন্দ্রনাথ এ-সবের কিছুই টের করতে পারছেন না। গ্রামের মুসলমান বিবিরা পাগল ঠাকুরকে দেখে পলকে ঘরে নিজেদের আড়াল করে দিচ্ছে। ওরা বড় নিঃস্ব। সুতরাং শরীরে পর্যাপ্ত আবরণ নেই। পুরুষেরা এখন প্রায় সকলেই মাঠে অথবা অন্যত্র পাট কাটতে গেছে। ওরা বিকেলে ফিরবে। মণীন্দ্রনাথ গ্রামটাকে চক্কর মেরে ফের ঘাটে এসে বসলেন নৌকায়। তারপর উদ্যোগী পুরুষের মতো সংগৃহীত বস্তুসকলকে একপাশে সাজিয়ে রেখে নৌকা বাইতে থাকলেন বর্ষার জলে। ঘাটে উলঙ্গ শিশুরা বালক-বালিকারা পাগল ঠাকুরকে নেচে গেয়ে বিদায় জানাল। আর এ-সময়ই তিনি মনে করতে পারলেন বড়বৌ অপেক্ষা করতে থাকবে এবং বড়বৌর জন্য মনটা কেমন করে উঠছে। বড়বৌর সেই গভীর চোখ মণীন্দ্রনাথকে বাড়িমুখো করে তুলল। অথচ বিলের ভিতর পড়েই মণীন্দ্রনাথের বাড়ি ফেরার স্পৃহা উবে গেল। তিনি বিলের ভিতর চুপচাপ বসে থাকলেন। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকলেন, কতক্ষণ তিনি সকালের সূর্য দেখলেন, বিশ্বাসপাড়া, নয়াপাড়ার উপর একদল কাকের উপদ্রব এবং ধানখেতে ঢুব ঢুব শব্দ কতক্ষণ তাঁকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিল তিনি জানেন না। তিনি জলে নেমে গেলেন এবং স্বচ্ছ জলে সাঁতরাতে থাকলেন, শরীরের সর্বত্র গরম—এতবার ডুব দিয়েও তাঁর শরীরের ভিতরে যে কষ্ট, কষ্টটাকে দূর করতে পারছেন না। এই নির্জন বিলে এসে চুপচাপ বসে থেকে তিনি কতবার ভেবেছেন অপরিচিত সব শব্দ অথবা অশ্লীল উচ্চারণ থেকে বিরত হবেন। কিন্তু পারছেন না। সব কেমন ক্রমশ ভুল হয়ে যাচ্ছে। সব কেমন স্মৃতির অতলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জীবনধারণের জন্য কি করা কর্তব্য—অনেক ভেবেও কোনও পথ ঠিক করতে পারছেন না। তখন ভয়ঙ্কর বিরক্তভাব ওঁকে আরও প্রকট করে তোলে। দুহাত ওপরে তুলে চিৎকার করতে থাকেন—আমি রাজা হব।

বিকেলের দিকে ভূপেন্দ্রনাথ এলেন কর্মস্থল থেকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ক'দিন থেকেই বাপের জন্য মনটা খারাপ লাগছিল। বুড়ো মানুষটার জন্য ভূপেন্দ্রনাথের বড় টান। এখনও যেন তিনি সকলকে আগলে আছেন। যৌবনে ভূপেন্দ্রনাথের কিছু আদর্শ ছিল। এখন আর তা নেই। স্বাধীনতা আসবে, স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন চোখে ভাসত। কিন্তু বড়দা পাগল হয়ে গেল—এত বড় সংসার শুধু জমি এবং যজমানিতে চলে না, ভূপেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেলেন। বুড়ো মানুষটার জন্য, এত বড় সংসারের জন্য তিনি পায়ে হেঁটে নতুন ধানের ছড়া আনতে চলে গেলেন। সংসারে তাঁর জীবন প্রায় এক উৎসর্গীকৃত প্রাণ যেন। বিবাহ করা হয়ে উঠল না। চন্দ্রনাথের বিয়ে দিলেন; এখন শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই দেশে চলে আসা এবং বুড়ো মানুষটার পাশে সংসারের গল্প, জোতজমির গল্প, কোন জমিতে কোন ফসল দিলে ভালো হবে—এমন সব পরামর্শ। মনেই হয় না মানুষটার জীবনে অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে।

ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা থেকে নামতেই বাড়ির সকলে যেন টের পেয়ে গেল—মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে, চাল, চিনি, কলা, কদমা এবং বর্ষাকাল বলে বড় বড় আখ এসেছে। ধনবৌ তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকে গেল। তিনি এখন এ-পথেই উঠে আসবেন।

তিনি প্রথমেই বাড়িতে উঠে ছড়িটা বারান্দায় রেখে যে-ঘরে বুড়ো মানুষটা চুপচাপ বসে থাকেন সেখানে উঠে গেলেন। বাবাকে, মাকে প্রণাম করলেন। বুড়ো মানুষটা তাঁর কুশল নিলেন। মনিবের কুশল নিলেন। শরীর কেমন, এ-সব জিজ্ঞাসাবাদের পর মনে হল উঠোনে কে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি বড়বৌ। বড়বৌকে প্রণাম করতে হয়। উঠোনে নেমে বাড়িটার কী কী পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ করতে গিয়ে মনে হল বাড়িটার সেই শুকনো ভাবটা নেই। বাড়ির চারদিকে ঝোপঝাড়গুলি বেড়ে উঠেছে। উত্তরের ঘর পার হয়ে কামরাঙা গাছের পাশে ছোট একটা মাচান। মাচানে কিছু শসার লতানে গাছ, হলদে ফুল। কচি শসা দুটো-একটা ঝুলছে। পাশে ঝিঙের মাচান, করলার মাচান। চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ওগুলো লাগিয়ে গেছে। সেই দুই নাবালককে খুঁজতে থাকলেন তিনি। ওরা এখন বাড়িতে নেই—কোথায় গেল! গোটা বাড়িটা এই দুই নাবালক—লালটু পলটু চিৎকার চেঁচামেচি করে জাগিয়ে রাখে। ওদের জন্য সে হলদে রঙের পুরুষ্ট আখ এনেছে। মোটা এবং সরস।

নরম এই আখ ওদের খুব প্রিয়। নিজে ভেঙে দিতে পারলে কেমন যেন মনটা ওঁর ভরে যায়। অরা গেল কৈ! এমন একটা প্রশ্ন মনে মনে।

সেই দুই বালক তখন ছুটছিল। মেজকাকা এসেছে। পলটুর মেজকাকা লালটুর মেজ জ্যাঠামশাই—ওরা গ্রামের ওপর দিয়ে ছুটছে। ওরা খবর পেয়ে গেছে মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। নৌকা আসা মানে ওদের জন্য আখ এসেছে, কমলার দিনে কমলা, তিলা-কদমার দিনে তিলা-কদমা। অথবা আম-জাম-জামরুলের দিনে নানারকমের ফল। ওরা এসে দেখল, অলিমদ্দি মাথায় করে সব চাল-ডাল-তেল অথবা করলা-ঝিঙে নামাচ্ছে। একটা বড় মাছ এনেছেন, সেটা গলুইর নিচে, লালটু পলটু দু'জনে মাছটাকে টেনে তুলে আনছে। প্রায় এখন যেন উৎসবের মতো বাড়ি। কেবল বড়বৌ বিষণ্ণ চোখে চারদিকে কাকে যেন সারাদিন থেকে খুঁজছে। কে যেন তার চলে গেছে, আসার কথা, আসছে না! বড়বৌর বড় বড় চোখে ভূপেন্দ্রনাথ ধরতে পারলেন—বড়দা আবার নিরুদ্দেশে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিতরে কী এক কষ্ট ভেসে উঠল। বড়বৌর মুখের দিকে আর তাকাতে পারলেন না।

বিকেলের দিকে বুড়ো মানুষটা ভূপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে নানারকম খবর নেবার জন্য বারান্দায় বসে থাকলেন। ভূপেন্দ্রনাথ পায়ের কাছে বসে সব বলছিলেন—এটা স্বভাব তাঁর। মুড়াপাড়া থেকে এলেই বাবাকে পৃথিবীর সব খবর দিতে হয়। বাবুরা অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজার কাগজ পড়েন। বাবুদের পড়া হয়ে গেলে ভূপেন্দ্রনাথ প্রায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মুখস্থ করে ফেলেন। কেউ এলে তখন পত্রিকার খবর, যেন তার নখদর্পণে এই জগৎ সংসার। বাড়িতে এলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো দেশের কথা বর্ণনা করেন। কাগজ থেকে কিছু

খবরের কথা উল্লেখ করে বললেন, এবারে লীগপন্থীরা যে-ভাবে উইঠাপইড়া লাগছে তাতে আবার রায়ট লাগল বইলা।

বৃদ্ধ অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললেন, হাফিজদ্দির পোলা সামুরে তুই ত চিনস! সে নাকি টোডারবাগে লীগের ডেরা করছে। গাছে গাছে ইস্তাহার ঝুলাইতাছে। দেশটা দিন দিন কি হইয়া যাইতাছে বুঝি না!

ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, বাবা, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দ্যাখলাম, গারো পাহাড় থেকে শহরে একজন সন্ন্যাসী আইছে। ভূত-ভবিষ্যৎ সব কইতে পারে। ভাবছিলাম বড়দারে নিয়া যামু।

—যাও, যা ভাল বোঝ কর।

—সঙ্গে ঈশম চলুক।

বড়বৌ ঘরের ভিতরে বসে চাল, প্রায় দু'বস্তা চাল, ঝেড়ে তুলে রাখছে। সবজি যা এসেছে সাজিয়ে রাখছে। পাগল মানুষটাকে নিয়ে যাবে ওরা। সামান্য আশার আলো মনের ভিতর জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই কেমন তা নিভে গেল।

মানুষটাকে নিরাময় করার জন্য কত চেষ্টা—দেখতে দেখতে প্রায় দশ বছর কেটে গেল। মানুষটা কিছুতেই ভালো হচ্ছে না।

—আজকাল ত মণি দুই তিনদিন বাড়ি আসে না। কই থাকে, খায় ঈশ্বরই জানে।

ভূপেন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছিলেন এ ভাবে না খেয়ে ঘুরছে, কোথায় থাকছে, কোথায় রাত কাটাচ্ছে কেউ কিছু বলতে পারছে না—বরং বেঁধে রাখা ভালো। কিন্তু বলতে পারলেন না, কারণ এই ঘরে এখন মা আছেন, বড়বৌ আছে—ওরা সকলে এমন কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না, তা'হলে যেন বাবা যে দু'দিন আরও বাঁচতেন তাও বাঁচবেন না। সুতরাং তিনি অন্য কথা বললেন, সোনারে আনেন দেখি, দ্যাখতে কেমন হইল দ্যাখি।

বড়বৌ সোনাকে কোলে দিলে কেমন তাজ্জব হয়ে গেলেন তিনি। একেবারে বড়দার মুখ পেয়েছে। সোনাকে কাঁধে করে বারবাড়িতে চলে এলেন। সোনা যেমন অ আ ত ত করে কথা বলে তেমনি কথা বলছিল। অপরিচিত মানুষ দেখে সে এতটুকু কাঁদেনি। বরং মাঝে মাঝে কুটুস কুটুস দাঁতে কামড়াচ্ছিল। সোনার দুটো ছোট ছোট ইঁদুরের মতো দাঁত উঠেছে।—পোলা, তোমার অসুখ হইব দ্যাখতাছি। বলে দাঁতে দুটো টোকা দিলেন। যেন এই শিশুকে দাঁতে আঘাত করে ওর কঠিন অসুখ থেকে রক্ষা করছেন ভূপেন্দ্রনাথ। সোনা ভয়ঙ্করভাবে কেঁদে উঠতেই পাশের বাড়ির দীনবন্ধু পিছন থেকে ডাকল, মাইজা ভাই, ঢাকায় নাকি আবার রায়ট লাগব শুনছি।

—তা লাগতে পারে।

—কেডা জিতব মনে হয়?

—কী কইরা কই! হার জিতের কি আছে ক?

—কী দুর্ধর্ষ দ্যাখেন, দুধের পোলা, হালার হালা কথা নাই বার্তা নাই চাকু চালায়।

—তুই দ্যাখছস নাকি?

—তা দ্যাখমু না ক্যান। মালতীর বিয়ার সময় একবার ঢাকা শহরে গেছিলাম। ঘুইরা ফিরা দ্যাখলাম শহরটা। এলাহি কাণ্ড—না!—রমনার মাঠে গ্যালাম, সদর ঘাটের কামান দ্যাখলাম।

সন্ধ্যার পর ধনবৌ পশ্চিমের ঘরে হারিকেন জ্বেলে রেখে গেল। হাত-পা ধোওয়ার জল রেখে গেল। একটা জলচৌকি, ঘটি এবং গামছা রেখে দিল। তিনি হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে যাবেন। আর বের হবেন না। কারণ গ্রামে খবরটা রটে গেছে। মুড়াপাড়া থেকে মাইজা কর্তা এসেছেন। বিশ্বের খবর তাঁর জানা আছে। গ্রামের পালবাড়ি থেকে মাঝিবাড়ি অথবা চন্দদের বাড়ি থেকে প্রৌঢ়গণ হাতে লাঠি এবং লণ্ঠন নিয়ে খড়ম পায়ে ঠাকুরবাড়ি এসে ডাকল, ভূপেন আছ? মাইজা কর্তা আছেন?

ভূপেন্দ্রনাথ তখন হয়তো তক্তপোশে বসে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছিলেন অথবা ঈশমের কুশলবার্তা। তখন তিনি এক দুই করে খড়মের শব্দ শুনতে পেলেন। গ্রামের বয়স্ক মানুষেরা এখন এসে ভিড় করবে। আড্ডা দেবে এবং পত্রিকার খবর নেবে। দেশের খবর, বিদেশের খবর, গান্ধীজী কি ভাবছেন, এমন সব খবরের জন্য ওরা উন্মুখ হয়ে থাকে। তিনি এই আড্ডার প্রাণ। তিনি তখন ঈশ্বরের চেয়েও বড়, তার কথা এদের কাছে ঈশ্বরের শামিল—এই বিশ্বাস লোকগুলির মনে। তিনি তখন বলবেন, দেশের বড় দুরবস্থা হারান।

—ক্যান কাকা?

—কাইল সারা বাজার ঘুইরা বাবুরহাটের একটা শাড়ি পাইলাম না।

—ক্যান এমন হইল?

—কি জানি! মহালে তর আদাই নাই। এদিকে তোমার সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইতেছেন গান্ধী। ইংরাজরাও ছাইড়া কথা কইতাছে না। লাঠি চালাইতেছে। গুলি করতাছে। এদিকে তোমার বিলাতের প্রধানমন্ত্রী লীগের পক্ষ নিছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ লীগের পোয়াবার।

মাঝিবাড়ির শ্রীশ চন্দ বলল, ঘোর কলিকাল আইসা গেল মাইজা ভাই।

ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, চারিদিকে তর একটা ষড়যন্ত্র। আনন্দময়ী কালীবাড়ির পাশে বনজঙ্গলের ভিতর পুরানো একটা বাড়ি আছে, একটা দিঘি আছে। কেউ খবর রাখে না। এখন তর চরের মৌলভি-সাব কয় ওটা নাকি মসজিদ। মুসলমানরা কয় নামাজ পড়ব।

—তা হইলে গণ্ডগোল একটা লাগব কন!

—বাবুরা কি ছাইড়া দিব? জায়গাটা অমর্ত্যবাবুর! পাশে আনন্দময়ী কালীবাড়ি। আগুন জ্বলতে কতক্ষণ।

—অঃ, আমার হোমন্দির পো' রে, দেশে আর বিচার নাই। আমাগ জাতধর্ম নাই। পূজা-পার্বণ নাই। মাকালী নিব্বংশ কইরা দিব। তখনই সে দেখল উঠোনে ঈশম বসে তামাক টানছে। মাইজা কর্তা এলে একটু দেরি করে সে গোয়ালে গরু বাছুর তোলে। ঈশমকে দেখে সে কেমন জিভে কামড় দিয়ে ফেলল। উঠোনে মানুষটা বসে আছে সে খেয়ালই করেনি। এবার কেমন গলা নামিয়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, আমার দোকান থাইকা মাইজা ভাই মুসলমান খরিদ্দার সওদা করতে চায় না। কতদিনের সব খরিদ্দার। কত বিশ্বাসের সব—অরা সরিবদ্দির দোকানে খায়।

এ-সময় সকলেই চুপ হয়ে গেল। কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। শ্রীশ চন্দ তার দুঃখের কথা বলে চুপ হয়ে গেছে। ভূপেন্দ্রনাথ হুঁকা টানছেন। জোর হাওয়ার জন্য আলোটা মৃদু-মৃদু কাঁপছিল। দূরে সোনালী বালির নদী থেকে গয়না নৌকার হাঁক আসছে। শচীন্দ্রনাথ ঠাকুরঘরে শীতল ভোগ দিচ্ছেন। ঘণ্টার শব্দ, গয়না নৌকার হাঁক এবং ঈশমের ব্যাজার মুখ সকলকেই কেমন পীড়িত করছে। বুড়ো মানুষটা ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। কোথায় এখন তাঁর পাগল ছেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে অথবা গাছের নিচে শুয়ে আছে কে জানে। বড়বৌ পুবের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে কামরাঙা গাছ, গাছ পার হলে বেতের ঝোপ এবং ডুমুরের গাছটা পার হলে মাঠ। বড় চাঁদ উঠে আসছে গাছটার মাথায়। এখন সাদা জ্যোৎস্না সর্বত্র। গাছগুলি স্পষ্ট। ফাঁকা মাঠে ধান গাছে সামান্য কুয়াশার পাতলা আবরণ। সে পথের দিকে তাকিয়ে আছে—যদি কোনও মানুষের ছায়া এই পথে উঠে আসে, যদি মানুষটা লগি বাইতে থাকে সামনের মাঠে অথবা নৌকার শব্দ পেলেই চমকে ওঠে—এই বুঝি এল, সাধু-সন্ন্যাসীর মতো এক উদাসীন মানুষ বুঝি বাড়ি ফিরে এল। পাগল মানুষটার প্রতীক্ষাতে বড়বৌ জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর মানুষটার জন্য কেন জানি কেবল কান্না পাচ্ছিল।

কিছুদূর এসেই মণীন্দ্রনাথের বাড়ি ফেরার স্পৃহা উবে গেল। তিনি বার বার ধানখেতের চারপাশে ঘুরতে থাকলেন এবং মাঝে মাঝে নৌকাকে ঘুরিয়ে দিয়ে লগিটাকে মাথার উপর লাঠিখেলার মতো ঘোরাতে থাকলেন। এই যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, আকাশ রয়েছে এবং বিলের জলে কোড়া পাখি ডাকছে সব কিছুর ভিতর কোন এক অদৃশ্য সংগ্রাম তাঁর। পাটাতনে লাফ দিচ্ছিলেন। হাতে ধরে কি যেন আয়ত্তে এনেছেন, তারপর গলা টিপে হত্যা। যত তিনি লাঠিটা ঘোরাচ্ছিলেন তত বন-বন শব্দ হচ্ছে। দূরে যারা পাট কাটছিল

তারা দেখল বিলের জলে নৌকা ভাসছে আর পাগলঠাকুর মাথার ওপর লগি ঘোরাচ্ছে। কি মানুষটা কি হইয়া গ্যাল এমন সব চিন্তা।

তিনি অনেক দূরে চলে এসেছিলেন নৌকা বাইতে বাইতে। সুতরাং ঘরে ফিরতে বেশ দেরি হবে। বড়বৌর বড় এবং গভীর চোখ দুটো তাকে এখন কষ্ট দিচ্ছে এই ভেবে যখন ধানখেত ভেঙে ঘরে ফেরার স্পৃহাতে লগি তুলছেন তখনই দেখতে পেলেন, সোনালী বালির নদীর বুকে একটা বড় পানসি নাও। তার কেন জানি মনে হল—এই নৌকায় পলিন আছে। পলিনকে নিয়ে এই নাও কোন এক অদৃশ্যলোকে হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি পাটাতনের নিচ থেকে এবার বৈঠা বের করে জলে বড় বড় ঢেউ তুলতেই নৌকাটি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে নদীতে পড়ল। স্রোতের মুখে তিনি ভেসে চলেছেন। এখন কোনও বেগ পেতে হচ্ছে না মণীন্দ্রনাথকে—তিনি পানসি নৌকাটার পেছনে হাল ধরে শুধু বসে আছেন।

পানসি নৌকার মানুষেরা দেখল পিছনে পিছনে একটা নৌকা আসছে। হালে বসে আছে উদোম গায়ে গৌরবর্ণ এক সুপুরুষ। রোদে পুড়ে রঙটা একটু তামাটে হয়ে গেছে। হালে মানুষটা প্রায় যেন চোখ বুজে আছে। এই বর্ষা এবং তার স্রোত যেদিকে নিয়ে যায় যাবে—মানুষগুলি দেখে হাসাহাসি করছিল। ভিতরে জমিদার পুত্র এবং বাঈজী বিলাসী একঘরে এক বিছানায়। গান শেষে কিছু কিছু কৌতুকের কথাবার্তা। এবং সরোদের টুংটাং শব্দ। বিলাসী তারে হাত রেখে পা দুটো ছড়িয়ে—হায় সজনিয়া, এমন এক ভঙ্গি টেনে পড়ে আছে। চোখমুখ জড়িয়ে আসছিল, নেশায় ওরা পরস্পর তাকাতে পারছে না। মণীন্দ্রনাথ দীর্ঘপথ ওদের কেবল অনুসরণ করলেন। তিনি সরোদের গম্ভীর আওয়াজের ভিতর কেবল যেন এক মেয়ের মুখ দেখতে পান—তিনি পলিনের অবয়ব এবং তার মুখ, তার প্রেম সম্পর্কিত সকল ঘটনা এই ধানখেতের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী বালির নদীর চরে, জলে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছেন। অথচ এক সময় আবার সবই কেমন গুলিয়ে গেল। কেন যে এত দীর্ঘ পথ পানসি নৌকার পিছনে অনুসরণ করলেন, মনে করতে পারছেন না। কোন পথ ধরে ঘরে ফিরতে হবে সব যেন ভুলে গেলেন। তিনি এবার নদী থেকে চরে উঠে আসার জন্য নৌকার মুখ ফেরালেন, কাশবনের ভিতর ঢুকে আর পথ পেলেন না। সূর্য পশ্চিমে হেলে গেছে—এবার সূর্যাস্ত হবে—কিছু গগনভেরী পাখির আর্তনাদ আকাশের প্রান্তে শোনা যাচ্ছিল এবং দূরে হাটফেরত মানুষেরা ঘরে ফিরছে। তিনি নৌকার পাটাতনে এবার শুয়ে পড়লেন। শরীরের কোথায় কী যেন কষ্ট। তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত। অথচ কী করলে এই কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবেন বুঝতে পারছেন না। সুতরাং চুপচাপ শুয়ে থেকে গগনভেরী পাখির আর্তনাদ কোথায় কোন আকাশে উড়ছে খুঁজতে থাকলেন। আকাশ একেবারে নিঃসঙ্গ। কোথাও একটা পাখি একটা ফড়িঙ পর্যন্ত উড়ছে না। তিনি ক্লান্ত গলায় যেন বলতে চাইলেন পলিন, আমি তোমার কাছে যাব।

দূরে কোন গ্রাম—সেখান থেকে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। কোন মুসলমান গ্রাম থেকে আজানের শব্দ। কিছু কিছু নক্ষত্র আকাশে ফুলের মতো ফুটে উঠছে। এখন আকাশটাকে তত আর নিঃসঙ্গ মনে হয় না। কতদূর এইসব নক্ষত্রের জগৎ—ইচ্ছা করলে

ওদের ধরা যায় না! এইসব নক্ষত্রের জগতে অথবা নীহারিকাপুঞ্জে নৌকায় পাল তুলে ঘুমিয়ে থাকলে কেমন হয়! তিনি কত বিচিত্র চিন্তা করতে করতে সবকিছুর খেই হারিয়ে সহসা কেমন উত্তেজনা বোধ করেন।

কিছু জোনাকি জ্বলছে ধানগাছের পাতার আড়ালে। জ্যোৎস্নায় এই ধরণী শান্ত এবং স্থির। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি এই মিষ্টি হাওয়ায় কেমন উবে গেল। ফের পলিনের মুখ মনে পড়ছে। মণীন্দ্রনাথ কাৎ হয়ে শুয়েছিলেন এবং বিড়বিড় করে বকছিলেন। দেখলে মনে হবে না—তিনি এখন সুদূর কলকাতায় কোনও ইউরোপীয় পরিবারের সঙ্গে আলাপ করছেন। মনে হবে বিড়বিড় করে কি শুধু বকে যাচ্ছেন। জোরে জোরে উচ্চারণ করলে ইংরেজির স্পষ্ট উচ্চারণে সব ধরা পড়ত, কিন্তু হাতের ওপর মাথা রেখে অথবা এইসব কথা তাকে শুধু পাগল বলেই প্রতিপন্ন করছে। আমি পলিনকে ভালবাসি—এই উক্তি পরিবারের সকলের কাছে চিৎকার করে বলতে পারলে যেন খুশি হতেন। অথচ অঘটন ঘটে গেল। মণীন্দ্রনাথ যেন পিতৃসত্য পালনে বনবাসে গমন করলেন। পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করতে গিয়ে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বে অবশেষে বলেই ফেললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

মণীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন মাঠে অথবা নদীর জলে কোথাও কোনও নৌকার শব্দ উঠছে না তখন তিনি দাঁড়িয়ে বলতে চাইলেন, পলিন, আমি পাগল হইনি। আমাকে সবাই অযথা পাগল বলছে। আমি তোমার কাছে গেলেই ভালো হয়ে যাব। এইসব কথা এখন মাঠে মাঠে জলে জলে বনে বনে ঘাসে ঘাসে সর্বত্র প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে—আমি পাগল হইনি। সবাই অযথা আমাকে পাগল বলছে।

রাত বাড়ছে। লালটু পলটু পড়ছে দক্ষিণের ঘরে। ঈশম আজ বুঝি বাড়ি যাবে না, গেলেও রাত করে যাবে। সে দক্ষিণের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ধনবৌ হেঁশেলে। শশীবালা দরজায় বসে, কোলে সোনা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি তালপাতার পাখা নাড়ছেন। গরম পড়েছে বেশ। পশ্চিমের ঘরে যারা এতক্ষণ বসে রাজাউজির মারছিল, রাত গভীর হলে এক এক করে সকলে চলে গেল। দীনবন্ধু কেবল যায়নি। সে মেজকর্তার পায়ের কাছে বসে হুঁকো টানছিল। এবং জমিদারী সেরেস্তার গল্প শুনে কর্তার মন জয় করার তালে ছিল। দীনবন্ধু এতদিন যে জমিটা ভোগ করছে ভাগে, সে কর্তাকে খুশি করে জমিটার ভোগদখল চাইছে।

শশীবালা রান্না হলে সকলকে খেতে ডাকলেন। বড়বৌ কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে দিল। লালটু পলটুর জন্য ছোট পিঁড়ি। জল দিল। বড় দোচালা ঘর। মুলি বাঁশের বেড়া সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে। শশীবালা এখন দরজার কাঠে হেলান দিয়ে ছেলেদের খাওয়া দেখবেন। বড়বৌ পরিবেশন করবে, ধনবৌ হেঁশেলে ঘোমটা টেনে বসে থাকবে—মাঝে মাঝে কানের কাছে কথা ধনবৌর, ফিসফিস করে কথা—এটা ওটা বড়বৌকে এগিয়ে দেবে।

খেতে বসেই ভূপেন্দ্রনাথের মনটা ভারি হয়ে উঠল। বড়দার আসন পড়েনি। একটা দিক খালি। সেদিকে তাকিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, বড়দা কখন বাইর হইছে?

শচীনাথ পঞ্চদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করছিলেন তখন, জলটা গণ্ডুষ করবে, ঠিক তখন মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর এখন খেয়াল থাকে না—বড়দার আসন খালি, তিনি জলটা গণ্ডুষ-করে বললেন, পরশু ভোরে বৌদি উইঠা দেখে দরজা খোলা। ঘাটে গিয়া দেখি কোষাটা নাই। হাসিমের বাপ কইছে তাইন নাকি দুপুরে বিলের দিকে নৌকা বাইয়া নাইমা গ্যাছে।

—কাইল একবার চল দেখি—অলিমদ্দিরে লইয়া যাই।

—চলেন। তবে মনে লয় পাইবেন না। কই থাকে কই যায় কেউ জানে না।

বড়বৌ কোনও কথা বলছিল না। বসে বসে শুনছিল। এবং চোখে জল এসে গেলে ঘোমটা সামান্য টেনে দিল। কোন নালিশ নেই এমন ভাব চোখে-মুখে। কোনওদিন সুপুরুষ লোকটি আদর করে কথা বলেনি। কোনও প্রেম সম্পর্কিত সুখী ঘটনা ইদানীং আর ঘটছে না। শুধু মাঝে মাঝে, তাও ক্বচিৎ কখনও বুকের কাছে টেনে এনে দস্যুর মতো কি এক আদিম প্রেরণা যেন, চোখমুখ ঘোলা ঘোলা—মানুষ বলে চেনা যায় না। বুকের কাছে নিয়ে একেবারে বন্যজীবের মতো করতে থাকে; বড়বৌ শরীর ছেড়ে দেয়—যা খুশি করুক—পাগল মানুষটাকে সে শিশুর মতো, অথবা সন্তানের মতো, অথবা তুমি যে এক আদিম মানুষ সে কথা তুমি কি করে ভুলে যাও—আমাকে দ্যাখো, খেলা কর। বন্যজীবের মতো বুকের কাছে টেনে নেবার ঘটনাও সে আঙুলে গুনে বলতে পারে—কত দিন, কতবার—জ্যোৎস্না রাত ছিল, না অন্ধকার রাত ছিল, সব বলে দিতে পারে।

দু'দিনের উপর হয়ে গেছে। মানুষটা ফিরছে না। বড়বৌ পাগলঠাকুরকে আপনার ধন বলে জানে। মণীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিটি বড় অপরিচিত। বিয়ের পিঁড়িতে সে যেন এই পাগল মানুষটাকেই দেখেছিল। অশান্ত পুরুষ, জীবন থেকে তাঁর সোনার হরিণ হারিয়ে গেছে—মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন, অভিশাপ দেবার বাসনা যেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর লাবণ্যময়ীকে গিলে খাবেন। এত লোকজন, এত আলো আর সমারোহ, তবু বড়বৌর সেদিন ভয় করছিল। রাতে দিদিকে ডেকে বলেছিল, দিদি আমার বড় ভয় করছে। মানুষটা যেন আমাকে গিলে ফেলবে। আমাকে তোমরা কি দেখে বিয়ে দিলে! এমন গ্রাম জায়গায় আমি থাকবো কী করে! পরে বড়বৌ বুঝেছিল,—মানুষটি নিরীহ এবং মস্তিষ্কে বিকৃতি আছে। ততদিনে সে এই সুপুরুষ ব্যক্তিটিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবেসে ফেলেছে। সুতরাং দুঃখকে জীবনের নিত্য অনুগামী ভেবে আজ-কাল আর নিজের জন্য আদৌ ভাবে না—মানুষটার জন্য রাতে কেবল ঘুম আসে না, কেবল জেগে বসে থাকে মানুষটা কখন ফিরবে।

রাত ঘন হচ্ছিল। ঘাটে বড়বৌ বাসন মাজছে। সোনা কাঁদছিল বলে ধনবৌকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে এখন একা এই ঘাটে। শশীবালা খেয়েদেয়ে এইমাত্র বড়ঘরে ঢুকে গেছেন। নির্জন রাতে এমন কি বুড়ো মানুষটার কাশির শব্দও ভেসে আসছে না। বোধ হয় এখন সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নৌকাটা অলিমদ্দি ঘাটে রাখেনি। ঘাটের কিছুটা দূরে লগিতে বেঁধে ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়বৌর বাসন মাজা হয়ে গেছে, তবু উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঘাটের একপাশে লণ্ঠনের আলোতে বড়বৌর মুখ বিষণ্ণ। জ্যোৎস্না রাত বলে দূরের মাঠ দিয়ে নৌকা গেলে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আজ আর কুয়াশা ভাবটা নেই। বড়বৌ এই ঘাটে সেই নিরুদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বসে আছে। তিনি হয়তো আসছেন, এক্ষুনি এসে পড়বেন। বড়বৌর কথা মনে ভেসে উঠলে মানুষটা পাগলের মতো ঘরের দিকে ছুটতে থাকেন।

রাত বাড়ছে। একা একা ঘাটে বসে থাকতে আর সাহস পেল না বড়বৌ। শুধু ঝোপ জঙ্গলে কিছু অপরিচিত পাখ-পাখালি, কীট-পতঙ্গ রাতের প্রহর ঘোষণায় মত্ত। আলকুশি লতার ঝোপে ঢুব-ঢুব আওয়াজ। গন্ধপাদাল ঝোপে ঝিঁঝি-পোকা ডাকছে। রাত গভীর হলে, নিশীথের প্রাণীরা কত হাজার হবে লক্ষ হবে এবং লক্ষ কোটির প্রাণের সাড়া এই ভুবনময়। গভীর রাতে জেগে থেকে টের পায় বড়বৌ, যেন মানুষটা এখন নিশীথের জীব হয়ে জলে-জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছে।

রান্নাঘরে বাসনকোসন রেখে পুবের ঘরে উঠে যাবার মুখেই মনে হল ঘাটে লগির শব্দ। বড়বৌর বুকটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঘাটে। মানুষটা লাফ দিয়ে নৌকা থেকে নামছে। নৌকাটাকে টেনে প্রায় জমিতে তুলে ফেলল। কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই। লম্বা উঁচু মানুষটা—কী যে লম্বা আর কী যে রহস্যময় চোখ—এই সুদৃশ্য জ্যোৎস্নায় যেন এক দেবদূত আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। বড়বৌ দেখল মানুষটার শরীরে কোনও বসন নেই। একেবারে প্রায় উলঙ্গ এবং শিশুর মতো বড়বৌকে জেগে থাকতে দেখে হাসছে। নৌকায় কচু কুমড়া কলা। যার যা কিছু প্রথম গাছে হয়েছে, মানুষটাকে দিয়ে দিয়েছে। বড়বৌ বিস্ময়ে কোনও কথা বলতে পারল না। যেন এক সন্ন্যাসী দীর্ঘদিন তীর্থ-ভ্রমণের পর নিজের ডেরাতে হাজির হয়েছে। অন্যদিন হলে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে কাপড় পেড়ে আনত। আজ কিছুই ইচ্ছা হল না, এই সাদা জ্যোৎস্নায় এমন এক শিশুর মতো যুবকটিকে নিয়ে কেবল খেলা করে বেড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তখন বিকেলবেলা। বর্ষার জল মাঠে থইথই করছে। জোটন গোপাট ধরে জল ভাঙতে থাকল। সে সাঁতার কেটে পাশের গ্রামে উঠে যাবে। সে জলজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম করে কেবল সাঁতার কাটছে। সে সাঁতার কেটে ঠাকুরবাড়ির সুপারি বাগানে উঠে দেখল একটাও সুপারি পড়ে নেই। ঘাটে একটা তেমাল্লা নৌকা বাঁধা। ছই-এর নিচে দুই মাঝি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। জলে সে সারাক্ষণ সাঁতার কেটেছে। শাড়ি ভিজে গেছে। জবাফুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে শাড়িটাকে খুলে চিপে ফেলল। তারপর ফের প্যাঁচ দিয়ে পরতেই মনে হল—কোথায় যেন কারা চিঁড়া কুটছে। তালের বড়া ভাজছে। সে নাক টেনে গন্ধ নিল। চিঁড়া কোটার শব্দ ভেসে আসছিল। মামাদের এখন ভাদ্রমাস। ভিটা জমিতে আউশ ধান, আউশ ধানের চিঁড়া—সে ভাবল, চিঁড়া কুটে দিলে ওর নসিবটা খুলে যাবে।

সে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। দেখল মাইজা কর্তা পশ্চিমের ঘরে তক্তপোশে একটা মোটা পুঁথি পড়ছেন। জোটন মাইজা কর্তাকে দেখেই দরজার সামনে দাঁড়াল। কে দাঁড়িয়ে আছে! চোখ তুলতেই দেখলেন আবেদালির দিদি জোটন। জোটনের শরীরটা একটু রুগ্‌ণ দেখাচ্ছে। চুল জোটনের নেই বললেই হয় এবং শণের মতো। মুখে কোনও কমনীয়তা নেই। ওর শরীরের গঠনটা কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। গালে মেচেতা সুতরাং মুখটি কুৎসিত দেখাচ্ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বলল, কিরে জুটি, তুই!

—হ কর্তা, আমি। আবার ফিরা আইছি।

—আবার তরে তালাক দিল?

—হ। কিন্তু নির্বংশায় না দিল পোলা, না দিল এক ফালি ত্যানা!

—পোলা না দিছে ভাল করছে—পোলা আইনা খাওয়াইবি কি?

জোটন সেটা ভাল করে বোঝে বলে অন্য কথা আর বলল না। মাইজা কর্তা আবার বড় পুঁথিতে মন দিয়েছেন। চশমার ভিতর কর্তার সহৃদয় মুখ দেখে বলতে ইচ্ছে হল, মাইজাকর্তা, আমারে পুরান-দুরান যা হয় একখানা ঠিক কইরা দ্যান। কিন্তু বলতে পারল না। যেন বললে শোনাত—সেই ফকিরসাব এসেছিলেন, কষ্টের যা কিছু সঞ্চয় ছিল, মোটা ভাত একটু শুকনো মাছের বাটা দিয়ে মানুষটা সবক'টা ভাত খেয়ে সেই যে চলে গেলেন আর এলেন না। যেন জোটন এই দরজায় দাঁড়িয়ে মনে করতে পারে—ফকিরসাব হুঁকো খাচ্ছিলেন, সব পোঁটলা-পুঁটলি যত্ন করে বাঁধা। যেন তিনি উঠবেন, হুঁকো খাওয়াটা বাকি। জোটন ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারেনি! সে বলেছিল—ফকিরসাব, আমারে লইয়া যাইবেন না? ফকিরসাব ঝোলাঝুলি কাঁধে নিতে নিতে বলেছিলেন—আইজ না। অন্যদিন হইব। কোরবান শেখের সিন্নিতে যামু। কবে ফিরমু ঠিক নাই! সেই যে বলে চলে গেলেন আর এলেন না মানুষটা। আর আসবেন কিনা ঠিক নেই। তাকে একটা মানুষ ঠিক করে দেবার জন্য সে যেন দোরে দোরে ঘুরছে।

আমারে একটা পুরান-দুরান যা হয় ঠিক কইরা দ্যান—বলতে সাহস পেল না। তিনবার তালাক এই শরীরকে যেন দুর্গন্ধময় করে রেখেছে—মাইজা কর্তা বললেন, কিছু কবি?

—কি কমুগ কর্তা। আমার চলে কি কইরা!

—আবার তর পাগলামি আরম্ভ হইছে। এইটা ঠিক না।

মাইজা কর্তা বুঝতে পারছিলেন, পুরান-দুরান মানুষ ঠিক করে দেবার কথাটা সে বলতে এসেছে। জোটন কর্তার মুখে এমন কথা শুনে আর দাঁড়াল না। আতাবেড়ার পাশ দিয়ে ভিতর বাড়িতে ঢুকে গেল।

ধনমামি বড়মামি দাঁড়িয়ে আছেন। হারান পালের বৌ চিঁড়া কুটে দিচ্ছে। মালতী সঙ্গে আছে। জোটন বলল, দ্যান, আমি চিঁড়া কুটি।

জোটন অতি অল্প সময়ে চিঁড়া কুটে খোলায় ছড়িয়ে দেখাল। সে যে ভাল চিঁড়া কুটতে পারে, চিঁড়াগুলি ওর বেশ বড় বড় হয়—খোলায় ছড়িয়ে যেন সকলকে দেখাতে চাইল। জোটন ওর চিঁড়াগুলি অন্য একটা বেতের ঢাকিতে রাখল। শশীবালা এই চিঁড়া দেখলে খুশি হবেন। যাবার সময় এক খোলা চিঁড়া ওর আঁচলে ঢেলে দেবেন।

ধনবৌ বলল, তর নাকি আবার বিয়া বসনের শখ হইছে?

—অঃ আল্লা, এডা এতদিনে জানলেন! কিন্তু পাইতাছি কই।

—তর ক্ষমতা আছে জুটি!

—কি যে কন আপনারা। শরমের কথা আর কইয়েন না। এডা গতরের কথা। আপনের-অ আছে আমার-অ আছে। আপনে সুখ পান কথা কন না, কর্তা আসে যায়। আমার মানুষ নাই, মানুষ আসে না যায় না। সুখ পাই না, কথা কই। এইসব বলে জোটন চিঁড়া কুটতে থাকল ফের, ওর মুখে একরকমের শব্দ; শব্দটা কোড়া পাখির ডাকের মতো। ভাদ্র মাস বলেই এত গরম এবং তালের পিঠা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি—তার গন্ধ গ্রামময়। মাঠময়। হারান চন্দের বৌ ধান খোলাতে ভাজছে, শুকনো কাঠ গুঁজে দিচ্ছেন শশীবালা। সকলেই কোন-না-কোন কাজে ব্যস্ত। জোটন একটু জল চাইল। বড়বৌ জল আনতে গেছে কুয়াতে। আর এ সময় জাম গাছে একটা ইষ্টিকুটুম পাখি ডাকল। দুধারে বস্তা পাতার সময় সে চোখ তুলে দেখল—গাছে পাখিটা ডাকছে। সে বলল, ধনমামি, গাছে ইষ্টিকুটুম পাখি। মেমান আসব।

রান্নাঘরে পবন কর্তার বৌ, তার ছেলেপুলে, সবাই বেড়াতে এসেছে। শশীবালা এই বর্ষাকালটা সব নাইয়রীদের জন্য যেন প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। সারা বর্ষাকাল কুটুম আর কুটুম। ধনবৌ তখন নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। বড়বৌকে সারাদিন হেঁশেলে পড়ে থাকতে

হয়। মুখ ফসকে ধনবৌ বলে ফেলেছিল আর কি—আর কুটুম না। কিন্তু ঘরে পবন কর্তার বৌ। সে বলতে পারল না, পাখিটারে উড়াইয়া দে জুটি। সারা বর্ষাকাল কুটুম আর কুটুম। দিন-রাইত নাই, আইতাছে যাইতাছে। অথচ বুড়ো ঠাকরুণ শশীবালার বড় শখ কুটুমে। কোন্ কুটুম কি খেতে পছন্দ করে—শশীবালার সব মুখস্থ।

এ-সময়ে মেঘনা-পদ্মাতে ইলিশের ঝাঁক উঠতে থাকবে। জোটন জানত, এসময় ঠাকরুণ কুটুমের জন্য ভাল-মন্দ খাবার অথবা নাইয়রীরা ঘুরে বেড়াবে ঘরময়, উঠোনময় শিশুদের কোলাহল, ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা—এইসব দৃশ্য, আর জোটন তখন দেখল হারান পাল নৌকা থেকে এক গণ্ডা ইলিশ নামাচ্ছে। বড় বড় ইলিশ—রূপোর মতো উজ্জ্বল রঙ অবেলার রোদে চিকচিক করছিল। জোটন ইলিশমাছগুলি দেখে চোখ নামাতে পারছে না।

ওর ইলিশমাছগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা—খুব করুণ অথবা রহস্যময় মনে হয়—যেন কতদিন এইসব মাছের স্বাদ ভুলে গেছে জোটন। শশীবালা এসব লক্ষ্য করে বললেন, রাইতে খাইয়া যাইস জুটি। জুটির চোখদুটো কেমন সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, ঠাইনদি, মাছগুলির প্যাটে ডিম হইব মনে হয়।

—তরে ডিম ভাজা দিতে কমু।

সে আর কি বলবে ভেবে পেল না। একমনে আবার চিঁড়া কুটতে থাকল। সেই কোড়াপাখির ডাকটা ওর ভিতর থেকে এখনও উঠছে। ওর পরনের শতচ্ছিন্ন শাড়িটা এতক্ষণে শুকিয়ে উঠেছে। বড়বৌ জোটনকে এক খোলা চিঁড়া দিল খেতে, সে খেল না। আঁচলে পোঁটলা বেঁধে নিল। পলটু এনে ক'টা কাঁচা সুপারি দিল। আঁচলে তা বেঁধে নিল। রাত হয়ে যাচ্ছিল অনেক। সে কলাপাতা ধুয়ে বসে থাকল—রান্না হলেই সে খেতে পাবে।

জোটন খেতে বসে পেট ভরে খেল। চেটেপুটে খেল। বড় যত্নের সঙ্গে ভাত ক'টি খেল। বেগুনের সঙ্গে ইলিশমাছের স্বাদ এবং আউশ ধানের মোটা ভাত জোটনকে এই পরিবারের সহৃদয়তা সম্বন্ধে অভিভূত করছে। বুড়ো ঠাকরুণ, ধনবৌর উদারতা যেন এই পরিবারের পাগল ঠাকুরের মতো। এই ভোজনের সঙ্গে রাতের জ্যোৎস্না এবং এক পাগল মানুষের অস্তিত্ব, বুড়ো কর্তার সাত্ত্বিক ধারণা, ভূপেন্দ্রনাথের সততা, সব মিলে জোটনকে সুখ দিচ্ছে। আর কতকালের মেমান যেন এইসব পরিবার। সে বড়বৌকে ডেকে বলল, মামি গ, অনেকদিন পরে দুইডা প্যাট ভইরা ভাত খাইলাম। এ খাওয়নের কথা ভুলতে পারি না।

বড়বৌ ওর দুঃখের কথা শুনে বলল, তুই যে বললি, কোন্ দরগার এক ফকিরসাব তোকে নিকা করতে চায়?

—কি যে কন মামি! খোয়াব ত কত দ্যাখলাম গ মামি। কিন্তু আল্লার মর্জি না হইলে আপনে আমি কি করমু!

—কেন, আবেদালি যে বলে গেল ফকিরসাব এসেছিল।

—আইছিল। প্যাট ভইরা ভাত গিলছিল। গিল্যা আমারে কয় কি, আপনে থাকেন, আমি কোরবান শেখের সিন্নিতে যামু। ফিরনের সময় আপনারে লইয়া ফিরমু। এই বইলা নির্ব্বেংশায় আইজ-অ গ্যাছে কাইল-অ গ্যাছে মামি।

—যখন বলে গেছে তখন ঠিকই আসবে।

জোটন আর কোনও কথা বলল না। সে কলা পাতায় সব এঁটোকাঁটা তুলে জামগাছের অন্ধকার অতিক্রম করে বড়ঘরের পিছনে এসে দাঁড়াল। গন্ধপাদালের ঝোপ ছাড়িয়ে সে তার এঁটোকাঁটা নিক্ষেপ করল। জ্যোৎস্না রাত বলে এই ঝোপ-জঙ্গল, দূরের মাঠ, সবুজ ধানখেতের অস্পষ্ট ছবি তার ভালো লাগে। সে হিসাব করে বুঝল প্রায় দু'সাল হবে গতর আল্লার মাশুল তুলছে না। বিশেষ করে এই রাত এবং ঝোপ-জঙ্গলের ইতস্তত অন্ধকারের ছবি অথবা আকণ্ঠ ভোজনে এক তীক্ষ্ণ ইচ্ছা জোটনকে কেমন কাতর করছে। ফকিরসাবকে এ-সময়ে বড় বেশি মনে পড়ছিল।

সে বড় মামির কাছ থেকে একটা পান চেয়ে নিল। কাঁচা সুপারি একটা আস্ত চিবোতে চিবোতে বাগানের ভিতর ঢুকে গেল। এক মন্ত্রবৎ ইচ্ছাশক্তি এই বাগানের ভিতর ওকে কিছুক্ষণ রেখে দিল—যদি একটা পাকা সুপারি, গাছ থেকে টুপ—এই শব্দ ঘাসের ভিতর, সে কান খাড়া করে রাখল—কোথায় টুপ্ এই শব্দ জেগে উঠবে—কখন বাদুড়েরা উড়ে আসবে। কিন্তু একটা বাদুড় উড়ে এল না। টুপ্ শব্দ হল না। শুধু কাঁচা সুপারির রসে মাথাটা কেমন ভারী ভারী, নেশার মতো মনে হল। সে এখন জলে নেমে যাবে। সাঁতার কেটে গ্রামে উঠে যেতে হবে। জ্যোৎস্না রাত। জলে সাদা জ্যোৎস্না এবং জোটন জলে নেমে যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে সে শাড়ি হাঁটুর উপর তুলে ফেলল। যত জলে নেমে যেতে লাগল, তত সে শাড়ি ক্রমে উপরে তুলে তুলে এক সময় কোমরের কাছে নিয়ে এল। না, জল কেবল বাড়ছে। সে শাড়ি খুলে মাথার উপর তুলে একটা গোসাপের মতো জলে ভেসে পড়ল। এক কাপড় জোটনের। ভিজা কাপড়ে রাত্রিবাস বড় কষ্টের।

ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে জোটন দেখল নরেন দাসের বারান্দায় একটা কুপি জ্বলছে। পুবের ঘরে কোনও তাঁতের শব্দ হচ্ছে না। অমূল্য ওদের তাঁত চালায়। অমূল্য বাড়ি গেলে তাঁত বন্ধ থাকে। তাছাড়া সূতা পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। তার জন্যও নরেন দাস রাতে তাঁত বন্ধ করে রাখতে পারে। এখন আর জোটন নলী ভরতে পারছে না। জোটন অনেক কষ্টে একটা চরকা কিনে যখন বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছিল, যখন ভাবল হিন্দু বাড়ির বৌদের মতো ছোট একটা কাঁসার থালা কিনে বড়লোক হবে এবং যখন সূতার মোড়া দু'পয়সা থেকে চার পয়সা হয়ে গেল এবং একজন ফকিরকে পোষার ক্ষমতা হচ্ছে তখন কিনা—বাজারে সূতা পাওয়া যাচ্ছে না।

জোটন জল কাটছিল। দু'হাতে ব্যাঙের মতো জলের ওপর ভেসে ভেসে যাচ্ছে। হাত-পা জলের ভিতর ফুটকরি তুলছে। এই গরমে জলের ঠাণ্ডাটুকু, আকাশের স্বাচ্ছন্দ্যটুকু এবং পুব দিকের বড় চান্দের হাসি জোটনের ভিতর কতদিন পর মাশুল তুলতে বলছে। আকণ্ঠ খেয়ে শরীরে এখন কত রকমের শখ জাগছে। দূরের মাঠে একটা আলোর ফুলকি। সামনে সব পাটের জমি। পাট কাটা হয়ে গেছে—জল স্বচ্ছ। হাওয়ায় জল থইথই করছে চারদিকে। স্বচ্ছ জলে জোটন শরীরের উত্তাপ ঢালছিল—য্যান কতকাল গাজীর গীদের বায়নদারের মতো সূর্যের উত্তাপ না পেয়ে অবসন্ন। সে এসময় একমুখ জল নিয়ে আকাশমুখো ছুঁড়ে দিল। বলল আল্লা, তর দুনিয়ায় আমার কি কামডা থাকল ক'দিনি!

আকাশে জ্যোৎস্না। জলে শাপলা-শালুক রয়েছে আর মাঠ শেষে আম-জামের ছায়া প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে। শাপলাফুলের মতো সে জল থেকে মুখটা তুলে দুটো মান্দার গাছ অতিক্রম করতেই দেখল, গোপাটের বটগাছটার নিচে একটা হ্যারিকেন এবং নৌকার ছায়া। একটা মানুষেরও যেন। সে তাড়াতাড়ি জলের ভিতর হারিয়ে যাবার জন্য ঘাসের বনে শরীর আড়াল করে দিল। কিন্তু পালাবার সময় জলে শব্দ। বুঝি একটা মাছ পালাচ্ছে! অথবা বঁড়শীতে, বোয়ালের বঁড়শীতে বড় বোয়াল মাছ আটকে গেছে। মানুষটা নৌকা নিয়ে মাছের খোঁজে এসে দেখল কে এক মানুষের মতো ঝোপে-জঙ্গলে জলের ভিতর ভেসে যাচ্ছে। জোটন তাড়াতাড়ি গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে শ্যাওলার জঙ্গলে শরীর লুকোতে চাইল —কিন্তু পারল না। ওর মুখের ওপর লণ্ঠন তুলে মনজুর বলছে, জোটন তুই!

জোটন শরমে চোখ বুজে ফেলল। চোখ বুজেই বলল, হ আমি!

—কই গ্যাছিলি?

—গ্যাছিলাম ঠাকুরবাড়ি। পথ ছাড়, যাই।

মনজুর জলের ভিতর ওর অবস্থা বুঝে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। সে মুখ ফেরাল না। অথচ বলল আমি ভাবলাম বুঝি বড় একটা মাছ বঁড়শীতে ধরা পড়ছে।

—আর কিছু ভাবস নাই।

—আর কি ভাবমু। বলে সে নৌকাটার উপর বসল।

—ক্যান, অন্য কিছু ভাবন যায় না। তুই ইদিকে ক্যান! বলে জোটন চোখ খুলল। কথাবার্তায় যেন সব সঙ্কোচ কেটে গেছে। দেখল, মনজুর খালি গায়ে। পরনে অত্যন্ত মিহি গামছা। তাও জলে ভিজে খানিকটা উপরে উঠে গেছে। মনজুর কিছুতেই জোটনের দিকে তাকাচ্ছে না। জোটনের ভারি হাসি পেল। তর ত ম্যালা পয়সা। একটা বড় গামছা কিনতে পারস না?

মনজুর বলল, তুই যা দিনি।

—যামুনা ত, কি করবি। জোটনের ভিতর ইচ্ছাটা বড় চাড়া দিচ্ছে!

—কি আবার করমু! সে তার এই পরিস্থিতির জন্য অজুহাত দেখাল। বলল, হাইজাদি গ্যাছিলাম। ওষুধ আনতে। ফিরতে রাইত হইয়া গ্যাল। গোপাটে আইছি বঁড়শীতে মাছ লাগছে কিনা দ্যাখতে। আইয়া দ্যাখি তর এই কাণ্ড। জ্যোৎস্না রাইতে জায়গাটারে আনধাইর কইরা আছস। তর লগে দ্যাখা হইব জানলে তফন পইরা আইতাম।

মনজুর জোটনের সমবয়সী। শৈশবের কিছু ঘটনা উভয়ে এ-সময় স্মরণ করতে পারল। একদা শৈশবে এইসব পাটখেতের আলে-আলে ওরা ঘুরে বেড়িয়েছে। জোটন সেইসব স্মৃতির কথা স্মরণ করতে চাইল অথচ সঙ্কোচবোধে কিছু বলতে পারছে না। দু'সালের অধিক এই শরীর জ্বলে-জ্বলে খাঁক্। জোটন কাতর গলায় বলল, পথ দে। যাই।

—তরে ধইরা রাখছি আমি?

জোটন এই জল দেখে, রাতের জ্যোৎস্না দেখে এবং আকণ্ঠ ভোজনে কি যে তৃপ্তি শরীরে—জোটন কিছুতেই নৌকা অতিক্রম করে সাঁতার কাটতে পারল না। শরীর ওর ক্রমে কেমন জলের ওপরে ভেসে উঠছিল। জলের ওপর ব্যাঙের মতো যেন একটা সোনালী ব্যাঙ জোনাকি খাবার জন্য জলে ভেসে হাঁ করে আছে। মনজুর কোনও কথা বলছে না দেখে সে-ই বলল, আসমানের চান্দের লাখান তর মুখখান। কিন্তু দেইখা ত এহনে মনে হয় অমাবস্যার আনধাইর রাইত। য্যান ডরে শুকাইয়া গ্যাছে।

—শুকাইয়া গ্যাছে! তরে কইছে।

মনজুর ওর রুগ্ন বিবির মুখটা স্মরণে এনে কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। দীর্ঘদিন বিবির রুগ্ন শরীর ওর গরম কল্‌জের ভিতর জল ছিটাতে পারেনি। শুধু মনজুর জ্বলছে, জ্বলছে। একটা, সাদির যে শখ ছিল না—তা নয়, তবু মনজুর বিবিকে যথার্থই ভালোবাসে। মনজুর অনেক কষ্টে যেন বলল, পারবি আনধাইর রাইত আলো করতে! এবং মনজুর মুখ ফেরাতেই আবার শরীরটাকে জলের ভিতর জোটন ডুবিয়ে দিল। সামনে পিছনে জলজ ঘাস। বেশ আব্রু সৃষ্টি করেছে। জোটন এই জলজ ঘাসের ভিতর মনজুরকে নিয়ে ডুব দিতে চাইল। আর মনজুর সহ্য করতে না পেরে দু'হাতে যেন একটা মরা মাছ নৌকায় তুলে আনছে—টানতে-টানতে নৌকার পাটাতনে তুলে ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে পাটখেতের ফাঁক দিয়ে কেমন একটা কান্নার শব্দ গ্রাম থেকে ভেসে আসতে থাকল। জোটন শুনতে পাচ্ছে, মনজুর শুনতে পাচ্ছে। নৌকার ওপর কিছু পোকা উড়ছিল। ধানের জমিতে চাঁদের আলো বড় মায়াময়। সুখ অথবা আনন্দ এই পাটাতনে এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। সব দুঃখ ভেসে যাচ্ছিল জলে, সব উত্তাপ চাঁদের আলোর মতো গলে-গলে পড়ছে। ইচ্ছার সংসারে মনজুর পুতুল সেজে বিবির মরা মুখ দেখতে দেখতে বলল, ক্যাডা ক্যান্দে ল।

—মনে হয় তগ বাড়ি থাইক্যা আইতাছে।

—তবে বিবিডা বুঝি গ্যাল।

জোটন দেখল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মতো মনজুরের মুখ। সব উত্তাপ এখানে ঢেলে দিয়ে মনজুর হাউহাউ করে কাঁদছে আর নৌকাটা বাইছে।

কুকুরটাকে ফেলে দিয়ে গেছে কারা। জলের ভিতর ফেলে দিয়ে নৌকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। কুকুরটা আপ্রাণ বাঁচার জন্য জলে সাঁতার কাটছে। কোনওরকমে নাকটা জাগিয়ে রেখেছে জলে। তারপর মনে হল টানমতো জায়গা। কুকুরটা সামান্য উঠে দাঁড়াল। না, দূরে কোনও গ্রাম দেখা যাচ্ছে না। হতাশায় চোখ-মুখ কাতর। শেষ বর্ষা এখন। জল, ধানখেত থেকে পাটখেত থেকে নেমে যাচ্ছে।

পাগল ঠাকুর তখন নৌকাটাকে আলে আলে টেনে নিচ্ছিলেন। সোনা পাটাতনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। ধানগাছ হেলে পড়ছে। শ্রাবণ-ভাদ্রের সেই স্বচ্ছ ভাবটুকু আর নেই। জল ঘোলা। জলে পচা গন্ধ উঠছে। দু'ধারে কাদা জল, শামুক পচা দুর্গন্ধময় জলজ ঘাস। নৌকাটাকে কবিরাজের জমিতে ঢুকিয়ে দিতেই মনে হল একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। চোখে-মুখে কাতর চেহারা। কুকুরটা পাগল ঠাকুরকে দেখে বলল, ঘেউ।

পাগল ঠাকুর দাঁড়ালেন। তারপর পুরানো কায়দায় হাত কচলে বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

কুকুরটা ফের বলল, ঘেউ!

পাগল ঠাকুর বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

জল কম বলেই আলের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে কুকুরটা। একপাশে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়ার জায়গা করে দিয়েছে। কুকুরের এই ভদ্রতাটুকু পাগল ঠাকুরের ভাল লাগল। তিনি আর তাকে মন্দ কথা বললেন না। তিনি পাশ কাটিয়ে নৌকা টেনে নেবার সময়ই কি মনে হতে পেছনে তাকালেন—কুকুরটা অবোধ বালকের মতো তাকিয়ে আছে। তিনি এবার আদর করার ভঙ্গিতে মুখে এক ধরনের শব্দ করতেই, জলের ভিতর ছপছপ শব্দ তুলে কুকুরটা পাশে এসে দাঁড়াল। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ কুকুরটার মুখে চুমু খেলেন এবং নৌকায় তুলে বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

কুকুরটা পাটাতনের এক পাশে দাঁড়াল। গা ঝাড়ল। তারপর লম্বা হয়ে আড়মোড়া ভাঙল এবং জিভটা বের করে রাখল কিছুক্ষণের জন্য। পাগল ঠাকুর এবং সোনাকে দেখতে দেখতে হাঁপাচ্ছে। কুকুরটা লেজ নাড়ছে অনবরত। মণীন্দ্রনাথ তখন লগি মারছেন।

মণীন্দ্রনাথ শালুকের ফল তুলে খেলেন। ফল ভেঙে সোনাকে খেতে দিলেন। সোনা শক্ত জিনিস এখনও খেতে পারে না। সে খেতে গিয়ে বিষম খেল। ওর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তিনি ওকে কোলে নিয়ে একটু আদর করলেন।

দুটো জমি পার হলে হাসান পীরের দরগা। শীতের শেষে তিনি এখানে ঘুরে গেছেন। তখন পীরের মেলা ছিল, সিন্নি ছিল। গ্রাম পার হয়ে মানুষেরা এসেছিল এবং মোমবাতি জ্বেলে সওদা করে ঘরে ফিরেছিল। এখন কোনও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। শুধু ভাঙা-মসজিদ এবং পীরসাহেবের কবরের পাঁচিলে কয়েকটা কাক অনবরত উড়ছে, সোনার কিছুতেই কান্না থামছে না। তিনি এক হাতে সোনাকে বুকে নিয়ে অন্য হাতে লগি বাইতে থাকলেন। হাসান পীরের নির্জন দরগাতে নৌকা ভিড়িয়ে এক সময় ভিতরে উঠে গেলেন।

কাকগুলি পাঁচিলের উপর চিৎকার করছে। পীরসাহেবের কবরের পাশে পলাশ গাছটা এখনও তেমনি আছে। পাগল মানুষটাকে দেখে কাকগুলি পলাশ গাছটার উপর এসে বসল। ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দূরের মাইনর স্কুলটা দেখা যাচ্ছে। মণীন্দ্রনাথ হেঁটে-হেঁটে একদা এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে আসতেন।

ভিটেমাটির মতো এই জমিটা উঁচু! কয়েকটা আমগাছ কিছু পাখপাখালি, বেতঝোপ, কাঁকড়া, সাপ এবং মোত্রাঘাসের জঙ্গল নিয়ে পীর সাহেব কবরের নিচে ঘুমোচ্ছেন। বন্যার জল পীরসাহেবকে ছুঁতে পারে না। তখন অদূরের নদী-নালার কচ্ছপেরা পর্যন্ত নরম মাটির খোঁজে পীরসাহেবের কাছে চলে আসে। ডিম পাড়ার জন্য আশ্রয় চায়, ডিমে তা দেবার জন্য আশ্রয় চায়। অঘ্রান মাস, বেলা পড়তে দেরি নেই। সোনা তখনও কাঁদছিল। কুকুরটা ওদের পায়ে পায়ে হাঁটছে। কবরখানায় দুটো একটা পাতা ঝরে পড়ল। হেমন্তের শীত ভাবটা সকল ঘাস পাখি এবং পীরসাহেবের পাঁচিলের গাঁয়ে জড়িয়ে আছে। পাঁচিলের নিচে কতরকমের গর্ত। কবরের বেদী থেকে ভাঙা কাঁচ আলগা হয়ে গেছে।

মণীন্দ্রনাথ সোনাকে কোলে নিয়ে এই পাঁচিলের চারদিকে ঘুরতে থাকলেন। কাকগুলি নির্জন নিঃসঙ্গ দরগায় সহসা মানুষ দেখে কেমন ক্ষেপে গেল। ওরা মণীন্দ্রনাথের মাথার উপর ঘুরে-ঘুরে উড়তে থাকল। কতদিন অথবা দীর্ঘ সময় বাদে মণীন্দ্রনাথ পীরসাহেবের দরগাতে এসেছেন, কতদিন অথবা দীর্ঘ সময় বাদে মণীন্দ্রনাথ পীরসাহেবকে গলায় দড়ি দিয়ে মরার কারণটা জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন।

সোনা এখন আর কাঁদছে না। পাগল ঠাকুর সোনাকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন। কুকুরটা এতক্ষণ পায়ে-পায়ে ঘুরছিল। মণীন্দ্রনাথ সোনাকে রেখে একটু হেঁটে গেলেন সামনে। কুকুরটা সোনার পাশে বসে থাকল। এতটুকু নড়ল না। ঘাসের ওপর শুয়ে সোনা হাত-পা ছড়িয়ে এখন খেলছে। মণীন্দ্রনাথ যেন কোথায় যাচ্ছেন। তিনি পাঁচিলের দরজা টপকে ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। যেন বলতে চাইলেন, পীরসাহেব, তোমার দরগাতে মেলা বসেছে, তুমি হিন্দু-মুসলমান সকল মানুষের পীর, তুমি

গলায় দড়ি দিলে কেন, বলে বেদীটার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং একটা শুকনো ডাল এ সময় অন্য পাশে ভেঙে পড়ায় তিনি দেখলেন, ছাতিম গাছের মগডালে কিছু শকুন বাসা বেঁধেছে।

পাগল মানুষ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। বলার ইচ্ছা যেন, পীরসাহেব ভিতরে আছেন। তিনি বেদীটার পাশে বসলেন এবং কান পাতলেন মাটিতে—পীর সাহেবের মুখটা মনে করতে পারছেন, বুড়ো অথর্ব তখন পীরসাহেব। মণীন্দ্রনাথ দূরের বিদ্যালয় থেকে পাঠ নিয়ে ফেরার পথে এই দরগাতে এসে পীরসাহেবের দাড়ি-গোঁফবিহীন মুখটা দেখতেন। এবং সেই পীরসাহেব একদিন কেন যে রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে ছাতিম গাছটায় ঝুলে থাকলেন! হায়! ঈশ্বর জানেন, এমন মানুষ হয় না এবং কথিত ছিল পীরসাহেবের আহারের প্রয়োজন হতো না। পীরসাহেবের হুঁকো কল্কে কোমরে বাঁধা থাকত। তিনি এই দরগার চারপাশে ঘুরতেন শুধু এবং রাতের অন্ধকারে যখন দূরে দূরে শুধু ইতস্তত গয়না নৌকার আলো, দূরে দূরে সব গ্রাম গভীর মায়ায় আচ্ছন্ন তখন তিনি শাক পাতা অথবা পুরানো ছাতিম গাছের ডাল বেয়ে উঠে শকুনের ডিম অন্বেষণ করতেন, কচ্ছপেরা এই দরগাতে অথবা খালের ধারে হেমন্তের শেষে, শীতের প্রথমে ডিম পেড়ে রেখে যেত—তাও অন্বেষণ করে ঘরে তুলে রাখতেন।

এখন আর সেসব শাক-পাতার গাছ এই দরগাতে নেই। হেজে মজে গেছে। বর্ষাকাল গেছে বলেই দরগার চারধারে নানারকমের আগাছার জঙ্গল—কিছু ঘাসের চিহ্ন। নরম ঘাসে সোনা ঘুমোচ্ছে—এই সময় সোনার কথা মনে হওয়ায় তিনি পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। যখন দেখলেন সোনা ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে, কুকুরটা পাহারায় আছে, তখন তিনি ফিরে এলেন। পাঁচিলটার ভিতরের দিকে প্রচুর জায়গা। বড় বড় গর্ত, কবর থেকে যেন ঢাকনা খুলে কারা মানুষ তুলে নিয়ে গেছে। বড় বড় শান পড়ে আছে। শান দিয়ে ঢেকে দিলেই একটা মানুষ গায়েব। কেউ জানবে না শানের নিচে একটা মানুষ আটকা পড়েছে। প্রচুর জায়গা দেখে, ঘর করে এখন কেমন এই দরগায় বসবাসের ইচ্ছা মণীন্দ্রনাথের। মেলার সময় যেখানে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়, পীরসাহেবের নামে সিন্নি চড়ানো হয়, সেই জায়গাটুকু শুধু পরিষ্কার। সেই জায়গাটুকুতে দূর্বাঘাস এবং সেই জায়গাটুকুতেই একটা কুঁড়েঘর ছিল, ভাঙা হাঁড়ি কলসি ছিল, কিছু দ্রব্যগুণ ছিল পীরসাহেবের—যার দৌলতে হাসান চোর ফকির হল এবং এক সময় পীর বনে গেল। মালা, তাবিজ, নানারকমের হাড় সংগ্রহের বাতিক ছিল হাসানের। গোর দেবার সময় সবই ওর কবরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন লম্বা বেদীর ওপর শকুনেরা শুধু হাগছেই। কাক এবং অন্য পাখ-পাখালি—যেমন শালিকের কথাই ধরা যাক, বড় বেশি ভিড় করছে এই দরগাতে। আর এই হাসান পীরই বলেছিলেন, তর যা চক্ষু মণি, চক্ষুতে কয় তুই পাগল বইনা যাবি।

—কি যে কন পীরসাহেব!

—আমি ঠিক কথাই কই ঠাকুর। তর সব লিখাপড়া মিছা। পীর-পয়গম্বর হইতে হইলে তর মত চক্ষু লাগে, তর শরীর মুখ লাগে। তর মত চক্ষু না থাকলে পাগল হওন যায় না, পাগল করণ যায় না।

আর ফোর্ট উইলিয়ামের র‍্যামপার্টে বসে পলিন বলত, তোমার চোখ বড় গভীর বড় বিষণ্ণ মণি। ইওর আইজ আর গ্লুমি। অথবা বোটানিক্যালের পুরানো বটের ছায়ায় পলিন ববকাটা চুলে বিলি কেটে মিহি ইংরাজিতে উচ্চারণ করত, এস, আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসে কীট্‌সের কবিতা আবৃত্তি করি। 'দেয়রস নান আই গ্রীভ টু লিভ বিহাইন্ড বাট ওনলি, ওনলি দি'। তখন দূরের নারকেল গাছ অথবা গঙ্গাবক্ষে জাহাজের বাঁশি এবং সমুদ্র থেকে আগত সব পাখিদের পাখার শব্দ উভয়কে অন্যমনস্ক করত। ওরা তখন পরস্পর নিবিষ্টভাবে পরস্পরকে দেখত। কবিতা উচ্চারণের পর পাখির পালকের মতো উভয়ে হালকা এক বিষণ্ণতায় ডুবে থেকে কথা বলত না।

পলিন বলত, চলো এইসব জাহাজে উঠে আমরা অন্য কোনও সমুদ্রে চলে যাই। মণীন্দ্রনাথ এই দরগায় বসে সেই সব স্মৃতিতে এখন কাতর হচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছার ঘরে পলিন...১৯২৫-২৬ সাল, পলিন তখন তরুণী, প্রথম মহাযুদ্ধে পলিনের দাদার মৃত্যু এবং সেই পরিবারে কোনও রাতের আঁধারে মোমবাতির সামনে যীশুখ্রিস্টের ছবি, হাঁটু গেড়ে পলিনের বসে থাকা—কি সব স্মৃতি যেন বার বার মাথার ভিতর ভেসে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। মণীন্দ্রনাথ কিছু মনে করতে পারেন না। তাঁর এখন কেবল ভালোমানুষের মতো কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, ইচ্ছা হচ্ছিল এই দরগার মালিক হাসান পীরকে বলতে, আবার সেখানে ফিরে-যেতে পারি না পীরসাহেব? অথচ কথা বলার সময় সেই এক উচ্চারণ। আর এ-সময় পাখিরা উড়তে থাকল। হেমন্তের রোদ নেমে গেছে। বর্ষার জল এখন জলাজমিতে হাঁটু জলে এসে থেমেছে। ছোট ছোট চাঁদা মাছ, বৈচা মাছ ধানের গুঁড়িতে লেজ নেড়ে শ্যাওলা খাচ্ছে। শীতের এই আমেজ সকল প্রাণী-জীবনে শুভ এক বার্তা বয়ে আনছে। তবু অনেক মোত্রাঘাস পেরিয়ে, অনেক বন-জঙ্গল পেরিয়ে, নদী-নালা অতিক্রম করে শুধু সেই ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ, তার সবুজ মাঠ এবং গম্বুজের মাথায় জালালি কবুতর উড়ছে—মণীন্দ্রনাথ দরগার বেদীতে বসে এখন কেবল দুর্গের মাথায় সূর্য দেখছেন। যেন পলিন সেই সূর্যের আলো এই অবেলায় দরগার মাঠে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সোনা বসে নেই, অথবা হামাগুড়ি দিয়ে সোনা এগিয়েও যাচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কুকুরটা বসে রয়েছে। নড়ছে না। তবুও যেন কেমন ঘুম পাচ্ছে। কুকুরটা চোখ বুজেছিল। মণীন্দ্রনাথ আরও দেখলেন হেমন্তের রোদ খুব সরু হয়ে পাঁচিলের গায়ে লেগে আছে। সোনার জলের মতো এই রেখা চিকচিক করছে। মণীন্দ্রনাথ পলাশের ডাল ফাঁক করে আকাশের ভিতর মাথা গুঁজে দিলেন এবং সেই আলোর জল যেখান থেকে ঝরে পড়ছে, তাকে দু'হাতে ধরতে চাইলেন। বড় উষ্ণ মনে হচ্ছে সেই আঁধারকে। সুতরাং লাফ দিয়ে পাঁচিল টপকালেন। তারপর দু'হাত ওপরে তুলে সেই আলোর ঘর সূর্যকে ধরার জন্য ছুটতে থাকলেন। অথচ যত এগোচ্ছেন সূর্য তত ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ঘাস জঙ্গল পার

হলেই দরগার জমি শেষ। তিনি ক্রমশ মাঠে নেমে যেতে থাকলেন, মাঠে হাঁটুজল, জল ভেঙে এগুতে থাকলেন—যেন ঐ সূর্য পালিয়ে যাচ্ছে যে রথে, তিনি সেই রথে এখন উঠে যাবেন এবং অশ্বের বল্গা ধারণ করবেন। তারপর সূর্যকে নিয়ে সেই নিরুদ্দেশে, যেখানে পলিন এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। আর তা যদি না হয় এই সূর্যকে এনে অশ্বত্থের ডালে ঝুলিয়ে দেবেন। এই ধরিত্রীর সব লাঞ্ছনা দূর করতে, অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে সূর্যকে ধরে আনবেন। অর্থাৎ তিনি যেন ধরিত্রীকে সব কলুষ-কালিমা থেকে রক্ষা করার জন্য অথবা এক প্রিয় নিদর্শন রাখার জন্য পাগলের মতো ধানখেত, শীতল জল এবং খাল-বিল সাঁতরে যখন ট্যাবার পুকুরপাড়ে উঠলেন তখন দেখলেন সূর্য পলাতকের মতো গাছগাছালির অন্য প্রান্তে নেমে গেছে। তিনি সূর্যকে ওপারে বিলের জলে অদৃশ্য হতে দেখে ভেঙে পড়লেন। পরাজিত সৈনিকের মতো একটা গাছে হেলান দিয়ে যেন বন্দুকের নল হাতে রেখেছেন এমন ভাবের এক ভঙ্গি টেনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। চারপাশে রাতের সব কীটপতঙ্গের আওয়াজ আর তার সঙ্গে অতিদূর থেকে আগত এক শিশু কান্না। তাঁর মাথার ভিতর ফের যন্ত্রণা হতে থাকল। পিছনে যেন কি ফেলে এসেছেন, একেবারেই মনে করতে পারছেন না। এতদূর থেকে কান্না সেই শিশুর, মনে হয় মাঠময় হাজার শিশু উচ্চরোলে কাঁদছে। তাঁর কিছুই মনে পড়ছে না। কর্দমাক্ত পথে তিনি বাড়ি ফিরে যাবেন। পথটা তাঁর খুবই চেনা। চারদিকে অন্ধকার নেমে আসছে, অথচ দূর থেকে আগত শিশু কান্নার জন্য ব্যথিত হচ্ছিলেন। বিকেলে সোনা যে একা বসে বসে বারান্দায় খেলছিল, পাগল-জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কথা বলছিল এবং তিনি যে তাকে আদর করে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বের হয়েছেন, সকলের অলক্ষ্যে নৌকা নিয়ে—সোনা দ্যাখো, কত জমিন মাঠ, এই মাঠ এবং জমির ভিতর তুমি বড় হবে, এই তোমার জন্মভূমি, মায়ের চেয়ে বড়, ঈশ্বরের চেয়ে সত্য এই ঘাস ফুল মাটি—অথচ এখন কিছুতেই সেসব তিনি মনে করতে পারছেন না—কখন ঘর থেকে বের হয়েছেন, কে, কে তাঁর সঙ্গে ছিল!

কুকুর, সোনা এবং কোষা নৌকাটা দরগার মাটিতে পড়ে থাকল। দরগার মাটিতে হাসান পীরের স্পর্শ ওদের জন্য থাকুক।

ছাতিমের ডালে শকুনের আর্তনাদ—এইসব নির্জন নিঃসঙ্গ গ্রামকে ভয় দেখাচ্ছে। আর মণীন্দ্রনাথ ঘরে ফিরেই দেখলেন—সব মানুষ ছোটাছুটি করছে। প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হয়েছে। সোনা কি করে নিখোঁজ হয়ে গেছে সংসার থেকে। ধনবৌ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, পাগল মানুষ বাড়ি একা ফিরেছেন, কোষা নৌকা আনেননি। ধনবৌ, বড়বৌ সকলেই কাঁদছিল। অন্ধ মানুষ মহেন্দ্রনাথ উঠোনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মণীন্দ্রনাথ বুঝলেন—বাড়ি থেকে সোনা হারিয়ে গেছে। ওরা সকলে মিলে সোনাকে অন্বেষণ করছে। এবার মণীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সব মনে করতে পারলেন, ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে জলে নেমে গেলেন। হাঁটুজল ভেঙে যত এগুতে থাকলেন, তত কুকুরের আর্তনাদ স্পষ্ট হতে থাকল। তত তিনি বলতে চাইলেন যেন—হাসান পীর, তুই আছিস, তোর দরগা আছে, আমার সোনা তোর কাছে গচ্ছিত আছে। তিনি অন্ধকার পথে ছুটে চললেন। তিনি জল-

কাদা ভেঙে ছুটলেন। তিনি ঘেমে যাচ্ছেন। কাদা জলে মুখ-শরীর ভরে যাচ্ছে। তিনি শুধু এখন কুকুরের ডাক অনুসরণ করে হেঁটে যাচ্ছেন। হাতে কোনও লণ্ঠন নেই—কোনও পরিচিত শব্দ পাচ্ছেন না। থেকে থেকে দূরে শেয়ালের আর্তনাদ। একটা কুকুর কী করে পারবে এত শেয়ালের সঙ্গে। সোনা, সোনারে! কেমন ভালোমানুষের মতো মুহূর্তে আবেগ ভরে ডেকে ফেললেন। আমি তোকে জঙ্গলে ফেলে এসেছি। আর কিছু বলতে পারলেন না। আলো ছিল না, তবু নক্ষত্রের আলোতে তিনি পথ চিনে নিতে পারছেন। অবশেষে তিনি আরও কাছে গিয়ে বললেন গ্যাৎচোরেৎশালা। তিনি জোরে জোরে একই উচ্চারণে ডাকলেন অথচ কুকুরটা কাছে আসছে না। পাঁচিলের কোন এক গহ্বর থেকে কুকুরটা যেন ডাকছে। তিনি ভিতরে ঢুকে দেখলেন, সোনা হামাগুড়ি দিচ্ছে আর কাঁদছে। কুকুরটা পাশে পাশে থাকছে। অনবরত কান্নায় ভেঙে আসছে গলা। শুধু গলাতে এখন একটা হিক্কার শব্দ। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সোনাকে বুকে তুলে নিলেন এবং আদর করতে থাকলেন। সোনার হাত মুখ স্পর্শ করে, অক্ষত সোনার শরীরের জন্য এক অপার আনন্দ—ধনবৌর মুখ, ব্যথিত সংসার আর কুকুরটাকে কাছে টেনে এক নতুন সংসার—বার বার তিনি কৃতজ্ঞতায় কুকুরটাকে চুমু খেয়ে কেমন পাগলের মতো ছুটে গিয়ে কোষা নৌকাটাতে উঠতেই শুনলেন, একদল ধূর্ত শেয়াল পাঁচিলের পাশে হুক্কাহুয়া করছে। তিনি আকাশ এবং দরগার ভাঙা কাচের স্বচ্ছ ভাবকে মথিত করে হেসে উঠলেন। কুকুরকে বললেন, আকাশ দ্যাখো, সোনাকে বললেন, নক্ষত্র দ্যাখো—ঘাস ফড়িং-ফুল-পাখি দ্যাখো, জন্মভূমি দ্যাখো। তার পর নিজে দেখলেন আকাশের গায়ে লেখা রয়েছে—সোনার মুখ, পলিনের চোখ। কুকুরটা পাটাতনে দাঁড়িয়ে নীরবে লেজ নাড়ছে।

আরও কিছুকাল পরে। সোনা নিবিষ্ট মনে তরমুজ খেতে বসে মাটি খুঁড়ছিল। বেলে মাটি, সুতরাং সে অনেকটা মাটি তুলে ফেলল। সোনালি বালির চর এখন শুকনো। চর পার হলে নদীর জল পাতলা চাদরের মতো, তিরতির করে কাঁপছে।

স্বচ্ছ জলে ছোট ছোট মালিনী-মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। সোনা ছোট একটা নারকেলের মালার সাহায্যে জল নিয়ে এল নদী থেকে। ছোট গর্তটা জলে ভরে দিল। যেহেতু নদীতে হাঁটুজল, পার হয় গরু, পার হয় গাড়ি, সেজন্য হাঁটু জলে নেমে একটা মালিনী-মাছ ধরল সোনা। মাছটা অঞ্জলিতে রেখে সে নদী থেকে প্রথমে গর্তটার সামনে এসে দাঁড়াল। জলে মাছটা ছেড়ে খরগোশের মতো মাথা উঁচু করে দিল তরমুজ পাতার ভিতর থেকে; দেখল, দূরে ছই-এর নিচে বসে ঈশম দাদা তামাক খাচ্ছে। সোনার প্রতি অথবা তরমুজের প্রতি যেন সে লক্ষ রাখছে। সোনা তরমুজ-পাতার আড়ালে নিজেকে আর একটু ঢেকে ফেলল। ছোট শরীর সোনার। শরীরের রঙ বালির চরের মতো। সোনার পা খালি এবং এটা বসন্তকাল। নদীর চর থেকে বসন্তকালীন হাওয়া উঠে আসছে। বাতাস জোর বইছিল বলে তরমুজের পাতা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য পাতার ফাঁকে সোনার শরীর স্পষ্ট। পাতার ফাঁকে সোনাকে নিবিষ্ট মনে বসে থাকতে দেখে ঈষৎ চিন্তিত হল ঈশম। সে ভাবল—সোনাডা আবার বইসা বইসা তরমুজের লতা উপড়াইতাছে না ত! সে ছই-এর ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হল। ডাকল, সোনা কর্তা কই গ্যালেন?

সোনা তাড়াতাড়ি পাতার ভিতর আরও লুকিয়ে গেল। প্রথমত, সে একা একা বাড়ি থেকে এ জগতে চলে এসেছে, দ্বিতীয়ত, সে একটা গর্ত করে নদী থেকে জল এনে পুকুর তৈরি করছে। পুকুর তৈরি করতে গিয়ে দুটো তরমুজের লতা উঠে এসেছে। এসব অপরাধবোধ ওর মনে কাজ করছে। সে একবার পাতার ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু করে দেখল, ঈশম তাকে খোঁজবার জন্য এদিকেই আসছে। সোনা তাড়াতাড়ি পাতার ফাঁকে মাটির সঙ্গে মিশে হামাগুড়ি দিতে থাকল। ঈশম যত ওর দিকে এগিয়ে আসছে তত সে পাতার আড়ালে উপরে উঠে যব খেতের ভিতর ঢুকে গেল এবং চুপচাপ বসে থাকল।

ঈশম যেখানে সোনাকে বসে থাকতে দেখেছিল এখন সেসব জায়গা নির্জন। দুটো তরমুজের লতা উপড়ানো। একটা ছোট গর্তে কিছু জল এবং একটা মালিনী-মাছ ভেসে

বেড়াচ্ছে। জলটা ক্রমশ কমে আসছে। মাছটা যেন উঁকি দিয়ে ঈশমকে দেখতে পেয়ে জলের খোলাটে অন্ধকারে লুকাল। ঈশম ফের ডাকল, সোনা কর্তা আমার, কই গ্যালেন?

যেখানে নদীর পাড় ক্রমশ উঁচু হয়ে গ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে সেখানে যবের খেত,গমের খেত। খেত পার হলে গোপাট। কবিরাজবাড়ি। নীল রঙের ডাকবাকস। এখন যব গম কাটার সময়। কিছু গাঙশালিক যব গম খেতে উড়ছে। ঈশম ফের ডাকল সোনা কর্তা, কই গ্যালেন গ! আমি আপনের লগে পারি! আইয়েন কর্তা, আইলে কান্দে লইয়া নদী পার হমু।

সোনা ডাক শুনতে পেল কিন্তু আড়াল ছেড়ে এতটুকু নড়ল না। ঈশমের সঙ্গে এখন ওর পলান্তি খেলার শখ যেন। সে যব খেতের ভিতর আরও ঘন হয়ে বসল। সে বসে বসে শুকনো ঘাস ছিঁড়তে থাকল। যব গাছ নড়ছিল। ঈশম জমির আল থেকে টের করতে পারছে সব। সে দ্রুত হেঁটে এসে ঘব খেতে ঢুকে সোনাকে সাপটে ধরল এবং বলল, এহনে যাইবেন কইগ কর্তা?

সোনা হাত ছুঁড়ছিল যব খেতের ভিতর। ওর চিৎকারে যব গম খেত থেকে সব গাঙশালিক বিকেলের রোদে উড়ে গেল।

—আমারে ছাইড়া দ্যান।

ওরা উড়ে উড়ে নদীর চরে নেমে গেল। সোনা বলল, না যামু না।

—আপনারে আমি কিছু কইছি? আইয়েন আমার লগে। ছই-এর নিচে বসুম, আসমান দ্যাখমু। বলে, সোনাকে কাঁধে তুলে হাঁটতে থাকল ঈশম।

সোনার এখন আর পরাজিত ভাবটুকু নেই। সে কাঁধে পা দোলাতে থাকল। সোনালী বালির নদীতে জল, কিছু নৌকা, কিছু গ্রামের মানুষ দেখল সোনা। বসন্তের বাতাস এখন যব, গম খেতে ঢুকে অদৃশ্য হচ্ছে। নদীর পাড় ধরে যত দূর চোখ গেল শুধু যব গমের পাকা শীষ, কিছু হিজল গাছ এবং তার পাতা গাছের নিচে বিছানো শতরঞ্জের মতো। সোনা বলল, রাইতে আপনের একলা ডর করে না?

—না গ কর্তা! আল্লা ভরসা। ডরে ধরলে আল্লার নাম লই।

—নিশিতে যদি ধইরা লইয়া যায়?

—আমারে নিব না।

—নিব, দেইখেন। নিশিতে ধবলে আপনে ট্যার-অ পাইবেন না।

—আমারে নিব না। নিশি ব্যাডা আমার মিতা।

—তবে মায় যে কয়, তুমি একলা কোনখানে যাইঅ না সোনা। নিশিতে ধইরা লইয়া যাইব-অ। নিশি নাকি ইচ্ছা করলে মার মত হইতে পারে, আপনের মত হইতে পারে।

—তা হইতে পাবে।

—আমি আর কোনখানে যামু না।

—আব যাইয়েন না।

এবার সোনা ঈশমের মুখ দেখার চেষ্টা করল। চারপাশে মাঠ। ওর নানা রকমের ভয়ডরের কথা মনে হল। যবের শীষ ওর শরীরে লাগছে। ওর শরীর চুলকাচ্ছিল। ঈশমের কাঁধ থেকে নেমে সোনা তরমুজ খেতের ভিতর ঢুকে গেল। সে বলল, আমি একলা যামু না বাড়িতে। আপনের লগে যামু ঈশম দাদা। তারপর সে তার প্রিয় মাছটিকে খুঁজতে থাকল। ঈশমকে বলল, আপনে যান ছই-এর ভিতর, আমি পরে আইতাছি। সে একটা তরমুজের ওপর বসে গর্তের ভিতর মাছটাকে খুঁজতে থাকল। জলের নিচে মাছটা এখন লুকোচুরি খেলছে। সে গ্রামের দিকে তাকাল, বেলা পড়ে আসছে। তরমুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ জলের রেখার মতো বেয়ে বেয়ে নামছে। সে দেখল একটা বড় তরমুজ, পাতার উপরে উঠে গেছে। সে দীর্ঘ সময় নদীর জলে সূর্যের আলো পড়তে দেখল। সে দীর্ঘ সময় বড় তরমুজটার ওপর বসে আকাশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে মেঘের ছায়া দেখল এবং বিচিত্র রকমের সব পাখিদের গ্রামের দিকে উড়ে যেতে দেখল। ওর এখন উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ঈশম বার বার ছই-এর ভিতর থেকে ডাকছিল। তামাকের গন্ধ এদিকে নেমে আসছে, কিছু বালিহাঁসের শব্দ পেল সোনা, তবু সে উঠল না। সে নিবিষ্ট মনে নদীর চর দেখছে। বড় নির্জন এই অঞ্চলটা। একটা ভালুকের মুখ সে যব গমের খেতে দেখতে পেল। সে তাড়াতাড়ি ছই-এর দিকে হেঁটে যাবার সময়েই মনে করতে পারল ভালুকের মুখটা ছবির বইয়ে দেখা। সুতরাং ভীত হবার মতো কোনও ঘটনাই যেন নেই।

ছই-এর ভিতর ঢুকে সোনা বলল, নিশি ব্যাডা আমার-অ মিতা। আমি কেয়রে ডরাই না।

সোনা ছই-এর নিচে ঢুকে কিছুক্ষণ লাফালো। মাচানের নিচে মালসাতে তামাক খাবার জন্য ঈশম আগুন ধরে রেখেছে। ধোঁয়া উঠছিল। —বাইরে আইয়া বসেন, আসমানের নিচে কত সুখ দ্যাখেন। ঈশম বলল।

ঈশম পা ছড়িয়ে বসল। তরমুজ খেতে সোনা ওর কোলে বসে বলল, আমারে যে কইলেন কান্দে কইরা নদী পার করব্যান, কই করল্যান না-ত! দীর্ঘকাল থেকে সোনার নদী পার হবার ইচ্ছা। কিন্তু ঈশম ওর কথায় রা করল না বলে মনে মনে অভিমান হতে থাকল। দূরে দূরে নদীর জল পাতলা চাদরের মতো কাঁপছিল। দু'জন বোরখা পরা বিবিকে দেখল নদীর পাড় ধরে যব গম খেতের ফাঁকে চরে নেমে আসছে। সে এবার যথার্থই ভীত হল। সে এবার ঈশমের কাছে খুব ঘন হয়ে বসল; ঈশম দাদার সেই সব

ভূতের গল্প মনে পড়ছে—দু'চোখ সাদা, অন্য কোনও অবয়ব নেই। রাত্রিবেলা মায়ের বর্ণিত সেই সব রাক্ষস খোক্কোসেরা বালির চরে সন্তপর্ণে নেমে আসছে যেন! সে খুবই কাতর গলায় বলল, ঈশম দাদা আমি মার কাছে যামু।

—যাইয়েন, আমার লগে যাইয়েন।

—না, আমি এখন যামু।

দু'জন বোরখা পরা বিবি নদীতে নেমে যাচ্ছে। পিছনে নয়াবাড়ির বড় মিঞা। সে বুঝল বড় মিঞার দুই বিবি। সুতরাং সে হাত তুলে ডাকল, অঃ বড় মিঞা, বড় মি...ঞা! বড় মিঞাকে ধরবার জন্য সে সোনাকে কাঁধে নিয়ে তরমুজ খেত অতিক্রম করতে থাকল।

নদীর পাড় ধরে বড় মিঞা এগিয়ে আসছে। ঈশম এখন বালির চর অতিক্রম করছে। এইসব ঘটনায় সোনা ভীত এবং বিব্রত। সে শুধু বলছে আমি যামু না, মার কাছে যামু। অথচ সে দেখল ঈশমের গলার আওয়াজে সেই অবয়বহীন কালো রঙের বোরখা দুটো পুতুলের মতো স্থির। সে বুঝল, ক্রমশ ওরা পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হচ্ছে। সে আবার বলল, আমার ডর করতাছে, আমি বাড়ি যামু।

ঈশম বলল, অঃ বড় মিঞা, ইট্টু খাড়ও। তোমার বিবিগ দ্যাখাইয়া লইয়া যাও। বোরখা পইরা যাইতাছে দেইখা সোনা কর্তার ডরে ধরছে।

বড় মিঞার কুৎসিত বীভৎস মুখ; বসন্তের দাগ মুখে, একটা চোখ সাদা এবং মৃত।

সোনা এবার ঈশমকে খুব শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল। বলল, আমি দুষ্টামি করমু না। আমারে ছাইড়া দ্যান।

সোনার এমন কথায় বড় মিঞা না হেসে পারল না। বলল, ধনকর্তার পোলা?

—হ! ঈশমও হাসল। ডরান ক্যান। আপনেগ পুরান আমলের চাকর।

এখন সোনালী বালির নদীর জলে সূর্যের শেষ আলো সোনার রাজহাঁসের মতো দেখাচ্ছে। সেই কালো অবয়ব-বিহীন বস্তু দুটো নীরব এবং নিশ্চল, যেন কোনও জাদুকরের মন্ত্রগুণ এই দুই অপরিচিত প্রেতাত্মাকে বেঁধে রেখে ভূতের খেলা দেখাচ্ছে। সোনা ঈশমকে শেষবারের মতো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল—সার্কাসে সিংহের খেলা দেখার মতো এক অযাচিত ভয়, রোমাঞ্চকর সব দৃশ্য। বিসদৃশ অবয়ব-বিহীন অন্ধকার রঙের বস্তু দুটো এগিয়ে আসছে।

ঈশম বলল, এইবার তোমার দুই লবেজান বিবিরে দ্যাখাও। সোনাকর্তার ডরডা ভাঙাইয়া দ্যাও! দ্যাখছ মুখে রা নাই।

চারদিকে গমের খেত। পাড়ে পাড়ে লটকন গাছ আর তেমনি গাছে গাছে নীলকণ্ঠ পাখিদের মতো শালিকেরা আশ্রয় নিয়েছে। কিচিরমিচির শব্দ। দূরে গাভীর ডাক। সূর্যের আলো তেমনি যেন সোনার রাজহাঁস। সেই আশ্চর্য বিস্ময়মুগ্ধ প্রকৃতির নীরবতার ভিতর বড় মিঞা তার দুই বিবির বোরখা তুলে দিল—আশ্চর্য মুখ এবং পাতলা গড়ন যুবতীদের—বড় মিঞার দুই বিবি- দুগ্‌গা ঠাকুরের মতো মুখ, গড়ন, নাকে নথ এবং পায়ের মলে ঝমঝম শব্দ। সোনার কাতর চোখ দুটো এখন নদীর জলে আঁধার রাতে নৌকার আলো যেন—বিস্ময়ে চকচক করছে।

ছোট বিবি বলল, আইয়েন কর্তা, কোলে আইয়েন। বলে ঈশমের কোল থেকে সোনাকে নিজের কোলে তুলে নিল এবং মুখের কাছে মুখ রেখে বলল, কি দ্যাখতাছেন বড় বড় চক্ষু দিয়া?

সোনা কোনও জবাব দিতে পারল না। সে ছোট বিবির মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ঈশমকে দেখল। ঈশম এখন বড় মিঞার সঙ্গে ফসলের গল্প করছে।

বড় বিবি বলল, কর্তা, চলেন আমাগ লগে।

সোনা চোখমুখ বুজে বলল, না।

সোনা ফের ছোট বিবির মুখের দিকে তাকালে, বলল, আমারে আপনের খুব পছন্দ লাগছে।

—হা গ বড় মিঞা, সোনা কর্তায় য্যা আমারে নজর দিতাছে। বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসি শুনে ঈশম বলল, তর হাসিডা আগের মতই আছে। সহসা মনে পড়ার ভঙ্গিতে ঈশম বলল, জাবিদা, তর ম্যায় ক্যামন আছে ল?

—ভালই আছে ভাইসাব।

ছোট বিবি সোনার চিবুক ধরে বলল, কর্তা, আমারে নিকা করতে হইলে গালে বড় বড় দাড়ি রাখন লাগব। দাড়ি না হইলে শখ মজাইতে পারবেন না। বড় বড় চক্ষু হইছে, ভারি ভারি নাক মুখ হইছে, নদীর চরের মত শরীরের রঙ হইছে—সব হইছে গ করতা, বড় খুবসুরত হয়েছেন। কিন্তু দাড়ি নাই গ গালে। বলে আড়চোখে বড় মিঞার দিকে তাকাল। বড় মিঞার মৃত চোখটা পর্যন্ত এমন কথায় সজাগ হয়ে উঠল। ছোট বিবির চোখে তখন মানিক জ্বলছিল। হেসে বলল, ডর নাই। এবং সোনাকে বুকের সঙ্গোপনে রেখে ভাবল; আল্লা, সোনা কর্তার মত একডা পোলা দ্যান।

বড় মিঞা বলল, যাই ঈশম ভাই। ব্যালা পইড়া গ্যাছে। ঘরে ফিরতে রাইত হইব। সময় পাইলে যাইয়েন।

ছোট বিবি বলল, ভাইসাব, ন্যান আপনের কর্তারে। বলে ছোট বিবি সোনাকে নিচে নামিয়ে রেখে মুখে বোরখা নামিয়ে দিল। তারপর ওরা চলতে থাকল। ওরা নদীতে নেমে যাচ্ছে। ওরা জল অতিক্রম করে ওপারে উঠে গেল। বড় মিঞা আগে, ছোট বিবি বড় বিবির পিছনে এবং সঙ্গে যেন ওদের রোদের ছায়া হেঁটে যাচ্ছে। সোনা ঈশমের হাত ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বড় বিবিব প্রতিবিম্ব জলে ভাসছে। ওরা নদীর পাড় ধরে হাঁটছিল—ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমশ। সোনার কষ্ট হতে থাকল—বড় বড় চোখ, দুগ্‌গা ঠাকুরের মতো নাকমুখ, নাকে নথ, পায়ে খাড়ু, এখনও ঝমঝম শব্দটা কানে বাজছে। তারপর সেই ছবির ভালুকটা আবার চোখের ওপর ভেসে উঠল। সে ঈশমকে বলল, মায় কইছে আমারে একটা বন্দুক কিনা দিব।

ঈশমও যেন এতক্ষণ কী সব ভাবছিল। বড় বিবির যৌবনকাল অথবা অন্য কোনও প্রিয় ঘটনা ওকে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক কবে রেখেছিল। এবং এও হতে পারে...সূর্য ডুবছে, গাভীসকলের শব্দ এখন শোনা যাচ্ছে না, ঘাস নিয়ে মাঠ থেকে কামলা ফিরছে, সুতরাং ঘরে ফেরার সময় হলেই পঙ্গু বিবির কথা মনে হয়। বড় মিঞার কপালে সুখ, দুই বিবিকে নিয়ে ঘরে ফিরছে। তখন সোনা বলছে, বন্দুকটা দিয়া আমি একটা ভালুক মারমু।

ঈশম এবারও কোন জবাব দিল না। সে সোনার হাত ধরে তরমুজ খেতের ভিতর ঢুকে গেল। কয়েকটি বড় বড় তরমুজ তুলে ছই-এর ভিতর রেখে দিল, তারপর ঝাঁপ বন্ধ করে বলল, লন যাই।

সোনা মাচানের নিচে নেমে বলল, আমারে কান্দে লইয়া নদী পার হইবেন না?

আইজ থাকুক। সন্ধ্যা হইয়া আইতাছে, ধনমামি খোঁজাখুঁজি করব। তাড়াতাড়ি লন, বাড়ি যাই।

তরমুজখেত অতিক্রম করতেই সোনার মনে পড়ল ওর প্রিয় মালিনী-মাছটা একা পড়ে আছে তরমুজের জমিতে। সে বলল, ইটু খাড়ন, মাছটারে নদীর জলে ছাইড়া দিয়া আসি।

সোনা লাফ দিয়ে তরমুজের পাতা এবং ফল ডিঙিয়ে গেল। সে খুঁজে খুঁজে নির্দিষ্ট জায়গাটুকু খুঁজে পেল না, তখন হতাশ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল তরমুজের জমিতে। ঈশম বার বার ডেকেও সাড়া পেল না। কাছে এলে কেমন ভারি গলায় সোনা বলল, মালিনী-মাছটারে পাইতাছি না।

ঈশম সোনার হাত ধরে গর্তটার সামনে নিয়ে দাঁড় করাল। গর্তটাতে এখন জল নেই। মালিনী- মাছটা বালি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সোনা গর্তটার পাশে বসল। হাতের তালুতে মাছটাকে রেখে উল্টে পাল্টে যখন যথার্থই বুঝল মাছটা মরে গেছে, কেমন এক শোকার্ত চোখ নিয়ে চারদিকে তখন তাকাতে থাকল। ওর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না এখন। মালিনী-মাছের চোখ ওকে পীড়িত করছে অথবা যেন ছোট বিবির মুখ...সে এবার

ধীরে ধীরে মাছটাকে বালি মাটিতে শুইয়ে দিল। পাড়ের মাটি দিয়ে শরীর মুখ ঢেকে দিল। এবং একটা ছোট্ট তরমুজ পাতা ছিঁড়ে ওর কবরের ওপর ছাউনির মতো করে রেখে দিল। তারপর ঈশ্বরের কাছে ছোট এই মাছের জন্য প্রার্থনা করার সময় দেখল, যব গম খেতের ফাঁকে বড় মিঞা তার সাদা মৃত চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে, হাউ মাউ কাউ মানুষের গন্ধ পাউ। অথচ সোনা দেখল সেই এক মাঠ—যব গম খেত, চরের বালিতে তরমুজের ঘন রঙ এবং নদীর জলে অবেলার শেষ রোদ আর নদীর ওপার থেকে বড় নিঃশব্দে সেই একটি মৃত চোখ—মুখে দাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছে। সুতরাং সব ফেলে, ঈশমকে ফেলে চরের জমি ভেঙে কেবল ছুটতে থাকল সোনা। কেবল মনে হচ্ছে ওকে নিশিতে পেয়েছে। নিশির ডাকে সে এই সব নির্জন জায়গায় চলে এসেছে। সে ঈশমকে পর্যন্ত গরুর ছানা ভেবে এই অপরিচিত জায়গা থেকে পালাতে চাইল। সে ছুটছে—ছুটছে। কিন্তু বেশি দূর ছুটতে পারল না।

যব গম খেতের আলে পথ হারিয়ে ফেলল। ওর ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। সে জোরে কাঁদতে পারল না পর্যন্ত। সে ভয়ে বিবর্ণ। চারদিকে যব গমের শীষ এবং তার শরীর দেখা যাচ্ছে না।

সে ভয়ে চোখ বুজে যখন পথ খুঁজছিল, যখন যথার্থই অন্ধকার নেমে গেছে মাঠে এবং আশেপাশে শেয়ালেরা ডাকতে আরম্ভ করেছে, তখন ঈশম সোনাকে বুকের কোমল উষ্ণতায় ভরে দিল। বলল, কর্তা, আপনে আমারে ফালাইয়া যাইবেন কই?

এবার চোখ খুলল সোনা। দেখল সেই পরিচিত জায়গা, সেই প্রিয় বকুল গাছ...গাছের ছায়ায় অজস্র বকুল ফুলের গন্ধ। সোনা এবার নির্ভয়ে বলল, আমি কোনখানে যামু না ঈশম দাদা। আপনেরে রাইখা কোনখানে যামু না।

ক্রমে কিছু সময় গেল। কিছু বছর কেটে গেল।

মাঠের শেষ শস্যকণা ঘরে উঠে গেছে। এখন চৈত্রের মাঝামাঝি।

মাঠ এখন ধু-ধু করছে। শুকনো জমিতে হাল বসছে না। সর্বত্র চাষবাসের একটা বন্ধ্যা সময়। যতদূর চোখ পড়ছে, সমানে সাদা ধোঁয়াটে ভাব। শুকনো কঠিন জমি পাথরের

মতো উঁচু হয়ে আছে। পাখ-পাখালি যেন সব অদৃশ্য অথবা সব জ্বলে পুড়ে গেছে। মনেই হয় না এই সব জমিতে সোনার ফসল ফলে, মনেই হয় না এখানে কোনও দিন বর্ষায় প্লাবন আসে। ঝোপ-জঙ্গল ফাঁকা ফাঁকা। গরিব দুঃখীরা ঝরাপাতা সংগ্রহ করছে। মুসলমান চাষীবৌরা এইসব ঝরাপাতা সংগ্রহের সময় আকাশ দেখছিল।

জোটনও আকাশ দেখছিল কারণ তার এখন দুর্দিন। ফকিরসাব সেই যে নাস্তা করে পাঁচ বছর আগে সিন্নির নাম করে চলে গেছে আর ফিরে আসেনি। আবেদালিও আকাশ দেখছিল কারণ চাষবাসের কাজ একেবারেই বন্ধ। নৌকার কাজ বন্ধ। গয়না নৌকার কাজ শীতের মরশুমেই বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলে নতুন শাক-পাতা মাটি থেকে বের হবে, সেজন্য জোটন আকাশ দেখছিল। বৃষ্টি হলে চাষবাসের কাজ আরম্ভ হবে, সেজন্য আবেদালি আকাশ দেখছিল। এই অঞ্চলে আকাশ দেখা এখন সকলের অভ্যাস। কচি কচি ঘাস, নতুন নতুন পাতা এবং ভিজে ভিজে গন্ধ বৃষ্টির— আহা মজাদার গাঙে নাইয়র যাওয়নের লাখান। জোটন বলল, বর্ষা আইলে আবেদালি তুই আমারে নাইয়র লইয়া যাবি?

আবেদালি বলল, তর নাইয়র যাওনের জায়গাটা কোনখানে!

—ক্যান, আমার পোলারা বাইচা নাই?

—আছে, তর সবই আছে। কিন্তু কে-অ তরে খোঁজ-খবর করে না।

জোটন আবেদালির এই অপমানকর কথার কোনও উত্তর দিল না। গতকাল আবেদালির কোনও কাজ ছিল না। আজ সারাদিন হিন্দুপাড়া ঘুরে ঘুরে একটা কাজ সংগ্রহ করতে পারেনি। এখন চৈত্র মাস। সব কিছুতে টান পড়েছে। আবেদালি, গৌর সরকারের শণের চালে নতুন শণ লাগিয়ে দিয়েছে। যা মিলবে—-সামান্য যা কিছু। সে পয়সার কথা বলেনি। আবেদালি সারাটা দিন কাজ করেছে—যেহেতু কামলার সংখ্যা প্রচুর এবং মুসলমান পাড়াতে রুজিরোজগার বন্ধ, যার গরু আছে সে দুধ বেচে একবেলা ভাত, অন্য বেলা মিষ্টি আলু সেদ্ধ খাচ্ছে। আবেদালির গরু নেই, জমি নেই, শুধু গতর আছে। গতর বেচে পর্যন্ত পয়সা হচ্ছে না। সারাদিন খাটুনির পর গৌর সরকারের সঙ্গে পয়সা নিয়ে বচসা হয়ে গেল। কুৎসিত গাল দিয়ে চলে এসেছে আবেদালি।

আবেদালির বিবি জালালি তখনও পেট মেঝেতে রেখে পড়ে আছে। সারাদিন কিছু পেটে পড়ে নি। জব্বর আসমানদির চরে গান শুনতে গেছে।

জালালি পেট মাটিতে রেখেই বলল, পাইলা নি?

আবেদালি কোনও উত্তর করল না। সে তার পাশ থেকে ছোট পুটলিটা ঢিল মেরে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল! সামনে জোটনের ঘর। ঘরের ঝাঁপ বন্ধ। জালালি পুঁটলিটা দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি উঠে বসল। এবং দাঁড়িয়ে খোলা কাপড়ের গিঁট ফের পেটে শক্ত করে

বাঁধল। আবেদালি অন্যমনস্ক হবার জন্য হুঁকো নিয়ে বসল। আর জালালি ঝরাপাতা উঠোনে ঠেলে ঘোলা জলে পাতিল হাঁড়ি খলখল করে ধুতে গেল।

আবেদালি কতক্ষণ হুঁকো খাচ্ছিল টের পায়নি। সে দেখল উনানের ওপাশে বসে জালালি হাঁড়িতে চাল দিচ্ছে। ওর খাটো কাপড়। দু হাঁটুর ভিতর দিয়ে পেটের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। শালী, মাগীর বড় পেট ভাসাইয়া রাখনের অভ্যাস। শরীর দেয় না আর। তবু এই ভাসানো পেট আবেদালিকে কেমন লোভী করে তুলছে। আবেদালি বেশিক্ষণ বিবিকে এভাবে বসে থাকতে দেখলে কখনও কখনও কলাইর জমি অথবা একটা ফাঁকা মাঠ দেখতে পায়। সে ফের নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, জব্বাইরা গ্যাল কোনখানে? কাইল থাইকা দ্যাখতাছি না।

জালালি আবেদালির দুষ্ট বুদ্ধি ধরতে পারছে যেন। সে বলল, জব্বাইরা গুনাই বিবির গান শুনতে গ্যাছে। কাঠের হাতা দিয়ে ভাতের চালটা নেড়ে দেবার সময় জালালি বলল, গুনাই বিবির গান শুনতে আমার-অ ইসছা হয়।

এত অভাবের ভিতরও আবেদালির হাসি পাচ্ছে। এত দুঃখের ভিতর আবেদালি বলল—পানিতে নদী-নালা ভাইসা যাউক, তখন তরে লইয়া পানিতে ভাইসা যামু।

জালালির এইসব কথাই যেন আবেদালির ছাড় পত্র। মাঠে নামার অথবা চাষ করার ছাড়পত্র।

আবেদালির দিদি জোটন এতক্ষণ দাওয়ায় বসে সব শুনছিল। এত সুখের কথা সে সহ্য করতে পারছিল না। সে সন্তর্পণে ঝাঁপটা আরও টেনে চুপচাপ বসে থাকল। কোনও কর্ম নেই—শুধু আলস্য শরীরে। আর চুলের গোড়া থেকে চিমটি কেটে কেটে উকুন খুঁজছিল। আর জালালির এত সুখের কথা শুনেই যেন চুলের গোড়া থেকে একটা উকুনকে ধরে ফেলতে পারল। জোটনের মুখে এখন প্রতিশোধের স্পৃহা—মান্দার গাছের নিচে মনজুরের মুখ ভেসে উঠল। উকুনটাকে দু'নখের ভিতর রেখে ঝাঁপের ফাঁকে উঁকি দিতেই দেখল, উঠোনের অন্য পাশে আবেদালি। জালালিকে সে সাপ্টে যেন বাঘ ঘাড় কামড়ে অথবা থাবার ভিতর শিকার নিয়ে পালাচ্ছে। জালালি লতার মতো দু'পায়ের ফাঁকে ঝুলে আছে। এখন চৈত্র মাস বলে কথায় কথায় ঘূর্ণি ঝড়। ধুলো উড়ে এসে ঝাপটা মারল—উঠোন অন্ধকার হয়ে ওঠায় ঘরের ভিতর আবেদালি কি করছে শিকার নিয়ে, দেখতে পেল না। সে রাগে দুঃখে এবার মাঠের ভিতর নেমে ধুলোর ঝড়ে ডুবে গেল।

চৈত্র মাস সুতরাং রোদে খাঁ-খাঁ করছে মাঠ। পুকুরগুলিতে জল নেই। একমাত্র সোনালী বালির নদীর চরে পাতলা চাদরের মতো তখনও জল নেমে যাচ্ছে। মসজিদের কুয়োতে জল নেই। গ্রামের দুঃখী মানুষেরা অনেকদূর হেঁটে গিয়ে জল আনছে। সোনালী বালির নদীতে ঘড়া ডুবছে না। নমশূদ্রপাড়ার মেয়ে বৌরা সার বেঁধে জল আনতে যাচ্ছে। ওরা খোঁড়া দিয়ে জল তুলছে কলসিতে। ট্যাবার পুকুরে, কবিরাজ বাড়ির পুকুরে, ঘোলা

জল। গরু নেমে নেমে জল একেবারে সবুজ রঙ হয়ে গেছে। বড় দুঃসময় এখন। সে বের হবার মুখে কলসি নিয়ে বের হল। সোনালী বালির নদী থেকে এক ঘড়া জল এনে হাজি সাহেবের বাড়িতে উঠে যাবে। বুড়ো হাজি সাহেবের জন্য এত কষ্ট করে জল বয়ে আনলে কিছু তেলকড়ি মিলতে পারে—পয়সা না হোক, এক কোনকা ধান। সে নেমেই দেখল মাঠে কারা যেন ছুটে ছুটে যাচ্ছে। একদল লোক খাঁ-খাঁ রোদের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। ওদের মাথায় বোধ হয় ওলাওঠার দেবী। বিশ্বাসপাড়াতে ওলাওঠা লেগেছে। সে এতদূর থেকে মানুষগুলিকে স্পষ্ট চিনতে পারছে না।

মাঠে পড়েই জোটনের মনে হল—জালালি এখন উদোম গায়ে ঘরের ভিতর। উনানে ভাত সেদ্ধ হচ্ছে। পাতা, খেড় অথবা লতা পাতায় আগুন ধরে গেলে আগুন লাগতে কতক্ষণ! নদীর দিকে হেঁটে যাবার সময় জোটনের এমন সব দৃশ্য মনে পড়ছিল। চৈত্র মাসে আগুন যেন চালে বাঁশে লেগেই থাকে। জোটনের মন ভাল ছিল না, সেজন্য দ্রুত হাঁটছে। সকলেই জল নিয়ে ঘরে ফিরছে, তাকেও তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। গ্রামে গ্রামে ওলাওঠা মহামারীর মতো। যেসব লোক রোদের ভিতর পালাচ্ছিল তারা ক্রমশ জোটনের নিকটবর্তী হচ্ছে। একেবারে সামনা-সামনি। জোটন তাড়াতাড়ি পাশে কলসি রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। গাধার পিঠে ওলাওঠা দেবী যাচ্ছেন। মাথায় করে মানুষরা ঢাকের বাদ্যি বাজাতে বাজাতে নিয়ে যাচ্ছে। জোটন ওদের পিছন পিছন বেশিদুর গেল না। সড়কের ধারে সব মান্দার গাছ। মান্দার গাছে লীগের ইস্তাহার ঝুলছে। জোটন সেই মান্দার গাছের ছায়ায় গ্রামের দিকে উঠে গেল।

পথে ফেলু শেখের সঙ্গে দেখা। ফেলু বলল, জুটি, পানি আনলি কার লাইগ্যা?

জোটন থুতু ফেলল মাটিতে। মানুষটার সঙ্গে কথা বললে গুনাহ। মানুষটা এক কোপে আন্নুর মরদকে কেটে এখন আন্নুকে নিয়ে ঘর করছে। একদিন বসে বসে আবেদালিকে এইসব গল্প শুনিয়েছে—মানুষটার বুকের কি পাটা? ভয়ডর নাই। সামসুদ্দিনের সঙ্গে এখন লীগের পাণ্ডাগিরি করছে।

জোটন কিছুতেই কথা বলছে না। আলের পাশে দাঁড়িয়ে ফেলুর যাবার পথ খালি করে দিচ্ছে।

কিন্তু ফেলুর লক্ষণ ভাল না। সে দাঁড়িয়ে থাকল সামনে! কেমন মুচকি হাসছে। ওর একটা চোখ বসন্তে গেছে। মুখ কী ভয়ঙ্কর কুৎসিত। দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ ঢাকা থাকে এখন। হাডুডু খেলার রস মরে গেছে। গতরে তেমন শক্তি নেই বুঝি। তবু চোখটা ভয়ঙ্করভাবে কেবল জ্বলছে। ফেলু মুচকি হেসে বলল, জুটি, তর ফকিরসাব তবে আর আইল না?

—কি করতে কন তবে। না আইলে কি করমু! জোটন ফের থুতু ফেলল।

ফেলু এবার অন্য কথা বলল। কারণ জোটনের মুখ দেখে ধরতে পারছে এইসব ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকাটা সে পছন্দ করছে না। সে এবার খুব ভালো মানুষের মতো বলল, মানুষগুলাইন মাথায় কইরা কি লইয়া যাইতাছে।

—ওলাওঠা দেবীরে লইয়া যাইতাছে।

—মাথাটা ভাইঙ্গা দিলে ক্যামন হয়?

জোটন এবারেও দাঁত শক্ত করে বলতে চাইল যেন, তর মাথাটা ভাঙমু নির্বৈবংশা। অথচ মুখে কোনও শব্দ করল না। লোকটার জন্য সকলের ভয়ডর। কার মাথা কখন নেবে, হাসতে হাসতে হ্যাঁৎ করে মাথা কাটতে ফেলুর মতো ওস্তাদ আর নেই। মানুষটাকে কেউ ঘাঁটায় না। যেন ঘাঁটালেই সে রাতের অন্ধকারে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে কোরবানির খাসির মতো গলার নলি ছিঁড়ে দেবে। কোরবানির দিনে মানুষটা আরও ভয়ঙ্কর। সুতরাং জোটন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে চাইল।

ফেলু দেখল চৈত্রের শেষ রোদ বাঁশগাছের মাথায়। সামসুদ্দিন তার দলবল নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন সামনের মাঠ ফাঁকা। লতানে ঝোপ আর শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল, আর জঙ্গলের ফাঁকে ওরা দু'জন। একটু ফষ্টিনষ্টি করার মতো মুখ করে সামনে ঝুঁকল, তারপর ফিসফিস করে বলল, দিমু নাকি একটা গুঁতা।

জোটন এবার মরিয়া হয়ে বলল, তর ওলাওঠা হইবরে নির্বৈবংশা। পথ ছাড়, না হইলে চিৎকার দিমু। বলা নেই, কওয়া নেই, এমন একটা হঠাৎ ঘটনার জন্য জোটন প্রস্তুত ছিল না। ফেলু হাসতে হাসতে বলল, রাগ করস ক্যান! তর লগে মসকরা করলাম। তারপর চারিদিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, শীতলা ঠাইরেনের ডর আমারে দেখাইস না জোটন। কস তো আইজ রাইতে মাথাটা লইয়া আইতে পারি।

সামসুদ্দিন দলবল নিয়ে সঙ্গে যাচ্ছে। লীগের সভা হবে। শহর থেকে মৌলবীসাব আসবেন। সুতরাং ফেলুকে নেতা গোছের মানুষের মতো লাগছে। পরনে খোপকাটা লুঙ্গি। গায়ে হাতকাটা কালো গেঞ্জি। আর গলাতে গামছা মাফলারের মতো প্যাচানো। সে জোটনকে পথ ছেড়ে দিল। ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ওদের ধরতে হবে। সে আল ভেঙে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে। মাঠ থেকে ওলাওঠা দেবীও গ্রামের ভিতর অদৃশ্য। তখন ধোঁয়ার মতো এক কুণ্ডলী গ্রাম মাঠ পার হয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে যা ভাবছিল তাই। জল নেই নদী-নালাতে। মাঠ শুকনো, পাতা শুকনো। আর সারাদিন রোদে পাতার ছাউনি তেতে থাকে, পাটকাঠির বেড়া তেতে থাকে। জোটন কাঁখের কলসি নিয়ে দ্রুত ছুটছে। সে দেখল পাশের গ্রাম থেকে ও মানুষেরা ছুটে আসছে। যারা সোনালী বালির নদীতে জল আনতে গিয়েছিল তারা পর্যন্ত দুঃসময়ে আগুনের উপর সব জল ঢেলে দিল।

কিন্তু এই আগুন আগুনের মতো আগুন, বাতাসের সঙ্গে মিলে-মিশে অশিক্ষিত এবং অপটু হাতের গড়া সব গৃহবাস ছাই করে দিতে থাকল। জোটনের ঘরটা পুড়ে যাচ্ছে। আবেদালির ঘরটা সকলের আগে পুড়েছে। আবেদালি জালালির অগোছালো শরীরটা সেই আগের মতো সাপ্টে ধরে রেখেছে। নতুবা ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। ওর কাঁথা, বালিশ, মাদুর, কলাইকরা থালা সানকি সব গেল। পুড়ে যাচ্ছে। ঠাস ঠাস করে বাঁশ ফাটছে, হাঁড়ি-পাতিলের শব্দ হচ্ছে। আগুন গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং কাঁচা বাঁশ অথবা কলাগাছ এবং কাদা জল সবই প্রয়োজনীয়। চারিদিকে বীভৎস সব দৃশ্য। যাদের কাঁথা বালিশ আছে তারা কাঁথা বালিশ মাঠে এনে ফেলল। জালালি তখন আমগাছের নিচে বসে কপাল থাপড়াচ্ছে। পুবের বাড়ির নরেন দাস একটা দা নিয়ে এসেছে। যেসব ঘরে আগুন লাগেনি এবার লেগে যাবে—হল্কা বের হয়ে হয়ে লম্বা হচ্ছে, চাল থেকে চালে আগুন লাফিয়ে পড়ছে, সেইসব চাল কেটে দিচ্ছে। ঘর আগা করে দিচ্ছে। যেন আগুন আর ছড়াতে না পারে। মানুষেরা সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, আগুন নেভানোর জন্য। কুয়োর জল ফুরিয়ে গেছে। হাজি সাহেবের পুকুরে যে তলানিটুকু ছিল তাও নিঃশেষ। মনজুরদের পুকুরে শুধু কাদামাটি। এখন লোকে কোদাল মেরে কাদামাটি চালে ছুঁড়ছে। তখন দূরে ওলাওঠা দেবীর সামনে ঢাক বাজছিল, ঢোল বাজছিল। বিশ্বাসপাড়াতে হরিপদ বিশ্বাস হিক্কা তুলে মারা গেল। সাইকেল চালিয়ে গোপাল ডাক্তার ছুটছে বাড়ি বাড়ি টাকার জন্য, রুগী দেখার জন্য। সে যেতে যেতে আগুন দেখে এইসব অশিক্ষিত লোকদের গাল দিল। ফি বছর হামেশাই কোনও কোনও দুঃখী গ্রামে এমন হচ্ছে। হাতুড়ে বদ্যি গোপাল ডাক্তারের এখন পোয়াবারো। রুগী কামিয়ে অর্থ, গরিব লোকদের অনটনে অর্থ দিয়ে সুদ। আলের উপর গোপাল ডাক্তার এখন দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে ক্রিং ক্রিং বেল বাজাচ্ছে। যেন বলছে, কে আছ এস, টাকা নিয়ে যাও, ওষুধ নিয়ে যাও! অর্থ দিয়ে সুদ দেবে, ঋণশোধ করবে।

খড়ম পায়ে শচীন্দ্রনাথও ছুটে এসেছিলেন। জোটন, আবেদালি এবং গ্রামের অন্য সকলে সান্ত্বনার জন্য ওকে ঘিরে দাঁড়াল। শচীন্দ্রনাথ সকলের মুখ দেখলেন। সকলে এখন আবেদালি এবং জালালিকে দোষারোপ করছে। শচীন্দ্রনাথ বললেন, কপাল।

সামসুদ্দিনের দলটা অনেক রাতে সভা শেষ করে ফিরে এল। ওরাও ঘুরে ঘুরে সকলকে সান্ত্বনা দিতে থাকল। আগুন নেভানোর চেষ্টায় বড় বড় বাঁশের লাঠি অথবা কাদামাটি নিক্ষেপ করে যখন বুঝল—কোনও উপায় নেই, সব জ্বলে যাবে—তখন ওরা মসজিদের দিকে চলে গেল। মসজিদটা এখন দাউদাউ করে জ্বলছে।

চোখের উপর গোটা গ্রামটা পুড়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস পাড়াতে এখন ওলাওঠা দেবীর অর্চনা হচ্ছে। মাঠে সব চাষের জমিতে পোড়া কাঁথা পেতে যে যার ভস্ম থেকে তুলে আনা ধন-সম্পত্তি আগলাচ্ছে। আগুনে ওদের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

যখন আগুন পড়ে এল এবং এক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব—জোটন শোকে আকুল হতে থাকল। ঘন অন্ধকার চারদিকে। থেকে থেকে ধোঁয়া উঠছে। সে অন্ধকারের ভিতর পোড়া ভস্ম ধন-সম্পত্তির আশায় চুপি চুপি হাজিসাহেবের গোলাবাড়িতে উঠে এল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। সে ঘুরেও গেল কতকটা পথ। ধান চাল পোড়া গন্ধ। আশেপাশে সব হা-অন্ন মানুষদের হা-হুতাশের শব্দ ভেসে আসছে। অন্ধকারে জোটন পরিচিত কণ্ঠ পেয়ে বলল, ফুফা, আমার ঘরটা গ্যাল। ভালই হয়েছে। যামু গিয়া যেদিকে চোখ যায়। ঘরটার লাইগা বড় মায়া হইত। ফকিরসাব আর বুঝি আইল না, এও বলার ইচ্ছা। যখন এল না তখন আর কার আশায় সে এখানে বসে থাকবে। পরিচিত মানুষটা অন্ধকারে বসে টের পেল, জোটন অনেক কষ্টে এমন কথা বলছে।

পরিচিত মানুষটি বলল, আবেদালির আফুর দুফুর নাই!

জোটন এবার ফিরে দাঁড়াল। কাকে কি কমু কন। পুরুষমানুষ দিন নাই রাইত নাই খামু খামু করে, কিন্তু তুই মাইয়ামানুষ হইয়া আফুর দুফুর দ্যাখলি না। উদাম কইরা গায়ে গতরে পানি ঢাললি।

জোটন আর দাঁড়াল না। সে বকতে বকতে অন্ধকারে হাজিসাহেবের গোলাবাড়িতে ঢুকে গেল। বড় বড় গোলা ভস্ম হয়ে গেছে। ধান-পোড়া মুসুরি-পোড়া গন্ধ উঠছে। কোথাও থেকে এই দুঃসময়ে একটা ব্যাঙ ফ্লপ ফ্লপ করে উঠল। জোটন আগুনের ভিতর খোঁচা মারল একটা। না, কিছু বের হচ্ছে না। অন্ধকারের ভিতর কিছু ছাইচাপা আগুন শুধু কতকটা ঝলসে উঠে ফের নিভে গেল। আগুনে জোটনের মুখ পোয়াতির মুখের মতো—লোভী এবং পেট সর্বস্ব চেহারা। সেই আগুনে জোটন অন্ধকারে পথ চিনে নিল। তখন ঢাকের বাজনা, ঢোলের বাজনা ওলাওঠা দেবীর সামনে। তখন হাজিসাহেব তার তিন বিবির কোলে ঠ্যাং রেখে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর হাজিসাহেবের তিন বেটার তিন বিবি, মাঠের মধ্যে চষা জমির উপর বিছানা পেতে ওৎ পাতার মতো অপেক্ষা করছে!

জোটনের মনে হল এই অন্ধকারে সে একা নয়। অন্য অনেকে যেন হাতে কাঠি নিয়ে পা টিপে টিপে গোপনে আগুনের ভিতর ঢুকে খোঁচা মারছে। দূর থেকে মনে হল হাজিসাহেবের একটা ঘর—সবটা জ্বলেনি। অথবা আর জ্বলবে না। সে লাফিয়ে এগোল। সে ঘরের ভিতর গতকাল কয়েক লাছি পাট দেখেছিল। জোটনের পরাণ এখন ভাদ্রমাসের পানির মতো টলমল করছে। আর তখন জোটনের পায়ের শব্দে অন্ধকার থেকে কে যেন বলল, কেডা?

—আমি...আমি..।

জোটনের মনে হল অন্ধকারে আর এক মানুষ যেন গোপনে তন্ন তন্ন করে কি খুঁজছে।

জোটন বলল, তুমি কেডা?

জোটনের মনে হল ফেলু শেখ। সেও অন্ধকারে আগুনে পোড়া সম্পত্তি চুরি করতে এসেছে। অথবা মাইজলা বিবির সনে পীরিত তার। হাজিসাহেবের মাইজলা বিবিও এই রাতের অন্ধকারে যখন কেউ কোথাও জেগে নেই, সকলে মাঠে নেমে গেছে, কিছু ফেলে গেছে এই নাম করে ফিরে এলে ফেলু শেখ চুপি চুপি চিনে ফেলবে। কার টের পাবার কথা! ফেলু সেই এক জ্বালা নিবারণের জন্য, কি যে এক জ্বালা, উজানে যেতে হাজিসাহেব ভোলা অঞ্চলের পাশে কোন এক সাগরের কূল থেকে এই মাইজলা বিবিকে তুলে এনেছিলেন। তখন সঙ্গে ছিল ফেলু। ফেলু ফুসলে ফাসলে টাকার লোভ দেখিয়ে হাজিসাহেবের নৌকায় এনে তুলেছিল মাইজলা বিবিকে। তখন হাজিসাহেব হাজি নন, তখন ফেলুর যৌবন কত বড়, ফেলুর কত নামডাক—জোয়ান মরদ ফেলু পীরিত করার অছিলা খুঁজছিল মাইজলা বিবির সনে। বোধ হয় এখন সংগোপনে গানটা গায় মাইজলা বিবি। যখন কলিমুদ্দি সাহেব হজ করতে গেলেন এবং যখন হাজি হয়ে ফিরে এলেন তখন মাইজলা বিবির সেই গান গলায়। একা আতাবেড়ার পাশে বসে বসে গাইত। ঘাটে ফেলু বসে থাকত। সে ওদের তখন বড় নৌকার মাঝি—কাজ কারবারে তাকে হাটে-বাজারে যেতে হয়, সওদা করে আনতে হয়। তাই মাইজলা বিবির সনে পীরিত রঙ্গরস করার অছিলাতে ঘাটের মাঝি হয়ে সে বসে থাকত। কিন্তু কলিমুদ্দি হজ করে এসে সবই টের পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, মিঞা, তোমার এই আছিল মনে। তারপর হাজিসাহেব ঘাট থেকে তাড়িয়ে দিলেন ফেলুকে। সে কবেকার কথা! সেই থেকে ফেলু আর হাজিসাহেবের বাড়ি যেতে পারে না। মাঝে মাঝে মাইজলা বিবির মুখ ওর পরাণে দরিয়ার বান ডেকে আনে। তখন সে একা একা প্রায় পাগল ঠাকুরের শামিল। সে গো পাটে অথবা অন্ধকার রাতে চুপি-চুপি অশ্বত্থের নিচে নেমে আসে। ঝোপ-জঙ্গলে উবু হয়ে বসে থাকে। আতাবেড়ার পাশে কখন উঁকি দেবে মুখটা। বিবি আন্নু আজকাল হাজিসাহেবের বাড়িতে আসে-যায়। ছোট বিবির সঙ্গে আন্নুর খুব ভাব। সেই বিবি ওকে লুকিয়েচুরিয়ে তেল দেয়, ডাল দেয়, মাসকলাইর বড়ি দেয়। আন্নু বলে ছোট বিবি দেয়—কিন্তু জোটনের মন বলে সব মাইজলা বিবির কাজ। মাইজলা বিবির সনে পীরিত বড় ফেলুর।

জোটন বোঝে সব। আন্নু দেখায় ছোটবিবির সঙ্গে তার বড় ভাব—সখী সখী গলায় দড়ি ওলো সখী ভাব।

আর ফেলুর যখনই ভাবের কথা মনে হয় তখন আর এক মুহূর্ত দেরি করতে পারে না। সে এই অন্ধকারে আগুনের ভিতর মাইজলা বিবিকে দেখার বাসনাতে বসে আছে। যদি আসে। চারিদিকে হল্লা—কে কোথায় ছুটছে—কে কোথায় আছে কে জানে। এই ত সময়। সুতরাং সে এখানে বসে বিবির উঠে আসার অপেক্ষায়—কি জাদু বিবির চোখে আর কি জাদু আছে এই মনের ভিতর। এই মন কি যেন চায় সব সময়। ফেলু কি যেন চায় সব সময়। তার ঘরে যুবতী বিবি আন্নু, ফেলুর বয়স দুই কুড়ির ওপরে হয়ে গেছে—তবু মনটা কি যেন চায়। এত অভাব অনটনের ভিতরও ভিতরটা কি পেতে কেবল ইসছা ইসছা করে। কিসে যে সুখ—এই আন্নুর জন্য সে কী কাণ্ড না করেছে! আলতাফ সাহেবের

গলাটা সে হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলেছে। পাটখেতের ভিতর আলতাফ সাহেব বাছ-পাট কেমন হয়েছে দেখতে এসেছিল। বুড়ো আলতাফ সাহেবের শেষ পক্ষের বিবিকে সে ঈদের পার্বণে পীরের দরগায় দেখে প্রায় পাগলের মতো—কি করে, কি করে! কি করবে ফেলু ভেবে উঠতে পারল না। তখন ফেলুর যৌবনকাল যায় যায়। সে তল্লাটের ফেলু। সুতরাং সে ঈদের আর এক পার্বণে মেমান সেজে চলে গেল আলতাফ সাহেবের বাড়ি। ওকে সে পাটের ব্যবসা করতে বলল—য্যান ফেলু কত বড় মহাজন। সে দাড়িতে আতর মাখত তখন, ভাল তফন কিনে আনতো বাবুর হাট থেকে। মন খুশ থাকলেই ম্যাডেল ঝোলাত গলায়।

বুড়ো আলতাফ খেলার বড় উৎসাহদাতা ছিল। ফেলুর সঙ্গে কত জান পহ্চান, কত বড় খেলুড়ে ফেলু তার বাড়ি মেমান হয়ে এসেছে—বিবি, বেটারা দেখুক। খেলোয়াড় ফেলুকে সে অন্দর মহলে একদিন ঢুকিয়ে দিল। ফেলুর পীরিতের ছলাকলা সব যেন জানা। ফাঁকা বুঝে ফুলের কুঁড়ির মতো আলতাফের ছোটবিবিকে কাছিমের মতো বুকের ছাতি দেখাল একদিন। আন্নু দেখল সেই বুকের ছাতিতে মেডেলগুলি ঝকঝক করছে। আর তখন মনে পড়েছিল ছোট বয়সের কথা। বালিকা আন্নু খেলা দেখতে গেছে—হা-ডু-ডু খেলা। ফেলু এসেছে খেলতে পরাপরদির হাটে। সেদিন হাটবার ছিল না, তবু কি লোক, কি লোক! দু'দশ মাইলের ভিতর কোনও যুবা পুরুষ আর সেদিন ঘরে ছিল না। মেলার মতো প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে নিশান উড়ছিল—য্যান ঈদ-মুবারক। ফেলু সেই মেলার প্রাণ ছিল। খেলা শেষ হলে ফেলুর জয়-জয়কার। আন্নু, বালিকা আন্নু সেদিনই কেমন ফেলুর ভালোবাসায় পড়ে গেল। সেই ফেলু এসেছে মেমান সেজে—আলতাফ সাহেবের বিবি নিজেকেই যেন শুধাল, এই আছিল তর মনে! তারপর সময় বুঝে হ্যাঁৎ করে গলাটা কেটে ফেলল ফেলু। পাটখেতের ভিতর হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলল গলার নলিটা। যেমন সে কোরবানির দিন দশ পাঁচটা কোরবানিতে চাকু চালায়, বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে, তেমনি সে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে হ্যাঁৎ করে নলিটা আলতাফ সাহেবের কেটে ফেলল। যেদিন সে বিবিকে বোরখা পরিয়ে নিয়ে আসে, সেদিন সে, হ্যাঁৎ করে গলা কেটে ফেলেছে কথাটা প্রথম জানাল বিবিকে। আন্নু শুনে বলল, এই আছিল তর মনে! বলে সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর হা-হা করে হেসে উঠেছিল। আন্নুকে দেখলে মনেই হবে না ফেলুর জন্য সে এত বড় হত্যাকাণ্ড হজম করে গেছে।

অন্ধকারে ফেলু দূরের একটা ছায়া-মূর্তি দেখছিল আর ভাবছিল। বুঝি চুপিচুপি মাইজলা বিবি উঠে আসছে। কিন্তু এখন এ কি—কার গলা, জোটন মনে হয়! সে ধরা পড়ে যাবে, চুরি করতে এসেছে এই আগুনের ভস্ম ধনসম্পত্তি থেকে তার ভয় ধরে গেল।

জোটন তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, নাম কইতে পার না মিঞা! আমি কেডা।

—আমি মতিউর। ফেলু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলল।

—তোমাগ আর মানুষগুলান কই?

—আগুন দেইখ্যা পালাইছে।

—তুমি এখানে কি করতাছ?

—সানকিডা খুঁজতাছি।

—হাজিসাহেব জানে না, বৈঠকখানা ঘরডা পুইড়া যায় নাই।

—আগুনে বড় ডর হাজিসাহেবের। লোকটা দূর থেকেই কথা বলছে। এই ভস্মরাশিকে এখন সকলেরই ভয়। গলাটা স্পষ্ট নয়। গলাটা কখনও ফকির সাহেবের মতো, কখনও মনে হচ্ছে ফেলুই মতিউরের গলায় কথা বলছে। তারপর মনে হল অন্ধকারে লোকটা কিছু কুড়িয়ে পেয়েছে। এবং পেয়েই এক দৌড়।

জোটন বলতে চাইল—ধর-ধর। কিন্তু বলতে পারল না। সে নিজেও একটা সানকি খুঁজতে এসেছে অথবা কিছু চাল, পোড়া ধান হলে মন্দ হয় না, পোড়া কাঁথা হলে মন্দ হয় না—সে এখন যা পেল তাই নিয়ে আমগাছের নিচে জড়ো করল। জালালি সব জোটনের হয়ে সংরক্ষণ করছে। সে ভস্মরাশি থেকে খুঁজে-পেতে আনছে আর জালালিকে দিয়ে আবার অন্ধকারে খুঁজতে চলে যাচ্ছে।

তখন কান্না ভেসে আসছিল বিশ্বাসপাড়া থেকে। তখন ওলাওঠা দেবীর সামনে আরতি হচ্ছিল।

ওলাওঠাতে আবার হয়তো কেউ মারা গেল। জোটন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সানকি, ভাঙা পাতিল অথবা পেতলের বদনা খুঁজতে খুঁজতে সেই কান্না শুনছে। রাত তখন অনেক। মাঠের ভিতর দিয়ে কারা যেন নদীর পাড়ের দিকে ছুটছে আর গাছের নিচে ইতস্তত যেসব লম্ফ জ্বলছিল—বাতাসে সব এক-দুই করে নিভে যাচ্ছে। মাঠে একটামাত্র হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেনটা হাজিসাহেবের।

মহামারী লাগলে যেমন এক অশরীরী বাতাসে ভেসে বেড়ায় তেমনি এই ভস্মরাশির অন্ধকারে জোটন ভেসে বেড়াতে লাগল। জোটন অন্ধকারে পা টিপে-টিপে হাঁটছে। হাজিসাহেব মাঠে এখন কেবল সোভান আল্লা, সোভান আল্লা বলে চেঁচামেচি করছেন। তিনি ঘুমোতে পারছেন না। মাঠের ভিতর তিনি তাঁর ছোট বিবিকে নিয়ে আছেন। কে কখন কি করে যাবে—ভয়ে ঘুম আসছিল না। যাদের ভাঙা ঘর শুধু গেছে, ছেঁড়া হোগলা বিছিয়ে ঘুম যাচ্ছে তারা। সকাল হলেই হিন্দু পাড়াতে রুজি রোজগারের জন্য উঠে যেতে হবে এবং হিন্দু পাড়াতেই সব বাঁশ কাঠ। সব শণের জমি ওদের। ওদের থেকে চেয়ে আনলে ঘর এবং ঘর বানাতে বানাতে ঘোর বর্ষা এসে যাবে। জোটন এ সময় নিজের ঘরের কথা ভাবল, বর্ষার কথা ভাবল, ফেলু সময়-অসময় গুতা দিতে চায়, মনজুরের মতো চোখ-মুখ গরম ছিল না, চান্দের লাখান গড়বন্দি আছিল না—দিমু তরে একদিন একটা

গুতা—এইসব ভেবে জোটন নিজের অভাব জোড়াতালি দিয়ে আধপোড়া ঘরের ভিতরে আর একটা বদনা পেয়েই এক দৌড়। সে জালালির পাশে এসে বসল, দ্যাখ, কি আনছি।

জালালি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বদনাটি দেখল। কুপির আলোতে এত বড় একটা আস্ত পেতলের বদনা— সে কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আবেদালি ঘাড় কাৎ করে তাকিয়ে আছে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছা তার।

—এক বদনা পানি আন ঢক ঢক কইরা খাই। বদনা দেখেই আবেদালির কেমন জলতেষ্টা পেয়ে গেল।

জালালি বলল, আমি যাই। যদি কিছু মিল্যা যায়!

জোটন জল আনতে গেছে। আশেপাশে কেউ নেই। আবেদালি তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। তার পর এক থাপ্পড় নিয়ে গেল গালের কাছে। বলল, তর এত সাহস! তুই যাবি চুরি করতে। পরে সে গামছা দিয়ে মুখ মুছল। ঘামে গরমে মুখ চুলকাচ্ছে। সে আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসতেই দেখল জোটন জলের জন্য উঠে যাচ্ছে। জলের বড় অভাব। সে অন্ধকারে এখন জল চুরি করতে যাচ্ছে।

জালালি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর কচ্ছপের মতো গলা লম্বা করে দিল। তারপর চিৎকার করে বলল, তর লাইগাই তা নির্বংশা আগুন লাগল রে।

চিৎকারে ভয় পেয়ে গেল আবেদালি।—আমার লাইগ্যা বুঝি!

এবার জালালি খল্‌খল্ করে উঠল, আমি সকলরে না কইছি ত কইলাম কি!

—কি কইবি?

—কমু তাইন আমারে ঘরে জোর কইরা ধইরা নিছে।

—ঘরে নিছি, ভাল করছি। তুই নাড়া দিয়া রানতে-রানতে প্যাট ভাসাইলি ক্যান?

—তার লাইগ্যা বুঝি সময়-অসময় নাই?

গোটা ঘটনাটাই আগুনের মতো। আবেদালি এবার আরও ঘন হয়ে বসল।—আমার বুঝি ইচ্ছা হয় না ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করি।

ফকিরসাব নিমগাছটার নিচে বসলেন। গাছটাতে একটা কাকও উড়ছে না। সুতরাং ফকিরসাব এ-গাঁয়ের ঘরগুলো দেখলেন। বৈশাখ মাস শেষ হচ্ছে। এখন গাছে-গাছে আমের ভাল ফলন। তিনি তাঁর মালা-তাবিজের ভিতর থেকে একটা বড় পুঁটলি বের করলেন। আর গোস্তের ওজন দেখবার সময় মনে হল এবার গ্রামের কোরবানির সংখ্যা কমে গেছে। তিনি হাত গুণে বলতে পারছেন যেন সংখ্যায় কত তারা, বকরি ঈদে এত

কম কোরবানি এই প্রথম আর এই জন্যই কাকগুলি গোস্ত খুঁজে খুঁজে হন্যে হচ্ছিল। কাকগুলি উড়ে উড়ে হয়রান হয়ে গেছে অথচ কিছুই মিলছে না। ওরা উড়ে উড়ে এদিক-ওদিক চলে গেল। সুতরাং তিনি কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। কোথাও পুঁটলির ভিতর পান-সুপারি আছে অথবা চুনের কৌটা থেকে চুন নিয়ে ঠোঁটে লাগাবার সময়ই সুখী পায়রার মতো অনেকদিন আগের কসমের কথা মনে পড়ে গেল।

সামনে সড়ক। দূরে কোথাও আজ হিন্দুদের মেলা আছে। ফকিরসাব মনে করতে পারলেন, হয়তো এদিনেই নয়া পাড়া পার হলে ঘোড়দৌড়ের মাঠে মরশুমের শেষ ঘোড়দৌড় হবে। একবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেলে হয়। কিন্তু অনেক দিন পর এদিকে আসায় কসমের কথা মনে পড়ে গেল। সড়কের পথে গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোড়া যাচ্ছে। বিশ্বাসপাড়ার কালু বিশ্বাসের ঘোড়া—য্যান নয়নের মণি। ঘোড়াটার রঙ কালো কুচকুচে। কপাল সাদা আর সোনালী কড়ির মালা ঝুলছে ঘোড়ার গলাতে। ঘোড়াটা সড়ক ধরে দূরে চলে গেল। গ্রীষ্মের শেষ জল-ঝড়ে এ অঞ্চলের কিছু বাড়ি-ঘর ফেলে দিয়েছে। মাঠে ছোট ছোট পাটের চারা বাতাসে দুলছে। ইতস্তত মাঠের ভিতর মাথলা মাথায় চাষীরা পাটের জমিতে নিড়ান দিচ্ছিল আর আল্লা ম্যাঘ দ্যা, পানি দ্যা—এই গান গাইছিল। চৈত্রের খরা রোদ এবং শুকনো ভাবটা কেটে গেছে। এখন শুধু সবুজ প্রান্তর এবং মানুষের মুখে সুখের ইচ্ছা অথবা যেন বছর শেষ, দুঃখ শেষ—এখন অভাব কম, গরিব মানুষেরা অন্তত শাক-পাতা খেয়ে বাঁচবে। বিশেষ করে এইসব গ্রীষ্মের দিনে কচি পাট-পাতার শাক অথবা শুক্তোনি এক সানকি ভাতের সঙ্গে মন্দ নয় এবং যখন কোরবানির গোস্ত মুশকিলাসানের পাত্রটার নিচে যত্ন করে রাখা আছে, যখন মনে হচ্ছিল শেষ বয়সের সম্বল জোটন বিবিকে ধরে নিলে গোস্তের মতোই সস্তা হবে তখন সড়ক ধরে সামনের গ্রামটার দিকে হাঁটা যাক।

মুশকিলাসানের আধারে তেল নেই। দরগার ছইয়ের নিচে রসুন গোটা ভিজানো আছে। তার তেল বড় উজ্জ্বল আলো দেয়। তেল নেই বলে আর এ-অঞ্চলে তিনি রাতে মুশকিলাসানের লম্ফ নিয়ে ঘুরতে পারবেন না। দরগায় গিয়ে লম্ফে আবার তেল ভরতে হবে। ফকির সাহেবের ইচ্ছা ছিল রসুন গোটার তেলে মুশকিলাসানের লম্ফ জ্বালাবেন এবং ছোটদের চোখে সুর্মা টেনে আস্তানা সাহেবের দরগাতে রসুলের কাছে দোয়া, জোটনের জন্য দোয়া ভিখ মেগে নিবেন। কিছুই হল না।

মসজিদের কুয়া থেকে প্রথম জল তুলে পা ধুলেন ফকিরসাব। তারপর শতচ্ছিন্ন এক জোড়া কাপড়ের জুতো, যার ফাঁকে কচ্ছপের গলার মতো বুড়ো আঙুলটা বের হয়ে আসে এবং জুতোর ভিতর পা গলাবার সময় একটা ইষ্টিকুটুম পাখি ডেকে উঠলে ফকিরসাব ভাবলেন, দিনটা ভালোই যাবে। শেষে আবেদালির বাড়িতে ওঠার মুখেই ডাকতে থাকলেন, মুশকিলাসান সব আসান করেন এবং এইসব বলতে বলতে উঠেই তিনি বুঝতে পারলেন পরবের দিনে জোটন বাড়ি নাই। তিনি যেন এই উঠোন এবং ঝোপ জঙ্গলকে বললেন, ওনারে ডাইকা দিলে ভাল হয়। অনেক দূর থাইক্যা আইছি, আবার কবে আমু ঠিক নাই। তাই ভাবছি অরে নিয়া যামু। তার পর কারও উপর ভরসা না করে নিজেই ছেঁড়া লুঙ্গি

ঘাসের উপর বিছিয়ে বসে পড়লেন। খুব সন্তর্পণে মালা-তাবিজ খুলে পোঁটলা-পুঁটলি পাশে রাখলেন। অন্য কোনও দিকে তাকাচ্ছেন না। যেন সব ঠিকই করা আছে, উকিল বলা আছে, মৌলবী সাবকে বলা আছে আর দু-চারটে দোয়া। ফকিরসাব এবার গলা খেকারি দিয়ে চোখ তুলতেই দেখলেন, জালালি ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে জোটনকে খবর দিতে হাজিসাহেবের বাড়ির দিকে ছুটছে।

ফকিরসাব ছেঁড়া তফনের উপর বসে জামরুল গাছের ফাঁকে সেই অস্পষ্ট মুখ দেখতে পেলেন। জোটন আসছে। আগের শক্তিসামর্থ্য যেন গায়ে নেই। জোটন নিজের ঘরে ঢুকে গেল। ফকিরসাব জোটনকে আর দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি নানারকম শব্দে ধরতে পারছেন জোটন এখন আর্শিতে নিজের মুখ দেখছে। ভিজা শনের মতো চুল—কত কষ্টে খোঁপা বাঁধা! আর তিনি মুখ না তুলেও যেন ধরতে পারছিলেন, জোটন বেড়ার ফাঁকে ফকিরসাবের মুখ হাত পা অথবা সব অবয়ব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

ফকিরসাব গাছ-গাছালিকে যেন ডেকে বললেন, তাড়াতাড়ি করতে হয়।

ঘরের ভিতর জোটন সরমে মরে যাচ্ছিল। ঘরের ভিতর ফিসফিস্ শব্দ, আবেদালিরে আইতে দ্যান।

ফকিরসাব উঠোন থেকে বললেন, উকিল দ্যাখতে হয়।

জোটন এবার যেন গলায় শক্তি পাচ্ছে। ভাইবেন না। আবেদালি আইসা সব ঠিক কইরা দিব।

ফকিরসাব সঞ্চিত কোরবানির গোস্তের উপর হাত রেখে বললেন, ব্যালায় ব্যালায় রওনা হইতে হয়। না হইলে গোস্ত পইচা যাইব। বলে ফকিরসাব গোস্তের পুঁটলিটা নাকের কাছে এনে শুঁকে বললেন, গোস্তে মশলা নুন দিতে আপনের হাত কেমন?

এবার জোটন ঘরের ভিতর খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, ঘরে নেওয়ার আগে একবার পরখ কইরা দ্যাখতে সাধ যায় বুঝি!

—দ্যাখতে ইচ্ছা যায়, কিন্তু ব্যালা যে পইড়া আইতাছে।

জোটন দাঁত খুঁটছিল। মুখ কুলকুচা করে হাঁড়ির ভিতর থেকে পান সুপারি বের করে মুখে পুরল। তার পর ঝোপের ফাঁকে যখন দেখল জালালি আসছে, যখন দেখল গোপাটের অশ্বত্থ গাছের মাথা থেকে রোদ নেমে যাচ্ছে এবং যখন কামলা ফিরছে মাঠ থেকে, মাথায় পাট গাছের আঁটি, ঘাসের বোঝা, আর আবেদালি পরবের দিনও ঠাকুরবাড়ির কাজে গেছে—ফেরার সময় এখন, হয়তো সে ফিরছে, তখন জোটন ঠোট রাঙা করে বাবুর হাটের ডুরে শাড়ি পরে দেখল বুকের মাংস একেবারে শুকিয়ে গেছে। সে একটু ঠোঁট থেকে থুতু এনে, বুকে মেখে দিল। পাতলা থুতু দিয়ে শরীরের শুকনো ভাবটা কমনীয় করতে চাইছে অথবা মনে হল, ফকিরসাহেবের বুড়ো হাড় অঘ্রানী ধানের মতো—আশ্রয় দেবে, নিকা

করবে এবং ফাঁকা মাঠের মতো উদোম গায়ে রঙ্গরস করবে। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা—আল্লার মাশুল তুলতে এই বয়সেও গতর কম কৌশল করবে না।

বেলায় বেলায় আবেদালি এল। বেলায় বেলায় করণীয় কাজটুকু আবেদালি করে ফেলল। দুচারজন গাঁয়ের লোক জমা হয়েছে উঠোনে। আবেদালি সকলকে পান-তামুক খাওয়াল। হাজিসাহেবের ছোট বিবি একটা ছেঁড়া বোরখা দিল জোটনকে। আগুনের ভস্ম থেকে যে পেতলের বদনাটা তুলে এনেছিল, ফকিরসাহেবের পাশে সেটা রেখে দিল জোটন।

দুটো মেটে কলসি এনেছিল জোটন লাঙ্গলবন্দের বান্নি থেকে—যাবার সময় জোটন জালালিকে ডেকে কলসি এবং ঘরের সামান্য জিনিসপত্র অর্থাৎ গ্রীষ্মের দিনে সংগ্রহ করা ঝরা পাতা, পাটকাটি এবং দুটো সরা,—সব দিয়ে দিল। আর ছেঁড়া তফনে জোটন তার ভাঙা আর্শি, ঠাকুরবাড়ির বৌদের পরিত্যক্ত ভাঙা কাঠের চিরুনী, একটা সানকি আর সম্বলের মধ্যে কিছু ভাতের শেউই বাঁধা পুঁটলি হাতে তুলে নেবার সময়ই অন্যান্যবারের মতো আবেদালির হাত ধরে কেঁদে ফেলল। এবার নিয়ে চারবার নিকা, এবং এবার নিয়ে চারবার জোটন এই উঠোন ছেড়ে বাপের ভিটা ছেড়ে মিঞা মানুষের সঙ্গে খোদার মাশুল তুলতে চলে যাচ্ছে। ফকিরসাব পোঁটলা পুঁটলি যত্ন নিয়ে বাঁধছে। পিতলের বদনাটা হাতে নিয়ে দু'বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বদনা থেকে পানি চুষে খেলেন। তারপর বাকি পানিটুকু ফেলে দিয়ে—বাঁ-হাতে পেতলের বদনা, কাঁধে ঝোলাঝুলি এবং ডানহাতে মুশকিলাসান, মুখে আল্লার নাম অথবা রসুলের নাম নিতে নিতে গোপাটে নেমে যাচ্ছেন। জোটন এক হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে আবেদালির ঘরে ঢুকে বোরখাটা মাথার ওপর তুলে দিল। আবেদালিকে বলল, জালালির দিকে তাকিয়ে বলল, জালালিরে মাইর-অ ধইর-অ না ভাই। জালালিকে বলল, সময় মত দুইটা রাইন্দা দ্যাইস।

এসব কথা বলার সময়ই জোটনের চোখ থেকে জল পড়ছিল। কত দীর্ঘদিন পরে ফের এই নিকা এবং এদিনে সে তার মোট তেরটি সন্তানের কথা মনে করতে পারল। যেন তাদের জন্যই চোখে জল। কোথাও তার দীর্ঘদিন ঠাঁই হয় না। জোটন চতুর্থবার স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে এবং আল্লার মাশুলের জন্য এই যাত্রা। যদি কোনও কারণে আল্লার দরবার শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে সে ফের ফিরে আসবে এবং সোনালী বালির নদীতে অথবা বিলে শামুক তুলে, বাড়ি বাড়ি চিঁড়া কুটে, পরবে পরবে গেরস্থ মানুষের কাজ করে দুঃখে সুখে তার দিন কেটে যাবে।

বোরখা গায়ে জোটন চলে যাচ্ছিল। এই অঞ্চলের সকলে দেখল, আবেদালির দিদি জোটন ফের চলে যাচ্ছে। কবে আবার সন্তান-সন্ততি প্রসব করে ফিরে আসবে, কবে আবেদালি ফের ওর উত্তরদুয়ারি ঘরটা তুলে দিতে দিতে বচসা করবে জোটনের সঙ্গে, তা যেন সকলের জানা। হিন্দুপাড়ার মেয়েরা এই ঘটনায় খিলখিল করে হেসে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। দীনবন্ধুর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ খবর পেয়ে ড্যাফলগাছটার নিচে ছুটে এসেছে। মালতী ঝোপের ভিতর বেথুন ফল খুঁজছিল, সে জোটনকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকল, বৌদি দেইখা যান কাণ্ড। জুটি একটা ফকিরের লগে কই যাইতাছে। ঠাকুরবাড়ির বৌরা পর্যন্ত পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল। হাতে মুশকিলাসান, বগলে কোরবানির গোস্ত এবং গলায় মালাতাবিজ—ফকিরসাব ওপরের দিকে চেয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। গায়ে শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা কাঁথার সেলাইর মতো সেলাই সেখানে। যেখানে যে কাপড়টুকু পাওয়া গেছে তাই জুড়ে দিয়েছেন ফকিরসাব। ঠিক এই আল্লার দুনিয়ার মতো—যেখানে যা পাওয়া গেছে এই দুনিয়ার জন্য তিনি হাজির করেছেন। এই মাঠ, গাছপালা, পাখি এবং নদীর তীর, তরমুজ খেত সবই যেন এক শতচ্ছিন্ন সেলাই করা জোব্বা। বিচিত্র দোয়াঁশ মাটি এবং জলের রং-এ দুনিয়া রাঙিয়ে রেখেছেন আল্লা। তিনি এবার চোখ তুলে দেখতে পেলেন পেছনে জোটন বিবি—বোরখা পরে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার, তবু এই চেনা পথটুকু বোরখা পরে পার না হলে সম্মান থাকে না। তিনি তাকে জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে বললেন।

জোটন বোরখার ভিতরে পেতলের বদনা রেখে জোরে জোরে হাঁটার চেষ্টা করছে। এই গ্রাম মাঠ ফেলে সে চলে যাচ্ছে, নরেন দাসের বিধবা বোন মালতীকে এখন কিছু বলার ইচ্ছা। মালতীর হাঁসগুলি প্যাঁক প্যাঁক করছিল মাঠে। পুরুষ হাঁসটার জন্য মালতীর বড় কষ্ট। মালতীর শরীর আর আল্লার মাশুল তুলবে না ভেবে জোটনের ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল।

মাঠ ভেঙে কখনও নদী-নালা অতিক্রম করে অথবা বাঁশের সাঁকোতে ওঠার সময় ফকিরসাব জোটনের হাত ধরে পার করে দিচ্ছিলেন। তিনি সওদা করে ফিরছেন। হাতে পানিফলের মতো মুশকিলাসানের লম্ফ, তিনদিকে তিনমুখ, কাজল জমানো গর্তে ছোট একটি কাঠি। চারক্রোশের মতো পথ। জ্যৈষ্ঠ মাস বলে নদীতে জল বাড়তে শুরু করেছে।

ফকিরসাব জোটনকে একটা পলাশ গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে সামনের হাটে সওদা করতে গেলেন। নতুন মেমান ঘর আলো করে রাখবে। দূরবর্তী কোন দরগার পাশে ফকিরসাবের ছই দেয়া ছোট মাচানের ঘর। সাঁজ লাগলে দরগার কবরে কত মোমবাতির আলো, আলোতে খানিক সময় ঝোপ জঙ্গল সাদা হয়ে থাকে। তখন তিনি কালো রঙের আলখাল্লা পরে মুশকিলাসানের লম্ফ জ্বেলে অন্ধকার মাঠ ভেঙে গেরস্থ বাড়ির উঠোনে উঠে যান। মোটা গলায় হেঁকে ওঠেন মাঠ থেকে। গভীর রাতে মানুষেরা ভয় পায়—মুশকিলাসান আসান করে, বলতে বলতে উঠে আসেন। জবা ফুলের মতো চোখ লাল। রসুন গোটার তেল মুখে মেখে চোখ জবা ফুলের মতো করে না রাখলে—মানুষ রাতে ভয় পায় না, পয়সা দেয় না। তখন ফকিরসাবের মাচানে ফেরার স্পৃহা আর থাকে না। অন্ধকারের ভিতর, বিচিত্র সব ঘাসের ভিতর অথবা জমির আলে আলে এক ভয়ঙ্কর রহস্য জেগে থাকে। মনে হয় তাঁর এইসব অলৌকিক রহস্যের ভিতর আল্লা কোথাও না কোথাও অদৃশ্য হয়ে আছেন।

বাজার করে ফিরতে বেশিক্ষণ সময় নিলেন না ফকিরসাব। হাট পার হলে বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। পলাশ গাছের নিচে শুধোলেন, যাইবেন নাকি একবার বাবা লোকনাথের আশ্রমে?

জোটন বোরখার ভিতর থেকে বলল, তবে চাইর পয়সার মিসরি কিনা লন।

কিন্তু ফকিরসাব যেন সহসা মনে করার মতো বললেন, কোরবানির গোস্ত নিয়া যামু কি কইরা বাবার কাছে। তার চাইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে বাবার উৎসবে আপনেরে নিয়া যামু। সুতরাং আর দেরি করা ভালো নয়। বেলাবেলিতে পৌঁছাতে পারলে হয়। আরও ক্রোশখানিক পথ। ওরা জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করল।

ফকিরসাব বললেন, কতদিন ভাবছি একবার আপনের কাছে চইলা যাই। কিন্তু ভরসা আছিল না।

—ক্যান এই কথা কন!

—আমার ছই ছোট। মেলা বন-জঙ্গল। কবরখানা। বড় বড় শিরিষ গাছ। রাতে ডর লাগতে পারে।

আপনে আমার নয়নের মণি। বলার ইচ্ছা ছিল জোটনের কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এমন ভালোবাসাবাসির কথা বলতে পারল না।

এসময় বেলা পড়ে আসছিল। সূর্য মেঘনার অন্য পারে অস্ত যাচ্ছে। মাঠের পুকুরে অজু সেরে নামাজ পড়তে বসে গেলেন ফকিরসাব। জোটনও পাশাপাশি বসে—যখন কেউ নেই আশেপাশে—কেবল ফাঁকা মাঠ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, জোটন পা ভাঁজ করে ফকিরসাহেবের পাশে বসে পড়লে মনে হল তার সামনের গ্রামটাই বুঝি সেই প্রিয়

সোলেমানপুর। তার প্রথম সাদি সমন্দের কথা মনে হল। গ্রামের সে বড় বিশ্বাসের ছোট বিবি ছিল। সেদিন সে যেন বেগম। তার সন্তানেরাই হয়তো দূরের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোটন নিজের প্রথম সাদি সমন্দের কথা ভেবে আকুল হতে থাকল।

আস্তানা সাবের দরগাতে পৌঁছাতে ওদের রাত হয়ে গেল। চারদিকে কবরখানা। চারদিকে ঘন বন এবং মাঝে মাঝে শান বাঁধানো কবর, কেউ কেউ মোমের বাতি জ্বেলে দিয়ে গেছে। আজ কি বার, বুঝি কেউ কবর দিতে এসে সব কবরে মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেছে। অন্ধকার রাতে লাঠি ঠুকে ঠুকে নিজের আস্তানার ভিতর ঢুকে বললেন, ডর নাইগ বিবি। আপনে বোরখা খুইলা ইবারে হাওয়া খান। কবরের আলো থাইকা মুশকিলাসানের লম্ফটা জ্বালাইয়া আনতাছি।

ফকিরসাব লম্ফ জ্বালতে গেলে জোটন বোরখাটা খুলে রাখল। অন্ধকারে সে কিছুই টের করতে পারছে না। এমন ঘন অন্ধকার জোটন যেন জীবনেও দেখেনি। একটা কুকুর ডাকছে না, একটা মোরগ ডাকছে না। সে দূরবর্তী কোনও গ্রামে আলো পর্যন্ত দেখল না। যেন সে যোজন দূরে চলে এসেছে। ওর ভয়ে আতঙ্কে কান্না পাচ্ছিল। জঙ্গলের ভিতর শুকনো পাতার শুধু খচখচ শব্দ। মৃত মানুষেরা ইতিমধ্যেই যেন যুদ্ধের মহড়া দেবার জন্য যোজন দূর থেকে জিনপরী হয়ে নেমে এসেছে।

তখন দূরে মুশকিলাসানের আলো এবং শেয়ালের চিৎকার। ঝোপ অথবা গাছগাছালির ফাঁক থেকে ফকিরসাবকে কোনও রসুলের মতো মনে হচ্ছে যেন। সামনে অনেকগুলি অর্জুন গাছ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। তার নিচে নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে। জোটন নতুন কফিনের গন্ধ পাচ্ছিল। অথবা কারা যেন বলাবলি করছে, সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের ছোট বিবির পহেলা সন্তানের ইন্তেকাল হচ্ছে।

যারা কবরে কফিন নামাচ্ছিল জোটন তাদের দেখতে পাচ্ছে না। ফকিরসাব দরগার চারপাশটায় কেবল কি খুঁজে মরছেন লম্ফর আলোতে। কবর দিতে যারা এসেছে তারা সব এখন ফিরে যাচ্ছে। জোটন এই প্রথম এখানে মানুষের সাড়া পেল। ওদের হাতে হারিকেন। ওরা নিচের পথ ধরে মাঠে নেমে যাচ্ছে। বড় বিশ্বাসের পেয়ারের ধন সকলের মুখে ছাই দিয়ে গেল। আল্লার বড় বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন তিনি। বড় বিশ্বাসের নাম শুনতেই ছই-এর নিচে জোটনের মুখ শুকিয়ে গেল। সে ফকিরসাবের অপেক্ষায় বসে আছে, এলে খবরটা নেবে, কারণ লোকগুলি পথে যেতে যেতে সোলেমানপুরের বিশ্বাসের কথা বলছিল। বাকি কথা অস্পষ্ট। বাকি কথা কানে আসেনি। মানুষগুলিকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। হ্যারিকেনটা মাঠে দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে।

ওখানে কার ইন্তেকাল হল, জিজ্ঞেস করতেই ফকিরসাহেব আসানের আলোটা জোটনের মুখে তুলে ধরলেন। কিছুক্ষণ মুখে কি দেখলেন। তারপর খুব ঘন হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনের মুখে এই কথা শোভা পায় না বিবি। আপনে ফকিরসাবের

শেষ বিবি। বলে আরও কাছে মুখটা এনে তদগত চিত্তে দেখতে থাকলেন, তারপর একসময় আবেগে বলে ফেললেন, কথা দ্যান, আমারে ছাইড়া যাইবেন না।

—যামু না।

—ইবারে গোস্ত রাইন্দা ফ্যালান।

মাচানের নিচে নানা রকমের হাঁড়িপাতিল। ভাঙা এবং ভালো—সব রকমের। মাঠে জলাশয়। পিছনে নোনা ধরা ইটের প্রাচীন মসজিদ। ফকিরসাব লম্ফটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে দিলেন। সব জামা-কাপড়, মালাতাবিজ খুলে শুধু একটি নেংটি পরলেন। তারপর জলাশয় থেকে জল এনে দিলেন। রান্না হলে গোস্ত-ভাত খেয়ে তাড়াতাড়ি ছইয়ের ভেতরে ঢুকে মুখোমুখি বসে অন্ধকারে গল্প আরম্ভ করলেন।

আর যখন অন্ধকার এই শয়তানের রাজত্ব গিলে খাচ্ছে, যখন মনে হচ্ছিল এই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর পরী অথবা জিনেরা হেঁটে বেড়াচ্ছে তখন একদল ধূর্ত শেয়াল নতুন কবরের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। নেমে আসার সময় ওরা পরস্পর মাংসের লোভে খ্যাকখ্যাক করছিল। জোটন বলল, আমার ক্যান জানি ডর লাগতাছে।

ফকিরসাব জানেন, সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের ছোট বিবির বড় ছেলে কলেরায় মারা গেছে, জানেন শেয়ালেরা খাবার লোভে কবরে পা বাড়িয়ে গর্ত খুঁড়ছে। সুতরাং তিনি সান্ত্বনা দেবার মতো আদর করে বললেন, শিয়ালেরে এত ডরান! ডর নাই। অরা ক্ষুধায় এমন করতাছে। মনে আছে আপনের—পাঁচ বছর আগে আমার একবার ক্ষুধা পাইছিল। আপনে শুটকি-মাছ দিয়া প্যাট ভ-ই-রা খাওয়াইছিলেন। প্যাট ভরলে অরা হুক্কাহুয়া করব না।

জোটনের স্মৃতিতে সব ভেসে উঠেছে। সেদিন ফকিরসাব পরিপাটি করে ছেঁড়া মাদুরে খেতে বসেছিলেন। তিনি খেতে বসে দু’বার আল্লার নাম উচ্চারণ করে আকাশ দেখেছিলেন। আকাশ পরিষ্কার। বড় তকতকে সেই উঠোনে ঝকঝকে আকাশের নিচে বসে গব গব করে খেতে পারছিলেন না। যেমন পরিপাটি করে বসেছিলেন, তেমনি ধীরে-সুস্থে এক সানকি মোটা ভাত শুটকির বর্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ মেখে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছিলেন। ঠিক যেন এই মাচানের মতো। কোনও জবরদস্তি নেই। নিচে একটা দুটো ভাত পড়েছিল, তিনি আঙুলের ডগায় তুলে সন্তর্পণে মুখে পুরে...যেন এই মোটা ভাত ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না...আল্লার বড় অমূল্য ধন। জোটনের এখন মনে হচ্ছে ফকিরসাবের খুঁটে খুঁটে খাওয়ার স্বভাব চিরদিনের। এখন এই মাচানে বসে অন্ধকারে খুঁটে খুঁটে খাওয়ার শখ। শরীরে শক্তি নেই। তবু ফোকলা দাঁতে মাংস খাওয়ার মতো হাতটা যত্রতত্র নাড়ছেন। এভাবে ধীরে ধীরে জোটন বিবি নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। এখন আর শেয়ালের চিৎকার কানে আসছে না। সোলেমানপুরের বড় বিশ্বাসের কথা মনে পড়ছে না। তেরটি সন্তানের জননী জোটন—এই অন্ধকারে চুপি দিলে কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না।

তার বড় বেটা কাফনের ভিতর হাত-পা শক্ত করে শুয়ে আছে, অথচ জোটনের জননী হবার শখ মরছে না। সে ফকিরসাবের কোলে মাথা রেখে বলল, রাইতের ব্যালা চান্দের লাখান মুখখানা একবার দ্যাখমু ফকিরসাব।

ধীর সুস্থির ফকিরসাব এই মুহূর্তে খুঁটে খুঁটে খেতে এত ব্যস্ত যে, চান্দের লাখান মুখখান, আপনে আমার নয়নের মণি অথবা পানির মতো গড়-বন্দী কইরা রাখতে ইসছা যায়—এ ধরনের কোনও কথাই গলা থেকে উঠে আসছে না। জননী জোটনও সে কথার উত্তর পেতে জবরদস্তি করল না। খুঁটে খুঁটে ভাত খেতে সেও বসে গেল।

ছোটকাকা লালটু পলটুকে পড়ার ঘরে ধমকাচ্ছেন। সোনার পড়া হয়ে গেছে, ওর এখন ছুটি। সুতরাং ওর একা-একা পড়ার ঘরে ভাল লাগছিল না। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে মনে মনে খুঁজতে থাকল। মা এখন রান্নাঘরে, তিনি আতপ চালের ভাত রান্না করছেন। আতপের ভাত আর কৈ মাছ ভাজা আর সুগন্ধ ঘি। সোনা ক্ষুধার্ত ভাবল নিজেকে। সে জবা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ে নিল একটা। ওদের পড়া শেষ হলে একসঙ্গে মা খেতে দেবেন। সে এখন বাড়ির চারদিকে জ্যাঠামশাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে হেঁটে যাচ্ছে। বাগানে দোপাটি ফুল ফুটে আছে। বেলফুলের গন্ধ আসছে। ঝুমকোলতা গাছে গাছে দুলছিল। নানারকমের ফুল এই বাগানে। শ্বেত জবা, রক্ত জবা, চন্দনি জবা। কত রকমের জবা ফুল। সকালে সে বড় জেঠিমার সঙ্গে ফুল তোলার সময় সব ফুলের নাম মুখস্থ করে ফেলেছে। সে যেতে যেতে দেখল, দোপাটি ফুলগাছের নিচে যে সবুজ ঘাস রয়েছে, সেখানে জ্যাঠামশাই শুয়ে আছেন। সে চুপি চুপি ফুলের রাজ্যে ঢুকে জ্যাঠামশাইর পাশে বসল; জ্যাঠামশাই মাথার নিচে হাত রেখে সন্তর্পণে অন্য হাতটা প্রায় আয়নার মতো চোখের সামনে এনে ধরে রেখেছেন। যেন সেই হাতের ভিতর তাঁর বিশ্বদর্শনের পালা চলছে। সোনা এবার চুপি চুপি জ্যাঠামশাইর পেটের ওপর চেপে বসল। তারপর উঁকি দিল পাতার ফাঁক দিয়ে। সে দেখল কত সব বিচিত্র রঙের প্রজাপতি ফুলের মরা ডালে বসে আছে। সোনা বুঝল, জ্যাঠামশাই হাত দেখছেন না, গাছের সব প্রজাপতি দেখছেন। সোনা তখন পেটের ওপর চেপে বসে ডাকল, জ্যাঠামশয়।

মণীন্দ্রনাথ উত্তর করলেন না। শুধু হাসলেন।

সোনা বলল, তামুক খাইবেন? তামুক আইনা দিমু?

মণীন্দ্রনাথ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

সোনা এবার বলল, আপনের ক্ষুধা লাগে না জ্যাঠামশয়?

মণীন্দ্রনাথ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

সোনা এবার রেগে বলল, আমি-অ আপনেরে তবে গ্যাৎচোরেৎশালা কমু।

মণীন্দ্রনাথ এবারেও হাসলেন। তারপর হাত তুলে মরা সেই ডালে বিচিত্র রঙের সব প্রজাপতি দেখিয়ে নিজে দু-তিনটে ঘাস মুখে পুরে দিলেন। তার পর দীর্ঘ সময় ধরে মুখটা হাঁ করে রাখলেন— যেন বলতে চাইছেন, আমার মুখ দ্যাখো, গহ্বর দ্যাখো, আমার আলজিভটা কত বড় দ্যাখো। তখন সামসুদ্দিন কি কাজে এ পাড়ায় নৌকা নিয়ে উঠে আসছে। ঈশম এই সকালে নাও নিয়ে আউশ ধান কাটতে চলে গেল। এটা ভাদ্র মাস।

মণীন্দ্রনাথ, দোপাটি ফুলের সব বড় বড় গাছ, গাছের ভিতর নিজেকে কেমন আড়াল করে রেখেছেন। কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সেই গাছের ঝোপে ঢুকে গেলে সোনাকেও আর দেখা গেল না। কেবল মনে হয় সেখানে সব ফুলের গাছ আছে আর অজস্র দোপাটি ফুল, লাল নীল হলুদ অথবা লাল রঙের ফুল ফুটেছে আর ঝরে পড়ছে। আর ঘাট পার হলে গোপাটের জল, জলে জলে নৌকা যাচ্ছে। বাবুর হাটের শাড়ি যাচ্ছে নৌকায়, বাদাম তুলে সোনালী বালির নদীতে এখন গিয়ে এইসব নৌকা পড়বে। সামু ফতিমার হাত ধরে ছোটকর্তার কাছে যাচ্ছে।

সামু ছোটকর্তাকে দেখেই বলল, কর্তা আপনের ডে-লাইটটা নিতে আইলাম।

ছোটকর্তা বললেন, ডে-লাইট দিয়া কি হইব?

—ফুলুনের সাদি দিতাছি।

—কোনখানে দিবি?

—আসমানদির চরে।

—বৈঠকখানায় গিয়া ব’। আমি দ্যাখতাছি লাইটের অবস্থাটা কি।

সামু ফুলের বাগান অতিক্রম করার সময় দেখল বড়কর্তা দোপাটি গাছের ভিতর শুয়ে আছেন। মাথার নিচে হাত এবং সোনা, বড়কর্তাকে জড়িয়ে দুর্বা ঘাসের উপর শুয়ে আছে। সন্তর্পণে ওরা উভয়ে গাছের ভিতর কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ফতিমা সামুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সোনাবাবুকে দেখতে পেল। বলল, আমি যাই বা’জি।

—কই যাবি?

—বড় ঠাকুরের কাছে।

—যাও, কিন্তু বড়কর্তারে ছুঁইয় না। সোনাবাবুরে ছুঁইয় না। এইসব ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ এবং লেবুর ঝোপ পার হলে গ্রামের পথ। ফতিমা ঘুরে গিয়ে সেই পথের ওপর বসল। ডাকল, অ সোনাবাবু!

সোনা পিটপিট করে তাকাচ্ছে ঝোপের ভিতর থেকে। সে বলল, তুই!

—বা'জীর লগে আইছি। ফিক করে হেসে দিল ফতিমা।

ফতিমার কোমরে একটা বাবুর হাটের ছোট শাড়ি জড়ানো।

নাকে নথ, ছোট চোখ এবং সুর্মাটানা চোখে। পায়ে মল। ফতিমা নড়লে অথবা হাঁটলে পায়ে ঝুমঝুম শব্দ হয়। গায়ের রঙ সবুজ এবং ঘন পাতার রঙ মুখে। সোনা বলল, ভিতরে আইবি?

—কি কইরা যামু?

—ক্যান, দোপাটি গাছগুলির ভিতর দিয়া আয়।

ফতিমা ফুলের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিল। সে লেবুর ঝোপে ঢুকে সোনার পাশে একটা পোষা পাখির মতো মুখ করে ফুলের মরা ডালে সেইসব প্রজাপতি দেখল। আর অবাক ফতিমা—সে লক্ষই করেনি, ঠিক পায়ের কাছে, একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ, গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে, নিচে সেই আশ্বিনের কুকুর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ছে। ফতিমাকে সামান্য অপরিচিত মনে হচ্ছিল। কুকুরটা মুখ হাঁ করে ঘেউঘেউ করবে ভাবছিল —কিন্তু যা ভাব সোনাবাবুর সঙ্গে, কুকুরটা আর কোনও কথা বলল না। মণীন্দ্রনাথ তেমনি শুয়ে আছেন। ডালপালা অতিক্রম করলে অফুরন্ত আকাশ, সেখানে মেঘের ভিতর অনেকদিন আগের সোনালী বালির চরে নৌকার পালের মতো একখানা মুখ ভাসতে দেখলেন। আর সেই অভ্যাস মতো একই কবিতার পাখিরা সারা মুখের ওপর উড়তে থাকল, তিনি যেন বলছেন, আই হ্যাভ একজামিন্‌ড অ্যান্ড ডু ফাইন্ড অল দ্যাট ফেভার মি, দেয়ার'স নান আই গ্রীভ টু লিভ বিহাইন্ড, বাট ওনলি, ওনলি দি।

ফতিমা নথ পরে পোষা পাখির মতো ঝোপের ভিতরে বসেছিল। সে পাগল ঠাকুরের কথা শুনে হাসছিল। কিছুই বুঝতে পারছে না। কিছু বুঝতে না পারলে ফতিমা হাসে। সোনা বলল, জ্যাঠামশয় ইংরাজি কইতাছে। আমি যখন জ্যাঠামশাইর মতো বড় হমু, ইংরাজিতে কথা কমু। আমি এ বি সি ডি পড়তে পারি।

ফতিমা পাল্টা গাইল,—বা'জী কইছে আমারে-অ ইস্কুলে ভর্তি কইরা দিব। আমি-অ পড়ুম।

সোনা বলল, ভোরে কলাপাতায় খাগের কলমে এ বি সি ডি লেখলাম। তারপর সে বলতে পারত, নির্মল চরণে, রত্নে বিভূষিত কুণ্ডল করণে বললাম। কারণ পড়া শেষ হলে প্রতিদিনের মতো সোনা ঘাটে দাঁড়িয়ে আজ খাজা-পাতাগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে। তারপর বর্ষার জলে ভাসিয়ে দেবার সময় সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করতে করতে বলেছে, আইছেন সরস্বতী যাইবেন কই—হাতে পায়ে ধইরা বিদ্যাখানি লই। কিন্তু সোনা কিছুই বলল না। কারণ, জ্যাঠামশাই বড় বড় চোখে তাকাচ্ছেন। কোনদিকে চলে যাবার আগে

তিনি এমন করেন। সোনা এবং ফতিমার কথা শুনে তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। ফতিমা এক কথা বললে, সোনা দু’কথা বলছে।

—বা’জী কইছে দন্দিরহাটে যাইয়া বই আইনা দিব। মসজিদের বারান্দায় বইসা আমি পড়মু।

পাগল ঠাকুর তখন বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

সোনা বলল, আপনে গ্যাৎচোরেৎশালা।

এবার পাগল ঠাকুর সোনাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সেই ঝোপ থেকে উঠে বাইরে এসে সোনাকে একটা প্রজাপতি ধরে দিতে সাহায্য করার সময় ফতিমা পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। সোনা সেই প্রজাপতি নিয়ে কৌটার ভিতর ধরে রাখবার সময় বলল, এই, প্রজাপতি লাগব তর?

—দ্যান।

—নিবি কি কইরা?

ফতিমার গলাতে পাথরের মালা। ফতিমা কোমরের কাপড়টার প্যাঁচ খুলে ফেলল। একটা কচুর পাতা তুলে আনল। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে দু’জনে প্রজাপতিটা কচু পাতায় রেখে মুখটা বন্ধ করে দিল। তারপর ফতিমার আঁচলে বেঁধে দিয়ে আবার জ্যাঠামশাইর পিছনে ছুটতে থাকল। মণীন্দ্রনাথ ওদের নিয়ে অর্জুন গাছটা পর্যন্ত হেঁটে গেছেন। এখন বর্ষাকাল—সুতরাং নাও, নদী, মানুষ এই শুধু দৃশ্যমান জগৎ। এখন কত তালের নৌকা, আনারসের নৌকা, করলার নৌকা নদী ধরে নেমে যাচ্ছে। এই নদী আর নাও দেখলেই মনে হয় কোথাও পলিন শুয়ে আছে। পলিনের স্মৃতি, পলিনের চোখ গুণ দেওয়া নৌকার মতো শুধু টানছে আর টানছে।

দক্ষিণের ঘরে লালটু পলটু এখনও পড়ছে। ওদের ছুটি হয়নি। ওরা সোনাকে পুকুরপাড়ে ঘুরতে দেখে চটে গেল। পুকুরের অন্য পাড়ে সোনা, পাগল জ্যাঠামশাই এবং টোডারবাগের সেই টরটরি মেয়েটা। যেন এক হরিণশিশু লাফায় আর নাচে, সোনাকে পেলে তো কথাই নেই—শুকনো দিন হলে মাঠে ছুটে গিয়ে যব খেতে হারিয়ে যেত। ওদের ছুটি হয়নি। সোনার ছুটি হয়ে গেছে। ওদের রাগ বাড়ছিল। সোনা মেয়েটার আঁচলে কি যেন বেঁধে দিচ্ছে। ওরা ক্ষেপে গেল। পলটু বলল, দ্যাখলি, সোনা ফতিমারে ছুঁইয়া দিল।

তখন অর্জুন গাছের নরম ত্বকের ওপর পিঠ রাখলেন মণীন্দ্রনাথ। সামনে বিলের জমি, জমিতে জল থৈথৈ করছে, দূরে কোথাও ধানখেতের ভিতর কোড়া পাখি ডাকছিল। নদীতে নৌকা, গ্রামোফোনে গান—নদী আমারে ভাসাইয়া লইয়া যাও। আর বর্ষার অবয়বে শুধু এই যেন প্রার্থনা—আমারে ভাসাইয়া লইয়া যাও। সুতরাং এখন এই দুই বালক-বালিকার সঙ্গে এই জলে ভেসে যেতে ইচ্ছা হল মণীন্দ্রনাথের।

ফতিমা ডাকল, সোনাবাবু।

সোনা বলল, কি!

—আমারে একটা লাল শাপলাফুল দিবেন?

—দিমুনে। তখন সামু ফিরছে। হাতে তার ডে-লাইট। সে কিছুতেই নরেন দাসের বাড়ির দিকে গেল না। সে সোজা পুকুর পাড়ে নেমে এল। এবং দূরে একবার চোখ তুলে গাছগাছালির ফাঁকে মালতীকে দেখার সময় মনে হল বাড়িটা বড় খালি খালি লাগছে। মালতী কি এখানে নেই। সে কি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে! ওর কেন জানি একবার বেহায়ার মতো মালতীদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা হল। অথচ পারছে না। কোথায় যেন ক্রমে সংশয় ওকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। সে তখন অন্যমনস্ক হবার জন্য ডাকল, ফতিমা কই গ্যালি?

ফতিমা সোনাবাবুকে বলল, আমি যাই। সে ছুটে চলে গেল। সামসুদ্দিন নৌকায় উঠে লগি বাইতে থাকল। কি ভেবে ফতিমা বলল, বা'জী, সোনাবাবু কইছে আমারে একটা লাল শাপলাফুল দিব। সামু উত্তর না করে মেয়ের মুখ দেখল—মেয়ে তার বড় চঞ্চল। চোখ দুটোতে সব সময় দুষ্টুমির হাসি। মেয়ে এখনও অর্জুন গাছটার নিচে কি খুঁজছে। সামু দেখল, গাছটার নিচে কেউ নেই। ফতিমাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

তখন সোনা ক্ষুধার জন্য এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকে ধনবৌকে জড়িয়ে ধরল। বলল, মা ভাত খাইতে দ্যাও। ক্ষুধা লাগছে।

ধনবৌ সোনার জন্য পিতলের মালসা থেকে সরু আতপ চালের ভাত বাড়ছিল। বলল, পিঁড়ি পাইতা বস।

লালটু খাচ্ছিল। সে পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। সোনার জন্য মার এমন সোহাগ ভাল লাগছিল না। মা ওকে বড় কৈ মাছ ভাজা দিয়েছিল। সে কিছুতেই আর ক্ষোভ সামলাতে পারল না। বলল, মা, সোনা ফতিমার কাপড়ে কি বাইন্ধা দিছে।

সোনা তাড়াতাড়ি ভয়ে মার গলা ছেড়ে বলল, না গ মা।

লালটু চিৎকার করে বলল, মিছা কথা কইস না। সে পলটুকে সাক্ষী রাখল।

পলটু বলল, তুই ফতিমারে প্রজাপতি ধইরা দিছস।

শশীবালা বাইরে বড় শিঙি মাছের গলা কাটছিলেন। তিনি এমন কথা শুনে হৈহৈ করে ছুটে এলেন। ধনবৌ ভীত হয়ে পড়ছে। কারণ, এখন এই ভোরে শাশুড়িঠাকরুণ জাতপাত নিয়ে অনর্থ বাধাবেন। বাছ-বিচারের কথা বলবেন। অশুচির কথা, সোনা অমঙ্গল

ডেকে আনছে—আরও কত রকমের কথা হবে কে জানে। সুতরাং ধনবৌ ভাতের থালা রেখে বলল, সোনা, বাইরে যাও। তুমি সান কর আগে।

সোনা বলল, না আমি সান করমু না। আমার ক্ষুধা লাগছে। আমারে খাইতে দ্যাও।

ধনবৌর মাথা কেমন গরম হয়ে উঠছে। এই নিয়ে সারাদিন শশীবালা গজগজ করবেন। সে কঠিন গলায় বলল, সোনা ঘরের বাইরে যাও কইতাছি।

সোনা বলল, আমার ক্ষুধা পাইছে। খামু। খাইতে দ্যাও আমারে। লালটু বলল, না, খাইতে পাইবি না, সান না করলে খাইতে পাইবি না। ধনবৌ ধমক দিল লালটুকে। পেতলের মালসাতে অবশিষ্ট যে ভাত ছিল সবই ধনবৌ বাইরে বের করে দিল। মাছ ভাজা, সব আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিল। সোনার দুঃখ বাড়ছে তখন। জিদ বাড়ছে। মা তার খাবার আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মা তাকে স্নান করতে বলছে। সোনা পিঁড়িতে বসে থাকল। সে উঠল না। সে রাগে, অভিমানে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে থাকল।

ধনবৌ বলল, ভাল হইব না সোনা। তোমার পিঠে পড়ব কইতাছি। ভাল চাও তা উইঠা যাও।

বাইরে শাশুড়িঠাকরুণের গজগজ করা ক্রমে বাড়ছে। সোনা কিছুতেই উঠছে না। এইসব হেনস্থার জন্য একমাত্র সোনাকে দায়ী ভেবে, সোনার পিঠে ধনবৌ অমানুষিকভাবে আঘাত করতে থাকল। সোনার দম বন্ধ হয়ে আসছে; সোনা কিছুতেই পিঁড়ি ছেড়ে উঠছে না। একান্নবর্তী পরিবার এবং সংসারের ভিন্ন ভিন্ন জ্বালা ধনবৌকে এই মুহূর্তে চরম কুৎসিত করে তুলল। সোনার চুল ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এল।—খাড়াও চুপ কইরা। মুখে য্যান রা থাকে না। বলে ধনবৌ নিজে চান করে এল এবং এক কলসী জল ঢেলে দিল সোনার মাথায়।

আর কাফিলা গাছের নিচে তখন সেই আশ্বিনের কুকুর। পাশে মণীন্দ্রনাথ সোনার কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না। দুঃখে নিজে নিজের হাত কামড়ে ধরছেন। হাত থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল।

ঘাটে ফতিমা নৌকা বাঁধলে বলছিল, বা'জী, সোনাবাবু আমারে প্রজাপতি ধইরা দিছে।

সামসুদ্দিন কেমন অন্যমনস্কভাবে বলল, জীবেরে কষ্ট দিতে নাই। ছাইড়া দ্যাও!

ফতিমা প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দেবার জন্য আঁচল খুলে দেখল, প্রজাপতিটা উড়ছে না। প্রজাপতিটা মরে গেছে।

বাইরে ইতস্তত মুরগি চরে বেড়াচ্ছিল। ভুখা পেটে জালালি ঘরের দাওয়ায় বসে। সামসুদ্দিন এবং তার মজলিস, অথবা ভিতর বাড়িতে অলিজানের রান্না গোস্ত (মেহমানদের ভোগের জন্য) সবই বিসদৃশ। জালালি কচুর ঝোপ অতিক্রম করে মাঠে দৃষ্টি দিল। ধানখেতে কিছু হাঁস শব্দ করছে—প্যাঁক প্যাঁক। ওর পেট মোচড় দিয়ে উঠল। মকবুলের আতাবেড়াতে বাছ-পাট শুকোচ্ছে। তিন চার দিন ধরে বৃষ্টি হয়নি বলে মাটি শুকনো, ঘাস শুকনো। খামারবাড়িতে জামরুল গাছ। গাছে জামরুল ফল ঝুলছে। এবং রোদের জন্য ওদের পাখির মতো মনে হচ্ছিল। আর গ্রামময় রসুন পেঁয়াজের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। আর হাঁসগুলি তখনও গোপাটের ধানখেতে প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছে। সুতরাং জালালি বসে থাকতে পারছে না। মালতীর হাঁসগুলি আবার এই মাঠে। মিঞা মাতব্বরেরা মজলিস শেষ করে গোসলে যাচ্ছে। জালালি অলিজানের পাছদুয়ারে বসেছিল—চোখমুখ শুকনো এবং কাতর কণ্ঠ। অলিজান যেন তার এই প্রাচুর্যকে জালালির চোখের উপর ভাসিয়ে দিল। মেমানগণ বর্ষার জলে পানিতে গোসল করতে গেল। ওরা ডুব দিল অথবা জলে সাঁতার কাটল, তারপর নামাজ শেষ করে শীতলপাটিতে খেতে বসে গেল গোল হয়ে। বেশ খাওয়া—মাছের ছালোন, মুরগীর গোস্ত, রসুন সম্বারে মুগের ডাল। ওরা খেয়ে সানকিতে কুলকুচা করল। ওরা একই বদনার নলে মুখ রেখে পানি খেল। ওরা কোনও উচ্ছিষ্ট খাবার রাখল না। জালালির বসে থেকে হাঁটু ধরে গেছিল। জালালি থুতু গিলে শেষ পর্যন্ত নিজের কুঁড়েঘরটাতে আশ্রয় নিয়ে সকলের প্রতি এবং আল্লার প্রতি ক্ষুব্ধ কথাবার্তা নিক্ষেপ করে শান্তি পাচ্ছিল। মালতীর হাঁসগুলি প্যাঁক প্যাঁক করছে গোপাটের ধানখেতে; সুতরাং সে গামছা পরে গোপাটের জলে শালুক তুলতে নেমে গেল।

মেমান সকল চলে গেল। সামসুদ্দিন ঘাটে সকলকে বিদায় জানাল। ওদের নৌকা গোপাট ধরে চলতে থাকল। কিছু পাটখেত অতিক্রম করলে নৌকাগুলি আর দেখা গেল না—মাঝে মাঝে লগির ডগাটাকে উঠতে নামতে দেখা গেল। ওরা পুবের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। পুবের বাড়ির মালতী অথবা নরেন দাসের বিধবা বোন মালতীর কথা মনে হল সামসুদ্দিনের। হিজল গাছের ইস্তাহারটাকে কেন্দ্র করে যে বচসা এবং অপমানে উভয়ে ক্ষত-বিক্ষত ছিল—এ সময়ে সবই কেমন অর্থহীন লাগল। বার বার সেই এক ইস্তাহার ঝুলত। অর্থাৎ এই দেশ সামুর, এই দেশ সামুর জাতভাইদের। গাব গাছটার নিচে

মালতীর সঙ্গে কতদিন দেখা—কিন্তু মালতী কথা বলত না। কৈশোর বয়সের কিছু স্মৃতি মনে করে কেমন কষ্ট বোধে পীড়িত হল সামু।

ফতিমা পাশ থেকে ডাকল, বা'জান।

সামু কেমন আঁৎকে উঠল, কিছু কইলি?

—বা'জান, মায় আপনেরে ডাকতাছে!

সামু ফতিমার মুখ দেখে, জলের নীল রঙ দেখে, এই ঘাস এবং মাটি দেখে, ক্রমশ সে কেমন ইসলাম প্রীতির জন্য এক গভীর অরণ্যের ভিতর ডুবে যেতে থাকল। সেই অরণ্যে সে দেখল কোনও এক ফকিরসাব ধর্মের নিশান হাতে নিয়ে মুশকিলাসানের আলোতে পথ ধরে শুধু সামনের দিকে হাঁটছেন। আলোর বৃত্তে বৃদ্ধের মুখ—অস্পষ্ট এক ইচ্ছার তাড়নাতে তিনি ক্লান্ত। সামু বার বার ডেকেও সেই শীর্ণ ক্লান্ত ফকিরকে ফেরাতে পারছে না। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন এবং তিনি সামুকে শুধু অনুসরণ করতে বলছেন।

ফতিমা ঘুরে এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, মায় আপনেরে ডাকতাছে।

সে ভিতর বাড়িতে ঢুকে গেল। তার বিবির খালি গা, নাকে নথ। বিবির চোখ ছোট, সুর্মা-টানা। হাতে নীল কাচের চুড়ি। পরনে ডুরে শাড়ি। গায়ে সেমিজ নেই, কাপড়ের নিচে সায়া নেই। সাদাসিধে এক প্যাঁচে কাপড় পরনে, সুতরাং শরীরের সকল অবয়বই প্রায় স্পষ্ট। অলিজানের শরীরটা এখন গাভীন গরুর মতো। শুধু যেন শুয়ে থাকতে পারলে বাঁচে। অথচ চোখ সুর্মাটানা বলে ইচ্ছার চেয়ে চোখে আবেগ বেশি। সে বলল, বেলা বাড়ে না কমে? আপনে খাইবেন না?

সামু তক্তপোশে খেতে বসল। ওর বিবি কাছে বসে খাওয়াল। সামুকে খুব চিন্তিত দেখে বিবি বলল, কি ভাবতাছেন?

সামু উত্তর দিল না। নিঃশব্দে খেয়ে যেতে থাকল।

—কি, কথা কন না ক্যান?

সামু বিরক্ত হল। বলল, তর সব কথায় কাম কি! দুইডা ভাত দিবি তা দ্যা। কথা বাড়াইস না।

অলিজান বলল, কি কথা বাড়াইলাম?

সামু মুখ তুলে অলিজানের মুখ দেখল, চোখ দেখল। অলিজানের চোখে কি যেন একটা আছে—যা দেখলে সে সব রাগ দ্বেষ হিংসা ভুলে যায়। সে বলল, আমি ভোটে লীগের তরফে খারমু ঠিক করছি। ছোট ঠাকুরের বিরুদ্ধে খারমু।

—আপনের মাথায় যে কি ঢুইকা পড়ে না! বুঝি না! ক্যান, কী দায় পড়ছে ওই কাইজ্যা ডাইকা আননের। ছোট ঠাকুর আপনের কী ক্ষতি করছে? তিনি ত খুব ভালো মানুষ।

সামসুদ্দিন বলল, আমি কইছি তাইন খারাপ মানুষ! বলে সে উঠে পড়ল। হাত মুখ ধুলো এবং যখন দেখল বেলা পড়তে দেরি নাই—ধনু শেখ পাটের আঁটি ঘরে তুলছে তখন নাও নিয়ে এবং ধনু শেখকে নিয়ে জলের ওপর ভেসে গেল। সে সব ঝোপজঙ্গল ভেঙে পুকুরের জল কেটে মাঠে গিয়ে পড়ল। এখন মসজিদের চালে মোরগ হেঁটে বেড়াচ্ছে। এখন গরুছাগল সব উঠোনের উপর। বাড়ির সকল পুরুষরাই খাটতে গেছে। শুধু মনজুর নিজের জমি চাষ করে। হাজি সাহেবের কিছু জমি আছে। নয়া পাড়ার ইসমতালী বড় গেরস্থ। অলিজানকে সাদি করে সামু ভাবল, ইসমতালী-সাব এবার তার কথা বলবে। কিন্তু বড় হিন্দু ঘেঁষা লোক। সঙ্গে সঙ্গে সামুর মুখটা কঠিন দেখাল। আর এ-পাশের শালুকের জমি অতিক্রম করে জঙ্গলের ভিতর হাঁসের শব্দ পেতেই সে চোখ তুলে তাকাল। মনে হল ঝোপের ভিতর কোনও মানুষের চিহ্ন যেন। সে বলল, ঝোপের ভিতর ক্যাডা?

ঝোপের ভিতর থেকে কোনও মুখ উঁকি দিল না। আশেপাশে বেতঝোপ এবং শ্যাওড়া গাছ। কিছু সোনালী লতা শ্যাওড়া গাছটাকে ঢেকে রেখেছে। একদল হাঁস ভয়ে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে পুবের বাড়ির দিকে ছুটছে। আর তখন সে দেখল পানির তলা থেকে কাদামাটি সব উপরে উঠে আসছে। যেন কোনও গো-সাপ একটা বড় সাপকে ধরে পানির নিচে সামলাতে পারছে না, যেন পানির নিচে ঝোপের পাশে একটা প্রাগৈতিহাসিক জীব হেঁটে বেড়াচ্ছে।

সামু পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ধনু শেখ নৌকা থামিয়ে দিল। এবং নৌকাটাকে ঝোপের পাশে নিয়ে যেতেই দেখল জলের ওপর শাপলা-শালুকের পাতার ফাঁকে জালালি মুখ জাগিয়ে নিশ্বাস ফেলছে।

সামু বলল, আপনে এহানে কি করতাছেন?

জালালি গলাটা কিঞ্চিৎ তুলে বলল, শালুক তুলতাছি রে বা'জী।

—এহানে কি শালুক হইছে?

—হইছে। ইট্টু ইট্টু হইছে। বলে সে ডান হাতে একটা শালুক তুলে দেখাল সামুকে। বলল, বড় হয় নাই, কষা। তারপর জালালি বিকালের রোদে মুখ রেখে বলল, তর চাচায় ফাওসার গয়না নৌকায় মাঝি হইয়া গ্যাল কবে! না খত, না পয়সা! খাই কি, ক! এয়ের লাইগ্যা, শালুক তুইল্যা চিবাইতাছি।

জালালি গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রেখেছে। এবং জালালির চোখ দুটোতে আতঙ্ক। জালালির শুকনো মুখ দেখে সামুর কষ্ট হতে থাকল। শাপলা-শালুকের জমি পার হলে

ধানখেত। মালতীর হাঁসগুলি ধানখেতের ভিতর ভয়ে ভয়ে ডাকছে। সে আকাশে কোনও বাজপাখি উড়তে দেখল না—কোনও ঝোপজঙ্গলে শেয়ালের চোখ দেখল না—শুধু জালালির মুখটা লোভের জন্য পাপের জন্য ধীরে ধীরে বীভৎস হয়ে উঠছে, যেন মুখটা এখন যথার্থই শেয়ালের মতো।

জালালি তার জায়গা থেকে এতটুকু নড়ল না। দু'হাতে হাঁসটার গলা জলের নিচে টিপে ধরেছে। এতক্ষণ ধরে সংগ্রামের পর সে ক্লান্ত! সামুর চাকরটা এখন লগি বাইছে। হাঁড়িটা বাতাসে ভেসে দূরে সরে যাচ্ছে। সামু গোপাটের অশ্বত্থ গাছটার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেলে গাল দিল জালালি, নির্বংশা। এহানে কি করতাছেন? তর মাথা চিবাইতেছি। বলে সে একটা গিরগিটির মতো জলে সাঁতার কাটতে থাকল। হাঁসটা ওর ডান হাতে। এবং হাঁসটাকে সে জলের নিচে সব সময় লুকিয়ে রাখার জন্য এক হাতে সাঁতার কেটে হাঁড়িটাকে যখন আয়ত্তে আনল তখন সামু অনেক দূরে—তখন বিকেলের রোদ সরে যাচ্ছিল এবং তখন আকাশে নানা রঙের মেঘ জমে ঈশান কোণটাকে কালো, গম্ভীর করে তুলছে।

এবার সে বাড়ির দিকে উঠে যাবার জন্য হাঁসটাকে আড়ালে হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দিল। পুরুষ্টু হাঁসের পেটটা এখনও নরম এবং উষ্ণ। সে পেটে হাত রেখে উত্তাপ নেবার সময় দেখল, অনেকগুলি ধানখেত পার হলে পুবের বাড়ির গাবগাছ, গাছের নিচে মালতী। মালতী ওর হাঁসগুলিকে খুঁজছে। জলের ওপর শরীরটাকে তুলে সে উঁকি দিল। এবং দূরে মানুষের শব্দ পেল জালালি। সে পরনের গামছাটা খুলে ভয়ে হাঁড়ির মুখটা ঢেকে দিল। দূর থেকে মালতীর গলাও ভেসে আসছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে চারদিকে। পাটখেতের ভিতর দিয়ে অন্য প্রান্তে কিছু দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা নির্জন। অশ্বত্থ গাছ পার হলে মনজুরদের ঘর। ধনার মা বুড়ি ছাতিম গাছের নিচে বসে এখন প্রলাপ বকছে। সে ঘরের দিকে উঠে যাবার সময় যখন দেখল কোথাও কোনও মানুষের চোখ উঁকি দিয়ে নেই, যখন অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে তখন উষ্ণ পেটটাতে আর একবার হাত রাখল। সে গামছা তুলে ফের মৃত হাঁসটাকে উঁকি দিয়ে দেখল। এবং চাপ চাপ অন্ধকারের ভিতর মৃত হাঁসটার পেটে হাত রেখে ফের বড় রকমের একটা ঢোঁক গিলে মাংস খাবার লোভে মরিয়া হয়ে উঠল।

জলের ওপর দিয়ে মালতীর কণ্ঠ ভেসে আসছে—আয়, তৈ তৈ।

দূরে ধানখেতের ভিতর হাঁসগুলি তেমনি প্যাঁক প্যাঁক করছে। ঘন ধান-গাছের ভিতর হাঁসগুলি লুকিয়ে আছে। মালতী জলে নেমে গেল। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ডাকল, আয়, তৈ তৈ। আয়...... আয়।

চারদিকে অন্ধকার। হাটুরেরা ঘরে ফিরছে। খালের ধারে লগির শব্দ। নৌকার শব্দ। সে অন্ধকারে কোনও পরিচিত হাটুরের মুখ দেখতে পেল না। অমূল্য সূতা আনতে গেছে হাটে। শোভা, আবু ঘরে ঘরে আলো জ্বালছে এবং জল দিচ্ছে দরজাতে। নরেন দাসের

বৌ বৃষ্টি আসবে ভেবে সব শুকনো পাটকাটি ঘরে নিয়ে রাখছে। আর ঝড়বৃষ্টি এলে হাঁসগুলি পথ ভুল করে দূরে চলে যেতে পারে অথবা কত রকমের দুর্ঘটনা...মালতী প্রাণপণে ডাকতে থাকল, আয়, তৈ তৈ।

শোভা, আবু গাবগাছের নিচে পিসির গলা শুনতে পেল। সেই কখন থেকে পিসি হাঁসগুলিকে ডাকছে। ওরা কাফিলা গাছ অতিক্রম করে পিসির জন্য জলে নেমে গেল এবং পিসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডাকতে থাকল। আর দূরে সামুর নৌকা ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টি আসবে জেনেও সামু ঘরে ফিরছে না। জালালি বৃষ্টির রঙ আকাশে দেখতে পেল। জলের পাশে কাঁটা গাছের সব ঝোপ। ঝোপ পার হলে মান্দার গাছের নিচে ওর পাটকাঠির বেড়া দেওয়া ঘর। ভিজে মাটির গন্ধ আসছে। জোটন ফকিরসাবের সঙ্গে দরগায় চলে গেছে। বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। হাজিসাহেবের খামারবাড়ি পার হলে তবে অন্য ঘর। অন্ধকার এবং নির্জনতা সত্ত্বেও মৃত হাঁসটাকে সে গামছা দিয়ে সন্তর্পণে ঢেকে রেখেছে। বৃষ্টি নামবে। বর্ষাকাল বলে ঘরের আশেপাশে এবং সর্বত্র আগাছার জঙ্গল। এক সবুজ সবুজ গন্ধ। সুতরাং জালালি সব দেখে-শুনে নগ্ন শরীরটাকে ঘরের দিকে গোপনে তুলে নিয়ে গেল। গামছা দিয়ে যেহেতু সে হাঁড়ির মুখ ঢেকে রেখেছিল, সেহেতু নগ্ন! অন্ধকার বলে, বৃষ্টি আসবে বলে গাবগাছের নিচে মালতীর গলা শোনা যাচ্ছে না—আশে পাশে শুধু কীট-পতঙ্গের আওয়াজ।

মালতী দেখল ওর হাঁসি তিনটে ফিরে আসছে। হাঁসাটা নেই। মালতীর বুকটা কেঁপে উঠল।

কত কষ্টের এই হাঁসা। প্রতিপালন করা কত বেদনা-সাপেক্ষ। ওর প্রিয় হাঁসাটাকে না দেখে মালতী চিৎকার করে উঠল, বৌদি গো, আমার হাঁসাটা কই। হাঁসি তিনটা আইতাছে, আমার হাঁসাটা কই গ্যাল!

নরেন দাসের বৌ পাঁজা করে সব শুকনো পাটকাঠি তুলছিল। পাটকাঠিগুলিতে মড়মড় শব্দ হচ্ছে—সুতরাং সে মালতীর চিৎকার শুনতে পাচ্ছে অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছে না মালতী কী বলছে। সে পাটকাঠি ফেলে গাবগাছতলায় ছুটে গেল এবং জলের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কী হইছে তর?

—দ্যাখেন, কি হইছে! হাঁসি তিনটা আছে, হাঁসাটা নাই। কেমন কান্না-কান্না গলায় মালতী বলল।

—দ্যাখ, কোনখানে পলাইয়া রইছে।

—আপনের যে কথা বৌদি! অর পরাণে বুঝি ডর নাই!

—ডর আছে ল, ডর আছে। অমূল্য আসুক, নৌকা লইয়া খুঁজতে বাইর হইবনে। তুই জল থাইক্যা উইঠ্যা আয়।

সুতরাং মালতী জল থেকে উঠে এল। ওর মনটা বিষণ্ণতায় ভরে আছে। কান্না কান্না এক আবেগ বুকের ভিতর জমা হচ্ছে ক্রমশ। ওর এই হাঁসা বড় প্রিয়, বড় কষ্টে সে লালন করেছে এবং বিধবা যুবতীর একমাত্র অবলম্বন। ঝড় জলে সেই ছোট ছোট চারটা পাখি যে দিন নরেন দাস ডুলাতে করে ঘরে নিয়ে এসেছিল সেইদিন থেকে কত যত্নের সঙ্গে এদের সে ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল। ছোট ছিল বলে ওরা কচি ঘাস খেতে পারত না, ওরা ভাত খেতে পারত না সুতরাং সে ছোট ডারকিনা মাছ ধরত পুকুর থেকে, ছোট ছোট জিড় তুলে যত্নের সঙ্গে খাইয়ে পুকুর-ঘাটে ছেড়ে ওদের বড় হতে সাহায্য করত। মালতী জল থেকে উঠে আসার সময় প্রাণপণ ডাকল, আয়, আয়, তৈ তৈ।

অন্ধকার বলে, বৃষ্টি আসবে বলে ওরা আর গাবগাছের নিচে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না।

জালালি ঘরের ভিতর কুপি জ্বালল। ঘরে তার ছেঁড়া হোগলা এবং শিকাতে ঝোলানো নাঙলবন্দের বান্নি থেকে আনা হাঁড়ি পাতিল। একটা ভাঙা উনুন। কুপিটা জ্বলতে থাকল। সে ভিজা গামছাটা বিছিয়ে তার উপর মৃত হাঁসটাকে রেখেছে। ওর দরজার ঝাঁপ বন্ধ ছিল। কুপির আলোতে ওর তলপেট চকচক করছে। মুখে পেটুকের গন্ধ। সে হাঁসটার তলপেটে চাপ দিতেই বুঝল উষ্ণতা। মরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁসটার শরীরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ওর শরীরের সব পালক দ্রুত তুলতে থাকল। ওর শরীর থেকে এখনও ইতস্তত জল ঝরছে। এই জলের জন্য নিচের মাটি ভিজে উঠছে—কাদা কাদা ভাব। সে যত্নের সঙ্গে হাঁসটাকে, গামছাটাকে শুকনো মাটিতে টেনে আনল, যত্নের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত প্রাণপণে মৃত হাঁসটাকে আগুন জ্বেলে সেঁকতে থাকল। বাইরে বৃষ্টি।

কতদিন থেকে যেন পেটে ভাত নেই, কতদিন থেকে যেন জাম-জামরুল খেয়ে, কখনও শালুক খেয়ে জালালি ক্ষুধা মিটিয়েছে। পেট ভরে খাবার জন্য সারাদিন থেকে খোয়াব দেখছিল। বিকেলের এই হাঁসটা সে খোয়াবকে সার্থক করছে। সুতরাং সে তার আল্লার কাছে এই মেহেরবানিটুকুর জন্য খুশি। খুশির জন্যই হোক অথবা ক্ষুধার তাড়নাতেই হোক এবং লোভের জন্যও হতে পারে, সে কাপড় পরতে ভুলে গেছিল। ওর তলপেটের ফাটা সাদা সাদা দাগগুলোতে এখনও কিছু জলের রেখা চিকচিক করছে, অনেকটা মানচিত্রের নদী-নালার মতো। কি ভেবে জালালি তলপেটে হাত রাখল এবং ভাবল এই তলপেটে ফের চর্বি হবে, ফের আবেদালি গয়না নৌকার কাজ সেরে ঘরে ফিরবে।

জালালি হাঁসটার পেটের ভিতর থেকে নখ দিয়ে টেনে টেনে ময়লাগুলো বের করবার সময়ই ভাবল আবেদালির বড় দুঃখ। সে বলত, জব্বইরা হওয়নের পর তর প্যাট যে নাইমা গ্যাল আর উঠল না, আর তর পেটে চর্বি ধরল না।

জালালি মনে মনে বলল এ-সময়, তুমি আমারে হপ্তায় হপ্তায় হাঁসের গোস্ত খাইতে দ্যাও দ্যাখ ক'দিনে প্যাটে চর্বি লাগাইয়া দ্যাই। ওর এ-সময় মালতীর কথাও মনে হল।

মালতী বিধবা যুবতী। দিন দিন মালতীর রূপ খুইল্যা পড়তাছে। আল্লা, আমারে অর রূপটা দিলি না ক্যান। বাইরে বৃষ্টি ঘন হয়ে নামছে তখন।

এবার হাঁসের শরীর থেকে চামড়াটা তুলে ফেলল জালালি। বাঁশের চোঙাতে সরষের তেল নেই। একটু তেল আনতে সে কোথাও যেতে পারছে না বৃষ্টির জন্য! সুতরাং সে অনেকক্ষণ ধরে শরীরটাকে সেঁকছিল আর তার জন্য সেদ্ধ-পোড়া এক ধরনের গন্ধ উঠছিল। সে এই সেদ্ধ-পোড়া মাংস একটু নুন লঙ্কাতে ভেজে দুটো সানকিতে রাখল। এক টুকরো মুখে দিল, তারপর ফুৎ করে হাড়টা মুখ থেকে বের করে চেখে চেখে মাংসটা খাবার সময় দেখল, হাঁসের পালকগুলো কখন সব বাতাসে ঘরময় হয়ে গেছে। গাছার ওপর কুপিটা দপদপ করে জ্বলছে। আলোটার দিকে চেয়ে, ঘরময় পালকগুলো দেখে এবং চুরি করে হাঁস ভক্ষণের নিমিত্ত মনে মনে অসহায় হয়ে পড়ল জালালি। আবেদালি জানতে পারলে মারধোর করবে। সেজন্য জালালি আর মাংসের হাড় না চিবিয়ে খুঁটে খুঁটে সব পালকগুলো তুলে বৃষ্টির ভিতর জলে নেমে গেল। জল ভেঙে অন্ধকারের ভিতর গোপাটের দিকে চলতে থাকল। তারপর অশ্বত্থের নিচে যে ঝোপ-জঙ্গল ছিল, সেখানে সব পালকগুলি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আল্লা আমার ক্ষুধা পাইছে। আমি যাই। এখন বৃষ্টির জলে জালালির সব দুঃখ ধুয়ে যাচ্ছে। সুখের জন্য জালালি ঘরের দিকে ফিরছে। সে বিদ্যুতের আলোয় দেখল, পাটখেত নুয়ে পড়েছে। সেই সব পাটখেত পার হলে জলের ওপর একটি আলোর বিন্দু ঘুরতে দেখল। এবং সন্তর্পণে কান পাতলে শুনতে পেল যেন তখনও মালতী ওর হাঁসাটাকে ডাকছে—আয়, আয়, তৈ তৈ। সে আর এতটুকু দেরি করল না। সে ঘরের ভিতর ঢুকে ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। শরীর মুখ মুছল। এবার একটু সময় নিয়ে গামছাটা ভালো করে প্যাঁচ দিয়ে পরল। একটা কাঠের টুকরোর উপর বসে হাঁসের হাড় এবং গোস্ত চুষতে থাকল জালালি। মনে হল, মালতী যেভাবে ডাকছে-এখনই হয়তো হাঁসটা সানকির ওপর ডেকে উঠবে। সে গব গব করে এবার মাংস ছিঁড়ে খেতে থাকল। অথবা গিলতে থাকল। সে কিছুতেই হাঁসটাকে সানকির ওপর আর প্যাক প্যাক করে ডেকে উঠতে দিল না।

বৃষ্টি থামলে সামসুদ্দিন ঘরের দিকে ফিরল। ধনু শেখ নৌকা বাইছিল। দূরে ধানখেতের ভিতর অন্য একটি আলো দেখে মালতীর কণ্ঠ শুনে বুঝল, মালতী এখনও হাঁসগুলি পায়নি। মালতী এবং অমূল্য প্রাণপণ ডাকছে—আয়, আয়, তৈ তৈ এবং এই শব্দ গ্রাম মাঠ পার হয়ে বহু দূরে চলে যাচ্ছে—বড় দুঃখের এই ডাক, বড় কষ্টের। মালতীকে অনেকদিন পর সামু এই মাঠে দেখল—কী যেন অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। অমূল্য নৌকা বাইছিল। ধানখেতের ভিতর, পাটখেতের ভিতর অথবা অন্য কোনও ঝোপ-জঙ্গলে হাঁসটা ভয়ে লুকিয়ে আছে কি না দেখছে মালতী। এ-সময় মালতী দেখল, অন্য একটা নৌকা, পাটাতনে সামসুদ্দিন। সামসুদ্দিন যেন কিছু বলতে চাইছে। হ্যারিকেনের আলোতে সামসুদ্দিনের মুখ স্পষ্ট। মালতী এক বিজাতীয় ঘৃণাবোধে সামুর সঙ্গে প্রথমে কথা বলতে পারল না। সামু যেন হালে তামাসা দেখছে। মালতীর কান্না পাচ্ছিল হাঁসটার জন্য। সে

মাথা নিচু করে বসে থাকল। সামসুদ্দিনকে দেখে কোনও কথা বলল না। সামু আজ অপমানিত বোধ করল না কারণ মালতীর এই বসে থাকাটুকু সহায়-সম্বলহীনা নারীর মতো। সুতরাং সে বলল, তর হাঁসগুলি বাড়ি যায় নাই?

—হাঁসিগুলি গ্যাছে। হাঁসাটা যায় নাই।

মালতী সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছিল। মালতী মাথা নিচু করে বসেছিল, চারদিকে ভিজা বাতাসের গন্ধ। চারদিকে আঁধার আরও ঘন। ঘন হয়ে নামছে। সামু এবং অমূল্য দুজন মিলেই এবার ডাকতে থাকল, আয়, তৈ তৈ। কোথাও কোনও হাঁসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না শুধু অশ্বত্থ গাছটায় জোনাকি জ্বলছে। নিচে হাঁসের পালক উড়ছে। পালকগুলো জলে নৌকার মতো ভেসে যাচ্ছে।

সামু, অমূল্য এবং মালতী গলা মিলিয়ে ডাকল। ওরা লণ্ঠন তুলে ধান গাছের ফাঁকে অন্বেষণের সময় দেখল জলে ইতস্তত হাঁসের পালক ভেসে যাচ্ছে। গোপাটের অশ্বত্থ গাছটার নিচে এসে যথার্থই মালতী ভেঙে পড়ল। পালকের ধূসর রঙ, অশ্বত্থের ঘন জঙ্গল সব মিলে সে হাঁসটার মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন হতেই ডুকরে কেঁদে উঠল।

এই কান্নার জন্যই হোক অথবা পালকের অবস্থানের জন্যই হোক, সামসুদ্দিন বিকেলের কিছু কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে দেখল, জঙ্গলের ফাঁকে যেন জালালির মুখ। সুতরাং অযথা সে আর হাঁসটাকে খুঁজল না। সে জানত এই হাঁসগুলিকে মালতী সন্তানবৎ স্নেহে লালন করে আসছে। মালতী বিধবা—সুতরাং বিধবা যুবতীর একমাত্র সম্বল!... সামু রাগে দুঃখে প্রথমে কথা বলতে পারল না। জালালির মুখটা ওর চোখের ওপর কেবল ধূর্ত শেয়ালের মতো ভেসে উঠছে, এবং মালতীর বেদনাবোধ সামুকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলল।

সামু বলল, বাড়ি যা মালতী।

অমূল্য বলল, চলেন দিদি।

সামু বলল, কান্দিস না, মালতী।

মালতী এবার চোখ তুলল এবং সামুকে দেখে ভাবল সেই সামু—যার চোখ ছোট এবং গোল গোল ছিল—সেই সামু যে শান্ত ছিল এবং মালতীর দুঃখে কৈশোর বয়সে কাতর হতো। সামু যেন আজ যথার্থই দাড়ি-গোঁফহীন পুরুষ—সামু যেন এক হিন্দু যুবকের মতো আজ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মালতীর দীর্ঘদিনের ঘৃণাবোধ সরে গেল। সে অনেকক্ষণ নির্বোধ বালিকার মতো সামুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছু বলল না।

নৌকা দুটো পাশাপাশি ছিল।

হ্যারিকেনের আলোতে ওদের মুখ স্পষ্ট ছিল। গ্রামের ভিতর থেকে কুকুরের ডাক জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে। বিশ্বাস পাড়াতে হ্যাজাকের আলো এবং আকাশে অস্পষ্ট মেঘের ছায়া। কিছু নক্ষত্র যেন মালতীর শোকতাপকে আরও গভীর করছে। এই শোকতাপ সামুর ভিতরেও সংক্রামিত হল। সামসুদ্দিন বালক বয়সে এই গ্রাম মাঠ পার হয়ে বাপের হাত ধরে ধরে কোথাও চলে যাচ্ছে. যেন চারিদিকে ঢাকঢোল বাজছে—চারিদিকে পাইক-বরকন্দাজ...ওর বাপ দুগ্‌গা ঠাকুরের সামনে লাঠিখেলা দেখাচ্ছে-সামুর মনে হল, সেই সব কীর্তি মান পুরুষেরা আজ অথর্ব এবং এক নতুন ভাবধারা, নতুন ধর্মবোধ মানুষকে সংকীর্ণ করে তুলছে। সে জালালির ও পর যথার্থই ক্ষেপে গেল। সে মনে মনে বলল, শালীর প্যাটে পাড়া দিয়া গোস্ত বাইর করমু।

সামুর নৌকা ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকল। ক্রমশ অদৃশ্য হতে থাকল। পিছনে অমূল্য, মালতী এবং হ্যারিকেনটা পড়ে থাকছে। হ্যারিকেনের আলো কিছুদূর পর্যন্ত অন্ধকারটাকে ঠেলে রেখেছিল, সামু যত দূরে সরে যেতে থাকল তত মালতীর মুখ অস্পষ্ট হতে থাকল। ...মালতী যেন এক রহস্যময়ী নারী। বৃষ্টির জল। ধানগাছ থেকে টুপটাপ জলে এবং নৌকার পাটাতনে ঝরছে, ঠিক মালতীর চোখের জলের মতো। সামু দূর থেকে চিৎকার করে বলল, তুই বাড়ী যা মালতী। অমূল্যকে বলল, অমূল্য, নৌকা ঘাটে লইয়া যাও। রাইতের ব্যালা এই মাঠময়দানে ঘুইর না। নির্জনে মালতীর এই বসে থাকাটুকু সামুকে অসহায় করে তুলেছিল, কারণ, কলজের ভিতর কৈশোরের কাঁটাটা বড় বেশি আজ খচখচ করছে।

ধনু শেখকে নৌকাটা আবেদালির ঘাটে সন্তপর্ণে ভিড়িয়ে দিতে বলল সামু। বলল, লগির য্যান শব্দ না হয়।

সামু সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ওপরে উঠতে থাকল। ওকে হাঁটু পর্যন্ত কাদা ভাঙতে হল। এখন ঝোপ-জঙ্গল থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে নামছে। এখনও গাছ থেকে টুপটাপ বৃষ্টির ফোটা বাতাসে ঝরে পড়ছে। ঘরের ভিতর স্তিমিত আলো। ভিতরে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আবেদালি নেই, জব্বর গেছে বাবুর হাটে এবং জোটনও অনুপস্থিত। বড় ভুতুড়ে মনে হচ্ছিল। সে ঝোপের বেত পাতা সরিয়ে বেড়ার ফাঁকে চোখ ঠেলে দিল। দেখল, ছোট এক লম্ফ জ্বলছে। জালালি প্রায় নগ্ন হয়ে বসে আছে পিঁড়িতে। সে সানকির সব হাড় চুষছিল। হাড়ে কোনও গোস্ত লেগে নেই। সে দাঁতের ফাঁকে হাড়গুলোকে মড়মড় করে ভেঙে খাচ্ছিল। তারপর পানি খাচ্ছে। সামু দেখল, পানির ওপর যে ধূর্ত শেয়ালের মুখটা ভেসে ছিল জালালির—সারাদিন পর গোস্ত ভক্ষণে—সে মুখ সহজ এবং সুন্দর। সে মুখে আল্লার দোয়া। পানি খেতে খেতে দুবার সে তার আল্লার নাম স্মরণ করল। সামু গরিব এই মানুষগুলির জন্য ফের অরণ্যের ভিতর হেঁটে যেতে চাইছে, সুতরাং মালতীর হাঁস চুরির কথা অথবা জালালির পেট পাড়া দিয়ে গোস্ত বের করার কথা সব কেমন যেন মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। কারণ জালালি একটা ছেঁড়া হোগলা পেতে এখন নামাজ পড়ছে। রসুলের মতো মুখ-সামনে দুহাত প্রসারিত জালালির। সামসুদ্দিন কিছুই বলতে

পারল না। দীর্ঘ এই সংসারযাত্রার আসরে সে যেন কালনেমিনির মতো এক অলীক লঙ্কাভাগে মত্ত। ওর পা সরছিল না। মাটির সঙ্গে পা গেঁথে যাচ্ছে।

শীতকাল এলেই মানুষটা কিছুদিন যেন ভালো থাকে। ঠাণ্ডার জন্য মণীন্দ্রনাথ গায়ে র‍্যাপার জড়িয়েছেন। আগের মতো খালি গায়ে থাকছেন না। এমন করে ভালো হতে হতে একদিন হয়তো যথার্থই ভাল হয়ে যাবেন। তখন কোথাও দু'জনে চলে যাবে এক সঙ্গে—কোনও তীর্থে অথবা বড় শহরে। অথবা সেই যে বলে না, এক মাঠ আছে, মাঠের পাশে বড় দিঘি আছে, দিঘিতে বড় বড় পদ্মফুল ফুটে থাকে, বড়বৌ গ্রীক পুরাণের এই নায়ককে নিয়ে একদিন যথার্থই সেখানে চলে যাবে। মানুষটা ভালো হলেই জলদানের নিমিত্ত কোনও জলছত্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন হয়তো কোথাও দূরে গীর্জায় ঘণ্টা বাজবে, পুরোহিতেরা মন্ত্র উচ্চারণ করবে—পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ কোনও হ্যামলক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সোনার হরিণের স্বপ্ন দেখবেন।

বড়বৌ মানুষটাকে আজ স্বাভাবিক দেখে এক বাটি গরম দুধ নিয়ে এল। সঙ্গে নতুন গুড়, মর্তমান কলা। কিছু গরম মুড়ি। বড় আসন পেতে সে মানুষটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

সেই আশ্বিনের কুকুরটা মণীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল। সোনা দক্ষিণের বারান্দায় পড়ছে। কুকুরটা মাঝে মাঝে ঘেউঘেউ করছিল। লাল জবা গাছটার নিচে দুটো শীতের ব্যাঙ ক্লপ ক্লপ করছে। মণীন্দ্রনাথ গরম দুধ, মর্তমান কলা, নতুন গুড় মেখে খেলেন। কিছু তার প্রিয় কুকুরকে দিলেন। তারপর উঠে আসার সময় মনে হল সোনা চুপি চুপি পড়া ফেলে এদিকে আসছে। বড়কর্তা খুব খুশি—তিনি, কুকুর এবং সোনাকে নিয়ে শীতের ভোরে মাঠে নেমে গেলেন।

ওরা সোনালী বালির নদীতে এসে নামল। এখন জলে তেমন স্রোত নেই। জল কমে গেছে। যেন ইচ্ছা করলে হেঁটে পার হওয়া যায়। পাড়ের পরিচিত মানুষেরা সোনা এবং মণীন্দ্রনাথকে আদাব দিল। আশে পাশে সব মুসলমান গ্রাম। ওদের দেখেই নৌকা নিয়ে মাঝি এ পাড়ে চলে এল। নৌকায় কুকুরটা সকলের আগে লাফিয়ে উঠেছে। সোনার অনেকদিনের ইচ্ছা—কোন ভোরে, পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে গ্রাম মাঠ দেখতে বের হবে। প্রতিদিন ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে দুপুরে অথবা সন্ধ্যায় জ্যাঠামশাই ক্লান্ত সৈনিকের মতো

বাড়ির উঠোনে উঠে আসেন, পায়ে তাঁর বিচিত্র নদী-নালার চিহ্ন থাকে, গরমে তরমুজ এবং শীতের শেষে আখের আঁটি সঙ্গে আনেন। সোনার কাছে মানুষটা বনবাসী রাজপুত্রের মতো। কত রকমের গল্প শোনার ইচ্ছা এই মানুষের কাছে—পাগল বলে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাতেন। নির্জন নিঃসঙ্গ মাঠ পেলেই বলতে থাকেন। পাগল বলে গল্পের আরম্ভও নেই শেষও নেই।

জ্যাঠামশাই বলতেন, পদ্মপুকুর যাবি?

জ্যাঠামশাই বলতেন, ইলিশমাছের ঘর দেখবি?

তারপর কোনও উত্তর না পেলে বলতেন, রূপচাঁদ পক্ষী দেখবি?

সোনা কোনও উত্তর করত না। উত্তর দিলেই বলবেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। তবু একবার সে খুব সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল, আমি পঙ্খীরাজ ঘোড়া দ্যাখমু। দ্যাখাইবেন?

মণীন্দ্রনাথের যেন বলার ইচ্ছা, তোমার পদ্ম পুকুর দেখতে ইচ্ছা হয় না! ইলিশমাছের ঘর দেখতে ইচ্ছা হয় না। রূপচাঁদ পক্ষী দ্যাখো না! দ্যাখো কেবল, পঙ্খীরাজ ঘোড়া। পঙ্খীরাজ ঘোড়া একটা আমারও লাগে। পাই কোথা। বলে সোনার দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন।

আজ আর সোনার কিছুতেই পঙ্খীরাজ ঘোড়ার কথা মনে হল না। সে আজ পড়া ফেলে চলে এসেছে। মা, ছোট কাকা খুঁজছেন। সোনা কই গ্যাল, দ্যাখেন, পোলাটা কই গ্যাল—সকলে খুঁজবে।

সোনার ভারি মজা লাগল। মা ওকে ফতিমাকে ছুঁয়ে দেবার জন্য মেরেছে। ঠাকুমা বলেছে ওর জাতধর্ম গেল। ওকে সকলে অযথা হেনস্থা করেছে। কতদিন লালটু পলটু ওকে, একটু কিছু করলেই কান ধরে ওঠ বোস করিয়েছে—আজ ওরা সকলে ভাবুক। সে, জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বাড়ি থেকে চুপি চুপি বের হয়ে পড়ল। পাগল বলে তিনি শুধু হেসেছিলেন। পাগল বলে তিনি তাকে এই যাত্রার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। যেন বলেছিলেন, কোথাও না কোথাও পঙ্খীরাজ ঘোড়া আকাশে উড়ে বেড়ায়, কোথাও না কোথাও শঙ্খের ভিতর শঙ্খকুমার পালিয়ে থাকে আর কোথাও না কোথাও ঝিনুকের ভিতর চম্পকনগরের রাজকন্যা সাপের বিষে ঢলে আছে। তুমি আমি সেখানে চলে যাব সোনা। সবার জন্য বড় মাঠ, সোনালী ধানের ছড়া, নিয়ে আসব।

আহা, ওরা কত গ্রাম মাঠ ফেলে চলে যাচ্ছে। যত ওরা এগুচ্ছিল তত আকাশটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। সোনা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এতটা হেঁটেও সে আকাশ ছুঁতে পারছে না কিছুতে। ওর কতদিনের ইচ্ছা, জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বের হয়ে সে, যে আকাশটা নদীর ওপারে নেমে গেছে—সেটা ছুঁয়ে আসবে। কিন্তু কি করে জাদুবলে আকাশটা কেবল সরে যাচ্ছে।

কিছু পরিচিত লোক এই নাবালক শিশুকে পাগল মানুষের সঙ্গে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠল, সোনাবাবু, আপনে! জ্যাঠামশাইর লগে কোনখানে যাইতেছেন! হাঁটতে কষ্ট হয় না!

সোনা খুব বড় মানুষের মতো ঘাড় নাড়িয়ে বলল, না।

কিন্তু মণীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছেন সোনা আর যথার্থই হাঁটতে পারছে না। তিনি ওকে কাঁধে তুলে নিলেন। এখন সূর্যের উত্তাপ প্রখর। ঘাসের মাথায় আর শিশির পড়ে নেই। সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। এ-সময় ওরা, কোথাও যেন ঘণ্টা বাজছে এমন শুনতে পেল।

সোনার মনে হল বুঝি সেই পঙ্খীরাজ ঘোড়া। সে হাততালি দিতে দিতে বলল, জ্যাঠামশয় পঙ্খীরাজ ঘোড়া!

আশ্বিনের কুকুরটা সহসা চলতে চলতে থেমে পড়ল। সে কান খাড়া করে শব্দটা শুনল। শব্দটা এগিয়ে আসছে।

মণীন্দ্রনাথের এখন বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ছে। সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনেই বুঝি বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ে গেল। ডানদিকে এক দীর্ঘ বন। বনের ভিতর দিয়ে হাঁটলে ফের সেই সোনালী বালির নদী পাওয়া যাবে, নদীর পাড়ে তরমুজ খেত। এখন হয়তো তরমুজের লতা এক দুই করে বিছিয়ে যাচ্ছে ঈশম। আর তখন বনের ভিতর কত রকমের গাছ। সেই ঘণ্টার শব্দ ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে। বনের ভিতর কত রকমের গাছ—সব চেনা নয়। তবু গন্ধ গোলাপজামের, লটকন ফলের। সব ফল এখন প্রায় নিঃশেষ। সোনা গাছে গাছে কি ফল আছে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল তারপর ফাঁকা মাঠে নামতেই দেখল, এক আজব জীব। অতিকায় জীব। ওর গলায় ঘণ্টা বাজছে। সোনা চিৎকার করে উঠল, ঐ দ্যাখেন জ্যাঠামশয়!

কুকুরটা ছুটতে চাইল এবং ঘেউঘেউ করে উঠল। জ্যাঠামশাই কুকুরটাকে ধরে রাখলেন। সোনাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে পাশাপাশি যেন তাঁরা তিন মহাপ্রাণ সেই আজব জীবের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। কাছে এলেই ছুটতে থাকবেন তাঁরা, অন্য পথে চলে গেলে কোনও ভয় থাকবে না।

সোনা বিস্ময়ে কথা বলতে পারছে না। আসলে এত বড় মাঠ এবং এক বিরাট জীব—এ-হাতির গল্প সে মেজ-জ্যাঠামশাইর কাছে শুনেছে। জমিদার বাড়ির হাতি। হাতিটা দুলে দুলে ওদের দিকে নেমে আসছে। কাছে এলে, ওর মতো বয়সের এক বালক হাতির মাথায় বসে অঙ্কুশ চালাচ্ছে দেখতে পেল। যে ভয়টুকু ছিল প্রাণে তা একেবারে উবে গেল। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, জ্যাঠামশয়!

জ্যাঠামশাই কতদিন পর যেন কথা বললেন।—ওটা হাতি।

সোনা বলল, হাতি!

জ্যাঠামশাই বললেন, ওটা মুড়াপাড়ার হাতি।

কিন্তু এ-কি! হাতিটা যে ওদের দিকেই ধেয়ে আসছে। বড় বড় পা ফেলে উঠে আসছে। এত বড় একটা জীব দেখে আর এমনভাবে এগিয়ে আসছে দেখে সোনা ভয়ে গুটিয়ে গেল। একেবারে ওদের সামনে এসে পড়েছে। জ্যাঠামশাই নড়ছেন না। কুকুরটা ছুটোছুটি করছে। সোনা ভাবছিল পালাবে কিনা, ছুটবে কিনা অথচ এত বড় বিস্তৃত মাঠ পিছনে সামনে ঝোপ—সে কোন দিকে ছুটে যাবে স্থির করতে পারল না। ভয়ে সে শুধু জ্যাঠামশাইকে জড়িয়ে ধরল। বলল, আমি বাড়ি যামু।

জ্যাঠামশাই কোনও উত্তর করলেন না। তিনি এখন শুধু অপলক দৃষ্টিতে হাতিটাকে দেখছেন। যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত তিনি কেমন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছেন।

ক্ষোভে এবং আতঙ্কে এবার সোনা জ্যাঠামশাইর হাত কামড়ে দিতে চাইল। জ্যাঠামশাই ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে বলল, আমি মার কাছে যামু। বলে কাঁদতে থাকল।

কিন্তু আশ্চর্য, হাতিটা ওদের সামনে এসে চার পা মুড়ে বশংবদের মতো বসে পড়ল। মাহুত, জ্যাঠামশাইকে সেলাম দিল। তারপর হাতিটাকে বলল সেলাম দিতে। হাতিটা শুঁড় তুলে সেলাম দিল।

জসীমের ছেলে ওসমান সামনে বসে। জসীম পিছনে। সে বলল, আসেন কর্তা হাতির পিঠে চড়েন। আপনেগ বাড়ি দিয়া আসি।

ওরা এতদূর এসে গেছেন যে জসীম পর্যন্ত বুঝতে পারছিল বেলাবেলিতে পাগল মানুষ এই নাবালককে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবেন না। সে তাদের পিঠে তুলে নিল। সোনা হাতির পিঠে বসে মেজ-জ্যাঠামশাইর কথা মনে করতে পারছে। তিনি মুড়াপাড়া থেকে বাড়িতে এলেই এই হাতির বিচিত্র গল্প করতেন—হাতিতে চড়ে একবার ওঁরা শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে কালীগঞ্জে যেতে এক ভয়ঙ্কর ঝড় এবং একটা গাছ উপড়ে এলে এই হাতি গাছ রুখে মেজ-জ্যাঠামশাইকে মৃত্যু থেকে রেহাই দিয়েছিল। সোনার এ-সব মনে হতেই হাতির জন্য মায়া হতে থাকল। এখন মনে হচ্ছে তার, হাতির পিঠে চড়ে সামনের আকাশ অতিক্রম করে চলে যেতে পারবে। হাতিটা হাঁটছে। গলায় ঘণ্টা বাজছে। পিছনে আশ্বিনের কুকুর। কুকুরটা পিছনে ছুটে ছুটে আসছে। কত গ্রাম কত মাঠ ভেঙে, ঝোপজঙ্গল ভেঙে ওরা হাতির পিঠে যেন কোনও এক সওদা গর বাণিজ্য করতে যাচ্ছে—সপ্তডিঙায়, সাতশো মাঝির বহর... সোনা যুদ্ধ জয়ের মতো ঘরে ফিরছে।

জসীম সোনাকে বলল, কখন আপনেরা বাইর হইছিলেন?

সোনা বলল, সেই ভোরবেলা।

—মুখ ত আপনের শুকাইয়া গ্যাছে।

—ক্ষুধা লাগছে, কিছু খাই নাই।

—খাইবেন? বলে জসীম পাকা পাকা প্রায় দুধের মতো সাদা গোলাপজাম কোঁচড় থেকে তুলে দিল।

মিষ্টি এবং সুস্বাদু গোলাপজাম। সোনা প্রায় খাচ্ছিল কি গিলে ফেলছিল বোঝা দায়।

তখন হাতিটাকে দেখে কিছু গাঁয়ের নেড়ি কুকুর চিৎকার করছিল। কিছু আবাদী মানুষ বাবুদের হাতি দেখছিল—মুড়াপাড়ার হাতিটাকে নিয়ে জসীমউদ্দিন প্রতি বছর এ-অঞ্চলে ঠিক হেমন্তের শেষে, শীতের প্রথম দিকে চলে আসে। বাড়ি বাড়ি হাতি নিয়ে জসীম খেলা দেখায়।

জসীম সোনাকে বলল, কর্তা পাগল জ্যাঠামশয়র লগে যে বাইর হইলেন—যদি আপনেরে ফালাইয়া তাইন অন্য কোনখানে চইলা যাইত?

—যায় না। জ্যাঠামশয় আমারে খুব ভালবাসে।

জসীম বলল, পাগল মাইনসের লগে বাইর হইতে ডর লাগে না?

সোনা বলল, না। লাগে না। জ্যাঠামশয় আমারে লইয়া কতখানে চইলা যায়। একবার হাসান পীরের দরগায় আমারে রাইখা আইছিল, না জ্যাঠামশয়! সোনা পাগল জ্যাঠামশাইকে সাক্ষী মানতে চাইল।

মণীন্দ্রনাথ ঘাড় ফিরিয়ে সোনাকে দেখলেন। যেন এখন কত অপরিচিত এই বালক। বালকের সঙ্গে কথা বলা অসম্মানজনক। তিনি তার চেয়ে বরং সামনের আকাশ দেখবেন। আকাশ অতিক্রম করে আরও দ্রুত চলে যাওয়া যায় কিনা অথবা যদি তিনি আকাশ অতিক্রম করে চলে যেতে পারেন—সামনে এক বিরাট দুর্গ পাবেন, দুর্গের ভিতর পলিন—তিনি এইসব ভেবে হামাগুড়ি দিতে চাইলেন হাতির পিঠে এবং সেই ক্ষুদ্র বালক ওসমানকে তুলে অঙ্কুশ কেড়ে হাতিকে নিজের খুশিমতো চালিয়ে নিতে চাইলেন—হাতি আমাকে নিয়ে তুমি দ্রুত হেঁটে পলিনের দেশে চল—সেই কোমল মুখ আমি আর কোথাও দেখছি না।

জসীম চিৎকার করে উঠল, কর্তা, আপনে কি করতাছেন কর্তা! ওসমান পাগল মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। তিনি তার অঙ্কুশ কেড়ে নিতে আসছেন। সোনা পিছন থেকে একটা পা চেপে ধরল।—জ্যাঠামশয় আপনে পইড়া যাইবেন। মণীন্দ্রনাথ আর নড়তে পারলেন না। তিনি করুণ এক মুখ নিয়ে সোনার দিকে তাকালেন। কারণ সোনার চোখে এমন এক জাদু আছে যা তিনি কিছুতেই অবহেলা করতে পারেন না। মাঠ পার হলে শুধু তিনি দেখলেন, পুবের বাড়ির নরেন দাস মাথায় কাপড়ের গাঁট নিয়ে বাবুর হাটে যাচ্ছে। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছিল বলে গ্রামের সব বালকবালিকা ছুটে এসেছে। আর নরেন দাসের বিধবা বোন মালতী সেই শ্যাওড়া গাছটার পাশে দেখল বড় বড় সামিয়ানা

টাঙানো হয়েছে। শতরঞ্জি পেতে দেওয়া হয়েছে। মিঞারা, মৌলবীরা এসে জড়ো হচ্ছে। আর এই গ্রামের সর্বত্র, অন্য গ্রামের গাছে গাছে, মাঠে মাঠে ইস্তাহার ঝুলিয়ে চলে গেছে সামসুদ্দিনের লোকেরা অথবা তার ডান হাত যাকে বলা যায়—সেই ফেলু শেখ। তাতে কিছু শব্দ লেখা ছিল। লেখা ছিল-পাকিস্তান জিন্দাবাদ। লেখা ছিল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান আর লেখা ছিল নারায়ে তকদির। মালতী নারায়ে তকদির এই শব্দের অর্থ জানত না। একদিন সে ভেবেছিল, চুপি চুপি সামসুদ্দিনকে অর্থটা জিজ্ঞাসা করবে।

মালতী এবার নিজের দিকে তাকাল। শরীরের লাবণ্য ক্রমে বাড়ছে। স্বামীর মৃত্যুর পর ফের ঢাকায় গত মাসে দাঙ্গা হয়ে গেছে। ওর শ্বশুর এসে বলে গেল, ঢাকায় শাঁখারীরা, কুট্টিরা বড় বদলা নিছে। সেদিন থেকে মালতী খুশি। সামুরে, তুই গাছে গাছে ইস্তাহার ঝুলাইয়া কি করবি! সামুকে মনে মনে গাল দিল মালতী।

সামিয়ানার নিচে মুসলমান গ্রামের লোকেরা জড়ো হচ্ছে। সিন্নির জন্য বড় উনুন ধরানো হচ্ছে। বড় বড় তামার ডেকচিতে দুধে জলে চালের গুঁড়ো সেদ্ধ হচ্ছে। গোপাট ধরে হাতির পিঠে রাজার মতো তখন পাগল মানুষ ঘরে ফিরে আসছেন।

মালতী দেখল হাতির পিঠে পাগল ঠাকুর বাড়িতে উঠে আসছেন। ঘণ্টার আওয়াজে যে যেখানে ছিল ছুটে এসেছে। এই ঘণ্টার শব্দ কোনও শুভ বার্তার মতো এই অঞ্চলের সকল মানুষের কানে বাজছে। ওরা মনে করতে পারল, সেই পয়মন্ত হাতি লক্ষ্মীর মতো রূপ নিয়ে, শুভ বার্তা নিয়ে তাদের দেশে চলে এসেছে। এই হাতির জন্য যারা গেরস্থ বৌ, যারা কোনও কালে একা একা ঘরের বার হয়নি তারা পর্যন্ত বাড়ির সব নাবালকের পিছু পিছু ঠাকুরবাড়ির দিকে হাঁটতে থাকল।

অথবা হাতিটা যখন পরদিন উঠোনের ওপর এসে মা মা বলে ডাকবে তখন সব গেরস্থ বৌদের প্রাণে 'এই হাতি আপনার ধন' অথবা 'এই হাতি মা লক্ষ্মীর মতো'। এই হাতি বাড়ির উঠোনে উঠে এলে জমিতে সোনা ফলবে। ওরা হাতির মাথায় কপালে লেপে দেবার জন্য সিঁদুর গুলতে বসে গেল। হাতিটার কপালে সিঁদুর দিতে হবে, ধান দূর্বা সংগ্রহ করে রাখল সকলে। আর মালতী দেখল, হাতির পিঠে পাগল মানুষ হাততালি দিচ্ছেন। হাতির পিঠে সোনা। ফতিমা, সোনাবাবুকে নিচ থেকে বলছে, আমারে পিঠে তুইলা নেন সোনাবাবু। ফতিমা হাতির পিঠে ওঠার জন্য ছুটছিল। আর তখন ফতিমার বা'জী সামসুদ্দিন সামিয়ানার নিচে বড় বড় অক্ষরে ইস্তাহার লিখছিল, ইসলাম বিপন্ন। বড় বড় হরফে লিখছিল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

মালতী এইসব দেখতে দেখতে ডেফল গাছটার নিচে বসে কেমন আবেগে কেঁদে ফেলল। সে চিৎকার করে বলতে চাইল, সামুরে, তুই দেশটার কপালে দুঃখ ডাইকা আনিস না।

হাতিটা পুকুরপাড় ধরে উঠে যাবার সময় আমের ডাল, অর্জুনের ডাল এবং জামগাছের ডাল অর্থাৎ নিচে যা পেল সব মটমট করে ডালপালা ভেঙে শুঁড় দিয়ে মুখে পুরে দিতে থাকল। আর সেই স্থলপদ্ম গাছটা, যে গাছের নিচে বসে পাগল মানুষটা স্বচ্ছ আকাশ দেখতে ভালোবাসতেন সেই গাছটা পর্যন্ত মটমট করে ভেঙে হাতিটা মুখে ফেলে কট করে একটা শব্দ, প্রায় কাটা নারকেল খেলে মানুষের মুখে যেমন শব্দ হয়, হাতির মুখে স্থলপদ্ম গাছের ডাল পালা কাণ্ড তেমন শব্দ তুলছে। জসীম বার বার অঙ্কুশ চালিয়েও হাতিটাকে দমিয়ে দিতে পারল না। হাতিটা গাছটাকে চেটে পুটে খেয়ে ফেলল। রাগে দুঃখে পাগল জ্যাঠামশাই হাত কচলাতে থাকলেন। তাঁর এই স্থল পদ্ম গাছ, তাঁর সখের এবং নীরব আত্মীয়ের মতো এই স্থলপদ্ম গাছের মৃত্যুতে তিনি বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

মাঠের ভিতর সামিয়ানা টাঙানো। মোল্লা মৌলবীরা আসতে শুরু করছে। ধানকাটা হয়ে গেছে বলে নেড়া নেড়া সব মাঠ। শস্য বলতে কিছু কলাই গাছ, মসুরি গাছ। ফেলু শেখ সব জুড়িদারদের নিয়ে বড় বড় গর্ত করছে। হাজিসাহেবের চাকর দুধ ফোটাচ্ছে। বড় বড় তামার ডেকচিতে দুধ এবং জলে চালের গুঁড়ো, মিষ্টি, তেজপাতা, আখরোট, এলাচ, দারুচিনি, জাফরান, লবঙ্গ। পুরানো তক্তপোশের ওপর ছিন্ন চাদর পাতা। আর হাজিসাহেবের তিন ছেলে উজান গিয়েছিল ধান কাটতে, তখন একটা খ্যাস এনেছিল উজান থেকে। সেই খ্যাস পেতে প্রধান মৌলবীসাবের জন্য একটা আসন করা হয়েছে। সব মুসলমান চাষাভুষা লোক ক্রমে সামিয়ানার নিচে জড়ো হচ্ছিল।

শচীন্দ্রনাথ জানতেন, এমন একটা ঘটবে। সামসুদ্দিন ভোটে এবারেও হেরে গেছে। লীগের নাম করে এবারেও সে মুসলমান চাষাভুষা লোকের সব ভোট নিতে পারেনি, শচীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে এবারেও ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনি এমন একটা ঘটনা ঘটবে জানতেন। সামসুদ্দিন ঢাকা গেছিল। সাহাবুদ্দিন সাহেবের আসার কথা। এত বড় একটা মানুষ আসবে এদেশে, একবার ওঁরও ইচ্ছা ছিল সামিয়ানার নিচে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই ধর্মীয় করে রেখেছে। বোধ হয় নিমন্ত্রণ করলেও তিনি যেতে পারতেন না।

হাতিটা পুকুরপাড় ধরে উঠে আসার সময় তিনি এসব ভাবছিলেন। জসীম হাতিটাকে এখন উঠোনে তুলে আনছে। হাতিটা কাছে এলে তিনি বললেন, জসীম ভালো আছ?

—আছি কর্তা। জসীম হাতিটাকে সেলাম দিতে বলল।

—মাইজাদা ভালো আছেন?

জসীম একটু নুয়ে বলল, হুজুর ভালো আছেন।

—অনেকদিন পর ইদিকে আইলা।

—আইলাম। আপনেগ দেখতে ইসছা হইল, চইলা আইলাম।

—বাবুরা বুঝি এখন বাড়ি নাই?

—না। বাবুরা ঢাকা গ্যাছে।

সোনাকে এবার ছোটকাকা বললেন, হারে সোনা, তর ক্ষুধা পায় না। অরে নামাইয়া দে জসীম। অর মায় ত গালে হাত দিয়া ভাবতাছে, পোলাটা গ্যাল কৈ?

হাতিটা পা মুড়ে বসে পড়ল। সোনা নেমে গেল। গ্রামে এখন এই হাতির জন্য উৎসবের মতো আনন্দ। জসীমের ছেলে ওসমান নেমে গেল। সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। জসীম পাগল মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, কর্তা, নামেন। পাগল মানুষ তিনি, তিনি এই কথায় শুধু হাসলেন। তিনি নেমে যাওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। এই হাতি তাঁর প্রিয় স্থলপদ্ম গাছ খেয়ে ফেলেছে। ক্ষোভে জ্বলছেন। গাছের নিচে বসলেই তিনি জাহাজের সেই অলৌকিক শব্দ শুনতে পেতেন। কাপ্তান মাস্তলে উঠে নিশান ওড়াচ্ছে। জাহাজটা পলিনকে নিয়ে জলে ভেসে গেল। আর হাতিটা সেই স্মৃতিসহ স্থলপদ্ম গাছটা চেটেপুটে খেয়ে এখন চোখ বুজে আছে।

শচীন্দ্রনাথও অনুরোধ করলেন হাতির পিঠ থেকে নামতে।

কিন্তু পাগল মানুষ তিনি—হাতির পিঠে সন্ন্যাসীর মতো পদ্মাসন করে বসে থাকলেন। এতটুকু নড়লেন না। জোর করতে গেলে তিনি সকলের হাত কামড়ে দেবেন। অথবা হত্যা করবেন সকলকে, এমন এক ভঙ্গি নিয়ে স্থলপদ্ম গাছের শেষ চিহ্নটুকু দেখতে থাকলেন।

জসীম দেখল হাতির পিঠে বড়কর্তা বসে কেবল বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছেন। তিনি কারও অনুরোধ রাখছেন না। শচীন্দ্রনাথ বার বার বলছেন, দু'চারজন মাতব্বর মানুষ হাতিটা ঠাকুরবাড়ি উঠে আসতে দেখে জড়ো হয়েছিল—তারাও বলছে, বড়কর্তা নামেন। হাতিটা অনেকটা পথ হাঁইটা আইছে, অরে বিশ্রাম দ্যান। বড়কর্তা ভ্রুক্ষেপ করলেন না, তিনি বরং হাতিটার কানের নিচে পা রেখে বলতে চাইলেন, হেট্ হেট্।

তখন হাতিটা ইঙ্গিত পেয়ে উঠে দাঁড়াল। পাগল মানুষ বড়কর্তা হাতিটা নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। জসীম ডাকল, কর্তা এইডা আপনে কি করেন! কর্তা, অঃ কর্তা!

বাড়ির প্রায় সকলেই বিপদ বুঝতে পেরে পিছনে ছুটল। ততক্ষণে হাতিটা পুকুরপাড় ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে। পুবের বাড়ির মালতী দেখল, পাগল ঠাকুর মুড়াপাড়ার হাতিটা নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। মাঠে নরেন দাসের জমি পার হলেই সেই শ্যাওড়া গাছ, গাছে ইস্তাহার ঝুলছে, গাছে, গাছে সামসুদ্দিন ইস্তাহার ঝুলিয়ে সেই এক বাক্য বলছে, ইসলাম বিপন্ন, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। অথবা নারায়ে তকদির এবং এমন সব অনেক কথা লেখা আছে—যা মালতীর দু'চোখের বিষ। মালতীর চিৎকার করে বলার ইচ্ছা, সামুরে, তর ওলাওঠা হয় না ক্যান!

তখন হাতিটা নরেন দাসের জমি পার হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। পিছনে ছোট ঠাকুর, জসীম, জসীমের পুত্র ওসমান ছুটছে। গ্রামের কিছু ছেলে-বুড়ো ছুটছে। ওরা সকলে হৈ হৈ করছিল—কারণ একজন পাগল মানুষ এক অবলা হাতি নিয়ে মাঠে ঘোড়দৌড়ের বাজী জেতার মতো ছুটছে। কিছুদুর গেলে সামসুদ্দিনের সামিয়ানা টাঙানো মণ্ডপ। মণ্ডপের বাইরে খোলা আকাশের নিচে বড় বড় ডেকচি—ফেলু সিন্নি চড়িয়েছে। মৌলবীসাব আজান দিয়ে এইমাত্র মঞ্চে উঠে নামাজ পড়ছেন। যারা দূর গাঁ থেকে সভায় ইসলাম বিপন্ন ভেবে সিন্নির স্বাদ নিতে এসেছে অথবা ইসলাম এক হও এবং এই যে কাফের জাতীয় মানুষ যাদের পায়ের তলায় থেকে সংসারের হাল ধরে আছি কি না দুঃখ বল, এই জাতি তোমাদের কী দিয়েছে, জমি তাদের, জমিদারী তাদের—উকিল বল, ডাক্তার বল সব তারা—কী আছে তোমাদের, নামাজ পড়ার পর এই ধরনের কিছু কিছু উক্তি—যা রক্তে উত্তেজনার জন্ম দেয়—মানুষগুলি কান খাড়া করে মৌলবীসাবের, বড় মিঞার এবং পরাপরদির বড় বিশ্বাসের ধর্মীয় বক্তৃতা শোনার সময় পিছনে ফেলু শেখের চিৎকারে একে অন্যের ওপর ছিটকে পড়ল। সেই ঠাকুরবাড়ির পাগল ঠাকুর এক মত্ত হাতি নিয়ে এদিকে ছুটে আসছে। সবাই হৈ হৈ করতে থাকল। তিনি পাগল মানুষ, হাতি অবলা জীব—সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাতিটা বুঝি ক্ষেপে গেছে। হাতিটা পাগলা হাতির মতো শুঁড় উঁচু করে চিৎকার করতে করতে সেই সামিয়ানার ভিতর ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

ফেলু তামার বড় ডেকচিগুলির পাশে লুকিয়েছিল। ভিতরে দুধে জলে চালের গুঁড়োতে টগবগ করে ফুটছে। সেই মত্ত হাতি ভিতরে ঢুকে গেলে সকলে নানাভাবে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। সকলে দৌড়ে দৌড়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করছে। সামসুদ্দিন আতঙ্কে ভাঙা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে পড়ল। ফেলু পালাচ্ছিল, পালাতে গিয়ে হাতিটার একেবারে সামনে পড়ে গেল। হাতিটা সহসা ওকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরল এবং ধরার জন্য একটা হাত ভেঙে গেল। সকলে চিৎকার করছে দূরে, কেউ কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না, হায় হায় করছে, একটা মানুষ হাতির পায়ের নিচে বুঝি শেষ হয়ে গেল। মণীন্দ্রনাথ হাতির পিঠে বসে গালে হাত দিয়ে হাতি কতটুক কি পারে যেন এমন কিছু দেখছিলেন। যেন তিনি ভাবে মগ্ন। হাতির পিঠে চড়ে বেশ তামাশা দেখা যাচ্ছে যেন, যেন এমনি হওয়া উচিত ফেলুর। পাগল ঠাকুর এবারে ফের হাতির কানের নিচে পা দিয়ে খোচা মারতেই একান্ত বশংবদের মতো ফেলুকে মাটির ওপর পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতিটাকে এই স্থানকাল-পাত্র পরিত্যাগ করে চলে যেতে বললেন। আর হাতিটাও স্থান-কাল-পাত্র পরিত্যাগ করে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকল।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তখন নদীর চরে ঈশম তরমুজের লতা নিড়ান দিয়ে সাফ করে দিচ্ছিল। হেমন্তের শেষে শীত এসে যাচ্ছে। সূর্য পশ্চিমে নামতে থাকলেই ঘাসে ঘাসে শিশির পড়তে থাকে। জসীম চিৎকার করছিল, আর হাতিটার পিছনে ছুটছিল। বাবুদের হাতি—সে এই অঞ্চলে হাতি নিয়ে ঘুরতে এসে কী এক দুর্যোগে পড়ে গেল—সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর থেকে পাগল মানুষকে হাতির পিঠে তুলে না নিলেই এখন মনে হচ্ছে

ভাল হতো। সেই যে তিনি হাতির পিঠে চড়ে বসলেন আর নামতে চাইলেন না। এখন কী হবে! হাতিটা ক্রমশ মাঠ ভেঙে গ্রামে, গ্রাম ভেঙে মাঠে পড়ছে। হাতির পিঠে মণীন্দ্রনাথ তালি বাজাচ্ছেন। গ্রামের ছোট বড় সকলে পিছনে ছুটে ছুটে যখন হাতিটার আর নাগাল পেল না, যখন হাতিটা নদীর চর পার হয়ে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল—তখন মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে বুঝলেন—আর ভয় নেই। হাতিটাকে কৌশলে তিনি যেন বলে দিলেন, অবলা জীব হাতি, তুমি এবার ধীরে ধীরে হাঁটো। তোমাকে এখন আর কেউ খুঁজে পাবে না।

রাত হয়ে গেছে। এটা কোনও মাঠ হবে, বোধ হয় দামোদরদির মাঠ হবে। আর একটু গেলেই মেঘনা। নদীর পাড়ে বড় মঠ। অন্ধকারে এখন মঠ দেখা যাচ্ছে না। শুধু ত্রিশূলের মাথায় একটা আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

শচীন্দ্রনাথ তখন বাড়ির ভিতর। আরও সব মানুষজন এসেছে।

জসীম উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। এত বড় হাতি নিয়ে পাগল ঠাকুর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সে মাহুত হাতির—বাবুদের হাতি, লক্ষ্মীর মতো পয়মন্ত হাতি—এখন কী হবে, সে ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিল না। উঠোনের ওপর গ্রামের লোকেরা কী করা যায় পরামর্শ করছে। গ্রামে গ্রামে এখন খবরটা পৌঁছে গেছে। ঈশম লণ্ঠন হাতে আবার বের হয়ে পড়েছে এবং প্রায় একদল মানুষ লণ্ঠন হাতে সোনালী বালির নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। তারা জোরে জোরে ডাকছিল। জসীমও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি। সে ওসমানকে রেখে একা সেই দলটার সঙ্গে মেশার জন্য কাঁধে গামছা ফেলে দৌড়াতে থাকল।

সামসুদ্দিন লণ্ঠন হাতে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ফেলু খুব বেঁচে গেছে এ যাত্রা। ওকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটা তছনছ ভাব এবং পাগল ঠাকুর ইচ্ছা করে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন যেন, যেন তিনি জানতেন সামসুদ্দিনের এই যে ইস্তাহার ঝুলিয়ে স্বার্থপর মানুষের মতো একই সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বাসনা—-এই বাসনা ভালো নয়। পাগল মানুষ তিনি। এইটুকু ভেবে গোটা উৎসবের মতো এক ছবিকে তছনছ করে চলে গেছেন। সামসুদ্দিনের আপ্রাণ চেষ্টার দরুন এই মাঠে এত বড় একটা জালসা হতে পারছে। এত বড় জলসাতে শহর থেকে মোল্লা মৌলবীরা এসেছিল। ওরা যখন হাজিসাহেবের বাড়িতে উঠে, তোবা তোবা, কি এক বেমাফিক কাজ হয়ে গেল! সামসুদ্দিনের ইচ্ছা হল এখন সে নিজের হাত কামড়ায়। আর মনে হল গোটা ব্যাপারটাই এক ষড়যন্ত্র। যেন ছোট ঠাকুর আবার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হতে চায়। আবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছোট ঠাকুর দাঁড়াবে এবং কবিরসাবকে ধরে এনে কংগ্রেসের পক্ষে বড় এক বক্তৃতা করাবে। সে ভাবছিল, এমন একটা হাতি পাওয়া যাবে না সেদিন! হাতির পিঠে ফেলু বসে থাকবে। অথবা ফেলুকে দিয়ে মণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দিলে যেন সব আক্রোশের শোধ নেওয়া যাবে। লণ্ঠন হাতে সামসুদ্দিন জব্বরকে দিয়ে সব তৈজসপত্র,

ভাঙা টুল টেবিল, ছেঁড়া সামিয়ানা এবং বড় শতরঞ্জ সব একসঙ্গে মাঠ থেকে বাড়িতে তুলে আনার সময় এসব ভাবল।

তখন বাড়ির বৃদ্ধ মানুষটি প্রশ্ন করেছিলেন—তিনি অতিশয় বৃদ্ধ বলেই ঘরের ভিতর বসে প্রদীপের মৃদু আলোতে সামান্য কাশছিলেন, এখন আর তিনি তেমন বেশি ঘর-বার হন না—অধিকাংশ সময় ঘরের ভিতর খাটে একটা বড় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকেন—অতিশয় গৌরবর্ণ চেহারার এই মানুষ উঠোনে গোলযোগ শুনে বড়বৌকে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে বড়বৌ? উঠোনে এত গণ্ডগোল ক্যান?

বড়বৌ প্রদীপে আলো একটু উসকে দিল। টিন-কাঠের ঘর। জানালা দিয়ে শেষ হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে। বড়বৌ এই সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুরের দেখাশুনা করার সময় প্রায়ই জানালায় দূরের সব মাঠ দেখতে পায় এবং সেই মাঠে সংসারের এক পাগল মানুষ ক্রমান্বয়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন কেবল চলে যেতে চাইছেন। উঠোনের সেই গণ্ডগোল, মানুষটার এভাবে হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এ—বড়বৌকে বিপন্ন করছে। মানুষটা আবার ক্ষেপে গেলেন। ভোরেও বড়বৌ এই মানুষকে খেতে দিয়েছে। ভালোমানুষের মতো খেয়ে প্রতিদিনের মতো নিরুদ্দেশে চলে গেছিলেন। সংসারের ছোট এক বালক সোনা সঙ্গ দিয়েছে মাঠে মাঠে এবং গ্রামে গ্রামে। তারপর কোন এক দূর গ্রাম থেকে মাঠ ভেঙে সোনার হাত ধরে এই পাগল মানুষ গ্রামের দিকে ফিরছিলেন, তখন জসীম আসছে হাতিতে চড়ে। জসীমের ছেলে ওসমান হাতির সামনে। ওরা দেখল সেই বড় মাঠে ঠাকুর ছোট বালকের হাত ধরে কোথায় যেন চলে যাচ্ছেন। এই মানুষটার জন্য তল্লাটের সকলের কষ্ট—কারণ এমন মানুষ হয় না, কথিত আছে তিনি দরগার পীরের মতো এক মহৎ পুরুষ। জসীম পাগল ঠাকুরকে হাতির পিঠে তুলে বলেছিল, চলেন বাড়ি দিয়া আসি কর্তা। জসীম, সোনা এবং পাগল মানুষকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে এই কাণ্ড। বড়বৌ খুব দুঃখের সঙ্গে বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসে সব বলল। বৃদ্ধ পুত্রের হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনে পাশ ফিরলেন শুধু। বৃদ্ধের মুখে এক অসামান্য কষ্ট ফুটে উঠেছে। বড়বৌর কাছে ধরা পড়ে যাবেন ভাবতেই মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে শুধু অন্ধকার দেখতে থাকলেন। এই সময়ে তাঁর এক পাগল ছেলে মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সব দুঃখের মূলে তিনি—তাঁর জেদ, এ সব ভেবে তাঁর দুঃখের যেন অন্ত ছিল না। তিনি বললেন, বৌমা, জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও। আমার শীত করতাছে।

—একটা কম্বল গায়ে দ্যান বাবা।

—না। জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও।

বড়বৌ জানালা বন্ধ করার সময়ই দেখল কামরাঙা গাছের ও পারে যে বড় মাঠ ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে—সেখানে অনেক লণ্ঠন। বড়বৌ বুঝল, এইসব মানুষ যাচ্ছে অন্ধকারের ভিতর পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে খুঁজতে।

আর জসীম অন্ধকারে ডাকছিল হাতিটার নাম ধরে-লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী! সে সবার আগে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল। যেন তার ঘরের বিবির মতো এক রমণী অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়েছে অথবা সেরা মানুষ পাগল ঠাকুর—দশাসই চেহারা, গৌরবর্ণ—ঠিক পীরের মতো এক মানুষের সঙ্গে তার পোষা হাতি, তার ভালোবাসার লক্ষ্মী চলে গেছে। সে প্রাণপণ ডাকছিল, লক্ষ্মী অ লক্ষ্মী! আমি তর লাইগা চিড়ামুড়ি তুইলা রাখছি, লক্ষ্মী অ লক্ষ্মী, তুই একবার অন্ধকারে ডাক দিহি, মাঠের কোন আনধাইরে তুই বইসা আছস একবার ডাইকা ক' দিহি। আমি পাগল ঠাকুরের মতো তরে লইয়া ঘরে ফিরমু।

ঈশম বলছিল, আরে মিঞা, এত উতালা হইলে চলব ক্যান। বড়কর্তা বড় মানুষ। হাতি অবলা জীব, ভালবাসার জীব। তিনি হাতির মতো পোষা জীব লইয়া পলিনেরে খুঁজতে বাইর হইছেন।

জসীম বলল, পলিন, কোন পলিনের কথা কন!

—আরে আছে মিঞা!

জসীম বলল, হাঁটতে বড় কষ্ট। কিস্সা কইলে বেশি হাঁটতে পারি।

ঈশম বলল, বড় মানুষের কথা অধমের মুখে ভাল শুনাইব না। অথবা যেন ঈশমের বলার ইচ্ছা—মিঞা, তল্লাটের লোক কে না জানে এ-কথা। তুমি এডা কি কও! তুমি জান না কর্তা ফাঁক পাইলে নৌকায়, না হয় হাঁটতে হাঁটতে নিরুদ্দেশে যান। তারপর ঈশম এক বর্ষার কথা বলল। এর বর্ষাকালে পাগল ঠাকুর নৌকা নিয়ে তিনদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন, তার গল্প করল। সোনালী বালির নদীর জলে তখন স্রোত ছিল। তিনি একা স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে বসেছিলেন। যেন সেই নাও তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে অথবা গঙ্গার জেটির পাশে বড় এক জাহাজে পৌঁছে দেবে। পাগল মানুষ বলে তিনি মনে মনে বিলের ভিতর বড় এক কলকাতা শহর বানিয়ে বসেছিলেন এবং সারাদিন সারা রাত ধরে যেন তিনি সেই বিলের জলে পলিনকে খুঁজেছিলেন। বিলের জলে এক স্বপ্ন ভাসে, স্বপ্নে সেই বড় কলকাতা শহর—গাড়ি ঘোড়া হাতির মিছিল, আর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, দুর্গের পাশে মেমরিয়েল হল কার্জন পার্ক। গড়ের মাঠে সাহেবরা উর্দি পরে কুচকাওয়াজ করছে। পাগল ঠাকুর হে হে করে হাসতে হাসতে শুধু বলছিলেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। কারণ তাঁর প্রতিবিম্ব জলে দেখা যাচ্ছিল, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। শহরটা নিমেষে কেমন জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাগল মানুষের প্রতিবিম্ব তখন শুধু পরিহাস করছে, হায় বেহুলা জলে ভাইস্যা যায় রে, জলে ভাইস্যা যায়।

সবই যেন জলে ভেসে যাচ্ছিল। এতবড় বিল, এই অন্ধকার চারদিকে, জোনাকিরা জ্বলছে। উড়ে উড়ে জোনাকিরা পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথকে এবং হাতিটাকে ঘিরে ধরল। মণীন্দ্রনাথ হাতির পিঠে চড়ে বিলের পাড়ে পাড়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন; বিলের জলে শুধু অন্ধকার। হেমন্তকাল বলে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। পাকা ধানের গন্ধ মাঠে মাঠে। এই

অন্ধকারে হাতির পিঠে বসে পাকা ধানের গন্ধ পাচ্ছিলেন। আর আকাশে কত হাজার নক্ষত্র, পাগল মানুষ প্রতিদিনের মতো হাতির পিঠে বসে সেইসব নক্ষত্র দেখতে দেখতে, যেন সেইসব নক্ষত্রের কোনও একটি তার প্রিয় পলিনের মুখ—তিনি হাতিতে চড়ে অথবা নৌকায় উঠে কিছুতেই আর সেই প্রিয় পলিনের কাছে অথবা হেমলক গাছের নিচে পৌঁছতে পারলেন না। তিনি হাতিটাকে সম্বোধন করে বললেন, হ্যাঁ লক্ষ্মী, তুমি আমাকে নিয়ে পলিনের কাছে যেতে পার না। সেই সুন্দর মুখ—ঝরনার জলের উৎসে তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে পার না।

সহসা এই পাগল মানুষের ভিতর পূর্বের স্মৃতি তোলপাড় করলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। মনে হয় আর কিছুদূর গেলেই তিনি তাঁর প্রিয় হেমলক গাছটি খুঁজে পাবেন এবং সেই হেমলক গাছের নিচে সোনার হরিণটি বাঁধা আছে। এইভাবে কতদিন একা একা মাঠ থেকে মাঠে, গ্রাম থেকে গ্রামে এবং এমন তল্লাট নেই এ-অঞ্চলে তিনি যেখানে একা-একা চলে যান না, তারপর এক-সময় ফের মনে হয় সেখানে আর তিনি এ-জীবনে পৌঁছাতে পারবেন না। সুতরাং সেই এক বড়বৌর মুখ এবং তার বিষণ্ণ মুখ পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথকে অস্থির করে তোলে। তিনি ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকেন। তখন মনে হয় হাতিতে অথবা নৌকায় কখনও সেই হেমলক গাছের নিচে পৌঁছানো যাবে না। সোনার হরিণেরা বড় বেশি দ্রুত দৌড়ায়।

জসীম, ঈশম এবং নরেন দাসের দলটা সারারাত লণ্ঠন হাতে খুঁজে হাতিটা এবং মানুষটাকে বার করতে পারল না। ওরা সবাই রাতের দিকে ফিরে এসেছিল। আরও দুটো দলকে শচীন্দ্রনাথ পুবে এবং পশ্চিমে পাঠিয়েছিলেন। তারা নানা রকমের খবর দিল। কেউ বলল, অশ্বত্থ গাছের নিচে গত রাতে পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে দেখেছে। কেউ বলল, বারদির মাঠের উত্তরে একদিন দেখা গেছে মানুষটাকে। উত্তর থেকে খবর এল, পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ হাতিটাকে দিয়ে সব আখের খেত খাইয়ে দিচ্ছেন। কেউ কিন্তু হাতিটার নাগাল পাচ্ছে না। সপ্তাহের শেষ দিকে আর কোনও খবর এল না। সবাই তখন বলল, না আমরা পাগল মানুষ এবং হাতিটাকে দেখিনি।

বাড়িতে প্রায় সকলের মুখে একটা শোকের ছবি। কেউ জোরে কথা বলছে না। লালটু, পলটু, সোনা সারাদিন বাড়িতেই থাকছে। পুকুর পাড়ের অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ওরা প্রতিদিনই হাতিতে চড়ে মানুষটা ফিরছেন কিনা দেখত। বিকালের দিকে জ্যাঠামশাই মাঠের ওপর থেকে উঠে আসবেন প্রতীক্ষায় অর্জুন গাছটার নিচে বসে থাকত। সঙ্গে থাকত সেই আশ্বিনের কুকুর। ওরা প্রিয় মানুষটির জন্য গাছের নিচে বসে সারা বিকেল, যতক্ষণ সন্ধ্যা না হতো, যতক্ষণ গোপাট অতিক্রম করে মাঠের বড় অশ্বত্থ গাছটায় অন্ধকার না নামত, ততক্ষণ অপেক্ষা করত। আর এভাবেই একদিন কুকুরটা ঘেউঘেউ করে উঠল—কুকুরটা কেবল চিৎকার করছে—সূর্য তখনও অস্ত যায় নি। তখন ওরা দেখল কুকুরটা দৌড়ে দৌড়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। আবার সোনার কাছে উঠে আসছে। ওরা দেখল পুবের মাঠে আকাশের নিচে কালো একটা বিন্দুর মতো কি কাঁপছে। ক্রমে বিন্দুটা বড়

হচ্ছে। হতে হতে ওরা দেখল এক বড় হাতি আসছে। সোনা চিৎকার করে বাড়ির দিকে দৌড়ে গেল, হাতিতে চইড়া জ্যাঠামশয় আইতাছে।

গ্রামের সকলে দেখল পাগল মানুষ ক্লান্ত। বিষণ্ণ। চোখমুখে অনাহারের ছাপ। তিনি হাতির পিঠে প্রায় মিশে গেছেন।

হাতিটা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল উঠোনে। যেন এই হাতি আর কোথাও যাবে না। এখানেই বসে থাকবে। জসীম বলল, কর্তা নামেন। লক্ষ্মীরে আর কত কষ্ট দিবেন!

গ্রামের সকলে অনুরোধ করল নামতে। কিন্তু তিনি নামলেন না।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, তোমরা সকলে বাড়ি যাও বাছারা, আমি দেখি। বলে, তিনি হাতিটার কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, বড়দা, বড়বৌদি কয়দিন ধইরা কিছুই খায় নাই। বৌদিরে কত আর কষ্ট দিবেন!

কিন্তু কোনও লক্ষ্মণ নেই নামার। শচীন্দ্রনাথ বললেন, সোনা, তর বড় জ্যাঠিমারে ডাক।

বড়বৌ ঘোমটা টেনে ডাল পালা ভাঙ্গা স্থলপদ্ম গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। শচীন্দ্রনাথ বললেন, আপনে একবার চেষ্টা কইরা দ্যাখেন।

বড়বৌ কিছু বলল না। সেই সজল উদ্বিগ্ন এক চোখ নিয়ে হাতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ হাতি থেকে নেমে বড়বৌকে অনুসরণ করলেন—তিনি এখন এক সরল বালক যেন। তাঁর এখন বড়বৌর দুই বড় চোখ ব্যতিরেকে কিছু মনে আসছে না। ঘরে ঢুকে দেখলেন, তাঁর প্রিয় জানালাটা খোলা। তিনি সেখানে দাঁড়ালেই তার প্রিয় মাঠ দেখতে পান। এবং তখন মনে হয় মাঠে বড় এক হেমলক গাছ আছে, নিচে পলিন দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন অকারণে তিনি নদী বন মাঠের ওপারে পলিনকে খুঁজেছেন।

বড়বৌ পূজার ফুল তুলছিল। শীতকাল। বাগানের ভিতর শীতের সব ফুল ফুটে আছে। খুব ভোরে মালতী স্নান করতে এসেছিল ঘাটে। ঘাটে শীতের কুয়াশা ছিল তখন, ঘাটের সিঁড়িতে রোদ ছিল না। কিরণী আবু পাড়ে বসে ব্রতকথা বলছিল—ওঠ ওঠ সুয্যিঠাকুর

ঝিকিমিকি দিয়া...তখন মালতী ঘাটে নেমে গেল। ঘাটে এসে বড়বৌ দেখল, মালতী শীতের ঠাণ্ডায় জলে ডুবে ডুবে স্নান করছে। যেন এই শীত, শীত নয়, মালতী জলের উপর ভেসে যেতে থাকল।

মালতী এক সময় জল থেকে উঠে পড়ল। ভেজা কাপড়ে হিহি করে কাঁপছে। সে বড়বৌকে ভেজা কাপড়েই কিছু ফুল তুলে দেবার অছিলায় অতসী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

বড়বৌ বলল, তোর এই সাত সকালে স্নান?

মালতী কোনও কথা বলল না। সে ফুলগাছ অথবা ঝোপজঙ্গলের ভিতর উঁকি দিয়ে কি যেন অনুসন্ধান করছে। দেখলে মনে হবে, ওর কিছু হারিয়ে গেছে। সুতরাং মালতীকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মালতীর পরনে ডুরে শাড়ি—পাতলা। শাড়ি দেখে সেই স্বপ্নটার কথা মনে করতে পারছিল—সেই স্বপ্ন, স্বপ্নে সে মধুমালা সেজে বসেছিল। মালতী ডুরে শাড়ি পরে মধুমালা সেজে বসেছিল। মদনকুমার আসবে, সেই মদনকুমার, যার সখের সীমা ছিল না, যে হাটে বাজারে গেলেই ডুরে শাড়ি কিনতে ভালোবাসতো মালতীর জন্য। স্বপ্নে সেই মানুষ কতদিন পর রাতে ওর কাছে এসেছিল। পাশে বসেছিল। দাঙ্গার কথা বলার সময় মুখ বড় করুণ। তারপর সব ভুলে মানুষটা গল্প করতে করতে ওর মুখ চিবুক টেনে শেষে মালতীকে কোলে নিয়ে ধপাস করে মোটা গদিয়ালা বিছানাতে ফেলে দিয়েছিল। আর কী? আর কী করেছিল স্বপ্নে? স্বপ্নে স্বামীর সঙ্গে সহবাস। সে সহবাসের পর সোজা পুকুরঘাটে স্নান করতে চলে এসেছে। মালতী শরীরের উত্তাপ জলে ভাসিয়ে পাড়ে উঠতেই শুনতে পেল, দক্ষিণের ঘরে এখন কে যেন দুলে দুলে পড়ছে, পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। শীতের সকাল। মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা শেষ করে পালেদের দুই মেয়ে পুকুর পাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। ওরা কবিতার মতো আবৃত্তি করছিল, ওঠ ওঠ সুয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া, না উঠতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।

সোনা পড়ছিল, পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

লালটু পড়ছিল, অ্যাট লাস্ট দি সেলফিস জায়েন্ট কেম্।

পলটু পড়ছিল, এ প্লাস বি হোল স্কোয়্যার...

দক্ষিণের ঘরে তখন পড়ার প্রতিযোগিতা চলছে। ওরা তিনজনই চেঁচিয়ে পড়ছে। বাড়িতে দূরদেশ থেকে দীর্ঘদিন পর বুঝি সেই যুবক ফিরে এসেছে। বোধ হয় এখন উচ্চ স্বরে পড়ে এই বালকেরা কত বেশি পড়ছে এবং কত কঠিন পড়া পড়তে হয়, চেঁচিয়ে মানুষটাকে জানাচ্ছে। মালতী গতকাল সন্ধ্যায় খবর পেয়েছে। কিন্তু সংকোচের জন্য আসতে পারেনি। মানুষটাকে দেখার বড় ইচ্ছা। প্রায় সারা রাত সে যেন মানুষটার জন্য জেগেছিল।

লালটু একই লাইন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ছে। অ্যাট লাস্ট দি সেলফিস্ জায়েন্ট কেম্। সেলফিস্ জায়েন্ট। মনে মনে উচ্চারণ করল কথাটা। ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই কবেকার কথা। তখন বিলের জলে কুমীর ভেসে আসেনি, তখন মালতী ফ্রক পরত। একদিন সেই কৈশোরে সেলফিস্ জায়েন্ট লুকোচুরি খেলতে গিয়ে মালতীকে সাপ্টে ধরেছিল। চুমু খেয়েছিল। মালতী রাগে দুঃখে ঠিক রাগে দুঃখে বলা চলে না, কেমন যেন রঞ্জিত ওকে না বলে না কয়ে চুমু খেয়ে—কী একটা ফাজিল কাজ করে ফেলেছে। বলতে হয় কিছু, না বললে কুমারীর সম্মান থাকে না। বড়বৌকে বলে দেবে এমন ভয় দেখিয়েছিল রঞ্জিতকে।

পরদিন ভোরে বাপ-মা মরা সেলফিস্ জায়েন্ট কিছু না বলে কয়ে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুরবাড়ির বড়বৌর পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাই-এর খোঁজ-খবর কেউ আর দিতে পারেনি। তারপর কত জল সোনালী বালির নদীতে ভেসে গেল, কত শীত, কত বসন্ত চলে গেল।। বিলের জলে যেবার কুমীর ধরা পড়ল—মালতীর সেবারেই বিয়ে। মালতী একদিন চুপি চুপি বলেছিল, বড়বৌদি রঞ্জিত আপনেরে চিঠি দ্যায় না?

—দ্যায়।

—কি ল্যাখে।

—কিছু লেখে না। শুধু লেখে ভালো আছি।

—ঠিকানা দেয় না।

—ঠিকানা দিতে নেই।

—ক্যান?

—দেশের কাজ করে। ঠিকানা দিতে নেই।

শীতের সূর্য উঠতে চায় না। রোদ দিতে চায় না। গাছপালার ছায়ায় বাড়িগুলি ঢেকে থাকে। বুড়ো মানুষেরা রোদের জন্য প্রায় হাহাকার করছিল। ভোরের দিকে তখন খুব অন্ধকার নয়, আবার আলোও নয়—মালতী চুপি চুপি ঘাটে আসার সময় দেখেছিল, অমূল্য তাঁতঘরের পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছে। খড় কুটো এনে—শীতের দিন বলে শুকনো পাতা সংগ্রহ করে রেখেছিল অমূল্য। অমূল্য বসে সেই খড়কুটোর ভিতর আগুন জ্বেলে শীত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল। আর শোভা, আবু, নরেন দাসের বৌ আগুনের পাশে গোল হয়ে বসেছিল।

মালতী দরজা খুলে বের হবার মুখেই দেখল অমূল্য ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মালতী সোজা উঠোনে নেমে এল না। চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আগুনের ভিতর থেকে অমূল্যর মুখ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। স্বপ্নে দেখা মৃত মানুষটার মুখ, চোখে আর ভাসছে না। শুধু অমূল্যর মুখ চোখে ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এক অশুচি ভাব শরীরের সর্বত্র। শীতে কোথায় অমূল্যের পাশে বসে আগুন পোহাবে, কোথায় শীতের ভিতর উত্তাপ খুঁজবে —তা না করে মালতী ছুটে গেছে পুকুরে। স্বামীর মৃত মুখ মনে করে জলে অধিক সময় ডুব দিয়ে থেকেছে। অমূল্যর মুখ ভুলে থাকার জন্য, পাপ চিন্তা ভুলে থাকার জন্য মালতী শীতের জলে, ঠাণ্ডা হিমের মতো জলে বোধ হয় ডুব দিয়েছিল।

সুতরাং স্থলপদ্ম গাছটির পাশে দাঁড়িয়ে মালতী মনে করতে পারল না, সে কোন নির্দিষ্ট কারণে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মালতী এখন ঠাকুরঘরে প্রণাম করছে এবং বিড়বিড় করে বকছে। নিজেকে গালাগালি দিচ্ছে। সে ঠাকুরঘরের দরজায় মাথা ঠুকছিল। যেন ভগবানের ইচ্ছা—বিধবা মানুষের যৌবন থাকতে নেই, সুখ থাকতে নেই, ভালোবাসা থাকতে নেই। যৌবন থাকলে পাপ, ভালোবাসা থাকলে পাপ এবং সুখ চাইলে পাপ। মালতী মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে চাইল যেন, ভগবান, তুমি আমার পোড়া যৌবন হরণ করে নাও। আমার পোড়া কপাল। ভালোবাসার কপাল থাকলে আমার মানুষ ঘরে থাকত। রায়টে কাটা পড়ত না। স্বপ্নটার কথা কেবল মনে আসছিল মালতীর। কতদিন পর যেন যথার্থই তার কাছে জল চাইতে এসেছিল। কিন্তু সে যতবার জল নিয়ে ওর হাতে দিয়েছে ততবার মানুষটার মুখ বদলে গেছে। মুখটা যেন অমূল্যের। তাঁতঘরে অমূল্য যেমন হেসে হেসে কথা বলে, যেমন খুব সহজে নেকা নেকা কথা বলে—যেন কিছু জানে না অমূল্য, কিছু বোঝে না, দিদি, অ মালতী দিদি, আমার ঘরে জল পাঠাইয়া দ্যান। দিদি, আপনের জন্য বেথুন পাইড়া আনছি, দিদি, জলের তলে শালুক হয়, শালুকের ফল হয়—আপনের জন্য আমি কী না করছি। স্বপ্নে নিজের মানুষটাকে জল দিতে গিয়ে মালতী কেবল সেই অমূল্যকে বিছানার ওপর বসে থাকতে দেখল।

মালতী ঘরে ফিরে কাপড় ছাড়ল, সাদা থান পরল একটা। তাঁতের চাদর গায়ে দিল। ঘরের পাশে পেয়ারা গাছের নিচে মালতী আগুন জ্বালল। আজ ইচ্ছা করেই মালতী অমূল্যর পাশে গিয়ে আগুন পোহাতে বসল না। যেন ওর পাশে আগুন পোহাতে বসলেই শরীরের গ্লানিটা আবার ভেসে উঠবে। সে আবুকে ডেকে আনল, শোভাকে কিছু শুকনো কাঁঠালের ডাল এনে দিতে বলল—শীতের জন্য হাত পা বড় বেশি সাদা দেখাচ্ছে। শীতের ভিতর আদর করে ঠাণ্ডা হাত আবুর গালে ঘষে দিল। হাত গরম করতে চাইলে শোভার গালে হাত রাখে। মেয়েগুলি এই শীতেও কেমন গালগলা গরম করে রেখেছে।

শীতের রোদ লম্বা হয়ে নামছে। বাড়ির নিচে সব জমি, বড় বড় তামাক গাছ সামনের মাঠে। পেছনে সব পেঁয়াজের জমি—পেঁয়াজ, রসুন, আলু, বাঁধাকপি। এবং নরেন দাস জমির জন্য, তাঁতের জন্য সারা মাস খেটে খেটে এই সংসারকে সোজা করে রাখছে! নরেন দাস তার এই সংসারকে বড় বেশি ভালোবেসে সারাক্ষণ মাঠে অথবা তাঁতঘরে

কোন-না-কোন কাজের ভিতর ডুবে থাকে। নরেন দাস, পুবের বাড়ির নরেন দাস জমিতে এখন পেঁয়াজের গুঁড়িতে মাটি তুলে দিচ্ছে। মালতী দেখল, এই আগুনের ভিতর থেকে দেখল, নরেন দাস জমির মাটি সোনার মতো হাতে নিয়ে অপলক চেয়ে থাকছে। নরেন দাস মাটির ভিতর কি রস আছে, ফসলের মাটি কি রস দিয়ে গড়া, এই যে সোনার ফসল ঘরে ওঠে কিসের এত পুণ্য এই সংসারে—বোধ হয় নরেন দাস মাটির ভিতর তার রহস্য খুঁজছিল। মাটির সঙ্গে বিড়বিড় করে নরেন দাস তখন কথা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে অথবা গাছগুলির সঙ্গে হতে পারে, কারণ ওর চারদিকে তামাক গাছ, চীনাবাদামের গাছ। কত যত্ন করে জল টেনে নরেন দাস মাটির ভিতর এইসব শস্যকণা পুঁতে দিয়েছিল। এইসব শস্যের জন্য নরেন দাসের বড় ভালোবাসা। প্রতিদিন ভোর হলে নরেন দাস সে তার নিজের জমির ভিতর নেমে আসবে, কিছু না কিছু মাটি গাছের গুঁড়িতে দিতে দিতে গাছের সঙ্গে কথা বলবে, খেতে ভুলে যাবে। জীবনের অন্য সুখ-দুঃখের কথা ভুলে যাবে।

মালতী বড় একটা ঘটি নিল জলের, কিছু মুড়ি, তেল দিয়ে মেখে বড় বড় দুটো পেঁয়াজের টুকরো নিল হাতে, নুন এবং কাঁচা লঙ্কা নিয়ে জমির পাশে নেমে গেল নরেন দাসকে খেতে দিতে। আর আসার সময় দেখল, গ্রামের সব মানুষই এই শীতের সকালে জমি এবং ফসলের ঘ্রাণে মাঠে নেমে যাচ্ছে। ঠাকুরবাড়ির ছোট ঠাকুর নেমে গেল মাঠে, পিছনে ঈশম—ওরা নিশ্চয়ই সোনালী বালির চরে নেমে যাচ্ছে। ঈশম নিশ্চয়ই জমি থেকে জল নেমে যাচ্ছে না বলে চিন্তিত। নিশ্চয়ই ছোট ঠাকুরকে বিশ্বস্ত মানুষ ঈশম জমিতে নিয়ে গিয়ে এই জল নিয়ে কী করা যায়, কীভাবে জল নামিয়ে দেওয়া যায়, চরের বুক থেকে, সেইসব সলাপরামর্শ করবে। তখন গোপাট ধরে বাজারে যাচ্ছিল মঞ্জুর, জব্বর এবং অন্য অনেকে। নয়াপাড়ার বিশ্বাসেরা, হাসিমের বাপ জয়নাল, আবেদালি কেউ যেন বাকি নেই। সকলে ষাঁড় গরু নিয়ে মাঠের রোদে নেমে আসছে। ফেলু শেখ হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মাঠে। এদের এখন শুধু ফসলের জন্য চাষাবাদ আর এই চাষাবাদই মানুষগুলির সব—আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন অথবা ভালোবাসা। আর কী চায় মানুষগুলি? মানুষগুলি তারপর ধর্ম করতে চায়। হিন্দু পাড়াতে তখন যাত্রা নাটক হবে, রাবণ বধের পালাগান, রামায়ণ গান, রাম সেজে আসবে লোকনাথ পাল। মাঝিবাড়ির বড় সামিয়ানার নিচে ঢোলক বাজবে—গ্রামের বুড়োবুড়িরা তখন কেউ ঘরে থাকবে না। এই শীত এলে কবিগান হয় চন্দদের বাড়ি, বড় বড় ডে-লাইট জ্বলবে, মনে হবে তখন গ্রামটা মেলার মতো। পরাপরদির হাট থেকে দোকান পাট তুলে শ্রীশচন্দ্র চলে আসবে। শীত এলেই কতরকমের মেলা বসবে, দূরে দূরে কত মানুষ চলে যাবে, ঘোড়দৌড় হবে, বাজি জেতার জন্য বিশ্বাস পাড়াতে রোজ ঘোড়দৌড়ের মহড়া হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, অমূল্যও তাঁতঘরে মহড়া দিচ্ছে। অথচ এই অমূল্য আগে কত হাবাগোবা ছিল। এই অমূল্য সারাক্ষণ তাঁত বুনে ঘরের বার হলে চোখ তুলে তাকাত না পর্যন্ত! অমূল্য মালতীর বান্দা লোক ছিল। সেই অমূল্য কী করে গত বর্ষায়—ওরা সেই যে অষ্টমীর স্নানে এক সঙ্গে এক নৌকায়, বড় নৌকা, প্রায় তেমাল্লা হবে, পাড়ার বড় পিসি,

ধনবৌ, মাঝিবাড়ির কালপাহাড়ের মা, নরেন দাস—প্রায় গ্রামের গোটা লটবহর এক নৌকায় শুয়ে বসে একদিনের পথ নাঙ্গলবন্ধ, নাঙ্গলবন্ধের বান্নিতে মালতী সকলের সঙ্গে স্নান করতে গিয়েছিল। অষ্টমীর স্নানে কত মানুষ, নদীর দু-পাড়ে কত দেব-দেবীর মূর্তি। মাটি দিয়ে গড়া ভৈরব ঠাকুরের বড় নীল রঙের পেটের দিকে তাকিয়ে অমূল্য রসিকতা করেছিল। বড় নদী, দু'পাড় প্রায় দেখা যায় না নদীর। কত নৌকা এসেছে। কত মানুষ এসেছে স্টিমারে, আর পাপ ঢেলে পুণ্য নিতে দু'পাড়ে তিল ধারণের স্থান ছিল না। মালতীও সকলের সঙ্গে নদীর জলে স্নান করতে নেমেছিল। পাড়ে অমূল্য। পকেটে তামার পয়সা। মালতীর হয়ে ঠাকুরের দক্ষিণা, তিলতুলসী সব সংগ্রহ করে দিচ্ছিল। গোটা মেলাতে সে-ই সারাক্ষণ মালতীকে দেখাশুনা করেছে। সে মালতীকে নিয়ে ঘুরেছে—একটা লক্ষ্মীর পট কিনে দিয়েছিল অমূল্য, মালতীর জন্য পয়সা খরচ করতে পেরে অমূল্য গুনগুন করে এক সময় গান ধরেছিল। পয়সা খরচ করার হকদার হতেই মালতী অমূল্যের জিম্মায় কী করে যেন চলে গেল। অমূল্য মালতীকে এক সময় বলেছিল, দিদি আসেন, সাঁতার দিয়া নদী পার হই।

—নদী পার হইতে তোমার বুঝি ইচ্ছা যায় অমূল্য!

—বড় ইচ্ছা যায়।

—নদীর জলে এক কুম্ভীর ভাইস্যা যায়, তোমার গানটা মনে পড়ে অমূল্য?

অমূল্য বলেছিল, পড়ে।

মালতী ভিড়ের ভিতরে অমূল্যর দিকে অপলক তাকিয়ে বলেছিল, বড় ডর ঐ কুম্ভীরকে।

—কোন ডর নাই মালতী দিদি। এবং ডর নাই বলেই হয়তো অমূল্য সারাটা দিন মালতীকে নিয়ে ঘুরতে পেরেছিল। অষ্টমীর স্নানে মালতীকে আর কেউ এত আদর করে সোহাগ করে মেলা দেখায়নি। শোভা, আবু সঙ্গে ছিল না। নরেন দাস তাঁতের কাপড়ের দোকান খুলে বসেছিল আর সেই থেকে অমূল্য হাবাগোবা থাকল না। বান্দা লোক অমূল্যর খাই খাই সহসা বড় বেশি বেড়ে গেল।

সূর্য এবার গোপাটের ওপাশে উঠে এল। এখন হাতে পায়ে শীতটা জমে নেই। মালতী দেখল হাঁসগুলি গর্তের ভিতর প্যাঁকপ্যাঁক করছে। মালতী গর্তের মুখ থেকে টিনটা তুলে দিল। হাঁসগুলি গলা বের করে দিল প্রথম। বড় পুরুষ হাঁসটা সকলকে ঠেলে প্রথম বের হয়ে এল। অমূল্য বারদীর হাট থেকে পুরুষ হাঁসটা কিনে দিয়েছে মালতীকে। গত বর্ষায় কোথায় যে তার প্রিয় পুরুষ হাঁসটা হারিয়ে গেল, রাতের অন্ধকারে বিলের মাঠে সে এবং অমূল্য পুরুষ হাঁসটাকে ঝোপে জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে পেল না। অন্ধকার রাতে হাঁসটার অন্বেষণে নৌকায় মালতী এবং অমূল্য ধানখেতের ভিতর ঘোরাঘুরি করছিল। সামু নৌকায় গ্রামে ফেরার সময় ওদের দেখে অমূল্যকে বলেছিল, অমূল্য বাড়ি যাও মালতীকে বলেছিল,

আনধাইর রাইতে মাঠে ঘাটে একা ঘুরতে নাই মালতী। বাড়ি যা। হাঁসটা আমি দ্যাখতাছি কই গ্যাল। সামু শেষ পর্যন্ত হাঁসটার খোঁজ দিতে পারেনি, হাঁসটা নিখোঁজ হবার পর থেকেই মালতী বড় ম্রিয়মাণ ছিল। অমূল্যর পুরুষ হাঁসটা নীল, কালো এবং খয়েরী রঙের। কী করে, কত কষ্ট করে এবং সারা হাট ঘুরে মাত্র এই একটা তাজা হাঁস মালতীর জন্য অমূল্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, প্রায়ই কথায় কথায় এই হাঁসের জন্য অমূল্যর কী কষ্ট গেছে, অমূল্য কত লোককে একটা ভালো পুরুষ হাঁস মালতী দিদির জন্য বলে রেখেছিল—সময়ে অসময়ে কথাটা শোনাবার চেষ্টা করত। আর এই হাঁস কিনে দেবার পর থেকে অমূল্যর আবদারটা আরও বেড়ে গেল। অমূল্য, তুমি অমূল্য তাঁত বুনে খাও, বিধবার ধম্ম কী বুঝবে! যেন মালতীর বলার ইচ্ছা, বিধবার সম্মান বৈধব্যে, বিধবার শাক অন্নে। তুমি অমূল্য, তাঁতের খটখট শব্দ শুনে দু'কান ভোঁতা করে রেখেছ, নাকে তোমার গন্ধ থাকে না, চোখে তোমার স্বপ্ন ঝোলে—আমি বিধবা মালতী সারাদিন এই সংসার করে, ঘরদোর পরিষ্কার রেখে তোমার তাঁতের নলী ভরে শাক অন্নে আমার ভুরিভোজন। ঢেকুরে আঁশের গন্ধ থাকলে আমার সম্মান বাঁচে না। পুরুষ হাঁসটার মতো বনেবাদাড়ে, জলের ঘাটে অথবা রাতের আঁধারে ঘাড় কামড়ে সুখ পেতে চাও, তাতে আমার সম্মান বাঁচে না। তুমি আমায় ভালোবাসা দাও, শুধু আঁশের আশায় ঘুরলে আমিও একদিন গলা কামড়ে দেব। শুধু আঁশে আমার ভালোবাসা কথা কয় না।

স্বপ্নটা দেখার পর থেকেই কেন জানি অমূল্যর প্রতি নৃশংস ভাবটা আরও বেড়ে গেল। অমূল্য আর জব্বর বড় বেশি ঘুরঘুর করছে। মালতী ভাবল, দাদাকে একদিন সে সব বলে দেবে। কারণ জব্বরও কম যায় না। জব্বরের কথা মনে আসতেই মালতীর মুখটা ঘৃণায় কুঁচকে গেল।

মালতী এখন হাঁস নিয়ে ঘাটে যাচ্ছে। মনে মনে অমূল্য ওর ভিতরে তাঁত বুনছে। একবার এদিক, একবার ওদিক। পুরুষ হাঁসটা অন্য হাঁসগুলিকে জলে নামতে দিচ্ছে না। তার আগেই ঠোঁট কামড়ে ঝগড়া করতে চাইছে। মালতী পুরুষ হাঁসটার কাণ্ড দেখে অন্যদিনের মতো আজও মুখে আঁচল চাপা দিল। ওর ভিতর থেকে এখন আবার সেই দুষ্ট হাসিটা মুখে খেলে গেল। তর সয় না। মালতী হাঁসগুলিকে জলের দিকে নিয়ে যাবার সময় কথাটা বলল। আর এইসব দেখলেই মনটা তাঁতের মাকুর মতো কেবল এদিক ওদিক করতে থাকে। এই একটা ইচ্ছার ভাব থাকে ভিতরে সাপ্টে ওকে কেউ খেয়ে ফেলুক। কিন্তু ফের কেন জানি মনে হয়, বিধবা মানুষের এই ইচ্ছা ভালো নয়। তখন শুধু স্নানের ইচ্ছা, ডুবে ডুবে শরীর থেকে সব পাপ চিন্তা মুছে দেবার ইচ্ছা। যেন স্নান না করলে জাত যাবে। তারপর আবার মনে হয় বিধবার আবার জাত, বিধবার আবার ছোট বড় সবল যুবতী মালতী যার অঙ্গে লাবণ্য ঝরে পড়ে—যার মুখ পেঁয়াজের কোমল খোসার মতো নরম আর যার ইচ্ছার ঘরে অমূল্য শুধু একটা বাঁদর—সারাক্ষণ লেজ তুলে বসে আছে, সেই অমূল্যকে স্বপ্নে দেখে মুখ বড় বিস্বাদ লাগছিল।

হাঁসগুলি জলে নেমে গেলে মালতী একবার চারদিকে তাকাল। হাঁসগুলি ডুবে ডুবে স্নান করছে। কেউ নেই কাছে। তামাক খেত পার হলে উঁচু জমি, জব্বর সেখানে হালচাষ করছে। নরেন দাস জমির নিচ থেকে রস তুলে পেঁয়াজ রসুন অথবা চীনাবাদামের শরীর পুষ্ট করার চেষ্টায় আছে। আর যেন কোথাও কোনও দৃশ্য ঝুলে নেই। শুধু ঠাকুরবাড়ির সোনা পড়ছে—পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। লালটু পড়ছে, অ্যাট লাস্ট দি সেল্‌ফিস্‌ জায়েন্ট কেম। জব্বর হাল চাষ করছে। মালতীকে দেখতে পেলে জব্বর গাই গরু ফেলে এক্ষুনি ছুটে আসবে—মালতী দিদি, বদনাতে পানি দ্যান। গলাটা শুকাইয়া গ্যাছে। মালতী ভাবল, জব্বর এলে সামসুদ্দিনের খবর নেবে। সামু এখন এখানে নেই। ঢাকা গেছে। পাগল ঠাকুর হাতি দিয়ে ওদের জলসা ভেঙে দিয়েছিলেন। ফেলু শেখের হাত ভেঙে দিয়েছেন। তারপর থেকে সামু বুঝি হিন্দুপাড়া আসা ছেড়ে দিয়েছে। ছোট ঠাকুর শচীন্দ্রনাথ একদিন গোপাটে দাঁড়িয়ে সামুর সঙ্গে কি সব কথা বলতে বলতে বচসা করেছিলেন। সেই থেকে সামু আর আসে না। সামুর মেয়েটা মাঝে মাঝে গোপাটে এসে ওদের ছাগল গরুগুলি নিয়ে যায়। বড় নথ নাকে দিয়েছে মেয়েটা। ঠাকুরবাড়ির অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল। কারও জন্য অপেক্ষা করছিল। মালতী চুপি চুপি হেঁটে গিয়ে বলেছিল, কিরে ফতিমা, তুই!

ফতিমার ছোট চোখ। বড় নথ নাকে। শিশু বয়সের মুখচোখ শুধু লাবণ্যে ভরা। বিনুনী বাঁধা চুল। ফতিমা কিছুক্ষণ মালতীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, পিসি, সোনাবাবুরে দিয়েন। বলে, সে কোঁচড় থেকে দুটো লটকনের থোকা মালতীর হাতে দিয়েছিল।

অসময়ে লটকন ফল! সুতরাং মালতী বিস্মিত।

ফতিমা নিজেই বলল, আবেদালি চাচা উজান থাইকা আনছে।

মালতীর কেন জানি দু'হাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানের মেয়ে ছুঁয়ে দিলেই জাত যাবে। সে লটকনের ফল খুব আলগা করে হাতে নিল। সে ফতিমাকে ছুঁল না। শুধু হাসতে হাসতে বলল, সোনাবাবুর লাইগা বড় কষ্টরে তোর। বড় হইলে বাবুর লগে বিয়া দিয়া দিমু।

ছোট মেয়ে। অথচ সামান্য রসিকতা ফতিমাকে কেমন লজ্জিত করেছিল। ফতিমা আর দাঁড়ায় নি। সে গোপাট ধরে ছুটছিল। লজ্জায় হোক অথবা অন্য এক কারণ যেন, মেয়েটাকে গোপাট ধরে ছুটে যেতে সাহায্য করছে। অথবা এত যে গাছগাছালি যার ছায়া সারা গ্রামে এবং মাঠে জড়িয়ে আছে তার ভিতর নিরন্তর এক সুষমা আছে যেন। এই সুষমা, ভালোবাসার সুষমা মেয়েটার সারা অঙ্গে লেপ্টে আছে। হেমন্তের শেষ বিকেল ছিল সেটা। মেয়েটা ক্রমে এক সুষমার ভিতর হারিয়ে গেল।

সেই সুষমা মালতীকে দীর্ঘদিন অভিভূত করে রেখেছে। সোনা পড়ছে তখনও—পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। হাঁসগুলি জলে ডুবছিল ভাসছিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে

মালতী। জলে ওর লম্বা ছায়া, মালতী জলে নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে। এই পাড়ে দাঁড়িয়ে কত কথা মনে হয়, সামুর কথা মনে হয়। রসো এবং বুড়ির কথা মনে হয় আর সেই মানুষের কথা মনে হয়। সে মানুষ কৈশোরে ওকে সাপ্টে চুমু খেয়েছিল তারপর ভয়ে নিরুদ্দিষ্ট। সেই মানুষ গত রাতে এসেছে। এখন আর তেমন ছোট নেই। কথায় কথায় ঝগড়া করবে না। এখন মানুষটা বড় এবং মহৎ। মানুষটা দেশের কাজ করে বেড়াচ্ছে। জেলে ছিল কিছুদিন। সবই এখন কেন জানি গল্পকথার মতো মনে হয়। মালতী জলে আর হাঁস দেখতে পাচ্ছিল না, শুধু মানুষটার শরীর মুখ জলের ওপর ভেসে যেতে দেখছে। এই মানুষটাকে দেখার জন্য কেমন পাগলের মতো ঠাকুরবাড়ির ঘাটে সারাটা সকাল ডুবে ডুবে স্নান করল। বড়বৌর জন্য পূজার ফুল তুলে দিল। এমন কি ঠাকুরঘরের পাশে মানুষটাকে দেখতে পাবে ভেবে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কোথায়! ফের সেই অমূল্যর মুখ, অমূল্য এবং জব্বর উভয়ে মিলে কেবল যেন ওকে গিলতে আসছে। সে মানুষটার জন্য ঠাকুরঘরের দরজায় অধিক সময় অপেক্ষা করতে পারল না—কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে। এমন কি বড়বৌকে বলতে পারল না, বৌদি, রঞ্জিত নাকি কাইল রাতে আইছে? কারণ, ভালোবাসার সুষমা মালতীর চোখে। মালতী রঞ্জিতকে দেখার জন্য ঘাটের পাড়ে যেসব ঝোপজঙ্গল ছিল সেখানে নিজেকে অদৃশ্য করার ইচ্ছাতে বসে পড়তেই কে যেন বলে উঠল, মালতী, তুমি এখানে একা।

মালতীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে পিছনের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল রঞ্জিত দাঁড়িয়ে আছে। হাত ধরে আছে সোনা। সব লুকোচুরি এবার বুঝি ফাঁস হয়ে গেল। মালতী প্রথম মাটি থেকে কিছুতেই চোখ তুলতে পারল না, পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির—এখন আর কেউ পড়ছে না। সব সহসা বড় চুপ মেরে গেছে। এমন কি কীট-পতঙ্গের আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে না। মালতী ভয়ে ভয়ে বলল, হাঁস ছাড়তে আইছি। এই বলে মুখ তুলে তাকাল রঞ্জিতের দিকে। মনে হল এখন কোথাও কিছু চুপ হয়ে নেই। সকল কিছু ডেকে বেড়াচ্ছে, হাঁস-মুরগি, গরু-বাছুর কাকপক্ষী সকলেই কলরব করছে। ঠিক তখনই মালতী তাঁতঘরে অমূল্যর ঠকঠক তাঁতের শব্দ শুনতে পেল।

রঞ্জিতকে দেখে মালতীর দীর্ঘদিন পর সব ভয় কেটে গেছে। জব্বর অথবা অমূল্য কেউ বুঝি আর তাকে গিলে খেতে পারবে না।

কোথাও যেন তখনও একই স্বরে কে পড়ে যাচ্ছে—অ্যাট লাস্ট দি সেলফিস্ জায়েন্ট কেম। মালতী কান পেতে শোনার সময় রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। রঞ্জিতও সামান্য না হেসে পারল না।

মালতীর দিনগুলি মন্দ কাটছিল না। রঞ্জিত আসার পরই মালতীর মনে হল ওর কী যেন হারিয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে, কী যেন নেই, সংসারে কী না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় এমন এক জিনিস রঞ্জিত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মালতীর জীবনে ফিরে এসেছে।

শীতকাল বলে বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। শীতকাল বলে জলে বাঁশ পচা গন্ধটা তেমন তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে না। আর শীতকাল বলেই গ্রামের সকলে সকাল সকাল জল নিতে চলে আসে কুয়োতে।

চাকের কুয়ো লম্বা। গলা পর্যন্ত দাঁড়ালে দেখা যায়। কুয়োতলা পার হলে বাঁশঝাড়। ঈশম শক্ত বাঁশ খুঁজছে। রঞ্জিত একটা করে কোপ মেরে আলগা করে দিচ্ছে আর ঈশম সেই বাঁশ টেনে বের করে কঞ্চিগুলি ছেঁটে দিচ্ছিল। যারা জল নিতে এসেছিল ওরা বেশিক্ষণ কুয়োতলায় অপেক্ষা করল না। বড়বৌর সেই নিখোঁজ ভাইটি ফিরে এসেছে। সরু গোঁফ, বড় চোখ আর বিদেশ বিভুঁয়ে থাকে বলেই হয়তো শরীরে এক ধরনের শ্যামল লাবণ্য। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছে, চুল কোঁকড়ানো, মাথার মাঝখানে সিঁথি—লম্বা মানুষ রঞ্জিতকে এখন আর দেখলে চেনাই যায় না, বাপ-মা মরা সেই বালক এত বড় হয়ে এখন মশাই হয়ে গেছে।

যারাই জল নিতে এসেছিল তারা সকলেই প্রায় বালতি ফেলছে কুয়োর ভিতর এবং জল তুলে আনার সময় রঞ্জিতকে দেখছে। সুদর্শন এই যুবকটিকে সকলেই একনজরে চিনতে পেরেছিল, কতদিন আগের কথা যেন, কেউ কেউ ডেকে ওর সঙ্গে কথা বলল, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, সে যাদের দিদি বলে ডাকত, পাড়াপড়শী যারা এক সময় ওকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়েছিল, মা-মরা ছেলে বলে যারা ওকে সামান্য ভালোমন্দ হলে ডেকে খাওয়াত তারা জল তুলে নিচে নেমে গেল এবং ওর সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরে গেল।

মালতী এল সকলের শেষে। ওর কাঁখে কলসী, পরনে তাঁতের শাড়ি। মালতী যে বিধবা, এ-শাড়ি পরলে মনে হয় না। মনে হয় কুমারী মালতী শখ করে এখন জল তুলতে এসেছে। মনে হয় মালতী এই মানুষের সামনে সাদা থান পরতে লজ্জা পায়। সে এসেই সোজা কুয়োতলায় কলসী রেখে যেখানে রঞ্জিত বাঁশ কাটছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল—এত বাঁশ। এত বাঁশ দিয়া কি হইব?

রঞ্জিত বলল, জলে ভিজিয়ে রাখব। লাঠি হবে, পাকা বাঁশের লাঠি।

সোনা আশে পাশে ছোটাছুটি করছে। সে এই নতুন মানুষটিকে কখনও ছাড়ছে না। মানুষটি তাকে কত দেশ-বিদেশের সব অদ্ভুত গল্প বলছে। অদ্ভূত সব ম্যাজিকের কথা বলছে।

সোনা বলল, পিসি, রঞ্জিত মামা রাইতের ব্যালা ম্যাজিক দেখায়।

মালতী আর একটু নেমে গেল। যেখানে ঈশম বাঁশের গুঁড়িতে দা রেখে কাটা বাঁশ ঝাড় থেকে টেনে নামাচ্ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, তর মামার কথা আর কইস না!

রঞ্জিত মালতীর দিকে তাকাল না। সে বাঁশের কঞ্চি কেটে সাফ করছে কারণ মালতীর কোনও রহস্যজনক কথা শুনলেই শুধু সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে। সেদিন মালতী রাগে অথবা ক্ষোভে কিংবা হয়তো উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। চোখ মুখ লাল, চোখ ভিজা ভিজা, যেন মালতীর সব সতীত্ব রঞ্জিত কেড়ে নিয়েছে। প্রায় মালতী কেঁদে ফেলেছিল। রঞ্জিতের সেই কথা মনে হয় আর মনে হয়—মালতী তোমার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে না। মালতী তুমি দিদিকে আর কিছু বলনি তো!

রঞ্জিত এবার মালতীর দিকে সহজভাবে তাকাল। বলল, মামার কথা বলতে নেই কেন?

রঞ্জিত এমনভাবে তাকাল, যেন মালতীরও সেই দৃশ্যটা মনে পড়ুক এমন এক ইচ্ছা। সুতরাং মালতী আর দেরি করল না। সে জল ভরে চলে গেল। চলে গেলেই শেষ হয়ে যায় না। যেতে যেতে বড়বৌদির সঙ্গে গল্প করল। বড়বৌ এবং ধনবৌ ঢেঁকিতে ঠাকুর-ভোগের জন্য ধান ভানছে। ভানা ধান ঢেঁকির মাথার কাছে বসে শশীবালা ঝাড়ছিলেন। পাগল ঠাকুর আজ কোনওদিকে বের হয়ে যাননি। তিনি উঠোনে আপন মনে পায়চারি করছেন। মালতী উঠোনে এসেও বাঁশের কোপ শুনতে পেল। এই বাঁশ দিয়ে কী হবে, বাঁশ দিয়ে লাঠি হবে! তার তোড়জোড় হচ্ছে। মানুষটার শরীর হাত পা মুখ, সারাক্ষণ কেন জানি বুকের ভিতর নড়েচড়ে বেড়ায়। এমন মানুষটাকে দেখার জন্য ছলছুতো করে কেবল এ-বাড়িতে চলে আসা। কী আর কাজ মালতীর, নরেন দাস এখন আর বাড়িতে নেই। অমূল্য মাথায় ডুরে শাড়ি নিয়ে বাবুর হাটে গেছে নরেন দাসের সঙ্গে। এখন বাড়িতে শুধু শোভা, আবু, মালতী। আভারানী আছে, কিন্তু এত নিরীহ যে মনেই হয় না একটা মানুষ বাড়িতে আছে। আভারানীকে রঞ্জিত বৌদি বলে ডাকে। রাতের বেলায়, যখন শীত বলে সকলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, যখন বৈঠকখানায় শচীন্দ্রনাথ লালটু পলটুকে পড়াতে বসেন তখন রঞ্জিত নিজের ঘরে বসে সামান্য আলোতে কি সব বড় বড় বই পড়ে। কত পড়ে মানুষটা! মানুষটা এখন কম কথা বলে, বেশি কথা বললে মালতীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, যেন অজ্ঞ লোকের কথা শুনে হাসছে। তখন অভিমানে মুখটা লাল হয়ে ওঠে মালতীর। মানুষটা

তখন অপরাধীর মতো চোখ করে তাকায়। তাকালেই কিছু দৃশ্য, ভয়ে মানুষটা নিরুদ্দেশে চলে গেল।

মালতী একদিন বলেছিল, এত ডর পুরুষ মাইনসের ভালো না।

—আমার আবার ডর কিসের?

—ডর না! মুখে কইলেই কি সব কওয়ন যায়!

—আমার কিন্তু মনে হয়েছিল তুমি দিদিকে সত্যি বলে দেবে।

—আর কিছু মনে হয় নাই ত।

—আবার কি মনে হবে!

—ক্যান, মালতীর নামে কত কথা মনে হইতে পারে।

—আমার আর কিছু মনে হয়নি মালতী। আমি তারপর অনেক দূরে চলে গেছলাম। আসাম চলে যাই। সেখান থেকে ফিরে আসি দু'বছর পর। কলকাতায় লাহিড়ীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। তিনিই আমাকে প্রায় টেনে তুলেছেন। বলতে বলতে থেমে যেত রঞ্জিত। স্বপ্ন দেখতে শিখে গেলাম। এ-সব এখন খুব তুচ্ছ মনে হয়। বোধ হয় বেশি বলা হয়ে গেল। তার গোপন জীবনের কথা বুঝি ফাঁস হয়ে গেল। সে সহসা থেমে আর কিছু বলতে চাইত না। নিজের কথা ভুলে গিয়ে বলত, তুমি কেমন আছ। তোমার সব খবরই আমি রাখতাম। তুমি যে এখানে চলে এসেছ তাও। কিন্তু তারপর?

—তারপর আবার কি! যেন বলার ইচ্ছা, তারপর যা আছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। এই নিয়ে আছি।

—সামুকে আর দেখি না কেন?

—সামু ঢাকা গ্যাছে। লীগ লীগ কইরা দ্যাশটারে জ্বালাইয়া দিল।

—সামু তবে পার্টি করে!

—পার্টি না ছাই! মালতীকে খুব হিংস্র দেখাচ্ছিল। মালতী বলল, লাঠি ত বানাইতেছ মেলা। কিন্তু লাঠিতে মাথা ভাঙতে পার কয়টা?

—লাঠি তো মালতী মাথা ভাঙার জন্য নয়, মাথা রক্ষা করার জন্য। আমি ভেবেছি, এখানেই মূল আখড়া করব। তারপর আরও তিনটে ছোট ছোট আখড়া খুলব। একটা বামন্দিতে, একটা সম্মান্দিতে আর একটা বারদীতে। তারপর সেখানে থেকে যারা শিখে ফেলবে তারা আবার তিনটে করে নতুন আখড়া খুলবে। গ্রামে গ্রামে আখড়া খুলে

আমাদের প্রত্যেককে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা সব শিখে নিতে হবে। নিজের মাথা রক্ষা করার জন্য এসব করছি। অন্যের মাথা ভাঙার জন্য নয়।

মালতী কেমন লজ্জা পেল বলে। তারপর বলল, তুমি আমারে দুই চারটে কৌশল শিখাইয়া দ্যাও। আমারে লাঠি খেলা শিখাইলে তোমার আবার জাত যাইব না ত?

—জাত যাবে কেন?

—আমি মেয়েমানুষ। অবলা জীব।

—অবলা জীবদেরই বেশি শিখতে হবে। আরম্ভ হোক, সব গোছগাছ করে নি। খেলা জমে উঠুক।

—খেলা শিখাইবে কে?

—আমি।

—তুমি আবার এইসব শিখলা কবে?

—এক ফাঁকে শিখে ফেলেছি।

—তুমি কত না কিছু জান! কত কিছু না করতে পার!

—আমি কিছুই করতে পারিনি মালতী। কত কিছু করার আছে আমাদের। তুমি সব জানলে অবাক হয়ে যাবে।

—আমারে দলে নাও না।

—দল পেলে কোনখানে?

—এই যে তুমি লাঠিখেলার দল করতাছ।

দল কথাটা বলতেই রঞ্জিত কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। দল বলা উচিত নয়। কারণ সে এখানে গোপনে কিছুদিন বসবাস করতে এসেছে। সে বলল, না, কোন দল করছি না মালতী। আমার দল করার কি আছে।

—ক্যান, বৌদি যে কইল তুমি দ্যাশের কাজ কইরা বেড়াও।

—তা হলে দিদি তোমাকে সব বলেছে! বলে সামান্য সময় চুপ করে থাকল রঞ্জিত। সকালবেলার রোদ ওদের পিঠে পড়ছিল। ওরা দীনবন্ধুর বড় ঘরটার পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। লালটু পলটু সোনা সকলেই ওকে ঘিরে আছে। ওরা মালতী পিসিকে দেখছে।

মামা, মালতী পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, মালতী পিসি মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে।

মালতী কিছু বলতে যাচ্ছিল। দেখল এইসব ছোট ছোট ছেলেদের সামনে বলা ঠিক না। মালতী আর কথা না বলে চলে গেল।

খুব গোপনে কাজ করছিল রঞ্জিত। সে লাঠি খেলা ভিতর বাড়ির উঠোনে, জ্যোৎস্নায় অথবা মৃদু হারিকেনের আলোতে শেখাবার চেষ্টা করছে। যেন কেউ না জানে। কেবল বড়বৌ, ধনবৌ পাগল ঠাকুর সাক্ষী থাকত। সোনা, লালটু, পলটু ঘুমিয়ে পড়লে উঠোনে লাঠি খেলা আরম্ভ হতো। কিন্তু একদিন রাতে সোনা পাশে খুঁজতে গিয়ে দেখল মা নেই। মা কোথায়! সে ঘুম থেকে উঠে বসল। দরজা খোলা। উঠোনে লাঠির ঠকাঠক শব্দ পাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত। আবছা আলোতে সে বুঝতে পারল, মা উঠোনের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছেন। সে নেমে দরজা পার হয়ে মায়ের কাছে চলে গেল। আট দশজন গ্রামের জোয়ান লোক রঞ্জিত মামার কাছে লাঠি খেলা শিখছে। অন্য পাশে কারা যেন—বুঝি মালতী পিসি, বুঝি কিরণী দিদি এবং ননী, শোভা, আবু। ওরা কাঠের ছোরা নিয়ে খেলছিল, খেলা শিখছিল। মা এবং জেঠিমা পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল আর বোধহয় পাহারা দিচ্ছিল। এদিকে কেউ আসছে কিনা লক্ষ রাখছে। লাঠির ঠকাঠক শব্দ উঠছে। শির, বহেরা কটি এমন সব শব্দ। ছোট মামা কেমন মন্ত্রের মতো তালে তালে বলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ছোট মামা লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে এত বেগে এদিকে ধেয়ে আসছেন যে টের পাওয়া যাচ্ছে না ছোট মামার হাতে লাঠি আছে, কেবল বনবন শব্দ। তিনি ঘুরে ঘুরে, কখনও ডান পা তুলে, কখনও বাঁ পা তুলে, যেন মানুষটা এই লাঠির ভিতর বেঁচে থাকার রহস্য খুঁজে পেয়েছে, মানুষটা লাঠিটাকে নিজের ডান হাত বাঁ হাত করে ফেলছে, যেমন খুশি লাঠি চালাচ্ছে। সোনা মাঝে মাঝে লাঠির ভিতর ছোট মামার মুখটা হারিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেল।

সোনাও খুব উত্তেজনা বোধ করছিল ভিতরে ভিতরে। সামান্য কাকজ্যোৎস্না। কামরাঙা গাছের ওপাশে তেমনি বিস্তৃত মাঠ নিঃসঙ্গ জ্যোৎস্নায় শুয়ে আছে। পাগল জ্যাঠামশাই দাওয়ায় বসে হাত কচলাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে সেই এক উচ্চারণ। সংসারে যেন আপদ লেগেই আছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ছোট মামা মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছিলেন মালতী পিসির দিকে। মালতী পিসি কাঠের ছোরা নামাতে গিয়ে কোথায় ভুল করছে শুধরে দিচ্ছেন। দাওয়ার পাশে সব বড় বড় লাঠি দাঁড় করানো। তেল মাখানো বলে লাঠিগুলি এই সামান্য জ্যোৎস্নায়ও চকচক করছে। কেউ লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে পরিশ্রান্ত হলে, লাঠিটা দাওয়ার পাশে রেখে উঠোনের উপর দু'পা ছড়িয়ে বসে যাচ্ছে। ছোট মামা হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে অনবরত দৃষ্টি রাখছেন সকলের উপর। সোনা আর কাফিলা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে ছুটে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ধনবৌ বলল, তুমি সোনা!

—আমার ভয় করতাছে।

ঘরের অন্ধকারে সোনা একা থাকতে ভয় পাচ্ছিল। সে ফের বলল, মা এইটা কি হইতাছে?

—লাঠিখেলা।

রঞ্জিত দেখতে পেল সোনা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সে সোনাকে কাছে ডেকে বলল, তুই খেলা শিখবি?

—শিখমু! খুব আগ্রহের সঙ্গে কথাটা বলল সোনা।

—কিন্তু অনেক সাধনা করতে হয়।

সোনা সাধনা কথাটার অর্থ জানে না। সে মাকে বলল, মা সাধনা মানে কি মা?

রঞ্জিত বলল, ধনদি কি বলবে। আমার কাছে আয়। সাধনা মানে হচ্ছে তুমি যা করবে, একাগ্রচিত্তে করবে। কেউ তোমার এই ইচ্ছার কথা জানবে না।

—আমি কমু না।

—হ্যাঁ বলতে নেই। যদি না বল, তবে তোমাকে শেখাতে পারি।

—দ্যাখবেন, আমি কমু না।

রঞ্জিত জানত এইসব কথার কোনও অর্থ হয় না। এইসব বালকদের রঞ্জিত দলে নিয়ে নিল। বলে দিতে পারে, নাও পারে, তবু ওদের একাগ্রচিত্ত করার জন্য মাঝে মাঝে রঞ্জিত নানাভাবে বক্তৃতা করত। সুতরাং সোনা, লালটু, পলটু এই দলে ক্রমে ভিড়ে গেল। ওরা খেলার চেয়ে ফাইমরমাস খাটায় বেশি উৎসাহ বোধ করত। রাত ঘন হলে কোনওদিন সোনা ঘুমিয়ে পড়ত। ওর খেলার কথা মনে থাকত না। ভোর হলে মামাকে বলত, আমি তোমার লগে কথা কমু না।

—কেন কি হল?

—তুমি কাইল আমারে খেলাতে লও নাই।

—তুমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সোনা মাঝে মাঝে মামার মতো অথবা বড় জেঠিমার মতো কথা বলতে চেষ্টা করত। মামা যেন তার অন্য গ্রহের মানুষ। স্পষ্ট এবং ধীর গলায় কথা বলে। মালতীরও ইচ্ছা হত রঞ্জিতের মতো কথা বলতে। বড়বৌদি এবং এই রঞ্জিতের কথা এত মিষ্টি যে, মনের ভিতর কেবল গুনগুন করে বাজে। ওদের কথা এতটুকু কর্কশ নয়। মালতীর মনে হত

ওর কথা কর্কশ। সে সেজন্য যতটা পারে রঞ্জিতের সঙ্গে কম কথা বলে। রঞ্জিত আজকাল কাজের কথা ব্যতিরেকে অন্য কথা বলতেই চায় না। সে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় বলত, তোমার খুব একাগ্রতার অভাব মালতী। তুমি খুব যেন অন্যমনস্ক, খেলার সময় অন্যমনস্ক হলে মাথায় মুখে কোনদিন লেগে যাবে।

মালতী তখন উত্তর দিত না। কি উত্তর দেবে! এই খেলা যেন নিত্য তার সঙ্গলাভের জন্য। যেন এই মানুষ এসে গেছে তার, এখন আর ভয় কিসের। রঞ্জিতের সব কথা সেজন্য সে চুপচাপ শুনে যেত কেবল। কোনও কোনদিনও মালতীকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সে এই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করত। তখন আরও গা জ্বলে যেত মালতীর। এসব গ্রাম্য আঞ্চলিক ভাষা যেমন কর্কশ তেমন শ্রীহীন! রঞ্জিত এমন ভাষায় কথা বললে, তার কাছে আর কিছু চাইবার থাকে না। মালতী বিরক্ত হয়ে বলত, তোমার আর ঢং করতে হবে না রঞ্জিত। ইচ্ছা করলে আমিও তোমার মতো কথা বলতে পারি। তুমি যা ভাল করে বলতে পার না, তা বলো না। বড় খারাপ লাগে। তোমার সঙ্গে আমি ছেলেবয়স থেকে বড় হয়েছি।

রঞ্জিত কেমন অবাক হল ওর কথা শুনে। —তোমাকে মালতী আর গ্রাম্য বলে ধরাই যায় না।

মালতী বলল, তবু যার যা তার তা। আমার মুখে তোমার ভাষা মানইব ক্যান। তুমিও যা ভাল কইরা কইতে পার না, তা কইতে যাইয় না। বড় খারাপ লাগে শুনতে।

সোনা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি ডাকলা না ক্যান?

—ঠিক আছে, আজ রাতে তোমাকে ডেকে তুলব। কিন্তু শর্ত আছে।

—শর্ত! শর্ত কথাটাই শোনেনি সোনা। সে বলে, ছোটমামা শর্ত কি!

—তুমি সোনা শুধু মাঠ দেখেছ।

—মাঠ দেখেছি।

—ফুল দেখেছ।

—ফুল দেখেছি। সোনা মামার মতো কথা বলতে চেষ্টা করল।

—আর সোনালী বালির চর দেখেছ।

—চর দেখেছি। তরমুজ দেখেছি।

—কিন্তু শর্ত দ্যাখো নি।

—না।

শর্ত বড় এক দৈত্য। এই দৈত্য কাঁধে চাপলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। আবার অমানুষ মানুষ হয়ে যায়।

—তোমার দৈত্যটা কি কয় ছোটমামা?

—আমার দৈত্যটা অমানুষকে মানুষ হতে কয়।

—দৈত্যটা আমারে আইনা দ্যাও না।

—বড় হও। বড় হলে এনে দেব। রঞ্জিত এই বলে সোনাকে কাঁধে তুলে ঘোরাতে থাকল। বড় উঠোনে লাঠি খেলা হয়, ছোরা খেলা হয়। চারধারে বড় বড় টিন-কাঠের ঘর। পালবাড়ির উঠোন থেকে কিছু দেখা যায় না ভিতরে। রাত হলেই উঠোনটা মানুষে ভরে যাবে।

আতা বেড়ার ওপাশ থেকে একটা চোখ অপলকে দেখছে রঞ্জিতকে। রঞ্জিতের পেশীবহুল শরীর দেখে চোখটা তাজ্জব বনে যাচ্ছে। রঞ্জিতের খালি গা। রঞ্জিত সোনাকে কাঁধে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। কখনও সোনাকে দুহাত ধরে ঘোরাচ্ছে। সোনা খুব আনন্দ পাচ্ছিল। ওর মাথা ঘুরছিল। কিছুক্ষণ ঘুরিয়েই সে সোনাকে মাটির ওপর ছেড়ে দিচ্ছে, সোনা টলছিল, দু'হাত বাড়িয়ে আবার আবার করছিল। শচীন্দ্রনাথ উঠোন পার হয়ে যাবার সময় দেখলেন, রঞ্জিত সোনাকে নিয়ে উঠোনে খেলা করছে। শচীন্দ্রনাথ কিছু বললেন না। সকালবেলা পড়ার সময়। কিন্তু সোনার পরীক্ষা হয়ে গেছে।

সে পরীক্ষায় খুব ভালো করেছে। সোনার স্মৃতিশক্তি প্রখর। এই সকালে উঠোনের ওপর মামা ভাগ্নেকে নিয়ে এমন মত্ত দেখে মনে মনে খুশি হলেন তিনি। শীতকালে ওদের মামাবাড়ি যাবার কথা। ধনবৌ ওদের পরীক্ষা হয়ে গেলেই বাপের বাড়ি যায়। শীতের সময় খুব কুয়াশা হয় মাঠে। কলাই গাছে কলাই শুঁটি। আর মাঠে মাঠে সর্ষের ফুল হলুদগোলা রঙের মতো।

শীতের দিনেই হত খাবার, রকমারি খাবার। পিঠে-পায়েস তখন বাড়ি বাড়ি। তখন বড় বড় লোকদের বাড়িতে বাস্তুপূজা। ভেড়া বলি, তিলা কদমা আর তিলের অম্বল। নানা রকমের খাবার। তখন বাজারে গেলেই বড় পাবদা মাছ—কি সোনালী রং আর কি বড় বড়! কালিবাউশ, বড় বাগদা চিংড়ি আর দুধ। শীত এলেই অঞ্চলের গাভীরা তাদের সঞ্চিত দুধ সব ঢেলে দেয়। তখন অভাবটাও পল্লীতে পল্লীতে জাঁকিয়ে বসে থাকে না। তখন সংসারে সংসারে আনন্দ উৎসব। সব দিনমজুর তখন কাজ পায় গেরস্থবাড়িতে। জিনিসপত্রের দাম সস্তা হয়ে যায়। আর শীতকাল এলেই লালটু পলটু গ্রামের সব ছেলেদের সঙ্গে মাঠে নেমে গিয়ে গোল্লাছুট খেলে। শুধু মাঠ, ধান কেটে নেওয়া হয়েছে বলে নরম মাটির শুকনো নাড়া, পা পড়লেই খড়খড় শব্দ। তখন যত পারো ছোটো। ছুটে ছুটে পড়ে যাও মাটিতে—কিন্তু শরীরের কোথাও এতটুকু আঘাত লাগবে না।

শচীন্দ্রনাথ আতা বেড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, মালতী দাঁড়িয়ে আছে। কাফিলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। শচীন্দ্রনাথ বললেন, তুই এখানে?

—আঠা নিমু। বলে কাফিলা গাছ থেকে আঠা তুলে নেবার মতো অভিনয় করল। বস্তুত মালতী এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একজন মানুষকে ওপাশে বেড়ার ফাঁকে চুপি চুপি দেখছিল। কেউ এলেই খুঁটে খুঁটে যেন গাছ থেকে আঠা নিচ্ছে এমনভাব চোখেমুখে। সে এই করে প্রাণভরে রঞ্জিতকে দেখছিল। ভোরে উঠেই মালতীর হাতে যা কাজ ছিল, যেমন উঠোন ঝাঁট দেওয়া আর বাসন ঘাটে নিয়ে যাওয়া, তারপর হাঁসগুলি ছেড়ে দেওয়া—এইসব কাজ করে দেখল আর কিছু করণীয় নেই। আভারানী রান্নাঘরে চিঁড়ার ধান ভিজিয়ে রাখছে। চুপি চুপি সে ঠাকুরবাড়ি চলে এল। মালতী আতা বেড়ার পাশে একটু সময় অপেক্ষা করল। প্রথম উঁকি দিতে সাহস পায়নি। একটা কিছু অছিলা দরকার। বেড়ার সঙ্গে কাফিলা গাছ। গাছ থেকে একটু একটু আঠা ঝরছে। সে একটা পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ দেখতে পেলে বুঝবে মালতী আঠা নিচ্ছে গাছ থেকে। সে আতা বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিল। মরিয়া হয়ে সে উঁকি দিয়ে রঞ্জিতকে দেখতে থাকল। অপমানকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে এই নিয়ে, কলঙ্ক পর্যন্ত রটে যেতে পারে এই নিয়ে, সে তাও ভুলে গেল। নরেন দাস বাড়িতে নেই, অমূল্য বাবুর হাটে শাড়ি বিক্রি করতে গেছে, তাঁত এখন ক'দিনের জন্য বন্ধ। সুতরাং মালতীর প্রায় ছুটির দিন এগুলি। সে এইসব দিনে খেলে, বেড়িয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তেঁতুলের আচার মুখে স্বাদ নিতে নিতে বেশ সময় কাটিয়ে দিতে পারবে। তারপর পুরীপূজার মেলা। সে এবার রঞ্জিতকে নিয়ে পুরীপূজার মেলায় চলে যাবে। তারপর সেই মেলার প্রাঙ্গণে সারকাসের হাতি, সিংহ, বাঘ, মাঠে ঘোড়দৌড় এবং মন্দিরের এক পাশে ডোমেদের শুয়োর বলি এসব দেখে, জিলিপি রসগোল্লা মুখে পুরে সারা মাঠ ছুটে বেড়িয়ে—কী যে এক আনন্দ, কী যে এক সুখ বসত করে মনের ভিতর—বুঝি সুখের জন্য এই মানুষ রঞ্জিত এখন তার জীবনের সব কিছু। সে মরিয়া হয়ে বেড়ার ফাঁকে একটা চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল।

বিকেলের দিকে যখন বেলা একেবারেই পড়ে এল, যখন বৈঠকখানার উঠোনে আলো মরে গেছে, সোনা, লালটু, পলটু যখন একটা করে বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে পুবের ঘরে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছিল—তখনই গলা পাওয়া গেল। পুকুরপাড় থেকে ডেকে ডেকে উঠে আসছে কে!

বৈঠকখানার উঠোনে এসে ডাকল, রঞ্জিত নাকি আইছে?

শচীন্দ্রনাথ সামুকে দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন। কিছুদিন আগে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে শচীন্দ্রনাথ সামুকে গালমন্দ করেছিলেন। কথা কাটাকাটি হয়েছে। সেই সামু ফের এ বাড়িতে উঠে এসেছে বলেই বোধ হয় তিনি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। তিনি স্বাভাবিক থাকার জন্য অন্য কথা টেনে আনলেন। বললেন, তর মায় নাকি বিছানা থাইকা আর উঠতেই পারে না।

—পারে না কর্তা।

—তারিণী কবিরাজের কাছে একবার যা।

—গিয়া কি হইব কর্তা। বোধ হয় শীতটা আর পার হইব না।

—তবু একবার গিয়া দ্যাখ। যদি তাইন একবার তর মায়েরে দেইখা যান। আমার চিঠি নিয়া যা।

সামু বলল, দ্যান চিঠি। পাঠাই। দ্যাখি কি হয়।

—দ্যাখি কি হয় না! তুমি পাঠাইবা। পিসিরে অচিকিৎসায় মারবা সে হইতে দিমু না। সামুর মুখে সামান্য প্রসন্ন হাসির রেখা ভেসে উঠল। নাকের নিচে ছাঁটা গোঁফ এবং থুতনিতে অতি সামান্য নুর—খুব লক্ষ করলে বোঝা যায় থুতনির নিচে সেই নুরটাকে যেন সামু গোপনে লালন করছে। এক সময় সামুর মুখে বড় বড় দাড়ি দেখে শচীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তরে দেখলে সামু, পিসার কথা মনে হয়। শচীন্দ্রনাথ সামুর বাবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সামুকে মহান করে তুলছিলেন যেন। তারপর কতদিন গেছে, মালতীকে ইচ্ছা করেই গালে বড় দাড়ি দেখিয়ে যেন প্রতিশোধ তুলতে চেয়েছিল। তারপর একসময় মনে হয়েছে, প্রতিশোধ কোথাও কারও জন্য অপেক্ষা করে থাকে না, সময় এলে সব জলের মতো মনে হয়, হাস্যকর মনে হয়। নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভেবে লজ্জায় মুখ ঢেকে দিতে ইচ্ছা যায়। সুতরাং এখন সামু আবার ভদ্রগোছের যেন। বিশেষ করে শিক্ষিত, মার্জিত রুচির পুরুষ। যেন এখন সামু রঞ্জিত একরকম। সামুর পরনে তফন, ডোরাকাটা। ধানগাছের মতো রং তফনের। আর গায়ে হাল্কা গেঞ্জি, পুরুহাতা শার্ট। সে এবার শচীন্দ্রনাথের দিকে না তাকিয়েই বলল, শোনলাম রঞ্জিত ফিরা আইছে?

—হ, আইছে। এতদিন কলিকাতায় আছিল, আবার ফিরা আইছে।

সামু আর শচীন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করল না। ডাকল, কৈ ঠাকুর, কৈ গ্যালা। একবার এদিকে বাইর হও। দেখি চেহারাটা। তুমি আমারে চিনতে পার কিনা দেখি।

রঞ্জিত বৈঠকখানার উঠোনে এসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল—তুই সামু না?

—তাহলে দেখছি ভুইলা যাও নাই।

—ভুলব কেন!

—কি জানি বাবা, তুমি কোনখানে চইলা গেলা। কোন চিঠিপত্র নাই। বড় বৌঠাইরেনের লগে দেখা হইলে কইছি, রঞ্জিতের চিঠি পাইলেন নি! এক্কেবারে নিরুদ্দেশে গ্যালা কোন চিঠিপত্র নাই।

রঞ্জিত বলল, ভিতরে এসে বোস।

—সাঁজ বেলাতে ঘরে বইসা থাকবা? চল না মাঠের দিকে যাই।

এটা মন্দ কথা নয়। মাঠের দিকে বলতে—সেই সোনালী বালির নদীর চর। সেই নদী, এক আবহমান কালের নদী। কথায় কথায় রঞ্জিত সামুকে অনেক কথাই বলল, অনেক দিনের অনেক কথা। এক ফাঁকে মালতীর কথাও।

জোৎস্না উঠে গেলে, পরিচ্ছন্ন আকাশ। ওরা আলের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। এই সব যব গম খেত পার হলেই নদীর চর। নদী সাপের মতো বিস্তৃতি নিয়ে এই চর, মাঠ এবং গাঁয়ের মাঝে শুয়ে আছে। তরমুজের লতা খুব ছোট বলে এবং বাতাস দিচ্ছিল বলে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দূর থেকে একপাল খরগোশের মতো মনে হচ্ছে। ওরা যেন নিরন্তর সেই বালির চরে ছুটে বেড়াচ্ছিল। নদীর জল নেমে গেছে। কি আর জল—সেই এক রকমের, মনে হয় পার হয় গরু, পার হয় গাড়ি। ওরা নদীর জলে কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলে নেমে গেল। স্ফটিক জল। নিচে নুড়িপাথর, মাথার ওপর আকাশ। সাদা জ্যোৎস্না। নদী পার হলে গ্রাম, কিছু ঘন বন, আরও পুবে হেঁটে গেলে এক বাঁশের সাঁকো পাওয়া যায়। সেই সাঁকোর ওপর মালতীকে নিয়ে একদিন সামু এবং রঞ্জিত চলে গিয়েছিল। নদীর জল মাঠ ভেঙে চুকৈর ফল, টক টক মিষ্টি মিষ্টি ফল, আনতে ওরা চলে গিয়েছিল। তারপর ওরা ফেরার পথে বড় মাঠ পার হতে গিয়ে পথ হারিয়ে সারাক্ষণ মাঠময়, গ্রামময় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলে নরেন দাস ধমক দিয়েছিল। ওদের দুজনকে নরেন দাস লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল। ওরা বাড়িতে ঢুকলেই মালতীকে কাজ দিয়ে তাঁতঘরে পাঠিয়ে দিত।

তখন সামু বলেছিল, ঠাকুর একটা বুদ্ধি দ্যাও।

রঞ্জিত বলেছিল, নরেন দাস মাছ খেতে ভালোবাসে।

—কি মাছ?

—ইচা মাছ।

সেবার ভাদ্র কি আশ্বিন মাস ছিল। ঠিক এখন মনে পড়ছে না ওদের। বর্ষার জল নেমে যেতে আরম্ভ করেছে। জলের নিচে সব জলজ ঘাস পচতে শুরু করেছে। দুর্গন্ধ জলে। জলের মাছ বড় বিল, নদী অথবা সমুদ্রে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। খাল ধরে মাছগুলি নেমে যাবে। ঠিক জায়গা মতো জলের নিচে চাই পেতে রাখতে পারলে মাছে চাই ভরে যাবে। চিংড়ি মাছে ভরে যাবে। বড় বড় গলদা চিংড়ি। কিন্তু বড় কষ্ট। বিশেষ করে সাপখোপের ভয়, জোঁক এবং জলজ কীট-পতঙ্গের ভয়। ওরা সব তুচ্ছ করে গায়ে রসুন গোটার তেল মেখে মাছধরার জন্য সাঁতরাতে থাকল। পচা জল সাঁতরে খালের বড় বট গাছটার নিচে চাই পেতে সেই বটগাছের ডালে ওরা সারারাত পাহারা দিয়ে পরদিন প্রায় দুই ঝুড়ি গলদা চিংড়ি নরেন দাসের উঠোনে এনে ফেলতেই চকিতে যেন বলে উঠেছিল, আরে, তরা করছসটা কি! সেই যে উভয়ে চকিত চোখে দেখেছিল, নরেন দাসের কী যে

লোভ! নরেন দাস, বিষয়ী মানুষ নরেন দাস, লোভে আঁকুপাঁকু করছিল—আর কোনওদিন কখনও ছোট মেয়ে মালতীরে ধরে রাখেনি। মালতী প্রায় সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে এই অঞ্চলের সর্বত্র ছুটে বেড়িয়েছে।

এই মালতীর জন্য ওরা কত দুঃসাহসিক কাজ করে বেড়াত! সেই মালতী এখন কত বড় হয়েছে। রঞ্জিত হাঁটছিল আর ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে এক সময় বলে ফেলল, মালতী বড় সুন্দর হয়েছে, কতদিন পর দেখা। মালতী এখন কি লম্বা হয়েছে!

সামু এবার মুখ তুলে তাকাল। বলল অরে নিয়া বড় ভয় আমার। একদিন রাইতে দেখি অমূল্যরে নিয়া আনধাইরে হাঁস খুঁজতে মাঠে বাইর হইছে।

রঞ্জিত বোধ হয় কিছুই শুনছিল না। মালতীকে সে প্রথম দিন দেখে চমকে গিয়েছিল। ওর মুখ থেকে যেন ফসকে বের হয়ে গেছিল—কি সুন্দর তুমি! কিন্তু বলতে পারেনি। কোথায় যেন ওর মনে এক অহঙ্কার আছে, আত্মত্যাগের অহঙ্কার। তবু মনের ভিতর ভালো লাগার আবেগ সময়ে অসময়ে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। সামুর সঙ্গে দেখা হতেই মনে হল, এই মানুষ একমাত্র মানুষ যাকে তার ভালো লাগার কথাটুকু বললে কোনও ক্ষতির কারণ হবে না। সে জলের কিনারে হেঁটে যাবার সময় মালতীর কথা বলছিল। নির্মল জলের মতো মালতী পবিত্র হয়ে আছে এমন সব বলার ইচ্ছা। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। জলের শব্দে ছোট ছোট মাছেরা ছুটে আসছে পায়ের কাছে। দাঁড়িয়ে গেলে সেই সব কুঁচো মাছ পায়ে ঠোকর মারছিল। দু'জনই প্রায় সময় সময় একেবারে চুপ মেরে যাচ্ছে আবার কথা উঠলে নানারকমের কথা, কথায় কথায় রঞ্জিত বলল, তুই নাকি লীগের পাণ্ডা হয়েছিস!

সামু এ-কথার কোনও জবাব দিল না। কারণ কথাটার ভিতর বোধ হয় রঞ্জিতের অবজ্ঞা আছে। সে যেন ঠিক এখন শচীন্দ্রনাথের মতো কথা বলছে। শচীন্দ্রনাথ অথবা অন্যান্য হিন্দু মাতব্বর ব্যক্তিরা ওর দল সম্পর্কে যেমন উন্নাসিকতা রক্ষা করে থাকেন ঠিক তেমনি যেন রঞ্জিত ওর পার্টি সম্পর্কে অবজ্ঞা দেখাতে চাইল। সুতরাং সামু অন্য কথায় চলে আসার জন্য বলল, চল উপরে উইঠা যাই। চরে বইসা হাওয়া খাই।

রঞ্জিত চরে উঠে এগিয়ে গেল। তারপর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলল, কি রে জবাব পেলাম না যে।

—ও কথা, বাদ দ্যাও ঠাকুর।

—কেন বাদ দেব। আরও কি বলতে যাচ্ছিল। সহসা যেন সামু বলে ফেলল, ওটা আমার ধর্মের কথা। বলেই হাত ধরে রঞ্জিতকে টেনে বসাল। ছুঁইয়া দিলাম। সান করতে হইব না ত! রঞ্জিত এমন কথায় হা হা করে হেসে উঠল। কিন্তু হাসতে হাসতেই কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল রঞ্জিত। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সামু এবার ধীরে ধীরে বলল, কতদিন আছ ঠাকুর? বলে দূরে নদীর জল দেখতে থাকল।

—ঠিক নেই। যতদিন পারি থাকব! বলার ইচ্ছা যেন, আত্মগোপন করে আছি। যদি ধরিয়ে না দিস তবে বোধ হয় এবার এখানে অনেকদিন পর্যন্ত থেকে যেতে পারব।

সামু এবার ওর দিকে মুখ ফেরাল। এখন সে আর এই বালিয়াড়ি দেখছে না। নদী দেখছে না। এবং এত যে রহস্যময় গ্রাম মাঠ ফসল পড়ে আছে তাও দেখছে না। সে শুধু রঞ্জিতের মুখ দেখছে। সে রঞ্জিতের মুখে সেই ছায়া দেখছে—বোধ হয় আত্মত্যাগের অহংকার এই মানুষের মুখে, অন্য মানুষের ধর্মে কর্মে একেবারেই বিশ্বাস নেই। সে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমার মাইয়াটারে তোমারে আইনা দ্যাখামু ঠাকুর। মাইয়াটা এখন ঠিক মালতীর ছোট বয়সের মত হইছে। কেবল ছুটে ছুটে বেড়ায় গোপাটে। মাইয়াটারে দ্যাখলে, আমার তোমার কথা মনে হয়। তুমি আমারে ঠাকুর অবিশ্বাস কইর না, অবহেলা কইর না। বলে কেমন মুখ ব্যাজার করে ফেলল সামু।

—মালতী বলল, তুই ঢাকায় থাকিস, সেখানে পার্টি করছিস!

—মালতী বড় অবজ্ঞা করে ঠাকুর। মালতী আমার লগে আর প্রাণ খুইলা কথা কয় না।

—বুঝি অবিশ্বাস করছে?

—জানি না ঠাকুর। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা জানি না।

ঠিক তখনই জ্যোৎস্নার ভিতর মনে হচ্ছিল এক মানুষ, পাগল মানুষ হেঁটে নদী পার হচ্ছেন। ওপারে গ্রামের ভিতর লণ্ঠন জ্বলছিল, জলে সেই লণ্ঠনের আলো ভাসছে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ নদী পার হচ্ছিলেন বলে জলে সামান্য ঢেউ উঠছে। আলোর রেখাগুলি ছত্রখান হয়ে গেল।

ফেলু দাওয়ায় বসে গজরাচ্ছিল। বাঁ হাতে এখন আর একেবারেই শক্তি পাচ্ছে না। হাতটার দিকে তাকালেই ভয়ঙ্কর এক আক্রোশ বুক বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে—তুমি ঠাকুর, পাগল ঠাকুর, তোমার পাগলামি ভাইঙ্গা দিমু।

হাতটা ওর বাঁ হাত। কব্জিতে জোর নেই। কালো পোড়া বিশীর্ণ রঙ ধরে আছে কব্জির চামড়াতে। দু'পাশের মাংস ফুলে ফেঁপে আছে, যেন কব্জির দু'পাশে মাংস বেড়ে একটা মোটা গিঁট হয়ে যাচ্ছে। কালো তার বাঁধা। কালো তারে মন্ত্র পড়া সাদা এক কড়ি ঝুলছে। কড়ির গলায় ফুটো করে হাতে বাঁধা সুতো নিয়ে ফেলু কেবল গজরাচ্ছিল। কিছু কাক উড়ছিল উঠোনে, কিছু শালিখ পড়ছিল মাচানে আর বিবি গেছে পশ্চিম পাড়াতে এক শিশি তেল ধার করতে। ফেলু আছে মাছ পাহারায়।

উঠোনের ওপর শীতের রোদ কাফিলা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে নিচে এসে নামছে। এই সামান্য রোদেই ফেলু মাচানে মাছ ছড়িয়ে বসে আছে তারপর আরও সামনে খানা-ডোবা এবং জমি, জমিতে কোনও ফসল হয় না। ছোট্ট একখণ্ড জমি ফেলুর। বাড়ির উত্তরে এই জমি, বাঁশ গাছের ছায়া জমিটাকে বড় অনুর্বর করে রেখেছে।

ওর গলায় কালো তার বাঁধা। গলায় চৌকো রুপোর চাকতি। সব সময় পালোয়ানের মতো চেহারা করে রাখার সখ ফেলুর। ফেলুর যৌবন নেই, কিন্তু এখনও শক্ত ঘাড় গলা দেখলে, ঘাড় গলা হাত দেখলে, তাজ্জব বনে যেতে হয়! মানুষটার মুখ ফসলহীন মাঠের মতো। রুক্ষ, দাবদাহে যেন সবসময় পুড়ে যাচ্ছে। একচোখে তাকালে বুকটা কেঁপে ওঠে। চোখের ভিতর মণি আছে, মণির ভিতর সব সময় নৃশংস এক ভাব। সুখী পায়রা আকাশে উড়তে দেখলেই ধরে ফেলার সখ, দুই পাখা ছিঁড়ে দেবার সখ। এবং ঠ্যাং খোঁড়া করে দিতে পারলে গাজীর গীদের বায়ানদারের মতো চান্দের লাখান মুখখান এমন সব বলতে থাকে।

ফেলু বড় হা-ডু-ডু খেলোয়াড় ছিল। তখন তার দুই হাতের ওপর শত্রু পক্ষের কী আক্রোশ! ঐ হাত যেভাবে পারো ভেঙে দাও। থাবা মারলে ফেলু, সকলে বাঘের মতো ভয় পায়।

চত্বরে খেলা হচ্ছে। গোপালদি বাবুদের দল খেলছে—দশ টাকা আগাম আরও দশ ফেলুর ঐ বাঘের মতো থাবা মচকে দিতে পরলে কিন্তু হায়, কে কার থাবা মচকায়! ফেলু ছুটছে। একবার এ-মাথায় আবার ও-মাথায়। সে খুব দ্রুত ছুটতে ভালোবাসে। দাগের উপর পড়েই সে লাফ দেয়, যেন সে লাফ দিয়ে আসমান ছুঁতে চায়। ঐ ওর কায়দা। শক্ত হাত-পা পেশীতে সূর্যের আলো ঝলমল করত। কালো খাটো প্যান্ট, কালো গেঞ্জি আর রুপোর তাগা গলায়, যেমন লম্বা ফেলু, তেমন কুৎসিত মুখ শরীর—মনে হয় তখন ফেলু জয় মা বলে অথবা আল্লা আল্লা বলে—হা মা ঈশ্বরী বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুই পায়ে কাইচি চালাও—ফেলু যে ফেলু সে পর্যন্ত পাহাড়ের মতো মুখ থুবড়ে পড়বে। তখন ফেলুর কোমরে বসে উল্টোভাবে এমন এক মোচড় দিতে হবে যেন বাঘের থাবা বেড়ালের হয়ে যায়। বাবুদের বায়নার মুখে ছাই দিয়ে যে ফেলু সেই ফেলু। খেলার শেষে টেরটি পাওয়া যায় না, ফেলুর কোথাও শরীর জখম হয়েছে।

সেই ফেলু বসে বসে এখন নিজের হাত দেখছে। কাক তাড়াচ্ছিল এবং ভাঙা হাতের দিকে তাকিয়ে বড়ঠাকুরকে গাল পাড়ছিল—পাগলামির আর জায়গা পাও না ঠাকুর, তোমার পীরগিরি ভাইঙ্গা দিমু। তারপর সে হুস করল। একটা কাক ফের এসে ঘরের চালে বসেছে। কাকটা সেই থেকে জ্বালাতন করছে। কাক একটা নয়, অনেক। ধরে ফেলেছে, সে ব্যারামি নাচারি মানুষ। সে ক্রমে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। গিঁটে গিঁটে ব্যাদনা। হাতির শুঁড় ওর সব শক্তি নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু ফেলুর জ্বলন্ত দুই চোখ, বিশেষ করে পোকায় খাওয়া চোখটা এখন বড় বেশি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কাকটা বোধ হয় সেই চোখটা দেখতে পায়নি। সে চোখটা দেখাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কাকটা উড়ে এসে উঠোনে বসল। চোখটা দেখতে পায়নি। সে এবার তেড়ে গেল। তুমি আমারে পাগল ঠাকুর পাইছ! বলেই সে ডান হাতটা উঁচু করতে গিয়ে দেখল, হাতটা পুরোপুরি নিরাময় হয়নি। বাঁ হাতটা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতটা নিরাময় হচ্ছে না। বিবি গেছে এক শিশি তেল ধার করতে আর সে ঘরের মাগের মতো বসে আছে মাছ পাহারায়।

বিবির ওপর রাগটা বাড়ছিল। পাটকাঠি নিয়ে হাতে কত আর কাক-শালিখ তাড়ানো যায়। কাক-শালিখ, মাছের লোভে বাজপাখি পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে। বাজপাখির কথা মনে আসতেই গৌর সরকারের কথা মনে এসে গেল। হাজিসাহেবের পাঁচনের খোঁচা, সময়ে অসময়ে সেই সন্দেহের পোকা কুরে কুরে খেলে, হাজিসাহেব পাঁচনের খোঁচা মারেন মাইজলা বিবিরে, আর প্রতাপ চন্দের নাভিতে তেল মাখানোর অভ্যাস, অভ্যাসটার কথা মনে আসতেই ফেলু ভাবল—ওরা কাক চিল নয়, ওরা বাজপাখি নয়, ওরা লাল নদীর ঈগল। বড় মাছ বাদে ওরা খায় না।

সব জমি জিরাত ওদের। সুদিনে দুর্দিনে কামলা খাটলে পয়সা। ফেলুকে গৌর সরকার বড় ভয় পায়। সে ফেলুকে ভয় পায় গতর দেখে নয়, এমন গতরের কামলা ওর ঘরে কত বাঁধা আছে। ভয়, ফেলু নাকি যৌবনে অথবা সেদিনও রাতে-বিরেতে কোথায় চলে যেত। দরকার পড়লে সে দশটা টাকার বিনিময়ে দশটা মাথা এনে দিতে পারে—সেই ফেলু কি তাজ্জব, একটা কাক তাড়াতে পারছে না! ফেলু রাগে হতাশায় লুঙ্গিটা ডান হাতে ঝাড়তে থাকল বার বার।

রোদে মাছ শুকানো হচ্ছে। ছোট্ট একটা উঠোন নিয়ে ফেলুর ঘর। একটা পেয়ারা গাছ। নতুন বিবি পুরানো হয়ে গেছে। সাত আট সাল হল সে বিবিকে ধরে এনেছে। বয়স আর কত বিবির, দেড় কুড়ি হবে, কি দু-এক বছর বেশি হতে পারে। কাঁচা যৌবনের ঢল বিবির বড় বেশি। পাড়াময় রসিকতা কত—বিবিটা আলতাফ সাহেবের। কি করে, কে কখন আলতাফ সাহেবের কাটা মাথা পাট খেতে আবিষ্কার করেছিল কেউ জানে না। তারপর বছর পার হয়নি, ফেলু আলতাফ সাহেবের খুবসুরত বিবিকে ঘরে এনে তুলেছে। কেউ রা-টি করেনি। ফেলু বড় দাঙ্গাবাজ মানুষ। ভয়ে বিস্ময়ে কেউ ওকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। সেই ফেলু এখন এক কাক, সামান্য কাকের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

মাছ রোদে শুকাচ্ছে। এক ফাঁকে একটা কাক এসে মাছ নিয়ে উড়াল দিল। ক্ষোভে হতাশায় ফেলু কাকটাকে তেড়ে গেল। কোমর থেকে লুঙ্গিটা খুলে গেছে, সে প্রায় উলঙ্গ হয়ে কাকটার পিছনে ছুটতে গিয়ে দেখল, প্রায় সব কাকগুলো ওর মাছের মাচানে বসে মাছ খাচ্ছে। রাগে দুঃখে সে ছেঁড়া তফনটা তুলে আর হাঁটতে পারল না। প্রায় হামাগুড়ি দেবার মতো হেঁটে গিয়ে দেখল, কাক যে সামান্য কাক, সেও বুঝে ফেলেছে ফেলুর আর তাগদ নেই। সে মরা মাছগুলির দিকে নিজের পোকায় খাওয়া চোখটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল। সে নড়তে পারছে না। নড়লে বাকি কয়টা মাছও আর থাকবে না। ওর ডান হাত সম্বল, বিবির ওপর সংসার। মাছের এ-অবস্থা দেখলে বিবি তাকে কুপিয়ে কাটবে। সে মাচানের পাশে বসে মাছগুলিকে ফের ছড়িয়ে রাখল। পুঁটি মাছ, চেলা মাছ। ইতস্তত ছড়িয়ে রাখলে বিবি এসে ধরতে পারবে না, কাকে এসে মাছ নিয়ে গেছে। সামু ফের ঢাকা গেছে, ফিরছে না। সামুর মার কাছ থেকে এক কাঠা ধান এনেছে ধার করে, সেও কী দিয়ে শোধ হবে, কবে, কীভাবে কাজ করতে পারলে শোধ হবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। একমাত্র যুবতী বিবি আন্নু সব দেখেশুনে করছে।

আন্নুর ওপর এ সময় তার কেমন মায়া হতে থাকল। সে লুঙ্গিটা তুলে এবার পরল। আন্নু বেগম, বড় মনোরম নাম। কিন্তু আন্নুটার শরীরে এত বেশি তেজ—প্রায় যেন সরকারদের তেজী ঘোড়া—লম্বা মাঠ পেলেই কেবল দৌড়াতে চায়। বড় মাঠে ফেলু এখন আর ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে পারে না। কোমরে টান ধরে। সমানে ছুটতে গেলে বড় অবশ অবশ লাগে শরীরটা। আন্নু ক্ষেপে গিয়ে বলে, মরদ আমার! ঠেলে ফেলে দেয় পিঠ থেকে, মাটিতে থুবড়ে পড়ে মুখ হাঁ করে ফেলে ফেলু। তখনই একটা সন্দেহের কোড়া পাখি ফেলুকে কুরে কুরে খায়। সে অতি কষ্টে যেন নদীর চর পার হতে হতে ডাকছে আন্নু, আন্নু রে, পাগল ঠাকুর আমারে কানা কইরা দিছে।

ছোট গ্রাম। কয়েক ঘর মুসলমান পরিবার। হাজিসাহেবের বাড়িতে চারটা চার-দুয়ারী নতুন টিনের ঘর আছে। কিছু গাইগরু আছে, বড় দুটো মেলার গরু আছে। তারপর সামুদের কিছু জমি, নয়াপাড়ার মাঠে ওদের কিছু জমি আছে। সম্বৎসর সামুদের ঐ ফসলে চলে যায়। ভাল দু'কানি পাটের জমি থাকলে আর কী লাগে! সামুর মিঞাজানেরা বড় গেরস্থ। সুতরাং অভাবে অনটনে ধান, খৈ, মুড়ি সবই চলে আসে। তারপর আর যারা আছে প্রায় সবাই আল্লার বান্দা। গতরের ওপর নির্ভর। আবেদালির জমি নেই। মনজুর অধিকাংশ জমি ভাগচাষ করে। ঈশম ত শালা! বলে ফেলু একটা খিস্তি করল। পঙ্গু বিবি ঈশমের। সামুদের আতাবেড়া পার হলে হাজিসাহেবের গোলাবাড়ি এবং পরে একটা বেতঝোপ আর আতাফলের একটা বড় গাছ, গাছের নিচে ভাঙা কুঁড়েঘর—কোন আদ্যিকাল থেকে বিবিটা সেখানে পড়ে গোঙাচ্ছে। কি কঠিন ব্যাধি! বিবিটাকে সে কোনওদিন ভালোবাসতে পারেনি! ওর একমাত্র সম্বল এক তরমুজ খেত। সেই খেতে বসে থাকে মানুষটা। এখন শীতের দিন, এইসব দিন পার হলে গ্রীষ্মের দিন আসবে। তখন যেন ঈশম সওদাগরের মতো। ঠাকুরবাড়ির বান্দা ঈশম তরমুজ বিক্রি করবে, আর সব টাকা

তুলে দেবে ছোট ঠাকুরের হাতে। ওর গর্ব সে জমি থেকে ছোট ঠাকুরের হাতে কত টাকা তুলে দিতে পারল।

গ্রামের পর গ্রাম অথবা বিস্তীর্ণ মাঠ। মুসলমান গ্রামগুলিতে হাহাকার যেন বেশি। কোনও কোনও গ্রামে হাজিসাহেবের মতো ধনী আছেন, তাদের সুখ অন্য ধরনের। ওরা, ওদের ছেলেরা উজানে যায়, পাটের ব্যবসা করে কেউ। মসজিদে ইন্দারা বানিয়ে ওরা সিন্নি ছড়ায়। এইসব দেখে অজ্ঞ ফেলুর বড় ইচ্ছা বড় একটা নাও বানায়। সেই নাও নিয়ে পাটের ব্যবসা করার সখ। পাটের দালাল অথবা ফড়ে হতে পারলে বড় সুখের। যা করে হাজিসাহেব হজ করে আসলেন পর্যন্ত।

আর হিন্দু গ্রামগুলির দিকে তাকাও—পুবের বাড়ির নরেন দাস—তার জমি আছে, তাঁতের ব্যবসা আছে। দীনবন্ধুর দুই তাঁত দুই বউ। সুখে আছে লোকটা। আর ঠাকুরবাড়ির মানুষেরা শোনা যায় তল্লাটের বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ। বড় ঠাকুর পাগল মানুষ। মেজ ঠাকুর, সেজ ঠাকুর দু'দশ ক্রোশ হেঁটে গেলে মুড়াপাড়ার জমিদারদের কাছারিবাড়ির নায়েব গোমস্তা। জমিদারদের বড় বিশ্বাসভাজন লোক। ওদের সচ্ছল সংসার। তারপর পালবাড়ি—জমি আছে ওদের, মিলের কাজ আছে। তারপর মাঝিরা—ওদের বড় বড় গরু। ইচ্ছা করলে ওরা প্রায় মেলায় গরু দৌড়ে বাজি জিতে আসতে পারে। ক্বচিৎ দু'একবার নয়াপাড়ার মিঞাজানেরা বাজিতে জিতে গেলে সে যেন মাঝিদেরই বদান্যতা। বার বার কাপ মেডেল নিলে মাইনসে কয় কি! ওরা মেলার গরু মাঠে নিয়ে যায়নি বলে মিঞাজানেরা দৌড়ে বাজি জিতে গেল।

শেষে পড়বে কবিরাজ বাড়ি। নীল রঙের ডাক-বাক্স লাল রঙের ঘোড়া আছে বাড়িতে। প্রতাপ মাঝি ধনী লোক, বিশ্বাসপাড়ার মাঠে, ফাউসার মাঠে এবং সুলতানসাদির মাঠে সব সেরা জমিগুলি ওর। শেষে আর দ্যাখো গৌর সরকার—শালীর সনে পীরিত যার, যে ছন ছাইতে গেলে জলপান করতে দেয় না, যে মানুষ সুদে এবং লালসায় বড় হচ্ছে—অপরের সুখ দুঃখের বোধগম্যি কম—কেবল টাকা টাকা, টাকা পেলে সে নিজের কলিজা পর্যন্ত বিক্রি করতে পারে। ফেলু ভাবতে ভাবতে দাঁত শক্ত করে ফেলল—তোমা-গ মশাইরা জবাই করতে পারলে শান্তি। সে চিৎকার করে উঠল, ঠাকুর, পাগল তুমি। তোমার পাগলামি—সে আর বলতে পারল না, কাকগুলি ওকে অন্যমনস্ক দেখে ফের নেমে এসেছে। সে হুস হুস করতে থাকল। ভারি দুর্দশা তার। বিবিটা এখনও ফিরছে না, কি করছে এতক্ষণ। হাজিসাহেবের ছোট ছেলে কি আন্নুর পেটে হাঁটু রাখতে চায়। সে চিৎকার করে উঠল, হালার কাওয়া আমারে ডরায় না। হালার বিবি আমারে ডরায় না! সে বিবিকে খুন করবে বলে পাগলের মতো হেসে উঠল। সে হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, পোড়া হাত কি ভাল হইব আল্লা! সে বাঁ-হাতটা কোনও রকমে ডান হাতে চোখের সামনে তুলে আনল। দেখল কব্জির চামড়া কুঁচকে গেছে। ফোলা কব্জি, কব্জিতে কানাকড়ি বাঁধা কালো তার ঝুলছে। মনে হয় এই ফেলু ঈশমের বিবির মতো পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সে উঠোন থেকেই পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, আন্নু রে, আন্নু।

তখন আবেদালির বিবি জালালি যাচ্ছে বাড়ির নিচ দিয়ে। বাঁশ ঝাড়ের নিচে শীর্ণ জালালিকে দেখে মনে হল বিলে নেমে যাচ্ছে জালালি। এখন গরিব গরবাদের শালুক তুলবার সময়। আশ্বিন-কার্তিকে সামনের সব মাঠে আর অঘ্রান-পৌষে বিলেন জমিতে কট করে ধানের ছড়া শামুকের মুখে কেটে কোঁচড় ভরা যায়। এখন মাঠে কিছু নেই। ফাঁকা মাঠ। যব গমের ফলন হয়নি। এখন শুধু বিলে নেমে যাওয়া শালুকের জন্য। জালালি শালুক তুলতে বিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। জালালিকে দেখে বলল, ভাবি, আন্নুরে দ্যাখছেন নি?

জালালি গামছাটা বগলে রেখেছে। মাথায় ওর একটা পাতিল ছিল। পাতিলটার জন্য মুখ দেখা যাচ্ছে না। পাতিলটা মাথায় ছিল বলেই হয়তো ফেলুর কথা ওর কানে যায়নি। অথবা গেলেও অস্পষ্ট। সুতরাং জালালি পাতিলটা মাথা থেকে নামিয়ে এনে বলল, কি কও মিঞা। আমারে কিছু কও নাকি!

—আর কি কমু গ! বলে ফেলু যে ফেলু, সে পর্যন্ত গাইগরুর মতো মুখে নির্বোধের হাসি নিয়ে তাকাল।

—কিছু কইতে চাও?

—আন্নু গেছে এক শিশি ত্যাল আনতে। আইতাছে না।

জালালি বলল, আইব নে। বলে জালালি দাঁড়াল না। সে ফের পাতিলটা মাথায় নিয়ে মাঠে নেমে গেল। বড় মাঠ সামনে। বাঁ পাশে সোনালী বালির নদী, নদীর চর। চর পার হয়ে সোজা উত্তরমুখো হাঁটলে সেই বিল। ফাওসার বিল। বিলে একবার ঈশমকে কানাওলায় ধরেছিল—এত বড় বিল এ-পরগণাতে কেন, এ-জেলাতে বুঝি আর নেই। একবার বিলের জলে কুমীর ভেসে এসেছিল, বড় এক অজগর সাপ ভেসে উঠেছিল। তারপর এই বিলের নানা রকমের কাছিমের গল্প, গজার মাছের গল্প, এবং রাতে সপ্তডিঙা মধুকরের গল্প কিংবদন্তীর মতো এ-অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সেই বিলে জালালি যাচ্ছে শালুক তুলতে। শুধু জালালি নয়, অনেক, এমন প্রায় হাজার হবে। ওরা শালুক তুলে আনবে। ওরা ভোরে শালুক তুলতে বের হয়ে যাচ্ছে। ফেলু উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।

আবেদালি এ সময়ে দেশে চলে আসবে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্তে সে গয়না নৌকার মাঝি, শীত, গ্রীষ্ম আর বসন্তে সে হিন্দু পাড়ায় কামলা খাটবে। এই তো গ্রাম—গ্রামে মাত্র সামু মাতব্বর মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারছে। যত সামু মাতব্বর মানুষ হয়ে যাচ্ছে, যত হিন্দু যুবকেরা সম্মান দিয়ে কথা বলছে, তত ফেলু সামুর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সে যেন সামুর বান্দা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

যেন এক মানুষ মিলে গেছে সমাজে, মাত্র এক মানুষ, সে এইসব ভদ্র হিন্দু পরিবারের মানুষদের চেয়ে কোনও অংশে কম যায় না। সামু ঢাকা থেকে এলেই ফেলুর

ঘুরঘুর করা বেড়ে যায়। সে ওর ভাঙা হাত সম্পর্কে নালিশ দেবার সময় ক্ষোভে-দুঃখে ভেঙে পড়ে। ভিতরে ভিতরে এইসব হিন্দু সুখী পরিবারের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ ভয়ঙ্করভাবে পীড়ন করলে সামু যেন মোল্লা-মৌলবীর মতো কিছুটা আসানের কথা শোনাতে পারে। সামুর লীগ পার্টি—জিন্দাবাদ—আমাদের জন্য একটা দেশ চাই। এই দেশে আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটা জায়গা চাই। তারপরে যে কথা শুনলে ফেলুর ঘুম চলে আসে—একদিন এ-দেশটা দুঃখী মানুষের হয়ে যাবে। ফেলু দুঃখী মানুষ ভাবতে সে প্রায় তার গোটা স্বজাতিকে ভেবে ফেলেছিল। তার জন্য কতরকমের জেহাদ—ধর্মযুদ্ধ চাই। তার জন্য কত রকমের বিপ্লব চাই, সামু বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ত। আমাদের জন্য দেশ, এই দেশ মাটি ফসল সব আমাদের জন্য হবে। আমাদের সুখের জন্য হবে। অধিকাংশ মানুষ যখন আমরাই এই দেশে বসবাস করছি, তখন এই দেশ আমাদের।

সামু যখন বইয়ের ভাষায় টেনে টেনে কথা বলতে থাকে, তখন মনে হয়, ফেলুর সব ফেলে ঐ এক মানুষের পিছনে থেকে জাতির সেবা করলে কাজটা মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম ধর্মীয় হবে না। কিন্তু হাত ভেঙে কী হয়ে গেল সে! কাকগুলি মাছের লোভে মাথার ওপর উড়ছে। সে হুস্ করল। বলল, হালার কাওয়া, আমার নাম ফেলু শেখ। সে মাথার উপরে ডান হাতে পাটকাঠিটা ঘোরাতে থাকল।

আর তখনই বাছুরটা হাম্বা করে ডাকল। হাড় বের করা বাছুরটার মুখ দিয়ে ঠাণ্ডায় লাল পড়ছে। বাছুরটার ঠাণ্ডা লেগেছে, শীতে বাছুরটা ফুলে ঢাক হয়ে আছে। রোদে নিয়ে গেলে ফুলে থাকা ভাবটা গরমে কমে যাবে। তা'ছাড়া হাতে একটা কাজ পাওয়া গেল। এত বেলায়ও যখন আন্নু ফিরে এল না, বাছুরটা ক্ষুধায় হাম্বা করছে—ওকে নিয়ে তবে মাঠে নেবে যেতে হয়। খোঁটাতে বেঁধে দিলে কিছু ঘাসপাতা খেতে পাবে। ঘাসপাতা খেলে শক্ত হবে বাছুরটা।

আন্নু আসছে না! কী করা যায়? সে তাড়াতাড়ি ডান হাতে মাছগুলি তুলে ফেলল। ঘরের ভিতর মাছ রেখে ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। সে বাছুর নিয়ে গোপাটে নেমে গেল। খোঁটা পুঁতে দিলে দেখল কাতারে কাতারে লোক বিলে শালুক তুলতে যাচ্ছে। সব মুসলমান বিবি, বেওয়া। ওরা এ-অঞ্চলের সব মুসলমান গ্রাম থেকে নেমে যাচ্ছে। আর এই তো সামনে বিশাল বিলেন মাঠ। হাইজাদির সরকাররা পুকুর পাড়ে বাস্তুপূজা করছে। ভেড়া বলি হচ্ছে। ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে।

বাস্তুপূজার জন্য ঠাকুরবাড়ির ছোট ঠাকুর বের হয়ে পড়েছেন। তিনি হিন্দু গ্রামে উঠে সব হিন্দু গেরস্থবাড়িতে বাস্তুপূজার তিল-তুলসী দেবেন। বাস্তুপূজায় ঢাক বাজছে। পূজা-পার্বণে ঘুরে বেড়াবেন, মন্ত্র পড়বেন। ঈশম আজ যাবে না। সে কাল যাবে। চাল কলা এবং তৈজসপত্র সব বেঁধে আনবে।

সরকারদের বাস্তুপূজায় কত মেয়ে-বউ এসেছে নতুন শাড়ি পরে—কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে সোনার গহনা, পরনে গরদের শাড়ি আর ওদের কেমন মিষ্টি চেহারা—কী সুন্দর মুখ! একেবারে য্যান হেমন্তে সোনালী বালির নদীর চর। পূজা হচ্ছে, পার্বণ হচ্ছে। কুটুমের মতো ঠাকুরবাড়ির বড়বৌ, ধনবৌ পুকুর পাড়ে নেমে এল। জমির বুকে ছোট কলাগাছ, নিচে ছোট ঘট। ঘটের ওপর নারকেল আর চারধারে সব নৈবেদ্য—যেন ভোজ্যদ্রব্যের অভাব নেই। তিলা কদমা শীতের যত খাদ্যদ্রব্য সব ওদের আয়ত্তে।

আর কী জ্বালা, জ্বালা নিবারণ হয় না জলে, জালালি জলের দিকে নেমে যাবার জন্য মাঠের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর কী জ্বালা, বাছুরটা কিছুতেই ঘাসে মুখ দিচ্ছে না। শীতের ঘাস—শিশিরে ভিজে আছে ঘাস। যতক্ষণ রোদ ভালোভাবে না উঠবে, যতক্ষণ হিম ঘাস থেকে ভালোভাবে না মরে যাবে ততক্ষণ বাছুরটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ঘাসে মুখ দেবে না। সে রাগে দুঃখে বাছুরটা ঘাস খাচ্ছে না বলে পেটে লাথি বসিয়ে দিল। বাছুরটা দু'হাঁটু মুড়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কারণ ওর মনে হচ্ছিল বাছুরটা তাড়াতাড়ি ঘাস ক'টা না খেয়ে ফেললে, এক ফাঁকে হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়টা অথবা গৌর সরকারের দামড়া গরুটা এসে চেটেপুটে এই তাজা ঘাস খেয়ে ফেলবে। এই ঘাস সে যেন মাঠে নেমে আবিষ্কার করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বাছুরটা ঘাস খেয়ে ফেললে আর কেউ এসে ভাগ বসাতে পারবে না। কিন্তু বলিহারি যাই হালার মাগী আন্নু ভাগে এক বাছুর এনেছে! এমন এক মরা বাছুর যার কপালে সুখ নাই, গায়ে বল নাই, আছে কেবল মল-মূত্র ছড়ানো ছিটানো অথবা ধ্যাবড়ানো। আন্নুর কথা মনে হতেই সে সব ফেলে গাঁয়ের দিকে উঠে যাবে ভাবল। এক শিশি তেল ধার করতে এত দেরি!

দূরে ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। ওর কানে বড় বেঢপ লাগছে শব্দটা। জালালিকে দেখা যাচ্ছে। অনাহারে জালালি কাতর! এখন ফাওসার বিলে নেমে যাবার জন্য প্রতাপ চন্দের ঘাট পার হচ্ছে। সে, সামনে যেসব জমি আছে, শ্যাওড়া গাছের বন আছে তা অতিক্রম করে বেনেদের পুকুরপাড় ধরে হাঁটছে। সেই এক বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের সব জমি প্রতাপ চন্দের। সেই সব জমি পার হলে ফাওসার খাল। খালের পাড়ে পাড়ে যত জমি পড়বে—পাটের, আখের, এমনকি করলার জমি, সব গৌর সরকারের। তারপর যত জমি, সব হাজিসাহেবের। হাজিসাহেবের তিন বিবি, ছোট বিবির বয়স আর কত—এই এক কুড়ি চার-পাঁচ হবে। হাজিসাহেব ঈদের দিনে তিন বিবি মসজিদে নিয়ে যাবার সময় চারদিকে নজর রাখেন। সতর্ক নজর। কেউ নজর দিয়ে গিলে ফেলল কিনা দেখেন। অন্তরালে কিছু দেখা যায় কিনা, হেই হেডা কি হইছে। নজরে লালসা ক্যান, বলে হয়তো একটা পাঁচনের খোঁচা মারেন মাইজলা বিবিরে। খোঁচা দিয়ে কন, বিবিরে, অঃ সোনার বিবি, পথ দেইখা হাঁট। তখন কেবল কেন জানি মনে হয় ফেলুর, পাঁচনটা কেড়ে নিয়ে এক বাড়ি হালার হালা, হাজির মাথায়। ভাবতে ভাবতে এসব, ফেলুর মাথায় খুন চড়ে যায়, ফেলু স্থির থাকতে পারে না—কেবল কি সব মনে হয়। ফেলু, যে ফেলু কোন মাতব্বর নয়, জলে জঙ্গলে যে ফেলু মানুষ হয়েছে, যে ফেলুকে উজান থেকে হাজিসাহেব ধরে এনেছিল—

উজানি নৌকাতে ধান কাটা সারা হলে, ফেলু হাজিসাহেবের পেটে পিঠে পায়ে রসুন গোটার তেল গরম করে মেখে দিত, সেই ফেলুর কেন জানি বড় সাধ মাঝে মাঝে হাজিসাহেবের মাইজলা বিবিরে একবার বোরখার অন্তরালে উঁকি দিয়া দ্যাখে।

সে গোপাটে দাঁড়িয়ে ছিল। বড় সেই অশ্বত্থ গাছটির নিচে বিচিত্র সব মটকিলা গাছের ঝোপ, পাতাবাহারের জঙ্গল। শীতকাল বলে জঙ্গলের ভিতরটা শুকনো খটখটে। ভিতরে ঢুকে গোসাপের মতো ঝোপের আড়ালে সন্তর্পণে পড়ে থাকলে হয়তো মাইজলা বিবিরে দেখা যাবে—কারণ, ও-পাশটায় হাজিসাহেবের অন্দরের পুকুর। ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি দেবার আগে চারপাশটা সে দেখে নিল। বাঁদিকে আবেদালির ঘর, কেউ এখন ঘরে নেই। আমগাছটার নিচে ভাঙা ঘর এখন খালি। উত্তর-দুয়ারী ঘরে সেই কবে জোটন বাস করত, এখন জোটন নেই বলে বর্ষায় বৃষ্টিতে ঝড়ে ঘরটা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কিছু ঝোপজঙ্গল, বেত গাছ আবেদালির বাড়িটাকে সব সময় অন্ধকার করে রাখে। কোনও রকমেই শীতের সূর্য আবেদালির উঠোনে নামতে চায় না।

আর এইসব ঘর উঠোন এবং ঝোপ-জঙ্গল পার হলেই—হাজিসাহেবের আতাবেড়ার ওপাশে তিন বিবির গলা, কাচের চুড়ির মতো জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলেছে। কি হাসে! হাসতে হাসতে মনে হয় হালার দুনিয়া গিলা ফ্যালবে। সিঁথিতে বড় লম্বা টান ধানখেতের সাদা আলের মতো। আর ডুরে শাড়ি হাঁটুর নিচে বেশিদূর নামতে চায় না। ঝোপের ভিতর থেকে ফেলু মরিয়া হয়ে এবার উঁকি দিল। হাত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, ডান হাতটা কোনওরকমে কাজে লাগছে এখনও, কবে এই হাতটা পঙ্গু হয়ে যাবে—সে প্রায় একটা মরা সাপের মতো ঝোপের ভিতর পড়ে থাকল। ঝোপের পাশ দিয়ে ঘাটের পথ। হাজিসাহেবের অন্দরের পুকুরের পানি কি কালো। পানি দেখলেই বিবি-বৌদের পেটে জ্বালা ধরে। তলপেটটা শিরশির করতে থাকে। কালো পানির টানে চুপি চুপি সময়ে-অসময়ে মাইজলা বিবি ঘাটে নেমে আসে। এলেই খপ করে হাত ধরে ফেলবে, ধরে ঝোপের ভিতর টেনে—ফেলু আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে কচ্ছপের মতো এবার গলাটা তুলে ধরল। সে মরা সাপের মতো বেশি সময় শিকারের আশায় ঝোপের ভিতর পড়ে থাকতে পারছে না।

যখন মন খুশিতে উজান বয় না তখন ডাকে আন্নু। আর যখন মন উজানি নদীর মতো মাতাল তখন ডাকে, আন্নু বেগম। পেট পুরে খেতে পারলে ডাকে বেগমসাহেবা। ফেলু বেগমসাহেবার জন্য পাগল, আর পাগল এই মাইজলা বিবির সুরমাটানা চোখের জন্য। ঘাট থেকে তাড়িয়ে দেবার পর এই অশ্বত্থের ঝোপ ওর মতো নিরালম্ব মানুষের সামান্য আশ্রয়। সে ঝোপের ভিতর একটা মরা গো-সাপের মতো সেই থেকে পড়ে আছে—মাইজলা বিবি এ-পথে এখনও ঘাটে এসে নামছে না।

এখন শীতের দিন। জমি থেকে সব ফসল উঠে গেল বলে মাঠ ফাঁকা। কেবল নরেন দাস অথবা মাঝি-বাড়ির শ্রীশচন্দ্র, প্রতাপ চন্দ কামলা দিয়ে নিচু জমিতে তামাকের চাষ করছে। আর সব উর্বরা জমি থাকলে সেখানে পেঁয়াজ, রসুন এবং চীনাবাদামের গাছ দেখা যাচ্ছে। এই পথে কেউ বড় এখন আসবে না। এলেও ঝোপের ভিতর যে একটা মানুষ শিকারী বেড়ালের মতো ওৎ পেতে আছে টের পাবে না। জালালির শরীরটা এখন মাঠের শেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুবের বাড়ির মালতী গরু নিয়ে এসেছে গোপাটে। সে গোপাটে গরুর খোঁটা পুঁতে চলে যাচ্ছে।

সরকারদের ঘাট পাড়ে তেমনি ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। মাঠে মাঠে বাস্তুপূজার নিশান উড়ছে। ঠাকুরবাড়ি, পালবাড়ি এবং বিশ্বাসপাড়া যেদিকে তাকানো যাচ্ছিল সব দিকে সেই ঢোলের বাজনা আর মেষ অথবা মোষের আর্তনাদ। মোষ বলির সময় হলে সরকারদের পঞ্চাশজন ঢাকি একসঙ্গে ছররা ছোটাবে। সে একবার একটু কাৎ হয়ে গলাটা কচ্ছপের মতো যেন বাড়িয়ে দিল। মনে হল মাইজলা বিবির মুখ শরীর ঝোপের অন্য পাশে—ঠিক ঘাটের মধ্যে নেমে আসছে। ভেসে উঠেও উঠল না। মরীচিকার মতো ঝিলিমিলি করছে শুধু। আহা, ভেতরটা কেমন করছিল ফেলুর।

তখন হাইজাদির সরকারেরা করজোড়ে নতুন গামছা গলায় দাঁড়িয়ে আছে। মোষের ধড় এবং মুণ্ড নিতে যারা শীতলক্ষ্যার পার থেকে এসেছিল, তারা ঘাটের অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে। মাঠে মাঠে উৎসব আর ঝোপের ভিতর ফেলু। সে মাইজলা বিবির মরীচিকা দেখার জন্য ঝোপের ভিতর কচ্ছপের মতো গলা তুলে রাখল।

মালতী গোপাটে গরুর খোঁটা পুঁতে তাড়াতাড়ি শোভা আবুকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ির ঘাটে স্নান করতে চলে গেল। বাস্তুপূজা বলে সকাল সকাল আভারানী স্নান করেছে। মাঠে অমূল্য কলাগাছ পুঁতে এসেছে। এবং দূর্বাঘাস চেঁচে চারদিকটা পরিচ্ছন্ন করে শুকনো আমের ডাল বেলপাতা সব পেড়ে এনে বারকোষে রেখে দিয়েছে। গোটা তিনেক জমি পার হলে ঠাকুরবাড়ির ভিটা জমি। সেখানে বড়বৌ ধনবৌ সকাল সকাল স্নান করে চলে এসেছে। সোনা, ঠাকুরঘর থেকে কাঁসি নিয়ে ছুটছে। সোনা কাঁসিটা জোরে জোরে বাজাচ্ছিল। পুকুরের জলে কচুরীপানা কলমিলতা এবং শীতের সময় বলে গাছে কোনও ফল নেই, ফুল বলতে কিছু শীতের ফুল ঝুমকোলতা, শ্বেতজবা, রাঙাজবা। বাস্তুপূজোয় রাঙাজবা দিতে

নেই। শ্বেতজবা কে ভোর না হতেই গাছ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। বড়বৌ সাজিতে সামান্য ফুল সংগ্রহ করতে পেরেছেন। খুঁজেপেতে কিছু শ্বেতজবা, কিছু পলাশ ফুল আর টগর। গাঁদা ফুল কিছু আছে। শীতের জন্য শ্বেতজবা তেমন ফোটে না ভালো, ফুলগুলি কুঁকড়ে আছে—অসময়ের ফুল বড় হতে চায় না।

তখন জালালি সমস্ত গরিবদুঃখী মানুষের সঙ্গে সেই বড় বিলে, প্রকাণ্ড বিলে—এ-পাড়ে দাঁড়ালে যার ও-পাড় দেখা যায় না, যে বিলে ভিন্ন ভিন্ন সব কিংবদন্তী রয়েছে, বিলের চারপাশে নলখাগড়ার বন, মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙা, আবার দু'দশ একর নিয়ে গভীর জল, কালোজল বড় গভীর—যেখানে মানুষ যেতে, নৌকা বাইতে ভয়, তেমন বিলে নেমে যাচ্ছে জালালি। জলের ভিতর কি এক দৈত্য থাকে বুঝি, কিংবদন্তীর দৈত্য। ওর পেট পিঠ জ্যোৎস্না রাতে ময়ূরপঙ্খী নৌকার মতো। নৌকা যেন এক জলে ভাসে, জলে ভেসে নৌকা যায়, ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায় তারপর মানুষের সাড়া পেলে টুপ করে জলের নিচে ডুবে যায় —হায়, মানুষের অগম্য বুদ্ধি। অজ্ঞ মানুষের বিশ্বাস, অলৌকিক ঘটনার মতো ঘটনা নেই। দুপুর রাতে চরাচরে যখন মানুষ জেগে থাকে না, যখন সারা বিলটা পাঁচ-দশ ক্রোশ জুড়ে জলের ভিতর ডুবে থাকে, যখন জ্যোৎস্নায় ফসলের মাঠ ভরে থাকে তখন জলে এক ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসে—ভিতরে রাজকন্যা এক, চাঁদবেনের পুত্রবধূ হবে হয়তো, বেহুলা লখীন্দরের পাঁচালি মানুষের প্রাণে বিহ্বলতা জাগায়।

নৌকা বিলের জলে ভেসে উঠলে আলোতে আলোময়। যেন মাঝ বিলে আগুন ধরে গেছে! তেমন বিলে নেমে যাবার আগে জালালি জলটা প্রথম মাথায় দিল, পরে মুখে জল দিল, তারপর গোসাপের মতো জলে ভেসে গেল। শীত কন্‌কন্‌ করছে—কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা নিবারণ হয় না জলে। কবে আবেদালি গেছে, মাস পার হয়ে যাবে প্রায়, ঘুরে এল না এখনও। এলেও দু'চার হপ্তা পেট পুরে খাওয়া। তারপর ফের উপোস। জালালি জলে ভাসতে থাকল।

ফুৎ করে জল মুখে নিয়ে হাওয়ার ভিতর জল ছুঁড়ে দিতে থাকল।

সব মানুষ সাঁতার কেটে যেখানে শাপলা-শালুকের পাতা ভেসে আছে সেদিকটায় চলে যেতে থাকল ক্রমশ। বড় শালুকের জন্য সকলের লোভ বেশি। এ-জলে কি আছে কি নেই, কেউ বড় জানে না। বরং কী নেই, কী থাকতে না পারে এই বিস্ময়। সেই এক সালে হাজার হাজার মানুষ পুরীপূজার মেলা থেকে ফিরে আসার সময় দেখেছিল—বিলের ঠিক মাঝখানে কালো রঙের এক মঠ ভেসে উঠেছে। ভেসে উঠতে উঠতে কিছু ওপরে উঠে থেমে গেল। তারপর ফের নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় স্বপ্নের মতো ব্যাপারটা। যারা দেখেছে, তারা মন্ত্রের মতো বিশ্বাস করেছে, যারা দেখেনি তারা আজগুবি গল্প মনে করেছে। আর যাদের অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস আছে তারা, খবরটাকে নিয়ে নতুন কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছে। মনে হয় বুঝি ঈশা খাঁ সোনাই বিবিকে নিয়ে এ-বিলে লুকিয়ে রয়েছে। সেই জাহাজের মতো হালের দাঁড় কালো রঙের মঠের মতো জলের ওপর

ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। শুধু একটু দেখিয়েই যেন ডুব দেয়। যেন বলে, দ্যাখো, দ্যাখো আমি এখনও বুড়ো বয়সে সোনাইরে নিয়ে বড় সুখে আছি বিলের ভিতর। তোমরা আমার অনিষ্ট করলে, আমিও তোমাদের অনিষ্ট করব। সেই ভয়ে ভরা ভাদরে সোজা বিলের মাঝ বরাবর কেউ নৌকা ছাড়ে না। এ-বিল বড় ভয়ঙ্কর। বিলের তল নেই, জলের নিচে মাটি নেই। শুধু যেন অন্ধকার আর প্রাচীন সব লতাগুল্ম নিয়ে চুপচাপ জলের ভিতর ডুবে আছে। ভয়ে এ-বিলে কেউ নৌকায় বাদাম দেয় না। বড় নিভৃতে যেতে হয়, যেন ঈশা খাঁর কালঘুম ভেঙে না যায়।

অঞ্চলের মানুষেরা এ-বিলকে দানবের মতো ভয় পায়। ঈশম যে ঈশম, সে পর্যন্ত এ বিলের পাড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কি এক জীনপরী পিছু লেগে ওকে রাতের বেলায় অজ্ঞান করে দিয়েছিল। সেই বিলে গরিবদুঃখী মানুষেরা পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য জলে নেমে গেল।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা মরে না জলে। জলের ভিতর ভেসে ছিল জালালি, যেন নেমে গেলেই পেটের জ্বালা নিবারণ হবে। কিন্তু হায়, জলের ভিতর কাদার ভিতর কোথাও শালুকের নাম গন্ধ নেই। রোজ রোজ তুলে নিয়ে গেলে কি আর থাকে! কিছু মরা শাপলা পাতা সামনের জলে উল্টে আছে। শীতের দিনে শাপলা ফুল আর ফোটে না। শাপলা ফুলে কালো কালো ফল হয়েছে। সে দুটো ফল সাঁতরাতে সাঁতরাতে সংগ্রহ করে ফেলল। এবং জলের ভিতরই জালালি ভাসতে ভাসতে খেতে থাকল। ভিতরে এক ধরনের কালো কালো বীচি, এক ধরনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, স্বাদ বলতে মরি মরি কিছু না, খেতে হয় বলে খাওয়া। পেটের ভেতর জ্বালা থাকলে কী খেতে না সখ যায়। লাল আলুর মতো সেদ্ধ করে খেতে হয় শালুকের ভেতরটা। একটু নুন দিয়ে, কোনও কোনও সময় তেঁতুলের অল্প গোলা ফেলে দিলে প্রায় অমৃতের মতো স্বাদ। লোভে সাঁতার দিতে থাকল জালালি। সামনে দুটো শালুক পাতা জলের ভিতর ডুবে আছে। লতা দুটো ধরার জন্য সে জলের ভিতর ডুব দিল। জলের নিচে নেমে গেল। অনেক নিচে, লতা ধরে ধরে আলগোছে তা ধরে ধরে—জোরে টান দিলে লতাটা ছিঁড়ে যাবে, লতা ছিঁড়ে গেলে সব গেল, জাদুর ঘরে নেমে যাবার সিঁড়িটা তুলে নেবার মতো হবে। সুতরাং খুব সন্তর্পণে জলে ডুবে যাবার জন্য, অন্ধকার মাটিতে হাতড়ে বেড়ানোর জন্য, ডুবুরির মতো বুড়বুড়ি তুলে প্রায় হারিয়ে গেল। জলের নিচে বড় ভয়। ভয়ে চোখ খুলছে না জালালি। চোখ খুললেই মনে হয় কোন জাদুকরের দেশে সে পৌঁছে গেছে। জলের নিচে জলজ ঘাসেরা তাকে নেচে নেচে ভয় দেখায়। নীল অথবা সবুজ মনে হতে হতে একটা কালো কুৎসিত অন্ধকার চারপাশ ঢেকে ফেলে। সে এক শ্বাসে জলের নিচে ডুবে নিমেষে জল কেটে আবার ওপরে ভেসে উঠল। তারপর কত দীর্ঘকাল পর যেন আকাশ মাটি এবং সূর্য দেখতে পেয়েছে এমন নিশ্চিন্তে শ্বাস নেবার সময় মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সোনার চেয়েও দামী একটা বড় শালুক ওর হাতে।

পাতিলটা ঢেউ খেয়ে একটু দূরে সরে গেছে। সে পাতিলটাকে টেনে এনে শালুকের শেকড়গুলি প্রথম কামড়ে ছিঁড়ে দেখল শালুকটা যত বড় ভেবেছিল—ঠিক তত বড় নয়। শালুকটা বোধ হয় রক্ত শাপলার। পেতি শাপলার শালুক বেশ মিষ্টি। সাদা শাপলার শালুকে কষ বেশি। রক্ত শাপলার শালুকে অল্প তিতাভাব থাকে। তবু শালুকটাকে পরিচ্ছন্ন করে খুব যত্নের সঙ্গে পাতিলের ভিতর রেখে পাড়ের দিকে তাকাল। কেউ আর পাড়ে দাঁড়িয়ে নেই। যে যার মতো শালুকের খোঁজে জলে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে। আবেদালি আসে না, কতকাল আসে না, সেই কবে গয়না নৌকার মাঝি হয়ে চলে গেল—আর আসে না। জব্বর আসে না। সে বাবুর হাটে তাঁতের কাজ নিয়ে চলে গেছে। জোটন এসেছিল একটা মুরগি নিয়ে আবেদালিকে খাওয়াবে বলে, মুরগিটা উড়াল দিয়ে সেই যে হাজিসাহেবের বাড়িতে চলে গেল, আর এল না। হাজিসাহেবের ছোট বিবি কোতল করে ফেলল মুরগির গলাটা।

বিলের জলে দুঃখী মানুষেরা শালুকের খোঁজে ভেসে বেড়াচ্ছিল। চারপাশের গ্রাম থেকে দুঃখী মানুষেরা হেঁটে এসে নেমে গেল জলে। বেলাবেলিতে সকলে জল ছেড়ে উঠে যাবে। এই শীতের শেষে আর যখন শালুক থাকবে না, যখন জলের ওপর আর কোনও শালুক পাতা ভাসবে না অথবা এই বিলের জল শান্ত নিরিবিলি, তখন ঝোপেজঙ্গলে অথবা জলের ও পর বালিহাঁস ভাসবে। নানা রকমের পাখি, লাল-নীল পালকের পাখি, জলপিপি এবং ভিন্ন ভিন্ন সব বক ছোট বড় চকাচকিতে প্রায় বিলটা ছেয়ে যাবে। তখন মুড়াপাড়ার জমিদারবাবুর ছেলেরা হাতিতে চড়ে আসবেন, তাঁবু ফেলবেন বিলের ধারে এবং ভোরে অথবা জ্যোৎস্নায় পাখি শিকার করে তাঁবুতে পাখির মাংস, ওরা শীতের শেষে মাসাধিক কাল পাখির মাংসে বন মহোৎসব চালাবে।

গ্রীষ্মকালটাই জালালির বড় দুঃসময়। প্রায় মাটিতে পেট দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। বর্ষা এলে ধানের জমিতে, পাটের জমিতে আবেদালির কাজের অন্ত থাকে না। বর্ষা শেষ হলে জল কমতে থাকলে, শাপলা ফুল ফুটতে থাকলে মাটির নিচে অন্নের মতো প্রিয় এই শালুক, দুঃখী মানুষদের, নিরন্ন মানুষদের একমাত্র সম্বল এই শালুক, বর্ষা এলেই মাটির ভিতর জন্ম নিতে থাকে। এই জলা জমি আর মাটির অন্তরে শালুক আপনার প্রিয় ধন যেন ফেলতে নেই, অবজ্ঞা করতে নেই। বসে থাকলে পাপ, ভেসে বেড়ালে পুণ্য। জালালি পাতিলটার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে বেড়াতে থাকল। ডুব দিলে তখন অন্য কেউ হাত বাড়িয়ে পাতিল থেকে শালুক তুলে নিতে পারে।

সামনে শুধু জল, প্রায় অনন্ত জলরাশি। শালুকের লোভে সে খুব দূরে চলে এসেছে। বোধ হয় এর পর আর শালুক নেই। ডান দিকে পদ্মফুলের বন। বাঁ দিকে স্ফটিক জল। সামনের জলে কি যেন সব ভেসে বেড়াচ্ছে। কি হবে আর—বড় গজার মাছ হবে হয়তো। বড়-বড় মাছ, থামের মতো লম্বা গজার মাছ। কালো কুচকুচে, মাথায় মুখে লাল সিঁদুর গোলা রঙ, গায়ে অজগর সাপের মতো চক্র। ওর ভয় লাগছিল। তবু মনে হয়, ভয়ে হোক বিস্ময়ে হোক কেউ এতদূর আসেনি। কেউ আসেনি বলেই বোধ হয় কিছু ইতস্তত শালুক

এখনও পড়ে আছে। সে ভয় থেকে রেহাই পাবার জন্য চোখ বুজে জলের নিচে ডুব দিল। কিন্তু জলের নিচে চোখ খুলতেই মনে হল—বড় একটা গজার মাছ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লেজ নাড়ছে। স্থির। গজার মাছটা জালালিকে দেখছে। জলের নিচে আজব একটা জীব, বোধ হয় মনুষ্যকুলের কেউ হবে—প্রায় ব্যাঙের মতো নিচে নেমে আসছে। প্রাচীন সব জলজ ঘাস এবং লতার ভিতর মাছটা মুখ বার করে রেখেছে। জালালি চোখ খুললেই শুধু মাছটার মুখ দেখতে পাচ্ছে। কালো ভয়ঙ্কর মুখ একবার হাঁ করছে, আবার জল গিলে মুখ বন্ধ করছে। জালালিকে মাছটা এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। বরং জালালিকেই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

হায়, পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা, জ্বালা সহে না প্রাণে। ভয়ে বিস্ময়ে জালালি জলের নিচে এতটুকু হয়ে আছে। তবু লোভ সামলাতে পারল না জালালি। আর একটু নিচে গেলেই মাটিতে হাত লেগে যাবে এবং শালুকটা আয়ত্তে চলে আসবে। দমে আসছিল না। সে তাড়াতাড়ি শ্বাস নেবার জন্য জল কেটে ভেসে উঠল। দম নিল, একটু সময় ভেসে থেকে বিশ্রাম নিল।

ফের ডুবে জলের নিচে চলে যেতে থাকলে দেখতে পেল, সবুজ এক দেশ, নীল জলের গালিচা পাতা। অন্ধকার, ক্রমে অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসছে। তারপরই লতার গোড়ায় ঠিক মাটিতে যেখানে শাপলা পাতার লতা এসে থেমে গেছে সেখানে হাতটা ঠেকে গেল। অন্ধকারেও টের পাচ্ছিল জালালি, মাছটা মুখ হাঁ করে এগিয়ে আসছে। অতিকায় মাছ। তবু একটা মাছ, সে যত অতিকায় হোক, বড় হোক, সে মাছ। একটা মাছ, সামান্য মাছ, তুমি মাছ যত বড়ই হও—আমি মনুষ্যকুলে জন্মে তোমাকে ভয় পাব! বোধ হয় সে এমন কিছু ভাবতে ভাবতে শালুকের গোড়া চেপে ধরল। তারপর সে দেখল মাছটা সবুজ রঙের ঘাসের ভিতর মুখটা নাড়ছে। খুব সন্তর্পণে নাড়ছে আর জালালিকে দেখছে। শালুকটা হাতে পেয়ে জালালির সাহস বেড়ে গেল। সে ভ্রুক্ষেপ করল না। সে আর একটু এগিয়ে গেল। মাছটা এবার পিছু হটে যাচ্ছে। সে এবার আর দেরি করল না। যখন মাছটা ভয় পেয়ে যাচ্ছে তখন আর ডুবে থেকে কি হবে। সে ভোঁস করে জল কেটে শুশুকের মতো পিঠ ভাসিয়ে দিল।

সেই কবে একবার জালালি জলের নিচে হাঁস চুরি করে গলা টিপে ধরেছিল, কবে একবার মালতীর পুরুষ হাঁসটাকে ঝড়ের রাতে পুড়িয়ে নরম মাংস এবং ঠ্যাঙ চিবিয়ে আল্লার দুনিয়া বড় সুখের ভেবে বড় একটা ঢেকুর তুলেছিল—এখন শুধু তার কথা মনে আসছে। সেই মৃত হাঁসটার মতো মাছ, মাছটার চোখ সারাক্ষণ জলের নিচে স্থির হয়ে ছিল। যেন এক বড় অজগর সাপ ওকে গিলতে আসছে এমন মনে হল। কিন্তু সাপ হলে সব জায়গাটা এতক্ষণে প্লাবনের মতো তোলপাড় হতে আরম্ভ করত। এত স্থির থাকত না। সে এটাকে মনের ভয় ভাবল। জলের নিচে চোখ খুললেই মনে হয় সব বিচিত্র গাছগাছালি যেন প্রাণ পেয়ে তার দিকে ধেয়ে আসছে। সে সহজে সেজন্য চোখ খুলতে চায় না।

সবুজ রঙের কদম ফুলের মতো ঘাসের অন্ধকারে জালালি বুঝতে পারেনি কী তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বেশ সুখে একটার পর একটা ডুব দিয়ে গভীর জলের ভিতর চলে যেতে থাকল। ঠিক ডুবুরীর মতো জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে, জলের ওপর ভেসে উঠছে। তেমন অসংখ্য মানুষ এখন পাড়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে, জলের ভিতর তারা ডুবে যাচ্ছে, জলের ওপর ভেসে উঠছে। কখনও শালুক পাচ্ছে, কখনও পাচ্ছে না। আর ঠিক কখন পাবে কেউ বলতে পারছে না। সব শাপলালতার গোড়ায় শালুক থাকে না। ফলে শালুক তোলার দলটা বিলের জলে ছড়িয়ে পড় ছিল। সূর্য ওপরে উঠে গেছে। দূরে চোখ মেলে তাকালে, শুধু গভীর জল—শান্ত এবং কালো। সেখানে এক শীতল ঠাণ্ডা ঘর রয়েছে যেন। ওপার দেখা যাচ্ছে না। অনন্ত জলরাশি কত প্রাচীনকাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তী নিয়ে বিলের ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে। শীতের সময় জলের রঙটা আরও কালো হয়ে ওঠে। শীতের সময় চারপাশের নলখাগড়ার ঝোপ থেকে পাখিরা অন্যত্র উড়ে যায় এবং ঝোপের ভিতর যেখানে জল থেকে জমি ভেসে উঠেছে সেখানে বিষাক্ত সাপেরা গর্তের ভিতরে মরার মতো শীতের ঠাণ্ডায় পড়ে থাকে। গ্রীষ্মের জন্য, বর্ষার জন্য ওদের প্রতীক্ষা। বর্ষা পড়লেই অথবা বসন্তকালে যখন সূর্য মাথার উপর কিরণ দেয় তখন বিষাক্ত সাপ সব মাঠ থেকে জলে নেমে যায়। জলের ওপর ভেসে বেড়ায়। দূরের গজারী বন থেকে তখন কিছু ময়াল সাপ পর্যন্ত এই বিলের জলে নেমে আসে। জালালি জলের ভিতর দেখছিল লাল চোখ দুটো ওর দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকছে। কিছুই স্পষ্ট নয়। কারণ অন্ধকার বড় প্রকট জলের গভীরে। নীল অথবা সবুজ রঙের ঝোপের ভিতর যদি আরও দুটো শালুক খুঁজে পাওয়া যায়—প্রলোভনে জালালি একটা পাতিহাঁস হয়ে গেল আর জলের ভিতর ডুবে-ডুবে লাল চোখ দুটোকে মরণ খেলা দেখাতে থাকল।

তখনও ফেলু ঝোপের ভিতর শুয়ে আছে। নেমে আসছে, আসছে না। এলেই খপ করে ধরে ঝোপের ভিতর টেনে নেবে। কামরাঙা গাছের ছায়ায় বিবির শরীর দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে না। এদিকে রোদ মাথার ওপর উঠে এল। অথচ বিবির মুখ দেখা গেল না, অঙ্গ দেখা গেল না। মাঠের ভিতর বাস্তুপূজার ঢাক-ঢোলের বাজনা কখন থেমে গেছে। পুকুর পাড়ে বড়বৌ। সোনা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কথা নেই বার্তা নেই কাঁসি বাজাচ্ছে—ট্যাং ট্যাং! পূজা পার্বণ শেষ। এখন সব তিল তুলসী, বারকোষ, নৈবেদ্য এবং তিলা কদমা আর অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্য বাড়ি নিয়ে যাওয়া। বড় সাদা পাথরে পায়েস—ধনবৌ সাদা পাথরে পায়েস নিয়ে যাচ্ছে। ফল ফুল, নতুন গামছা, ঘট আর নারকেল নিয়ে যাচ্ছে রঞ্জিত। মাঠের ভিতরই প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। গ্রামের যুবা পুরুষেরা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা প্রসাদ নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপর হ্যাজাকের আলো জ্বলবে রাতে। সরকাররা পুকুরের পাড়ে চার পাঁচটা হ্যাজাক জ্বালাবে। পথের ওপর ডে-লাইট জ্বলবে। তখন মাঠে মাঠে আরও সব হ্যাজাকের আলো, আলোতে এই মাঠ এবং গ্রাম সকল এক সময়, মাত্র এক রাত্রির জন্য ডুবে থাকবে আর ভেড়ার মাংস এবং আতপ চাউলের সুগন্ধ মাঠময় কী যে গন্ধ ছড়াবে! ফেলুর জিভে জল এসে গেল। রঞ্জিত এখন অন্য জমিতে মালতীকে দেখছে। মালতী বড় ব্যস্ত। সে কিছু লোককে বসিয়ে খিচুড়ি পায়েস খাওয়াচ্ছে। শীতের রোদে বেশ আমেজ ছিল। উত্তুরে ঠাণ্ডা

হাওয়ায় বেশ শীত-শীত ভাব। সকলে পেট পুরে খেয়ে রোদের ভিতর ঘাসের ওপর যেন প্রায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

আর সোনা তখন কাঁসি ফেলে গোপাট ধরে ছুটছে। ফতিমা গোপাটে ছাগল দিতে এসে ইশারাতে সোনাকে ডাকল। যেন ফতিমা শীতের ঠাণ্ডায় একটা কচ্ছপ আবিষ্কার করে ফেলেছে। কচ্ছপটাকে ধরার জন্য সে সোনাকে ডাকছে। এখন শীতকাল। শীতের জন্য কচ্ছপেরা বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারে না। পাড়ে উঠে রোদ পোহায়। অথবা জমির ভিতর কচ্ছপেরা লুকিয়ে থাকে। লাঙ্গলের ফালে মাটির ভিতর থেকে কচ্ছপ উঠে আসতে পারে। কিন্তু ফতিমা সোনাকে সে সবের কিছুই দেখাল না। অশ্বত্থ গাছটার নিচে সোনাকে টেনে নিয়ে গেল। ঝোপের ভিতর কি আছে দ্যাখেন। বলে ফতিমা চুপি দিল। বুঝি মানুষ হবে, পাগল ঠাকুর হবে। ফতিমা অন্তত তাই ভেবেছিল। সোনাবাবুর পাগল জ্যাঠামশাই যিনি রাত-বিরাতে, কোনওদিন খুব ভোরবেলা উঠে মাঠ পার হয়ে সোনালী বালির নদী পার হয়ে নিরুদ্দেশে চলে যান, সেই মানুষই হয়তো আজ বেশি দূর না গিয়ে এই অশ্বত্থের নিচে মটকিলা ঝোপের ভিতর শুয়ে শুয়ে পাখির সঙ্গে গল্প করছেন। ছোট মেয়ে ফতিমা, সামুর একমাত্র মেয়ে ফতিমা জানে না—এই মানুষ পাগল মানুষ নন, এ অন্য মানুষ ফেলু শেখ। ফেলু শেখ এখনও চুপচাপ সেই পরাণের চেয়ে প্রিয়, মরণে যার স্মৃতি ভোলা দায়—সেই এক পরমাশ্চর্য যুবতীকে খপ করে ঝোপের ভিতর টেনে নেবার জন্য আত্মগোপন করে আছে।

সোনা ঝোপের ভিতর উঁকি দিয়ে ডাকল, জ্যাঠামশয়। কারণ যখন সব দেখা যাচ্ছে তখন পাগল মানুষ ব্যতীত আর কে হবেন। এই অঞ্চলে তিনিই তো একমাত্র মানুষ যাঁর কাছে এই মাঠ, গাছগাছালি এবং পরবের দিনে উৎসব সব সমান।

ফেলু এত নিবিষ্ট যে কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে খেয়াল নেই। কার যেন গলা, কে যেন ঝোপে উকি দিয়ে পিছনে ডাকছে। হাত পিঠ মুখ ফেলুর দেখা যাচ্ছে না। ঘন ঝোপের বাইরে শুধু পা দুটো দৃশ্যমান, এই পা দেখে ধনকর্তার ছোট পোলা টের পেয়েছে মানুষ আছে ঝোপের ভিতর। ওরা এখন হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। আগে সোনা পিছনে ফতিমা। সে তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠে বসল। ঝোপ থেকে পাগলের মতো ছুটে বের হয়ে যাবে ভাবল, কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে ধরা পড়ে যাবে, সে কি যেন হাতড়াতে থাকল। তার কি যেন হারিয়ে গেছে।

সোনা এবং ফতিমা বুঝতেই পারেনি, এমন একটা নীরস মানুষ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। সোনা বলল, আপনে!

ফেলুর কি হারিয়ে গেছে এমন চোখমুখ। সে বলল, ঝোপের ভিতর শিকড়-বাকড় খুঁজতাছি।

—কি হইব?

—হাতটা জোড়া লাগব।

সোনা বলল, পাইলেন নি?

—না রে কর্তা, পাইলাম না। কৈ যে সব লুকাইয়া থাকে, বলে ফেলু ফতিমার দিকে কটমট করে তাকাল। ঝোপের ভিতর ফতিমা এবং সোনা। ফেলু সোনাবাবুকে কিছু বলল না। শুধু ফতিমার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে গজরাতে থাকল, সামু মাইয়াটারে বড় আসকারা দ্যায়। মাইয়াটারে ইংরাজি শিখায়। এত অধর্ম ভাল নয় মনে হল ফেলুর। আর সঙ্গে সঙ্গে পাগল ঠাকুরের মুখ ভেসে ওঠে, মুখ ভেসে উঠলেই ভিতরের সেই অধম্মটা জেগে ওঠে। হাতের দিকে তাকালে ক্ষোভের সীমা থাকে না। ফেলুর প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে। সেই যে বিবি আন্নু সে পর্যন্ত তেলের নাম করে হাজিসাহেবের ছোট বিবির কাছে চলে গেল। ছোট বিবির কাছে গেল কি ছোট সাহেবের কাছে গেল কে জানে! এখনও সে ফিরছে না। ফেলু তাই ভাবল একটু তাড়াতাড়ি করা যাক। বিবির কথা মনে হতেই সে পা চালিয়ে হাঁটল। তাড়াতাড়ি করতে গেলে বড় বাগের ভিতর দিয়ে সোজা উঠে নেতে হয়। পথ নেই, শুধু বাঁশের জঙ্গল। কিছু বেতগাছ এবং চারপাশটা অন্ধকার। দিনের বেলায় হেঁটে যেতে গা ছমছম করে। পাশেই গ্রামের কবরখানা। ফেলু হন হন করে হাঁটছিল। বাঁ হাতে একেবারে শক্তি নেই। কব্জিতে মন্ত্রপড়া কড়ি ঝুলছে। যদি বিবি এখনও সং করে বেড়ায় সে বিবির পেটে এক লাথি মারবে। তার শরীর এবং দাঁত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর তক্ষুনি দেখল বিবি তার বাগের অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসছে। কিন্তু হাতটা, হায় হাতটা—পঙ্গু হাত নিয়ে কিছু করতে পারল না। বাগের অন্ধকার থেকে বের হতেই সে মুখের উপরে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল, তুই আন্নু!

আন্নু দাঁড়াল না। এমন মানুষটাকে সে আর ভয় পায় না। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বলল, তুমি মানুষটা ক্যামনতর! কইলাম হুস করতে কাওয়া আর তুমি বাগের ভিতর ঘোরতাছ!

—তুই এহানে ঝোপে-জঙ্গলে কি করতাছস?

—সঙের লাইগ্যা তোমারে খোঁজতাছি।

—আঃ। বিবিটাও ইতর কথা কইতে শিখা গ্যাছে। কারে লাথি মারে ফ্যালু! নিজের পেটে লাথি মারে! ফেলু রাগে দুঃখে নিজের পেটে একটা লাথি মারতে চাইল। বিবিটা পর্যন্ত ধরে ফেলেছে ফেলু পঙ্গু হয়ে গেছে। সুতরাং কে কার পেটে এখন লাথি মারে। আন্নু পরম কুলীন এক যুবতী কন্যার মতো বাগের ভিতরে ডুব দিয়ে জল খাচ্ছে, একাদশীর বাপও টের পাচ্ছে না। ফেলু কেমন কাতর গলায় বলল, তুই মনে করস আমি কিছু বুঝি না! হালার কাওয়া।

—আর তুই মনে করস আমি অ কিছু বুঝি না। ফেলুর মুখের ওপর ঝামটা মারল আন্নু।

—তুই যুবতী মাইয়া, তর বোঝনের না আছে কি ক। বলে ফেলু কথা আর বাড়াল না। একটু দূরে কাঁঠাল গাছে সোনা, ফতিমা নিচে। কাঁঠাল পাতা অথবা ডাল ভেঙে দিচ্ছে ফতিমার ছাগলটাকে। গোলমাল বাধালে অথবা চিৎকার চেঁচামেচি করলে এখানে ওরা ছুটে আসতে পারে। ছুটে এলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। সে অশ্বত্থের ঝোপে আত্মগোপন করেছিল, গাছে তখন কাক উড়ছিল না, মেলায় গরু যাচ্ছে, গলায় ঘণ্টা বাজছিল আর ঘাসের ভিতর পড়ে থেকে মাইজলা বিবির সনে সঙ—সব টের পাবে যুবতী মেয়ে আন্নু। সে চুপচাপ আন্নুর শরীরের আঁশটে গন্ধটা এবারের মতো হজম করে গেল। সে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, গোসল কইরা বাড়ি ঢুকবি। না হয়, তর একদিন কি আমার একদিন। আর এই হজম করার যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ল পাগল-ঠাকুরের ওপর, সে এক হাতিতে চড়ে ওর দুই হাত ভেঙে এখন মাঠে ময়দানে পাখি ওড়াচ্ছে, এবং বাতাসে ফুঁ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেই মানুষকে বাগে পেলে পীর না বানিয়ে ছাড়ছে না! রাগ এবং বিদ্বেষ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিবি আন্তু এই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর এতক্ষণ তেল আনার নাম করে, ওকে মাছ পাহারায় রেখে এসে কী করছিল সব যেন জানা।

কিন্তু অসহায় ফেলু দু'হাত ওপরে তুলতে গিয়ে দেখল, সে নাচারি, বেরামি মানুষ। এমন জবরদস্ত বিবির সঙ্গে সে বুঝি ইহজীবনে লড়তে পারবে না। লড়তে পারলে বোধ হয় এই অন্ধকার বাগের ভিতর এখন এক প্রলয়ঙ্কর খণ্ডযুদ্ধ বেধে যেত। অগত্যা ভালো মানুষের মতো আন্নুর পিছনে পিছনে, যেন সে এবং আন্নু, মেমান বাড়ি থেকে বাগের ভিতর দিয়ে ফিরছে—কোনও তঞ্চকতা নেই, পরস্পর তেমনভাবে হাঁটছে, মাঠে তখনও ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। মালতী প্রসাদ বিতরণ করছে মাঠে। কাগজের লাল নীল পতাকা উড়ছে বাতাসে। মাঠের ভিতর সাদা ধবধবে গরদ পরে মালতী, নিষ্ঠাবতী, ধর্মাধর্ম যার একমাত্র সম্বল, যে সকলের মতো হাঁস পুষে বড় করছে, পুরুষ হাঁসটার জন্য যার মমতা আর বর্ষায় যে চুপচাপ নিঃশব্দে বৃষ্টি ভিজে সারারাত ধরে, সেই যুবতী মালতী, বিধবা মালতী এখন বাস্তুপূজার পায়েস খাওয়াচ্ছে সকল মানুষকে।

গাছের ডালে সোনাবাবু। ফতিমা দুষ্টু প্রজাপতির মতো চারা কাঁঠাল গাছটার চারপাশে ঘুরেছ এবং লাফাচ্ছে। ছাগলটার জন্য সে ডালপাতা সংগ্রহ করছে। সোনা ছাগলটার জন্য ডাল ভেঙে দিচ্ছিল গাছের। কাঁঠাল পাতা খাবার জন্য ছাগলটা, ছোট্ট এক বাচ্চা ছাগল দু'পায়ে ভর করে লাফ দিচ্ছিল। সোনা ছাগলটার পাতা খাবার আনন্দে, গাছের সব কচিকাঁচা ডালপাতা ভেঙে ছাগলটার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ছাগলটার পাশে এখন পাতার ডাঁই। সোনা লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল। পড়তেই কানের কাছে মুখ এনে ফতিমা ফিসফিস করে বলল, যাইবেন সোনাবাবু?

—কোনখানে?

—বকুল ফল আনতে যাইবেন?

—কতদূর?

—বেশি দূর না। বলে, আঙুল তুলে দেখাল ঐ যে দ্যাখছেন না হাসান পীরের দরগা। দরগার ডাইনে ট্যাবার পুস্কনি, আমরা যামু পুস্কনির পাড়ে।

—ছোটকাকা বকব।

—যামু আর আমু।

সোনা চারদিকে তাকাল। পূজা পার্বণের দিনে কারো কোনও লক্ষ নেই। লালটু, পলটু ছোটকাকার সঙ্গে চরু রান্নার জন্য গেছে। ছোটমামা গেছে সরকারদের বাস্তু পুজাতে।

শোভা, আবু, কিরণী বাস্তুপূজার প্রসাদ খেয়ে বেড়াচ্ছে। পূজা-পার্বণের দিনে কে কোথায় যায়—কে কার খবর রাখে! পা গল জ্যাঠামশাই ভোরে কোনদিকে বের হয়ে গেছেন, কেউ টের করতে পারেনি। সোনা মনে মনে ভাবল, বেশি দেরি হলে সকলে ভাববে, সোনা গেছে জ্যাঠামশাইর লগে। সুতরাং সোনা বোঁ বোঁ শব্দ করতে থাকল মুখে। তারপর ওরা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকল। বড় মাঠ, উত্তরে গেলে হাসান পীরের দরগা। দরগার পাশ দিয়ে সাইকেলে গো পাল ডাক্তার নেমে আসছে। গোপাল ডাক্তার ওদের দেখে ফেলবে ভয়ে ওরা দালানবাড়ির খালের ভিতর নেমে গেল। দু'জনে চুপচাপ মাথা গুঁজে উবু হয়ে বসে থাকল। এত বড় মাঠের ভিতর সোনা এবং ফতিমাকে একা একা ঘুরতে দেখলে আশঙ্কার কথা। তুমি সোনা, সেদিনের সোনা, একা একা এত বড় বিশাল বিলেন মাঠে নেমে এসেছ—কি সাহস তোমাদের! চল চল বাড়ি চল। অথবা কিছু তিরস্কার। কিংবা বাড়ি তে খান রাটা পৌঁছে দিলে ছুটবে ঈশম, তাব প্রিয় তরমুজ খেত ফেলে ছুটবে। আর মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে অথবা বিলেন মাঠে নেমে গিয়ে ডাকবে, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন! অঃ সোনাবাবু।

কবে একবার সোনা একা-একা তরমুজ খেতে নেমে গিয়েছিল–কবে, সেই কতকাল আগে, সোনা প্রথম গ্রামের বাইরে বের হয়ে দক্ষিণের মাঠে—সোনালী বালির নদীর চরে তরমুজ খেতের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল সঠিক মনে নেই, কিন্তু সেই তরমুজ খেত, মালিনী মাছ এবং বড় মিঞার দুই বিবি—দুর্গাঠাকুরের মতো মুখ, নাকে নথ দুলছিল, কি এক রোমাঞ্চ যেন জীবনে, সোনা এখন সেই এক রোমাঞ্চকর লোভে ছুটছে। ফতিমা কাপড়টা গামছার মতো করে প্যাঁচ দিয়ে পরেছে। শরীরে ফতিমার জামা নেই। কোনও ফ্রক নেই। খালি গা। নাকে নথ দুলছে ফতিমার। কানে পেতলের মাকড়ি। নাকের বাঁশিতে সোনার নাকচাবি। চাবির মুখটা চ্যাপ্টা চাঁদের মতো। কথা নেই বার্তা নেই সোনা ফতিমার নাকটা চ্যাপ্টা করে ধরে নাকের ভিতর সেই চ্যাপ্টা চাঁদ কি করে বাঁশিতে আটকে আছে দেখল। ফতিমার খুব লাগছিল নাকে। কিন্তু সোনাবাবু, ছোট্ট সোনাবাবু...শরীরে যার চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে আর মাথায় কি সুমধুর গন্ধ! সোনাবাবু তার নাক উল্টে বাঁশিতে এখন চ্যাপ্টা চাঁদের মুখ উঁকি দিয়ে দেখছে।

ফতিমার শরীর শিরশির করে আনন্দে কাঁপছিল। সে বলল, সোনাবাবু চলেন! গোপাল ডাক্তার গ্যাছে গিয়া। দূরে মাঠের আলে গোপাল ডাক্তারের ঘণ্টি বাজছে। আর প্রান্তরে যখন শস্য নেই, যখন মাঠ ফাঁকা, শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে তখন ছুটে যাওয়া ভালো। ওরা ছোটার সময়ই দেখল, ট্যাবার পুকুরের নিচে যে মাঠ আছে সেখানে পাগল জ্যাঠামশাই। তিনি হনহন করে বিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। সোনা আর মুহূর্ত দেরি করল না। সে যেন জ্যাঠামশাইকে মাঠের ওপর আবিষ্কার করে ফেলেছে তেমন গলায় ডাকল, কিন্তু মানুষটা হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। ঢাক ঢোল বাজছে তো বাজছেই। বাস্তুপুজোর মোষ বলির রক্ত খাঁড়াতে লাগছে তো লাগছেই। আর সোনা, ফতিমা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। ওরা ছুটছিল আর ডাকছিল। ওরা ঢিবির ওপর উঠে ডাকল, জ্যাঠামশয়! কে কার কথা শোনে! জ্যাঠামশাই পুকুরটার পাড়ে পাড়ে যে বন আছে তার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সংসারে কত কিছু ঘটে, কত কিছু ঘটে না। ফসল ফলে না সব সময় মাঠে। এখন কোথাও রুক্ষ মাঠ, কোথাও জমিতে তামাকের পাতা দেখা যাচ্ছে। পেঁয়াজ, রসুন, আলু, বাঁধাকপি উঁচু জমিতে—পুকুর থেকে জল তুলে পেঁয়াজ-আলু-বাঁধাকপির চাষ করছে বড় গেরস্থ প্রতাপ চন্দ। আলে আলে দুই বালক-বালিকা ছুটছে। ঢিবি থেকে নেমে মাঝিদের বড় জমি পার হয়ে ছুটছে। অকালের ফল বকুল ফল বনের ভিতর। ওরা বকুল ফলের অন্বেষণে ছুটে যাচ্ছে। ফতিমা ফল কুড়াবে, সঙ্গে সোনাবাবু আছে, ভরদুপুরের রোদ রয়েছে, আর শীতের সূর্য মাথার ওপর বলে ওদের এতটুকু শীত করছে না। খালি গায়ে খালি পায়ে ছুটছে। যেন দুটো খরগোশ তাড়া খেয়ে বনের দিকে পালাচ্ছে।

সহসা মনে হল সোনার, ওরা বড় বেশি দূরে চলে এসেছে। এতবড় বন সামনে! সোনা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল! ওরা আর বাড়ি বুঝি ফিরে যেতে পারবে না।

জায়গাটা বড় নির্জন, পুকুরটা প্রাচীন। মজা দিঘির মতো দাম এবং কচুরিপানায় ঠাসা। পাড়ে পাড়ে কত বিচিত্র গাছগাছালি গভীর বনের সৃষ্টি করেছে। ছোট বড় লতার ঝোপ-পায়ে হাঁটা সামান্য পথ। পথে শুকনো ঘাসপাতা। মাটিতে মরা ডাল, পাখির পালক। বোধ হয় মাথার ওপরে প্রাচীন এক অর্জুনের ডালে পাখিদের রাতের আস্তানা। তার নিচে কত যুগ ধরে, মাছের এবং মানুষের হাড়, গরু-বাছুরের হাড়। পাশেই এক জরদ্গবের মতো

কড়ুই গাছ। গাছটার ভিতর কত বিচিত্র খোঁদল, ডালপালা নিয়ে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে সব মৃত গাছের ডাল, ডালে ডালে হাজার হবে শকুন সার সার বসে রয়েছে। ওরা গাছটার নিচে যেতে সাহস পেল না। কিন্তু এইটুকু পথ পার হতে না পারলে ওরা অকালের ফল বকুল ফল খুঁজে পাবে না। বকুল গাছটা বড় নয়, ছোট। ঝোপজঙ্গলে গাছটাকে খুঁজে বের করা কঠিন। গাছটার খোঁজখবর ফতিমাকে জোটন দিয়ে গেছে। আবেদালির দিদি জোটন আবেদালির জন্য একটা মুরগি এনেছিল, মুরগিটা উড়াল দিয়ে চলে গেল হাজিসাহেবের আতাবেড়াতে। আতাবেড়ার পাশে ছোটবিবির সঙ্গে দেখা জোটনকে ছোটবিবি বলল, মুরগিটা মাঠের দিকে নেমে গেছে। মাঠে নামলেই মনে হল জোটনের, দূরে কি একটা কেবল ছুটছে। বুঝি কুকুর হবে। বেড়াল হতে পারে। মাঠের ওপর দিয়ে অকারণে ছুটে পালাচ্ছে। মাঠে নামতেই হাজিসাহেবের ছোট বেটার সঙ্গে জোটনের দেখা। ঐ যায়, যায়। দেখা যায়। সব শলাপরামর্শ যেন ঠিক ছিল। ছোট বেটা জোটনকে অকারণ সেই মাঠের দিকে হাত তুলে মুরগির খোঁজে যেতে বলে দিল।

জোটন মুরগিটা চুরি করে এনেছিল আবেদালিকে খাওয়াবে বলে। জোটনের ধারণা এখন সেই মুরগি ফাঁক বুঝে তার গ্রামের দিকে পালাচ্ছে। পোষা মুরগি, বড় সোহাগের মুরগি মৌলবীসাহেবের। আদরের মুরগি মাঠের উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। সে কি ভেবে তাড়াতাড়ি মুরগি ধরার জন্য ছুটতে থাকল। যদি এ মুরগি চলে যায় আর যদি টের পায় মৌলবীসাব, মুরগি যাবার পথে জোটন চুরি করে নিয়ে গেছে তবে আর রক্ষে থাকবে না। সেই মুরগি যখন দূর থেকে অস্পষ্ট, মনে হচ্ছে কি একটা ট্যাবার পুকুর পাড়ে বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, তখন জোটনও না ছুটে পারল না। এত সখ করে, এত কুরশিস করে মুরগিটা ধরে এনেছিল আবেদালিকে খাওয়াবে বলে, এখন হায় সেই মুরগির চৈতন্য উদয়। কি হবে! কি হবে! সুতরাং ছোটা ভালো। মুরগি ধরার জন্য জোটন কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে ছুটতে থাকল। ছুটতে ছুটতে ট্যাবার পুকুরের পাড়ে, ভিতরের জঙ্গলে। কিন্তু শেষে আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। মুরগিটা যদি গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে, উকি দিয়ে দেখতে থাকল।

তখন মুরগির গলা টিপে ধরেছে ছোটবিবি হাজিসাহেবের ছোটবিবি মুরগি হালাল করে হাতের ভিতর শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই ক্যা-ক্যাঁ করে ডেকে উঠবে। তখন বনে বনে জোটন খুঁজছিল, হায়, মুরগি তুই কোথায় গেলি! ঝোপে-জঙ্গলে জোটন মুরগি খুঁজতে এসে কপাল থাবড়াতে থাকল। তখন মনে হল ঝুঁটিতে লাল রঙ মুরগির, ঝোপের ভিতর লাল রঙের কি যেন দেখা যায়। সে লোভে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বনের ভিতর ঢুকে পড়ল। কিন্তু হায় ঢুকে দেখল, গাছের ডালে লাল বকুল ফল। অকালে বকুল ধরেছে গাছটাতে। একটা বিড়াল কি নেড়ি। পাকা ফল দু'চারটে নিচে পড়ে আছে কুকুর এই বাগের ভিতর ঢুকে গেল। আবছা অস্পষ্ট শীতের রোদে দূর থেকে বিড়াল কুকুর না অন্য কোনও জীব ধরা যাচ্ছিল না। জোটন ভেবেছিল, ওর মুরগি পালাচ্ছে। নাকের বদলে নরুন পাবার মতো জোটন মুরগির বদলে বকুল ফল তুলে নিল। সেই ফল এনে সে

ফতিমার হাতে দিয়েছে, আর বলছে সেই আশ্চর্য বকুল ফলের গাছটা বনের ভিতর লুকিয়ে আছে।

গাছটার অনুসন্ধানে এসে সোনার ভয় ধরে গেল। সে বলল, আমার ডর করতাছে ফতিমা।

—ডর কিসের। আইয়েন আপনে। বলে ফতিমা সোনার হাত ধরে কড়ুই গাছটার দিকে তাকাল। বড় বড় শকুন, ওরা নিবিষ্ট মনে বসে আছে। কড়ুই গাছটার দিকে তাকালেই সোনার ভয়টা বড়ছে। ওরা শকুনের রাজা গৃধিনীকে দেখতে পেল, মগ ডালে বসে রাজার মতো তাবৎ পৃথিবীর কোথায় কোন মৃত জীব পড়ে আছে বাতাস শুঁকে টের পাবার চেষ্টা করছে। অন্য শকুনগুলি ঠোঁট গুঁজে বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো ঘাড় নিচু করে ওদের একবার দেখে নিল—ছোট ছোট কাঠের পুতুলের মতো মনুষ্যকুলের দুই জীব নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শকুনের রাজা সবসময় জেগে। সে ক্ষুধার জন্য শিকারের খবর দেবে। সে-ই একমাত্র উঁচু মুখে আকাশের অন্য প্রান্তে কী উড়ে যাচ্ছে, কারা উড়ে যাচ্ছে, কত হবে......আর যদি মৃত জীবের গন্ধ ভেসে আসে, সে প্রথম দু'পাখা বাতাসে ছড়িয়ে দেবে, তারপর উড়তে থাকবে আকাশে প্রায় তখন মনে হয় নির্বাণ লাভের মতো এইসব বড় বড় পাখি কোন এক অদৃশ্য জগতের সন্ধানে উড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রাজা শকুনটা ওড়ার বদলে কেবল উঁকি দিয়ে ওদের দেখছে। ফতিমা, যে ফতিমা, একা গোপাটে ছাগল নিয়ে আসে, যে মাথায় করে সানকিতে নাস্তা নিয়ে যায় জমিতে, যার ভয়ডর একেবারে কম—পাটখেত বড় হলে অথবা নির্জন মাঠের ভিতরে যখন বড় বড় পাটগাছগুলি ফতিমার মাথা পার হয়ে উঁচুতে উঠে যায়, যখন সামনের আলপথ সিঁথির মতো, দু'ধারে পাট গাছ ঘন বনের সৃষ্টি করে রাখে, তেমন পথে কতবার ফতিমা একা একা চলে এসেছে ছাগলটার দড়ি ধরে-সেই ফতিমা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। রাজা শকুনটা নিচের দিকে উঁকি দিলে সে লাফ দিয়ে ছুটতে চাইল সোনাবাবুর হাত ধরে।

যেন এই গাছটা গল্পের সেই সদর দেউড়ি—গাছটা রাক্ষস খোক্কসের মতো সদর দেউড়িতে পাহারা দিচ্ছে। সদর দেউড়ি পার হতে পারলেই ফুল-ফল রাজকন্যা মিলে যাবে। ফতিমা সাহসে ভর করে ফুল-ফলের জন্য এবং সেই অত্যাশ্চর্য জগতের জন্য সোনাবাবুকে ঠেলে ঠুলে পাখিব পালক, মাছের হাড়, মানুষের হাড়, পাখিদের মলমূত্র অতিক্রম করে বনের ভিতর ঢুকে গেল। ভিতরে বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। পাখিরা ডাকছিল। প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা গিরগিটি ক্লপ ক্লপ শব্দ করে ডাল থেকে পাতায় উঠে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল। জায়গাটা বড় নির্জন, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে সোনার। কোথাও কোনও মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দূরে কে যেন কেবল কাঠ কেটে চলেছে—তার শব্দ ভেসে আসছিল। কান পাতলে ঢাক-ঢোলেব শব্দ শোনা যায়। ওরা এমন একটা জায়গায় চলে এসে এই প্রথম পরস্পর অসহায় চোখ তুলে তাকাল।

ফতিমা বলল, সোনাবাবু, আপনেরে ছুইয়া দিছি। বাড়ি গেলে সান করতে হইব।

সোনা মা'র ভয়ে বলল, তুই ছুইলি ক্যান।

—আমি ছুইলাম, না আপনে ছুইলেন। বাঁশিতে নাকচাবিটা আপনে দ্যাখলেন না!

—মায় শুনলে আমারে মারব। সোনার চোখের ওপর সেই দৃশ্যটা এতক্ষণে ভেসে উঠল। সেই বর্ষার মতো। সে ফতিমার আঁচলে প্রজাপতি বেঁধে দিয়েছিল বলে মা ওকে খুব মেরেছিল। ফতিমার কথায় সোনার যথার্থই ভয় ধরে গেল। বলল, তুই কইস না। আমি তরে ছুইয়া দিছি মায়েরে কইস না।

—আমি কইতে যামু ক্যান!

—কইলে ঠিক মায় আমারে মারব।

—কোনদিন কমু না।

—তিন সত্য!

—তিন সত্য।

সোনা যেন এবার একটু নিশ্চিন্ত হল। ফতিমা না বললে, এ-কথা কেউ আর জানতে পারবে না।

চারিদিকে বড় বড় গাছ। অপরিচিত গাছ। ঝোপ-জঙ্গল লতায়-পাতায় প্রায় কোথাও কোথাও নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি করে ফেলেছে। ওরা সেই অরণ্যের ভিতর বকুল গাছটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেন ওরা বলতে চাইছে, বৃক্ষ, তুমি এতদিন কার ছিলে?

বৃক্ষ উত্তর দিল, রাক্ষসের।

—এখন কার?

—এখন তোমাদের।

—তবে তুমি আমাদের ফল দাও। বকুল ফল।

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এগুতে পারছে না। চারপাশটায় যেন জঙ্গলের শেষ নেই। কতদূর হেঁটে যাওয়া যেন এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে! শুকনো ঘাসপাতা পায়ের নিচে। কত দীর্ঘদিনের মানুষ-বিবর্জিত জায়গা! ওরা হামাগুড়ি দিয়ে অথবা সন্তর্পণে কাঁটাগাছ পার হবার জন্য ছোট ছোট লাফ দিচ্ছিল। আর মনে মনে সেই গল্পের মতো বলা, বৃক্ষ তুমি কার ছিলে?

—রাজার ছিলাম।

—এখন কার?

—এখন তোমার।

—তবে ফল দাও। বকুল ফল!

বৃক্ষ কখনও রাজার, কখনও রাক্ষসের। বৃক্ষ, অঃ বৃক্ষ! ওরা বৃক্ষ বৃক্ষ বলে চেঁচাতে থাকল। কোথায় গেলে তুমি বৃক্ষ! ওরা বনের ভিতর হেঁকে ডেকে বেড়াতে থাকল। ওরা কেবল গাছটার অন্বেষণে আছে। মগডালে বসে শকুনেরা চিৎকার করছিল, বনের বিচিত্র সব শব্দ উঠছে ঘস ঘস—ডালে ডালে পাখিদের কলরব ছিল আর ছিল দুই বালক-বালিকা। ওরা ভয়ে ভয়ে বকুল গাছটার উদ্দেশে হাঁটছে।

আর ঠিক তখন মনে হল বনের ভিতর কে বা কারা হুঁম হুঁম শব্দ করে ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, ঠাকুরমার কাছে শোনা গল্পের সেই ভূত-প্রেত অথবা ডাকিনী-যোগিনীর মতো। ফতিমা ফিসফিস্ করে বলল, সোনাবাবু ঐ শোনেন!

সোনা একটা মরা গাছের গুঁড়িতে বসেছিল। ও আর হাঁটতে পারছিল না। পায়ে লাগছিল। পায়ে কাঁটা ফুটেছে। ওর মনে হল এখন এইসব ফেলে খোলা মাঠের ভিতর নেমে যেতে পারলে বড়দা মেজদা ট্যারা হয়ে যাবে। আমারে একটা দে, সোনা বড় ভাল পোলা, দে দে, একটা দে, বলে বড়দা মেজদা ওর চারপাশে ঘুর ঘুর করবে। ফতিমাও বড় শখ করে এই বনের ভিতর পালিয়ে এসেছে ফল নেবে বলে, কিন্তু বনের ভিতর সেই হুম্ হুম্ শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

বনের ভিতর ওরা চুপচাপ বসেছিল। ওদের ভিতর আতঙ্ক—এবারে কিছু একটা হয়ে যাবে। ওরা পালাতে গিয়ে ঘন গাছপালার ভিতর ক্রমে আরও হারিয়ে যাচ্ছিল! বনটা যে ভিতরে ভিতরে এত বড় ওদের জানা ছিল না। বনের ভিতর ঢুকে গেলেই গাছটা সদর দেউড়ির সেপাইর মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং ওদের অঞ্জলিতে বকুল ফল ভরে দেবে এমন একটা ধারণা ছিল, কিন্তু হায়! এখন ওরা এত ভিতরে ঢুকে গেছে যে, কোন্ দিকে গেলে মাঠ এবং পরিচিত পথ মিলে যাবে বুঝতে পারছে না। ফতিমার মুখ-চোখ শুকনো দেখাচ্ছে। বনময় সেই শব্দ কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে এইসব জঙ্গলের ভিতর কে বা কারা সহসা সহসা অট্টহাস্য করছিল। ঠাকুরমার গল্পের মতো যেন কে বা কারা বলছে হাঁউ মাঁউ-কাউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। ওরা ভয়ে, মৃত্যুভয়ে চোখ বন্ধ করে সামনের ঘাস, শুকনো পাতা, জঙ্গল যা কিছু সামনে পড়ছে সব মাড়িয়ে ছুটছে। অথচ সামনের খোলা মাঠ এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওরা শুকনো ডাল, পাখির পালক, গাছ এবং মানুষের হাড় অতিক্রম করে কেবল ছুটতে থাকল। কিন্তু সামনে আর পথ নেই, ফের পিছনের দিকে ছোটা। অথচ সেই এক অট্টহাসি পিছনে ছুটে আসছে তো আসছেই। ডালপালা ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে ওদের ধরার জন্য ছুটে আসছে। সূর্যের অমিত তেজের মতো

বনের ভিতর সেই এক অট্টহাসি গাছপালা ভেঙে দুম-দাম শব্দ করে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

তখন মাঠের ভিতর হুম্-হুম্-হুম্ শব্দ। রাজ-রাজেশ্বর কি জয়! জয় যজ্ঞেশ্বর কি জয়কারা যেন মাঠ ভেঙে এমন বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। সোনা ভয়ে গাছপাতার ভিতর লুকিয়ে পড়ল। ফতিমাও জঙ্গলের ভিতর মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। আর মুখ তুলতেই দেখল, ঝোপের ভিতর থেকে খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটা দল খোলা মাঠের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ষোলজন লোক বাঁশের ভিতর কাটা মোটা ঝুলিয়ে নিয়েছে। চার-পা বাঁধা কাটা মোটা মরা গরু-বাছুরের মতো ঝুলছে। ঠিক পেটের মাঝখানে বসানো কাটা মোষের মাথাটা। দড়ি দিয়ে মাথাটাকে পেটের ওপর বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথাটা চোখ খুলে রেখেছে, কান ঝুলিয়ে রেখেছে। এবং শস্যবিহীন মাঠ দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। লোকগুলি জয় যজ্ঞেশ্বর কি জয়, রাজ-রাজেশ্বর কি জয় বলতে বলতে নেমে যাচ্ছে। ওরা ঝোপের ভিতর প্রায় যেন শ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য এখন শুধু চোখের উপর ভাসছে। গলা এত শুকনো যে, ওরা ডাকতে পর্যন্ত পারল না। বলতে পারল না, আমরা ঝোপের ভিতর আটকা পড়েছি। কোনদিকে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আমরা মরে যাব।

লোকগুলি কাটা মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। পিছনে যারা আসছে, তাদের মাথায় চাল ডাল। একটা মোষের মাংস খাবার মতো মানুষের জন্য চাল-ডাল-তেল। ওরা শীতলক্ষ্যার পাড় থেকে এসেছে। পূজার প্রসাদ মোষের মাংস ফেলতে নেই তাই এইসব মানুষ এসেছে শীতলক্ষ্যার পাড় থেকে এই কাটা মোষ নিয়ে যেতে! ওরা মোষটা নিয়ে যেন পাল্কি কাঁধে বেহারা! যায়—হুঁ-হোম-না, যেন বরের সঙ্গে বধূ যায়—হুঁ-হোম-না, যেন মোষের পেটে কাটা মাথা যায়—হুঁ-হোম-না! বড় কুৎসিত এই দৃশ্য। মুণ্ডবিহীন মোষ পেটে মাথা নিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে। বনের ভিতর তখন ডালপালা ভেঙে বেড়াচ্ছে কে? অট্টহাস্য, অট্টহাস্য! মগডালে শকুনের আর্তনাদ, ঝিঁঝিপোকার ডাক এবং সেই দ্রুত ডালপালা ভাঙাব শব্দ—ওরা ভয়ে এবার চোখ বুজে ফেলল, কারণ বনের ভিতর পথ করে সেই অট্টহাস্য ওদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওদের দুজনকে শক্ত দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরেছে। মাটি থেকে টেনে উপরে তুলে নিচ্ছে। যেন দুই পুতুল। সোমা রুপোর পুতুল। দৈত্যটা দুই কাঁধে দুই সোনা রুপোর পুতুল ফেলে বনের বাইরে বের হয়ে এল। তখন দুই পুতুল প্রাণ পেয়ে ঝলমল করে উঠেছে। দৈত্যটা বুঝি এত আনন্দ আর দু'হাতে সামলাতে পারছিল না। চিৎকার করে উঠল, গ্যাংচোরেৎশালা।

তখনও মাঠে ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। বাস্তু পূজা শেষ হলেই পুরীপুজোর মেলা। মেলায় দোকানপত্র যাচ্ছে গোপাট ধরে। বাঁশ কাঁধে মানুষ যাচ্ছে। ত্রিপল মাথায় মানুষ যাচ্ছে! সোনালী বালির নদীর জলে এখন কত সওদাগর নৌকা ভাসাল। বাদাম তুলে খাঁড়ি ধরে ব্রহ্মপুত্রে পড়বে। তারপর ফের বাঁক নিলে সেই প্রকাণ্ড বিল—পাঁচ ক্রোশের মতো

বিল রয়েছে। খালের জল বিলে পড়েছে। বিল পার হলেই মেলার প্রাঙ্গণ! বড় কাঠের পুল পার হলে যজ্ঞেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের পাশে সারকাসের তাঁবু পড়েছে।

সেই বিলের কথা মনে পড়ছিল পাগল ঠাকুরের। তিনি সোনা এবং ফতিমাকে মাঠে এনে ছেড়ে দিলেন। সোনার সব ভয় উবে গেছে! ফতিমা পর্যন্ত এখন হি-হি করে হাসছে। ওরা বাড়ি ফেরার জন্য দৌড়াতে লাগল। বেলা পড়ে আসছে, শীতের বেলা। সামসুদ্দিন ঢাকা গেছে। আজ ঢাকা থেকে ফেরার কথা। ফতিমা দ্রুত ছুটতে থাকল। ঢাকা থেকে বা'জান কাঁচের চুড়ি কিনে আনবে। ফিরে ফতিমাকে বাড়ি না দেখলে খুব রাগ করবে বা'জান। কানের দুল আনবে। মা'র জন্য ডুরে শাড়ি আনবে। বা'জান সময়-অসময় নেই সেই শহরে চলে যায়। দু'চার দিন পর ফের ফিরে আসে! সেই ঢাকা শহরে বড় হলে ফতিমা যাবে! যেতে যেতে তেমন গল্পও করল ফতিমা।

সোনা বলল, আমি-অ যামু। বাবায় কইছে বড় হইলে আমারে লইয়া যাইব।

—বাজী কইছে আমারে সদর ঘাটের কামান দেখাইব।

—বাবায় কইছে আমারেও সদর ঘাটের কামান দেখাইব। রমনার মাঠ দেখাইব। বুড়িগঙ্গার জলে সান করাইব।

—বাজী কইছে লিখা-পড়া শিখলে মোটরে চড়াইব!

—বাবায় কইছে ফাস্ট হইলে রেলগাড়ি কইরা ঢাকায় নিয়া যাইব।

—রেলগাড়ি ছোট। ছোট গাড়িতে সোনাবাবু যাইব!

—মোটরগাড়ি রেলগাড়ির ছোট।

—হ কইছে? ফতিমা সোনার মুখের সামনে গিয়ে মুখ বাঁকাল

—কিছু জানস না ছেরি, দিমু এক থাপ্পর।

—দ্যান ত দ্যাখি। থাপ্পর দিবেন! আপনের মায়রে কইয়া মাইর খাওয়ামু না তবে! কমু,সোনাবাবু আমারে ছুইয়া দিছে;

—আমি যে তরে ছুইয়া দিছি, তুই কইয়া দিবি!

—তবে মোটরগাড়ি ছোট এডা কন ক্যান!

—আর কমু না।

ফতিমা আর দেরি করল না। এই বাবুটির উপর বিজয়নী হয়ে উল্লাসে ছুটছে। মাথার চুল উড়ছে। কোমর থেকে ডুরে শাড়ি খুলে পড়ছে। ছুটতে ছুটতে কোনওরকমে

প্যাচ দিচ্ছে কোমরে। কোনওরকমে কাপড় সামলে মল বাজিয়ে ছুটছিল। পায়ে মল, রুপোর মলের ভিতর ছোট লোহার দানা। ফতিমা ছুটছিল আর পায়ের মল বাজছিল ঝম ঝম। ছুটতে ছুটতে দু'বার ফিরে তাকাল পিছনে। এতটুকু নড়ছে না, সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ছে সোনাবাবু। ফতিমা বিজয়িনীর মতো ঘুরে ফিরে লাফ দিল, হাঁটল, দু'পা এগিয়ে ফের লাফ দিল। ফের ঘুরে ফিরে চরকিবাজির মতো মাঠের ওপর ঘুরছে। যেন এক চঞ্চল খরগোশ কচি ঘাস থেকে এক কামড় খাচ্ছে, দু'কামড় নষ্ট করছে। ফুতিমা মাঠের উপর দিয়ে চঞ্চল খরগোশের মতো ছুটছিল। কিন্তু মনে মনে সোনা, যে সোনার শরীরে সব সময় চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে, যে সোনাবাবুর মুখ ঘাসের মতো নরম, কচি কলাপাতার মতো যে লাজুক, তেমন মানুষকে মাঠে একা ফেলে যেতে কেমন কষ্ট হচ্ছিল ফতিমার। ফতিমা এবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে ডাকল, আইযেন, আমি খাড়াইছি।

সোনা রাগে এবং ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল, না, আমি যামু না।

ফতিমাও গলা ছেড়ে বলল, আপনে না আইলে, আমি-অ যামু না।

দু'জন দু'জমির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকল। সোনা কিছুতেই নড়ছে না।

ফতিমা ছুটে সোনার নাগালে চলে গেল। চলেন।

—না, আমি যামু না।

—চলেন। না হয় আপনের রেলগাড়িটাই বড়। তারপর ফতিমা আরও কি যেন বলতে চেয়েছিল। বলতে পারল না। অথবা মনের ভিতর হয়তো এমন কথা উঁকি মারতে পারে—মেলায় গেলে আমরা রেলগাড়িতে যাব। বড় গাড়ি না হলে আমরা দু'জনে যাব কি করে। অথচ ফতিমা কথাটা প্রকাশের ভাষা ঠিক খুঁজে পেল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়। তারপর সোনার হাত ধরে বলল, আমারে একটা কারতিক পূজার ছিরাঘট দিবেন?

—দিমু।

—আইয়েন, ইবারে মাঠের ওপর দিয়া ছুটি। ওরা হাত ধরে শীতের রোদে কিছুক্ষণ ছুটে দেখল, পুকুরপাড়ে মালতী। ও রা তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিল। হাত ছেড়ে দিয়ে দু'জন দু'দিকে ছুটতে থাকল।

সেই যে ঢাক বাজছিল, ঢোল বাজছিল আর থামছে না। পঞ্চাশটা ঢাকি অনবরত ঘাড় কাৎ করে বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই। সরকারদের বাস্তুপূজা অঞ্চলে বিখ্যাত। লোকজনের সীমা সংখ্যা নেই। আত্মীয় কুটুম্ব, গ্রামের নিবাসিগণ, কিছু গরিব প্রজা আর সব মাতব্বর ব্যক্তি লাঠি হাতে ঘোরাফেরা করছিল। পুকুরপাড়ে হাজার মানুষ হবে, দূর দূর গ্রাম থেকে ওরা এসেছে। ধোপা নাপিত নমঃশূদ্র। ওরা পাত পেতে খিচুড়ি খাচ্ছে।

আর মাঠের উ পর দিয়ে মোষ যাচ্ছে, সেই যেন পাল্কি কাধে বেহারা যায়। ওরা মুসলমান গ্রামগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় শিব ঠাকুর কি জয়, রাজ রাজেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর কি জয়, এইসব বলছিল। পেটে মাথা নিয়ে মোষ চলেছে। মাঠের ওপর, ঘাসের ওপর বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে—ধর্ম আমাদের সনাতন, এত কচি মোষ তল্লাটে বলি হয় না। এত বড় খাঁড়া তল্লাটে আর কার আছে! আর এই ধর্মের মতো পূতঃপবিত্র কী আছে—জয় রাজ রাজেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর কি জয়। বিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মানুষগুলি কাটা মোষ বাঁশে ঝুলিয়ে জয়ধ্বনি করছিল। বিলের গরিব দুঃখী মানুষগুলি যারা শালুক তুলতে এসে জলের ভেতর সাদা হয়ে যাচ্ছে--হাত পা ঠাণ্ডা—এবং শীতে শিথিল হয়ে যাচ্ছে, যারা মাঝে মাঝে পাড়ে বসে রোদ পোহাচ্ছিল, তারা পাড়ের উপর দেখল বিন্দু বিন্দু এক ঝাঁক পাখির মতো মানুষগুলি কাঁধে মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার কাটা মোষের পেটে মাথাটা হড়কে নিচে পড়ে গেল! এত খাড়া ছিল বিলের পাড় যে পড়বি তো পড় একেবারে সেই গরিব দুঃখীদের পায়ের কাছে। সহসা এমন কাণ্ড! ধড়বিহীন মুণ্ড ওদের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

মোষের কাটা মুণ্ড দেখে ওরা তোবা তোবা বলে উঠল। এক কোপে কাটা মুণ্ড ওরা দেখে কেমন গুনাহ করে ফেলল। এত বড় বিলে ওরা দুঃখী মানুষ সব শালুক তুলতে এসে এমন কুৎসিত দৃশ্য দেখে ফেলে চোখে কানে কেমন আঙুল দিল অথবা বুঝি ভয়, এই যে বিল দেখছ, বড় বিল, বিলে কত না কিংবদন্তী, কত না সাপখোপ, অজগর আর কত না জলজ ঘাস জলের ভিতর। লতাপাতা কীট-পতঙ্গ বড় বড় জোঁক নাকে কানে ঢুকে গেলে কে কাকে রক্ষা করে! সুতরাং ওরা মুণ্ডটার দিকে আর তাকাল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবারে ঘরে ফিরতে হয়।

শীতকাল বলে উত্তরের হাওয়া ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। আকাশ বড় পরিচ্ছন্ন। মনে হয় এবার পৃথিবী উজাড় করে সব ঠাণ্ডা এই মাটির উপর, এই বিলের উপর নেমে আসবে। এতক্ষণ বিলের জলে সহস্র পাতিল ভেসেছিল, এখন একটিমাত্র পাতিল জলে ভাসছে। জলে একা এক পাতিল ভাসলে বড় ভয়। সেই পাতিলের মানুষটা কোথায় গেল! দ্যাখো দ্যাখো পাতিলের মানুষটা কোথায় গেল!

সূর্য তেমনি অস্ত যাচ্ছিল। শালুক ফুল ফোটে না আর। দূরে সব পদ্মপাতা, পদ্মপাতার পাশে ছোট এক পাতিল একা একা জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। মানুষটা কোথায় গেল! পাতিলের মানুষটা! জলের মানুষ এ পাড়ে উঠে এসেছে। যে যার শালুকের পাতিল মাথায় পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছেএকটা পাতিল বিলের জলে উত্তরের হাওয়ায় ভেসে ভেসে গভীর জলে চলে যাচ্ছে।

কে তখন হাঁকল, দ্যাখো, বিলের জলে পাতিল ভাইস্যা যায়।

কে তখন ফের হাঁকল, দ্যাখো পানির তলে মানুষ ডুইবা যায়।

কিন্তু এক ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধা, মুখে জরার চিহ্ন, ক্লিষ্ট চেহারা, সে জোর গলায় হাঁকরাতে থাকল, বিল আবার একটা মানুষ কাইরা নিল। সেই বৃদ্ধা নিয়তির মতো দাঁড়িয়ে যেন বলতে চাইল, এটা হবেই। সালের পর সাল বিল ক্ষুধা নিয়ে জেগে থাকে। ফাঁক পেলেই গিলে খায়। কিন্তু মানুষটা কে? কে ডুবে গেল জলে!

জালালি লাল চোখ দুটোর সঙ্গে জলের ভিতর তামাশা করছিল। সেই চোখ দুটো এগোচ্ছে পিছোচ্ছে। জলের নিচে ডুব দিলে ঘন নীল অথবা সবুজ রঙ চারদিকে। প্রেতের মতো ভেসে বেড়ায়। নিচে সূর্যের আলো যতটুকু পৌঁছায় ততটুকু আবছা দেখা যায়। কিন্তু গভীর জলের ভিতর জালালি আদৌ বুঝতে পারেনি, বড় রাক্ষুসে গজার মাছটা ওকে মরণ কামড় দেবার তালে আছে। ফাক পেলেই এসে খুবলে মাংস তুলে নেবে। কারণ মাছটা তার আস্তানায় জালালির উপদ্রব আদৌ সহ্য করতে পারছে না।

জালালি জলের ভেতর ডুবে দেখল, মাটি খুব মসৃণ। কোনও মাছের আস্তানা হলেই —বড় মাছ হতে হয়, রুই কাতলা অথবা কালিবাউস, বড় প্রকাণ্ড হতে হবে, হলেই নিচে, গভীর জলের নিচে বৃত্তাকার সমতল আবাস। চারপাশের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর মাছের এই নিঃসঙ্গ নিবাস। নিবাসের আশেপাশে যত জালালি শালুকের জন্য ঘুরঘুর করছিল তত মাছটা ক্ষেপে যাচ্ছিল। তত মাছটার লেজ কাঁপছে জলের নিচে। তত এগুচ্ছে পিছোচ্ছে। ভয় পাচ্ছে মানুষ দেখে, অথবা ভয় পাচ্ছে না, ঘোড়ার মতো কদমে পাখনা নাড়াচ্ছে। মাছটার শরীরে বড় বড় চক্র। অজগর সাপের গা যেন। বড় একটা কালো রঙের থাম যেন। শরীরে তার মানুষের চেয়ে কত অধিক শক্তি, সেই শক্তি নিয়ে দুর্বল জালালির বুক থেকে খুবলে মাংস তুলে নেবার জন্য জোরে এসে ধাক্কা মারল। জালালির মাথাটা নিচের দিকে ছিল তখন। জলের নিচে শালুক, মাটিতে শালুক—জালালি দু-ঠ্যাং ফাঁক করে প্রায় ব্যাঙের মতো ক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছিল। ঠিক নিচে নেমে যাবার মুখে মাছটা এসে বুকে ধাক্কা মারল।

জালালির এবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। জলের ভিতর মাছটা অতিকায় পশুর মতো দাপাচ্ছে। ফলে জলে ঘূর্ণি উঠছিল। জলের ভিতর মাছটা ঘাস লতাপাতাগুলি উল্টে পাল্টে ক্ষীণকায় জালালিকে সাপটে ধরল। শেষবারের মতো সে ঘাস-লতাপাতা ফুঁড়ে ও পরে ভেসে ওঠার দুবার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা ঢেকুর তুলল। একটা বড় শ্বাস নিতে গিয়ে জল গিলে ফেলল অনেকটা। ফের উঠতে গিয়ে যখন আর পারছিল না, তখন জলের ভিতরই শ্বাস নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হল রাজ্যর সব জল পেটে ঢুকে যাচ্ছে। যত অন্ধকারের ভিতর শালুকের লতা এবং সেইসব পদ্মপাতার শক্ত লতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছিল এবং প্রাণের যাতনায় ছটফট করছে তত লাল চোখ দুটো বড় হতে হতে

এক সময় আগুনের গোলা হয়ে গেল, তারপর ফস করে নিভে যাওয়ার মতো, জলের সঙ্গে জল মিশে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি আগুনের গোলা দুটো জলের সঙ্গে মিশে একটা কুসুমের মতো রঙ নিয়ে খানিকক্ষণ জেগে থাকল। তারপর জালালির প্রাণটুকু ফুটকরি তুলে জলের উপর ভেসে উঠলে কুসুমের রঙটাও আর থাকল না। ঘোলা জলটা ক্রমে থিতিয়ে আসতে থাকল। জলজ জঙ্গল, লতাপাতা ঝোপ-ঘাস সব জলের নিচে চুপ হয়ে আছে। আর নড়ছে না। লতাপাতার ভিতর একটা মানুষ আটকা পড়ল। আজব জীব মনে হচ্ছে এখন জালালিকে। ঘাড় গলায় লতাপাতা পেঁচিয়ে আছে। পায়ের নিচে এবং বুকের চারপাশে অজস্র কদম ফুলের মতো জলজ ঘাস লেপ্টে আছে। জালালি উপুড় হয়ে আছে। পা দুটো উপরের দিকে মাথাটা নিচের দিকে হেলানো। একটা ছোট মাছ রূপালী ঝিলিক তুলে জালালির নাকে মুখে এবং স্তনে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

গজার মাছটা নড়ছিল না। সে দূরে লেজ খাড়া করে একদৃষ্টে ঘটনাটা দেখছে। যখন দেখল আজব জীবটা লতাপাতায় আটকে গিয়ে আর নড়তে পারছে না তখন নিজের আস্তানার চারপাশে বিজয়ীর মতো পাক খেল। তারপর দ্রুত পাখনা ভাসিয়ে তীরের মতো দক্ষিণের দিকে ছুটতে থাকল। সকলকে যেন খবর দিতে হয়—দ্যাখো এসে আমার আস্তানায় একটা আজব জীবকে আমি ধরে ফেলেছি।

মাছটা এত বড় আর কপালে মনে হয় সিঁদুর দেওয়া—মাছটা কত প্রাচীনকালের কে জানে! মাছটার গায়ে কত মানুষের আজন্মকাল থেকে কোঁচ অথবা একহলার শিকারচিহ্ন। মাছটাব ডান ঠোটে দুটো বোয়ালের বঁড়শি নোলকের মতো দুলছে। মাছটার গায়ে কোঁচের ছোট ছোট কালি। খুঁজলে, একটা দুটো নয়, অনেক কটা যেন মাংসের ভিতর থেকে বের করা যাবে। সেই মাছটা এবার আনন্দে এবং উত্তেজনায় বিলের ভিতর জল ফুঁড়ে আকশের দিকে লাফিয়ে উঠল। তারপর সেই পাড়ের লোক, যারা পাতিল একা ভেসে যায় বলে হায় হায় করছিল, তারা দেখল বিলের জলে এমন একটা মাছ নয়, যেন হাজার লক্ষ মাছ সেই প্রাচীন বিলের জল ফুঁড়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, নেমে আসছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে মানুষগুলি দেখল অনন্ত জলরাশির ভিতর বড় বড় রাক্ষুসে সব গজার মাছ কুমিরের মতো জলের উপর ভেসে উঠেছে। ওরা যেন সন্তর্পণে সকলকে সাবধান করে দিল—বাপুরা দ্যাখো, আমাদের তামাশা দ্যাখো। আমরা জলের জীব, তাবৎ সুখ আমাদের জলে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বিলের জলে সূর্যের লাল রঙ। আকাশে লাল রঙ। মানুষগুলির মুখে আগুনের মতো উজ্জ্বল এক রঙ। গরিব দুঃখী মানুষেরা অসহায় মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শীত। উত্তরে হাওয়ায় সব শীত এসে এই বিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। জলে ডুবে ডুবে ওদের হাত পা সাদা হয়ে গেছে। ওরা একসঙ্গে সেই হাজার রাক্ষুসে গজার মাছের ডুব দেওয়া এবং কখনও কখনও জল ফুঁড়ে বাতাসের দিকে উঠে যাওয়া দেখছে। এমন হয়। সেই প্রাচীন বৃদ্ধা যার শরীরে প্রায় কোনও বাস ছিল না, যে আগুন জ্বালাবার জন্য ঘাসপাতা সংগ্রহ করছে এবং যে আগুন জ্বালাতে না পারলে, গামছার মতো

জ্যালজ্যালে শাড়িটা শুকিয়ে নিতে না পারলে প্রচণ্ড শীতে এই বিলের পাড়েই মরে পড়ে থাকবে; সে ঘাস পাতায় আগুন জ্বেলে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলছে—কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না, শুধু চোখমুখ দেখলে ধরা যাচ্ছে—যেন বলার ইচ্ছা, হে তোমরা বাপুরা মনুষ্যজাতিগণ দ্যাখো, মাছের খেলা দ্যাখো। আনন্দের দিনে একসঙ্গে ওরা কেমন ঘোরাফেরা করছে দ্যাখো। তোমরা খবর রাখ না মনুষ্যগণ, নোয়া নামক এক নবি জলে নৌকা ভাসিয়েছিলেন। সেই মহাপ্লাবনের দিন স্মরণ কর। এমন সব কথাই বুঝি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছিল বৃদ্ধা কিন্তু এসব বলবার অর্থ কি! জালালি, যার স্বামী আবেদালি, যে গয়না নৌকার মাঝি, যার বিবি এখন জলের নিচে দুই ফেরাস্তার আলোর জন্য প্রতীক্ষা করছে, তার আর মহাপ্লাবনের খবর নিয়ে কী হবে! সুতরাং বৃদ্ধার দিকে কেউ আর তাকাল না। সকলে শীতের ভিতর শুধু আগুনটুকুর জন্য লোভী হয়ে উঠল। সকলে জালালি জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনাটা পর্যন্ত ভুলে গেল সহসা। ওরা নিজেদের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিলের পাড় থেকে ঘাসপাতা এনে শুকনো সব ঘাসপাতা খড়কুটো এবং ঝোপজঙ্গল থেকে ডালপালা এই অগ্নিকুণ্ডে সকলে নিক্ষেপ করতে থাকল। বিলের ভিতর ক্রমে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পাড়ে আগুন মাথার ওপর উঠে গিয়ে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে। কী লেলিহান জিহ্বা! সেই আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ পেয়ে মনে হল সেই সহস্র মাছ বিলের দিকে চলে যাচ্ছে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে তখন বিশাল মানুষ পাগলঠাকুর। তিনি আগুন দেখে শীত নিবারণের জন্য ছুটে গেলেন না। তিনি হাত কচলে শুধু বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। কারণ বিলে মানুষ ডুবে গেল। দুই পদ্মকলির নিচে মানুষ ডুবে গেল। জলে ডুবে শালুক তুলতে গিয়ে মানুষটা আর উঠল না।

শীতের জন্য পাড়ের মানুষেরা আগুনের চার পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিলের সেই পাতিলটা নড়ছে না। বাতাস পড়ে গেছে। দূরে পদ্ম পাতার ভিতর পাতিলটা ভাসতে ভাসতে আটকে গেল নিলের জলে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল বলে ক্রমে জলটা রক্তবর্ণ, ফিকে রক্তিম আভা, ক্রমশ ফিকে হতে হতে একেবারে নীল হয়ে গেল। নীল থেকে সবুজ এবং পরে কালো জল। এখন এই অনন্ত জলরাশি মনে হচ্ছে স্থির। জলে কোনও ফুটকরি ভাসছে না। শীতের ভয়ে মাছগুলি পর্যন্ত নড়তে সাহস পাচ্ছে না। পাগলঠাকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে ফের উচ্চারণ করলেন, গ্যাৎচোরেৎশালা।

মোষের কাটা মুণ্ড তেমনি বিলে পড়ে থাকল! মানুষগুলি যারা কাটা মোষ নিয়ে শীতলক্ষ্যার পাড়ে যাবে তাদের কাছে বুঝি মাথাটা আদৌ লোভনীয় নয়। মাথাটা এখানে ওখানে ফেলে দিতেই হয়। মোষের সব মাংস খাওয়া যায় না। তবু নিতে হয়। প্রসাদ ফেলতে নেই। মাথা নিলে চালডালের পরিমাণটা বাড়ে। সুতরাং এই বিলের ভিতর কাটা মুণ্ড মোষের আগুনের উত্তাপে কান দুটো খাড়া করে দিল। আহা, সেই কখন শীতের ভোরে অবলা কচি মোষটাকে স্নান করানো হয়েছিল, তেল-সিঁদুর মাথায় দিয়ে কচি ঘাস

খেতে দিয়েছিল। গলায় করবী ফুলের মালা। পায়ে রক্তজবার মালা ঠিক নূপুরের মতো। যেন ধর্মক্ষেত্রে কচি মোষের বাচ্চাটা এবার মরণ নাচন নাচবে।

অবলা মোষের এই বাচ্চা শীতের সকালে স্নান করে হাড়িকাঠের পাশে শুয়েছিল। শীতে নড়তে পারছিল না। রাজার মতো তার আপ্যায়ন। ছোট কচিকাঁচা ছেলেরা নূতন জামা-কাপড় পরে, কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়েরা নূতন ফ্রক পরে কচি ঘাস রেখে গেছে সামনে। সারা সকালটায় ওর কত সোহাগ ছিল। বুড়ো বামুনঠাকুরের মাথায় বড় টিকি, টিকিতে রক্তজবা বেঁধে সেই যে এক সের ঘি নিয়ে বসে গেল, আর কিছুতেই ওঠে না। ঘাড়ে গলায় ঘি মেখে মোষের, চবর চবর সে পান চিবুচ্ছিল। ঘাড়ে-গলায় ঘি মেখে মাংসের ভিতরটা নরম করে দিচ্ছিল। যেন খাঁড়া আটকে না যায়। কি প্রাণান্তকর চেষ্টা সফল বলির জন্য। কিন্তু হলে কী হয়, মোষের প্রাণবায়ু গলায় আটকে আছে। সব খেতে বিস্বাদ। ঢাকঢোলের বাজনায়, ধূপধুনোর গন্ধে, চন্দনের গন্ধে, ফুল-বেলপাতার গন্ধে এবং ভয়ঙ্কর শীতে মোষটা বড় নির্জীব ছিল সারাদিন। এখন একটু আগুনের তাপ এসে গায়ে লাগতেই কাটা মুণ্ড কান খাড়া করে দিল। পাগলঠাকুর এইসব দেখে, না হেসে এবং না বলে পারলেন না—-গ্যাংচোরে শালা।

তখন গ্রামে গ্রামে খবর রটে গেল—এ সালেও বিলের জলে মানুষ ডুবেছে। এমন কোনও সাল নেই, বছর যায় না, মানুষ ডুবে না মরে এই জলে। কিংবদন্তীর পাঁচালিকে রক্ষা করে আসছে যেন সুতরাং সর্বত্র খবর—ফাওসার বিলে, যে বিল বিশাল, যে বিলের তল খুঁজে পাওয়া যায় না, মানুষ যে বিলে পড়লে পথ হারিয়ে ফেলে, তেমন বিলে এ সালে আবেদালির বিবি জালালি ডুবে মরল।

টোডারবাগের আবেদালি গয়না নৌকা চালাতে সেই যে বর্ষার দিনে নেমে গেছে আর উঠে আসে নি। জব্বর বাবুর হাটে গেছে। সুতরাং মানুষজন পাঠাতে হয়, না হলে বিল থেকে লাশ তোলা যাবে না। কোথায় কোন জলে ডুবে আছে অথবা কিংবদন্তীর রাক্ষসটা জালালিকে নিয়ে কোথায় ডুব দিয়েছে কে জানে!

বিলের মানুষগুলি আগুন নিভে গেলে যে যার গাঁয়ের দিকে রওনা হল। এখন জ্যোৎস্না নামবে বিলর উপর। সমস্ত বিলটা জ্যোৎস্নায় সারা রাত ডুবে থাকবে, পাতিলটা ভেসে যেতে যেতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যাবে। হাওয়া উঠলে সেই পাহাড়ের মতো কালো বস্তুটা বিলের ভিতর থেকে ফের ভেসে উঠতে পারে। কি বস্তু, কোন জীব, কোথায় এর নিবাস-দৈত্যদানো অথবা অন্য কিছু বোঝা ভার। কেউ কেউ জীবটাকে দেখেছে, এমন একটা প্রচলিত ধারণা আছে অঞ্চলের মানুষদের। বিলের পাড় ধরে হাঁটলেই কথাটা মনে হয়। এত বড় বিল এবং কালো জল দেখে অবিশ্বাস করা যায় না যেন। প্রাচীন বিল—কথিত আছে, নবাব ঈশা খাঁ এই বিলে সোনাই বিবিকে নিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকায় কত রাতের পর রাত কলাগাছিয়ার দুর্গের দিকে মুখ করে বসে থাকতেন। চাঁদ রায়, কেদার রায় কলাগাছিয়ার দুর্গ তছনছ করে দিয়েছে। সোনাইকে উদ্ধারের জন্য জলে জলে

সপ্তডিঙা যায়—সোনাইকে উদ্ধারের জন্য সাতশো মকরমুখী জাহাজ পাল তুলে দিয়েছে। জলে বৃদ্ধ ঈশা খাঁর মুখে লম্বা সাদা দাড়ি ফকির দরবেশের মতো। মাথায় তাঁর সোনার ঝালর, কোমরে অসি আর পিছনে কালো রঙের বোরখার ভিতর প্রতিমার মতো সোনাই, সোনাই বিবি—স্থির অপলক দৃষ্টি সামনে। ওরা বিলের ভিতর আত্মগোপন করে ছিল। এই আত্মগোপনের ছবি কিংবদন্তীর পাঁচালির মতো বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ফলে তামাক খেতে খেতে ফেলু ভাবল, জালালি এখন কিংবদন্তীর দেশে যেফত্ খেতে চলে গেছে। এবার ঈশা খাঁ, সোনাই বিবি, সেই পাহাড়ের মতো দানোটা এবং বিলের হাজার হাজার রাক্ষুসে গজার মাছ ফেরাস্তার অলৌকিক আলোতে জলের নিচে পথ দেখিয়ে নবাববাড়ির অন্দরে নিয়ে যাচ্ছে জালালিকে।

কেবল পাগল ঠাকুরই পাড়ে এখন একা দাঁড়িয়ে। প্রথমে পাতিলটা যে জায়গায় ছিল আর যে জায়গায় জালালি ডুব দিয়েছিল, সেই জায়গাটার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। ডান দিকে কাঁশবন পার হয়ে কিছুটা জলের ভিতর নেমে যেতে হয়। দুটো বড় পদ্মের কলি জল ফুঁড়ে ফুটে উঠেছে এবং ঠিক তার পাশেই জালালি শেষবারের মতো ডুব দিয়ে আর উঠতে পারেনি। পাতিলটা ভেসে ভেসে দূরে সরে গেল বলে আর দেখা গেল না। জ্যোৎস্নায় অদৃশ্য সব। ঠিক পায়ের নিচে শুধু সেই কাটা মুণ্ড। কাটা মুণ্ড পাগল ঠাকুরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিছু বলতে চায় যেন। রক্তবীজের বংশ। যেখানে এক ফোঁটা রক্ত সেখানে সেই রক্তবীজ দৈত্য—হাজার হাজার, লাখে লাখে। রক্তবীজ অসুরের মতো এই মোষের মুণ্ডটা প্রাণ পেয়ে যাচ্ছে। পাগল ঠাকুর বিস্ময়ে দেখছিলেন, দেখতে দেখতে মনে হল মোষের মুণ্ডটা প্রশ্ন করছে, ঠাকুর তুমি কী দেখছ?

পাগল ঠাকুর বললেন, আমি বিলের জ্যোৎস্না দেখছি।

—ঠাকুর তুমি জ্যোৎস্না ছাড়া আর কি দেখতে পাচ্ছ?

—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

—আমি কে?

—তুমি এক অবলা জীব মোষ।

—মোষের বুঝি ঠাকুর প্রাণ থাকে না?

—থাকে।

—তবে তোমরা আমাকে অযথা হত্যা করলে কেন?

—তোমাকে হত্যা করা হয়নি, দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

—দেবতা সে কে?

—দেবতা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আলো দিচ্ছেন, ফুল ফোটাচ্ছেন, সংসারের যাবতীয় পাপ মুছে পুণ্য ঘরে তুলে আনছেন।

—আর কিছু করছে না?

—আরও অনেক কিছু করছেন। জীবের পালন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব তাঁরই হাতে।

—তবে আমি নিমিত্ত মাত্র! ভোগের নিমিত্ত!

—নিমিত্ত মাত্র। ভোগের নিমিত্ত।

মোষটা এবার হেসে উঠল।

পাগল ঠাকুর বললেন, তুমি হাসছ কেন?

—ঠাকুর, তোমার কথা শুনে।

পাগল ঠাকুরকে এবার খুব বিমর্ষ দেখাল। তিনি মোষটার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাকালেই ফের হেসে উঠবে। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন। দুই পদ্মকলির নিচে জালালি ডুবে আছে দেখতে থাকলেন। সামনে শুধু জলরাশি। হাওয়ার জন্য এখন জলে ঢেউ উঠছে। জলের শব্দ ভেসে আসছিল তীরে। দূর থেকে ঢাক-ঢোলের শব্দ তেমনি ভেসে আসছে। কেমন গুমগুম শব্দের মতো মনে হচ্ছে। যেন ঝড় আসছে। অথবা মনে হয় হাজার বছর ধরে সেই রাক্ষস ছুটে আসছে। রাজপুত্রের হাতে পাখি। পাখির ডানা ছিঁড়ে ফেলছে রাজপুত্র। পড়ি-মরি করে সেই হাজার লক্ষ রাক্ষসের দলটা রাজ পুরীর দিকে ছুটে আসছে।

কান পাতলে মনে হয় সেই রাক্ষসেরা অনন্ত কালের গর্ভে পাখির রক্তপানের লোভে ছুটছে। পাখি রাজপুত্রের হাতে। খুশিমতো ডানা পা এবং মুণ্ড ছিঁড়ে দিলেই শেষ। কিন্তু হায়, রাজপুত্র পাথরের, পাখি পাথরের! সুখী রাজপুত্র রাতের বেলায় পাখি হাতে স্বপ্ন দেখতে দেখতে পাথর হয়ে গেছে।

মোষটা বলল, কী ঠাকুর, তাকাচ্ছো না কেন?

পাগল ঠাকুর জবাব দিলেন না।

—ঠাকুর, তুমি সামান্য কাটা মুণ্ডের হাসি সহ্য করতে পার না, আর আমি কী করে খাঁড়ার ঘা সহ্য করেছি বল!

পাগল ঠাকুর বললেন, দ্যাখো তোমাকে বাপু আমি কিছু বলছি না! তুমি আমার পিছনে লাগবে না।

—ঠিক আছে। তবে আমি উড়াল দিলাম। বলে মুণ্ডটা দু' পাশে পলকে দুটো ডানা গজিয়ে নিল, তার পর বিলের ও পর উড়তে থাকল।

—আরে কর কি, কর কি! পাগল ঠাকুর কাটা মুণ্ড ধরতে গেলেন।

কেন আমাকে তোমার ভগবানের চেয়ে খারাপ দেখাচ্ছে এখন! বাদুড়ের মতো দেখাচ্ছে না! অতিকায় বাদুড়ের মতো! বলে মোষের মাথাটা পাগল ঠাকুরের সামনে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে বলল, কেমন লাগে দেখতে! বাদুড়ের মতো লাগছে না! লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে এমন সব বাদুড় ছিল। এখন আর তারা নেই। একদল আরও বড় সরীসৃপ এসে ওদের খেয়ে ফেলল। কিন্তু তারা তোমাদের মতো আর যাই করুক, ধর্মের নামে ভণ্ডামি করেনি। ঈশ্বরের নামে সব অপকর্ম চালায়নি।

কাটা মুণ্ডটার কাণ্ডকারখানা দেখে পাগল ঠাকুর বড় বেশি বিরক্ত হলেন। বড্ড জ্বালাতন করছে মুণ্ডটা, ভালো মানুষ পেলে যা হয়। তিনি পাড় ধরে হাঁটতে থাকলেন— কিন্তু আশ্চর্য, সব সময় সেই মোষের মুণ্ডটা দুটো বড় পাখা নিয়ে ওর চোখের সামনে ঠিক পেণ্ডুলামের মতো ঝুলছে তো ঝুলছেই। কেউ যেন অদৃশ্য এক সুতো দিয়ে মোষের মুণ্ডটাকে আকাশ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। পাগল ঠাকুর হাঁটছেন, মোষের মুণ্ডটা ক্রমশ পিছনে সরে যাচ্ছে। পাগল ঠাকুর পিছনে হাঁটছেন, মোষের মুণ্ডটা এবার এগুচ্ছে। এ তো বিষম জ্বালাতন হল! তিনি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য থেকে মুক্ত হবার জন্য ছুটতে থাকলেন। একবার সামনে, একবার পিছনে। যেন একা একা মাঠে গোল্লাছুট খেলছেন। একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে। পশ্চিমে পুবে যেদিকে গেছেন, মোষের মুণ্ডটা ওঁর চোখের উপর একটা অতিকায় বাদুড় হয়ে ঝুলছে। কখনও মুণ্ডটা হাসছে, কখনও কাঁদছে। কখনও বলছে, শালা মনুষ্যজাতির মতো ইতর জাতি দেখিনি বাপু। খুশিমতো ঈশ্বরের নামে আমাকে দু'টুকরো করে বিলের পাশে ফেলে চলে গেল।

পাগল ঠাকুর যে পাগল ঠাকুর, তাঁর পর্যন্ত ভয় ধরে গেল। তিনি সব ভুলে মাঠময় ছুটে বেড়াতে থাকলেন। এবং সেই এক চিৎকার অতিকায় বাদুড়কে উদ্দেশ করে, গ্যাৎচোরেৎশালা!

সামসুদ্দিন ঢাকা থেকে ফিরেই শুনল, জালালি ডুবে গেছে জলে। গ্রামের কেউ একবার খোঁজ করতে যায়নি পর্যন্ত। সে তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে মাঠে বের হয়ে পড়ল। দু'জন লোককে দু'জায়গায় পাঠিয়ে দিল। একজন আবেদালি এবং অন্যজন জব্বরকে খবর দিতে চলে গেল। সে তার দলবল নিয়ে বিলের পাড়ে পৌঁছাতে বেশ রাত করে ফেলল। ওরা পাড়ে পৌঁছেই দেখল, জ্যোৎস্নার ভিতর মাঠময় কে যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখলে মনে হবে ঘটনাটা আধিভৌতিক। মনে হবে কোনও জিন পরী, ঈশ্বরের ভয়ে পাগলের মতো ছুটে

পালাচ্ছে। সামসুদ্দিন পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। দলের লোকেরা বলল, ভাই সামু, চলি রে। কার কপালে কি আছে কওয়ন যায় না।

সামু এবার চিৎকার করে উঠল, মাঠের ভিতর কে জাগে কও।

উত্তরে এক পরিচিত শব্দ, গ্যাৎচোরেৎশালা। মাঠের ভিতর মনুষ্য জাগে। সকলের প্রাণে এবার জল এসে গেল। পাগল ঠাকুর সাদা জ্যোৎস্নায় এই মাঠের ভিতর ছুটাছুটি করছেন। ভূত প্রেত, দৈত্য-দানোর ভয় ওদের আর থাকল না। সামু চিৎকার করে প্রতিধ্বনি তুলল, বড়কর্তা, আমি সামু! আবেদালির বিবি জালালি জলে ডুইবা গ্যাছে! তারে আমরা তুলতে আইছি।

সুতরাং কিংবদন্তীর ভয়টা ওদের মুহূর্তে উবে গেল। ওরা এবার অলস অথবা মন্থর পায়ে জলের কাছে নেমে গেল। যারা বিলে শামুক তুলতে এসেছিল তাদের দু'একজন সঙ্গে আছে। সামসুদ্দিন তাদের একজনকে নিয়ে বিলের ধারে ধারে ঘুরতে থাকল। কোথায় শেষবার ওরা জালালিকে দেখেছে এবং তখন বেলা ক'টা তার একটা আন্দাজ করতে চাইল সামু। হাসিমদের বড় নৌকাটা জলের নিচ থেকে তুলে আনার জন্য কয়েকজন লোক চলে গেছে। নৌকা এলেই জলের ভিতর অন্বেষণে নেমে যাবে। জালালির কাপড় জলে ভেসে থাকতে পারে, ফুলে ফেঁপে জালালি জলের ওপর ভেসে উঠতে পারে।

কিন্তু নৌকা ভাসিয়ে মনজুর যখন এল, যখন জয়নাল গলুইতে লগি বাইছে এবং নৌকার ওপর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন লোক, জ্যোৎস্না রাতে বিলের জলে ঢেউ উঠছে—পদ্ম পাতার উপর কোনও গাঙফড়িঙের শব্দ, রাতনিশুতি হচ্ছে অথবা জালালির কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মনে হল দূরে কি ভেসে যায়! ওরা বিলের ভিতর ঢুকে দেখল সেই পাতিল, পাতিলে কিছু শালুক, শালুকের ওপর চাঁদের আলো মায়াময়। গোটা আট-দশ শালুক সারাদিনে ডুবে ডুবে জালালি সংগ্রহ করেছিল। শালুকের ভিতর একটা বড় ঝিনুক। বড় ঝিনুক জলের তলায় মিলে গেলে স্বপ্ন দেখা—ঝিনুকে যদি মুক্তো থাকে, বোধ হয় জালালি জলের নিচে স্বপ্ন দেখেছিল, বেগম হবার স্বপ্ন। সামসুদ্দিন নুয়ে পাতিলটা পাটাতনে তোলার সময় কাতর গলায় হাঁকল, চাচি, তর রাজ্যে এখন কারা জাগে!

জল থেকে কোনও উত্তর উঠে এল না। সে এবার চারদিকে তাকাল। বিলের পাড়ে একের পর এক ছোট ছোট গ্রাম। গরিব-দুঃখীদের নিবাস। গ্রামে যারা মোল্লা-মৌলবী মানুষ, হাটে তাদের সুতোর অথবা পাটের কারবার আছে। আর আছে হিন্দু মহাজন। এবং হক সাহেবের ঋণসালিশী বোর্ড! মানুষগুলি আত্মরক্ষার কৌশল ধীরে ধীরে জেনে ফেলছে। সে অন্যান্য সকলকে লক্ষ করে বলল, তবে দ্যাখছি পাওয়া গ্যাল না।

কেউ কোনও শব্দ করল না। করলেই সামু ওদের জলের নিচে ডুব দিতে বলবে। এই শীতে জলে নামলে হিমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ওরা কেমন ইতস্তত করতে থাকলে সামু

বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনারা নৌকায় থাকেন, জলে ডুব দিয়া আমিই খুঁজি। বলে, দলের মানুষেরা যেখানে শেষবার জালালিকে দেখেছে বলেছে, সামু গামছাটা পরে সেখানে ডুব দিল।

বিলে এত মানুষজন দেখেই বুঝি মোষের মুণ্ডটা চোখের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাগল ঠাকুর সামান্য সময় পেলেন ভাববার। তিনি ভাবলেন, এমন কেন হল! সামান্য এক অবলা জীবের এত রোষ! তিনি তাড়াতাড়ি সেই রোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সামুদের নৌকার দিকে হাঁটতে থাকলেন। নৌকাটা জলের উপর এক জায়গায় থেমে আছে। এবং একজন মানুষ একা জলে সাঁতার কাটছে। জলে ডুব দিচ্ছে। ভয়-ভীতির তোয়াক্কা করছে না! এতগুলো মানুষ নৌকার উপর দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। আর একটা মানুষ দামের ভিতর শীতের রাতে আটকে পড়বে? কে এমন অবিবেচক মানুষ! পাগল ঠাকুর প্রায় জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জালালি যেখানে ডুবেছে তার চেয়ে অনেক দূরে ওরা খোঁজাখুঁজি করছে। সামুর এই অনর্থক পরিশ্রমের জন্য পাগল ঠাকুর রুষ্ট হচ্ছিলেন। তা'ছাড়া একা একা মাঠে হাঁটলে ফের মোষের কবলে পড়ে যাবেন ভেবে পাড়ে দাঁড়িয়ে তালি বাজালেন। যেন তোমরা আমায় নৌকায় তুলে নাও এমন বলার ইচ্ছা।

মনজুর পাটাতনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, তালি বাজায় কোন্ মাইনষে?

উত্তর নেই। কেবল কে অনবরত বিলের পাড়ে তালি বাজাচ্ছেন। ওর বুঝতে এবার আদৌ কষ্ট হল না, ঠাকুরবাড়ির পাগল ঠাকুর তালি বাজাচ্ছেন। নৌকায় ওঠার জন্য তালি বাজাচ্ছেন। মনজুর এবার চিৎকার করে বলল, যাইতাছি কর্তা, খাড়ান।

নৌকা পাড়ের কাছে গেলে কোথায় পাগল ঠাকুর নৌকায় উঠে আসবেন—তা না, জলে ঝাঁপ দিয়ে সেই দুই পদ্মকলির দিকে ছুটে যেতে থাকলেন। পাগল মানুষের শীত গ্রীষ্ম সব সমান। মানুষটা বুঝি পুরোপুরি ক্ষেপে গেছে। তিনি সকলকে পিছনে ফেলে দুই পদ্মকলির উদ্দেশে একটা বড় সাদা রাজহাঁসের বেগে চলে যেতে থাকলেন। দশাসই মানুষ, তল্লাটে এমন খুঁজে পাওয়া ভার। যেমন লম্বা তেমনি অসীম শক্তির ধারক মানুষটি। সকল কিংবদন্তীর দৈত্যদানোকে কলা দেখিয়ে দুই পদ্মকলির ভেতরে ডুবে গেলেন। দাম, লতাপাতা, পদ্মের লতা ছিঁড়ে ফুঁড়ে জালালির জীর্ণ লাশটাকে টেনে বের করে ফেললেন। তারপর চুল ধরে জলের ওপর ভেসে সাঁতরাতে থাকলেন। তীরের বেগে সাঁতার কাটছেন। মানুষগুলি ভয়ে বিস্ময়ে রা করতে পারছে না। ঠিক এক পীর দরগার পীর পাগল মানুষ যেন। সকলকে বিস্মিত করে শরীরটা কাঁধে ফেলে জল ভেঙে উপরে উঠে গেলেন তিনি। কোনওদিকে তাকালেন না। কাঁধে মৃতদেহ, সামনে ফসলবিহীন মাঠ, আকাশে কিছু নক্ষত্র রুলছিল, আর দূরে তেমনি ঢাকের বাদ্যি বাজছে। পাগল ঠাকুরের সহসা মনে হল তিনি জালালিকে নিয়ে হাঁটছেন না। যেন সেই ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ, দুর্গের মাথায় কবুতর উড়ছে এবং র‍্যামপার্টে ব্যাণ্ড বাজছিল! এখন ঢাকের বাদ্যি শুনে সেসব মনে করতে পারছেন। কাঁধে তাঁর জালালি নয়, যুবতী পলিন। পলিনকে নিয়ে হাঁটছেন। এটা

ফসলবিহীন মাঠ নয়, এটা যেন সেই র‍্যামপার্ট। পাশে দুর্গ। একদল ইংরেজ সৈন্যের কুচকাওয়াজের শব্দ, ওরা পিছন থেকে পলিনকে কেড়ে নেবার জন্য ছুটে আসছে। পাগল ঠাকুর এই ভেবে ছুটতে থাকলেন।

ওরা দেখল মাঠের ওপর দিয়ে তিনি ছুটে যাচ্ছেন। পাগল মানুষ তিনি, কোনদিকে চলে যাবেন জালালিকে নিয়ে কে জানে! তা ছাড়া তিনি বিধর্মী মানুষ। সেই মানুষের কাঁধে মৃত জালালি। ওরা ছুটতে থাকল। মৃত জালালিকে নিয়ে অন্য কোনও মাঠে অথবা নদীর ওপারে চলে গেলে ইসলামের গুনাহগার হতে তবে আর বাকি থাকবে না। এখন জালালিকে ধর্মমতে আবেদালি পর্যন্ত দেখতে পাবে না। আর কিনা এই পাগল মানুষ বিধর্মী মানুষ সব পিছনে ফেলে মাঠ ধরে ছুটছেন! ওরা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মাঠের মাঝখানে পাগল ঠাকুরকে ঘিরে ফেলল। ধীরে ধীরে ওরা পাগল ঠাকুরের নিকটবর্তী হতে থাকল। ওরা বুঝতে দিচ্ছে না জালালিকে কাঁধ থেকে তুলে নেবার জন্য ওরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। ওদের এই কৌশল ধরে ফেলতে পারলে তিনি ফের ছুটবেন। যেমন এক হেমন্তের বিকেলে মুড়াপাড়ার হাতি নিয়ে মাঠে ঘাটে বের হয়ে পড়েছিলেন।

ওরা ওকে ঘিরে ফেলে চারদিকে সতর্ক নজর রাখল। সামু কাছে গিয়ে বলল, চাচিরে দ্যান।

অদ্ভুত ব্যাপার। একেবারে ভালোমানুষ তিনি। খুব ধীরে ধীরে, যেন রুগণ অসুস্থ মানুষকে কাঁধ থেকে নামাচ্ছেন। ধীরে ধীরে তিনি জালালিকে শুইয়ে দিলেন। শুইয়ে দেবার সময় গল গল করে ভিতর থেকে জল উগলে দিল জালালি। শরীরটা সাদা ফ্যাকাসে। চোখের মণি দুটো স্থির। অপলক তাকিয়ে সকলকে দেখছে। ডুরে শাড়িটা আলগা হয়ে গেছে। সামু কাপড়টা খুলে জলটা চিপে ফেলে দিল। তারপর শাড়িটা দিয়ে লাশটা ঢেকে দিল। তারপর জালালির সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, কে এই লাশ বহন করে নেবার অধিকারী —যারা পুত্রবৎ তারাই শুধু লাশ বহন করে নিয়ে যেতে পারবে এইসব ভেবে সে চার-পাঁচজন মানুষকে লাশটা বেঁধে ফেলতে বলল। একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে যেমন কাটা মোষ নিয়ে মানুষেরা গিয়েছিল, জয় যজ্ঞেশ্বর কি জয় বলে জয়ধ্বনি করছিল, তেমনি ওরা আল্লা রহমানে রহিম বলে চলে যাচ্ছিল মাঠ ধরে!

আবেদালির বিবি শালুক তুলতে এসে জলে ডুবে মরে গেল। কিংবদন্তীর দেশে জালালি শহীদ হয়ে গেল। এই নিয়ে ফের একটা সাল উত্তেজনা থাকবে—যেমন রসো এবং বুড়ি সেই কোন এক সালে জলে ডুবে মরেছিল, কেউ টের পায়নি, হেমন্তের কোন অপরাহ্নে কঙ্কাল আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছে অঞ্চলের মানুষেরা। তারপর সব গালগল্প। অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা যখন রাত হয়, যখন কেউ জেগে থাকে না, তখন অঞ্চলের এইসব খালবিল শ্মশানের অথবা কবরখানার অলৌকিক ঘটনা নিয়ে তারা ডুবে থাকে। এমন একটা বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে।

ওরা যত এগুচ্ছিল ততই ঢাক এবং ঢোলের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সারারাত ঢাক ঢোল বাজবে। হ্যাজাকের আলো এখন মাঠময় আর মাঝে মাঝে বাজি পুড়ছে। হাউই উড়ছে আকাশে। মালতীর চোখে ঘুম আসছিল না। পার্বণের খাওয়া চালকলা, তিলাকদমা ফুলেফলে ভরা। তার পর খিচুড়ি পায়েস। বড়বৌ আলাদা ডেকে আবার পায়েস খেতে দিয়েছিল মালতীকে।

মালতী লেপ কাঁথার ভিতর শুয়ে জানালা দিয়ে মাঠের জ্যোৎস্না দেখছিল। বাস্তুপূজার দিনে জ্যোৎস্না বড় রহস্যময়। ঠিক যেন কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। বাজি, আতসবাজি আর নাড়ু মোয়া। খেতে খেতে আকণ্ঠ। এই জ্যোৎস্নায় বিলের জলে জালালি ডুবে আছে। কথাটা ভাবতেই মালতীর কেমন দম বন্ধ ভাব হচ্ছে। সে উঠে বসল। ওরা এখনও আসেনি। এলে গোপাটে ওদের কথাবার্তা থেকে টের পাওয়া যেত জালালিকে খুঁজে পাওয়া গেছে কিনা!

মালতী অনেক চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারল না লেপ-কাঁথা গায়ে জড়িয়ে কেমন চুপচাপ উদাস ভঙ্গিতে জানালার কাছে বসে থাকল। সারাদিন শরীরে খুবই ধকল গেছে। নৈবেদ্য সাজাবার জন্য পেতলের হাঁড়ি মেজে সাফসোফ করেছে। নরেন দাসের নানারকম বাতিক। এই বাস্তু পূজা জমির জন্য, ফসলের জন্য। প্রাণের চেয়ে মূল্যবান ফসল। সুতরাং কোথাও ত্রুটি থাকলে রক্ষা নেই। বিষয়ী মানুষ নরেন দাস অমূল্যকে পর্যন্ত ছুটি দিয়েছে এই দিনে। মালতী সেই কোন ভোর থেকে দুধের বাসন, পেতলের হাঁড়ি মেজে সাফসোফ করেছে। তার পর সারাদিন মাঠ আর বাড়ি। বাস্তু পুজা মাঠে হয়। মাঠে সব টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে। আবার মাঠ থেকে টেনে বাড়িতে তুলতে হয়েছে। প্রায় এক হাতে সব কাজ, শোভা আবু সামান্য সাহায্য করেছে। অমূল্য দুপুর পর্যন্ত ছিল, তারপর সে বাড়ি চলে গেছে। ফলে মালতী সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্বাস ফেলার সময় পায়নি। তাড়াতাড়ি সেজন্য হাত পা ধুয়ে শুয়ে পড়েছে ঘুমোবে বলে। কিন্তু হায় কপাল, ঘুম আসে না চোখে। কিসের আশায় কি যেন কেবল বুকে বাজে। মনে হয় এই জ্যোৎস্না রাতে চুপচাপ মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকতে। পাশে এক ভালোবাসার মানুষ থাকবে শুধু। ওর প্রিয় সেই স্বার্থপর দৈত্যটির কথা মনে হল।

দৈত্যটি তার সারাদিন মাঠে মাঠে প্রসাদ খেয়ে বেড়িয়েছে—একবার মালতীর পূজা দেখতে এল না। সে, সরকারদের বাস্তুপূজা দেখতে ওর জমির পাশ দিয়ে চলে গেল অথচ ওর এমন নিয়মনিষ্ঠার পূজা দেখে গেল না। ভিতর ভিতরে ক্ষোভে মরে যাচ্ছিল। যেন মানুষটার ওপর রাগ করেই সে সারাদিন ক্রমান্বয়ে কাজ করেছে। এই ক্ষোভের জ্বালা ভয়ঙ্কর। সে ভিতরে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। মানুষটার বড় বেশি গরিমা মনে মনে। দেশের কাজ করে বেড়ায় বলে অহঙ্কারে পা পড়ে না।

জোৎস্নায় মাঠ এখন ভেসে যাচ্ছে। গাছগাছালি সব সাদা হয়ে গেছে। এতটুকু অন্ধকার নেই কোথাও। এমন জ্যোৎস্না যেন কতকাল ওঠেনি। এমন জ্যোৎস্নায় ঘুম আসে

না চোখে।

মালতীর প্রথম মনে হয়েছিল বেশি খাওয়ার জন্য ভিতরটা হাঁসফাস করছে এবং ঘুম আসছে না চোখে। ক্ষোভে অভিমানে ঘুম আসছে না, অথবা মানুষটাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফলে জ্বালা ভিতরে, বুকের ভিতর কী এক ভীষণ জ্বালা। মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠছে। বুঝি সে এল। চুপিচুপি ওর জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু না, কেউ এল না। কেউ আসবে না। শুধু একা জেগে বসে থাকা। মালতী ফের শুয়ে পড়ল। জ্যোৎস্নায় মাঠ আদিগন্ত ভেসে যাচ্ছে। ওর মুখে জ্যোৎস্নার লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ছে। সে নিজের ঘাড় গলা ছুঁয়ে দেখল। কি মসৃণ ত্বক, কী মনোরম এই শরীর। সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছে। সে রঞ্জিতকে ভুলে থাকার জন্য স্বামীর স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করল। স্বামীর সঙ্গে সহবাসের দৃশ্য ভাববার চেষ্টা করল—যদি মনের ভিতর তার অস্থির ভাবটা কাটে। কিন্তু সেই পুরানো দৃশ্য, একঘেয়ে দৃশ্য নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। পুরানো সহবাসের দৃশ্য কোনও আর উত্তেজনার জন্ম দেয় না। সে মনে মনে ভাবল, না কোথাও আর জ্যোৎস্না নেই। সে লে পটা গোটা মাথায় মুখে ছড়িয়ে দিয়ে ভিতরটা অন্ধকার করে দিল। এখন শুধু মালতীর চারপাশে অন্ধকার। সব স্বপ্ন শহরের দাঙ্গা শেষ করে দিয়েছে। নূতন করে স্বপ্ন দেখলে পাপ। মালতী এই পাপের ভয়ে লেপের নিচে মুখ লুকিয়ে ফেলল, অন্ধকারে নিজে নিজে পাপ করে বেড়ালে কে আর টের পাবে। স্বামীর মুখ যখন কিছুতেই মনে আসছে না, পুরানো সহবাসের ছবি যখন চোখের উপর ক্যালেণ্ডারের পাতার মতো নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে গেছে তখন অন্ধকারে সরু সুন্দর আঙুলের স্পর্শ শরীরে রোমাঞ্চ এনে দিচ্ছে। আঙুলগুলো শরীরের ভিতর নানারকম পাপ কাজ করে বেড়াচ্ছে, শরীরে আবেশ এনে দিচ্ছিল। সতী সাবিত্রীর মতো পুণ্যবতী না হয়ে মনে মনে অন্ধকারের ভিতর রঞ্জিত নামক এক যুবকের স্মৃতিভারে আপন শরীরের ভিতর পাপকে অন্বেষণ করে বেড়াল—গোপনে এই পাপকার্য বড় ভালো লাগে। প্রাণের চেয়েও আপন মনে হয়। আহত সাপ মরে যাবার আগে শরীর যেমন গুটিয়ে আনে আবার সবটা ছেড়ে দেয় এবং এক সময় সোজা লম্বা হয়ে পড়ে থাকে, তেমনি মালতী শরীর ক্রমে গুটিয়ে আনছে এবং সহসা শরীর ছেড়ে দিচ্ছিল। তুলে দিচ্ছিল। তার এখন অসহায় আর্তনাদ এই শরীরের ভিতরে। কী যেন নেই পৃথিবীতে, কী যেন তার হারিয়ে গেছে। সারা শরীরে এখন তার ভালোবাসার অনুসন্ধান চলছে শুধু। কত আপন আর কত প্রিয় অনুসন্ধান। হায়, মানুষের অন্তরে এই ভালোবাসার ইচ্ছা কী করে হয়, কোন অন্ধকার থেকে সে উঁকি মারে, কখন সে সব পাপ-পুণ্য বিসর্জন দিয়ে মরমিয়া সন্ন্যাসিনীর মতো পাগল-পারা হয় কেউ বলতে পারে না। মালতী ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল। বুঝি সেই এক বাউল শরীরে নৃত্য-গীত বাজায়, আমারে বাজাও তুমি রসের অঙ্গুলি দিয়া। তারপর কোড়াপাখির ডাকের মতো শব্দ—ডুব্ ডুব্। মালতী একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল। কিন্তু এ কি! গো পাটে কারা এখন ছোটাছুটি করছে! কে যেন আকাশফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ছে! মালতীর গলা চিনতে কষ্ট হল না। জব্বর কাঁদছে। ওর মা শালুক তুলতে গিয়ে ডুবে মরেছে। জব্বর এমনভাবে কবে কাঁদতে শিখল! ঠিক শিশুর মতো আকাশ বিদীর্ণ করে কেঁদে উঠছে—মা মা! মালতী ছুটে সাদা

জ্যোৎস্নায় নেমে গেল। বাঁশে ঝুলিয়ে লাশটা নিয়ে সামু গোপাট ধরে এবার বুঝি উঠে আসবে।

গোপাটের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই জেগে গেল। তা ছাড়া সন্ধ্যার পর থেকে পাড়ার বৌ-ঝিরা কুয়োতলায় অথবা পুকুর পাড়ে, কখনও আতাবেড়ার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মেরেছে—এই বুঝি এল! সামসুদ্দিন যখন তার দলবল নিয়ে গেছে তখন লাশ তুলে আনতে কতক্ষণ! কিন্তু যারা বয়সে প্রাচীন, যারা বিলের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে, তাদের কাছে এটা সামুর পণ্ডশ্রম। ওরা বৈঠকখানায় অথবা উঠোনে এবং গোয়ালের পাশে বসে তামাক খাচ্ছিল। আর বিলের সব অলৌকিক গল্পের ফোয়ারা ছোটাচ্ছিল। প্রতিবেশীদের ছোট ছোট শিশুরা, নাবালকেরা সেইসব প্রাচীন পুরুষদের পাশে বসে দলে দলে গল্প শুনছিল।

ঈশম সোনাকে সেই কিংবদন্তীর গল্প শোনাচ্ছিল।

হেমন্তের এক বিকেলে সোনাবাবু জন্মালেন। ঈশম তরমুজ খেতে তরমুজের লতা পাহারা দিচ্ছিল। তখন সোনালী বালির নদীর চরে কাশফুল ফুটে থাকার কথা। ধান কাটা হয়ে গেছে তখন। সোনাবাবু ম্যাউ ম্যাউ করে বেড়ালের মতো অসুজ ঘরে কাঁদছেন। সোনা ঈশমের কাছে সেই ম্যাউ মাউ কান্নার কথা শুনে বলল, যান! আপনে মিছা কথা কন।

—না গ কর্তা, মিছা কথা কই না। যেন তার বলার ইচ্ছা, সংসারে এমনটা হয় কত। মাথায় পাগড়ি বাইন্দা রওনা দিলাম, ধনকর্তারে খবর দিতে। তারপর বোঝলেন নি কর্তা, রাইত, কি ঘুটঘুইটা আনধাইর। মনে হইল বামুন্দির মাঠের বড় শিমুল গাছটা, মাথায় একটা চেরাগ জ্বালাইয়া আমার দিকে হাঁইটা আইতাছে। কি ডর, কি ডর! বিলের পানিতে মনে হইল কে য্যান আমারে ডুবাইয়া মারতে চায়।

—মারতে চায়! সোনা প্রায় চোখ কপালে তুলে কথাটা বলল।

—হ। কি কমু কর্তা। বিলের লক্ষ্মীরে ত আমরা দেখি নাই কোনদিন। রূপবতী কন্যা—সোনার নাও পবনের বৈঠাতে পানি থ্যাইক্যা ফুস কইরা ভাইসা ওঠে। আনধাইর রাইতে ভাসে না, রাইত ফর্সা হইলে ভাসে। চান্দের আলো থাকলে ভাসে। পূর্ণিমার দিনে সেই নাও দেখলে তাজ্জব। কী সাদা কী সাদা! সেই জলে ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে, বলে গান ধরে দিল ঈশম।

সোনার এই গল্প কেন জানি ভালো লাগছিল না। বিলের অলৌকিক গল্প শুনে ওর ভয় ধরে যাচ্ছে। সেই জলে ডুইবা গেলে আর ভাসে না জলে। এখন কেন জানি বার বার মার কথা মনে আসছিল সোনার। মা বিকেলে বকাবকি করেছেন, তুমি কোনখানে যাও সোনা, কোনখানে থাক ঠিক থাকে না। কোনদিন তুমি জলে ডুইবা মরবা।

সোনার মনে হল মা ঠিকই বলেছেন। বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর সখ বড় বেশি ওর। কবে থেকে এমন অভ্যাস গড়ে উঠেছে সোনা নিজেও জানে না। ছোট মানুষের যা হয় সোনার তাই হল। ভয় ধরে গেল প্রাণে। কোনওদিন সে না বলে না কয়ে মাঠে নেমে যাবে—তারপর সেই বিল, প্রকাণ্ড বিলে নেমে যাবার নেশা, কোনদিন সে জলে ডুবে মরে থাকবে কেউ টের পাবে না। সেজন্য সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, না আর না। আর কোনদিন সে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে না। সে একা অথবা পাগল জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কোথাও চলে যাবে না। গেলে সেই যে গল্প অথবা কিংবদন্তীর পাঁচালি—জলে ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে—সেই জলে অথবা ডাঙায় যেখানেই হোক সে আর একা যাবে না। মা সারাদিন চিন্তা করেন। মার চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখে এখন সে কেমন অতি কর্তব্যপরায়ণ অথবা যেন সদা সত্য কথা বলিবে, যেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প—মায়ের জন্য ঝড় জলের ভিতর অবলীলাক্রমে দামোদর নদী পার হয়ে যাচ্ছেন সোনা এবার ভাবল, সে মায়ের অবাধ্য কোনও দিন হবে না। সেও মায়ের জন্য সব করবে। কেন জানি তার মার কথা মনে হলেই ঈশ্বরচন্দ্রের জননীর কথা মনে হয়। সে কেমন যেন মনে মনে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো আদর্শবাদী সত্যবাদী হতে চাইল। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো সেও মায়ের জন্য সব করবে। মার যা অপছন্দ তা করবে না, যা পছন্দ তা করবে। ঈশম গান করছে তেমনি, ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে।

এখন বড়ঘরে ঠাকুর্দা কাশছেন। ওরা এই উঠোনের পাশে বসে সব শুনতে পেল।

ঈশম একসময় গান থামিয়ে বলল, বোঝলেন নি কর্তা, সাঁজ লা গলেই রাজকন্যা বিলের পানিতে সূর্য হাতে ডুব দ্যায়।

—আর ভাসে না জলে?

—ভাসে। সারা রাইত পানির তলে দুই হাতে সূর্যেরে লইয়া সাঁতার কাটে। কাটতে কাটতে নদী ধইরা সাগরে যায়। সাগরে সাগরে মহাসাগরে। ভোর হইতে না হইতে পুবের আকাশে ভাইস্যা ও ঠে। আসমানে সূর্যটারে টানাইয়া দ্যান রাজকন্যা। তারপর পলকে তিনি অন্তর্ধান করেন।

—কোনখানে তিনি অন্তর্ধান করেন?

—বিলের পানিতে।

—আপনে দ্যাখছেন?

—আমি দ্যাখমু কি গ কর্তা। আপনের মায়রে জিগাইয়েন। পাগল কর্তারে জিগাইতে পারেন।

সোনা ভাবল, হয়তো হবে। এত বড় যখন বিল আর সোনার নাও পবনের বৈঠা যখন রাজকন্যার জিম্মায়, তখন তার নদী ধরে সাগরে পড়তে কতক্ষণ! সাগরে সাগরে কতদূর চলে যায় রাজকন্যা। এখন রাজকন্যা তবে কোন সাগরে আছে—দক্ষিণের না উত্তরের? ওর প্রশ্ন করার ইচ্ছা, কোন সাগরের নিচে এখন রাজকন্যা সাঁতার কাটছে? সূর্য হাতে রাজকন্যা নীল জলের ভিতর সোনালী মাছের মতো মুখে রুপোলী সূর্য নিয়ে কোন জলের নিচে সাঁতার কাটছে? এসবও জানার ইচ্ছা। ঈশম তখন বলছিল, সকাল হইলে রাজকন্যা পূব সাগরে ভাইস্যা ওঠে সূর্যটারে আসমানে টানাইয়া দ্যায়। তার পর রাজকন্যা টুপ কইরা পানির নিচে ডুইবা যায়। সোনা যেন এবার কতদিন পর এই সূর্য ঠাকুরের চালাকিটা ধরে ফেলেছে?

ওর বার বার এক প্রশ্ন ছিল, সূর্য তুমি যাও কোথা? বাবা বলেছেন, সে বড় হলে রহস্য জানতে পারবে। এখন কিন্তু তার কাছে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সূর্য যায় মামার বাড়ি। বিলের নিচে মামা-মামিদের ঘরে যায়।

সোনা চুপচাপ বসেছিল। ঈশম গোয়ালে কি কাজের জন্য উঠে গেল। ঈশম চলে গেলে উঠোনের উপর একা ওর ভয় করতে থাকল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে বড় ঘরে উঠে গেল। ঘরে ঠাকুমা আছেন, ঠাকুরদা তক্তপোশের উ পর কাঁথা বালিশ চারদিকে রেখে বসে আছেন। বড় বড় বালিশ দিয়ে ঠাকুরদাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। বালিশগুলি ওঁর অবলম্বনের মতো কাজ করছিল। মাথার কাছে পিলসুজে বাতি জ্বলছে। রেড়ির তেলের প্রদীপ। নীলচে রঙ এই আলোর। মুখে-চোখে বিদ্যুতের মতো আলোটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুমা সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য ঠাকুরঘরে চলে যাবেন এবার। যতক্ষণ ঠাকুমা ঘরে ছিলেন, সোনা পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করেছে। ঘুরঘুর করার সময়ই ঈশ্বরচন্দ্রের কথা ফের মনে হল। দামোদর নদীর কথা মনে হল। সে আবার ভাবল, মায়ের জন্য সে সব করবে। আর ঘুরেফিরে সেই কথা মনে হল বিলে রাজকন্যা, মাঠে ফতিমা। ফতিমা ওকে ছুঁয়ে দিয়েছে। সে স্নান

করেনি। এসব শুনলে মা রাগ করবেন। মার কঠিন মুখের কথা ভাবতেই ওর প্রায় কান্না পেতে থাকল। মা আজ গরদের শাড়ি পরেছেন, পূজা-পার্বণের দিনে মা সারাদিন গরদ পরে থাকেন। মাকে তখন ভালো মানুষের ঝি মনে হয়। মাকে জলের মতো নির্মল মনে হয়, সাদা শাপলা ফুলের মতো পবিত্র মনে হয়। সুতরাং সেই পবিত্র এবং নির্মল জলের পাশে অশুচি শরীর নিয়ে থাকলে পাপ। সোনা এখন কি করবে ভাবতে পারছিল না। বলবে, ফতিমা আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে! না কিছুই বলবে না—চুপচাপ থেকে যাবে, সে কিছুই স্থির করতে পারছে না। ওর ভিতর থে ভয়ে ভয়ে কেমন শীত উঠে আসছিল, সে দাঁড়াল না। এক দৌড়ে পশ্চিমের ঘরে ঢুকে গেল। কী শীত, কী শীত! কী ঠাণ্ডা, এই ঠাণ্ডায় স্নান করা বড় কষ্ট। সোনা গায়ের চাদরটা আরও ভালোভাবে জড়িয়ে নিল। তারপর মায়ের পাশে বসে পড়ল। ওর স্নান করবার কথা মনে থাকল না। এখন কেবল বিলের সেই রাজকন্যার কথা মনে আসছে। রাজকন্যার মুখে রুপোলী সূর্য। সূর্য মুখে রাজকন্যা একটা মাছের মতো জলের নিচে সাঁতার কাটছে।

উৎসবের দিনে এই ছুটাছুটি সোনাকে খুব ক্লান্ত করেছিল। সে রাতে খেল না পর্যন্ত। তক্তপোশে উঠে সকলের অলক্ষ্যে শুয়ে পড়ল। ওর আজ পড়া নেই। উৎসবের জন্য ছুটি। আজ উঠোনে লাঠিখেলা ছোরাখেলা বন্ধ। লালটু পলটু সেই যে ছোটকাকার সঙ্গে পূজার চরু রান্না করতে গেছে, ফেরেনি। সারা বিকেল সে একা ছিল। বড় জেঠিমা এখনও রান্নাঘরে, রাত্রে আজ কোনও রান্নার কাজ নেই। ঠাকুরদা সামান্য ফল সেদ্ধ খাবেন। ঠাকুরমা গরম দুধ খাবেন। তাঁদের সেই কাজটুকু করতে পারলে মা-জেঠিমার ছুটি। মা এখন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সে এখন একা এই ঘরে। হ্যারিকেনের আলোটা নিবু নিবু। টিনের চাল, চালে কুয়াশা জমেছে। ফোঁটা ফোঁটা জল জমে নিচে পড়ছে। টুপ টাপ শব্দ হচ্ছিল। কান পেতে রয়েছে সোনা। যেন কে বা কারা উপরের কাঠের পাটাতনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সোনা মাকে ডাকতে পারত। তার ভয়ের কথা বলতে পারত। অন্যদিন কোনও ভয় থাকে না, আজ ভয়ের কথা বললে মা বিরক্ত হবেন। সে মাকে ডাকতে সাহস পেল না।

একটা মানুষ জলে ডুবে মরে গেছে আর কাটা মুণ্ড পেটে নিয়ে মোষ যায় মাঠে, দৃশ্যটা মনে পড়তেই সে লেপ দিয়ে মাথা ঢেকে দিল। মনে হল তার শরীরটা অশুচি। সে ফতিমাকে ছুঁয়ে স্নান করেনি। শরীর অশুচি থাকলে অপদেবতা ঘাড়ে চাপতে সময় নেয় না। সে নিজেকে অশরীরী আত্মাদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য লেপ দিয়ে শরীর মুখ ঢেকে দিল। ছোট মানুষ, মনে কত রকমের ভয়, ওর বার-বারই মনে হচ্ছিল ফাঁক পেলেই সেই বিলের অপদেবতাও লেপের ভিতর ঢুকে যাবে। ওকে সুড়সুড়ি দেবে। ওকে হাসিয়ে মেরে ফেলবে অথবা ওর নাকে-মুখে কল্পিত এক ঘ্রাণ দেবে মেখে। মেখে দিলেই সে দাসানুদাস—সেই অপদেবতা তাকে বিলের জলে হেঁটে যেতে বলবে। অপদেবতার পিছনে-পিছনে সে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলেই ডুবে যাবে। ওর ভিতরে-ভিতরে বড় কষ্ট হচ্ছিল। মা-বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে। সে ক্রমে লেপের নিচে গুটিয়ে আসছে। কারা যেন

এখন ঘরটার চারপাশে ফিসফিস করে কথা বলছে। সোনা মনে মনে দেবতাদের নাম স্মরণ করছে। তখন ঘরের আলোটা ক'বার দপদপ করে নিভে গেল। ঘর অন্ধকার। সোনা এবার লেপ থেকে মুখ বার করতেই দেখল জানালায় সাদা জ্যোৎস্না এবং সেখানে যেন কার মুখ। বুঝি জালালি উকি দিয়ে সোনাকে দেখছে। সোনা এবার ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কাটা মোষের গলা নিয়ে জালালি ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

চিৎকার শুনে রান্নাঘর থেকে ধনবৌ ছুটে এসেছে। সোনা বসে থরথর করে কাঁপছিল। জানালায় আঙুল তুলে কি যেন দেখাতে চাইছে। ধনবৌ দেখল, জানালায় এখন শুধু জ্যোৎস্না খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ধনবৌ বলল, চিৎকার দিলি ক্যান!

সে বলল, মানুষ।

—মানুষ কই থাইকা আইব! শুইয়া পড়়।

সোনা এবার ভয়ে কেঁদে ফেলল—মা, আমারে ফতিমা ছুইয়া দিছে।

—আবার সেই মাইয়াটার লগে তুমি গেছ!

সোনা নিজের দোষ ঢেকে বলল, মা, আমি অরে ছুঁই নাই।

ধনবৌ সোনাকে কিছু আর বলল না। সে ঠাকুরঘরের দিকে হাঁটতে থাকল। পরনে গরদের শাড়ি, ফুল-বেলপাতার গন্ধ, চন্দনের গন্ধ শরীরে। মাকে পবিত্র ফুলকুমারী মনে হচ্ছে সোনার। সে মায়ের পিছনে আল্‌গা হয়ে হাঁটছে। অন্ধকার ছিল না। জ্যোৎস্নায় মাঠ-ঘাট ভেসে যাচ্ছে। ঈশম বোধ হয় এতক্ষণে তরমুজ-খেতে পৌঁছে গেছে। রঞ্জিতও বৈঠকখানা ঘরে বসে কি লিখছিল মনোযোগ দিয়ে—সে ক্রমাগত লিখে যাচ্ছে। আর ধনবৌ উঠোন পার হয়ে যাচ্ছে। সোনা প্রথম ভেবেছিল মার যা রাগ-তিনি নিশ্চয়ই ওকে পুকুরে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে হিমের মতো জল, জলে ডুব দিতে বলবেন। সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল।

মা ঠিক শেফালি গাছটার নিচে এসে বললেন, সোনা, তুমি দাঁড়াও।

সোনা দাঁড়াল।

মা পুকুরের দিকে নেমে গেলেন না। ঠাকুরঘরের দরজা খুলে তামার পাত্র থেকে তুলসী পাতা নিলেন, সামান্য চরণামৃত নিলেন। জলটা সোনার শরীরে এবং নিজের মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে হাঁ করতে বললেন সোনাকে। হাঁ করলে তুলসী-পাতাটা সোনার মুখে আলগা করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, খাও। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সোনার, শরীর থেকে তার

সমস্ত ভয় মন্ত্রের মতো উবে গেছে। সে মাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, মা আমি আর একা মাঠে যামু না।

ধনবৌ সোনার কথার জবাব দিল না। তামার পাত্র থেকে গণ্ডুষ করে জল নিল এবং দ্রুত ছুটে গেল ঘরে। ঘরের ভিতর, বিছানায় তক্তপোশে জলটা ছিটিয়ে দেবার সময়ই শুনল, গোপাটে হৈ-চৈ। জব্বর কাঁদছে।

বড়বৌ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে এল। রঞ্জিতও সব ফেলে নেমে এল উঠোনে। ধনবৌ দরজায় শেকল তুলে দিল। এক সঙ্গে ওরা পুকুরপাড়ের দিকে হেঁটে গেল। সোনা পিছনে। সেও সন্তর্পণে ওদের পিছু পিছু পুকুরপাড়ে নেমে গেল।

দীনবন্ধু আর ওর দুই বৌ সুখী দুঃখী এসে দাঁড়াল বকুলতলায়। প্রতাপ চন্দ এসে দাঁড়াল চিলাকোঠার পাশে। ওর তিন স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি অনেক। ওরা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে জালালিকে দেখার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। শ্রীশ চন্দ, অবিনাশ কবিরাজ এবং গৌর সরকারের ছেলে-মেয়ে বাঁশঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়েছিল—দলটা আসছে। কেমন ভৌতিক মনে হচ্ছে সব। জলে ডোবা মানুষ উঠে আসছে। জ্যোৎস্না পর্যন্ত কেমন মরা-মরা, সাদা ফ্যাকাসে। এমন কি এখন হাওয়ায় একটা কলাপাতা নড়লে পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। চুপচাপ। নিঃশব্দ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। সাদা মেঘ থাকলে, হাওয়া থাকলে এবং ঝোপ জঙ্গলে কোন কীট-পতঙ্গ শব্দ করলে বোধহয় ব্যাপারটা এত বেশি ভৌতিক মনে হতো না। এমন কি ঢাকঢোলের বাজনা থেমে গেছে! ভয়ঙ্কর সাদা জ্যোৎস্নায় ওরা দেখল গোপাট ধরে মানুষগুলি উঠে আসছে। সোনা এবার মাকে জড়িয়ে ধরল, কারণ সেই মুখটা, কাটা মোষের মুণ্ড পেটে নিয়ে যেন ফের উঁকি দেবে।

ধনবৌ সোনাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল।

লাশটা বাঁশে বাঁধা। লাশটা ঝুলে-ঝুলে উঠে আসছে। রঞ্জিতও ভাবল একবার ডেকে সামসুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু মাঠের দিকে তাকাতেই মনে হল এখনও উৎসবের ছবি জেগে আছে। একটু পরে অর্থাৎ শেষ রাতের দিকে সরকারদের পুকুর পাড়ে বাজি পোড়ানো হবে। রঞ্জিত ডাকতে সঙ্কোচ বোধ করল।

আর সোনার মনে হল দুপুরের ছবি যায়। কাটা মোষ পেটে মাথা নিয়ে যায়। সব স্পষ্ট নয়, তবু মনে হয় জালালির মাথাটা নিচের দিকে ঝুলে আছে। চুলগুলি শণের মতো খাড়া হয়ে আছে। সোনা ভয়ে এবার মাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু মার কোনও সাড়া-শব্দ পাচ্ছে না। তিনি এই দৃশ্য দেখে কেমন শক্ত হয়ে গেছেন।

সাধারণত এমনি হয় মানুষের। শোকের ছবি দেখলে কষ্ট নামক একটা বোধ সংক্রামিত হতে থাকে ভিতরে। মনে হয় একদিন না একদিন সকলকে সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে। ভুবনময় সাদা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। বড়বৌ অর্জুন গাছটার নিচে। জালালির লাশ নিয়ে ওরা মাঠ পার হয়ে চলে গেল।

তারপরই ওরা সকলে দেখল, সেই মানুষ, কিংবদন্তীর মানুষ গোপাট ধরে রাজার মতো উঠে আসছেন। সাদা জ্যোৎস্নায় পাগল ঠাকুরকে সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে। সোনা দেখল, জ্যাঠামশাই এখন কোনও দিকে তাকাচ্ছেন না। সোজা গোপাট ধরে হেঁটে আসছেন। সামনে এসে পড়তেই বড় জেঠিমা ছুটে গোপাটে নেমে গেলেন। রঞ্জিতও নেমে গেল। জ্যাঠামশাইকে দেখে সোনার সব ভয় উবে গেল। সে ছুটে গিয়ে গোপাটে নেমে ডাকল, জ্যাঠামশাই।

বড়বৌ পথ আগলে আর মানুষটাকে বেশি দূরে যেতে দিল না। সে পাগল মানুষের হাতে হাত রাখল। হাত রাখলে এই মানুষ একেবারে সরল বালক বনে যান। তাঁর খালি পা, হাত-পা ঠাণ্ডা, শীতে মানুষটা আরও সাদা হয়ে গেছে। কাপড় ভিজা। মানুষটার সর্দিকাশি পর্যন্ত হয় না। আর বড়বৌ পারছে না। মানুষটার দিন-দুপুর নেই, কখন কোথায় চলে যান, কখন আসেন ঠিক থাকে না। এত বড় উৎসবের দিনে মানুষটাকে সে আহার করাতে পারেনি। আলাদা করে সব রেখে দিয়েছে—যদি মানুষটা রাতে আসে, যদি মানুষটা ভোরের দিকে ফিরে আসে—সেই আশায় বড়বৌ শ্বেত পাথরের বাটিতে সব কিছু ভাগে ভাগে আলাদা করে রেখেছে।

পাগল ঠাকুর বেশিক্ষণ শক্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। বড়বৌর চোখে সেই এক বিষণ্ণতা। সাদা জ্যোৎস্নায় সেই বিষণ্ণতা নেন আরও তির্যক্। মানুষটা এবার চুপচাপ বড়বৌর হাত ধরে ঘরের দিকে উঠে যেতে থাকলেন। চারদিকে একবার চোখ মেলে তাকালেন, কেন যে বের হয়েছিলেন মনে করতে পারছেন না। কিসের উদ্দেশে এই বের হওয়া। কার স্মৃতির জন্য এমন উতলা হওয়া। কারা ওঁর জীবনের সোনার হরিণটি বেঁধে রেখেছে। কোথায় এমন হেমলক গাছ আছে—যার নিচে এক সোনার হরিণ বাঁধা—কল্পিত সেই সোনার হরিণটি কোন মাঠে—পাগল ঠাকুর ভাবতে-ভাবতে বিচলিত বোধ করলেন। কে সে? যুবতী পলিন কি চাঁদের বুড়ির মতো? অপলক কি তার চোখ! সে কি কোনও ঝরনার পাশে খরগোশের ঘরে বাস করছে! অথবা প্রতিদিন ঝরনার জলে স্নান, যুবতী পলিন হায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে... দুর্গের মাথায় জালালি কবুতর এবং সামনে কত জাহাজ। জাহাজে করে যুবতী এসেছিল এ-দেশে বাপের কাছে। সে জাহাজঘাটায় বাপের সঙ্গে তাকে রিসিভ করতে গেছিল। কিছু কিছু স্মৃতি ফের মনে পড়ছে। স্পষ্ট নয়, ভাসা-ভাসা। যুবতীর মুখে কি অপরূপ লাবণ্য, নীল চোখ। আর ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে প্রতিদিন দুর্গের র‍্যামপার্টে বসত। এসব মনে এলেই কেমন উদাস হয়ে যান। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা মাথার ভিতর। আবার স্মৃতিভ্রষ্ট। যুবতীর চোখ মুখ এবং শরীরের লাবণ্য কেবল পাগল প্রায় মাঠে মাঠে ঘুরিয়ে মারছে তাঁকে। তিনি কিছুতেই সেই নীল চোখ, লাবণ্যভরা মুখ স্মরণ করতে পারলেন না। প্রিয়জনের মুখ এবং স্মৃতি স্মরণ করতে না পারলে যা হয়—রাগে দুঃখে বেদনায় এবং হতাশায় ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠেন। ফলে সেই আক্রোশের চিৎকার, গ্যাংচোরেৎশালা।

রঞ্জিতও দেখল মাঠে সে একা। দূরে ইতস্তত এখনও মাঠের ভেতর হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। মাঠ, বিশাল বিলেন মাঠ, মাঠে আলো—বিশ্বাস-পাড়াতে হ্যাজাকের আলো, সরকারদের পুকুর পাড়ে হ্যাজাকের আলো এবং দু-একজন মানুষ এখনও প্রসাদ পাবার লোভে মাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছে। রঞ্জিত একা-একা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডার ভিতর পায়চারি করল। ওকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বোধহয় মনের ভেতর আখড়ার কাজকর্মগুলি সম্পর্কে সে সমস্যা-পীড়িত। সে সকলের অলক্ষ্যে, প্রায় গোপনে কাজটা চালাচ্ছে—সমিতির এই নির্দেশ। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে ওর লাঠিখেলা, ছোরাখেলার আখড়া সম্পর্কে সামসুদ্দিন এবং তার দলবল ভালোভাবেই জেনে গেছে। ওরা অর্থাৎ এই সব হিন্দুরা নিজেদের সাহসী এবং শক্তিশালী করে তুলছে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত এইসব হচ্ছে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। হিন্দুরা জনসংখ্যায় কম। ওরা কম-বেশি সব মধ্যবিত্ত। এবং নিচু জাতি যারা যেমন নমশূদ্র সম্প্রদায়—তাদের ভিতর এই লাঠিখেলা ছোরাখেলার হুজুগ এসে গেছে। এইসব কারণে পরস্পর নির্ভরতা ক্রমশ কমে আসছিল। ভিন্ন দুই জাতি, ফলে ক্রমশ দুই দিকে ধাবিত হচ্ছে। বোধহয় সমিতির কাছে দীর্ঘ এক চিঠিতে এইসব ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল রঞ্জিত। এবং এই মৃত্যু, জালালির জলে ডুবে মরা প্রায় জীবন-সংগ্রামের জন্য বলা যায়। শালুক তুলতে গিয়ে জালালি পদ্মপাতায় আটকে মরে গেল। বোধহয় রঞ্জিতকে মানুষে-মানুষে এই প্রকট আর্থিক বৈষম্যও পীড়িত করছিল। সে সমিতিকে এইসব লিখেও জানাবে ভাবল।

ঠিক তখনই মনে হল নরেন দাসের জমিতে সাদা কাপড়ে কে এক মানুষ দাড়িয়ে তাকে দূর থেকে দেখছে। রঞ্জিত বুঝল মালতী মাঠে নেমে এসেছে। সে সবার সঙ্গে ফিরে যায়নি। সে ক্রমে সন্তর্পণে এদিকে এগিয়ে আসছে। নিঃসঙ্গ এই মালতীর জন্য ভেতরটা তোল পাড় করে উঠল। সে নিজেকে অর্জুন গাছটার পাশে অদৃশ্য করে রাখল। কিন্তু হায়, কে কাকে লুকায়, কে কাকে অদৃশ্য করে! মালতীর চোখ বড় প্রখর এবং বুকের ভিতর যে সুখ পাখিটা ডাকছিল, দূরে জ্যোৎস্নায় রঞ্জিতকে দেখে সেই সুখপাখি ফের কলবব করতে থাকল। ধিকধিক করে বুকের ভিতরটা জ্বলছে। এমন দিনে কার না ইচ্ছা হয় সামনের দিগন্ত প্রসারিত মাঠে অদৃশ্য হতে! যখন জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎ সংসার ডুবে আছে, কার না ইচ্ছা করে অগাধ সলিলে ডুবে মরতে।

আর কার না ইচ্ছা করে এমন সুপুরুষ দেখলে ভালোবাসতে। বড়বৌ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। টেবিলের ওপর হ্যারিকেন জ্বলছে। পাগল মানুষ এখন প্রায় নগ্ন। বড়বৌ ভিজা কাপড় শরীর থেকে খুলে ফেলল। শ্বেত পাথরের মতো শক্ত অবয়ব। বুকের পেশি এত প্রবল যে মনে হয় একটা বড় হাতি অনায়াসে বুকের ওপর তুলে নাচাতে পারেন। পেটে চর্বি নেই। পাতলা মাংসের ওপর সাদা চামড়া— ঠিক যেন নদীরেখার মতো কোমল লোমশ বুকের পেশি থেকে একটা রেখা নাভি বরাবর নিচে নেমে এক আদিম অরণ্য সৃষ্টি করেছে। বড়বৌ সাদা তোয়ালে দিয়ে শরীরের সব বিন্দু-বিন্দু জলকণা খুব যত্নের সঙ্গে শুষে নিল। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ ঠিক যেন একটা বড় কাঠের পুতুল। কল

লাগানো কাঠের পুতুল। এতটুকু নড়ছে না, এতটুকু অন্যমনস্ক হচ্ছে না—কেবল বড়বৌর সেই বড় বড় চোখ, ভালোবাসার চোখ অপলক দেখছেন। হাত তুলে দিতে বললে হাত তুলে দিচ্ছেন। বসতে বললে বসে পড়ছেন।

উৎসবের দিন। বড়বৌ সব খাদ্যবস্তু ভিন্ন ভিন্ন থালাতে সাজিয়ে রেখেছে। তিনি কিছু খাবেন, কিছু খাবেন না। আবার হয়তো সবটাই খেয়ে ফেলতে পারেন। তারপর আরও খাবার জন্য বড় বৌর হাতটা কামড়ে ধরতে পারেন। দিতে না পারলে সাপ্টে তুলে নেবেন পাঁজাকোলে। এবং ছুটতে থাকবেন মাঠ-ময়দানে। অথবা এই খাটের ওপর নিরন্তর মানুষটা বড়বৌকে ফেলে রেখে, কখনও উলঙ্গ করে দেন, কখনও এক সুন্দর যুবতীর মুখের ঘ্রাণ নেবার মতো মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকেন—কখন যে কি করবেন কেউ বলতে পারে না। সবই প্রায় তাঁর অত্যাচারের শামিল এবং এই অত্যাচারের আশায় বড়বৌ সারা দিনমান অপেক্ষা করে। দিনের শেষে তিনি ফিরে না এলে জানালায় বড়বৌ দূরের মাঠ দেখে। সেই মাঠ দেখতে দেখতে কত রাত শেষ হয়ে যায় তবু পাগল ঠাকুর ফিরে আসেন না। হয়তো তিনি কোনও গাছের নিচে শুয়ে নীল আকাশের গায়ে নক্ষত্র গুণছেন। তখন তাঁর মুখে কত সব কবিতা উচ্চারণ। ভালোবাসার কবিতা শুয়ে শুয়ে নক্ষত্র দেখতেদেখতে উচ্চারণ করেন। কবিতার সেই পঙ্ক্তি সব বড়বৌকে এক নীল চোখ এবং সোনালী চুলের কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর ঠাকুরের উদ্দেশে আবেগে বলার ইচ্ছা, আপনি কেন মানুষটাকে পাগল করে দিলেন বাবা। আপনার ধর্মাধর্ম মানুষটার চেয়ে বড় কেন ভাবলেন। কেন আপনি ওঁকে কলকাতা থেকে তার করে নিয়ে এলেন। জোর করে তাঁকে বিয়ে দিলেন। ঘরে একজন ম্লেচ্ছ বৌ থাকলে, এর চেয়ে কী বড় ক্ষতি হতো আপনার। চোখে জল এসে গেল বড়বৌর।

কাপড় পরবার সময় চোখের জলটা আচ্ছন্ন করে দিল সব কিছু। মণীন্দ্রনাথকে বড় ঝাপসা দেখাচ্ছে এখন। পাট-ভাঙা কাপড় পরাবার সময় বড়বৌ কিছুক্ষণ বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে রাখল। কাঠের পুতুলটা এতটুকু নড়ছে না। যদি তাঁর সামান্য অত্যাচার আরম্ভ হয়, যদি তিনি দু'হাতে জোরজার করে বড়বৌকে উলঙ্গ করে দেন—কিন্তু পাগলঠাকুর আজ এতটুকু উত্তেজিত হলেন না। তিনি যেন এখন সন্ন্যাসীর মতো ফলদানের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করছেন। হাতে বুঝি দণ্ডি দিলে তাই হতো। উৎসবের দিন বলে তসরের জামা গায়ে দেওয়া হল। কোঁকড়ানো চুলে চিরুনী দেওয়া হল। ঠিক যেন বরের সাজে পাগল মানুষ এখন দাঁড়িয়ে আছেন। এমন দৃশ্য বড়বৌ দেখে আবেগে গলে পড়ল। —এমন সুপুরুষ হয় না গো, বলতে বলতে সে প্রায় কেঁদে ফেলল। হাত ধরে এনে বড় বৌ পাগল মানুষটাকে আসনে বসাল। তার পর এক-এক করে উৎসবের ফুল-ফল বাতাসা, তিলাকদমা, পায়েস এবং খিচুড়ি—কত রকমারি খাবার থালার পাশে; বড় বৌ মাঝে-মাঝে এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আজ পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথের কোনও খাবার স্পৃহা দেখা গেল না। তিনি সর নেড়েচেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর নরম বিছানাতে সুন্দর এক রাজপুত্র যেমন শুয়ে থাকে, রুপোর কাঠি সোনার কাঠি যেমন পায়ে মাথায় দিয়ে শুয়ে

থাকে, ঠিক তেমনি শুয়ে থাকলেন মণীন্দ্রনাথ। এতটুকু পাট ভাঙেনি কাপড়ের। গোড়ালি পর্যন্ত টানা কাপড় কোচা সোজা পায়ের কাছে নেমে এসেছে। দু'হাত আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রাখা। তিনি বুকের ওপর হাত রেখে ঘরের কড়িকাঠ গুণছেন। স্থির অপলক দৃষ্টি। পাশে বড়বৌ। বসে আছে তো আছেই। চোখে ঘুম আসছে না। বার বার দু'গালে চুমু খাচ্ছে। জামার নিচে বুকের ভিতর নরম হাতের আঙুল কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল—যদি মানুষটা সোনা রুপোর কাঠির স্পর্শে মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে। না মানুষটা আজ কিছুতেই জাগছে না। এমন উৎসবের দিন বিফলে গেল! সে মানুষটার রোমশ বুক থেকে হাত তুলে নিল এবার। কোনও উত্তেজনা নেই দেখে লেপ গায়ে দিয়ে কাঠের পুতুল বুকে নিয়ে শুয়ে থাকল সারা রাত। কাঠের পুতুলটা ঘুমায় না—কিন্তু কালঘুম বড়বৌর কখন দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে, কখন মণীন্দ্রনাথ ধীরে-ধীরে রাজপুত্রের খোলস ছেড়ে হাঁটু কাপড়ে বের হয়ে যান, বড়বৌ টের পায় না। কালঘুম বড়বৌর সব কিছু হরণ করে নিয়েছে।

তাবুদের ভিতর ততক্ষণে জালালিকে রাখা হয়ে গেছে। মালতী সেই অর্জুন গাছটার উদ্দেশে পা টিপে টিপে হাঁটছে। আর তখন, ফেলু পাড়ে দাঁড়িয়ে জালালির কবর ঠিক মতো খোঁড়া হল কিনা দেখছে।

বিলে তখন গজার মাছটা আপন আস্তানায় ফিরে এসেছে এবং সন্তর্পণে পদ্মলতার ভিতর আজব জীবটাকে দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ে লেজ নাড়ছে। কে চুরি করে নিয়ে গেল — কোথায় কোন জলে আজব জীবটা ভেসে বেড়াচ্ছে! অনুসন্ধানের জন্য গজার মাছটা জলের ওপর পাখনা ভাসিয়ে সাঁতার কাটতে থাকল।

তাবুদের ভিতর জালালির মুখটা সাদা কাপড়ে ঢাকা। নূতন কাপড়ের কফিন দিয়েছেন হাজিসাহেব। হাজিসাহেবের তিন বিবি উষ্ণ জলে গোসল করিয়েছে। সব কাজ-কর্ম ওরাই দেখে-শুনে করছে। চুলে বেণী বেঁধে দিয়েছে, আতর দিয়েছে, চন্দনের গন্ধ দিয়েছে—এখন আর কে বলবে সামান্য গয়না নৌকার মাঝি আবেদালির বিবি জালালি!

তাবুদে জালালি, মসজিদে ইমাম। আল্লার কাছে জালালির জন্য দোয়া চাইছে সবে। তিন সারিতে গ্রামের সব পুরুষ মসজিদের ভিতর দাঁড়িয়ে কান স্পর্শ করে—হে আল্লা, এমন বিরাট বিশ্বময় তোমার অপার মহিমা—আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের আর কি করণীয় আছে, বিশ্বময় সৌরজগতের অপার লীলা তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ, হে আল্লা, যে ঘাস মাঠ ফসল এবং পাখিদের সব কলরব শুনছি, তোমার করুণার কথা কে না জানে—তুমি সকলকে আশ্রয় দাও, তুমি আমাদের এই দুঃখী জালালিকে তোমার অপার মহিমার আশ্রয়ে তুলে নাও—ওরা বোধ হয় ওঁদের দোয়া ভিক্ষার ভিতর এমন কিছুই বলতে চাইছিল।

জ্যোৎস্না রাত, ঢাক-ঢোল বাজছে, ইতস্তত হ্যাজাকের আলো মাঠে ঘাটে এবং তাবুদের ভিতর জালালি মুখ ফিরে শুয়ে আছে। সামসুদ্দিন ইমামের কাজ করছিল।

মসজিদের পাশে আতাফলের গাছ, গাছে রাজ্যের সব পাখির নিবাস, অসময়ে এত লোক দেখে ওরা সকলেই জেগে গেল, কলরব করতে থাকল এবং কিছু আতাফলের পাতা প্রায় ফুলের মতো তাবুদের ও পর ঝরে পড়তে থাকল।

তারপর সকলে মিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লা মোহম্মদ রসুলাল্লা—তাবুদ কাঁধে নিয়ে মানুষগুলি মাঠে যাবার সময় আল্লা এক মহম্মদ তার রসুল, এইসব বলছে। তখনও সরকারদের পুকুর পাড়ে ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে। তখনও মাঠময় জ্যোৎস্না। ওরা লণ্ঠন হাতে, কেউ কুপি হাতে, বোরখা পরে বিবিরা—যাদের নামার কথা নয় কবরে তারা পর্যন্ত দুঃখী মানুষ জালালির জন্য বটগাছের নিচে নেমে এসেছে। গাঁয়ের পুরুষেরা চারপাশে দাঁড়াল। হাজিসাহেব অসুস্থ, তিনি আসতে পারেন নি। অন্যান্য প্রায় সকলে কবরের চারপাশটায় দাঁড়িয়ে আছে। তাবুদ থেকে জালালিকে বের করা হল। একপাশে সামু, জব্বর অন্য পাশে। ওরা নিচে নেমে গেল। ফেলু ডান হাত দিয়ে কাটা বাঁশগুলি সামু কবর থেকে উঠে এলেই সাজিয়ে দেবে। উত্তরের দিকে মাথা এবং দক্ষিণের দিকে পা রেখে জালালিকে শুইয়ে দেওয়া হল। মুখটা ঘুরিয়ে দিল পশ্চিমে-মক্কা মদিনা দেখুক জালালি—এই করে ওরা উপরে উঠে এলে ফেলু এক হাতে কাটা বাঁশগুলি কবরের ওপরে বিছিয়ে দিল, কিছু ইস্তাহার বিছিয়ে বিছিয়ে দিল—তাতে লেখা আছে, মুসলিম লীগ—জিন্দাবাদ। যেন কবরে সাক্ষ্য হিসাবে ওরা ওদের শপথপত্র রেখে দিল। এই শপথপত্র কবরে মাটি ঝুরঝুর করে পড়ে না যাবার জন্য এবং এবং গরিব মুসলমানদের বেঁচে থাকবার উত্তরাধিকারের দৌলতকে কেউ যেন অস্বীকার করতে না পারে অথবা যেন সামুর বলার ইচ্ছা—চাচি, আমরা এই ফসল এবং মাঠ আমাদের জাতভাইদের দিয়ে যাব, আমরা এমন সব সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। ধর্ম আমাদের সকলের ওপরে—রসুল আমাদের মহম্মদ, আল্লা এক—তাঁর কোন শরিক নাই।

সকলেই একটু একটু কবে কবরে মাটি দিল। তারপর সব মাটি কবরের ওপর তুলে দেওয়া হল। চেপে মাটি দিল, মাটির ওপর গোসলের বাকি জল ঢেলে দিল জব্বর। তিনটা জীয়ল গাছ পুঁতে, ওরা পেছনের দিকে তাকাল না, ওরা গ্রামের দিকে উঠে যেতে থাকল। ঠিক ওরা সকলে আড়াই পা গিয়েছে, তক্ষুনি এক অলৌকিক আলো কবরের ভিতরে ঢুকে গেল। ফতিমা বাপের পাশে হাঁটছিল। বাপ তাকে ফেরাস্তার গল্প বলছে। সেই যেন এক কিংবদন্তীর গল্প— বেহেস্তের এক সিঁড়ি পড়ে গেল, আলোর সিঁড়ি। কবরের ভিতর অলৌকিক আলোর প্রভায় জালালি জেগে গেল।

দুই ফেরাস্তা প্রশ্ন করল, তুমি কে?

জালালি বলল, আমি জামিলা খাতুন।

—তোমার ধর্ম কি?

—ধর্ম ইসলাম।

—আল্লা কে?

—আল্লা এক, তাঁর কোন শরিক নাই।

—রসুলের নাম?

—হজরত মহম্মদ।

—এঁকে চেন? বলেই দুই ফেরাস্তা আলো ফেলল মুখে।—কে তিনি?

—হজরত মহম্মদ। জালালি ফের ঘুমের ভিতর যেন ঢলে পড়ল।

জালালিকে দুই ফেরাস্তা কোলে তুলে নিলেন। অলৌকিক আলোয় জালালির শরীর লীন হয়ে গেল। ঠিক যেন এক কিংবদন্তীর সূর্য—যায় যায়, বিলের জলে ডুবে যায়। বিল থেকে নদীতে, নদী থেকে সাগরে, মহাসাগরে শেষে এক সময় রাজকন্যা টুপ করে জলে ভেসে উঠে দুই ডানা মেলে দেয় আকাশে, পুবের আকাশে সূর্য লটকে দিয়ে আবার সাগরের জলে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তখন সোনা মায়ের পাশে শুয়ে একটা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখল। একটা ঘোড়ার দুটো মুখ। ঘোড়াটা অন্ধ। সারকাসের তাঁবু থেকে ঘোড়াটাকে ক্লাউন টেনে বের করে এনেছে। তারপর ফাঁকা মাঠে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল। অন্ধ ঘোড়া এখন একবার পুবে আবার পশ্চিমে ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে এক হতভাগ্য মানুষ—সে একবার পুবে আবার পশ্চিমে ডিগবাজি খাচ্ছে। প্রায় সারকাসের খেলার মতো। দর্শক মাত্র দুজন। সোনা এবং ফতিমা। সোনা এবং ফতিমা এমন মজার খেলা দেখে হাততালি দিতে থাকল। পিছনে পাগল জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ওদের, মাঠে সারকাসের খেলা যেন দেখাতে এনেছেন।

জ্যোৎস্না মরে আসছে, ভোর হতে দেরি নেই। গ্রামের সবাই জালালিকে কবর দিয়ে উঠে যাচ্ছে। বাগের পথে ফেলু দাঁড়াল। সারা মাঠময় কুয়াশার জন্য দৃষ্টি এগুচ্ছে না। ক্রমশ কুয়াশা চরাচর এত আচ্ছন্ন করে দিল যে ফেলু প্রায় নিজেকেই দেখতে পাচ্ছিল না। ভোর রাতের ঠাণ্ডা হাত পা সব বরফ হয়ে যাচ্ছে। আন্নু সবার আগে উঠে গেছে, ঘুমের বাতিক বড় বেশি বিবির। মনজুর উঠে গেল, হাজি সাহেবের বড় বিবি উঠে গেল। জব্বরকে সামু ধরে নিয়ে যাচ্ছ। সামুর বিবি পেছনে পেছনে উঠে আসছে। বোরখা দেখে চেনা যাচ্ছিল সব—কার বিবি, বিবির কি রকমফের, শুধু সেই বোরখাটার চোখে সাদা গুটি সুতার কাজ। জ্যোৎস্নায় সহসা দেখে ফেললে প্রায় ভূত বলে বিভ্রম হতে পারে। সেই বোরখার নিচে যুবতী মাইজলা বিবি। তোর সনে পীরিত আমার ওলো সই ললিতে, ফেলু মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠল। আবার সেই বুকের ভিতর আঁকুপাঁকু শব্দটা হচ্ছে। কাজটা খুব নিমেষে করে ফেলতে হবে। যেন অন্য মানুষ টের না পায়। কুয়াশা এত ঘন যে এক হাত সামনের মানুষটাকে স্পষ্ট দেখা যায় না। অস্পষ্ট কুয়াশার ভিতর সেই বোরখাটা চিনে ঠিক মতো ধরতে না পারলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যাবে। সে শীতে হি হি করে কাঁপছিল।

মাত্র একটা হাত তার সম্বল। জবরদস্ত বিবিকে কাবু করতে কতক্ষণ সময় নেবে! ভাববার সময়ই মনে হল কুয়াশার পর্দার ওপর মাইজলা বিবি ভেসে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে খপ করে সাপটে ধরল এক হাতে। ওর ভিতরে প্রায় যেন এখন অযুত হস্তীর বল। সে মুখে ডান হাতটা চেপে ঠেলতে ঠেলতে ঝোপের ভিতর ফেলে বাঘের মতো হুঙ্কার দিল, রা করবি না বিবি। আমি তর পরাণের ফেলু।

সবার শেষে ঈশমও গ্রামে উঠে যাচ্ছে। উঠে যাবার পথে মনে হল, ঝোপের ভিতর এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড। প্রায় সাপে বাঘে ধস্তাধস্তি হচ্ছে যেন। বোধ হয় মড়ার গন্ধ পেয়ে হাসান পীরের দরগা থেকে শেয়াল উঠে এসেছে। গোসাপও হতে পারে। প্রায় কুমীরের মতো বড় বড় গোসাপ নদীর চরে সে কতদিন ঘুরতে দেখেছে। এখন এই ঝোপের ভিতর কামড়াকামড়ি করছে। ঈশম ভয়ে দ্রুত গ্রামের দিকে ছুটে গেল।

ভোরের স্বপ্ন, যেমন তাজা তেমনি মিষ্টি। আর বোধ হয় প্রথম স্বপ্ন দেখতে শিখল সোনা। স্বপ্ন দেখার পরই ঘুম ভেঙে গেল। সে শুনতে পেল বড় ঘরে ঠাকুরদা ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করছেন। বড় জ্যেঠিমা, ছোট কাকা এই শীতের ভোরে ঠাকুরদাকে উঠোনের ওপর এনে দাঁড় করিয়েছেন।

বৃদ্ধ দীর্ঘদিন পর বায়না ধরেছেন—তিনি আজ সূর্যোদয় দেখবেন। তিনি সেই কবে অন্ধ হয়ে গেছেন—দীর্ঘদিন ঘরের বার হননি, তিনি ঘরে বসেই প্রতিদিন ভোর রাতের দিকে ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করেন—হে ঈশ্বর, তোমার করুণা ফুলে ফলে, ফসলের মাঠে, তুমি করুণাময়।

বৃদ্ধের কথা না রাখলে অনর্থ ঘটবে। সুতরাং ওরা বৃদ্ধের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক কামরাঙা গাছটার নিচে দাঁড়ালে পুবের আকাশ স্পষ্ট। সূর্য উঠবে। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। মসজিদে আজান দিচ্ছে সামসুদ্দিন। মোরগেরা ডাকছে। বড়বৌ পূজার ফুল তুলতে চলে গেছে।

বৃদ্ধ মানুষটি সূর্যোদয় দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কতকাল যেন—কত দীর্ঘকাল যেন সূর্যোদয় দেখেননি, কতকাল তিনি যেন এমন পাখির কলবর শুনতে পাননি। কামরাঙা গাছটার নিচে তিনি সোনা, লালটু, পলটুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সূর্য উঠলেই

বলতে হবে—সুর্যোদয় হচ্ছে। তিনি এই যে সূর্য, আলোর দেবতা, ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর জনে জনে ফুলে ফুলে বিরাজমান—সর্বত্র তিনি, তিনি এক এবং বহু, তিনি সীমাসংখ্যার অতীত, মহাবিশ্বের তিনিই সব—তাঁর সেই আলোর দূতকে স্বাগত জানাবেন।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার সূর্যোদয়ের কথা তাঁকে আর বলতে হল না। তিনি নিজেই যেন টের পাচ্ছেন সূর্য আকাশে উঠে আসছে। কুয়াশার জল কামরাঙা গাছ থেকে টুপটাপ ঝরছিল। লাল নীল পাখির পালক উড়ছিল। ফ্লানেলের জামা গায়ে খড়ম পায়ে বৃদ্ধ মানুষটি সূর্য উঠতেই দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন। মহাবিশ্বে আমরা সামান্য মানুষ। তুমি মানুষের জরাজীর্ণ জীবনকে আলোকিত কর। রোগ-শোক সব হরণ করে নাও।

সূর্যোদয়ে এত রহস্য আছে সোনার জানা ছিল না। সেও ঠাকুরদার দেখাদেখি সূর্যকে প্রণাম করল এবং ঠাকুরদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সূর্যস্তব পাঠ করল।

শচীন্দ্রনাথের অন্য কিছু কাজ ছিল। মাঠে ঈশমকে নিয়ে নেমে যেতে হবে। গৌর সরকার সীমানা ভেঙে দিচ্ছে জমির। এসব দেখার জন্য, আর বোধ হয় ঘটনাটা মামলাবাজ গৌর সরকারকে একটু সমঝে দেবার জন্য তিনি দ্রুত মাঠে নেমে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। উত্তেজনায় রাতে শচীন্দ্রনাথের ঘুম হয়নি, কারণ মাটির মতো ভালোবাসার সামগ্রী আর কি আছে।

সূর্য আকাশে উঠে গেছে। মনে হল বৃদ্ধের এখন আর কোনও অবলম্বনের প্রয়োজন নেই সূর্যের উত্তাপে শরীরের ভিতর প্রাণের আবেগ—সেই যৌবনের মতো অথবা শৈশবের মতো মনে হয়, তিনি এখন একা একা, কেউ কিছু বলে না দিলেও কোথায় কোনদিকে গেলে গোপাট পড়বে, কোনদিকে গেলে পুকুর পাড়ের প্রিয় অর্জুন গাছটা পড়বে এবং নদী আর কতদূর, কতটা মাঠ এগুতে পারলে সোনালী বালির নদীর চর, চরে এখন তরমুজের লতা কত বড়, কত সবুজ সব লতাপাতা তিনি চোখ বুজে বলে দিতে পারেন। তিনি যেন বলতে চাইলেন, শচি, তুমি মাঠে নাইমা যাইতে চাও—যাও, আমার জন্য তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। আমি একলা মানুষ। সংসারে এই তো হয়—স্ত্রী-পুত্র এত, তবু নিজেকে কেবল একা মনে হয়। তিনি শচীন্দ্রনাথকে শুধু বলেছিলেন, সে যেন মাঠে যাবার আগে তাঁর চাঁদির বাঁধানো লাঠিটা দিয়ে যায়। কতকাল আগে, তখন প্রৌঢ় মহেন্দ্রনাথের কি দাপট! তিনি চাঁদির বাঁধানো লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে গ্রাম, মাঠ পার হয়ে চলে গেছেন। সেই মানুষ কতকাল ঘরের বার হননি। প্রায় অথর্ব এখন তিনি। কিন্তু কথা আছে এসালে তিনি দেহরক্ষা করবেন। কুষ্ঠী ঠিকুজি এবং রাশিফল এমনই সব বলছে। শীতকালে বুড়ো মানুষের মৃত্যুভয় অসীম। কার্তিকের টান, বড় টান। কার্তিকের টান বানের জলের মতো। গ্রাম মাঠ সাফ করে বুড়ো মানুষদের নিয়ে যায়। ঠিক সেই সময়ে একদিন তাঁর সন্তান ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিল, বাবা, এবারে চন্দ্রায়ণটা কইরা ফেলি

তিনি পুত্রের ইচ্ছার কথা ধরতে পেরেছিলেন। বয়স হয়েছে। কার্তিকের টানে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন এবং চন্দ্রায়ণ করালে পাপ খণ্ডন হবে। পাপ খণ্ডন

হলেই এই সংসার থেকে মুক্তি। তখন বায়ুতে পঞ্চভূত হয়ে আত্মাটা মিশে যাবে। তিনি ভূপেন্দ্রনাথের কথায় রুষ্ট হয়েছিলেন।—আমার ত যাওয়নের সময় হয় নাই! হইলে টের পামু। তোমাগ ঘণ্টা বাজাইতে হইব না।

আর শীতের মাঝামাঝিতে মনে হল মহেন্দ্রনাথ আবার তাজা হয়ে যাচ্ছেন। এবং কানে যেন ভালো শুনতে পাচ্ছেন। শরীরের জড়তা ক্রমশ উরে যাচ্ছে। এখন তিনি বিছানাতে ওঠা বসা করতে পারেন। হাঁটা চলা করতে পারেন। আর মনে হল তিনি ফের শতবর্ষ বাঁচার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

তিনি এবার তাঁর তিন নাতিকে উদ্দেশ করে বড় কচিকাঁচা বয়স ওদের, তাঁর সন্তানেরা সবই শেষ বয়সের, প্রথম দিকে কোনও সন্তানাদি হবে না বলেই ঠিক ছিল, তিন নাতিকে উদ্দেশ করে কিছু বলতে গিয়ে এমন সব ছবি মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি বললেন, আমার মাঠে নাইমা যাইতে ইচ্ছা হয়। তোমরা আমারে মাঠে নিয়া যাইবা?

এই কথায় তিন নাতিকে বড় উৎফুল্ল দেখাল। ওরা ঠাকুরদার এমন একটা অভিপ্রায় জেনে আনন্দে উৎফুল্ল। এখনও সূর্য উপরে উঠে আসেনি।

পলটুর হাত ধরে মহেন্দ্রনাথ গোপাটে নেমে যাচ্ছেন। লালটু আগে আগে হাঁটছে। সোনা পিছনে পিছনে হাঁটছে! ঠাকুরদার হাতে চাঁদি বাঁধানো লাঠি। লাঠির মুখটা সোনাব্যাঙের মাথা যেন। চোখ বোজা, কান খাড়া, কোনও-কোনও সময় মনে হয় শজারুর মুখের মতো লাঠির মাথাটা হাঁ করা। মহেন্দ্রনাথ লাঠিটা ডান হাতে ভালো করে ধরলেন। তিনি যেন এখন সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন, সেই প্রৌঢ় বয়সের মতো।

কোথাও একটা শ্বেতজবা ফুটে আছে। তিনি বললেন, দ্যাখ ত পলটু, মনে হয় গাছে একটা জবা ফুল ফুইটা আছে।

লালটু বলল, আছে।

লালটু পলটু সোনা অবাক। হ্যাঁ, গাছে মাত্র একটা শ্বেতজবা ফুটে আছে।

সোনা বলল, ঠাকুরদা, স্থলপদ্ম গাছটায় ফুল হইছে।

—অসময়ে ফুল! বলে তিনি পুকুরপাড় ধরে নেমে যাবার সময় বললেন, তরা আমারে তেঁতুল গাছটার নিচে নিয়া আইলি!

ওরা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধ মানুষকে যেমন সবাই ধরাধরি করে পথ পার করে দেয় তেমনি এই তিন নাবালক মহেন্দ্রনাথকে মাঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পুকুরপাড় ধরে হাঁটার সময় তিনি প্রায় এক-এক করে সব গাছের নাম বলে যাচ্ছিলেন। কখন কদবেল গাছ অথবা কখন জামরুল গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছেন, বলে দিতে পারছেন। যেতে যেতে সহসা তিনি থেমে পড়লেন। বললেন, জলে একটা বোয়াল মাছ ভাইসা আছে।

ওরা দেখল, হ্যাঁ, পুকুরের জলে বড় একটা বোয়াল মাছ ভেসে দাম খাচ্ছে। সোনা বলল, দ্যাখি আপনের চোখ দুইটা। বাবায় আইলে কইয়া দিমু, আপনে মিছা কথা কন। চক্ষে দ্যাখতে পান ঠিক। মহেন্দ্রনাথ সোনার কথা শুনে হাসলেন। তিনি পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে মাছের গন্ধ পাচ্ছিলেন, এবার লাঠি ঠুকে ঠুকে জায়গাটাকে চেনার জন্য বললেন, তরা বড় জামগাছটার নিচে নিয়া আইছস্!

তিনজন ওরা এবার একসঙ্গে হেসে উঠল। বলল, ঠাকুরদা কইতে পারল না।

মহেন্দ্রনাথ আরও সামান্য সময় চিন্তা করলেন। কতদিন পর ঘর থেকে বের হয়েছেন, সূর্যোদয় দেখবেন আর নিজের এই বাসভূমি যা তিনি তিলেতিলে অর্জন করেছেন, যে ভালোবাসা তাঁকে এখনও ঈশ্বরের সংসারে ডুবে যেতে দেয় না, সেই জগৎ এত অপরিচিত হয়ে গেল! তিনি এমন ভুল বলে ফেললেন! প্রায় শতবর্ষের অভিজ্ঞতা এই মাটি এবং মানুষ সম্পর্কে—তিনি এই তিন নাবালকের কাছে কিছুতেই হার স্বীকার করতে চাইলেন না। তিনি স্মৃতির ভিতর ডুবে মণি-মাণিক্য অনুসন্ধানের মতো কোথায় কোন গাছের পরে কি গাছ ছিল, কখন কোন গাছ তিনি কেটে ফেলেছেন—সব মনে-মনে অনুসন্ধান করে বেড়ালেন। তেঁতুল গাছটার পর জামরুল গাছের পাতার গন্ধ আসছিল নাকে, তারপর মনে হল রোদ মাথায় মুখে—তবে বড় জামগাছটা হবে ঠিক। কিন্তু নাতিরা তাঁর যেভাবে হেসে উড়িয়ে দিল তাতে তিনি বড় মুষড়ে পড়েছেন। নাকে বড়-বড় শ্বাস টানলেন—যদি নিঃশ্বাসে কোনও অন্য পরিচিত গন্ধ ভেসে আসে। যদি তাঁর জল মাটির জন্য ভালোবাসা তাঁকে ফের অন্তর্যামী করে তোলে।

এবার মহেন্দ্রনাথ বললেন, খেজুর গাছের নিচে আইছি।

নাবালক তিন নাতি আরও জোরে হেসে উঠল। ঠাকুরদাকে নিয়ে এবার তারা খেলায় মেতে গেল। সেই যেন চোর চোর খেলা। ঠাকুরদা অন্ধ। অন্ধ বলেই ওরা ধরে নিল ঠাকুরদার চোখ বাঁধা। ওরা ঠাকুরদার চারপাশে চোর চোর খেলছিল অথবা চোর চোর বলে চিৎকার করছিল—ঠাকুরদা ওদের ছুঁতে পারছেন না। ওরা ঠাকুরদাকে নিয়ে শক্ত খেলায় মেতেছে। ওরা এবার ঠাকুরদাকে সামনের মাঠে নিয়ে যাবে এবং যেতে যেতে বলবে, আপনি কোথায়? ঠাকুরদা বলবেন, আমি খামার বাড়িতে। তারপর ওরা যতদূর হেঁটে যাবে, উত্তরে, দক্ষিণে যেদিকে চোখ যায়—ফের এক প্রশ্ন, আমরা কোথায়? তিনি যেন বলবেন, আমরা ভিটা জমির ওপর। খেলার মতো ঘটনাটা হয়ে গেল। এমন খেলা বুঝি হয় না। ওরা প্রশ্ন করছিল আর বিজ্ঞের মতো ঠাকুরদার দিকে তাকিয়ে উত্তরের প্রত্যাশা করছিল। সোনা কেবল হরিণ শিশুর মতো ঠাকুরদার চারপাশে লাফাচ্ছে। ঠাকুরদা ঠিক বলতে পারলেই আবার টেনে নিয়ে যাওয়া রথের মতো—ওরা এক পুরানো রথ যেন ভালোবাসার পথ ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

জরাজীর্ণ রথটি পথের ওপর অতিকায় এক বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়েছিল। হাতে লাঠি, গায়ে শাল, মাথায় লাল টুপি এবং হাতে শীতের দস্তানা। তিনি গরম মোজা পায়ে

দিয়েছেন, পায়ে সাদা কেডস জুতো—তিনি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন, তাঁর প্রিয় নাবালকেরা কোথায় তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে। তিনি একবার ভাবলেন ডেকে বলবেন, দ্যাখ বৌমারা, তোমার পোলারা আমারে কই লইয়া যাইতাছে। কিন্তু বলতে পারলেন না। কেমন যেন পুকুর পাড়ে নেমে এসে তিনি মজা পেয়ে গেছেন। তিনি চুপচাপ লাঠিটা ঝোপে-জঙ্গলে ঠুকে ঠুকে এগুতে থাকলেন। এক সময় মনে হল লাঠিতে শক্ত একটা কিছু ঠেকছে। এতক্ষণে মনে হল তিনি বড় জামগাছটা কেটে একটা অর্জুন গাছ লাগিয়েছিলেন। ওঁর মুখ চোখ এবার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তোমরা আমারে অর্জুন গাছটার নিচে নিয়া আইছ!

ঠাকুরদা এবার ঠিক বলে ফেলেছেন। সোনা মনে মনে চাইছিল, ঠাকুরদা ঠিক-ঠিক বলে ফেলুক। কারণ তিনি যে ভাবে নিরালম্ব মানুষের মতো এই পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বড়দা মেজদা যে-ভাবে ঠাকুরদাকে হেনস্থা করছে—তাতে ওঁর কষ্টটা কেবল বাড়ছিল। যেই সঠিক বলে ফেলেছেন, যেই তিনি বুঝতে পেরেছেন ওঁকে অন্য পথে পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে নিয়ে আসা হয়েছে এবং মুখে নাবালকের মতোই যখন আর গর্বের অন্ত নেই, তখন সোনা আনন্দে একটা লাফ না দিয়ে থাকতে পারল না; যেন উত্তরটা মহেন্দ্রনাথ দেয়নি, উত্তরটা সোনা দিয়েছে।

ওরা মহেন্দ্রনাথকে আরও টেনে নামাতে চাইলে তিনি বললেন, আমি আর যামু না। আমারে তোমরা ঝোপে-জঙ্গলে নিয়া যাইতে চাও! বান্দরের মতো নাচাইতে চাও! আমি নাচমু না। বলে তিনি অর্জুন গাছটার নিচে বসে পড়লেন। দূর্বাঘাস ছিল কিছু, রোদ এসে পড়েছে কখন। ঘাসে কোনও শিশিরবিন্দু ছিল না। বসে পড়ে তিনি চারধারে কি খুঁজতে থাকলেন।

সোনা বলল, কি খোঁজেন।

—আমারে।

সোনা বুঝতে পারল না কথাটা।

—আমারে খুঁজি। আমারে তোমরা এইখান রাইখা দিয়। তারপর তিনি কি ভেবে চুপ করে গেলেন। হয়তো তাঁর এই তিন নাতি ওঁর এই প্রিয় স্থানটুকুর খবর রাখে না। তিনি মাটির ওপর ফের ভালোবাসার হাত রাখলেন। সব ছেলেদেরই বলে রেখেছেন, তাঁর এই ভালোবাসার মাটিতে তাঁকে যেন দাহ করা হয়। তিনি নিজেই স্থানটি নির্বাচন করে রাখার সময় স্মারক হিসাবে অর্জুন গাছ লাগিয়েছেন।

সূর্যের আলো গাছের মাথায় পড়ায় বেশ উষ্ণ মনে হচ্ছিল চারদিকটা। মাঠে মেলার গরু নেমে যাচ্ছে। কিছু গাছের ছায়া ইতস্তত পুকুরের পাড়ে পাড়ে। বুড়ো মানুষ মহেন্দ্রনাথ পা ছড়িয়ে নাতিদের নিয়ে অর্জন গাছের নিচে বসে রয়েছেন। দেখলে মনে হয় চোখ বুজে

কিছু ভাবছেন। বোধ হয় স্মৃতিতে তাঁর একমাত্র পাগল ছেলের জন্য কষ্ট। তিনি পলটুর মাথায় হাত রেখে বললেন, পড়াশুনা কইর। বাবারে কষ্ট দিয় না।

মাঠে আবেদালির বিবির কবরটা দেখা যাচ্ছে। কবরের পাশে তিনটে জিয়ল গাছ পোঁতা। একটা মোরগ কবরটার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে শীতের সূর্যকে দেখছে। আর এই জালালিকে নিয়ে পাগল ঠাকুর গত রাতে ফিরে এসেছেন। মণীন্দ্রনাথ, বড় ছেলে তার, পাগল ছেলে, সে এখন কোথায় কে জানে!

পলটু কোনও উত্তর করল না। বাপ সম্পর্কে পলটুর একটা অসম্ভব রকমের অবজ্ঞা আছে। সে বাপের সঙ্গে কোথাও যায় না। বরং সোনার সঙ্গে ভাব বেশ। পলটু অন্য কথায় এল। সে বলল, চলেন, ঠাকুরদা, আমরা গোপাটে নাইমা যাই।

মহেন্দ্রনাথ পলটুর কথা শুনেও শুনলেন না। তিনি এখন অন্য কথা ভাবছিলেন। জালালি জলে ডুবে মরেছে। কবরে একটা মোরগ উত্তর-দক্ষিণ ঘুরছে। আর সূর্যের উত্তাপ সমানভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। গতকাল পার্বণের দিন গেছে। পূজার শেষে বলির বাজনা যেন থামছে না। আর অঞ্চলের বয়সী মানুষটি এখন তাঁর প্রিয় মাটিটুকুর উপর বসে আছেন। এখানেই তিনি চিরকালের মতো মহানিদ্রায় মগ্ন হবেন। এখানেই তাঁর দেহ সবাই ধরাধরি করে নিয়ে আসবে— চোখের উপর তিনি দৃশ্যটা ঝুলতে দেখলেন। ছেলেরা চারপাশে ঘিরে থাকবে, গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোক জড়ো হবে—অঞ্চলের মানুষেরা হরিসংকীর্তন করবে, চন্দনের কাঠ পুড়বে, ঘৃত-দধি দুগ্ধ ঢেলে দেওয়া হবে, তার ভিতরে তিনি যজ্ঞের হবির মতো জ্বলতে থাকবেন। এবং তাঁর পাগল ছেলে তখন অর্জুন গাছটায় হেলান দিয়ে জ্বলন্ত মানুষটাকে দেখতে দেখতে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠবে। সহসা এই পাগল পুত্রের মুখ তাঁকে কেমন বিষণ্ন করে দিল। পাগল পুত্র চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন নালিশ—বাবা, আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন। আপনি আমার সব ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছেন। আপনার ধর্মবোধ আমার জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি এক পাগল, আমার চিন্তাশক্তি নাই, আমার পাগল চিন্তার সমভাগী হতে কেউ চায় না —কেবল যেন মনে হয় মাথার ভিতর এক স্বপ্ন নিরালম্ব মানুষের মতো পাক খাচ্ছে, কেবল কে যেন সেই স্বপ্নের ভিতর চলে যেতে থাকে। আপনি সেই মানুষ, আত্মার কাছাকাছি আমার যে যুবতী ছিল. যুবতীর নাম পলিন, উঁচু লম্বা এবং নীল চোখ তার, তাকে আপনি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সমুদ্র আমি দেখিনি বাবা, কিন্তু বসন্তের আকাশ দেখেছি, আকাশের নিচে সোনালী বালির নদীর জল, জলে তার মুখ ভাসে। আকাশের কোনও বড় নক্ষত্র অন্ধকারে জলে প্রতিবিম্ব ফেললে মনে হয়, সেই মেয়ে কত দূরদেশ থেকে ডাকছে, মণি, যাবে না? উইলো ঝোপের পাশে বসে আমরা দুজনে সান্তাক্লজের গল্প করব তুমি যাবে না? আর দেখছি শীতের মাঠে ঘাসে ঘাসে কত শিশিরবিন্দু। শিশিরবিন্দুর মতো সেই পবিত্র মুখ আপনি কেড়ে নিয়েছেন বাবা। নালিশ দিতে দিতে চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে বিদ্বান বুদ্ধিমান পাগল ছেলে হাউহাউ করে কাঁদছে।

মহেন্দ্রনাথ লাঠিটা এবার আরও জোর চেপে ধরলেন। মনের ভিতর কতকাল থেকে অনুশোচনা। মৃত্যুর জন্য যত প্রস্তুত হচ্ছেন তত এই পাগল ছেলের জন্য অনুশোচনা বাড়ছে। তত তিনি নিজেকে অসহায় ভাবছেন। তাঁর কেন জানি মনে হয়, আর দেরি করে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি চন্দ্রায়ণটা করে ফেলতে হয়। দ্বাদশ ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করতে হয়। ব্রাহ্মণ খাইয়ে প্রায়শ্চিত্তটা সেরে ফেললেই—সংসার থেকে চিরদিনের জন্য নির্বাসনের দলিলটা মিলে যাবে। ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ আর সাংসারিক দুঃখবোধে পীড়িত না হলেই যেন ভালো হয়। তিনি পলটুকে বললেন, আমারে ঘরে নিয়া যা। বলে তিনি পলটুর কাঁধে ঘরে ফেরার জন্য হাত রাখলেন।

বস্তুত তিনি নিজের সংসারে ফিরতে চাইলেন। ওরাই যেন তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে পৌঁছে দেবে। যে-ঘর থেকে একদা সূর্যোদয় দেখবেন বলে বের হয়েছিলেন, ঠিক সেই ঘরে। অন্ধকার ঘর, বায়ুশূন্য এবং মাঝে মাঝে ঝিল্লির ডাক শোনা যায়—কেমন নিঃশব্দ এবং নির্জন, পাশে কেউ নেই। সব শূন্য। একটা শূন্যের মতো বায়ুশূন্য ঘরে ফের ফিরে যাওয়া। তিনি চোখ বুজলে তেমন একটা আলোহীন বায়ুহীন ঘরের দৃশ্য দেখতে পান।

কিন্তু দুষ্ট বালকদের মতলব বোঝা দায়। ওরা ওদের ঠাকুরদাকে নিয়ে বেশ রঙ্গ-তামাশা আরম্ভ করে দিল। ওরা ওদের প্রিয় ঠাকুরদাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে থাকল। গোপাট পার হয়ে অশ্বত্থ গাছের নিচটাতে এসে দাঁড়াল তারা। ওরা মহেন্দ্রনাথকে গাছতলায় ছেড়ে দিয়ে বলল, এবারে কন ত কোনখানে আইছেন?

বৃদ্ধ তাদের খুব অনুনয়-বিনয় করতে থাকলেন—কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন ওদের হাতে যখন পড়েছেন, তখন তাঁর হেনস্থার শেষ নেই। ওরা ওঁকে নিয়ে খেলায় মেতে গেছে। ওরা ওঁকে ঝোপে-জঙ্গলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। তিনি প্রায় করজোড়ে বললেন ওদের, সোনাভাই, ধনভাই, বড়ভাই, তোমরা বড় লক্ষ্মী পোলা। তোমরা আমারে ঘরে নিয়া যাও।

সোনা বলল, ঠাকুরদা, ডর নাই। টোডারবাগের বটগাছটার নিচে আইছি। লালটু বলল, আমরা আপনের লগে মাঠ পলান্তি খেলুম। বলেই ওরা মহেন্দ্রনাথকে গাছের নিচে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিল। যেন মহেন্দ্রনাথ ওদের সমবয়সী বন্ধু। তারপর ওরা ছুটে ছুটে বেড়ালো—চিৎকার করে সবাইকে যেন বলতে চাইল—রাজা হুই গাছের নিচে বইসা আছ। রাজারে ছুঁইয়া দিলেই জিত! মহেন্দ্রনাথ এমন খেলায় ঘরের কথা ভুলে গেলেন। গাছের ডালে পাখি, পাখিরা সব কলরব করছে। কোথাও দূরে গরু-বাছুরের ডাক, অনেক দূরে কে যেন কাঠ কাটছে আর অনেক দূর দিয়ে কে যেন হেঁটে চলে যায়। বুঝি সেই পাগল ছেলে। আর মনে হল তাঁর, চারপাশে প্রকৃতির কোলে সেই এক শৈশব ঘুরে ফিরে আসে। তিনি লাঠি কোলে রেখে বসে আছেন। স্থির। প্রায় বুদ্ধমূর্তির মতো চোখ বুজে তিনি বসে আছেন। দূরে সোনালী বালির নদীর জলে নৌকা ভাসে, পাল তোলা নৌকার খুঁটিতে নীল

রঙের পাখি—তিনি বসে বসে সেই শৈশবকে যেন' দেখতে পাচ্ছেন, শৈশব ঘুরে ফিরে চলে আসে, সেই এক নাও নদী ধরে যায়, পাশে সেই এক লাল নীল পাখি উড়ে উড়ে আসে। তাঁর চারপাশে শৈশব এখন খেলা করে বেড়াচ্ছে। তিনি পুরানো শৈশবের প্রতীক। ওরা এখন গান গাইছে মাঠে, লুকোচুরির গান। গ্রামের অন্য সব বালক বালিকা এই খেলায় ভিড়ে গেছে। সুভাষ, কিরণী, কালাপাহাড় এমনকি টোডারবাগ থেকে ছোট্ট ফতিমা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

মহেন্দ্রনাথের চোখে এখন আর পাগল পুত্রের মুখ ভাসছে না। কারণ, সংসারে সুখ সব সময় থাকে না। সংসারে দুঃখও সব সময় ভাসে না। শুধু এক দূরের শৈশব বার বার এই প্রকৃতির কোলে ঘুরে ফিরে চলে আসে। তিনি মনে মনে নিজের সেই হারানো শৈশবকে ফিরে পাবার জন্য গুনগুন করে লুকোচুরি গান গাইতে থাকলেন। শৈশবে বুঝি মাথার উপরের বটবৃক্ষ অত বড় ছিল না। তবু তিনি তাঁর শৈশবের সাঙ্গোপাঙ্গদের গাছের নিচে দেখতে পেলেন। ওরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। এবং তিনি যে গান গাইছিলেন, সেই গান সমস্বরে ওরা গেয়ে চলেছে। কিন্তু সময় বড় সামান্য। কত আর সময় হবে—তাঁর মনে হল সহসা, ওরা কেউ বেঁচে নেই, ওরা এই বটবৃক্ষের নিচে কী করে আর ফিরে আসবে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ভিতর থেকে কে যেন কেবল বলছে, তারা কেউ বেঁচে নেই, একা তুমি পুরী পাহারা দিচ্ছ। যেন এতদিনে ধরতে পারলেন এই গাছপালা পাখির ভিতর তিনি আর কেউ নন। তিনি পরিত্যক্ত মানুষ। সবুজ বনে মৃত বৃক্ষের মতো তিনি জীর্ণ মঠের মতো জায়গা দখল করে আছেন। অথবা জীর্ণ মঠের মতো, মঠ থেকে সন্ন্যাসী পুণ্য করতে তীর্থে বের হয়ে গেছেন। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। একা একা সবার অলক্ষ্যে তিনি নদীর দিকে পাগলের মতো নেমে যেতে থাকলেন।

সোনা-ই প্রথমে চিৎকার উঠল, ঠাকুরদা গাছতলাতে নাই।

ওরা সকলে এত মশগুল ছিল খেলাতে, ঝোপে-জঙ্গলে ওরা এত বেশি ছুটছিল যে, টেরই পায়নি কখন বুড়ো মানুষটা নদীর দিকে নেমে গেছেন। ওরা সবাই এবার গ্রামের দিকে চিৎকার করে বলতে বলতে উঠে আসছে— ঠাকুরদা হারাইয়া গেছে গাছতলাতে নাই, কোনখানে নাই।

ঈশম চরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। চারদিকে তরমুজের লতা। হলুদ রঙের ফুল। বড় বড় লতার ফাঁকে ফাঁকে উটের ডিমের মতো তরমুজ। যেন এক অতিকায় উটপাখি এই বালির চরে ডিম পেড়ে রেখে গেছে। কালো কুচকুচে রঙ। এবার শীত যেতে-না-যেতেই তরমুজে ছেয়ে গেল। মেলায় এবার অনেক তরমুজ যাবে। ছোটঠাকুর ব্যাপারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। তিনি আল নিয়ে মামলা করবেন ভেবে বাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন। পথে ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা। তিনি জমিতে চলে এলেন। এসে তাজ্জব বনে গেলেন। ঈশম ওকে একবারও বলেনি, ফলন এত ভালো হয়েছে। ক'দিনের ভিতর জমিটার চেহারা পাল্টে গেছে। মেলায় যাবে তরমুজ। কাল পরশু থেকে এই পথে অথবা

চরের পাশ দিয়ে বড় বড় ঘোড়া উঠে যাবে। মেলায় ঘোড় দৌড় হবে। সোনালী বালির নদীতে পাল তুলে নৌকা যেতে আরম্ভ করেছে। এ মাসটাই নৌকা চলবে। তারপর জল কমে গেলে পারাপার করতে হাঁটু জল থাকে। ঈশম জমি থেকে এক দুই করে তরমুজ সংগ্রহ করছে।

ঈশম ছুটে যাচ্ছে। পাতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখছে। তারপর টোকা মারছে। ভাসা তরমুজ খেতে স্বাদের হয়। সে টোকা দিয়ে বুঝতে পারে কোন তরমুজ জমি থেকে তুলে নেবার সময় হয়েছে। এক-একটা তরমুজ বিশ-ত্রিশ সের ওজনের। সে একসঙ্গে দুটো তুলে আনতে পারছে না। এমন কি কোনও কোনও তরমুজ সে বুকের কাছে তুলে প্রায় যেন পাঁজাকোলে নিয়ে আসছে। সে ছইয়ের পাশে এক-দুই করে তরমুজ জড়ো করার সময়ই দেখল, এদিকে একটা মানুষ টলতে টলতে নেমে আসছে। কত লোকই আসে! সে ভালো করে লক্ষ করেনি। নিবিষ্ট মনে সে শুধু তরমুজ জড়ো করছে। তার যেন হাতে সময় নেই। সময় চলে যাচ্ছে। সে দূরে দেখল বাতাসে তরমুজের পাতা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, ফাঁক হয়ে গেলেই বড় একটা তরমুজের পিঠ সে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। বাতাস আর নেই। কাছে গিয়ে দেখল বড় বড় পাতা তরমুজটাকে ঢেকে দিয়েছে। সে চারিদিকে চোখ মেলে খুঁজতে থাকল। পাতার ভিতর পড়ে থাকলে টের পাওয়া যায় না। তরমুজ ফেটে নষ্ট হয়ে যায়। সে আর একবার বাতাসের জন্য অপেক্ষা করল। বাতাস উঠলেই পাতার ফাঁকে তরমুজটা সে দেখে ফেলবে—এই ভেবে চোখ তুলতেই দেখল, মানুষটা দু'বার আছাড় খেয়েছে, দু'বার উঠে দাঁড়িয়েছে। টলছে। কে এই মানুষ! শীতের রোদে পাগলের মতো নদীর দিকে নেমে আসছে। সে ভালো করে লক্ষ করতেই বুঝল, আরে এ যে সেই মানুষ, সে ছুটতে

থাকল। নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এত সাহস হল কী করে, চোখে দেখতে পায় না, তাজ্জব। মানুষটা লাঠি ঘুরিয়ে যেন তার যৌবনকাল, যেন বাতাসের সঙ্গে মানুষটা লড়ছে, লাঠি ঘোরাচ্ছে, দ্যাখো, আমি মহেন্দ্রনাথ এখনও কতদূর হেঁটে যেতে পারি, দ্যাখো, আমি মহেন্দ্রনাথ কতকাল এই মাটিতে বসবাস করছি, এখন কিনা আমার পোলারা কয় চন্দ্রায়ণ করেন বাবা। কি সাহস! মানুষটা লাঠি ঘুরিয়ে হাঁটতে গিয়ে বার বার মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছেন। আর একটু হলেই গড়িয়ে গিয়ে নদীর জলে পড়বেন। ঈশম ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধরে ফেলল। তার পর পাঁজাকোলে তুলে নিতেই দেখল, হাত পা ছিঁড়ে গেছে। রক্ত পড়ছে। এমন কেন করছেন তিনি! এখন যেন ঠিক একটা পুতুলের মতো মুখ —মানুষটার, সেই জবরদস্ত চেহারা নেই। একেবারে ছোট মানুষ হয়ে গেছেন। ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদছেন।

—আপনের কি হইছে কর্তা! কোন্ দিকে যাইবেন ঠিক করছেন!

—আমারে তুই কই লইয়া যাইতাছস?

—বাড়ি যাইবেন।

—বাড়ি! বৃদ্ধ এবার চোখ বুজে ফেললেন। তিনি এটা কী করতে যাচ্ছিলেন! তিনি তাঁর বড় ছেলের মতো নিরুদ্দেশে হাঁটছিলেন কেন! মনের ভিতর কিসের এই অনুতা! নিজের ছেলেমানুষীর জন্য কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। —আমারে নামাইয়া দে

—শরীর কি হইছে দ্যাখছেন?

—কি হইছে?

ঈশম ইচ্ছা করেই চুপ করে থাকল। শরীরে রক্ত নেই বোঝা যাচ্ছে। কোনও কোনও জায়গা কেটে গেছে অথচ রক্তপাত হচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি পুকুরপাড়ে উঠলেই সকলে ছুটে এল। সেই বৃদ্ধ মানুষ, আলখাল্লা পরা মানুষ, অঞ্চলের সর্বশেষ মানুষ পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তিনি সকলকে অন্তত এমনই বললেন।

এ-ভাবেই শেষে মেলার দিন এসে গেল। ঘোড়া উঠে আসতে আরম্ভ করল এক দুই করে। গোপাট ধরে বড় বড় ঘোড়া চলে যাচ্ছে। মাসাধিককাল মেলা। শনিবারে ঘৌড়দৌড় হবে। গলায় ঘণ্টা বাজলে মানুষেরা মাঠে নেমে ঘোড়া দেখে, কার ঘোড়া যায়! নয়াপাড়ার ঘোড়া কি বিশ্বাসপাড়ার ঘোড়া! মাঠে ঘোড়ার মুখ ভাসলেই মানুষগুলি ঘোড়া যায় বলে চিৎকার করতে থাকে।

মেলায় যাবে সকলে। রঞ্জিত যাবে, মালতী যাবে। আবু, শোভা যাবে। ছোট ঠাকুর যাবেন। তরমুজ যাবে নৌকায়। এখন নৌকায় তরমুজ বোঝাই হচ্ছে। যাবে না শুধু সোনা। লালটু পলটু পর্যন্ত প্যান্ট জামা পরে ঠিক হয়ে আছে, সূর্য উঠলেই ওরা হাঁটতে শুরু করবে। সোনা যাবে না, কারণ সোনার এতদূর হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। এতদূর যেতে পারবে না।

সোনা বারান্দায় বসে আছে। সে সব কিছু দেখছে এবং মনে মনে অভিমানে ভেঙে পড়ছে! কারও সঙ্গে কথা বলছে না। ছোট কাকা না বললে সে মেলাতে যেতে পারবে না। বাড়ির কেউ সাহস করে কাকাকে বলতে পারছে না। সোনা মাকে সকাল থেকে বায়না করছে, আমি যামু, তুমি ছোট কাকারে কও, আমি যামু। মা পর্যন্ত সাহস পায়নি বলতে। ধনবৌ গতকাল একবার বলেছিল, সোনা যদি মেলায় যায়! ছোটকাকা ধনবৌকে মেলার

ভিড়ের কথা বলেছিল, এতদূর সে যেতে পারবে না হেঁটে, এসব বলেছিল। আর ধনবৌ বলতে সাহস পায়নি।

সোনা থামে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সব কিছু দেখছে, এবং লালটু পলটু পাটভাঙা প্যান্ট জামা পরে ছুটোছুটি করছে, দেখতে পেয়ে ভ্যাক করে কেঁদে দিল। যত সকলের সময় হয়ে যাচ্ছে মাঠে নেমে যাবার, তত সে ভেঙে পড়ল। কারণ শেষ পর্যন্ত আশা ছিল ছোটকাকা তাকে কাঁদতে দেখে মেলায় যেতে বলবে।

ঈশম আসছিল তরমুজ মাথায় করে। সে এত বড় একটা তরমুজ আবিষ্কার করে অবাক। প্রায় এক মণের চেয়ে বেশি ওজন। সে তরমুজটা ব্যাপারীর নৌকায় তুলে দেয়নি। বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সবাইকে কেটে কেটে খেতে বলবে। আর কাটলেই ভিতরে লাল রঙ, কালো বীচি, বসন্তকালে এই তরমুজের রস মিছরির শরবতের মতো। সে উঠোনে উঠেই ডাকল, সোনাবাবু কই গ। দাওটা আনেন।

রঞ্জিত ছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। শোভা আবু এসেছে উঠোনে। মালতী এসেছে। যারা মেলায় যাবে তারা সবাই উঠোনে ভিড় করছে। গাঁয়ের নিচে পথ, পথ ধরে মানুষেরা সার বেঁধে মেলায় যেতে আরম্ভ করছে। সবাই মেলায় যাবে, যাবে না শুধু সোনা। সে ঈশমের ডাক শুনতে পেয়েছে। কিন্তু উঠোনে নেমে গেল না। থামে হেলান দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শুধু।

রঞ্জিতকে বলল ঈশম, দ্যান, কাইটা সকলেরে দ্যান।

ঈশম বড় দুটো কলাপাতা কেটে আনল। প্রথম তরমুজ, ঠাকুরের জন্য কিছুটা আলাদা করে রাখা হয়েছে। বাকিটা রঞ্জিত কেটে সবাইকে দিল। দেবার সময় ঈশম বলল, সোনাবাবু কৈ? তাইনরে দ্যাখতাছি না।

লালটু বলল, সোনা কানতাছে।

—কান্দে ক্যান!

—মেলায় যাইব বইলা।

—আপনেরা যাইবেন, সোনাবাবু যাইব না?

—ছোটকাকায় না করছে।

—না করলেই হইব। বলে সে ভিতরে ঢুকে ডাকল, সোনাবাবু কই! কেডা কইছে আপনে মেলায় যাইবেন না! আমি আপনেরে মেলায় লইয়া যামু। কার সাধ্য আছে না করে দ্যাখি।

ছোট কাকা বললেন, এতদূর হাঁইটা যাইতে পারব না। কে অরে কোলে নিয়া হাঁটব?

—আমি হাঁটমু। চলেন কর্তা।

যেন সহসা আকাশের সব মেঘ কেটে গেল। সোনার কি যেন হারিয়ে গিয়েছিল, সহসা মিলে গেছে। সে মাকে বলল, মা আমারে ছোট কাকায় যাইতে কইছে। ঈশম দাদা আমারে লইয়া যাইব। সোনা ছুটে ছুটে সকলকে বলতে থাকে। ঠাকুমাকে বলল, ঠাকুরদাকে বলল, আমি মেলাতে যামু। ঈশম দাদা আমারে লইয়া যাইবে। মেলায় যাবার নামে সে প্রায় আত্মহারা হয়ে গেল। এ যেন এক জীবন, মেলা, বান্নি, নদীনালা সব মিলে মানুষের প্রাণে এক বন্যা বয়ে আনে। রহস্যটা এতদিনে সোনা জানতে পারবে। মেলাতে কি রহস্য, কারা জাগে মেলাতে, ঘোড়দৌড় হলে বাজি জেতার জন্য সবাই আকুল হয় কেন—এসব মনে হচ্ছিল সোনার। সোনা ঈশমের হাত ধরে সবার আগে আগে মাঠে নেমে গেল। কিছু হেঁটে কিছু কাঁধে চড়ে এবং যখনই সোনা আর হাঁটতে পারছিল না, ঈশম কাঁধে তুলে নিচ্ছে। বেশিদূর যেতে না যেতেই বালিয়া পাড়া পার হলে নদীর পাড়ে সোনা জলছত্র দেখল। তারপর গাছের নিচে, সারি সারি হিজল গাছের নিচে সোনা বিন্নির খৈ এবং লাল বাতাসা দেখল। দু'পয়সার বিন্নির খৈ, এক পয়সার বাতাসা কিনে দিল ঈশম। ছোটকাকা থাকলে কিছুতেই খেতে পারত না, খেতে দিত না। কেউ কেউ আগে উঠে গেছে। সোনা দু'পকেটে বিন্নির খৈ রেখেছে, ঠোঙাতে বাতাসা। সে হাঁটছিল আর বিন্নির খৈ খাচ্ছিল। খেতে খেতেই দেখল বড় মাঠে তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর মাথায় পতাকা উড়ছে। যজ্ঞেশ্বরের মন্দির দেখা যাচ্ছে। অশ্বত্থ গাছ ফুঁড়ে মন্দিরের ত্রিশূল আকাশের দিকে উঠে গেছে। আর সারি সারি ঘোড়া দরগার জমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেউ তালপাতার বাঁশি বাজাচ্ছে। নদীতে কত নৌকা লেগে রয়েছে। ওদের একটা নৌকা আসবে। তরমুজের নৌকা। নদীনালা ঘুরে আসতে সময় লেগে যাবে।

রঞ্জিতের একটা দল আসবে নারায়ণগঞ্জ থেকে। এই মেলাতে দলটা ছোরা খেলা, লাঠি খেলা দেখাবে। ভুজঙ্গ, গোপাল দুদিন আগে মেলায় চলে গেছে। তাঁবু ফেলতে হবে। ছোট ছোট, এই তের চৌদ্দ বছরের মেয়েরা আসবে, সাদা ফ্রক গায়ে, কালো প্যান্ট পরে এবং পায়ে কেডস জুতো। কথা ছিল, বাবুদের কাছারি বাড়িতে ওরা থাকবে। সমিতির নির্দেশে এইসব হচ্ছে। রঞ্জিত এমনভাবে চলাফেরা করছে, দলটার সঙ্গে তার যেন কোনও সম্পর্ক নেই। বরং ভুজঙ্গই সব করছিল।

মালতী ঠিক যজ্ঞেশ্বরের মন্দিরে উঠে যাবার মুখেই দেখল, জব্বর ইস্তাহার বিলি করছে মেলাতে।

সে মালতী দিদিকে দেখে এক গাল হেসে দিল। দিদি, আপনে আইছেন। মালতী দেখল, ওর পাশে অপরিচিত দু' চারজন মুসলমান পুরুষ, মালতী ভয়ে হাসতে পারল না। একবার ইচ্ছা হল জানতে, মেলায় সামু এসেছে কিনা, কিন্তু জব্বরের দু'পাশের লোকগুলি এমনভাবে তাকাচ্ছিল যে, সে কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। নদী থেকে স্নান করে আসতে হবে। কিছু ফুল বেলপাতা তিল তুলসী লাগবে—মালতী সোজা মন্দিরে উঠে গেল।

আর তখনই একটা বাচ্চা ছেলে, ছেলের বয়স আর কত হবে, মেলায় হারিয়ে গিয়েছে। হাতে তার একটা ছোট্ট ছাগশিশু। দিদি গেছে স্নান করতে নদীর ঘাটে। ওকে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে—দিদি আসবে, এলেই মন্দিরে উঠে যাবে।

সংসারে তখন জ্বালা যন্ত্রণার কথা উঠেছে। ভিতরে এক মন আছে মানুষের, পাগলের মতো সেই মন নদী দেখলে কেবল উথালপাথাল করে। মেলায় এমন কত সুন্দরী হিন্দু মেয়েদের ভিড়। স্নান করে উঠে এলে, ভিজে কাপড়ে উঠে এলে, কী যে দেখায়, যুবতী মেয়ের সর্ব অঙ্গে কালসাপ যেন, কেবল দেখলেই ছোবল মারতে ইচ্ছা যায়। স্থির থাকা যায় না।

গোপালদির বাবুদের ছেলেরা গোটা মেলাতে ভলান্টিয়ার দিয়েছে। —ওহে মানব জাতির সন্তানেরা, মিলেমিশে থাক, কুকাজ করলে ধরে বেঁধে নিয়ে যাব। জলছত্র দিয়েছে। কেউ হারিয়ে গেলে তার সন্ধান দিচ্ছে। ব্যাজ পরা বাবুদের ছেলেরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ে দিকে দিকে খবর নিয়ে যাবার সময়ই শুনল, কে কার স্তন টিপে দিয়েছে। যুবককে ধরে ফেলেছে। লুঙ্গি পরা, গলায় গামছা বাঁধা, বগলে পাচনের লাঠি, মাতব্বর মানুষের মতো মেলা দেখতে এসেছিল! লোভে, যখন ভিড়, স্নানের ঘাটে ভিড়, তখন পরিচিত মেয়ের স্তনে হাত দিলে সব গোপন করে রাখবে—কিন্তু হিন্দু নারী, সে তার মানসম্মানের জন্য বোকার মতো হাউহাউ করে কেঁদে দিল। বাবুদের এক ছেলে দেখে ফেলেছে। কড়া নজর সবদিকে। মুঠিতে ধরে পাছায় এক ধাঁই করে লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে মেলায় খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ কিছু বলতে সাহস করছে না। দরগার ঘোড়াগুলি ঘাস খাচ্ছে। বিকেল হলে মাঠে নেমে যাবে। কত বড় প্রশস্ত মাঠ। দূরে দূরে সব লাল নীল নিশান উড়ছে! দুটো একটা ঘোড়া, বোধ হয় মুড়াপাড়ার সুরেশবাবুর ঘোড়াটা এখন ধুধু মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাদা রঙের ঘোড়া তীরবেগে ছুটে আসছিল।

আর তীরবেগে ছুটে যাচ্ছিল জব্বর। সে দেখল তার স্বজাতিকে টেনে বেঁধে নিয়ে কাছারি বাড়িতে তোলা হচ্ছে। কেউ একবার মুখ ফুটে কিছু বলছে না।। তার স্বজাতিরা মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। সে প্রায় যেন যোজন দূরে লাফ মেরে যেতে পারে, তেমনি লাফ দিয়ে ছুটে গেল এবং ভিড়ের ভিতর পড়ে হুংকার দিয়ে উঠল, কই লইয়া যান অরে।

কে একজন বলল, কাছারি বাড়ি।

—হ্যায় কি করছে!

—স্তন টিপা দিছে।

—দিছে ত কি হইছে। বলেই সে ভিড় ঠেলে আরও এগিয়ে গেল। ওর দলটাও এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা সেই যুবকের নাগাল পেল না। একদল ব্যাজ পরা লোক আনোয়ারকে কাছারি বাড়ি তে তুলে নিয়ে গেল। পাছায় লাথি, কিল চড় ঘুষি, হায় আনোয়ার, তোমার মনে যে কি ইচ্ছা, এমন সুন্দর স্তনে, ফোটা পদ্মফুলের মতো স্তনে তুমি

নাকি জলের অতলে স্বপ্ন দেখছিলে—যেন এক রূপালী মাছ ভাইস্যা যায়। তুমি তারে খপ করে ধরতে গেছিলে।

ক্রমে সূর্য নেমে যাচ্ছিল। বড় তাঁবুতে ফরাস পাতা। সেখানে বাবুদের মেয়েরা বসবে। সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার গায়ে। দেবীর মতো মুখ। ঝলমল চোখে ঘোড়দৌড় দেখবে। অথবা নদীতে যে হাজার নৌকা ভেসে রয়েছে—সেই সব নৌকা থেকে দাসদাসী উঠে এলে মেলাময় আনন্দ, দরগা থেকে তখন এক দুই করে ঘোড়া ঠিক এই তাঁবুর নিচে প্রথম নেমে আসবে, বাবুদের প্রথম সেলাম দিয়ে কদম দিতে দিতে মাঠে নেমে যাবে—যেন আমরা এসেছি দূর দেশ থেকে, বাজি জিতে আমরা চলে যাব, আপনারা মেহেরবান লোক, আপনাদের এই মাঠে ঘোড়া ছোটাব। বাজি জিতব। বলে ঘোড়াটার খেলা দেখাতে শুরু করেছিল। এক দুই করে ঘোড়া তার পা তুলে বাবুদের ছোট ছোট মেয়েদের নাচ দেখাচ্ছিল।

তখন মেলাতে দুটো দল। কাছারি বাড়িতে হিন্দু যুবকেরা উঠে গেছে। নিচে মুসলমান যুবকেরা। পুলিশ এসেছে। ওরা বাবুদের সপক্ষে কথা বলছিল। আইন আছে। বিচার আছে। থানায় চালান দেওয়া হবে!

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কাছারি বাড়ি ভেঙে আনোয়ারকে ওরা কেড়ে নিতে গেলে বাবুদের বন্দুক গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নাচছিল দূরে, সেই ঘোড়া ভয় পেয়ে ছুটতে থাকল। যে যেদিকে পারছে ছুটতে থাকল। ঈশম তরমুজ বিক্রি করছিল। সোনা লালটু পলটু সার্কাসের তাঁবুতে বাঘ সিংহের খেলা দেখছে। ব্যাগপাইপ বাজছিল, বাঘটা থাবা চাটছে। উঁচু রিঙে একটি ফুটফুটে মেয়ে খেলা দেখাচ্ছে, তখন সেই বন্দুকের গর্জনে সারা মেলাটায় কিরকম যেন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল।

দুটো লাশ পড়ে গেছে। ক্রমে অন্ধকারে মশালের আলো দেখা যেতে থাকল। কাছারি বাড়িতে বাবুদের মেয়েরা উঠে গেছে। দরগা থেকে সব ঘোড়া এক এক করে নেমে আসছে। সহিসের হাতে মশাল। মেলাময় মশাল জ্বলছে। মাঝে মাঝে আল্লা হো আকবর ধ্বনি উঠছিল। কাছারি বাড়িতে হিন্দুরা প্রাণ রক্ষার্থে চিৎকার করছে, বন্দে মাতরম্।

কে কোথায় ছিটকে পড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। সোনা, লালটু, পলটুকে তাঁবুর ভিতর বসিয়ে দিয়ে ঈশম চলে এসেছিল। সার্কাস ভেঙে গেলে ওরা ঈশমের কাছে চলে আসবে এমন ঠিক ছিল। ঈশম মেলাতে দাঙ্গা বাঁধতেই সার্কাসের তাঁবুর দিকে ছুটে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। লোকজন যে যেদিকে পারছে ছুটছে। সেই ছোট্ট ছাগশিশু এবং বাচ্চাটা কারা চেপ্টে দিয়ে চলে গেছে। দিদির আশায় সে দাঁড়িয়েছিল, দিদি এলেই মন্দিরে উঠে যাবে। যখন ঘটনাটা ঘটে দুপুর হবে, আর এই দুপুর থেকেই গুঞ্জন। ক্রমে জব্বর এলে সেই গুঞ্জন বাড়তে থাকে—সবাই ভেবেছিল, মেলাতে বান্নিতে এমন হামেশাই ঘটে। মাতব্বর মানুষেরা এসে সব মিটমাট করে দেয় কিন্তু তাজ্জব এই জব্বর—সে সকলকে বলছিল, আপনেগ ইজ্জত নাই। আপনেরা গরু ঘোড়া আর কতদিন হইয়া থাকবেন। ঠিক

সামুর গলার স্বরে সে চিৎকার করছিল। এত মানুষজন দেখে ওর কেমন জুস এসে গেছিল ভিতরে। সে এবার নিজেকে, সে যে কত বড়, এবং ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে, বলে আনোয়ারকে কেড়ে নেবার জন্য কাছারি বাড়িতে উঠে যাবার সময় দেখল বন্দুক গর্জে উঠছে। সে এতটা আশাই করতে পারেনি। পর পর দুটো লাশ ওর সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল। আগুন জ্বলতে কতক্ষণ। এবার যেন সকলে মশালে আগুন জ্বালিয়ে ছুটে আসবে এবং সব তছনছ করে কাছে পিঠে যার যা কিছু অমূল্য মনে হবে ফেলে মাঠের ভিতর দৌড়াতে থাকবে।

ঈশমও সাকার্সের তাঁবুর দিকে ছুটছে। হায় গেল, সব গেল। সে চিৎকার করে ডাকছে। সোনাবাবু! তাঁবুর সামনে এসে দেখল, তাঁবু আর নেই। সব তছনছ করে দিয়েছে। তাঁবুর একটা দিকে আগুন জ্বলছে। বাঘ সিংহ ঝলসে যাচ্ছে। কাছে কোথাও কোনও লোকজন নেই। যেন নিমেষে সব লুঠপাট করে তুলে নিয়ে গেছে কারা।

ঈশম কি করবে স্থির করতে পারছে না। সে বড় মুখ করে সোনাবাবুকে নিয়ে এসেছে। হায়, কি হবে! সে আকুল হতে থাকল। আর পাগলের মতো কাছারি বাড়ির দিকে উঠে যাবে ভাবল। কিন্তু কাছে গিয়ে মনে হল—বাবুরা যে-ভাবে রুখে আছে! ওর পরনে লুঙ্গি, সে কিছুতেই আর সে দিকে যেতে সাহস পেল না। তারপর মনে হল তিন নাবালক এদিকে ছুটে আসতে পারে না।

কারণ ওরা পথ হারিয়ে ঠিক যেখানে সে তরমুজ বিক্রি করছিল সেদিকেই ছুটে যাবে। সে আর দাঁড়াল না। গোটা মেলাটা ক্ষেপে গেছে। চারপাশে আগুন। এই আগুন যেন কতকাল থেকে মাটির ভিতর এতদিন আত্মগোপন করেছিল। কত দিনের অপমান এইসব মানুষ হজম করে এখন বদলা নিচ্ছে। সে কী করবে ভেবে পেল না। আগুনের ভিতর দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকল, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন গ। লালটুবাবু। আমি গাঁয়ে ফিরমু কি কইরা। মুখ দ্যাখামু কি কইরা! সে পাগলের মতো আগুনের ভিতর কেবল ডাকতে থাকল। সে ডাকতে ডাকতে ছুটছিল। চারধারে কাচ ভাঙা, কাচের চুড়ি ভেঙে পথটা লাল নীল সবুজ মিহিদানার মতো পথ, পথে ছুটতে গিয়ে ওর হাত-পা কেটে যাচ্ছে। ওর হুঁশ ছিল না। ওরা হয়তো গাছের নিচে ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু হায়, এসে দেখল সেখানে কেউ নেই। শুধু বড় বড় তরমুজ চারদিকে কারা ছড়িয়ে দিয়ে মাঠের অন্ধকারে মিশে গেছে। তরমুজে সব চাপ চাপ রক্ত। ওর শরীর শিউরে উঠল। পাগলের মতো হেঁকে উঠল, কেড়া আমার মানুষ কাইড়া নিছ কও! বলে সেও সেই উম্মত্ত মেলাতে কাদের হত্যা করার জন্য ছুটে গেল। সে ফাঁকা মাঠের ভিতরে দাঁড়িয়ে উন্মত্তপ্রায় চিৎকার করে ডাকতে থাকল, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন। রা করেন! কোন্ আনধাইরে লুকাইয়া আছেন কন, আমি ঈশম। আমি আপনেগ বাড়ি নিয়া যামু। বাড়ি নিয়া না যাইতে পারলে আমার জাত মান কুল সব যাইব।

ঘোড়াগুলি দ্রুতবেগে ছুটছে। যেসব ঘোড়া দরগায় ছিল তারা প্রায় সকলে জব্বরের হয়ে যেন লড়ছে। এটা যে কী হয়ে গেল—দোকানপাট লুঠ, মনিহারি দোকান, কাপড়ের দোকান এবং কামার কুমোরেরা এসেছে হাঁড়ি-কলসী, দা-বঁটি নিয়ে—সে সবও লুঠপাট হচ্ছিল। সার্কাসের তাঁবু থেকে দু-তিনটে মেয়ে উধাও হয়ে গেল। এবং মানুষেরা নদীর পাড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সামনের বড় বড় সব তরমুজের নৌকা, হাঁড়ি পাতিলের নৌকা, আর কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু জলের ভিতর হাহাকারের শব্দ। কেউ কোনওদিকে তাকাচ্ছে না। যে যার প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ের নিচে অথবা আগুনের ভিতর কার কখন প্রাণ যায় বোঝা দায়। সড়কি, বর্শা, সুপুরির শলা হাজার হাজার দু'দলের ভিতর কোথা থেকে সহসা আমদানি হয়ে গেল। যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। দীঘির দু' পাড়ে দু'দল অন্ধকারে প্রতীক্ষা করছে। রাত বাড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রঞ্জিত বিকেলের দিকেই প্রথম আঁচ পেয়েছিল। সে তার দলবল নিয়ে কাছারি বাড়িতে উঠে গেল। এখন সোনা লালটু পলটু আর মালতীকে খুঁজে বের করতে হবে। মেলাতে এলে মালতী অধিক সময় মন্দিরে কাটায়। সে ওদের কাছারি বাড়ি তুলে দিয়ে প্রথম মালতীর খোঁজে চলে গেল। মালতী ঠিক যেখানে বড় একটা ভাঙা মঠ আছে, মঠের দরজায় যেখানে ভিড়, ভিড়ের ভিতর মালতী পূজা দেবার জন্য প্রায় যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে। রঞ্জিত আঁচল ধরে ফেলল। বলল, শোভা আবু কোথায়?

—ওরা মন্দিরে আছে।

—ওদের নিয়ে চলে এস!

মালতী ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

রঞ্জিত বলল, দেরি করো না। আমি সার্কাসের তাঁবুতে যাচ্ছি। ঈশমকে খবর দিতে হবে। অনেক কাজ। মেলায় গণ্ডগোল হতে পারে।

রঞ্জিত হনহন করে হাঁটছে। দিঘির এ-পাড়ে রকমারি কাচের চুড়ির দোকান। তারপর ফুল ফলের দোকান। তারপর বাতাসা বিন্নির খৈ। মিষ্টির দোকান কত। তেলেভাজার দোকানগুলি পার হয়ে এলেই ফাঁকা মাঠ। মাঠে এখন তাঁবুর ভিতর গোপালদির বাবুরা বসে আছে। এই মাঠ পার হলে সার্কাসের তাঁবু, দুটো ছোট বড় সার্কাস। রঞ্জিত টিকিট কিনে দিয়েছে। ঈশম ওদের বসিয় দিয়ে বের হয়ে এলে কথা ছিল — সার্কাস দেখা শেষ হলে যেখানে ঈশম তরমুজ বিক্রি করবে সেখানে সবাই চলে যাবে। রঞ্জিত দেরি করতে পারল না। এখানে সে ছদ্মবেশী মানুষ। তার পরিচয়ের জন্য লোক হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করেছে। সে যতটা পারল দ্রুত সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকে যাবার জন্য হাঁটতে থাকল। জিলিপির দোকান থেকে তখনও একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এমন কু ৎসিত আকার নেবে মেলাটা অন্তত জিলিপি ভাজার মনোরম গন্ধ থেকে তা টের পাওয়া

যায়নি। কেবল রঞ্জিত এবং অন্য কেউ কেউ বুঝি ভেবেছিল—সময়টা দুঃসময়। মেলা ছেড়ে এখন যার যার মতো ঘরে ফেরা দরকার।

মেলাতে শচীন্দ্রনাথের আসার কথা ছিল। তিনি এলে এই জব্বরকে কব্জা করতে পারতেন। শচীন্দ্রনাথকে জব্বর ভয় পায়। কারণ আবেদালির সুখে-দুঃখে শচীন্দ্রনাথ আত্মীয়ের মতো। রঞ্জিত হাঁটতে হাঁটতে এসব ভাবল। সে সার্কাসের তাঁবুতে আসতেই দেখল, সার্কাস ভেঙে গেছে। গণ্ডগোলের আঁচটা ওরাও টের পেয়েছে। সব খেলা না দেখিয়ে, বাঘের খাঁচায় বাঘ, সিংহের খাঁচায় সিংহ পুরে দিল। রঞ্জিত গেটের সামনে ওদের তিনজনকে দেখে বলল, তোমাদের আর ওদিকে যেতে হবে না। আগে তোমাদের কাছারি বাড়ি দিয়ে আসি। রঞ্জিত ভেবেছিল, ওদের কাছারি বাড়ি তুলে দিয়ে ঈশমকে খবর দেবে এবং ঈশমকে সব তরমুজ নৌকায় তুলে দিতে বলবে। কাছারি বাড়ি পর্যন্ত রঞ্জিত যেতে পারল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন—বন্দুকের গর্জন, এবং হল্লা। মানুষজন নিহত হচ্ছে।

রঞ্জিত তাড়াতাড়ি একটু পিছনের দিকে হেঁটে গেল। ওর মনে পড়ে গেল মালতীকে সে বলে এসেছে, সার্কাসের তাঁবুর গেটে সে থাকবে। তাড়াতাড়ি সে তাঁবুর গেটে এসে দাঁড়াতেই দেখল, পেছনের দিকটায় কে তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সে এই বালকদের নিয়ে কী করবে! মালতী এখনও আসছে না, অথবা মালতী কী ওদের না দেখে ফের মন্দিরে চলে গেছে! এখন তো হাতে প্রাণ—কখন প্রাণ যায় আর মালতীর মতো সুন্দরী যুবতী—সে এবার কেমন আকুল হয়ে ওদের নিয়ে সোজা মন্দিরের দিকে ছুটে গেল। সোনা ঠিক কিছুই বুঝতে পারছে না। সহসা কেন এমন হল! যেন পঙ্গপালের মতো সব মানুষ নদীর দিকে ছুটে যাচ্ছে। সে দেখল আবু একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সোনা বলল, মামা ঐ দ্যাখেন আবু।

রঞ্জিত বলল, তোর পিসি কোথায়?

আবু কাঁদছিল শুধু। বুঝল আবু এই মেলাতে হারিয়ে গেছে। এখন আর মালতীকে খোঁজা অর্থহীন। ওর বুকটা কেঁপে উঠল।

ওদের কোনও নিরাপদ স্থানে পৌঁছে না দিতে পারলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না। কিন্তু কীভাবে কাছারি বাড়ির দিকে উঠে যাওয়া যায়! সে পিছনের দিকে তাকাতেই দেখল-- আগুন জ্বলছে। একমাত্র নদীর দিকেই নেমে যাওয়া যেতে পারে। নৌকা আছে। তরমুজের নৌকা। সে ওদের নিয়ে ছুটতে থাকল। অন্ধকার হয়ে গেছে। মানুষজন সব আর চেনা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে দূরের আগুন সহসা হল্কা ছাড়লে কিছু কিছু মুখ দেখা যাচ্ছে। নির্বিচারে হিন্দু-মুসলমান এদিকটাতে মিলেমিশে আছে। সবাই প্রাণের দায়ে নিরাপদ স্থানের জন্য ছুটছিল।

রঞ্জিত দেখল নৌকাটা কে আলগা করে দিয়েছে। একটু দূরে ভেসে রয়েছে। সে জলে ঝাঁপ দিল। এবং মাঝ নদী থেকে নৌকা টেনে আনার জন্য সাঁতরাতে থাকলে

দেখল, জলের ওপর কি সব ভেসে রয়েছে। সে বুঝতে পারল সেই ভীত সন্ত্রস্ত মানুষেরা জলে ভেসে রয়েছে। আগুন থেকে এবং হত্যা থেকে প্রাণ রক্ষার্থে ডুবে ডুবে নদী পার হচ্ছে। সে দেখল কিছু কিছু নৌকা তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে। সে আর দেরি করল না। নৌকায় উঠে গেল। এবং মনে হল তার কিছু আবছা মতো মানুষের আভাস সেই নৌকায়।

রঞ্জিত চিৎকার করে উঠল, তোমরা কে?

কোনও শব্দ ভেসে আসছে না!

—কে তোমরা?

এবার বুঝি গলা চিনতে পেরে মালতী কেঁদে ফেলল, আমি মালতী!

—তুমি! পাশে কে?

—শোভা, আবুরে পাইতাছি না।

এখন আর কথা বলার সময় নয়। নৌকাটা তীরের দিকে টেনে নিয়ে যাবার সময় বলল, আবুকে পাওয়া গেছে। আবু সোনা লালটু সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পর একটু থেমে বলল, বৈঠা দেখছি না, লগি নেই—কোথায় গেল সব!

মালতী কোনও জবাব দিল না। তার এখন আর কোনও ভয় নেই। সে প্রাণপণে রঞ্জিতকে সাহায্য করার জন্য হাতে জল টানছিল। নৌকা পাড়ে এলে রঞ্জিত অন্ধকারে দেখল সেই মশালের আগুন এদিকেই ছুটে আসছে। সর্বনাশ! ওরা টের পেয়েছে আত্মরক্ষার্থে নদীর জলে মানুষ ভেসে পার হয়ে যাচ্ছে ওপারে। সে এ-মুহূর্তে কি করবে ভাবতে পারল না। মনে হচ্ছে নিশ্চিত হত্যা-নির্বিচারে হত্যা। সে সোনার চোখ দেখল। সোনা কিছুই বুঝতে পারছে না যেন। এমন একটা হাসিখুশির মেলা, মেলাতে কত পাখি উড়ে এসেছে, কত রঙ-বেরঙের ঘোড়া, তালপাতার বাঁশি, তিলাকদমা, বাতাসা, কী সুন্দর সব লাল-নীল নিশান উড়ছিল—এখন সে সবের কিছু নেই—কী করে তছনছ হয়ে গেল—শুধু চারদিকে আগুন জ্বলছে। মাঠে সেই সব অশ্বারোহী পুরুষ—কদম দিচ্ছে। হাতে মশাল। মশালের আলোতে মৃত্যুর কাছাকাছি যে মানুষ তাদের মুখ দেখার বাসনা। সবাই উঠে এলে রঞ্জিত জোরে নৌকাটা নদীতে ঠেলে দিল। তারপর প্রাণপণ সবাই জল টানতে থাকল হাতে। তরমুজের নৌকো রঞ্জিত এক দুই করে সব তরমুজ জলে ফেলে পাড়ের দিকে ভাসিয়ে দিতে থাকল। অন্ধকারে এইসব তরমুক্ত জলে ভেসেছিল। জলে ভেসে ভেসে মানুষের মাথার মতো, যেন কত শত মানুষ জলে মুখ ডুবিয়ে এই পৈশাচিক উল্লাস থেকে আত্মরক্ষা করছে।

আর ঠিক মাঝ নদীতে এসেই মনে হল সেই মশাল হাতে দলটা মাঠ শেষ করে নদীর কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। ওরা যদি দেখতে পায়, বর্শা ছুঁড়ে দিতে পারে। অথবা জল সাঁতরে চলে আসতে পারে। সে সবাইকে এবার নৌকা থেকে জলে নামিয়ে দিল। তারপর

নৌকাটা জলে কাৎ করে রাখল। দূর থেকে দেখলে মনে হবে—খালি একটা নৌকা ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। বরং কাছেপিঠে যেসব তরমুজ ভেসে যাচ্ছে অন্ধকারে ওরা সেইসব তরমুজ মানুষের মাথা ভেবে যে যার বল্লম অথবা সুপারির শলা ছুঁড়ে দিলেই হাত খালি হয়ে যাবে, তখন আর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না, মাঠে উঠে যাবে। ওরা নৌকার ও পাশে শরীর লুকিয়ে জলের ভিতর মাছ হয়ে থাকবে এবং সন্তর্পণে নৌকাটাকে টেনে ওপারে নিতে পারলেই যেন ভয়ডর কেটে যাবে। ওরা নৌকাটাকে গুণ টানার মতো নিয়ে যাবে তারপর।

মালতী একপাশে। মাঝে সোনা লালটু পলটু এবং আবু শোভা-শেষ মাথায় রঞ্জিত। শুধু সবার হাতদুটো নৌকার কাঠে। আর গোটা শরীর মুখ নৌকার ছায়ায় আড়াল করা। যেন এই নৌকায় কিছু মানুষজন ছিল, এখন ওরা নদীর জলে ডুবে গেছে। খালি নৌকা কাটা মাথা নিয়ে যায়। দু-চারটা ভরমুজ গলুইর ওপর ইতস্তত ছড়ানো। অন্ধকারে এমন একটা দৃশ্য তৈরি করে রাখল রঞ্জিত।

কখন কী যেন হয়ে যায় মানুষের ভিতর। যারা ঘোড়ায় চড়ে এই হত্যাকাণ্ডে মেতে গেছে, রঞ্জিত জানে—ওরা, ঘরে বিবি বেটা রেখে এসেছে। বাজি জিতে গেলে পালা-পার্বণের মতো উৎসব লেগে যাবে। গ্রামে গ্রামে সেই বাজি জেতার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে মানুষের কাছে দোয়া ভিক্ষা করবে। এখন দেখলে কে বলবে—এরাই সেইসব মানুষ। অন্ধকারের ফাঁক থেকে সে দেখল, ওদের হাতে সুপারির শলা, যেন এক হত্যার খেলায় মেতে গেছে। ওরা সুপাবিব শলা, বল্লম সেইসব তরমুজের বুকে সড়কির মতো গেঁথে দিতে থাকল আর উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। ওরা কাফের হত্যা করছিল।

আর তখন এক মানুষ নদীর পাড়ে পাড়ে যায়। অন্ধকারে সে মানুষটা ডাকছে, সোনাবাবু কৈগ্যালেন গ।

অন্ধকার থেকে সাড়াশব্দ আসছে না।

দূরে তখন নৌকা ভাসিয়েছে রঞ্জিত। ওরা পাড়ে উঠে এবার ছুটতে থাকবে।

মানুষটা ডাকছিল, আমি কারে লইয়া ঘরে ফিমু। মানুষটা এ-পারে ডাকছে। ও পারের মাঠে তখন ছুটতে গিয়ে আছাড় খেল সোনা। দূর থেকে, অনেক দূর থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। সোনা ডাকল, মামা! আমারে কে ডাকে!

রঞ্জিত অন্ধকার মাঠে ওকে কোলে তুলে নিল। বলল, কথা বলো না। ছোটো। সে ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, সামনে হিন্দুগ্রাম পড়বে। সেখানে রাত কাটাতে হবে। অন্ধকারে মালতীকে নিয়ে যেতে সে সাহস পাচ্ছে না। সারারাত না হেঁটে সামনের গ্রামে সে আশ্রয় নেবে ভাবল!

মানুষটার ডাক ক্রমে কেমন ক্ষীণ হতে হতে এক সময় বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল। সোনাবাবু আছেন? আমি ঈশম! আমি কারে লইয়া বাড়ি যাই কন!

সোনার বার বার মনে হচ্ছিল, ওকে কে নদীর ওপারে একছে! কে যেন এই নদীর পাড়ে পাড়ে ওকে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে, সেই গলার স্বর সে কিছুতেই চিনতে পারছে না। সে ভয়ে পড়ি মরি করে ছুটতে থাকল। ভয়, নিশিটিশি হতে পারে। তাকে নিশিতে ডাকছে।

মেলার দাঙ্গা মেলাতেই শেষ হয়ে গেল। ঈশম বাড়ি ফিরে এসেছিল সকলের শেষে। শীর্ণ চেহারা, দুর্বল। দেখলে মনে হবে, শরীর থেকে প্রাণপাখি ওর উড়ে গেছে। সে সেই যে ডাকছিল, মাঠে মাঠে, নদীর পাড়ে, ডাক আর থামেনি। কেমন চোখ ঘোলা—যেন সে কোনও নাবালককে হত্যা করে ফিরেছে। কে যেন বলল, ঈশমকে দেখে এসেছে বিলের পাড়ে বসে বিড়বিড় করে কি বকছে! শচীন্দ্রনাথ আর দেরি করেন নি। মেলার দাঙ্গা এদিকে ছড়ায়নি। রাতে রাতে শেষ হয়ে গেছে। রূপগঞ্জ থেকে একদল পুলিশ নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে একদল আর্ম পুলিশ এসে শেষপর্যন্ত দাঙ্গা আয়ত্তে এনেছে। মাতব্বর মানুষেরা আবার সবাইকে মিলেমিশে থাকতে বলে ভাবল—যাক, এবারের মতো ফয়সালা হয়ে গেল। সামু খবর পেয়ে ঢাকা থেকে ছুটে এসেছে। বিলের পাড়ে যাবার সময় সামুর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের দেখা—সামু বলল কর্তা কৈ যান?

—যামু ফাওসার বিলে।

—এই সকাল সকাল!

—ঈশমটা ত ফিরে নাই। দাঙ্গাতে ঈশম বুঝি গ্যাল মনে হইল। এখন শুনতাছি ঈশম বিলের পাড়ে দুই দিন ধইরা বইসা আছে।

শচীন্দ্রনাথ ঈশমকে প্রায় বিলের পাড় থেকে ধরে এনেছিলেন; চোখমুখ দেখলে আর বিশ্বাসই করা যায় না এই সেই ঈশম। সোনা লালটু পলটু ঈশমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের দেখে ওর কেমন শরীর কাঁপছিল। সে হাসতে পারল না। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না—ওরা ফিরে আসতে পারে। সে নাবালকদের মাথায় মুখে হাত দিয়ে বলল, বাবু আপনেরা বাইচ্যা আছেন। বাবু গ, বলে তার ভিতর থেকে কেমন এক কান্নার আবেগ উঠে আসছিল।

শচীন্দ্রনাথ ধমক দিলেন।—-এই, ওঠ। যা, এখন সান কইরা খা। তারপর ঘুমাইবি। তরমুজ খেতে আজ আর নাইমা যাইতে হইব না। তোমরা যাও। অরে একটু বিশ্রাম নিতে দ্যাও, বলে সোনা লালটু পলটুকে বৈঠকখানার ঘর থেকে নেমে যেতে বললেন। ওরা নেমে

না গেলে ঈশম সারাদিন ওদের সামনে বসে থাকবে এবং পাগলের মতো হাউমাউ করে আবেগে সুখের কান্না কাঁদতে থাকবে।

মেলা থেকে মালতীও ফিরে এসে কেমন ভয়ে দিন কাটাতে থাকল। রাত হলে সে ঘরের বার হতো না। কুপি জ্বেলে বসে থাকত। রাত হলে শোভা আবুকে বুকে নিয়ে কেবল দুঃস্বপ্ন দেখত। এক একদিন বলার ইচ্ছা হতো, ঠাকুর, আর পারি না। রাইতে ঘুম নাই চোখে, মনে হয় কারা য্যান রাইতে বাড়ির উঠানে ফিসফিস কইরা কথা কয়। তোমারে ঠাকুর বুঝাইতে পারি না, পরাণে কি জ্বালা। সেই যেন জালালির মতো, জ্বালা সহে না প্রাণে। জ্বালা মরে না জলে। ঠাণ্ডা হাত! উষ্ণ স্পর্শের জন্য মালতীকে কাতর দেখাচ্ছে। অথবা যেন বলার ইচ্ছা, ঠাকুর, আমারে নিয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায়, চইলা যাও। কিন্তু সকাল হলে, যখন টোডারবাগের মাঠে মোরগেরা ডাকে, সূর্য গাবগাছটার ফাঁকে উঁকি মারে তখন কিছু আর মনে থাকে না। তখন মনটা পাগল পাগল লাগে, কোনও ফাক-ফিকির খোঁজা, কী করে মানুষটারে দ্যাখা যায়।

একদিন সে রঞ্জিতকে বলল, আমারে একটা চাকু দিবা ঠাকুর?

—চাকু দিয়ে কী করবে?

—আমারে দাও না। কাঠের চাকু দিয়া আর খেলতে ইসছা হয় না।

—হাত তোমার এখনও ঠিক হয়নি মালতী। ঠিক হলে এনে দেব।

মালতীর বলার ইচ্ছা হতো, আমার হাত ঠিক নাই কে কয়! তুমি আমারে আইনা দ্যাও, দ্যাখ একবার কি খেলাটা খেলি। বুঝি মরণ খেলার সখ। অমূল্যর বড় বেশি বাড় বাড়ছে। রঞ্জিত আসার পর থেকেই অমূল্য কেমন মরিয়া সে ফাঁক-ফিকিরে আছে, মালতীকে পেলেই ঘাড়টা মাঠে, ঝোপে জঙ্গলে অথবা কবি-গান হলে, যাত্রা গান হলে, যখন কেউ বাড়ি থাকবে না, তখন কামড়ে ধরবে। মালতী বাড়ি পাহারা দেবার জন্য শুয়ে থাকে, থাকতে থাকতে দরজায় শব্দ, কে তুমি! আরে কথা কও না ক্যান, দরজা খুইলা চইলা আস, দ্যাখি একবার চাঁদের লাখান মুখখানা, বলেই ভিতরে ভিতরে মরণ খেলার জন্য মালতী প্রস্তুত হতে থাকে। তখনই মনে হয় যেন জব্বর দাঁড়িয়ে আছে গাছতলাতে, ইস্তাহার বিলি করছে। বলছে, মালতী দিদি আইলেন। ওর পাশের মানুষগুলি দাঁত বের করে মালতীকে দেখছে। ঠিক এমন একটা ছবি ভাসলেই, ওর বায়না রঞ্জিতের কাছে, ঠাকুর দ্যাও না, বড় একটা চাকু, দিবা আমারে, সূর্য ডুবলে আমার বুকে জল থাকে না।

দাঙ্গার পর থেকে এই লাঠিখেলা ছোরাখেলা রাতের আঁধারে। অথবা অন্য কোথাও ডে-লাইট জ্বেলে। এবং বড় দালানবাড়ির মাঠকোঠা পার হলে যে নির্জন জায়গা গ্রামের, সেখানে সবাই জমা হতো। এখন আর রঞ্জিত এসব দেখে বেড়ায় না। সে দূরে চলে যায়, কোথায় যায়, কেন যায়, কেউ জানেনা। কবিরাজ এবং গোপাল দেখাশোনা করছে। ফাল্গুন-চৈত্র গেল। বোশেখ মাস বড় গরম। গরমে জ্যোৎস্না উঠলে ডে-লাইট জ্বালা হতো না।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় খেলা হতো। মুখগুলি তখন ভালো করে যেন চেনা যেত না। মালতী শোভা আবুকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরবাড়ি চলে আসত। ধনবৌ, বড়বৌ থাকত। পালবাড়ি থেকে সুভাষের মা আসত। হারান পালের বৌ আসত। চন্দদের বড় বড় দুই মেয়ে মতি গগনি আসত। ধীরে ধীরে খেলা জমে উঠলে, সোনাদের নতুন মাস্টারমশাই শশীভূষণ সকলের হাতে ভিজা ছোলা গুড় দিতেন। এই দেশে কোথায় কবে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে! তিনি ইতিহাসের ছাত্র। যখন স্বাধীনতা আসে, এমন গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। বেধে গেলে এইসব লাঠিখেলা আপন প্রাণ রক্ষার্থে কাজে আসে।

কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। ঠিক এ-অঞ্চলে বাস করলে টের পাওয়া যায় না। অভাবে অনটনে মানুষ চলে আসছিল, শশীভূষণ এই দলের বুঝি। তিনি চাকুরি নিয়ে চলে এলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সোনা শশীভূষণের পায়ের কাছে বসে ইতিহাসের গল্প শুনত, ট্রয় যুদ্ধ, ট্রয়ের সেই কাঠের ঘোড়া। শহরের দরজায় কাঠের ঘোড়াটা কারা রেখে গেল। কত বড় ঘোড়া! নগরীর শিশুরা সেই কাঠের ঘোড়ার চারপাশে ঘুরে ঘুরে গান গাইছিল। সেই কাঠের ঘোড়া সমুদ্রের বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে আছে—কী বড় আর উঁচু। এবং ভিতরে হাজার হাজার সৈন্য। সেই ট্রয়ের নগরী এবং সমুদ্রের বালিয়াড়ির কথা মনে হলেই সোনার মনে হয় রাজার এক দেশ আছে। বাবার কাছে সে গল্প এনেছে। মুড়াপাড়ার বাবুদের বাড়ি নদীর পাড়ে পাড়ে। প্রাসাদের মতো অট্টালিকা। নদীর চরে কাশফুল এবং বড় চর পার হলে পিলখানার মাঠ। মাঠে সব সময় হাতিটা বাঁধা থাকে। বাবুদের মেয়ে অমলা কমলা। কমলা ওর বয়সী মেয়ে। ওরা কলকাতায় থাকে। পূজার সময় ওরা আসে। কেন জানি সোনার ট্রয় নগরীর কাঠের ঘোড়ার কথা মনে হলে নদীর চরে হাতিটার কথা মনে হয়। অমলা কমলার কথা মনে হয়। আর মনে হয় সেই অট্টালিকার মতো প্রাসাদের কথা। বড়দা মেজদা পূজা এলেই যায়। সে যেতে পারে না। মেলা থেকে এসে এবার কেন জানি তার মনে হল, দাদাদের মতো সেও এবার মুড়াপাড়া যেতে পারবে। বাবুদের হাতি, শীতলক্ষ্যা নদী, পিলখানার মাঠ এবং নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই স্টিমারটা দেখতে পাবে। কী আলো, কী আলো! সারা নদী উথালপাথাল করে আলোটা গ্রামের দু'পাশের মাঠের ঘাসে ঘাসে, নদীর চরে, কাশবনে কিছুক্ষণের জন্য স্থির উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সোনা মেলা থেকে এসেই কেন জানি ভাবল সে বড় হয়ে গেছে। সে এবার মুড়াপাড়া দুর্গাপূজা দেখতে যেতে পারবে।

এই শশীভূষণ ভোর হলে তক্তপোশে বসে থাকতেন। দুলে দুলে কী সব বই পড়তেন। সোনা চেয়ারে বসে পা দোলাত এবং মনোযোগ দিলে ওর পড়া শিখতে বেশি সময় লাগত না। তারপর এদেশে বর্ষাকাল এলে নৌকায় করে স্কুল। মাস্টারমশাই কাঠের পাটাতনে মাঝখানে বসে থাকতেন। ঈশম লগি বাইত। ওরা তিন ভাই, গ্রামের আরও চার পাঁচজন ছেলে একসঙ্গে মাস্টারমশাইকে নিয়ে বিদ্যালয়ে চলে যেত।

বর্ষা এলেই কত শালুক ফুল ফুটে থাকে চারদিকে। তখন এসব অঞ্চলে আর হাতি ঘোড়া উঠে আসতে পারে না। কেবল জল আর জল। ধানের জমি, পাটের জমি। জলে

জলে দেশটা ডুবে থাকে। মাছ, ছোট বড় রুপোলী মাছ জলের নিচে। স্ফটিক জল। ধান খেতে পাট খেতে কত রাজ্যের সব পোকামাকড়। ছোট বড় নীল সবুজ রঙের কাঁচপোকার মতো আবার হলুদ রঙ কোনও পোকার! সূর্য উঠলে এই সব পোকামাকড় পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। সোনা নৌকায় উঠলেই কৌটোয় যত সোনাপোকা ধরে আনে। একবার সে একটা আশ্চর্য রকমের পোকা পেয়েছিল-সোনালী রঙের কাঁচপোকা। টিপ দেবার মতো। পোকাটাকে পোকা বলে চেনাই যায় না। মুক্তো বিন্দুর মতো মাঝখানে উজ্জ্বল। চারদিকে তার সোনালী রঙ। কালো একটা বর্ডার দেওয়া, হাত-পা বলে কিছু নেই। সত্যি কপালে টিপ দেবার জন্য যেন এই কাঁচপোকা। সে ফতিমার জন্য কাঁচপোকা কৌটার ভিতর রেখে দিয়েছিল। কবে ফতিমা আসবে! এখন আর দেখা হয় না। বর্ষা এলে এ-গ্রামে হুট করে চলে আসতে পারে না ফতিমা। সে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গোপনে কাঁচপোকা ওর স্যুটকেসে তুলে রাখল। বর্ষা শেষ হলে সে ফতিমাকে কপালে টিপের মতো পরিয়ে দেবে।

সোনা এইসবের ভিতর বড় হতে হতে একদিন দেখল, মেজ জ্যাঠামশাই নৌকা পাঠিয়েছেন। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। ছোটাকাকা বললেন, সোনা, তুমি যাইবা দুগ্‌গা ঠাকুর দ্যাখতে! কান্দাকাটি কইর না কিন্তু। সোনা এবার দূরদেশে যাবে। আকাশে বাতাসে পূজার বাজনা বেজে উঠল। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। অলিমদ্দি বড় একটা মাছ তুলে আনল। সোনা, লালটু, পলটু মাছটাকে টেনে রান্নাঘরে তুলছে। কত বড় মাছ! ওরা তিনজনে নাড়তে পারছে না। বড়বৌ, ধনবৌ মাছটা দেখে তাজ্জব। ঢাইন মাছ! পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ এত বড় মাছটা দেখে উঠোনের ওপর নাচতে থাকলেন।

সোনা বলল, আমি মুড়াপাড়া যামু দাদা।

—কে কইছে তুমি যাইবা?

—কাকায় কইছে।

লালটু ভেবেছিল মা হয়তো বলেছেন। মা বললে এ সংসারে কিছু হয় না। মার কিছু বলার কোনও অধিকার নেই। ছোট কাকা যখন বলেছে, তখন যথার্থই যাবে সোনা। কেউ বাধা দিতে পারবে না। লালটু কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, ভ্যাক্ কইরা কাইন্দা দিলে হইব না, আমি বাড়ি যামু—বলে লালটু সোনাকে মুখ ভেংচে দিল। এই অভ্যাস লালটু পলটুর। সোনাকে ওরা সহ্য করতে পারে না। বাড়িতে সোনা সবার ছোট বলে ওর আদর বেশি। এতদিন সে মুড়াপাড়া যেতে পারে নি—এটা একটা সান্ত্বনা ছিল। সেই সোনা ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। রাগ হয় না!

সোনাও ছেড়ে দেবার পাত্র না। সে দুগ্‌গা ঠাকুর দেখতে যাবে। ওর প্রাণে কি যে আনন্দ। মন প্রসন্ন। দাদারা খারাপ বলে সে খারাপ হবে কেন! সে দূরদেশে যাবে। কতদূর! একদিন লেগে যাবে যেতে। কত নদী বন মাঠ পড়বে যেতে। সে লালটুকে মন প্রফুল্ল থাকলে দাদা বলে ডাকে। পলটুকে বড় দাদা। সে এখন মোটামুটি স্কুলের ভালো

ছাত্র। সে এখন দূরের মাঠে একা নেমে যেতে পারে। যব খেতে লুকোচুরি খেলতে আজ-কাল আর ভয় পায় না।

ধনবৌ সোনার মুখ দেখতে থাকল। বড় করে কাজল টেনে দিয়েছে চোখে। সুন্দর মুখ। যত লাবণ্য চোখে। বয়সের অনুপাতে লম্বা বেশি। একটু মাংস থাকলে শরীরে এ-লাবণ্য সবুজ দ্বীপের মতো। সোনার চোখ বড়। কাজল দিলে সে চোখ আরও বড় দেখায়। কপালের এক পাশে কড়ে আঙুলে ধনবৌ লম্বা করে কাজল টেনে দিল। বাঁ পা থেকে সামান্য ধুলো নিয়ে সোনার মাথায় দিল এবং সামান্য থুতু ছিটিয়ে দিল শরীরে। তারপর সোনাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেল কপালে। সোনার কেমন সুড়সুড়ি লাগছিল—কাতুকুতুর মতো। সোনা খিলখিল করে হাসছিল।

সোনা একেবারে পুরোপুরি পাগল মানুষের মুখ পেয়েছে। শরীরের গড়ন দেখলে বোঝা যায়, তেমনি লাবণ্যময় শরীর তার, বয়সকালে উঁচু লম্বা হবে খুব। ধনবৌ সোনাকে কোলে নিয়ে আদর করতে চাইল। কিন্তু সোনার সংকোচ হচ্ছে। সে লজ্জা পাচ্ছিল। বলল, আমার লজ্জা করে। আমি কোলে উঠমু না মা।

দূরদেশে যাবে ছেলে। সাত আটদিন ধনবৌ এই ছেলে বুকে নিয়ে শুতে পারবে না। বুকটা কেমন টনটন করছিল। বলল, লও তোমারে নৌকায় দিয়া আসি। এই বলে জোরজার করে কোলে তুলে নিতে চাইল।

সোনা কিছুতেই উঠল না।

ধনবৌ বলল, আমার যে ইচ্ছা করে তোমারে একটু কোলে লই। বলে ফের ছেলেকে দু'হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেল।

—ধ্যাৎ, তুমি কি যে কর না মা! আমারে তুমি কোলে নিবা ক্যান! আমি বড় হই নাই!

—অ-মারে! আমার সোনা বড় হইছে। বড়দি শুইনা যান, কি কয় সোনা। সোনা নাকি বড় হইছে। কোলে উঠতে লজ্জা!

নৌকা ঘাটে বাঁধা। ওরা তিনজনে যাবে মুড়াপাড়া। দুগ্‌গা ঠাকুর দেখতে যাবে। গ্রামের পুজো প্রতাপ চন্দ করে। কতকালের এক মামলা আছে। কেউ সে বাড়ি ঠাকুর দেখতে যেতে পারে না। ছোট বালকদের মন মানবে কেন! পুজোর সময় হলেই ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠিয়ে দেন।

সুতরাং সোনা লালটু পলটু যাচ্ছে মুড়াপাড়া। ঈশম নিয়ে যাচ্ছে। এ-ক'দিন অলিমদ্দি বাড়ির কাজ করবে। ঈশমেরও যেন ক'দিন ছুটি। সে এই দলবল নিয়ে হৈচৈ করে ফিরে আসবে। সে সকলের আগে নৌকায় উঠে বসে আছে। ভাল লগি নিয়েছে। বৈঠা নিয়েছে। অন্যের লগি বৈঠা ওর পছন্দ নয়। পালের দড়িদড়া ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছে।

খুটিনাটি কাজ। দূরদেশে যাবে। একদিন লেগে যাবে। সে সবকিছু, এমন কি হুঁকো-কলকে ঠিক করে নিল। দশ ক্রোশের মতো পথ! এখন এই সকালে রওনা হলে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। ঘুরে ফিরে যেতে হবে। নদীতে এবং বিলে বাতাস পেলে, স্রোতের মুখে তুলে দিতে পারলে তবে সকাল সকাল যেতে পারবে।

সোনা ঠাকুর্দাকে প্রণাম করল। বলল, দাদু আমরা মুড়াপাড়া পূজা দ্যাখতে যাইতাছি।

বুড়ো মানুষটি খুঁজে পেতে চিবুক ধরে বলল, তাই বুঝি!

লালটু বলল, দাদু দশরায় আপনের লাইগা কি কিনমু?

বুড়ো মানুষটা কোনও উত্তর দেবার আগেই পলটু ঠাট্টা করে বলল, ঝুমঝুমি বাঁশি কিনমু।

—দ্যাখছ, দ্যাখ বড়বৌ কি কয় তোমার পোলা! আমারে ঝুমঝুমি বাঁশি কিনা দিব কয়।

—ঠিকই বলেছে। আপনি ছেলেমানুষের মতো কাঁদেন। আপনাকে কেউ খেতে দেয় না কন!

—আমি কই বুঝি!

—কন না।

—আমার কিছু মনে থাকে না বড়বৌ।

পলটু নৌকায় উঠে দেখল, পাগল মানুষ গলুইতে বসে আছে চুপচাপ। সে কখনও বাবা বলে ডাকে না। এই মানুষ বড় অপরিচিত তার কাছে। এই মানুষের পাগলামি কেমন বিরক্তিকর। সে যত বড় হচ্ছে, এক পাগল মানুষ তার বাবা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। বাবাকে এড়িয়ে চলার একটা স্বভাব গড়ে উঠেছে পলটুর ভিতর। কিছুটা যেন শাসনের ভঙ্গি। এই মানুষের কোনও অসম্মান ওকে পীড়া দেয়। নানাভাবে সেসব অসম্মান থেকে মানুষটাকে রক্ষা করার বাসনা। কিন্তু সে আর কী মানুষ যে, এই পাগল মানুষকে ধরে বেঁধে রাখবে।

নৌকার গলুইয়ে চুপচাপ বসে আছেন তিনি। পাটাতনের ওপর পদ্মাসন করে বসে আছেন। পলটু নৌকায় উঠেই বলল, আপনে নামেন। কই যাইবেন আপনে?

পাগল ঠাকুর পলটুর কথার কোনও জবাব দিল না। ছেলেমানুষের মতো ফিকফিক্ করে হাসলেন। পলটু এবার রেগে গিয়ে বলল, আপনে নামেন। নামেন কইতাছি। মণীন্দ্রনাথ এতটুকু নড়লেন না। কথা বললেন না। বরং কাপড়টা বেশ যত্ন নিয়ে পাট করে পরলেন। পোশাকে কোনও অশালীন কিছু আছে, এই ভেবে কাপড়টা বেশ গুটিয়ে পরলেন। হাতকাটা শার্ট গায়ে। শার্টটা টেনেটুনে দিলেন। মাথার চুল হাতেই পাট করতে

থাকলেন। দ্যাখো, এই চুল আমার, এই বসনভূষণ আমার—এবার আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি। বলে ধ্যানী পুরুষের মতো ফের পদ্মাসনে বসে পড়লে পলটু হাত ধরে টানতে আরম্ভ করল, নামেন আপনে। মা। মা—আ। সে চিৎকার করতে থাকল। যেন বড়বৌ এলেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু বড়বৌর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঈশম কিছু বলছিল না। সে বেশ মজা পাচ্ছে। সে চুপচাপ ছইয়ের ওপাশে বসে আছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মতো বসে বেতের ঝোপে বোলতার চাক খুঁজছে।

পলটু বলল, নামেন এখন। নৌকা ছাইড়া দিব।

কে কার কথা শোনে! এমন শরৎকালের সকাল, ঠাণ্ডা হাওয়া ধানখেত থেকে ভেসে আসছে, কোড়ার ডাক ভেসে আসছিল। নদীতে নৌকায় পাল দেখা যাচ্ছে। পাল তুলে নদীতে গ্রামোফোন বাজাতে বাজাতে কারা যেন যায়। সোনালী বালির নদী থেকে সব বড় বড় মাছ ধান খেতে শ্যাওলা খেতে উঠে আসছে। কত শস্যক্ষেত্র দু'পাশে অথবা স্ফটিক জল—কারণ পাট কাটা হলে গ্রাম মাঠ দ্বীপের মতো। চারপাশে যেন দীঘির জল টলটল করছে। বিশাল জলরাশি নিয়ে এইসব বাড়ি জমি এবং নদী ভেসে রয়েছে। মণীন্দ্রনাথের কতদিন থেকে কোথাও যাবার বাসনা। বর্ষা এলেই তিনি বন্দী রাজপুত্রের মতো শুধু অর্জুন গাছটার নিচে বসে থাকেন। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে শুনেই ওঁর দূরদেশে যাবার ইচ্ছা হল। সবার আগে যা কিছু পরণে ছিল, তাই নিয়ে তিনি নৌকায় উঠে বসে আছেন। চুল কি সুন্দরভাবে পাট করেছেন! ভদ্র মানুষের মতো চুপচাপ। একেবারে সেই এক সরল বালক যেন। পলটু যত এসব দেখছিল তত ক্ষেপে যাচ্ছিল। সে এবার ভয় দেখাবার জন্য বলল, ডাকমু ছোট কাকারে?

মণীন্দ্রনাথ খুব অপরাধী চোখে পলটুর দিকে তাকালেন। যেন বলার ইচ্ছা—বাছা, আর ডেকো না, আমি তোমাদের পাশে চুপচাপ বসে থাকব। মণীন্দ্রনাথের বড় অবলা জীবের মতো চোখ। চোখে এক অসামান্য অসহায় দুঃখ ভেসে বেড়াচ্ছে—আমি যে এক পাগল মানুষ। কতকাল ধরে হাঁটছি। তবু সেই দুর্গের মতো প্রাসাদে পৌঁছাতে পারছি না। তিনি তাঁর জাতককে এমন কিছু বুঝি বলতে চাইছেন।

লালটু পলটু উঠে এল। ছোট কাকা ঘাটে এসেই বললেন, ভিতরে কে বইসা আছে রে?

সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ ছই-এর ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে দিলেন। হামাগুড়ি দিয়ে যেন কত বাধ্যের ছেলে, বের হয়ে পাটাতনে দাঁড়ালেন। ধনবৌ বড়বৌ এসেছে ঘাটে। নৌকা ছেড়ে দিলে ওরা চলে যাবে। তখন মণীন্দ্রনাথ পাড়ে উঠে আসছেন। চোখমুখে কি ভয়ঙ্কর উদাসীনতা! নৌকার গলুইয়ে জল দিয়ে ঈশম ঘাট থেকে দড়ি ছেড়ে দিলে পাগল মানুষ ছুটে যেতে চাইলেন। বড়বৌ এখন ঘাটে। সুতরাং কোনও ভয় নেই। সে যেমন দু'হাত ছড়িয়ে অন্যান্যবার আগলে রাখে এবারেও আগলে রাখল। বলল, এস, বাড়ি এস।

বড়বৌর সেই এক বিষণ্ণ মুখ! কত আর বয়েস এই বড়বৌর। ত্রিশ হতে পারে, তেত্রিশ হতে পারে। বড়বৌর বয়স মুখ দেখে ধরা যায় না। বড়বৌর দিকে তাকিয়ে পাগল মানুষ আর নড়লেন না। সোনা ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল, বড় জেঠিমা জ্যাঠামশাইকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। সোনার বড় কষ্ট হতে লাগল। সে এবার গলা ছেড়ে হাঁকল, জ্যাঠামশয়।

মণীন্দ্রনাথ কেমন দু'হাত ওপরে তুলে দিলেন। আশীর্বাদ করার মতো ভঙ্গিতে দু'হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সোনা এবার চিৎকার করে বলল, দশরা থাইকা কি আনমু?

পার তো আমার জন্য কপিলা গাইর দুধ এনো—যেন এমন বলার ইচ্ছা। আর যদি পার, শীতলক্ষ্যার চরে এখন যেসব কাশফুল ফুটে থাকবে, বাতাসে তা আমার নামে উড়িয়ে দিও। সেই এক মেয়ে, পলিন যার নাম, পার তো তার নামে কিছু কাশফুল জলে ভাসিয়ে দিও।

সোনা দেখল জ্যাঠামশাই কিছুই বলছেন না! জেঠিমা চুপচাপ। ক্রমে নৌকা ভেসে যেতে থাকল। ক্রমে ধানখেত পার হলে, সোনালী বালির নদী। নদীতে নৌকা নেমে গেলে আর কিছু দেখা গেল না। সোনাও এবার ছইয়ের ভিতর চুপচাপ বসে থাকলে ঈশম বলল, কি দ্যাখছেন সোনাবাবু?

বিলের জলে নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল ঈশম। সোনাকে এমন চুপচাপ দেখে কথা না বলে পারছিল না।

সোনা অপলক শুধু দেখছিল। এমন অসীম জলরাশি, পারাপারহীন জলরাশি—কত দুর চলে গেছে—বুঝি আর এই নাও এবং মাঝি বিল পার হবে না—জল শুধু জল। সোনা বিস্ময়ে হতবাক। সোনা কিছু বলল না। এই বিলে আবেদালির বৌ ডুবে মরেছে। এই বিলের জলে এক ময়ূরপঙ্খী নাও আছে—সোনার নাও, পবনের বৈঠা। সোনার বলতে ইচ্ছা হল ঈশমকে—এই যে জল, জলের নিচে যে নাও, সোনার নাও পবনের বৈঠা—পারেন না আপনে সেই নাও তুলে আনতে। আমি, আপনে আর পাগল জ্যাঠামশাই সেই নাও নিয়ে বিল পার হয়ে চলে যাব। যেন এমন নাও মিলে গেলেই ওরা সেই র‍্যামপার্টে চলে যেতে পারবে। চোখ নীল, সোনালী চুল মেয়ের-আহা, বড় ডুব দিতে ইচ্ছা করছিল বিলের জলে। ডুব দিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকাটা তুলে আনতে ইচ্ছা হচ্ছিল সোনার।

ভোরবেলা উঠে মালতী যেমন অন্যদিন সে তার হাঁস কবুতর খোঁয়াড় অথবা টঙ থেকে ছেড়ে দেয়, যেমন সে অন্য কাজগুলি করে চুপচাপ কিছুক্ষণ উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি সে আজও দাঁড়িয়ে থাকল। হাঁসগুলি জলে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে। রাতে ভাল ঘুম হয়নি মালতীর। কারা যেন সারারাত অন্ধকারে বাড়িটার ঝোপে জঙ্গলে

ঘোরাফেরা করেছে। দাঙ্গার পর থেকেই মালতীর প্রাণে অহেতুক ভয়! নরেন দাসের বৌ বলেছে, তর যত কথা! কে তরে আর নিতে আইব।

সুতরাং সকালবেলা রাতের সেই ফিসফাস শব্দের কথা কাউকে সে বলতে পারল না। ভয়ে সে যথার্থই রাতে দরজা খুলে বের হয়নি। দু-একবার ওঠার অভ্যাস রাতে। সে সব চেপেচুপে সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। কে কে! এমন কি সে রাতে দু-তিনবার কে কে বলে চিৎকার করে উঠেছিল। কারা কথা কয় গাছের নিচে। সে একবার ঝাঁপ তুলে দেখবার চেষ্টা করেছে। কখনও মনে হয়েছে—সেই দাঙ্গা, দাঙ্গার আগুন চোখের ওপর জ্বলছে। সে এসব দেখলেই আঁতকে উঠত—তারপর মনে হতো, না, স্বপ্ন! জব্বরকে মালতী দু'দিন উত্তরের ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। নরেন দাস তেড়ে গেছে, তুমি এখানে ক্যান মিঞা! তারপর বলত, তর বাপ আইলে, না কইছি তা...। জব্বর হাসত। হাসতে হাসতে দাড়িতে হাত বুলাত। বড় দাড়ি-গোঁফ, চেনা যায় না—জব্বর এখন মাতব্বর মানুষ যেন। সে ওর মায়ের মৃত্যুর পর এদিকে অনেকদিন ছিল না। কোথায় কোন গঞ্জে সে এখন তাঁত কিনে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে। আবেদালির সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। আবেদালি আবার নিকা করে ভাঙা ঘরে শণ দিয়েছে। বিবির জন্য আতাবেড়া দিয়েছে। আবেদালিব হাঙ্গা করা বৌ মল বাজিয়ে এখন ঘরের ভিতর শুয়ে-বসে থাকে। আবেদালিকে জব্বর আর পরোয়া করে না। এমন কি সেদিন বাপ-বেটাতে বচসা। লাঠালাঠি। আবেদালি বলেছিল, হারে পুত, তুই জননীর গায়ে হাত দ্যাস। সেই জব্বর এখন এদিকে এলে আর বাপের কাছে ওঠে না। সে ফেলু শেখের বাড়ি এসে ওঠে। এবং যে ক'দিন থাকে, ফেলুর বিবিকে আতর কিনে এনে দেয়। সুগন্ধ তেল কিনে আনে হাট থেকে এবং বড় ইলিশ কিনে এনে দু'চার রোজ প্রায় যেন জব্বর এক নবাব—পয়সার ওপর উড়ে বসে বেড়ায়। ফেলুর বিবি তো জব্বর এলেই উল্লাসে আর বাঁচে না। ফেলু সব বোঝে। সেই এক উক্তি তার—হালার কাওয়া! ভয়ডর নাই। তারপর কব্জিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ডান হাতটাতে সামান্য নিরাময়ের চিহ্ন ফুটে উঠছে। বাঁ হাতের কব্জি তেমনি ফুলে ফেঁপে আছে। কালো রং। কুমীরের চামড়ার মতো খসখসে! মরা চামড়া উঠছে কেবল। কালো তারে সাদা কড়ি এবং আলকাতরার মতো চ্যাটচ্যাটে তেল মাখতে মাখতে হাতটা আর হাত নেই। জব্বর এলে বিবি তার নাচে গায়, ফুরফুরে বাতাসে উড়ে বেড়ায় আর কী সব সলা-পরামর্শ—ফেলু তখন ছেঁড়া মাদুরে জামগাছটার নিচে শুয়ে থাকে। নিদেন যখন চক্ষে আর সয় না; বাগি বাছুরটা নিয়ে মাঠে নেমে আসে। তারপর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার—হালার কাওয়া, আমারে ডরায় না! সেই বিবি পর্যন্ত কিছুদিন হল জব্বরের সঙ্গে কথা কয় না, কী এমন ঘটনা—ওর জানার ইচ্ছা ছিল, কী এমন ঘটনা ওদের দু'জনকে মাঠের মতো বোবা বানিয়ে রেখেছে। সে আসে না, সে না এলে ফেলুর এখন আহার জোটা দায়।

কোনও কোনও দিন জব্বর সোজা উঠোনে উঠে আসত। তারপর মালতীকে ডেকে বলত, দিদি আছেন?

মালতী বাইরে এলে জব্বর বলতো, আপনের শ্বশুরবাড়ি যাইতে ইচ্ছা হয় না? আপনে শ্বশুরবাড়ি আর যাইবেন না?

—না রে, কই যামু! কে আর আছে আমার! কি আর আছে আমার!

—কি যে কন দিদি, কি নাই আপনের?

মালতীর চোখে তখন জ্বালা ধরে যেত। মালতীর চেয়ে ছোট এই জব্বর। কিছু ছোট হবে। কত ছোট হতে পারে—সকালের হাওয়া মুখে লাগবার সময় এমন ভাবল। আর দেখল এক কদর্য মুখ, চোখে এখন জব্বরের কী যেন লালসা। সে বুঝি ঘুরঘুর করতে ভালোবাসছে। সময় অসময় নাই সে লোক নিয়ে উঠোনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। এইসব দেখলেই মালতীর ভয়টা বাড়ে। তখন যেন বলার ইচ্ছা, তোমার ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিমু। অথবা সেই মানুষটার কাছে চলে যেতে ইচ্ছা হয়—ঠাকুর, দিবা আমারে একটা বড় চাকু, আইনা দিবা!

জব্বরের কথা মনে আসতেই মালতীর শরীর কেমন শক্ত হয়ে গেল। সে আর দাঁড়াল না। হেঁটে হেঁটে দীনবন্ধুর ডেফল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সে একটু আড়াল দেওয়া জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সে মানুষটাকে খুঁজছে। না, নেই মানুষটা। সে দুটো লেবুপাতা ছিঁড়ল, যেন সে এখন এখানে লেবু পাতা তুলতে এসেছে। মানুষটার বদলে সে শশীভূষণকে বৈঠকখানা ঘরে দেখতে পেল। তিনি গোছগাছ করছেন—স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু সে গেল কোথায়? এ সময়ে মানুষটা জানালায় বসে থাকে। টেবিলের ওপর গাদা বই। কেবল বইয়ের ভিতর মানুষটা ডুবে থাকে। সে গেল কোথায়! মালতী আর অপেক্ষা করল না। কাঁখে জলের কলসী থাকলে এত ভয়ের কারণ থাকে না। একটা অছিলা থাকে। তবু যখন ভাবতে ভাবতে ঠাকুরবাড়ির উঠোনে উঠে এসেছে তখন আর ফেরা যায় না। সে ভিতর বাড়িতে ঢুকলে দেখতে পেল, ঘাট থেকে বড়বৌ ধনবৌ উঠে আসছে। মালতী এ-বাড়ির সকলকেই দেখতে পেল। কেবল রঞ্জিত নেই। রঞ্জিতকে কিছু বলা দরকার। একমাত্র মানুষ এই সংসারে যাকে সব বলা যায়। সে সোনাকে অনুসন্ধান করল। সে থাকলে তাকে বলা যেত, সোনা, তোমার মামা গ্যাছে কোনখানে? কিন্তু সোনা, লালটু পলটু কেউ নেই।

বড়বৌ মালতীকে দেখেই কি যেন টের পেল! বলল, তোর মুখ এমন কালো কেন রে? কিছু হয়েছে! কেউ কিছু বলেছে?

—কি হবে আবার!

—চোখ দেখলে মনে হয় সারা রাত না ঘুমিয়ে আছিস।

মালতী এবার লজ্জা পেল। সে বলতে পারত, অনেক কিছু—না ঘুমিয়ে সে থাকবে কেন, সে তো বিধবা মানুষ, তার আর কার জন্য রাত জেগে থাকা। সুতরাং সে যা-ও

ভেবেছিল, রঞ্জিত কই বৌদি, অরে দ্যাখতাছি না, সে তাও বলতে পারল না।

মালতী উঠোন পার হয়ে এল। ঠাকুরঘরের পাশে সেই শেফালি গাছটা। সে গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। ফুলে ফুলে গাছের চারপাশটা সাদা হয়ে আছে। খুব ভোরে যারা ফুল তুলে নেবার নিয়ে গেছে। এর পরও ফুল ফুটেছে এবং ফুল ঝরে পড়েছে। মালতী কি ভেবে কোঁচড়ে ফুল তুলতে বসে গেল কিছু কাজ ছিল না হাতে অথবা এও হতে পারে, কী করে এই উঠোনে কোন অছিলায় দেরি করা যায়—যদি রঞ্জিত কোথাও গিয়ে থাকে, তবে এক্ষুনি চলে আসবে। ফুল তুলতে তুলতে সে হয়তো চলে আসবে। সে রঞ্জিতের জন্য গাছের নিচে ফুল তোলার অভিনয় করছে। মালতীর খোঁপা খুলে গিয়েছিল—খালি গা মালতীর—সাদা থানে মালতীকে এই সকালে সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছে। কি পুষ্ট তার বাহু। এখন পুষ্ট বাহু আর শরীর নিয়ে সে কী করবে। রঞ্জিতের কাছে সে বুঝি এমন একটা প্রশ্ন করতেই এসেছে—আমি কী করি! আমি কী যে করি! তখনই উঠোনে পায়ের শব্দ। বুঝি রঞ্জিত। সে চোখ তুলে দেখল ছোটকর্তা। পিছনে অলিমদ্দি। অলিমদ্দিকে নিয়ে তিনি বোধ হয় যজমান বাড়ি যাচ্ছেন। পূজা-পার্বণের সময় এটা। দুর্গা পুজার সময়—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, দশমীর পর ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা পূর্ণিমাতে এসে ভরে যায়। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা—রাতে কোজাগরী জ্যোৎস্না। কি সাদা! কত ইচ্ছা তখন মালতীর। নদীর চরে সাদা জ্যোৎস্নায় তরমুজ খেতে চুপচাপ রঞ্জিতকে পাশে নিয়ে বসে থাকে। অঞ্জলিতে দু'হাত তুলে বলে, আমি বড় দুঃখিনী! তুমি আমারে নদীর পাড়ে নিয়ে যাও—অথবা যেন বলার ইচ্ছা, জলে নাও ভাসাওরে। মালতীর কেবল রঞ্জিতকে নিয়ে সাদা জ্যোৎস্নায় সোনালী বালির নদীর জলে নিভৃতে সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হয়। জলে নাও ভাসাতে ইচ্ছা হয়।

সে রঞ্জিতের প্রতীক্ষাতে বসে থাকল। সে এল না। দু'বার বড়বৌদি এদিকে এসেছিল, দুবারই বলবে ভেবেছিল, বৌদি রঞ্জিতকে দ্যাখতাছি না! কিন্তু বলা হয়নি। সঙ্কোচে সে বলতে পারেনি। বৌদি বৌদি, মনের ভিতর আকুতি তার, বৌদি বৌদি, আমি ফুল নিতে আসি নাই বৌদি, আমি...

বড়বৌ বলল, কিছু বলবি আমাকে?

—বৌদি, রঞ্জিতকে দ্যাখতাছি না!

—ও ঢাকা গেছে।

—ঢাকা গ্যাল! কেমন বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

—হ্যাঁ, গেল। সন্ধ্যায় দেখি ওর এক বন্ধু এসে হাজির। বাউল মানুষ। এ বাড়িতে তো মানুষের শেষ নাই! বৈরাগী বাউল লেগেই আছে। খাবেদাবে, শোবে, রাত কাটাবে। ভোর হলে যেদিকে চোখ যাবে সেদিকে নেমে যাবে। ভাবলাম সেই বুঝি। ওমা, রাতে দেখি, কি

সব ফিসফিস করে কথা। আমাকে বলল, দিদি ঢাকা যাচ্ছি, কবে ফিরব ঠিক নেই, ফিরব কিনা আর, তাও বলতে পারি না। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল বড়বৌ।

মালতী আর বড়বৌর সামনে দাঁড়াতে পারল না। সে বুঝি ধরা পড়ে যাবে। সে ছুটে বের হয়ে গেল। তুমি এমন মানুষ রঞ্জিত! সে যেন আর পারছে না! কোথাও ছুটে গিয়ে বুঝি ঝাঁপ দেবার ইচ্ছা। সে তেঁতুল গাছটা পার হয়ে গেল এবং বড় যে জাম গাছটা পুকুরপাড়ে ছায়া ছায়া ভাব সৃষ্টি করে রেখেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে সে হাউহাউ করে বুঝি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারবে। কেউ টের পাবে না। সে ফুলগুলি এবার জলে ফেলে দিল। এবং দাঁড়িয়ে দেখল ফুলগুলি জলে ভেসে ভেসে কত দূরে যায়! রাতের অন্ধকারে ফিসফিস করে কারা যেন কথা বলে! আমি কই যাই ঠাকুর! মালতী সহসা চিৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু পারল না! অভিমানে চোখ ফেটে শুধু জল নেমে আসছে তার।

ঈশম সহসা হেঁকে উঠল, কর্তারা ঠিক হইয়া বসেন! নৌকাটাকে খাল থেকে ঠেলে শীতলক্ষ্যার জলে ফেলে দেবার সময় এমন হেঁকে উঠল। —স্রোতের মুখে পইড়া গ্যালেন। পানিতে পইড়া গ্যালে আর উঠান যাইব না। সামনে বড় নদী, শীতলক্ষ্যা নাম তার।

এত বড় নদীর নাম শুনে সোনা ছইয়ের ভিতরে ঢুকে বসে থাকল। লালটু পলটু ছইয়ের ওপর বসে ছিল এতক্ষণ। বড় নদীতে পড়ে গেছে শুনেই লাফিয়ে পাটাতনে নামল। দেখল—বড় নদী তার দুই তীর নিয়ে জেগে রয়েছে। স্রোতের মুখে নৌকা পড়তেই বেগে ছুটতে থাকল। সারা পথ বড় কম সময়ে পার হয়ে এসেছে। পালে বাতাস ছিল। উজানে নৌকা বাইতে হয়নি। আব কি আশ্চর্য, নদীতে পড়তেই ঢাক-ঢোলের বাজনা। পূজার বাজনা বাজছে। দুই পাড়ে গাছ-পালা-পাখি এবং গাছ-পালা-পাখির ভিতর সোনা বড় অট্টালিকা আবিষ্কার করে কেমন মুহ্যমান হয়ে গেল।

সারি সারি অট্টালিকা। এত বড় যেন সেই বিল জুড়ে অথবা সোনালী বালির নদীর চর জুড়ে—গ্রাম মাঠ জুড়ে—শেষ নেই বুঝি অট্টালিকার। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। সে আর ছইয়ের নিচে বসে থাকতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে বের হতেই দেখল জলে সেইসব ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদের প্রতিবিম্ব ভাসছে। যেন জলের নিচে আর এক নগরী। সে

তার গ্রাম ছেড়ে বেশিদূর গেলে মেলা পর্যন্ত গেছে। কোথাও সে এমন প্রাসাদ দেখেনি—সে এবার উঠে দাঁড়াল। নৌকার মুখ এবার পাড়ের দিকে ঘুরছে। সামনে স্টীমার ঘাট, ঘাটের পাশে বুঝি নৌকা লাগবে।

পাড়ে পাম গাছ। সড়ক ধরে পাম গাছের সারি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সড়কের ডাইনে নদীর চর এবং কাশফুল। উত্তরের দিকে পিলখানার মাঠ, মাঠ পার হলে বাজার এবং আনন্দময়ী কালীবাড়ি। ঘাটে রামসুন্দর এসেছিল ওদের নিতে—সে পাড়ে উঠে যাবার সময় সব বলল।

নদী থেকে যত কাছে মনে হয়েছিল, যেন নদীর পাড়েই এই সব অট্টালিকা—নদীর পাড়ে নেমে মনে হল সোনার, তত কাছে নয়। ঠিক সড়কের পাশে পাশে হাঁটু সমান পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় লোহার রেলিঙ। ছোট-বড় গম্বুজ! কোথাও সেই গম্বুজে লাল-নীল পাথরের পরী উড়ছে। দু'পাশে সারি-সারি ঝাউগাছ। গাছের ফাঁক দিয়ে দীঘিটা চোখে পড়ছে। দু'পাড়ে বিচিত্র বর্ণের সব পাতাবাহারের গাছ, ফুলের গাছ, কত রকমারী সব ফুল ফুটে আছে, যেন ঠিক কুঞ্জবনের মতো। সাদা পদ্মফুল দিঘিতে—দু’পাড় বাঁধানো এবং ঝরনার জল যেন পড়ছে তেমন কোথাও শব্দ শুনে সোনা চোখ তুলে তাকাল। দেখল পাশে ছোট একফালি জমি। কি সব কচি ঘাস, লোহার জাল দিয়ে বেড়া। ভিতরে কিছু হরিণ খেলা করে বেড়াচ্ছে।

লালটু-পলটু এই হরিণ অথবা চিতাবাঘের গল্প তাকে বলেছে। সে মনে-মনে একটা বিস্ময়ের জগৎ আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিল। কিন্তু কাছে, এত কাছে এমন সব হরিণশিশু দেখে সোনা হতবাক। রামসুন্দর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লালটু-পলটু পিছনে আসছে। সে ছুটে ছুটে এতটা এসেছিল। তারপর গেলেই বুঝি সেই চিতাবাঘ এবং ময়ূর। ময়ূরের পালক সে যাবার সময় নিয়ে যাবে ভাবল। তখনই মনে হল ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে। নুড়ি বিছানো রাস্তা। সাদা কোমল আর মসৃণ। সে দুটো-একটা নুড়ি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেলল। তারপর মুখ তুলতেই দেখল, খুব সুন্দর এক যুবা এই অপরাহ্ণে ঘোড়ায় কদম দিতে দিতে ফিরছেন। পিছনে ফুটফুটে একটি মেয়ে। গায়ে সাদা ফ্রক! জরির কাজ ফ্রকে। ঘাড় পর্যন্ত মসৃণ চুল। সোনার মতো ছোট এক মেয়ে—যেন সেই রেলিঙ্ থেকে একটা বাচ্চা পরী উড়ে এসে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে। সোনাকে পলকে দেখা দিয়েই সহসা উড়ে গেল। সদর খুলে গেছে ততক্ষণে। ঘোড়ার পিঠে সেই যুবা দিঘির পাড়ে বাচ্চা পরী নিয়ে উধাও হয়ে গেল। সোনা কেমন হতবাকের মতো তাকিয়ে থাকল শুধু।

তার মনে হল ছোট্ট এক পরী ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে চলে গেছে। যেদিকে ঘোড়া গেছে, সোনা সেদিকে ছুটতে থাকল। ছুটতে ছুটতে সেই সদর দরজা। লোহার বড় গেট, ভিতরে একটা মানুষের গায়ে বিচিত্র পোশাক। হাতে বন্দুক কোমরে অসি। মাথায় নীল রঙের পাগড়ি। দরজা বন্ধ বলে সোনা ঢুকতে পারছে না ভিতরে। ঘোড়াটা এত বড় বাড়ির

ভিতর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! সোনার কেমন ভয় ভয় করছে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল, রামসুন্দর, লালটু পলটু আসছে।

সোনা ছোট্ট এক প্রাণপাখির মতো অট্টালিকার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। যেন সে এক রাজার দেশে চলে এসেছে। রাজবাড়ি। এই সদরে মানুষ-জন বেশি ঢুকছে না। দীঘির দক্ষিণ পাড় দিয়ে মানুষ-জন যাচ্ছে। এ-ফটক অন্দরমহলের। সোনা নিরিবিলি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে রামসুন্দর তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল।

মহলের এই ফটকে সবাই ঢুকতে পারে না। কেবল আপনজনেরা ঢুকতে পারে। অথবা কিছু আমলা যারা এই পরিবারে দীর্ঘকাল ধরে আশ্রিত। বিশেষ করে ভূপেন্দ্রনাথ, যার সততার তুলনা নেই, পারিবারিক সুখ-দুঃখে যে মানুষ প্রায় ঈশ্বরের শামিল। সোনা ঘোড়াটার পিছু-পিছু ছুটে ভেতরে ঢুকতে চাইলে মল্ল মানুষের মতো দুই বীরযোদ্ধা ফটক বন্ধ করে ছোট এক প্রাণপাখিকে ভিতরে ঢুকতে মানা করে দিল। সোনা প্রথম গরাদের ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে দিল। সে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে। অনেক দূর থেকে যেন কী এক সুর ভেসে আসছে। কে গান গাইছে যেন। সামনে সারি সারি থাম, কারুকাজ করা কাঠের রেলিঙ। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন। সে প্রায় ফড়িঙের মতো উড়ে উড়ে ভিতরে চলে যেতে চাইছে।

তখন কোথাও এক নর্তকী নাচছিল। ঘুঙুরের শব্দ কানে আসছে। তখন কোথাও ঢাকের বাদ্যি বাজছিল। ছাদের ওপর সারি-সারি পাথরের পরী উড়ছে। ওরা বাতাসে শরীরের সব বসনভূষণ আলগা করে ওড়াচ্ছে। অথবা পা তুলে হাত তুলে নাচছিল। চার পাশে সব মসৃণ ঘাসের চত্বর। কোমল ঘাসে ঘাসে পোষা সব বুলবুল পাখি। ছোট-ছোট কেয়ারী করা গাছ। গাছে-গাছে ফুল ফুটে আছে। দক্ষিণ থেকে এ-সময় কিছু পাখি উড়ে এসেছিল। সে-সব পাখি কলরব করছে। সে ফটকে মুখ রাখতেই দেখল—লাল অথবা হলুদ রঙের পোশাক পরে ছোট-ছোট মেয়েরা লুকোচুরি খেলছে, তখনই রামসুন্দর হাঁকল, ফটক খুলতে হয়। ভুইঞা কর্তার পরিজন আইছে। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে লোহার ফটক খুলে গেল। সোনাকে সেই মল্ল মানুষরা আদাব দিল! লালটু পলটু কি গম্ভীর! চাপল্য ওদের বিন্দুমাত্র নেই।

ওরা শেষে একটা জলের ফোয়ারা পেল। সোনা যত দেখে, তত চোখ বড় হয়ে যায়। সেই মানুষ দু'জন বন্দুক ফেলে সোনাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চাইলে, সোনা রামসুন্দরের পেছনে চলে গেল। কিছুতেই ওরা সোনাকে কাঁধে তুলে নিতে পারল না। ভুইঞা কর্তার পরিজন এই সোনা, ছোট্ট সোনা। জাদুকর-এর পালিত পুত্রের মতো মুখ চোখ। ওরা সোনাকে কাঁধে তুলে ভূপেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে চাইল। যেন নিয়ে গেলেই ইনাম মিলে যাবে তাদের—কিন্তু সোনা হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব। বেশি জোরজার করলে হয়তো সে কেঁদেই ফেলবে।

সোনা হেঁটে যেন এ-বাড়ি শেষ করতে পারছে না। সে যে এখন কোথায় আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। মাথার ওপর বড়-বড় ছাদ। ছাদে ঝাড়লণ্ঠন দুলছে। লম্বা বারান্দা, জালালি কবুতর খিলানের মাথায়, জাফরি কাটা রেলিঙের পর্দা—কত দাসদাসীর কণ্ঠ—এসব যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। রামসুন্দর হাত ধরে মহলার পর মহলা পার করে নিয়ে যাচ্ছে। আহা, এ-সময় পাগল জ্যাঠামশাই থাকলে সোনার এতটুকু ভয়ডর থাকত না। দেওয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র পূর্বপুরুষদের। তারপরই নাটমন্দির। এখানে এসেই সে আবার আকাশ দেখতে পেল। ওর যেন এতক্ষণে প্রাণে জল এসেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ কাছারি বাড়িতে বসে ছিলেন। পূজার যাবতীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের হিসাবপত্র নিচ্ছিলেন। তখন কানে গেল—ওরা এসে গেছে। মোটা পুরু গদীতে বসে ছিলেন তিনি। সাদা ধবধবে চাদর বিছানো। মোটা তাকিয়া। মানুষ-জন কিছু প্রজাবৃন্দ নিচে বসে রয়েছে। তিনি সব ফেলে ছুটে গেলেন। কারণ এবার কথা আছে সোনা আসবে পূজা দেখতে। শেষ পর্যন্ত শচী ওকে পাঠাল কিনা কে জানে। সকাল থেকেই মনটা উন্মনা হয়ে আছে। রামসুন্দরকে ঘাটে বসিয়ে রেখেছেন দুপুর থেকে। কখন আসবে, কখন আসবে এমন একটা অস্থির ভাব। তিনি সব ফেলে ছুটে গেলে দেখলেন নাটমন্দিরে সোনা দেবী প্রণাম করছে। পরনে নীল রঙের প্যান্ট। পায়ে সাদা রবারের জুতো, সিল্কের হাফশার্ট গায়ে। শুকনো মুখ। সেই কখন বের হয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে সোনাকে বুকে তুলে নিলেন। দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে—কত কিছু চেয়ে নেবার ইচ্ছা এই বালকের জন্য। কিন্তু আশ্চর্য, কিছু বলতে পারলেন না। বড় বড় চোখে দেবী এদের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতে তাঁর বরাভয়। মা-মা বলে চিৎকার করে উঠলেন ভূপেন্দ্রনাথ। সোনা সহসা এই চিৎকারে কেঁপে উঠল। ভূপেন্দ্রনাথের চোখে জল।

দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি। যেন পূজা নয়, প্রাণের ভিতর এক বিশ্বাসের পাখি নিয়ত খেলা করে বেড়ায়। সোনাকে বুকে নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে। দেবীর অপার মহিমা, মহিমা না হলে এই সব সামান্য মানুষ বাঁচে কী করে, খায় কী করে, প্রাচুর্য আসে কী ভাবে! এই যে সোনা এসেছে, সেও যেন দেবীর মহিমা। নির্বিঘ্নে এসে গেছে এবং এই দেশে মা এসেছেন শরৎকাল, কাশফুল ফুটেছে, ঝাড়লণ্ঠনে বাতি জ্বলবে। চরের ওপর দিয়ে হাতি যাবে। ঘণ্টা বাজবে হাতির গলায়। হাতিটাকে শ্বেতচন্দনে, রক্তচন্দনে সাজানো হবে। সবই দেবী এলে হয়। দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে ভূপেন্দ্রনাথ—এই সব নাবালকের জন্য মঙ্গল কামনা করলেন। দেবীর বড়-বড় চোখ। নাকে লম্বা নোলক, হাতের শঙ্খ-পদ্ম-গদা সব মিলে যেন কোথাও এক বরাভয়। আনন্দময়ীর বাড়ির পাশের জমিতে নামাজ পড়বে মুসলমান চাষাভুষা মানুষেরা। ওটা মসজিদ নয়। ভাঙা প্রাচীন কোন দুর্গ, ঈশা খাঁর হতে পারে, চাঁদ রায়, কেদার রায় করতে পারে, এখন সেই ভাঙা দুর্গে নামাজ পড়ার জন্য লোক ক্ষেপানো হচ্ছে। আজ সকালে এমন খবরই কাছারি বাড়িতে দিতে এসেছিল—মুসলমানরা বিশেষ করে বাজারের মৌলবীসাব, যার দুটো বড় সুতার কারবার আছে, যে মানুষের নদীর চরে একশো বিঘা ধানের জমি, খাসে রয়েছে হাজার বিঘা, সেই মানুষ

বাবুদের পিছনে লেগেছে। বোধ হয় এই দেবী, দেবীর মহিমাতে সব উবে যাবে। কার সাধ্য আছে দেবীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়! যেন হাতের শাণিত তরবারি এখন সেই মহিষাসুরকেই বধে উদ্যত। ভূপেন্দ্রনাথের মনে বোধ হয় এমন একটা ছবি ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার, মা-মা। তোর এত মহিমা! তোর এত মহিমার কথা তিনি উচ্চারণ করেন নি। কেবল সোনা, জ্যাঠামশাইর চোখে জল দেখে ভাবল, মানুষটা তাদের কাছে পেয়ে কাঁদছে। মা-মা বলে কাঁদছে।

সোনা এতটা পথ বাড়ির ভিতর হেঁটে এসেছে, অথচ সেই ছোট্ট মেয়ে কমলাকে সে কোথাও দেখতে পেল না। কোথায় আছে এখন কমলা! সে ভেবেছিল, ভেতরে ঢুকে গেলেই কমলাকে দেখতে পাবে। কিন্তু না সে নেই। সে খেতে বসে পর্যন্ত সন্তর্পণে চারদিকে তাকাচ্ছিল। কত বালক-বালিকা ছুটোছুটি করছে। কেবল সেই মেয়ে যে ঘোড়ায় চড়া শেখে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না। ছোট্ট মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে গেলে বড় আশ্চর্য দেখায়। সোনা যতক্ষণ এই ভিতর বাড়িতে ছিল কমলাকে দেখার আগ্রহে চারদিকে যেন কী কেবল খুঁজতে থাকল।

শচীন্দ্রনাথ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত ছিলেন। ছেলেরা সব পূজা দেখতে চলে গেছে। দুপুরে মনজুর এসেছিল সালিশি মানতে। মনজুর এবং হাজিসাহেবের ভিতর বিরোধ ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। হাজিসাহেবের বড় ছেলে, মনজুরের যে সামান্য জমি আছে সেখানে গত গ্রীষ্মে কোদাল মেরে আল নামিয়ে দিয়েছে। বর্ষায় যখন পাট কাটা হয়, কিছু পাট জোর-জবরদস্তি করে কেটে নিয়ে গেছে। মনজুর একা। হাজিসাহেবের তিন ছেলে। হাজিসাহেবের বড় সংসার। পাটের এবং আখের বড় চাষ। অথচ সামান্য জমির প্রলোভনে একটা খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সারা বিকেল শচীন্দ্রনাথ হাজিসাহেবের বাড়িতে বসে একটা ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ফয়সালা হলেই চলে যাবেন। উঠোনের জলচৌকিতে তিনি বসে ছিলেন। পানতামুক আসছিল। শচীন্দ্রনাথ কিছুই খাচ্ছেন না। এখন আসতে পারে ইসমতালি, প্রতাপচন্দ। বড় মিঞা আসতে পারে। তবু শচীন্দ্রনাথই সব। তিনি এক সময় হাজিসাহেবের মেজ ছেলের খোঁজ করলেন।

—আমির কৈ গ্যাছে?

—আমির নাও নিয়া গ্যাছে বড় মিঞারে আনতে।

বড় মিঞা ঘাট থেকে উঠে এসে শচীন্দ্রনাথকে আদাব দিল। বলল, কর্তা ভাল আছেন?

—আছি একরকম। তা তোমার এত দেরি?

—কইবেন না, একটা বড় নাও নদীর চরে কেডা বাইন্দা রাখছে।

—নাও কার জান না?

—কার বোঝা দায় কর্তা। দুই মাঝি। আর আছে বড় একখানা বৈঠা, পাল আছে। নাওডারে দ্যাখতে গ্যাছিলাম।

—মাঝিরা কি কয়?

—কিছু কয় না। কই যাইব, কোনখান থাইকা আসছে কিছু কয় না।

—কিছুই কয় না?

—না। রাইতের বেলা আপনের গান শোনা যায় কেবল।

—কি গান!

—মনে হয় গুণাই বিবির গান। চরে সারা রাইত ঝম-ঝম শব্দ হয়।

—গ্যাছ একবার রাইতে?

—কর্তা, ডর লাগে। রাতের বেলা গান শুনতে গ্যাছিলাম। যত যাই তত দ্যাখি নাও জলে-জলে ভাইসা যায়। দিনের বেলাতে গ্যালাম, দ্যাখি দুই মাঝি আছে। বোবা কালা। কথা কয় ইশারায়।

—কার নাও, কি জন্য আইছে জানতে পারলা না?

—না কর্তা;

—আশ্চর্য!

—হ কর্তা। বড় আশ্চর্য!

মনজুর আসতেই অন্য কথা পাড়লেন শচীন্দ্রনাথ। হাজিসাহেব মাদুরে বসে— প্রায় নামাজের ভঙ্গিতে, হাতে লাঠি, লাঠির মুখে চাঁদের বুড়ি—বুড়ো হাজিসাহেব সালিশি মেনে নিলেন। কথা থাকল, যে পাট কাটা হয়েছে, সব ওরা ফিরিয়ে দেবে। এবং জল নেমে গেলে কথা থাকল জমির আল সকলে মিলে ঠিক করে দেবে।

শচীন্দ্রনাথ এবার মনজুরকে বললেন, হা রে মনজুর নদীর চরে নাকি বড় নাও ভাইসা আইছে?

—আইছে শুনছি।

—চরের কোনখানে?

—সে অনেক দূর কর্তা।

অনেক দূর বলতে যথার্থই অনেক দূর। নদী-নালার দেশ। বর্ষাকালে এইসব গ্রাম অন্ধকারে দ্বীপের মতো জেগে থাকে। তারপর জল। শুধু জল। নদী-নালা তখন দু'পাড়ের সঙ্গে মিশে যায়। বড় বড় বাগান, ফলের এবং আনারসের। আর অরণ্য কোথাও জলে নাক ভাসিয়ে জেগে থাকে। দক্ষিণে শুধু গজারির বন। বনে বাঘ থাকে। ইচ্ছা করলে সেই নাও নিমেষে গজারি বনে পালিয়ে যেতে পারে। ইচ্ছা করলে এই নাও জলে জলে নিমেষে উধাও হয়ে যেতে পারে। টের পাবার জো নেই। প্রায় যেন এক লুকোচুরি খেলা। খালে বিলে, বিলের দু'পাশে বড় গজারির অরণ্য—দশ-বিশ ক্রোশ জুড়ে অরণ্য। সে সব অরণ্যে এখন এ-সময় ভিন্ন ভিন্ন দুর্ঘটনা খুবই স্বাভাবিক।

ঘাটে ওঠার আগে শচীন্দ্রনাথ বললেন, অলিমদ্দি, ল একবার ঘুইরা যাই।

—কই যাইবেন?

—নদীর চরে। বড় নাও আইছে। অসময়ে বড় নাও!

অলিমদ্দি লগি মেরে মাঠে এসে পড়ল। এসব মাঠে জল কম। কম জল বলে অলিমদ্দি কিছুটা পথ নৌকা বাইল। নদীর জলে পড়তেই সে বৈঠা বের করে পাল তুলে দিল, তারপর চারদিকে চোখ মেলে বলল, কই গ কর্তা, নাও ত দ্যাখতাছি না।

—চরে নাও নাই!

—কই আছে! থাকলে দ্যাখা যাইত না!

শচীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। পাটাতনে দাঁড়িয়ে দেখলেন যথার্থই চরে কোনও নৌকা নেই। বড় নৌকা দূরে থাকুক; হাটে গঞ্জে যাবার কোষা নৌকা পর্যন্ত তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি বিস্ময়ে বললেন, আশ্চর্য!

ঘরে ঘরে এখন লণ্ঠন জ্বলছে। আশ্বিন মাস বলে রাতের দিকে শীত পড়ার কথা। কিন্তু গরমই কাটছে না। ঠিক ভাদ্র মাসের মতো ভ্যাপসা গরমে শচীন্দ্রনাথের শরীর ঘামছিল। অলিমদ্দি এসে গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিচ্ছে! গরুর ঘরে একটা বড় লম্বা মশারি টাঙানো! ধোঁয়া উঠে এলে অলিমদ্দি মশারি ফেলে দিল। তখন শচীন্দ্রনাথ বড় ঘরে ঢুকে বললেন, বাবা নদীর চরে শুনছি একটা বড় নাও ভাইসা আইছে—

—কার নাও!

—তা কইতে পারমু না।

—দ্যাখ দ্যাখ, কার নাও! লক্ষ্মীর নাও হইতে পারে, আবার অলক্ষ্মীর নাও হইতে পারে! দ্যাখ, একবার খোঁজখবর কইরা।

—সকাল হলে 'ভাবছি বড় মিঞার নাও, হাজিদের নাও আর চন্দদের নাও নিয়া বাইর হমু, কোনখানে নাওটা অদৃশ্য হইয়া থাকে দ্যাখতে হইব।

কারণ বর্ষাকাল এলেই ডাকাতির উপদ্রব বাড়ে। সুতরাং এই এক বড় নৌকা ভেসে এসেছে, এবং দিনের বেলা কোথায় অদৃশ্য হয় কেউ জানে না, রাত নিঝুম হলে সকলে ভয়ে ভয়ে থাকে।

রাত হলে এইসব গ্রাম জলে জঙ্গলে একেবারে নিঝুম পুরীর মতো। কারণ গ্রামের বাড়ি সব দূরে দূরে। শুধু নবেন দাসের বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি এবং দীনবন্ধুর বাড়ি সংলগ্ন। তারপর পালবাড়ি।

হারান পালের দুই ছেলে, ভিন্নমুখী দুই ঘর এক উঠোনে করে নিয়েছে। রাত হলে সব কেমন নিঝুম হয়ে আসে। মালতীর আর তখন ঘুম আসে না। রঞ্জিত এতদিন ছিল বলে ভযডর কম ছিল। রঞ্জিত চলে গেলে ওর আর কী থাকল! যা হবার হবে। সে তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে ভাবল।

আশ্বিনের এই রাতে এমন গরম যে দরজা বন্ধ করলে হাঁসফাস লাগে। এখনও নরেন দাস জেগে আছে। তাঁতঘরে কি যেন করছে নরেন দাস। আভারানী বাসন মাজতে ঘাটে গেছে। আবু গেছে হারিকেন নিয়ে। সে পাড়ে হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। দরজা খোলা রেখে একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য পাটি পেতে মালতী শুয়ে পড়ল। গরমে গরমে শরীর যেন পচে গেছে।

গরম, রাতের অন্ধকার সব মিলে মালতীকে নানারকম হতাশায় পীড়িত করছে। কিছুই নেই আর। হায়, জীবন থেকে তার সব চলে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। গরমের জন্য সায়া সেমিজ শরীর থেকে আলগা করে দিতে দিতে এমন সব ভাবল। মানুষটা এখন কোথায় আছে, কী কাজ এমন সে করে বেড়ায়, যার জন্য নানা স্থানে তাকে ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়। ছদ্মনামটা তার কেউ জানে না। ওর একটা ছবি সে দেখেছে, ছবিতে রঞ্জিতকে চেনাই যায় না। লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—যেন এক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। মালতী এই ছদ্মবেশ কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। একদিন, তখন লাঠি খেলা ছোরাখেলা হয়ে গেছে। যে যার মতো যার-যার বাড়ি চলে গেছে। মালতীকে জ্যোৎস্নায় সহসা পিছন থেকে কে এসে আঁচল টেনে ধরল দেখল সেই সন্ন্যাসী। রুদ্র মূর্তি, মালতী ভয়ে মূর্ছা যাবার মতো। রঞ্জিত তখন বলল, আমি রঞ্জিত মালতী, চিনতে পারছ না! মালতী কাপড়টা বুকের কাছে টেনে রাখার সময়, সেই দৃশ্য মনে করে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেদিনই কেবল রঞ্জিত একবার মাত্র ওকে দু'হাতে জাপ্টে ধরে ভয় ভাঙিয়েছিল, আমি রঞ্জিত, তুমি চিনতে পারছ না। মালতী এখন ভাবছে সে বোকা। ভালো করে মুর্ছা গেলে মানুষটা নিশ্চয়ই পাজাকোলে তুলে নিত। ঘরে দিয়ে আসত। সে খিলখিল করে হেসে উঠে তখন দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সহসা অবাক করে দিতে পারত। আর মানুষটা নিজেকে বুঝি তখন কিছুতেই সামলে রাখতে পারত না। মনে হতেই ভিতরটা ওর

উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল। এবার সে সায়া সেমিজ পুরোপুরি আলগা করে ঘাটের দিকে তাকাল। অন্ধকারের জন্য ঘাটের কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাবগাছটার নিচে জল উঠে এসেছে। সেখানে জলে মাছ নড়লে যেমন শব্দ হয় প্রথমে তেমন একটা শব্দ পেল। অমূল্য থাকলে এ-সময় বড়শিতে মাছ আটকেছে ভেবে ছুটে যেত। কিন্তু মালতী জানে—নরেন দাস কোনও বঁড়শি জলে ফেলেনি। একা মানুষ বলে সারাদিন খাটা-খাটনি গেছে। এখনও রাত জেগে তাঁতঘরে সূতা ভিজাচ্ছে মাড়ে। কাল ফিরবে অমূল্য। কাজের চাপ তখন কমবে।

শোভা সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে। শরীর ভাল নেই। জ্বর-জ্বর হয়েছে। আবু এসে ঘরে ঢুকলেই দরজা বন্ধ করে দেবে ভাবল মালতী। ঘাটে হ্যারিকেন তেমনি জ্বলছে। আবুকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু আলোটা সহসা নিভে গেলে শুনতে পেল ঘাটে বাসন পড়ার শব্দ। মালতী ভাবল, ঘাট বুঝি পিছল ছিল, উঠে আসার সময় বৌদি পা ঠিক রাখতে পারেনি, পড়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁতঘরে ঢুকে কারা যেন ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। মালতী এবার উঠে বসল। এ সময়ে চোর ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব বাড়ে। সে ডাকল, দাদারে তর ঘরে লড়ালড়ি ক্যান! কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার—না কোনও শব্দ, না কোনও চিৎকার। ফের সব নিঝুম। সে তাড়াতাড়ি সায়া সেমিজ ঠিক করে উঠে বসল। আলো জ্বালাবে এই ভেবে হ্যারিকেনটা টেনে আনার জন্য উঠে দাঁড়াতেই দুই ছায়ামূর্তি অন্ধকারে সাপ্টে ধরে মুখে কাপড় ঠেসে দিল। এই ঘরে এখন ধস্তাধস্তি। শোভা জেগে গেল। অন্ধকারে শুধু ফোস-ফোঁস শব্দ। কিল লাথি এবং মহাপ্রলয়ের মতো ঘটনা। সে ভয়ে ডাকতে থাকল পিসি-পিসি। তারপর আর কারও কোনও সাড়া নেই! কারা যেন ভূতের মতো এই গৃহ থেকে যুবতী মেয়ে তুলে বর্ষার জলে ভেসে গেল।

সোনা খেয়ে উঠে নাটমন্দিরের সিঁড়িতে নেমে এল। লালটু পলটু এখন জমিদার বাবুর ছেলেদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। সোনা এ-বাড়ির কাউকে চেনে না। সেই আকাশ আবার মাথার ওপর।

সে যেন অনেকক্ষণ কোঠা বাড়ির ভিতর দিয়ে হেঁটে এসে আকাশটাকে দেখে ফেলল। সব কিছুই নতুন। অপরিচিত মুখ। জ্যাঠামশাই আগে আগে হেঁটে যাচ্ছেন। সে প্রায় সব সময় জ্যাঠামশাইর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। সে একটা সাদা হাফ শার্ট গায়ে দিয়েছে। নীল রঙের প্যান্ট। চুল ছোট করে ছাঁটা। চোখ বড় বলে অপরিচিত মানুষজনেরা ওকে ঘিরে ধরেছে। ওর নাম কি, জিজ্ঞাসা করছে। জ্যাঠামশাই তখন সামান্য হাসছেন। নাম বলতে বলছেন। এবং সে যে চন্দ্রনাথ ভৌমিকের ছোট ছেলে, বিকেলের ভিতরেই সেটা ছড়িয়ে পড়ল। নাটমন্দিরের পুরোহিত মশাই সোনাকে দুটো সন্দেশ দিল খেতে। সে সন্দেশ দুটো খেল না। জ্যাঠামশাইকে দিয়ে দিল রেখে দিতে। সে জ্যাঠামশাইকে ফেলে খুব একটা দূরে যেতে সাহস পাচ্ছে না। লালটু পলটু ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। দীঘির পাড়ে ব্যাডমিন্টন খেলা হবে, সোনা যায়নি। বস্তুত সোনা যেতে সাহস পায়নি। ঈশম এলে সে যেন যেতে পারত। ঈশম এখন নদীতে আছে। এ ক'দিন সে নদীতে থাকবে। ছইয়ের

ভিতর সে শুয়ে বসে অথবা মাছ ধরে, বেলে মাছ এবং পুঁটি মাছ ধরে কাটিয়ে দেবে। নিজের নৌকায় রান্না করবে, এবং খাবে।

মাঝে মাঝে সোনার আর যা মনে হচ্ছিল, সে এক মেয়ের কথা, যে মেয়ে বাপের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে অন্দরে ঢুকে গেল। সোনার সেই জগতে মাঝে মাঝে চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ছোট ছোট মেয়েরা, ছেলেরা লুকোচুরি খেলছে জরির টুপি পরে, সিল্কের ফ্রক গায়ে দিয়ে। সোনার ইচ্ছা হল সেই বড় উঠোনটাতে চলে যেতে। যেখানে সে ফুল ফুটে থাকার মতো মেয়েদের ফুটে থাকতে দেখে এসেছে। সে জনিত, ওরা এত বড় যে, তাকে তারা খেলায় নেবে না। সে একপাশে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে। সে খেলবে না। খেলা দেখবে! ওর মুখে দুঃখী রাজকুমারের ছবি ভেসে উঠবে। তখন হয়তো কোনও ছোট্ট মেয়ে ওর হাত ধরে বলবে, এস, আমাদের সঙ্গে খেলবে! আমরা লুকোচুরি খেলব! সেই জগৎটাতে যাবার বড় প্রলোভন হচ্ছিল সোনার। পরী কী হুরী হবে কে জানে, ছোট্ট এক মেয়ে তার চোখের উপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল—এখন আর সোনার অন্য কথা মনে আসছে না। কাছারিবাড়িতে বসে শুধু সেই ছোট্ট মেয়ের মুখ মনে ভাসছে। তখন জ্যাঠামশাই ডাকলেন, সোনা আয়!

কোথায় যাবে! সোনা এখন ঠিক বুঝতে পারছে না। জ্যাঠামশাই একটা শার্ট গায়ে দিলেন। ধুতি পাট করে পরলেন। তারপর ওরা যেদিকে খেতে গিয়েছিল, সেদিকে না গিয়ে একটু বাঁ দিক ঘেঁষে বারান্দার নিচে যে কেয়ারি করা ফুলের বাগান আছে তার ভিতর ঢুকে গেলেন। যেন এই মহলাতে ঢুকতে হলে তুমি কিছু প্রথমে ফুল ফল দেখে নাও—তেমনি দৃশ্য এই ঢোকার মুখে। নানা রকমের গাছ এবং ফুল ও ফল। এ-রাস্তাটা যে বাড়ির ভিতরই আছে অনুমান করতে পারেনি। আর এ-কী বাড়ি রে বাবা, যেন সেই কী বলে না, শেষ নেই তার, সোনা একপথে এসে এখন আবার অন্য পথে নেমে যাচ্ছে। তার বাড়ি সেই অজ পাড়াগাঁয়ে। সেখানে মাত্র প্রতাপ চন্দ্রের বাড়িতে দালান, অন্য বাড়ি সব টিনকাঠের। ওদের বাড়ির দেয়াল এবং মেঝে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। দক্ষিণের ঘর, পুবের ঘর, সব ঘরের একটা নাম আছে। এখানে কোনও নাম নেই। এখানে সব হলঘরের মতো ঘর। জ্যাঠামশাই যেতে যেতে সব ঘরগুলির নাম বলে যাচ্ছেন। দেয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র। সে-সব তৈলচিত্র কার, কোন সালে মারা গেছে, কার জন্ম কোন মাসে, বাবুদের হাতি কবে কেনা হয়েছে, যেতে যেতে জ্যাঠামশাই হাতি কেনার গল্প করতে থাকলেন। তারপর একটা সিঁড়ি। দোতলায় উঠে গেছে। কার্পেট পাতা। সোনা এ-সবের কী নাম কিছু জানে না। জ্যাঠামশায় সোনাকে সৎ বলে যাচ্ছেন। কী সুন্দর আর নরম কার্পেট সোনার খালি-পা ছিল। সে খুব আস্তে আস্তে, বুঝি দ্রুত হেঁটে গেলে কার্পেটে পা লাগবে— সে তেমনভাবে সিঁড়ি ভেঙে উ পরে উঠে গেল। দু'পাশে সব রেলিঙ্। কেবল মেয়েরা এখানে গিজগিজ করছে। ভূপেন্দ্রনাথ এমন মানুষ যে তাঁর কাছে অন্দর সদর সমান। সে একটা পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, বৌঠাইরেন, আমি আইছি। সোনা পাশে চুপচাপ পলাতক বালকের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এই ভিতর বাড়ির ঐশ্বর্য এবং বৈভব দেখতে দেখতে কেমন

আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওর মনে হল এখানে মানুষ থাকে না, দেব-দেবীরা থাকে। সে-যতটা পারল জ্যাঠামশাইর জামা-কাপড়ের ভিতর নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্ট করল।

সোনা কান পেতে থাকল। কে সাড়া দিচ্ছে, কোনদিকের দরজা খুলছে, সেই মেয়েটা কোথায়? এসব ভাবনার সময়ই মনে হল পর্দা নড়ছে। পর্দার ও পাশে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

ভূপেন্দ্রনাথের সবুর সইছে না। সে পর্দার এপাশ থেকে বলে উঠল, বৌঠাইরেন, সোনা আইছে।

বৌঠানের পাশে রাঙা চেলি পরে ছোট্ট এক মেয়ে—কেবল সেই থেকে ঘুরঘুর করছে! শালিক না চড়ুই কি পাখির যেন ছানা তার চাই। সে পুতুলের ঘর সাজাবে। পুজোর দিন বলেই রাঙা চেলি পরেছে। পায়ে আলতা। কপালে টিপ লাল রঙের। চুল বব-ছাঁট। চোখে লম্বা কাজল। হাতে হাতির দাঁতের কারুকাজ করা বালা। কমলা, পুজোর দিনে কত রকমের গয়না পরেছে। সেও ঠাকুমার পায়ে পায়ে বের হয়ে এল।

ভূপেন্দ্রনাথ ফের বললেন, সোনা আইছে বৌঠাইরেন।

বৌঠান চারদিকে তাকালেন। কোথায় সেই ছেলে! সোনা জ্যাঠামশাইর পিছনে এমন লেগে আছে যে সহসা দেখা যায় না। কমলা বলল, দাদু সোনা কোথায়?

ভূপেন্দ্রনাথ জোর করে সোনাকে পেছন থেকে টেনে আনল, এই হইল সোনা!

কমলা বলল, দেখি সোনা তোমার মুখ। কেমন পাকা পাকা কথা কমলের! সেই মেয়ে! সোনা লজ্জায় আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল।

বৌঠান সোনাকে অপলক দেখল। ভূপেন মিথ্যা বলেনি। দেখেই বোঝা যায় এই সোনা ভূপেন্দ্রনাথের বড় আদরের চন্দ্রনাথের ছোট ছেলে সোনা। চন্দ্রনাথ বিকালে এ-বাড়ির কাছারিবাড়িতে রোজ আসে। ভোরের দিকে কোনও কোনও দিন দেখা করে যায়। পুজোর সময় কাজের চাপ বলে বোধ হয় ভোরে দেখা করে যেতে পারেনি। এবার শচীন্দ্রনাথ সোনাকে আসতে দিয়েছে, ভূপেন্দ্রনাথের প্রাণে বড় আনন্দ। পুজোর ক'টা দিন তিনি খুবই ব্যস্ত থাকবেন, তবু আপন রক্তের এই তিন বালকের উপস্থিতি তাঁকে বড় মহিমময় করে রাখছে। ভূপেনের মুখ দেখলে এ-সব যেন টের পাওয়া যায়। বাড়ি থেকে ফিরে এলেই সে বৌঠাকুরানীকে বলত, বোঝলেন বৌঠাইরেন, সোনা যে কী হাসে না, কী বড় চোখ না, কী সুন্দর হইছে পোলাটা—আপনেরে আর কি কমু! বড় হইলে আপনেরে আইনা দ্যাখামু। সেই সোনা এ বাড়ি আসতেই এখানে টেনে নিয়ে এসেছেন, দ্যাখেন, আনছি। দ্যাখেন, মুখখানা একবার দ্যাখেন বৌঠাইরেন।

বৌঠাকু রানী সোনার মুখ দেখতে দেখতে শুধু ভাবলেন, ভূপেনের কথায় কোনও অতিশয়োক্তি ছিল না—পোলার মুখ ত রাজার মতো হইছে। কুষ্ঠি করাইছ নি!

—কুষ্ঠি সূর্যকান্তরে দিছি করতে। বলে সে সোনাকে বলল, প্রণাম কর। জ্যাঠিমা হন।

সোনা উবু হয়ে প্রণাম করলে দু'হাতে তুলে ধরলেন এবং চিবুক ধরে আদর করার সময়, হাতে একটা চকচকে রুপোর টাকা দিলেন। হাতে ওর রুপোর টাকা সে নেবে কি নেবে না ভাবছিল। জ্যাঠামশাইর দিকে সে তাকাল। তিনি চোখের ইশারায় সোনাকে অনুমতি দিয়েছেন। সোনাকে এই প্রথম দেখলেন বড় বৌঠাকুরানী। এই সোনা, এত বড় বৈভবের ভিতর প্রথম ঢুকেছে। সোনাকে তিনি বুঝি রুপোর টাকা দিয়ে বরণ করে নিলেন। হাতে টাকা, এমন টাকা-পয়সা কত আঁচলে বাঁধা থাকে, এ-যেন আশ্চর্য যোগাযোগ, কথা ছিল টাকাটা দিয়ে ময়নার বাচ্চা কিনে দেবেন কমলাকে। তখনই কিনা সোনা দরজায় দাঁড়িয়ে—তিনি টাকা দিয়ে সোনাকে আশীর্বাদ করলেন।

কমল মনে মনে ফুঁসছিল। ভূপেন্দ্রনাথ ওর সম্পর্কে দাদু হন। ভূঁইঞা-দাদু সে ডাকে। দাদু কোনও কথা বলছেন না। কমল যে এ-বাড়ির মেজবাবুর মেয়ে, ওরা যে দু-বোন ঠাকুমার কাছে শরৎকাল এলেই চলে আসে, মেজবাবু আসেন এসব বলছে না। মেজবাবু সরকারি অফিসে বড় চাকুরি করেন, বিদেশে তার প্রবাসজীবন দীর্ঘদিন কেটেছে। তার মা মাঝে মাঝে দেশের গল্প করেন। সে দেশটাতে একটা নদী আছে, নাম টেমস নদী, সে দেশটাতে একটা গ্রাম আছে, তার নাম লুজান। একটা গীর্জা আছে সকলে ওকে সেন্ট পলের গীর্জা বলে, দুপাশে গাছ আছে, ওরা নাকি উইলো গাছ, দুপাশে জমি আছে, শোনা যায় সন্ধ্যা হলে স্কাইলার্ক ফুল ফুটে থাকে। অমলা কমলা সে-সব গল্প শোনার সময় তন্ময় হয়ে যায়। আর সামনে এই বালক সোনা নাম, তাকে সেইসব দেশের গল্প না বলতে পারলে, এতবড় নদী পার হয়ে আসা, এত বড় বাড়িতে বসবাস করা বৃথা, এবং ছুটতে না পারলে, সে যে কমল, মা তার বিদেশিনী, এ সব যেন বোঝানো যাচ্ছে না। দাদু মাকে বাবাকে ভালোবাসে না। বাবার জন্য দাদু আলাদা বাড়ি করে দিয়েছে। বুঝি মাকে নিয়ে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে ঢোকা বারণ। না, এসব সোনাকে বলা যাবে না। দিদি এখন থেকে ওকে সব শেখাচ্ছে। দিদি বলে দিয়েছে, সবকিছু সবাইকে বলতে নেই। আমি তোমাকে সোনা সব কিন্তু বলব না। আমাকে ঠাকুমা শালিকের বাচ্চা এনে দেবে। আমি পুতুল খেলব। তোমার মুখ দেখলে কেবল আমার পুতুল খেলতে ইচ্ছা হয়।

সোনা হাতের টাকাটা পকেটে রাখল। তখন কমল আর সহ্য করতে পারল না। সোনা এবং ভূঁইঞা-দাদু চলে যাচ্ছে। সোনা ঠাকুমাকে তার ভালো নাম বলেছে। ভাল নাম ওর অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। কি নাম রে বাবা। কত বড় নাম!

তার মামাদের যেমন অদ্ভুত সব নাম—জন, ক্যামবেল, মার্টিন, বিশপ—কী সব নাম মামাদের! সে মনেই রাখতে পারে না। সোনার নামটাও প্রায় তাই সে আর সহ্য করতে পারছে না। বলেই ফেলল, সোনা আমাকে কী বলে ডাকবে?

বোধ হয় ভূপেন্দ্রনাথ কমলের কথা শুনতে পাননি। বৌঠাকুরানী এবং ভূপেন্দ্রনাথ কিছু পারিবারিক কথাবার্তা বলছিলেন। ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় কে একজন

অনেকদিন পর পূজা দেখতে এসেছেন। দেখাশোনার জন্য যেন আলাদা লোক দেওয়া হয়, এ-সব কথা বলছিলেন। তখন সোনা কেন জানি কমলের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। আমি তোমাকে আবার কি ডাকব। কমল ডাকব। পুচকে মেয়ে, বুঝি এমন বলার ইচ্ছা সোনার।

—দাদু, আমাকে সোনা কমল পিসি ডাকবে না? বলে সোনার দিকে গরবিনীর চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

এতক্ষণে সোনার মনে হল কমলের চোখ ঠিক কালো নয়। ঠিক নীল নয়। ঘন নীল অথবা কালো রঙের সঙ্গে হলুদ মিশালে এক রঙ—কি যে রঙ চোখে বোঝা দায়। তারপর মনে হল বেথুন ফলের মতো রঙ। বেথুন ফল পাকলে খোসা ছাড়িয়ে নিলে এমন রঙ হয়। সোনা দেখল, কমল ওর দিকে টগবগ করে তাকাচ্ছে। গাল ফুলিয়ে রেখেছে। সোনা ছড়া কাটতে চাইল, গাল ফুলা গোবিন্দের মা চালতা তলা যাইও না। কিন্তু এই বাড়ি, এতবড় বাড়ির বৈভব ওকে এখনও ভীতু করে রেখেছে। সে কিছু বলতে পারল না।

এ-সময় ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, তোমাকে সোনা কমল-পিসি ডাকবে। কি ক'ন বৌঠাইরেন। কমল সোনার বড় হইব না?

—তা তোমার হইব। আট-দশ মাসের বড় হইব।

সোনা যেন একটু মিইয়ে গেল। বৌঠাকুরানী ভূপেন্দ্রনাথকে বললেন, মায়রে ছাইড়া থাকতে পারব ত?

—পারব।

—না পারলে ভিতর বাড়িতে পাঠাইয়া দিও।

—দিমু।

বস্তুত এই পরিবারে ভূপেন্দ্রনাথ যথার্থ আত্মীয়ের মতো। এই তিন বালক, আত্মীয়ের শামিল। লালটু পলটুর সমবয়সী বৌঠাকুরানীর দুই বড় নাতি, ওর বড় ছেলে অজিতচন্দ্রের ছেলে এবং ছেলের ছোট শ্যালক নবীন। লালটু পলটু এলে কাছারিবাড়ির লনে অথবা দীঘির পাড়ে খেলা ব্যাডমিন্টন খেলা। বাবুদের আরও সব আমলা কর্মচারীর ছেলেরা সমবয়সী না হলেও—একসঙ্গে পূজার ক'টা দিন খুব হৈচৈ—যেন প্রাণে আর ঐশ্বর্য ধরে না। সারাদিন পূজার বাজনা। কেবল বাদ্য বাজে। ঢাক ঢোল বাজে। কাঁসি বাজে। আর অষ্টমীর দিনে বাবুদের বাড়ি বাড়ি পাঁঠা বলি। শীতলক্ষ্যার পাড়ে পাড়ে তখন কী জাঁকজমক নবমীতে মোষ বলি, হাড়কাঠে তখন পাঁঠা, মোষ, মোষের বলিদান। ভোর থেকে কমল বৃন্দাবনীর সঙ্গে ফুলের জন্য বা গানে ঠিক মৌমাছি হয়ে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। কলকাতার কমল গাঁয়ে এসে পূজার এ-ক'টা দিন ফুরফুরে পাখি হয়ে যায়।

সেই কমল সোনার হাত ধরে সারা প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে বেড়াল। হা-হা করে হাসল। হাসবার সময় সে বড় হলঘরে তার এই হাসির প্রতিধ্বনি কেমন শোনাল কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

হাত ধরে সে ছুটল। বড় বড় খিলান আর টানা লম্বা বারান্দা। ছোটার সময় সে পকেট ধরে রেখেছিল। পকেটে টাকাটা আছে। ছুটতে ছুটতে ওরা অন্দরের দিকটায় এসে গেল। কেমন নিঝুম, বাড়ির পিছনে বড় বড় গাছ সব। সারি সারি সুপারি ফলের বাগান। কমল হাত ধরে এবার ফিরে আসার সময় বলল, সোনা, ঐ দ্যাখ আমার দিদি দাঁড়িয়ে আছে। যাবি?

সোনা ঘাড় কাত করল। সে এখনও কমল অথবা কমল-পিসি কিছুই বলছে না। কেবল কমলের হাত ধরে সে হাঁটছে।

বারান্দায় রেলিঙে সেই মেয়ে। সোনা নাম বলে দিতে পারে। মেয়ের নাম অমলা। রেলিঙে ঝুঁকে সেই মেয়ে এখন ওকে দেখছে। লম্বা ফ্রক হাঁটুর নিচে। ঘাড়ের কাছে চুল একেবারে সোনালী রঙ চুলের। আর কাছে যেতেই দেখল চোখ একেবারে নীল।

কমল বলল, সোনা!

দিদি যেন ওর ঘুম থেকে উঠেছে এমনভাবে তাকাল। অমলা হাই তুলে বলল,—কি নাম তোমার?

এই মেয়ে কথা বলছে, কী যে ভালো লাগছিল। সে এইসব বালিকার মতো কথা বলতে চাইল, আমার নাম শ্রী অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।

—আমাকে তুমি কি বলে ডাকবে? অমলা বলল।

কমল বলল, সোনা, তোর পিসি হয়। অম পিসি।

আর ডল পুতুলের মতো এই মেয়ে কমলা। ডাকে সবাই কমল বলে। সোনা খুব ধীরে ধীরে ওদের মতো কথা বলল, তুমি আমার কমল-পিসি। তুমি আমার অমলা-পিসি।

কমলা খুব যেন খুশি। অমলা আবার রেলিঙে ঝুঁকে কি যেন দেখছে।

সোনা বলল, কমল, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার?

কমল বলল, হ্যাঁ রে, তুই আমার নাম ধরে ডাকছিস। আমি দাদুকে কিন্তু তবে বলে দেব।

কেমন বিমর্ষ দেখাল সোনাকে। সে বলল, আমি জ্যাঠামশয়ের কাছে যামু। সে রাগ করলে কমল অন্য কথায় এল। বলল, আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি। সোনাকে কাছে এনে

বলল, যামু কিরে, যাব বলবি।

সে তবু যেন খুশি হয় না। অথবা ওর যেন এখন বলার ইচ্ছা, আমার এক পাগল জ্যাঠামশাই আছে। কিন্তু সে তা না বলে বলল, ছাদে বড় বড় পুতুল। কেবল উইড়া যায়।

কমল বলল, নদীর পাড়ে কাশবনে ফুল ফুটলে ওরা স্থির থাকতে পারে না। বাকিটুকু বলল না। বাকিটুকু অমলাদি ওকে বলেছে। কাশ ফুল ফুটলে বসন-ভূষণ ঠিক থাকে না। সব ফেলে কেবল নদীর চরে উড়ে যেতে চায়।

পরীদের কথা শুনেই অমলা কেমন ফের ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো সোনাকে দেখল। সে যেন এই প্রথম দেখছে। সে সোনার চুলের ভিতর হাত রাখল এবার! সব ভুলে গেছে মতো বলল, কাদের ছেলে রে!

—অমা, তুমি জান না! এই না বললাম তোমাকে! আমাদের সোনা! চন্দ্রনাথ দাদুর ছেলে!

—ও মাঃ, তাই বুঝি। তবে তো আমাদের জিনিস—এমন এক মুখ করে সে সোনাকে বুকের কাছে সাপ্টে ধরতে চাইল। সোনা একটু সরে দাঁড়াল মেয়ের শরীরে কি যেন গন্ধ—মিষ্টি, বাগানে বেল ফুল ফুটলে সে এমন একটা গন্ধ পেত। মেয়ের চোখ এত নীল যে আকাশকে হার মানায়। সোনার একবার ইচ্ছা করছিল চোখ দুটো ছুঁয়ে দেখতে। বিষণ্ণ গোলাপের পাপড়ি ঝরে গেলে যেমন কাতর দেখায় এই চোখ এখন তেমন কাতর দেখাচ্ছিল। কেবল হাই তুলছে অমলা। তুমি সোনা এস, বলে সহসা সোনাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চাইল।

সোনা বলল, আমি জ্যাঠামশয়ের কাছে যামু।

—কি রে, দিদিকে ভয় পাস কেন?

অমলা বলল, এই শোনো। বলে কেমন ঝলমল করে উঠল খুশিতে। সোনার এমন মুখ, হাসিখুশি মুখ, ঝলমল আকাশের মতো মুখ দেখতে বড় ভালো লাগল। এস, আমার সঙ্গে এস। এস না, ভয় কি! কমলের মতো আমি তোমার পিসি। আমাকে তুমি অমলা-পিসি ডাকবে। এস না।

কমল বলল, আয় না। ভয় কি!

ওরা সিঁড়ি ধরে নামবার সময় ছোটবৌরানী বলল, কার ছেলে রে!

—সোনা, চন্দ্রনাথ দাদুর ছেলে।

বৌঝিরা বলল, ওমা, এ কেরে?

কমল গর্বের সঙ্গে যেন পরিচয় দিল, জান না! চন্দ্রনাথ দাদুর ছেলে।

—এ ছেলে কথা বলে না! ওমা, একি ছেলে রে! অমলা হাসতে থাকল।

সোনা বলল, আমি জ্যাঠামশয়ের কাছে যামু।

কমলা যেন সোনার চেয়ে কত বড় এমন চোখে মুখে কথা বলল, না, লক্ষ্মী, তুমি এস। দিদি তুই সোনাকে ভয় দেখাস কেন রে!

অমলা বলল, ভয় কোথায় দেখলাম! সোনা, এস।

লোকজন ভিড় ঠেলে ওরা ঠাকুমার ঘরে ঢুকে গেল। এ-ঘরটাও সেই বড় হলঘরের মতো। বড় বড় খাট পড়েছে। বারান্দায় ময়না পাখি। যাবার সময় অমলা পাখির খাঁচাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। কমল কি যেন কথা বলল পাখিটার সঙ্গে। বলল, এর নাম সোনা। পাখিটা দাঁড় থেকে নেমে ডাকল, কমল, কমল, নাম বল। সোনা সোনা নাম বল। পাখির গলায় সোনা তার নাম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। সোনাকে দেখে পাখিটা তখন খাঁচার ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে।

বড় এই ঘরটাতে ঢুকেই অমলা লাফ দিয়ে খাটে উঠে গেল। সে আলমারির ওপর থেকে বড় একটা চামড়ার স্যুটকেস টেনে নামাল। কি যেন ওরা দেবে সোনাকে। কমল ওর বাক্স খুলে ফেলল। ওরা কে আগে কি দেখাবে সেজন্য স্যুটকেস থেকে সব টেনে নামাল। অমলার বয়স আর কত, এই এগারো বারো, কমলের বয়স কত এই নয় দশ–কে জানে কার সঠিক বয়স–তবু দু'জনের ভিতর সোনাকে খুশি করার জন্য প্রতিযোগিতা, এই দ্যাখো সোনা বলে, পুঁতির মালা, ঝিনুক এবং ছোট ছোট নুড়ি পাথর বাক্স খুলে দেখাল। কমল বলল, তুমি কী নেবে সোনা!

সোনা বলল, আমি কিছু নিমু না।

অমলা বলল, এই দ্যাখো কী সুন্দর ছবি, ছবি নেবে?

—না, আমি কিছু নিমু না।

অমলা বলল, এই দ্যাখো কী সুন্দর ময়ুরের পালক, পালকের কলম দিয়ে তুমি লিখতে পারবে।

—আমি জ্যাঠামশাইর কাছে যামু কমল।

—ও মা! দিদি, দ্যাখ সোনা আমাকে কমলা ডাকছে! পিসি ডাকছে না।

অমলা হাসল। পুচকে মেয়ের কি বড় হবার সাধ। সে এবার বলল, বাইস্কোপের বাক্স নেবে সোনা! এখন যেন অমলা কমলা যে যার তূণ থেকে শেষ অস্ত্র বের করছে।

অমলা বলল, চোখ রাখো, কী সুন্দর ছবি দেখা যাচ্ছে! দ্যাখো কী সুন্দর একটা মেয়ে ডালিম গাছের নিচে, খোঁপায় ফুল গোঁজা। তারপর অমলা আর একটা ছবি লাগিয়ে বলল, দু'জন সিপাই, মাথায় ফৌজি টুপি। পাশে দুটো বাঁদর। গলায় গলায় ভাব। পা তুলে সোনাকে দেখে নাচছে।

সোনা এবার ফিক্ করে হেসে দিল। বাঁদর নাচছে দু'পাশে। সে এবার সাহস পাচ্ছে যেন।

অমলা বলল, এই দ্যাখো। অমলা ছবিটা পাল্টে দিতেই সোনা দেখল, একটা ঝরনা। একটা প্রজাপতি। এবং ঝোপের ভিতর মস্ত এক বাঘ। সোনা চোখ বড় বড় করে বলল, অমলা, একটা বাঘ।

—এই রে! তুমি আমাকেও নাম ধরে ডাকছ। বলেই খুশিতে গালে গাল লেপ্টে দিল সোনার।

সোনাকে নিয়ে অমলা কমলা এক সময় ছাদে উঠে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে শীতলক্ষ্যার বুকে নেমে আসছে। ডায়নামোর শব্দ ভেসে আসছে। চারদিকে আলোতে আলোময়। মনে হয় যেন এখানে এসে সব পৃথিবীটা খুশিতে ঝলমল করে ফুটে উঠেছে। কতদূর পর্যন্ত আলো, আলোতে আলোময়-ই মাটি এবং গাছ ফুল পাখি। কি উঁচু ছাদ! সে ছাদের ওপর ছুটে বেড়াল। কার্নিসের কাচে ঝুঁকে দাঁড়াল। নিচে দীঘির জল। জলে আলোর প্রতিবিম্ব ভাসছে। দূরে শীতলক্ষ্যা নদী এবং পাশে চর, তারপর পিলখানার মাঠ। মাঠে হাতিটা বাঁধা থাকে। ছাদে দাঁড়িয়ে সে, সব দেখার চেষ্টা করল। অমলা কমলার সঙ্গে সেই থেকে তার ভাব হয়ে গেছে, সে বাড়িময় ছুটে বেড়িয়েছে। অমলা কমলার শরীরে কি যেন মৃদু সৌরভ, এই সৌরভ মনের ভিতর এক আশ্চর্য রং খুলে ধরছিল। অমলা কমলা ওর দু'পাশে দাঁড়িয়ে কোথায় কী আছে, কোনদিকে গেলে মঠ পড়বে, মঠের সিঁড়িতে সাদা পাথরের ষাঁড়, গলায় তার মোতি ফুলের মালা, আরও কি সব খবর দিচ্ছিল। এখন সে ছাদে উঠে এসেছে, ছাদের দু'পাশে দুই মেয়ে তাকে কেবল বড় হতে বলছে। সে মাকে ফেলে অনেক দূর চলে এসেছে। সে যেন ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে। ওর ভয় ভয় ভাবটা থাকছে না। যেমন মেলায় বিন্নির খৈ খেতে খেতে অথবা ঘোড়দৌড়ের মাঠে কালু শেখের ঘোড়া দেখতে দেখতে সে পৃথিবীর যাবতীয় মাধুর্য শুষে নিত, ঠিক তেমনি এই ছাদে আজ গ্রহনক্ষত্র দেখতে দেখতে আকাশের মাধুর্য শুষে নেবার সময় তার মায়ের মুখ মনে পড়ে গেল। এই দুই মেয়ের ভালোবাসা তাকে আর ছোটাতে পারল না। ছাদের এক কোণে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। বড় কাতর দেখাচ্ছে তাকে। অমলা কমলা আদর করতে চাইলে সে প্রায় কেঁদে ফেলছিল। এত দূরদেশে এসে মায়ের জন্য মন খারাপ, ভিতরটা তার কেমন ছটফট করছে।

ক্রমে রাত বাড়ছে। কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে প্রকৃতি। গাছের একটা পাতা পর্যন্ত হাওয়ায় নড়ছে না। ক্রমে এই গ্রাম আরও অন্ধকারে ডুবতে থাকল। বুঝি চরাচরে কেউ জেগে নেই। ভেসে ভেসে সেই নৌকা কোথায় যে যায়, কোথায় যে থাকে কেউ জানে না! চরের বুকে রাতের গভীরে সেই নৌকা এসে হাজির। বড় দুই কোষা নাও। কোষা নাওএর মাঝিরা বাঁধাছাদা একটা জীবকে নৌকায় তুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহেন্দ্রনাথ তখন ডাকলেন, শচী, শচীরে।

কোনও সাড়াশব্দ নেই।। তিনি ডাকলেন, অলিমদ্দি, অ অলিমদ্দি!

কেউ সাড়া দিচ্ছে না। পুবের বাড়িতে হায় হায় রব। তোমরা ওঠ সকলে। কে কোথায় আছ!

দীনবন্ধুর বৌ চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। দীনবন্ধু উঠোনে নেমে চিৎকার করে উঠল, সকলে আপনেরা জাগেন। সর্বনাশ হইয়া গ্যাছে। শচীন্দ্রনাথ জেগেই মাথার কাছ থেকে একটা বর্শা তুলে নিলেন হাতে। অলিমদ্দি বলল, কর্তা, আমি একটা সুপারির শলা নিলাম।

ভুজঙ্গ এল, কবিরাজ এল, কালাপাহাড়, চন্দদের দুই বেটা এবং গৌর সরকার সদলবলে মুহূর্তে এসে হাজির।—কি হইছে!

—কি আর হইব! তোমার আমার মান-সম্মান গ্যাছে।

সবাই অন্ধকারে বের হয়ে পড়ল। মেঘলা আকাশ। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। নয়াপাড়াতে খবর দেওয়া হল। টোডার বাগ থেকে ছুটে এল মনজুর, আবেদালি আর হাজিসাহেবের তিন বেটা। বলল, কোনদিকে যাওয়ন যায়।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, চরের দিকে লও। রাইতে যদি সেই নাও জলে জলে ভাইসা যায়!

জয়, জয় মা মঙ্গলচণ্ডীর জয়। মা গো, তর ছাওয়াল পাওয়াল—তুই যারে রাখস মা তারে কে মারে! মা গো, তুই অবলা জীবের প্রাণ, তর কাছে মা জিম্মায় থাকল দুঃখিনী মালতী।

শচীন্দ্রনাথ নৌকায় উঠে বললেন, জব্বর কইরে! সে গাঁয়ে আইছিল, সে নাই ক্যান?

এবার আবেদালি হা হা করে কেঁদে উঠল, কর্তা গ, আমার জানমান আর নাই। পোলার কসুর আমি কি দিয়া শোধ দিমু। সকলে থ।

একদল থানায় গেল। সবিরুদ্দিনসাবকে খবর দিতে হয়।

শচীন্দ্রনাথ তখন বললেন, জব্বরের কাম। তোমরা নৌকা ভাসাও জলে।

জলে নাও ভাসাও রে, কিংবদন্তীর নাও ভাসাও। সোনার নাও পবনের বৈঠা। নাও রে—জলে নাও ভাসাও। মানুষগুলি রাতের অন্ধকারে জয় জয়মালা, গন্ধেশ্বরী, ওমা তুই পটেশ্বরী, তর দেশে জলে স্থলে দুঃখ মা, আখেরে বনিবনা হবে কি হবে না কে জানে। শচীন্দ্রনাথ চিৎকার করে উঠলেন, তিনদিকে চইলা যাও। একদল ফাওসার বিলে বিলে যাও। অন্যদল সোনালী বালির নদীর চরে। যারা পশ্চিমে যাবা সঙ্গে নিবা পালের নাও। পশ্চিমা বাতাসে পাল তুইলা দিবা।

নৌকা এখন না ছাড়লে নাগাল পাওয়া দায়। শচীন্দ্রনাথ বললেন, আর আমি যাই, সঙ্গে নরেন দাস যাউক—সেই যেখানে চরে আলো জ্বলে সেইখানে। ওরা এবার সকলে নৌকায় উঠে বৈঠা মাথার ওপর তুলে চিৎকার করে উঠল, মাগো, তর এমন সুজলা সুফলা দ্যাশ, মাগো তুই ক্যান আবার জ্বইলা উঠলি। সংসারে বনিবনা হয় না—একি কাণ্ড মা সিদ্ধেশ্বরী। তুই মা ওর মুখ রক্ষা কর দিকি ইবারে।

—আর কে যাইবা জলে জলে? গজারির বনে বনে অন্ধকার, আলো জ্বলে না, জোনাকি জ্বলে না। নিশুতি রাতে সাপে বাঘে বনিবনা হয় না। সেই বনের দিকে বড় নাও নিয়ে শচীন্দ্রনাথ ভেসে পড়লেন। এতক্ষণ গ্রামের ভিতর ভীষণ চিৎকার চেঁচামেচি ছিল। বাড়ি থেকে বাড়িতে, গ্রাম থেকে গ্রামে নৌকার পর নৌকা ছুটে এসেছে। টেবার দুই ভাই ছুটে এসেছে। মেয়ে মহলে গুঞ্জন! চোখে মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছাপ—কি হল দেশটাতে! এমন দেশ উচ্ছন্নে যায়—হায়, আর সর্বনাশ হতে কি বাকি! সকলে চুপচাপ এখন জেগে বসে আছে। কেউ সে রাতে আর ঘুম যেতে পারল না।

শচীন্দ্রনাথ, বড় মিঞা, মনজুর এবং নরেন দাস নিচের দিকের পাটাতনে। উপরের দিকের পাটাতনে অলিমদ্দি, গৌর সরকার, প্রতাপ চন্দ্রের দুই ছেলে। সকলের হাতে বৈঠা। আর উপরে আকাশ। মেঘলা আকাশ ক্রমে কেমন পাতলা হয়ে আসছে। থেকে থেকে হাওয়া উঠছে। সবগুলি দাঁড় এক সঙ্গে উঠছে, নামছে। দ্রুতবেগে প্রায় ঘণ্টায় দশ বিশ ক্রোশ তারা পাড়ি জমাতে পারে এখন। হালে মনজুর শক্ত হয়ে বসে থাকল। এই

অসম্মান এখন যেন শুধু নরেন দাসের নয়একটা জাতির, মনজুর মুখচোখ রাঙা করে হাঁকল—জব্বইরা, তুই মুখে চুনকালি মাখাইলি!

সেই বড় নৌকার সন্ধানে ওরা চরের মুখে এসে থামল। কোথায় নৌকা! কোনও চিহ্ন নেই নৌকার। চারদিকে শুধু জল, চুপচাপ ওরা জলের ওপর দাঁড় তুলে বসে থাকল। না নেই, কোথাও নেই। আদিগন্ত জলের ভিতর ইতস্তত মাছের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। ধানখেতে দুটো একটা বালিহাঁসের শব্দ। শচীন্দ্রনাথ তখন বললেন, নাও ইবারে দক্ষিণে ভাসাও।

সামনে গজারি গাছের বন। মাথার উপর গজারি গাছের অন্ধকার। নিচে জল, কোথাও বুক জল, কোথাও হাঁটু জল আর কোথাও ঝোপ জঙ্গল জলের নিচে অরণ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। নৌকা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জলের ভিতর ঢুকলে, ওরা প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। জলের ভিতর জোনাকিরা জ্বলছে। কত হাজার লক্ষ, যেন এক আলো-অন্ধকার জগৎ। এমন আলো অন্ধকারে ওরা কিছুই দেখতে পেল না। নরেন দাস বলল, আনধাইরে আর কারে খোঁজবেন?

কিছু পাখি ডাকল। চুপচাপ সকলে যেন আড়ি পাতার মতো ভাব। এদিকটাতে কোনও গ্রাম নেই, অনেক দূরে নৌকা বাইলে সুন্দরপুর গ্রাম। ওরা যত বনজঙ্গলের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে তত ক্রমে সব শব্দ মরে আসছে। পাতার খসখস শব্দ হচ্ছে না। নিচে জল বলে, পাতা খসে পড়লে শব্দ হচ্ছে না। এত বড় গভীর বনে আগাছা নেই, বেতের ঝোপঝাড় চারদিকে ছড়ানো, মাথার উপর হাজার রকমের লতা দুলছে। ভয়াবহ অন্ধকারে, যদি কোনও আলো জ্বলতে দেখা যায়, যদি অন্য কোনও নৌকার শব্দ কানে ভেসে আসে। কারণ, দ্রুত পালাবার মতো পথ এখানে নেই। বরং রাত কাটিয়ে দেবার জন্য এই গজারি গাছের বন। আঁধারে আঁধারে এই বন পার হলে মেঘনা নদী। নদীতে পাল তুলে দিলে ঠিক যেন আত্মীয়স্বজন যায়। অথবা নদীতে কার নৌকা ভেসে যায়, কেবা তার খোঁজ রাখে। এই গজারির বনে ওরা তন্ন তন্ন করে মালতীকে খোঁজার চেষ্ট করল। ওরা খুব আস্তে কথা বলছিল। দুটো একটা গজারি গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। জলে জলে সেই পাতা ভেসে ভেসে অন্ধকারে নদীতে নেমে যাচ্ছে। ওরা সেই পাতা অথবা পাখ-পাখালির ডাকের ভিতর নিজেদের আত্মগোপন করে রাখল। ওরা এভাবে বনের ভিতর বড় নৌকার সন্ধানে থাকল।

না নৌকা, না সেই গুনাইবিবির গান। এমন হারমাদ মানুষ কী করে মালতীর মতো এক জবরদস্ত যুবতীকে হাফিজ করে দিল!

শচীন্দ্রনাথ কেমন বিপর্যস্ত গলায় বললেন, নাও নদীতে ভাসাইয়া দ্যাও। বড় নাও মনে লয় নদীর জলে ভাইসা গ্যাছে।

—জব্বর, যুবতী কি কয়!

—কিছু কয় না মিঞা।

—কিছু না কইলে পার পাইব ক্যামনে?

—ইটু সবুর করেন মিঞা।

—সকাল হইতে আর যে দেরি নাই জব্বর।

জব্বর এবার পাটাতনে উঠে দাঁড়াল। নৌকা এবার গজারি বন পার হয়ে নদীতে পড়েছে। মেঘনা নদী উত্তাল। ক্রমে নদীর সব বড় বড় বাউড় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নৌকা চালাবার নির্দিষ্ট কোনও পথ নেই। শুধু জলে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা এবং ধরে আনা যুবতীকে বশ করা। হিন্দু রমণী-সুন্দরী যুবতী মাইয়া মালতীরে বশ করে শহরে নিয়ে যাওয়া। সবুর সয় না পরাণে—হেন কাজ কে করে! সবুর না সইলে জোর জবরদস্তিতে হেনস্থা করবেন মিঞাসাব। কিন্তু ছইয়ের ভিতর যায় কার সাধ্য। মালতী এখন সাপ বাঘের মতো। ভিতরে গেলেই ছুটে কামড়াতে আসছে। কখনও হিক্কা উঠছিল। কখনও পাগলের মতো চিৎকার করছিল, আর ভয়ে দু'কসে থুতু জমছে। গলা কাঠ। হাত-পা বাঁধা মালতীর। হাত-পা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। তবু এই যুবতী ছইয়ের ভিতর ঢেউএ গড়াগড়ি খাচ্ছে। কখনও চুপচাপ পড়ে একছে। চার মাঝি, মিঞাসাব তার দুই শাগরেদ আর জব্বর। জব্বর মাঝে মাঝে ঢুকে যাচ্ছে ছইয়ের ভিতর। বশ করার কথাবার্তা বলছে। আখেরে এই মহাজন মানুষ মালতীকে ঘরের বিবি করে ফেলবে। দুই চারদিন নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ানো, গায়ে পায়ে হাওয়া বাতাস লাগানো, তারপর ঘরে ফিরে যাওয়া। এমন বর্ষার দেশে দেরি আর সয় না, মন আর মানে না। উথাল-পাথাল কইরা মন নদীর চরে ছুইটা যায় কেবল। আর এমন শরীর নিয়ে জ্বলে পুড়ে খাক কে কবে হয়! জব্বর এখন পয়সার লোভে মাতালের মতো রংদার বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে কানের কাছে—মালতী দিদি, উঠেন, কথা কন, জলপানি খান। আসমান দ্যাখেন, কত বড় নদীতে নাইমা আইছি দ্যাখেন। গতরে দিদি আগুন জ্বালাইয়া বইসা আছেন, ইবারে আগুনে পানি দ্যান। বলতে বলতে দড়াদড়ি খুলে দিচ্ছে। খুলে দিলেই যুবতী মাইয়া ভালো মাইনসের ঝি বইনা যাইব। আশায় আশায় জব্বরের এখন চক্ষু চড়কগাছ।

গলুইর দিকে তিনজন লোক। ডোরাকাটা লুঙ্গি পরনে, কালো গেঞ্জি গায়ে। পয়সার লোভে জব্বর মালতীকে করিম শেখের নৌকায় তুলে আনল, কারণ জব্বরের দুটো তাঁত না হলে চলছে না। করিম শেখ মেলায় বিধবা মালতীকে দেখেছে। মেলাতে মালতীর রূপ দেখে সে তাজ্জব বনে গেছে। এখন তো এই সময়—মেলাতে দাঙ্গা হয়ে গেছে। দাঙ্গার সময় মেলাতে করিম শেখ দলবল নিয়ে সারা মেলা ছুটে বেড়িয়েছে, মালতী কোথায়! কোথাও সে মালতীকে খুঁজে পায়নি, সেই থেকে নেশার মতো জব্বর নারানগঞ্জের গদিতে সূতা আনতে গেলেই বলত, কিরে জব্বইরা তর দিদি কী কয়?

—কেবল আপনের কথা কয়। পয়সা খসানোর তালে ছিল জব্বর।

—আমার কথা ক্যান কয় রে! আমারে চিনে।

—চিনব না আপনেরে! কয়, মালতী দিদি কয়, হা রে জব্বইরা মেলাতে যে তর লগে সুন্দর মত মানুষ দ্যাখলাম, মানুষটা কেডারে?

—তুই কি কইলি?

—কইলাম খুব মেহেরবান মানুষ। জবরদস্ত আদমি। নাম করিম। নারানগঞ্জ শহরে তারে চিনে না এমন কেডা আছে!

—এত বড় কইরা দিলি আমারে!

—দিমু না! আপনে কত বড় মানুষ, কন!

—আর কি কইলি?

—কইলাম সোনার মানুষ।

—শুইনা কি কয়?

—কয় সোনার মানুষের বুঝি সখ থাকে না।-তুই কি কইলি?

—কইলাম সখ থাকে না কি কন! সখ সুখ সব থাকে।

তারপরই একরাতে গদিতে বসে করিম বলল, রাইতে আঁখিতে ঘুম থাকে না রে, জব্বর! য্যান এক স্বপ্নের হুঁরী উইড়া উইড়া আসে।

—হুরী! কেমন চোখ বড় বড় করে দিল জব্বর। শুধু হুরী বললে যে অসম্মান করা হয় মালতীকে। হুঁরী পরী বশ মানে। মালতী দিদি আমার আসমানের তারা। আসমানের তারা খসাইতে ম্যাও লাগে। এই বলে জব্বর একটা বড় অঙ্কের টাকার আভাস দিতে চাইল।

—কত ম্যাও লাগে?

জব্বর প্রথম চারখানা তাঁত কিনতে কত টাকা লাগতে পারে ভেবে নিল। তারপর বলল, হাজার টাকা।

—হাজার টাকায় হুরী পরী আসমানের তারা সব এক লগে কিনন যায় মিঞা।

একটা কিনতে কম লাগে তবে! বুঝি ফসকে গেল সব, সে ঢোক গিলে বলল, কম লাগে তবে!

—লাগে না?

—তবে লাগুক। দ্যান যা মনে লয়।

জব্বর শেষ পর্যন্ত দর-দাম করে পাঁচশত টাকা নিল। বাকি খরচপত্র করিম সব করবে কথা থাকল। নৌকা, মাঝি, এবং রাত-বিরাতের ফূর্তি সব করিম শেখের খরচে। প্রথম ভেবেছিল করিম নৌকায় নিজে থাকবে না, কিন্তু কেন জানি ওর অবিশ্বাস জন্মে গেল, হারমাদ জব্বর, কোনদিকে শেষে নাও ভাসাবে কে জানে—তবে তার আসমানের তারাও যাবে, নগদ টাকাও যাবে। শেষ পর্যন্ত সে নৌকায় পর্যন্ত উঠে এল।

জব্বর টাকার লোভে, দুই তাঁত করে তাঁতি হবার লোভে সময়ে অসময়ে গ্রামে চলে আসত। খরচ করত দু'হাতে, ফেলুকে নিয়ে সলাপরামর্শ করত, আর যাদের সে এ-অঞ্চল দেখাতে এনেছিল—কত বড় অঞ্চল দ্যাখেন মিঞারা, এই অঞ্চলে আমার মালতী দিদি বাড়ে দিনে দিনে, তারে লইয়া যান সাগরের জলে। মালতীকে দূর থেকে দেখাবার সময় যাদের সে এমন বলত, তারা সবাই করিম শেখের লোক। দিনক্ষণ দেখে, সময় বুঝে যখন রঞ্জিত গ্রামে নেই, যখন আনধাইর রাইত এবং যখন কেউ বলে না দিলে বোঝা দায় —কার নৌকা, কেবা এল নদীর চরে, তখনই কাজটা হাসিল করতে সময় লাগবে না। সামসুদ্দিন ও এখানে নেই। সে ঢাকা গেছে। সুতরাং এ-সময়েই কামটা হাসিল কইরা ফ্যালতে হয়, এমন পরামর্শ দিল ফেলু। ফেলু বিনিময়ে দুই কুড়ি দশ টাকা পেল। বিবি আন্মু তার ডুরে শাড়ি পেল। কথা ছিল, ফেলুর বিবি সঙ্গে যাবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেলু রাজি হয়নি। তার সাহস হয়নি। ধরা পড়ার ভয়ে ফেলু এতটুকু হয়ে গেছিল।

এখন সূর্য উঠছে। মৃদুমন্দ বাতাস পালে খেলছে। ভোরের সূর্য নদীর বুক থেকে প্রায় ভেসে ওঠার মতো। মেঘনা নদীর প্রবল ঘূর্ণির ভিতর নৌকা পড়ে না যায়—মাঝিরা খুব সন্তর্পণে বৈঠা চালাচ্ছে। হাল ধরে আছে। ছইয়ের দু'দিকে কাঠের দরজা। ভিতরটা ঘরের মতো। ঠিক যেন এক পাসি নাও। ভিতরে কথাবার্তা হলে গলুই থেকে বোঝা দায়। ছইয়ের ভিতর মালতী ফোঁপাচ্ছে। জব্বর উবু হয়ে বসে আছে পাশে এবং ঠিক সেই আগের মতো রংদার বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। ফেলুর বিবি নৌকায় থাকলে এখন সুবিধা হতো। দু'কড়ি দশ টাকা দিতে রাজি, তবু বিবিটাকে ফেলু আসতে দেয়নি। যদি বশ না মানাতে পারে, বনের বাঘ খাঁচায় ঢুকে যদি হালুম হালুম করতে থাকে কেবল—তা হলে কী যে হবে না! জব্বরের মুখ ভয়ে শুকিয়ে আসছে। সুতরাং জব্বর মরিয়া হয়ে পায়ের কাছে এসে বসে বলল, দিদি ওঠেন। দুধ গরম কইরা দেই, দুধ খান। বল পাইবেন গায়ে গতরে।

কে কার কথা শোনে! মালতী এখন পাটাতনে ঝড়ো কাকের মতো। চোখে-মুখে কলঙ্কের ছাপ। চোখের নিচে এক রাতে কী ভয়ঙ্কর কুৎসিত কালো দাগের চিহ্ন। হাতে-পায়ে এখন দড়ি-দড়া নেই। দরজার ফাঁকে সকালের আলো ওর পায়ের কাছে এসে পড়েছে।

জব্বর ডাকল, মালতী দিদি, ওঠেন। মুখ ধুইয়া নাস্তা করেন।

মালতী ঘাড় গুঁজে বসে থাকল, যেন ফেব বিরক্ত করলে গলা কামড়ে দেবে। জব্বর ভয়ে ছইয়ের ভেতর থেকে বের হয়ে এল। তেজ এখনও মরেনি। মুখ-চোখ মালতীর পাগলের মতো লাগছে।

—কি কয়? করিম শেখ পাটাতনে বসে হুঁকা টানছিল।

—কয় বুড়া মাইনসের জান, সামলাইতে পারব ত!

—কি যে কও! বয়স কত আমার! এই দুই কুড়ি মোতাবেক।

—তা যখন পারেন, তখন সব ঠিক হইয়া যাইব।

হুঁকা টানতে টানতেই বলল করিম, তুমি যে কইলা, তোমার দিদি আমার কথা কয়, এহনে ত দ্যাখছি, দিদি তোমার পাগলের মত বইসা আছে।

—আরে না মিঞা। বনের বাঘ খাঁচায় উঠাইলে তা ইট্টু এমন করে! বশ মানাতে সময় লাগে।

—বশ না মানাইতে পারলে নদী-নালায় আর কয় রাইত ঘুরবা? কবে গদি ছাইড়া বাহির হইছি। বড় বিবি কয়, কই যান মিঞা?

—কি কইলেন?

—কইলাম মৎস্য শিকারে যাই! নদী-নালার দ্যাশ, পানীতে ভ্যাইসা গ্যাছে। যদি মেঘনার পানিতে ঢাইন মাছ পাই। একটু থেমে কলকের আগুন জলে ফেলে দিলেই ফস করে আগুনটা নিভে গেল। তারপর বলল, মাছ ত বড়শিতে আটকাইছে, এহনে মৎস্য ডাঙ্গায় তুলতে পারতেছ না—এডা ক্যামন কথা!

—ডাঙ্গায় তুইলা ফ্যাললে আর থাকলটা কি কন? দুই চারডা লম্ফঝম্ফ। তারপর খতম। পাঁজ দোয়ারে আপনের মিষ্টি কথা ভাইসা বেড়াইব। বনের বাঘ বশ মানলে মিঞা তখন আবার ক্যান জানি সখ যায়—শিকারে গ্যালে হয়। ভাল লাগে না, পানিতে স্বাদ-সোয়াদ থাকে না। মনটা তখন আপনের আবার মৎস্য শিকারে যাইতে চায় না মিঞা? বলে জব্বর বলল, তামাক সাজি।

—সাজ। তামুক খাইয়া সুখ পাইলাম না।

এই খাল-বিলের দেশে করিম শেখ মুখটা ভোঁতা করে বসে থাকল। নৌকা কোনও গঞ্জের পাশ দিয়ে যাচ্ছে না। খাদ্যদ্রব্য যা ছিল সব শেষ ঘুরে-ফিরে—যতদিন না মালতীর প্রাণে বিশ্বাস জাগে ততদিন এই খালবিলে এবং নদীর মোহনাতে ঘুরে বেড়াতে হবে। এখন শুধু ভালো ব্যবহার, জবরদস্তির কাজ নয়। একমাত্র সরল অকপট ব্যবহারই

মালতীকে আপনার করে নিতে পারবে।এই ভেবে করিম শেখ বলল, মনের ভিতর এক পঙ্খী বাস করে জব্বর।

—তা করে মিঞা।

—পঙ্খীটা উড়াল দিতে চায় মিঞা। কী যে চায় পঙ্খী। পঙ্খী রে তুমি কী চাও? নতুন বিবির জন্য কেমন উদাস হইয়া যায়! পানির স্রোতে বিড়াল ভাসে—অ মন তুমি এক মাঝি। মনে পড়ে জব্বর, জবরদস্ত বিবি হালিমা—তারে বশ মানাইতে কয়দিন লাগছিল! তোমার মনে থাকনের কথা না রে, কী যে ভাবি। কেমন ছাড়া ছাড়া কথা মনের কোণে জেগে উঠছে করিমের। এখন যেন সে কত উদার মোতাবেক মানুষ। সরল ব্যবহারের চিহ্ন ওর মুখে। দেখলে মনেই হবে না—করিমের ভিতরের মানুষটা বড় কুটিল, সর্পিল স্রোতের মতো। মুখে মনে এক ছবি এখন করিমের। যা খুশি মনে লয় কর, গঞ্জের ঘাট থাইকা কিনা লও। মেঘনার ইলিশ! তারপর জলে জলে ভাইসা যাও। আর পাটাতনে বইসা ইলিশ মাছের ঝোল, গরম ভাত এবং নদীর জলে ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসাও। বড় লোভ আমার, যেন এমন বলার ইচ্ছা করিম শেখের। হিঁদুর মেয়ে, যৌবন যার বিফলে যায় এমন যুবতী মাইয়ারে লইয়া ঘর করতে সখ যায়—অ যুবতী, পরাণে তর কি কষ্ট, তুই ক্যামন কইরা যৌবন বাইন্দা কাইন্দা মরস, তরে লইয়া যামু সাগরের জলে, ভাবতে ভাবতে করিম শেখ ফুরৎ ফুরৎ করে দু'বার ধোঁয়া ছেড়ে দিল আকাশে। তারপর হুঁকোটা জব্বরকে দিয়ে বলল, টান মিঞা, পরাণ ভইরা সুখটান দ্যাও! বলে, কেমন হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পার হতে চাইলে জব্বর খপ করে দু ঠ্যাং জড়িয়ে ধরল, আরে মিঞাসাব, করতাছেন কি!

—কি, করতাছি কি!

—সাপ লইয়া খেলা করতে চান?

—সাপের বিষদাঁত ভাইঙা দিতে চাই।

—খুব সোজা মনে হইছে?

—তা মনে হইছে।

—সূতা বিচাকিনার মত মনে হইছে?

—হইছে।

—মিঞা এত সোজা না!

—সোজা কিনা দ্যাখি। বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে দরজা অতিক্রম করে ছইয়ের ভিতর ঢুকে গেল। এবং লেজ গুটিয়ে শেয়াল যেমন তার গর্তের ভিতর নিরিবিলি বসতে চায়, সে

তেমনভাবে একটু তফাতে নিরিবিলি বসল। মালতীকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাড় গুঁজে বসে আছে মালতী। নৌকায় তুলে আনতে জোর জবরদস্তি করতে হয়েছিল বলে শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত এবং রক্তের দাগ। অথবা কেউ যেন শরীরের সর্বত্র আঁচড়ে খামচে দিয়েছে। সে যেন ভালোবাসা দিচ্ছে তেমনভাবে হাত রাখতে গিয়ে দেখল, গলুইর মাঝি এদিকে তাকাচ্ছে। সে পাল্লাটা এবার ঠেলে ভেজিয়ে দিল। লালসায় এখন মানুষটার জিভ চকচক করছে। পদ্মফুলের মতো তাজা, গোলাপের মতো কোমল এবং স্নিগ্ধ অথবা লাবণ্যময় শরীরে যেন যৌবন কেবল নদীর উজানে যায়। করিম শেখ উত্তপ্ত লোহার ওপর হাত রেখে দ্রুত সরিয়ে নেবার মতো বার দুই ছুঁতে চেষ্টা করল, বার দুই কপালে হাত রেখে ভালোবাসা দিতে চাইল। মালতী এখন কেমন ভালোমানুষের ঝি হয়ে গেছে। করিমকে কিছু বলছে না। এবার সাহস পেয়ে করিম একেবারে রাজা-বাদশার মতো হাঁকল চরে নাও বান্দ মিঞারা। ইলিশের ঝোলে ভাত খাইয়া লও। তার পরই পাটাতনে যুবতী মালতীর সঙ্গে করিম শেখ এক খেলায় মেতে যাবে এমন চোখ মুখ নিয়ে ছইয়ের বাইরে এসে নদীর চরে তাকাতেই কাশবনের ভিতর বড় এক কুমির ভেসে উঠতে দেখল বুঝি। কুমিরটা ভিতরে ভিতরে এত বড় হাঁ খুলে রেখেছে ভাবতেই করিমের মুখে রক্ত এসে গেল।

চরে নাও বেঁধে ইলিশ মাছের ঝোল, ভাত। গ্রাম অনেক দূরে। নদীর দক্ষিণ পাড়ে। কাশবন পার হলে আস্তানাসাবের কবরখানা। কতদূরে এখন এইসব জমি এবং মাঠ চলে গেছে। সামনে হোগলার বন। জল ক্রমে কমতে কমতে ডাঙার দিকে উঠে গেছে! সূর্য ক্রমে মাথার উপর উঠে আসছে। ওরা পাটাতনে বসে খেল। মালতী কিছু খেল না। চুপচাপ মালতী নদীর জল দেখছে। ওরা তখন সবাই অন্যমনস্ক। করিম নামাজ পড়ছে।

মালতী আর ফিরতে পারছে না। কোথায় ফিরবে! ওকে হারমাদ মানুষেরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সে রঞ্জিত অথবা অন্য কোনও মুখ এ-সময় মনে করতে পারছে না। মাথার ভিতর কী জ্বালা যন্ত্রণা! থেকে থেকে অসহায় আর্তনাদ। সে হায়, কী করবে এখন? কোথায় যাচ্ছে, তার কী ইচ্ছা, সে কে, কেন এমন করে চুপচাপ বসে আছে? কিছু কি তার করণীয় নেই? এত বড় নদী, নদীর জল—এই অতল জলে ঠাঁই হবে না জননী, বলে, সবাই যখন ঝোল ভাত খেতে ব্যস্ত, করিম যখন নিবিষ্ট মনে নামাজ পড়ছে তখন মালতী জলে ঝাঁপ দিল। জয় মা জাহ্নবী, জননী মা তুই, তোর বুকে ভেসে গেলাম। কোথায় কি করে স্রোতের মুখে পড়তেই নিমিষে দূরে গিয়ে ভেসে উঠল মালতী। মাঝিরা সকলে নাস্তা ফেলে হৈ হৈ করে উঠল। জব্বর প্রমাদ গুণে তাড়াতাড়ি জলে লাফ দিয়ে পড়ল। মাঝিরা দড়ি খুলতে গিয়ে দেখল, গিঁট লেগে গেছে, ওরা তাড়াতাড়ি দড়ি খুলতে পারছে না! মালতী স্রোতের মুখে অনেকদূর চলে গেছে। মালতী কখনও ডুবে যাচ্ছে, কখনও ভেসে উঠছে। করিম পাটাতনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, সেই এক হাঁক এ অঞ্চলের, কে ডুইবা যায়! করিম নৌকা স্রোতের মুখে ছেড়ে দিলে মালতী চরের বুকে হোগলার জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল।

নৌকাটা স্রোতের মুখে কচ্ছপের মতো ভেসে যাচ্ছিল। সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু জলের ঘূর্ণি। ডানদিকে চর, চরের বুকে ধানখেত। সকলে ভাবল, জলের নিচে বুঝি মালতী ডুবে গেছে। কিন্তু বর্ষায় মালতী সোনালী বালির চর পার হয়ে যেত, ঘূর্ণিতে মালতী ডুবে ডুবে বালিমাটি তুলে আনত নদীর বুক থেকে। সেই মালতী জলে ডুবে যাবে জব্বর বিশ্বাস করতে পারল না। সে নৌকায় উঠে চারদিকে তাকাল। পাশে শরবন। শরের গোড়া ফাঁক করে যেমন মাছ নদীর জলে সাঁতার কাটে তেমন এক মানুষ যেন এক শর বনে সাঁতার কাটছে।

জব্বর চিৎকার করে উঠল, ঐ যায় দ্যাখেন!

মাঝিরা বলল, মাছ মিঞা, মানুষ না।

করিম বলল, হাঁ মাছ বড় মাছ। মাছের পিছনে এখন ছোটা ভাল না। করিম বরং সতর্ক দৃষ্টি রাখছে মাঝনদীতে। কারণ ভয় করিমের—একবার এই নদী পার হয়ে গেলে জেল হাজত করিমের। ঘরে তুলে না নিতে পারলে, নদীর জলে, শরবনে, যেখানে থাকুক, মাথায় মালতীর লগির বাড়ি, তখন জলের তলায় ডুবে যাবে মালতী! খাল বিল নদীর জলে কে কবে ভেসে যায় কে জানে! বর্ষার জল, এমন জলে যুবতী নারী ডুবে মরলে আত্মহত্যার শামিল হবে। কবিম বলল, কইরে মিঞা যুবতী মাইয়া কই?

জব্বর কিন্তু সেই শরবনের দিকে তাকিয়ে আছে। বন ক্রমে ডাঙার দিকে উঠে গেছে। সেখানে এতবড় নাও ভাসালে চড়ায় নাও আটকে যাবে। এবং সেখানে শুধু কাদা জল, কি করবে জব্বর! এই অসময়ে আল্লার বান্দা কে এমন আছে ধইরা আনে যুবতী মাইয়ারে—জব্বর রাগে দুঃখে এখন চুল ছিঁড়তে থাকল। এবং যেদিকে শরবন কাঁপছে অথবা নড়ছে সেদিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। আর সহসা দেখতে পেল, শরবন পার হয়ে মালতী অন্ধের মতো কবরখানার দিকে উঠে যাচ্ছে। করিম পাগলের মতো হা হা করে হাসতে থাকল। পথ হারাইছে যুবতী মাইয়া, যুবতীর সন্ধানে চল। সে আবার লাফ দিয়ে পড়ল জলে। জব্বর দেখাদেখি লাফ দিয়ে জলে ভেসে গেল। করিমের শাকরেদ পর্যন্ত লোভে লালসায় জল সাঁতরাতে থাকল। যতদূর চোখ যায় শুধু জল, মনুষ্যহীন এই বনে জঙ্গলে একটা শশকের পিছনে একদল নেকড়ে যেন দ্রুতবেগে ছুটছে। সামনে সেই ডাঙা। আস্তানাসাবের দরগা আর চারিদিকে গভীর জল। দূরে কতদূরে গেলে যেন লক্ষ যোজন দূরে মানুষের বসতি। এই ডাঙায় আটকা পড়লে নির্ঘাত মালতী পাগল হয়ে যাবে। অথবা ঝোপ জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে যদি কোনওরকমে পাঁচ সাত মাইল নদীর উজানে ভেসে গিয়ে লোকালয়ে উঠতে পারে তবে জব্বর তোমার জেল হাজত। তোমার দুই তাতের বোনাবুনি শেষ! লোভ লালসা শেষ! যত দ্রুত পালাচ্ছে মালতী তত দ্রুত ছুটছে জব্বর, করিম, ওর শাকরেদ। শরবনের ভিতর দিয়ে ছুটছে। শরীর কেটে রক্ত পড়ছে। ওদের এখন অমানুষের মতো দেখাচ্ছিল। ভূতের মতো অথবা প্রেতের মতো যেন শ্মশানভূমিতে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

মানুষের সাক্ষাৎ এ অঞ্চলে চোখে পড়বে না। দু'দশ ক্রোশের ভিতর প্রায় লোকালয়বিহীন এই অরণ্য, বন জঙ্গল এবং পরবে দরগায় মোমবাতি জ্বালানো হয়, পরব বাদে মানুষ এ পথে কেউ কখনও আসে না। এই অরণ্যের ভিতর যেন মৃত এক জগৎ-সংসার চুপচাপ প্রকৃতির খেলা দেখে চলেছে। আর আসে দশ-বিশ ক্রোশ দূর থেকে মানুষ, মৃত মানুষ। ইন্তেকালে মানুষ এসে এই কবরখানায়, অরণ্যের ভিতর আশ্রয় নেয়। এবং দরগার কবরে কবরে ইন্তেকালের সময় শোনা যায়—আল্লা এক, মহম্মদ তার একমাত্র রসুল।

এখন সূর্য আকাশে পশ্চিমের দিকে হেলে পড়তে শুরু করেছে। ওরা তিনজন হোগলা বনে ঢুকেই কেমন দিশেহারা হয়ে গেল! কারণ কোনও শব্দ পাচ্ছে না। জলে কাদায় মানুষ ছুটলে একরকমের ছপছপ শব্দ হয়, সেসব শব্দ চুপচাপ কেমন মরে গেছে। ওরা সেই শব্দ শুনে এতক্ষণ ছুটছিল। বাতাসে শরবন কেঁপে যাচ্ছে! ঝোপে জঙ্গলে কত সব কীট-পতঙ্গ এবং পোকামাকড়। বর্ষার জন্য সাপের ভয়। এই অঞ্চলে বিষধর সাপ, মাঠে এবং নদীর চরে গ্রীষ্মের দিনে যারা ঘুরে বেড়াত তারা জলের জন্য সব উঁচু জমিতে উঠে যাবে। অথবা ঝোপে জঙ্গলে ঘাসের মাথায় জড়াজড়ি করে পড়ে থাকবে। আর জলজ ঘাস, জোঁক এবং এক ধরনের ফড়িংয়ের ভয় আর-প্রায় যেন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই—এই এক যুবতী এখন ওদের সবাইকে বনের ভিতর কাদায় জলে ঘুরিয়ে মারছে। যত ঘুরে মরছে তত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে জব্বর এবং পাগলের মতো চিৎকার করছে করিম, অশ্লীল সব কটূক্তি। দড়িদড়া খুলে না দিলেই হতো। এখন কি করা। হায় এখন পদ্মফুলের মতো যে মালতী সে এখন কোথায়! এখন প্রায় ফাঁসির আসামীর মতো মুখ নিয়ে খোঁজাখুঁজি। ছুঁতে পারল না, ভালো করে সাপ্টে ধরতে পারল না, সাপ্টে ধরে সোহাগে কচু পাতার মতো নরম চুলে হাত ঢুকিয়ে, হায়! সে কিছুই করতে পারল না। সব বিফলে গেল, ভাবতেই করিম নিজের মূর্তি ধারণ করল এবার। একেবারে জানোয়ারের মতো মুখ! বলল, হালা, তুমি আমারে গরু ঘোড়া পাইছ। বলেই সে এক লাথি মারল জব্বরের পাছাতে। সঙ্গে সঙ্গে জব্বর ভয়ে ভয়ে বলল, আসেন মিঞা। মনে হয় উত্তরের ঝোপে জলে কাদায় মানুষ হাঁইটা যায়! আসেন।

না আর না! জব্বর মনে মনে কসম খেল। পেলেই সাপ্টে ধরবে। ইজ্জতের মাথা খাবে। করিম ভাবল, না আর না। আর সোহাগ দেবে না। পেলেই জানোয়ারের মতো লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। টানা হ্যাঁচড়া, টানতে টানতে ঝোপের ভিতর ফেলে, ভাবতেই করিমের চোখমুখ নেশাখোরের মতো দেখাচ্ছে। যা হয় হবে, একবার মাটির ভিতর আবাদের চারা তুলে দিতে পারলে জমি তার, কার হিম্মত আর বলে, জমি তোমার না মিঞা, জমি আমার। সে এবং জব্বর শাকরেদ নাদির হন্যে হয়ে ছুটছিল, এবং ছুটতে ছুটতে মনে হল সন্ধ্যায় মালতী ডাঙায় উঠে গেছে। ওরা ডাঙায় উঠে কবরখানার ঝোপ জঙ্গলে ওৎ পেতে থাকল। মালতী একা একা অরণ্যের ভিতর পথের খোঁজে ঘুরে বেড়ালে খপ করে ধরে ফেলবে।

মালতী অভুক্ত। সারাক্ষণ শরবনের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে অবসন্ন। সে এই অরণ্যের ভিতর ঢুকে দেখল দর দর করে রক্ত পড়ছে। গোটা শরীর কেটে গেছে। গায়ে কাপড় নেই। সেমিজ ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। কোথায় কোন জঙ্গলের লতায় পাতায় বেতঝোপের ভিতর ওর কাপড় এখন নিশানের মতো উড়ছে কে জানে। ওর হুঁশ ছিল না। সেমিজের একটা দিক ফালা ফালা। সে টলতে টলতে নির্জন বনভূমিতে ঢুকে আহত হরিণ যেমন তার শরীর ঝোপের ভিতর টেনে নেয়, সন্তর্পণে চুপচাপ পড়ে থাকে, মালতী তেমনি নিজেকে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য করে দিল। উপরে হাল্কা জ্যোৎস্না। সামান্য সময় এই জ্যোৎস্না আকাশে থাকবে। তারপর ক্রমে কেমন ক্ষীণ এক শব্দ উঠে আসছে মনে হল; নদীর জলে শব্দ। পাড়ে ঢেউ ভাঙার শব্দ। সহসা ঝোপে জঙ্গলে কোন অতর্কিত শব্দ শুনলে সে আঁতকে উঠছে। ক্রমে সে নিস্তেজ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল সে মরে যাচ্ছে। দূরে দূরে সে হরিণীর দ্রুত ছুটে যাওয়ার শব্দ পেল। দূরে দূরে আকাশে এক ভেলার মতো রঞ্জিতের মুখ, মুখের ছবি, দুই চোখ রঞ্জিতের ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে। মালতী ক্রমে এ-ভাবে সংজ্ঞা হারাচ্ছে বুঝতে পারছিল। আর ঠিক তক্ষুনি দেখল ওর পায়ের কাছে তিন যমদূতের মতো অপদেবতা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে তারা নিতে এসেছে। এবার যথার্থই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ভয়ে।

কিছু খচমচ শব্দ, হরিণীর দ্রুত পালানোর শব্দ এবং জলে ঢেউ ওঠার শব্দ—সারারাত সংজ্ঞাহীন মালতীর কোমল শরীরে পাশবিকতার সাক্ষ্য রেখে মালতীকে মৃত ভেবে কবরভূমিতে ফেলে অন্ধকারে ওরা সরে পড়ল সকাল হতে না হতেই। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে যুবতীকে। কেউ টের পাবে না, বনের ভিতর এক যুবতী মাইয়া মইরা পইড়া আছে।

সোনা সারা রাত ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখল, সেই এক বড় সমুদ্র যেন, বালিয়াড়িতে কারা একটা বড় কাঠের ঘোড়া টানতে টানতে নিয়ে এল। কি উঁচু আর লম্বা ঘোড়া! মানুষগুলি চলে গেলেই সে দেখতে পেল, ঘোড়াটা কাঠের নয়, ঘোড়াটা তাজা ঘোড়া—ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। সে একা ছিল না, কমলা অমলা যেন সঙ্গে আছে। ঘোড়াটা ওর কাছে এসে ঠিক পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল—যেমন মুড়াপাড়ার হাতিটাকে সেলাম দিতে বললে অথবা হেঁট-হেঁট বললে হাঁটু ভেঙে শুয়ে পড়ে তেমনি ঘোড়াটা এসে ওর সামনে হাঁটু ভেঙে শুয়ে পড়ল। সে, কমলা এবং অমলা পিঠে চড়তেই ঘোড়াটা ছুটতে থাকল। ঠিক

বালিয়াড়ির শেষে সমুদ্রের প্রায় হাঁটু জলে নেমেই ঘোড়াটা আবার কেমন কাঠের হয়ে গেল —নড়ছে না! সে, অমলা কমলা নামতে পারছে না। ক্রমে পোড়াটা উঁচু হতে হতে একেবারে আকাশ সমান হয়ে গেল। মেঘ ফুঁড়ে এত উঁচুতে উঠে গেছে যে, নিচের কিছুই ওরা দেখতে পাচ্ছে না। সে মুঠো মুঠো মেঘ ছিঁড়ে খেতে থাকল, কি মিষ্টি আর সুস্বাদু। ঠিক মেলাতে সে যেমন আঁশ-আঁশ চিনির তৈরি তুলোর বল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত, সে ঘোড়ার পিঠে উঠে তেমনি সেই মেঘ ছিঁড়ে, মোয়ার মতো হাতে নিয়ে গোল করে করে অমলা কমলাকে দিতে থাকল। আর তখন নিচের দিকে তাকাতেই মনে হল, কারা যেন সেই হাজার লক্ষ হবে, পিলপিল করে ঘোড়ার পা বেয়ে উঠে আসছে। ঠিক যেন ওদের স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি মিলে গেছে। সে এখন কী করবে ভেবে পেল না। হাতের কাছে আকাশ চিরে মাথা গলিয়ে দিতে পারবে, এবং দেব-দেবীদের রাজত্বে কার্তিক গণেশ অথবা শিবঠাকুর কীভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, দেখতে পাবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, যেই না এমন ভাবা, ঘোড়াটা আবার ছোট হতে হতে একটা ছোট খেলনা হয়ে গেল! সে, কমলা অমলা এখন সেই খেলনার ঘোড়া বুকে নিয়ে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে উঠে আসছে এবং উঠে আসার মুখেই মনে হল, জ্যাঠামশাই আশ্বিনের কুকুর নিয়ে হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে চলে যাচ্ছেন। সহসা জ্যাঠামশাই বিরক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন গ্যাৎচোরেৎশালা। সঙ্গে সঙ্গে সোনার সুন্দর স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ওর মাথার কাছে, ঠিক জানালায় শরতের সূর্য সোনালী জলের রঙ যেন, ওর পায়ের নিচে সূর্যের আলো। সে ধড়ফড় করে উঠে বসল।

প্রথম সে বুঝতে পারল না কোথায় সে আছে। ওর মনে হচ্ছিল সে বাড়িতে আছে। এবং বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছে। এখন মনে হল, এটা কাছারিবাড়ি। এটা মেজ-জ্যাঠামশাইর বিছানা। সে মেজ-জ্যাঠামশাইর পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছে। সে এবার ভালো করে চোখ মুছল। অমলা কমলার কথা মনে হল। ওরা এখন কোথায়? তারপর রোদ উঠলে সে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই কোথায়? এত বড় কাছারিবাড়িতে কেউ নেই। সকলেই যেন নদীর পাড়ে চলে গেছে। দরজা পার হলে বারান্দা। বারান্দার পর সবুজ মাঠ। আর দীঘির দক্ষিণ পাড়ে বড় মঠ। সোনা গতকাল মঠ দেখতে পায়নি। সোনা বস্তুত রাত হলে এদিকটায় এসেছে। অমলা কমলা ওকে জ্যাঠামশাইর কাছে দিয়ে গেছে। বাড়ির উত্তরে থাকলে বোঝাই যায় না দীঘির পাড়ে এত বড় এক মঠ আছে। শুধু ছাদের ওপর যখন সে দাঁড়িয়েছিল, অমলা কমলা বলেছে, মঠের সিঁড়িতে একটা শ্বেতপাথরের ষাঁড় আছে। ষাঁড়ের গলায় মোতি ফুলের মালা। আর সেই ছাদের অন্ধকারটা এখন যেন ওর কাছে এক রহস্যময় জগৎ। ঘুম থেকে উঠেই পূজার বাজনা কানে আসছিল। অর্জুন নায়েব নদী থেকে স্নান করে ফিরছে। রামসুন্দর কাঁধে লাঠি নিয়ে কোথাও যাবে বোধ হয়। লালটু পলটু এখন কোথায়? এ-বাড়িতে এসে মেজদাকে সে দেখতেই পাচ্ছে না। ওরা কোথায় আজ শিকারে যাবে। সকাল সকাল হয়তো নদীর চরে শিকারের জন্য বের হয়ে গেছে। আর তখনই মনে হল মাঠ পার হলে দীঘি, দীঘির ওপারে এক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন চিনতে পারছে মানুষটাকে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না! অস্পষ্ট লম্বা এবং স্থির, প্রায় যেন সমুদ্রের বালিয়াড়িতে ট্রয় নগরীর কাঠের ঘোড়া, শহরের দিকে মুখ করে

তাকিয়ে আছে। সোনা দাঁড়াল না। ঠিক স্বপ্নের মতো, যেন স্বপ্নটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। সে পাগলের মতো ছুটতে থাকল। অর্জুন নায়েব বলল, সোনা কোনখানে যাইতাছ? তোমার জ্যাঠামশাই নদীতে সান করতে গ্যাছে। কে কার কথা শোনে এখন। সে মাঠ পার হয়ে, হরিণেরা যেখানে থাকে, তাদের নিবাস পার হয়ে, ময়ূরের ঘর ডাইনে ফেলে, ফুলফলের গাছ পার হয়ে এক ছায়াস্নিগ্ধ ঝাউ গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। আবার ঘাড় তুলে দেখল। ঠিক মিলে যাচ্ছে কিনা। কারণ সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। এদিকটায় বিচিত্র সব দেশী-বিদেশী ফুলের গাছ, ঝোপ-জঙ্গলের মতো জায়গা, সে গাছের ডালপাতা ফাঁকা করে দেখল সব ঠিকই আছে। দীঘির পাড় থেকে যা স্পষ্ট দেখতে পায়নি, এখানে এসে স্পষ্ট হয়ে গেল। সে আবেগে ছুটতে ছুটতে ডাকল, জ্যাঠামশয়! বড় জ্যাঠামশয়! আমি সোনা, জ্যাঠামশয়, জ্যাঠামশয়। কি আকুল আবেগ। সে পড়ি-মরি করে ছুটছে! তার সেই আপন মানুষ মিলে গেছে! সে দেখল কুকুরটা পর্যন্ত সোনাকে দেখে আনন্দে লেজ নাড়ছে। জ্যাঠামশাই কিছুতেই তাকাচ্ছেন না। হাতে পায়ে ধান পাতার কাটা দাগ। জলে জলে হাত পা সাদা হয়ে গেছে। কখনও ঘুরে ঘুরে, কখনও জলে জলে কুকুর নিয়ে তিনি একলাই বের হয়ে পড়েছেন।

সোনা কাছে যেতেই কুকুরটা ডেকে উঠল, ঘেউ। এই সেই কুকুর, কবে থেকে বাড়ি উঠে এসেছে, বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, বড় অবহেলাতে এই কুকুর সংসারে বড় হচ্ছে। যা-কিছু উচ্ছিষ্ট থাকে, এই কুকুর খায়। বাড়িতে যে কুকুরটা থাকে বোঝাই যায় না। কেউ আদর করে না, কিন্তু এখন এই আশ্বিনের কুকুর সোনার কাছে কত মূল্যবান। তার কত নিজের জিনিস এসে গেছে। সে আর এখন কাকে ভয় পায়! সে, যেমন ট্রয় নগরীর বালকেরা কাঠের ঘোড়া টানতে টানতে শহরের ভিতর টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি সে এই মানুষটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। এত দূরে এসেই পাগল মানুষের কেমন যেন লজ্জা এসে গেছে প্রাণে। তিনি যেতে চাইছেন না ভিতরে। কারণ এত বড় বাড়ি দেখে বুঝি তার সেই দুর্গের কথা মনে পড়ে গেছে! একদিন তিনি একটা কালো রঙের টাই পরেছিলেন। পলিনের উক্তি, তুমি কালো রঙের টাই পরবেনা মণি, তুমি সাদা অথবা কমলা রঙের টাই পরবে, কালো রঙ দেখলে তোমার মতো মানুষকে কেমন নিষ্ঠুর মনে হয়। অথবা যেন এই যে তার বসন-ভূষণ এমন প্রাসাদের মতো বাড়িতে তা মানায় না। তিনি চারিদিকে তাকাতে থাকলেন। গায়ে জলের লাল মতো শ্যাওলা, যেন মানুষ নন তিনি এক জলের দেবতা, নানা রকম শ্যাওলা এবং গাছ লতাপাতা জলের, শরীরে গজিয়ে উঠেছে। সোনা টানতে টানতে নিয়ে যাবার সময় দিঘির সিঁড়িতে জ্যাঠামশাইকে বসাল। সে অঞ্জলিতে জল তুলে এনে শরীর থেকে শ্যাওলা, লতাপাতা পরিষ্কার করে দিতে থাকল। পাগল মানুষ যেন এই সিঁড়িতে পাথরের এক মূর্তি, বসে বসে আকাশ দেখছেন। চোখে না দেখলে বোঝাই যায় না মানুষটার ভিতর প্রাণ আছে।

দীঘির অন্য পাড়ে কমলা বৃন্দাবনীর সঙ্গে পূজার ফুল তুলছে। ফুল তুলতে তুলতে দেখল, সিঁড়িতে সোনা কি যেন করছে। সোনা লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে আবার উঠে

যাচ্ছে। সিঁড়ির শানে এক মানুষ, সোনা মানুষটার শরীরে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। পাশে এক কুকুর। সে সোনার সঙ্গে ঘাটে বার বার নামছে আবার সোনার সঙ্গে সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। কী এত কাজ করছে নিবিষ্ট মনে সোনা! কমল ছুটতে থাকল, সে সেই সব হরিণ অথবা ময়ূরের ঘর পার হয়ে সবুজ গালিচা ঘাসের পাতার ওপর দিয়ে ছুটল। তারপর ঘাটের সিঁড়িতে এসে দেখল, সোনা হাঁটু গেড়ে মানুষটার শরীর থেকে কি সব বেছে দিচ্ছে। সে দেখল, সোনা শ্যাওলা বেছে দিচ্ছে। শাপলা-শালুকের পাতা বেছে দিচ্ছে। মানুষটা কে! কমলা যে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, উকি দিয়ে দেখছে, আশ্চর্য চোখে কুকুর এবং এই পাথরের মতো মানুষকে দেখছে—সোনা তা দেখেও কোনও কথা বলছে না। কমল বাধ্য হয়ে বলল, কে রে সোনা?

—আমার জ্যাঠামশায়।

—তোর জ্যাঠামশাই?

—আমার বড় জ্যাঠামশায়।

—কথা বলে না?

—না।

—বোবা?

—না।

—তবে কথা বলে না কেন?

—কথা বলে—শুধু বলে গ্যাৎচোরেৎশালা।

—আর কিছু বলে না?

—না।

—এ মা, একি কথা রে। শুধু গ্যাৎচোরেৎশালা বলে!

সোনা আর উত্তর করল না। সোনা নিবিষ্ট মনে হাত পা থেকে শেষ শাপলা-শালুকের পাতা, দাম এবং জলজ ঘাস তুলে বলল, ওঠেন জ্যাঠামশয়।

কমল বলল, জলে ভিজে গেছে কেন?

সোনা বলতে পারত সাঁতার কেটে জ্যাঠামশাই এসেছেন। ওরা ওঁকে নিয়ে আসেনি। তিনি কুকুর নিয়ে চলে এসেছেন।

—তোর জ্যাঠামশাই পাগল।

সোনা রেগে গেল। বলল, হ, হ, কইছে! পাগল কে কইছে!

—তবে কথা বলে না কেন?

সোনার কেন জানি ভীষণ রাগ হচ্ছিল। জ্যাঠামশাইকে পাগল বললে সে স্থির থাকতে পারে না। সে যেন তাড়াতাড়ি কমলের কাছ থেকে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে দূরে সরে যেতে চাইল। তখন কমল বলল, আসুন দাদু। আমি সোনার পিসি হই। সোনা আমি তোর পিসি হই না রে?

এবার যেন সোনা খুব খুশি। বলল, আমার কমল-পিসি জ্যাঠামশায়।

মণীন্দ্রনাথ কমলকে দেখলেন। চোখ নীল কেন এ মেয়ের! সে হাঁটু গেড়ে বসল। যেন কোনও দৈত্য এখন হাঁটু গেড়ে বসে পুতুলের মতো ছোট্ট এক মেয়েকে দু'হাতে তুলে চোখের কাছে নিয়ে এল। বলতে চাইল, তুমি কে মেয়ে! তোমাকে যেন চিনি!

এমন যে ডাঁহাবাজ মেয়ে তার চোখ পর্যন্ত আতঙ্কে এতটুকু হয়ে গেল। সোনা ভিতরে ভিতরে মজা পাচ্ছিল। সে প্রথম কিছু বলল না, কিন্তু দেখল কমল কেঁদে দেবে, সে বলল, ভয় নাই কমল। বলে সে জ্যাঠামশাইর দিকে তাকাল। আর তক্ষুনি সেই মানুষ, যেন মন্ত্রের মতো চোখ সোনার, চোখে রাগ, এতটুকু ছেলের এমন চোখ দেখে মণীন্দ্রনাথ কমলকে নামিয়ে দিলেন। হয়তো কমল ছুটে পালাত, কিন্তু সোনা কি নির্ভীক, এখন কমল নিজেকে খুব ছোট ভাবল সোনার কাছে। সোনা এতটুকু ভয় পাচ্ছে না, সে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এতবড় মানুষ সোনার একান্ত বশংবদ, সোনার ভয়-ডর নেই, কমলেরও ভয়-ডর থাকল না। সে বাঁ হাতটা ধরল, সোনা ডান হাত ধরেছে। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে।

ট্রয়ের ঘোড়া নিয়ে নাটমন্দিরের সামনে ঢুকতেই প্রায় একটা সোরগোল পড়ে গেল। সেই মানুষ এসেছেন আবার এই দেশে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ হাবাগোবা মুখ নিয়ে নাটমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্গাঠাকুর দেখতে থাকলেন। আর বাড়ির আমলা কর্মচারী, বালক-বালিকা এমন কি মেজবাবু এসে গেলেন। তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। —বল গিয়ে ভূঁইঞা কাকাকে, ওঁর বড়দা এসেছেন। শান্তশিষ্ট বালকের মতো মানুষটা এখন দাঁড়িয়ে দুর্গাঠাকুর দেখছেন। উপরে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। তিনি ঘুরে-ফিরে সব দেখতে থাকলেন।

সোনা বলল, দুগগাঠাকুররে নম করেন।

মণীন্দ্রনাথ একেবারে সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। কেউ যেন ওঁকে আর এখন তুলতে পারবে না। দু'হাত সামনে সোজা। সবাই হাসাহাসি করছে। সোনার এসব ভাল লাগছে না। সে এখন পারলে এখান থেকেও নিয়ে সরে পড়তে চায়। মেজবাবু অর্থাৎ অমলা কমলার বাবা ধমক দিলেন। সামনে কেউ দাঁড়িয়েছিল বোধ হয়, কর্মচারী কেউ হবে—

মেজবাবু সকলকে চেনেন না—এই পূজার সময়ে দূর দেশের সব কাছারিবাড়ি থেকে নায়েব গোমস্তারা চলে আসে, সঙ্গে পূজা-পার্বণের জন্য আখ, কলা, দুধ, মাছ যে অঞ্চলে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, পূজার সময় সব নিয়ে হাজির হয়। ওদের একজনকে বললেন, ভূঁইঞাকাকা এখনও আসছেন না কেন দেখ তো?

পাগল মানুষ তেমনি সোজা সটান। প্রণিপাতের মতো শরীর শক্ত। সোনা দেখল, জ্যাঠামশাই সোজা হয়ে আছেন। সোনা বুঝতে পারল, না বললে তিনি উঠবেন না। সে এবার নুয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, উঠেন জ্যাঠামশয়। আর নম করতে হইব না। বলে হাত ধরতেই তিনি উঠে পড়লেন। ভিজা কাপড়ে সব কাদা-মাটি লেগে আছে।

ভূপেন্দ্রনাথ এসে তাজ্জব। মণীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথকে দেখেই সোনার দিকে তাকালেন। কি হবে সোনা! দেখছ মানুষটা আমার দিকে কিভাবে তাকাচ্ছে! সোনার দিকে তাকিয়েই মণীন্দ্রনাথ বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। যেন তাঁর মনেই ছিল না এখানে ভূপেন্দ্রনাথ থাকে। এখানে এলে তাঁকে ভূপেন্দ্রনাথের পাল্লায় পড়তে হবে। তিনি এবার হাঁটতে চাইলেন। ভূপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি হাত ধরে ফেললেন। কোথায় কোনদিকে আবার চলে যাবেন, ভূপেন্দ্রনাথ হাত ধরে রাখলেন। তিনি এবার সকলকে চলে যেতে বললেন। ভিড় করতে বারণ করে দিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন না কি করে এই মানুষ এত দূরে চলে এসেছেন। বোধ হয় সাঁতার কেটে চলে এসেছেন। কী যে পারেন না এই মানুষ, তা ভাবতে-ভাবতে নিজের ভিতর কেমন বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। দুর্গাঠাকুরের দিকে মুখ তুলে তাকালেন, মা, মাগো, বলার ইচ্ছা। দুর্গাঠাকুরের বড় বড় চোখ দুই ভাইকে দেখতে দেখতে বুঝি হাসছিল। তিনি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়তে চাইলেন, কারণ তিনি জানতেন, নাটমন্দিরের দোতলায় জাফরি কাটা অন্দরে এখন শতেক চোখ পর্দার আড়াল থেকে নিশ্চয়ই ওঁকে দেখছে—এমন সুপুরুষ মানুষকে দেখে নিশ্চয়ই ওরা হা-হুতাশ করছে। কি চেহারা তাঁর। গৌরবর্ণ। লম্বা এবং শিশুর মতো সরল। নাবিক যেমন সমুদ্রে পথ হারিয়ে বিষণ্ণতায় ভোগে, এখন এই মানুষের চোখে তেমনি এক বিষণ্ণতা। ভূপেন্দ্রনাথের এসব ভেবে কেন জানি চোখে জল এসে গেল।

জোটন সকাল থেকেই মুখ গোমড়া করে বসে আছে। আসমানে চাঁদ দেখছে। নীল আকাশ দেখলেই টের পায় জোটন, শরৎকাল এসে গেছে। এখন দুর্গাপূজার সময়। এই দরগায় বসেও তা টের পাওয়া যায়। দরগা তো নয় য্যান বিশাল বনের ভিতর বনবাসী জোটন। দু'সাল থেকে, কি আরও বেশি হবে—সে বাপের ভিটাতে যেতে পারছে না। ফকির সাহেব নিয়ে যাচ্ছে না। শরৎকাল এলেই আকাশে চাঁদ বড় হয়ে দেখা দেয়। সারা রাত এই বনের ভিতর জ্যোৎস্না ছড়ায়। আকাশের দিকে তাকালেই মনের ভিতর কেমন করে। প্রতাপ চন্দ্রের বাড়িতে দুগ্‌গা ঠাকুর, ঠাকুরের মুখ-চোখ এবং নাকে নথ সব সে মনে করতে পারছে। মনে হলেই ভিতরটা কেমন করে। কতবার ফকিরসাবকে বলেছে, দ্যাশে লইয়া যাবেন? মানুষটা তখন রা করেন না। দিন-দিন ফকিরসাবের শরীর ভেঙে আসছে। আর বুঝি সে বাপের ভিটাতে ফিরে যেতে পারবে না। মানুষটার কাছে দরগার

এক কোণে ছোট ছইয়ের মতো নিবাসের যেন তুলনা নেই। ছইয়ের ভিতর বসে ফকিরসাব কেবল হুঁকা খান আর কি সব বয়াৎ বলেন, যা জোটন আদৌ বোঝে না। বাংলা করে দিলে জোটন কেবল হাসে।

—ফ্যাক-ফ্যাক কইরা হাসেন ক্যান?

—হাসলাম কই আবার।

—আপনে হাসলেন না?

—ঠিক আছে। হাসি পাইলে আর হাসুম না। বিমর্ষ মুখ নিয়ে সে বসে থাকল।

ফকিরসাব বললেন, মন খারাপ ক্যান?

জোটন উত্তর করছে না।

—কি কথা কন না ক্যান?

—কি কমু কন?

—যা মনে লয়।

—মনে লয় দ্যাশে যাই।

—দ্যাশে গিয়া থাকবেন কই? আপনের ভাইজান ত আবার সাদি করছে। নতুন মানুষ আপনেরে চিনতে পারব?

—চিনতে পারব না ক্যান? গ্যালে ঠিকই চিনতে পারব।

—বড় দূর যে! এতদূর নাও বাইয়া যাইতে পারমু?

—নাও জলে জলে মাঠে পড়লে না হয় আমি লগি ধরমু।

—মাইনসে দ্যাখলে কি কইব? বলেই ফকিরসাব আবার শরীরে অস্বস্তি বোধ করলেন। পেটের ভেতরটা মোচড়াচ্ছে।

শরৎকাল বলে ঝোপ-জঙ্গলে এখন কীট-পতঙ্গ বাড়ছে। শরৎকাল বলে জলে এখন পচা গন্ধ উঠতে থাকবে। কারণ নদী-নালা, ঝোপ-জঙ্গল থেকে জল নামতে থাকলেই ঘাস শ্যাওলা দাম সব পচে যাবে। দরগার চারপাশে শুধু হোগলার বন। বনের ফাঁকে কোনও পথ নেই এখন।

দরগায় আসতে হলে নৌকা ঠেলে নিয়ে আসতে হয়। দরগার পুবে বড় নদী মেঘনা, মেঘনার পাড়ে-পাড়ে এই বন নিশুতি রাতে নির্জন অরণ্যের মতো চুপচাপ। এমন কি

কোনও কীট-পতঙ্গের ডাকও ভয়াবহ লাগে! চারপাশে বড় বড় রসুন গোটার গাছ, অশ্বত্থ গাছ আর নিচে তার হাজার বছর ধরে অঞ্চলের কবরখানা। কোথাও ভাঙা মসজিদ, ভাঙা কুয়ো, বেদি। জীর্ণ অন্ধকূপের মতো সব ছোট-ছোট ইঁটের কোঠা, কোনও কোনওটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আর লতাপাতা, গাছ-গাছালি এত ঘন যে, দু'পা যেতে লতাপাতায় জড়িয়ে যেতে হয়। একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ গ্রীষ্মের দিনে দেখা দেয়। বর্ষাকালে কেউ আর বনের ভিতর ঢুকতে চায় না। জলের কিনারে কবর দিয়ে চলে যায়। মানুষের ইন্তেকালের সময় কিছু মানুষজন চোখে পড়বে, দু'ক্রোশ পথ হাঁটলে ক'ঘর বসতি আছে। পারতপক্ষে এদিকে কেউ মাড়ায় না। দরগায় এক ফকিরসাব আছেন, দুঃসময়ে শুধু দোয়াভিক্ষার জন্য সাবের কাছে চলে আসে মানুষ। জমিতে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে ফকিরসাব ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে নিচে নেমে মালা-তাবিজ যখন যা দরকার প্রয়োজন মতো দিয়ে আসেন। মানুষেরা কেউ বনের ভিতর এক অলৌকিক ভয়ের জন্য ঢুকতে চায় না। পাশে একটা লম্বা খাল আছে। মৃত অজগর সাপের মতো খালটা নিশিদিন শুয়ে থাকে। বর্ষাকাল এলে এই খাল জেগে ওঠে, কিছু উজানি নৌকা পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য এই খালে উঠে আসে। খাল দিয়ে যায় আল্লা অথবা ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে। কোনও রকমে এই কবরখানা ভয়ে ভয়ে পার হয়ে যায়।

মানুষ মরলে ফকিরসাবের পরবের মতো উৎসব। ফকিরসাব তখন দু' গণ্ডা মতো পয়সা পান। পান খান। আর মালাতাবিজ গলায় ঝুলিয়ে আল্লা এক রহমানে রহিম বলতে-বলতে সেই মৃত মানুষটার চারপাশে ঘুরতে থাকেন। কখনও বনের ভিতর লুকিয়ে নানা রকমের খেলা খেলতে ভালোবাসেন অর্থাৎ কবরখানায় মৃত মানুষ এলেই ফকিরসাবের কেরামতি বেড়ে যায়। কালো আলখাল্লাতে পা পর্যন্ত ঢেকে, গলায় লাল নীল হলুদরঙের রসুন গোটার মতো বড় বড় পাথর ঝুলিয়ে, চোখে কালো সুর্মা টেনে এবং মাথায় ফেটি বেঁধে মনে হয় তখন এক পীর এসে গেছেন। সাদা কোঁকড়ানো চুল তার। ঊর্ধ্বমুখী বাহু তার। চাপ দাড়িতে রসুন গোটার তেল চপ চপ করছে। যারা কবর দিতে এল তারা দেখতে পায় এক মুশকিলাসানের লম্ফ হাতে নিয়ে বনের ভিতর কে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লোকগুলি ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। বনের ভিতর থেকে মুশকিলাসানের লম্ফ নিয়ে সহসা উদয়। মনে হবে তখন তিনি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছেন। তারপর যার যা খুশি—দু' গণ্ডা পয়সা এবং যার ইন্তেকাল হল তার কিছু জিনিসপত্র মিলে গেলে এই মানুষের অন্নসংস্থান। জোটন তখন ছইয়ের ভিতর বসে মানুষটার এই কেরামতি দেখে ফিকফিক করে হাসে। দিনের বেলাতেও কালো আলখাল্লার নানা জায়গায় তালি মারতে মারতে জোটন মানুষটার নাচন কোদন দেখে। তখন দেখলে কে বলবে এই মানুষ নিরীহ জীব, কে বলবে অকপট সরল মানুষ, প্রকৃতপক্ষে ভিতু লোক। অথচ অন্নসংস্থানের জন্য কবরে মানুষ এলেই এই মানুষ অন্য মানুষ হয়ে যান। পীর বনে যাবার লোভে মানুষটা সকলের চোখে ভিন্ন ভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দেখাতে ভালোবাসেন। এই অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জন্য ফকিরসাব দিন-রাত উপায় উদ্ভাবন করেন। আর ইন্তেকালের সময়

মানুষের চোখে নিজের খেলা দেখান। রাতে বেল গাছের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকেন।

সুতরাং কোথায় যে দুর্গোৎসবের জন্য জোটনের প্রাণে দুঃখ জেগে থাকে, বোঝার উপায় থাকে না ফকিরসাবের। সম্বৎসর এই দরগায় ছইয়ের ভিতর তিনি শুয়ে থাকেন। সময়ে অসময়ে তিনি রসুন গোটা কোঁচড়ে সংগ্রহ করে আনেন। মাচানের নিচে স্তূপীকৃত রসুন গোটা। বড় বড় পিপের মতো হাঁড়িতে সব ভিজানো থাকে। ছেঁচা রসুন গোটা জলে পচলে একরমের ঘন তেল, সেই তেলে ছইয়ের ভিতর তার আলো জ্বলে, মুশকিলাসানের লম্ফ জ্বলে এবং কিছু তেল পাতিলে পাতিলে গাছের মাথায় বসিয়ে রাখেন। সময়ে অসময়ে ইন্তেকালের সময় যারা আসে, তাদের অলৌকিক কিছু দেখাবার জন্য গাছের মাথায় আগুন জ্বেলে বসে থাকেন। আরও কী সব কাণ্ড তাঁর। দরগায় নতুন তখন। তাঁর কী যে তখন হাসি পেত! একটা হাড় রেখেছেন। কিছু জড়িবুটি রেখেছেন। মাঠে দাঁড়িয়ে মানুষ হাঁক পাড়লে—হেই কে আছে, আমি এক নাচারি ব্যারামি মুনুষ, তখনই ফকিরসাব যেন অন্য মানুষ হয়ে যান। পীর হবার জন্য তিনি তাঁর সেই মুখস্থ বয়াৎ বলতে বলতে জড়িবুটি নিয়ে মাঠে নেমে যান। পয়সা চাই সোয়া পাঁচ আনা। দরগার থানে সিন্নি দেবার জন্য এই পয়সা। সেই ফকিরসাব কী করে বুঝবেন, জোটন, যার নিবাস ছিল হিন্দু পল্লীর পাশে, পরবে পার্বণে চিড়া কুটে দিত, ধান ভেনে দিত, কেন সে ব্যাজার মুখে কাঠ কুড়াতে বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

সূর্য উঠবে উঠবে করছে। গাছপালা এত ঘন যে, সূর্য উঠলেও দেখা যায় না। সূর্যের আলো গাছের ডালপালায় পড়ছে। বড় সন্নিবিষ্ট এই গাছপালা বৃক্ষ। জোটন দু'হাতে বন-ঝোপ লতা পাতা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সে অনেকগুলি কবর পার হয়ে খালের পাড়ে নেমে এল। তারপরই সব হোগলার বন। এখন আশ্বিন-কার্তিক মাস বলে জলের কচ্ছপ পাড়ে উঠে আসবে। ডিম পাড়বে। এ-অঞ্চলে গ্রাম মাঠ নেই, ধানের খেত নেই, হিন্দু পল্লী নেই যে জমিতে নেমে শামুকের খোলে কট করে ধানের ছড়া কাটবে, ডিম নিয়ে ঠাকুরবাড়ি উঠে যাবে। ডিমের বদলে পানগুয়া চেয়ে নেবে। এখানে শুধু এই নির্জনে গাছপালা বৃক্ষ। জোটনের জোরে জোরে ফকিরসাবকে শুনিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ফকিরসাব আর নৌকা বাইতে পারেন না। ফকিরসাব ক্রমে লবেজান হয়ে যাচ্ছেন। ফকিরসাব একটা কোড়া পাখি ধরার জন্য বিলের জলে আঁতর পেতে রেখেছিলেন। কোড়া পাখির কলিজা খেলে গায়ে বল ফিরে আসতে পারে। ফিরে এলেই জোটন বাপের ভিটাতে বেড়াতে যাবে ভাবতেই মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। আর মন প্রসন্ন হতেই দেখল, দুটো সাদা পা যেন। হোগলার জঙ্গলে দুটো সাদা পা, কী সুন্দর আর যেন দুর্গাঠাকুরের পা। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। পায়ের ওপর সূর্যের আলো চিকচিক করছে। একটা ফড়িং কোত্থেকে উড়ে এসে বার বার পায়ের ওপর বসছে। ওপরে গাছপাতা নড়লে ছায়া পড়ছে পায়ে। ফড়িংটা ভয় পেয়ে তখন উড়ে যাচ্ছে। এই রোদ এবং পাতার ছায়াতে মনে হচ্ছিল, পায়ে মল বাজলে যেমন শব্দ দ্রুত বনের ভিতর হারিয়ে যায়, তেমনি এক শব্দ বুকের ভিতর

বাজতে বাজতে কোন অতলে ডুবে যাচ্ছে জোটনের। জোটন দেখল পা-দুটো এখন যথার্থই দুর্গাঠাকুরের হয়ে গেছে। সেই যেন গৌরী, শিবের জন্য বনবাসে এসে হোগলা বনে লুকিয়ে আছে। অথবা চৈত্র মাসে নীলের উপোসে গৌরী নাচে, নাচের মুদ্রা পায়ে যেন খেলে বেড়াচ্ছিল! জোটন বড় বড় চোখে এ-সব দেখছে, এখন কী করবে স্থির করতে পারছে না। সে সামনে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। এক যুবতী কন্যার পা দেখা যাচ্ছে। শুধু পা-দুটো, বাকি শরীর হোগলার জঙ্গলে। খুনটুন হবে হয়তো। কিন্তু এই দরগায়, পীরের থানে কার সাহস আছে খুন করে। জোটন কাঁপতে কাঁপতে দু'হাতে হোগলার বন ফাঁক করে দিতেই দেখল, নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিলে, দশ-হাত দুগ্‌গাঠাকুর যেমন চিৎ হয়ে থাকে, তেমনি মালতী হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। যেন অসুরনাশিনী মা জননী তুই, অ-মালতী, তুই চিৎপাত হইয়া পইড়া আছস! চুল খাড়া কইরা চোখ ঊর্ধ্বমুখী কইরা পইড়া আছস। তরে নিয়া আইছে কে। সে প্রায় মায়ের মতো শিয়রে বসে মাথাটা কোলে তুলে নিল। বুকে মুখে এবং শরীরের যেখানে যা-কিছু পুষ্ট সব হাতড়ে দেখল, না প্রাণ আছে। শুধু হুঁশ নেই। নাভির নিচটা কারা সারারাত খাবলে খুবলে খেয়ে গেছে। মৃতপ্রায় ভেবে মালতীকে কারা ফেলে চলে গেছে। শরীরের কোথাও কোথাও দাঁতের চিহ্ন। রক্তের দাগ, সে আর দাঁড়াল না। যেন এক অশ্ব ছুটে যায়, বনের ভিতর দিয়ে জোটন ছুটতে থাকল। আর ডাকতে থাকল, ফকিরসাব, অ ফকিরসাব, দ্যাখেন আইসা পীরের থানে কি হইছে। তাড়াতাড়ি করেন ফকিরসাব। হোগলা বনে কারা দুগ্‌গাঠাকুর বিসর্জন দিয়া গ্যাছে।

যেমন দু'লাফে সে ছুটে এসেছিল ফকিরসাবকে খবর দিতে, তেমনি দু'লাফে সে তার ছইয়ের ভিতর থেকে একটা ডুরে শাড়ি বের করে বলল, আপনে আমার পিছনে আসেন।

জোটন একটু দূরে দাঁড়িয়ে, ফকিরসাবকে বলল, কি দ্যাখা যায়?

—দুই পা দ্যাখা যায়।

—কার পায়ের মত?

—দুগ্‌গাঠাকুরের পা য্যান!

—তাহলে আপনে খাড়ন। বলে জোটন নিজে প্রথম হোগলার জঙ্গলে ঢুকে শাড়িটা দিয়ে মালতীকে ঢেকে দিল। তারপর বন ফাঁক করে ইশারায় ডাকল, আপনে মাথার দিকটা ধরেন। আমি পা ধরি।

এমন জবরদস্ত লাশ টানতে উভয়ের বড় কষ্ট হচ্ছিল। ওরা একটু গিয়েই গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখছে। আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফকিরসাব বললেন, বিবি, আপনের দুগ্‌গাঠাকুর, দরগাতে আইসা গেল! দ্যাশে গিয়া আর কাম কি!

জোটন হাঁপাচ্ছিল। সে উত্তর দিতে পারল না। ওর হাত এখন রক্তে অথবা পিচ্ছিল এক পদার্থে চ্যাট চ্যাট করছে! পাতা দিয়ে ঘাস দিয়ে সে সব মুছে আবার টেনে নেবার জন্য তুলে ধরছে। মাঝে মাঝে মালতীর শাড়ি লতায় পাতায় আটকে সরে যাচ্ছে। এমন পুষ্ট শরীর যে সামান্য বাতাস লাগতেই শাড়ি পিছলে পড়ে যায়। জোটন ফকিরসাবের দিকে তাকাল। বলল, না না, এইটা ভাল না, আপনার চোখ গাছপালার দিকে দ্যান! এদিকে না।

ফকিরসাব বলল, আমি ফকির মানুষ আমার চোখে দোষের কিছু থাকে না।

জোটন বলল, আপনে পুরুষমানুষ। চক্ষু আপনের এখন গাছপালা পাখি দ্যাখুক।

—আপনের যখন তাই ইচ্ছা...বলে ফকিরসাব চোখ বুজে থাকলে জোটন বলল, কি কইলাম আপনে কি করলেন!

—কি কইলেন?

—গাছপালা পাখি দ্যাখতে কইলাম।

—তাই দ্যাখতাছি!

—চোখ বুইজা বুজি দ্যাখা যায়?

—খুইলা রাখলে যা দ্যাখি, বুইজা রাখলে বেশি দ্যাখি।

—তা'হলে খুইলা রাখেন।

এবার জোটন ডেকে উঠল, মালতী অ মালতী, দ্যাখ কই আইছস। আল্লার বান্দার কাছে আইছস। চোখ মেইলা তাকা একবার। মালতী, মালতী! হুঁশ নেই। সুতরাং জোটন তাড়াতাড়ি কিছু জল এনে চোখমুখে ছিটিয়ে দিল। হুঁশ কিছুতেই ফিরছে না। এখানে রোদ নেই, গাছপালা এত নিবিড় যে সামান্য শিশির পর্যন্ত ঘাসের ওপর পড়তে পারে না। আর একটু যেতে পারলেই ওদের ছই! মাচানে ফেলে পিঠে পায়ে কোমরে গরম জলের সেঁক দিতে পারলে শরীরে ব্যথা মরে আসবে। তারপর সেই বিশল্যকরণীর মতো ফুলের রস যেখানে যা-কিছু ক্ষত আছে এবং যেখানে যা-কিছু রক্তপাত ধুয়ে মুছে রসুনগোটার তেলে ফুলের রস মিশিয়ে লাগাতে পারলে মালতী ফের চোখ মেলে তাকাবে।

ফকিরসাবের কিন্তু কিছুতেই এতটুকু ব্যস্তভাব নেই। হচ্ছে হবে ভাব। কেমন নিরিবিলি এই কবরখানায় দুর্গাঠাকুর আইসা গেল ভাব। সাতে নাই পাঁচে নাই, ফকিরসাবের তাড়াহুড়ো নাই। তিনি মালতীকে মাচানে ফেলে রেখে হুঁকোটা খুঁজতে থাকলেন।

—এখন আপনের হুঁকা খাওয়নের সময়!

—পানিটা গরম করেন ইত্যবসরে হুঁকা খাই। হুঁকা খাইলে মাথাটা সাফ থাকে।

হুঁকা খাইলে মাথাটা সাফ থাকে এটা ফকিরসাবের কথার কথা। মনের কথা নয়। হয়তো এমনই মানুষটা। শত বিপদেও মানুষটার মাথা গরম হয় না। বেশ রয়ে বসে বুঝেসুজে হাঁকল, কৈ গ, পানি আপনের গরম হইল?

তৈজসপত্র বলতে জোটনের চারটা পাতিল, একটা পিতলের বদনা এবং সামান্য এক ভাঙা আর্শি। চারটে জালা আছে রসুন গোটা ভেজানোর জন্য। না হলে তাড়াতাড়ি এক জালা পানি এনে দিতে পারত ফকিরসাবকে। বদনা করে পানি আনছে জোটন। বর্ষার পানি বেশি দূরে নয়। ছইয়ের নিচে জল। উনুনে জল গরম হলে জোটন বলল, এদিকে আর আইসেন না।

—ক্যান? ফকিরসাব হুঁকা খেতে খেতে বলল।

—ক্যান আবার খুইলা কইতে হইব!

—দুগ্‌গাঠাকুরকে আপনে তবে খালি কইরা একলাই দ্যাখবেন?

জোটন কান দিল না। মানুষটার এই স্বভাব। সব জানবে, বুঝবে এবং এত বড় ইমানদার মানুষ, তবু মানুষটা ক্যান, কি হইব দ্যাখলে—আমি ত ফকির মানুষ, আমার কাছে সব সমান এমন বলবে।

জোটন সমস্ত শরীর ভালো করে গরম জলে ধুইয়ে দিল। জোটন সব ধুয়েমুছে মালতীকে আবার সেই বিধবা মালতী করে দিতে চাইল। সংসারে সব চাইলেই হয় না! কেন জানি বার বার মালতীর জন্য সুন্দর এক যুবা পুরুষের মুখ মনে পড়ছিল জোটনের। কবে থেকে মালতীর শরীর খোদার মাশুল তুলছে না—বড় কষ্ট এই শরীরের। ঈষদুষ্ণ জলে গা ধোয়াবার সময় জোটন মনে মনে নানা রকমের কথা বলছিল। কি পুষ্ট শরীর। জোটন হাত দিয়ে মালতীর কোমর থাবড়ে দিচ্ছে। উপুড় করে মালতীর কোমরে জল ঢেলে দিচ্ছে। ডানদিকে বসে ধীরে ধীরে জল উপর থেকে ঢেলে থাবড়ে থাবড়ে মাজাতে যে সারারাত অমানুষের হাড়হালুম গেছে তা ঝেড়ে দিচ্ছে জোটন।

এ-ভাবে মনে হল মালতীর, কারা যেন তাকে একটা বড় জলাশয়ে ভাসিয়ে রেখেছে। শরীরে কে কি যেন মেখে দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল, নরম হাত, ভালোবাসার হাত—কিন্তু তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। যেন তাকালেই সেইসব নরপিশাচের মুখ ভেসে উঠবে। সে তবু পালাবার জন্য ধড়ফড় করে উঠে বসলে জোটন চিৎকার করে উঠল, ফকিরসাব আসেন। দ্যাখেন আইসা, মালতীর হুঁশ ফিরা আইছে।

মালতী চোখ খুলে দেখল জুটি ওকে ধরে বসে আছে। কি বলতে গিয়ে চোখমুখ কাতর দেখাল মালতীর। সে বলতে পারল না। সে মাচানে যেন কতকাল পর দীর্ঘ এক মরুভূমি পার হয়ে এক মরুদ্যানে উঠে এসেছে। মালতী ফের সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

জোটন এবার ফকিরসাবকে বলল, প্যাটটা পইড়া আছে।

—কি দিবেন খাইতে?

—ইট্টু দুধ নিয়া আসেন। গরম কইরা দেই! যদি খায়।

ফকিরসাব দেরি করলেন না। হুঁকা খাবার পর নানা রকমের প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে। প্রথমত এই যুবতীকে কারা ফেলে দিয়ে গেল! কখন এবং ওরা কতজন ছিল। নানা রকমের সন্দেহ দেখা দিতে থাকল। মালতী তার ঘরে ফিরে যাবে কিনা, থানা-পুলিস এবং অনেক ঝামেলা এর পিছনে রয়েছে। তিনি ফকির মানুষ। এখানে কতদিন আছেন। এমন ঘটনা এখানে কোনওদিন ঘটেনি। তবে একবার এক সাধু এসেছিল, ভৈরবী সঙ্গে ছিল। এই দরগায় ক'রাত ওস্তাদের ভোজ খেয়ে বেশ যখন সরগরম, তখন সেই ভৈরবী তিলকচাঁদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। ছিল ভৈরবী, হয়ে গেল পদ্মদীঘির ছোটবাবুর বহুরানী। তারপর সাধুবাবাজী বড় একটা রসুনগোটার মগডালে উঠে গলা দিল। ছোটবাবু মাথার ওপর ছিলেন বলে যে-যাত্রা ফকিরসাব থানা-পুলিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন—কিন্তু এখন, এবারে! ফকিরসাব বড় ঘাবড়ে গেলেন। তবু তিনি মুখ ফুটে কিছু বললেন না। জল ভেঙে বাগের ও-পাশে ওর দুই ছাগলের দুধ দুয়ে আনার জন্য নেমে গেলেন। জল ভেঙে ওপাড়ে গিয়ে উঠবেন।

জোটন মালতীর মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকল। বনের ভিতর ডাহুক পাকি ডাকছে। নিচে সেই জল এবং শরবন। যতদূর চোখ যায় সে দেখল বাতাসে শরবন কাঁপছে। শরৎকালের রোদ পাখ-পাখালির মতো উড়ে এসে দরগায় এখন নেচে খেলে বেড়াচ্ছে। সামান্য হাওয়া ছিল জলে। কত রকমের লাল নীল ফড়িং উড়ছে। কত রকমের বিচিত্র কীট-পতঙ্গের শব্দ কানে আসছে আর কতকাল আগে ইন্তেকাল হয়েছিল তার বড় সন্তানের—এই কবর ভূমিতেই এখন সে সন্তান পাথর হয়ে আছে। যেন মাটি খুঁড়লেই সেই সন্তান বের হয়ে আসবে। জোটন সব ভুলে মালতীকে মায়ের স্নেহে চোখেমুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। চুলে বিলি কেটে দিতে থাকল। সন্তানস্নেহে জোটনের চোখ ফেটে জল আসছিল।

মণীন্দ্রনাথ এত বড় রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িতে ঢুকেই মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি এখন সোনাকে সঙ্গে নিয়ে কাছারিবাড়ির উঠোনে পায়চারি করছেন। ভূপেন্দ্রনাথ ট্রাঙ্ক থেকে তাঁর ধুতি বের করে দিয়েছেন, পাঞ্জাবি খুলে নিজেই পরিয়ে দিয়েছেন। লম্বা মানুষ এবং বলিষ্ঠ বলে জামা-কাপড় সবই খাটো খাটো দেখাচ্ছে। রামপ্রসাদ দেখাশোনার ভার নিয়েছে—কোথায় কোন্ দিকে একা একা চলে যান দেখার জন্য রামপ্রসাদ থাকল। অনর্থক এই দেখাশোনার ভার রামপ্রসাদের ওপর। মণীন্দ্রনাথ কেবল কথা বলছেন না এই যা। নতুবা দেখে মনে হবে তিনি ফের তাঁর প্রবাস-জীবন থেকে ফিরে এসেছেন। এই মনোরম জগতে সোনার হাত ধরে কেবল তাঁর ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা।

উৎসবের বাড়ি। মানুষজন আত্মীয়কুটুম কেবল আসছে। নদীর ঘাটে নাও এখন লেগে আছে। ঢাক-ঢোলের শব্দ নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাইর হাত ধরে টানতে টানতে সোনা নাটমন্দির পার হয়ে এল। সে মনে মনে কাকে যেন খুঁজছে। কমল কোথায়! এত বড় বাড়ির ভিতর থেকে কমলকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সে জ্যাঠামশাইকে ময়ূর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট এক চিড়িয়াখানা বাবুদের। ছোট দুটো বাঘ আছে, হরিণ আছে, ময়ূর আছে আর কচ্ছপ আছে। জ্যাঠামশাইকে সে বাঘ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। কমল সঙ্গে থাকলে বড় ভালো হতো। কমল ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। সারাটাক্ষণ সে কমলকে কাছে পেতে চায়।

কমলের জন্য সে চারদিকে তাকাতে থাকল। বারান্দা পার হয়ে গেল। বড় বড় হলঘর পার হয়ে গেল। পরিচিত অপরিচিত মানুষজনের ভিতর দিয়ে সে চলে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই ওকে কেবল অনুসরণ করছেন মাত্র। মাথার উপরে সেই ঝাড়লণ্ঠন। একটা চড়ুই পাখি ধুতরো ফুলের মতো কাচের জারে ফরফর করে উড়ছে। দশটা বাজতে দেরি নেই। বড়দা মেজদা যে কোথায় থাকে! ওরা বড়বাবুর মেজ ছেলের সঙ্গে কোথায় এখন বন্দুক দিয়ে বিলের জলে হাঁস মারতে গেছে। সে কমলকে আর যেন কোথাও খুঁজে পেল না। সে জ্যাঠামশাইকে টানতে টানতে দীঘির পাড়ে নিয়ে এল। জ্যাঠামশাইকে বলতে চাইল—আমরা এক নতুন জায়গায় চলে এসেছি। এখানে বড় নদী শীতলক্ষ্যা, চরে কাশবন, দীঘির পাড়ে চিতাবাঘ, হরিণ, ময়ূর, দূরে পিলখানার মাঠ, ঝাউগাছ, নদীর পাড়ে

পামগাছের বন এবং দূরে চলে গেলে বাবুদের অন্য অনেক শরিক এবং তাঁদের দুর্গাপূজা —জ্যাঠামশাই এই যে দ্যাখছেন, এটা ময়ূর। দ্যাখেন দ্যাখেন। সে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ময়ূরের খাঁচার পাশে বসে পড়বে ভাবতেই দেখতে পেল, দীঘির পাড় ধরে চন্দ্রনাথ হনহন করে ফিরছেন। সোনা সে তার বাবাকে দেখে জ্যাঠামশাইর পিছনে লুকিয়ে থাকল। চন্দ্রনাথ মহালের আদায় পত্রের জন্য বের হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে দু'দিন এদিকে আসতে পারেন নি। আজই সে নৌকায় মহাল থেকে ফিরে এসেছে। সোনা, জ্যাঠামশাইকে বাইরে নিয়ে এসেছে সব দেখাবে বলে। সোনা যেন কত অভিজ্ঞ প্রবীণ এবং জ্যাঠামশাই তার হাত ধরে হাঁটছেন এমন ভাব। দূরে পিলখানার মাঠ পার হলে আনন্দময়ীর কালীবাড়ি, বাজার-হাট এবং রাতে সেই অদ্ভুত শব্দ—ডায়নামো চলছে। তার ইচ্ছা ছিল সব দেখিয়ে যে ঘরটায় ডায়নামো আছে, সেদিকে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাবাকে দেখেই সে ভয় পেয়ে গেল।

মহাল থেকে ফিরেই চন্দ্রনাথ শুনেছেন, সোনা এবার পূজা দেখতে এসেছে। চন্দ্রনাথ নদীর পাড় ধরে হাঁটছিলেন। সোনার মুখ দেখার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়ে আছেন। দীঘির পাড়ে এসে দেখলেন, বড়দা মণীন্দ্রনাথ। ময়ূরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মণীন্দ্রনাথকে দেখে চন্দ্রনাথ প্রথমে খুবই হতবাক। এই পাগল মানুষ একা এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর তিনি এলেনই বা কার সঙ্গে! মেজদা বলে পাঠিয়েছেন কেবল সোনা এসেছে। সুতরাং মণীন্দ্রনাথকে দেখতে পাবে আশাই করেন নি। চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দাদার দিকে হেঁটে গেলেন। কাছে যেতেই দেখলেন পিছনে সোনা বড়দার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

—তুমি, সোনা, এখানে?

—জ্যাঠামশাইকে ময়ূর দেখাইতে নিয়া আইছি।

—লালটু পলটু কই?

—ওরা পাখি মারতে গ্যাছে।

পূজার ছুটিতে বাবুদের ছেলেরা শহর থেকে চলে আসে। ওরা বন্দুক নিয়ে পাখি শিকারের খেলায় মেতে ওঠে। চন্দ্রনাথ সোনাকে দেখেই কেমন আকুল হতে থাকলেন। সোনা তার মায়ের মুখ পেয়েছে, না বড়দার মুখ পেয়েছে বুঝতে পারছে না। এই সময় যেন সেই মা অর্থাৎ দূরের এক গ্রামে, বড় বড় চোখে ধনবৌ নিত্য দিন শ্রম করে চলেছে সংসারের জন্য। দূরবর্তী গ্রামে কোমল এবং সুন্দর এক জননীর মুখ ভেসে উঠলে চন্দ্রনাথ সোনাকে বুকে নিয়ে আদর করতে চাইলেন। বললেন, আয় তরে কোলে লই।

সোনা জ্যাঠামশাইকে আরও জোরে সাপ্টে ধরল। সে কোলে উঠতে চাইল না। কারণ সোনার কাছে এই পাগল মানুষ, চন্দ্রনাথের চেয়ে কাছের মানুষ। সে তার বাবাকে কদাচিৎ দেখতে পায়। বাবা সাধারণত তিন-চার মাস অন্তর বাড়ি যান। অধিকাংশ সময় রাতের বেলা। অধিক রাতে। সোনা টের পায় না। ভোর হলে সে দেখতে পায় বিছানাতে মা নেই।

বাবা তাকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। সোনা প্রথমে অবাক চোখে তাকায়, তারপর চোখ বড় করে দিলে সে বুঝতে পারে, তার বাবা প্রবাস থেকে ফিরেছেন, আখ, আনারস, যে দিনের যা তিনি নিয়ে এসেছেন। সোনা তখন চুপচাপ ভালো ছেলের মতো শুয়ে থাকলে, বাবা তাকে কত রকমের কথা বলেন, এবার উঠতে হয়, উঠে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে হয়। লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে—এমন সব একের পর এক পুণ্যশ্লোকের মতো কথা, কিছু সংস্কৃত উচ্চারণ, ধর্মাধর্মের কথা, সূর্যস্তব আরও কি যেন তিনি এই ছেলে অথবা এই যে সংসার, গাছ ফুল মাটি এবং গোপাটে অশ্বত্থ গাছ, তারপর দূরে দূরে সোনালী বালির নদী, নদীর চর, সব মিলে বুঝি তার বাবা তাকে জন্মভূমি সম্পর্কে, জননী সম্পর্কে, এবং গুরুজনদের সম্পর্কে আচার ব্যবহার শেখাতে গাছ পালা পাখিদের ভিতর টেনে নিয়ে যান—সোনার মনে হয় বাবার হাতে আলাদিনের প্রদীপ আছে, তার যা খুশি বাবা তাকে এনে দিতে পারেন। ফলে তার কাছে চন্দ্রনাথ সব সময়ই জাদুর দেশের মানুষ।

চন্দ্রনাথ কেবল সোনার সঙ্গে কথা বলছেন, মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলছেন না, এ-কারণে মণীন্দ্রনাথ বুঝি মনে মনে রেগে যাচ্ছেন। চন্দ্রনাথ বুঝতে পেরে বললেন, আপনের শরীর কেমন? বড়বৌদির শরীর? এসব বলা নিরর্থক। তবু কুশল প্রশ্ন না করলে, এত বড় মানুষটা যে এখনও আছেন, এই সংসারে আছেন, যেন না থাকলেই বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, মানুষটাকে শুধু সম্মান দেখানো—মানুষটা আছেন বলেই যেন সব আছে! চন্দ্রনাথ এবার সোনাকে বললেন, জ্যাঠামশাইকে ধইরা ভিতর বাড়ি লইয়া যাও। কোন্ দিকে আবার ছুটব তখন তুমি ধইরা রাখতে পারবা না। তারপর চন্দ্রনাথ হাঁটু গেড়ে পাগল মানুষের পায়ে মাথা ঠেকালেন।

সোনা জ্যাঠামশাইর হাত ধরে কাছারিবাড়ির দিকে হাঁটছিল। চন্দ্রনাথ যেতে যেতে বললেন, তুমি যে পূজা দ্যাখতে আইলা, তোমার মার কষ্ট হইব না?

সোনা বলল, মায় তো আমারে কইল আইতে।

চন্দ্রনাথ ছেলের মাথায় হাত রাখলেন, রাইতের ব্যালা কিন্তু কাইন্দ না।

সোনা চুপ করে থাকল। জ্যাঠামশাই ওর পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এখন বাড়ির ভিতরে যেতে চাইছেন না। অথচ চন্দ্রনাথের ইচ্ছা—এই গাছপালা রোদ্দুরের ভিতর সোনা না ঘুরে এখন কাছারিবাড়িতে চলে যাক। রোদ উঠেছে। এই রোদে ঘুরে বেড়ালে সোনা অসুস্থ হতে পারে! আর এই রোদে যার মুখ দেখলে কেবল ধনবৌর কথা মনে হয়, প্রবাসে তিনি কতদিন ধরে যে একা, এই পূজার সময়ে চলে যেতে পারলে বড় মনোরম, সোনার মুখ দেখে চন্দ্রনাথ বাড়ি যাবার জন্য ভিতরে ভিতরে আকুল হয়ে উঠেছেন। এখন বর্ষাকাল বলে আর যখন তখন বাড়ি যাওয়া হয়ে উঠছে না। গেলেই নৌকা করে যেতে হয়। শীতে অথবা হেমন্তে মহালে বার হচ্ছে এই নামে তিনদিনের কাজ একদিনে সেরে বাড়ি চলে যান, দু’রাত বাড়ি থেকে কাছারিবাড়ি ফিরে আসেন, মহালে

আদায়পত্রের নামে লুকিয়ে চুরিয়ে চলে যাওয়া। কোনও ছুটিছাটার বালাই নেই, বাবুদের মর্জি, যাও, দু'দিন ছুটি! আবার হয়তো ছ'মাসে কোনও সময়ই করে উঠতে পারেন না চন্দ্রনাথ। ভূপেন্দ্রনাথ ছোটভাইর মুখ দেখে ধরতে পারেন সব, তিনি বাবুদের বলে-কয়ে ছুটি করে দেন। এ ছাড়া মহালের নাম করে চন্দ্রনাথ যখন বাড়ি চলে আসেন তখন প্রায়ই খুব রাত হয়ে যায়, নিশুতি রাত! বেলায় বেলায় মহালের কাজ সেরে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকেন। দশ ক্রোশ পথ হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন চন্দ্রনাথ। নিশুতি রাতে কড়া নাড়লে ধনবৌ টের পায় মানুষটা আর থাকতে পারছে না, চলে এসেছে। ধনবৌ নিজেও কত রাত না ঘুমিয়ে থেকেছে, কারণ ধনবৌ বলতে পারে না চন্দ্রনাথ কবে আসবে। দরজায় কড়া নাড়লেই বুকটা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে! খুব চুপি চুপি যেন সোনা টের না পায়, টের পেলেই উঠে বসবে, ঘুমাবে না, সারা রাত বাবা ওর জন্য কি এনেছে এবং লালটু ওর তক্তপোশ থেকে উঠে এসে বাবার সঙ্গে শুতে চাইবে। ফলে ধনবৌ প্রায় লুকিয়ে দরজা খুলে দেয়। আহা, চন্দ্রনাথ দীঘির পাড় ধরে হাঁটার সময় ভাবলেন, ধনবৌ নিশ্চয়ই রাতে ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। দূরের অন্ধকারে লগির শব্দ শুনলেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষটা বুঝি নৌকা করে নদীর চরে উঠে আসছে। ধনবৌ নিজেও বুঝি আর অপেক্ষা করতে পারছে না। রাতে জানালায় মুখ রেখে জেগে বসে থাকছে। দরজার কড়া বুঝি এক্ষুনি নড়ে উঠবে, চুপি চুপি দরজা খুলেই দেখতে পাবে তার স্বামী চন্দ্রনাথ, শক্তসমর্থ মানুষ, মোটা গোঁফ এবং ভাটা ভাটা চোখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। স্বামী তার পালিয়ে সহবাস করতে চলে এসেছে। ধনবৌ হাত-পা ধোবার জল এবং গামছা হাতে দিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, চন্দ্রনাথ কী খাবেন। চন্দ্রনাথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কিছু বলেন না। শুধু লণ্ঠনের আলো মুখের কাছে নিয়ে যান। ধনবৌর মুখ দেখতে দেখতে কী যেন তিনি বলতে চান। বলতে পারেন না। ধনবৌ তখন সব বুঝতে পেরে মিষ্টি মিষ্টি হাসে!

কি সব ভাবছেন তিনি! চন্দ্রনাথ এবার মণীন্দ্রনাথকে বললেন, সময় মত স্নান করবেন। সময় মত খাইবেন। ছুটাছুটি করলে বাবুবা কিন্তু রাগ করব।

মণীন্দ্রনাথ আর দাঁড়ালেন না। সোনার হাত ছেড়ে হাঁটতে লাগলেন। সোনা বলল, বাবা, যাই? বলে সে আর বাবার আদেশের অপেক্ষা করল না। সে জ্যাঠামশাইকে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল।

সোনা যেতে যেতে বলল, জ্যাঠামশয়, আমি কিন্তু আপনের লগে সান করমু, আপনের লগে খামু। সোনা আরও বলতে চাইল, এই যে দেখছেন, দীঘি পার হলে বাঘ আছে, বাঘের বাচ্চা আছে। সেই চিড়িয়াখানাতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা এখন সোনার। সে টানতে টানতে বাঘের খাঁচার সামনে নিয়ে দাঁড় করাল। চিতাবাঘের দুটো বাচ্চা, চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। কান খাড়া করে যেন বাঘদুটো সোনা এবং মণীন্দ্রনাথকে দেখতে থাকল। ডানদিকে হেঁটে গেলে ছোট্ট এক জলাশয়, পাড়ে পাড়ে লোহার রেলিঙ, জলাশয়ে কুমীর। শীতলক্ষ্যার জলে কুমীরের ছা ভেসে এসেছিল। গোলা করে মাছের জন্য ডালপালা এবং

জলের ভিতর পচা এক শ্যাওলাভূমি তৈয়ার করে রাখলে এই কুমীর মাছ খেতে ঢুকে আটকা পড়ে গেল গোলাতে। সেই থেকে ছোট্ট কুমীরের জন্য এই জলাশয়। লালটু পলটু বাঘ, হরিণ, ময়ূরের গল্প করেছে, কিন্তু কুমীরের গল্প করেনি। কাল এসেই ওরা কুমীর দেখে এসেছে। সোনা তখন অমলা কমলার সঙ্গে ছাদে উঠে নক্ষত্র দেখছিল—রাতে শুতে গেলে কাছারিবাড়িতে এই গল্প। চিড়িয়াখানাতে এবার একটা কুমীর এসেছে। সে জ্যাঠামশাইকে, যেন জ্যাঠামশাই এক নাবালক, সোনা বড় মানুষ, সে যাচ্ছে আর কথা বলছে, বাঘে কি খায়, ময়ূরে কখন পেখম ধরে, হরিণেরা কি খেতে ভালোবাসে, বাবুদের এইসব হরিণ কোথেকে ধরে এনেছে—বিজ্ঞের মতো যা সে এতদিন শুনেছে—এক এক করে বলে যাচ্ছিল।

বাঘের খাঁচার পাশে মণীন্দ্রনাথ সহসা দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং গরাদ ধরে নাড়তে থাকলেন। সোনা তাড়াতাড়ি ভয় দেখাল মণীন্দ্রনাথকে, জ্যাঠামশয়, বাঘে কিন্তু মানুষ খায়। দুষ্টামি করলে কিন্তু বাঘে লাফ দিব। মণীন্দ্রনাথ সোনার কথা শুনে হা-হা করে হাসতে থাকলেন। তারপর ছাদের দিকে তাকিয়ে সহসা চুপ মেরে গেলেন। সোনা এতদূর থেকেও চিনতে পারল, ছাদে উঠে অমলা রোদে চুল শুকাচ্ছে।

মণীন্দ্রনাথ এবার সোনাকে কাঁধে তুলে নিতে চাইলেন! সোনা জ্যাঠামশাইর কাঁধে উঠল না। বলল, আসেন দ্যাখি কে আগে যায়। বলে সোনা ছুটতে থাকলে দেখল পাগল মানুষ ছুটছেন না। ছাদের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। অমলার চুল সোনালী রঙের। চোখ নীল। অমলাকে দেখে জ্যাঠামশাই কেমন স্থির হয়ে গেলেন! আর আশ্চর্য এই মানুষ যথার্থই সেই থেকে ভালো হয়ে গেলেন যেন। সোনাকে তেল মাখিয়ে দিলেন গায়ে, স্নান করিয়ে দিলেন। একসঙ্গে খেতে বসলেন। সোনার মাছ বেছে দিলেন, এবং বিকেলে হাত ধরে নদীর পাড়ে বেড়াতে গেলেন।

আর তখনই সোনা দেখল একটা ল্যাণ্ডো গাড়ি আসছে। দুই সাদা ঘোড়া। অমলা কমলা হাওয়া খেতে বের হয়েছে। ওরা সোনাকে দেখে বলল, যাবে সোনা?

—জ্যাঠামশাইরে নিলে যামু।

ওরা গাড়ি থামাতে বলল। জ্যাঠামশাইকে তুলে নিল সোনা। অমলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর জ্যাঠামশাইর দিকে চেয়ে বলল, আমার বড় জ্যাঠামশয়। কলিকাতায় চাকরি করত।

ওরা সাদা সিল্কের ফ্রক গায়ে দিয়েছে, পায়ে সাদা মোজা, কেডস্। মণীন্দ্রনাথের সিল্কের পাঞ্জাবি আর পাট করা ধুতি, সাদা জুতো। সোনার সোনালী রঙের সিল্ক, সাদা হাফ প্যান্ট! পায়ে রবারের জুতো। দুই সাদা ঘোড়া নদীর পাড় ধরে ওদের এখন হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে। সোনা ঘাটে দেখল, নৌকায় ঈশম বসে মাছ ধরছে। সে চিৎকার করে উঠল, ঈশমদাদা যাইবেন? হাওয়া খাইতে যাইবেন?

সোনার কাছে ছোট বড় ভেদ থাকল না। যেন এই গাড়িতে উঠে ইচ্ছা করলে সকলেই হাওয়া খেতে যেতে পারে। সে তার জ্যাঠামশাইর দিকে তাকিয়ে বলল, যাইবেন পিলখানার মাঠে? হাতি দ্যাখামু আপনেরে। কমলা তুমি যাবে?

অমলা বলল, আমিও যাব। কমল, তুই, আমি, সোনা। সে এখন পাগল মানুষটাকে দেখল, দেখতে দেখতে বলল, আপনি যাবেন? কিন্তু কোনও কথা বলল না বলে জোরে অমলা বলল, আপনি যাবেন হাতি দেখতে? আমরা কাল ল্যাণ্ডোতে হাতি দেখতে যাব। নদীর চরে নেমে যাব। যাবেন?

এত করেও অমলা মণীন্দ্রনাথকে কথা বলাতে পারল না। এমন কি তিনি আজ গ্যাৎচোরেৎশালাও বললেন না। কেবল মাঠ, নদী এবং কাশফুল দেখতে দেখতে ফিরে ফিরে অমলাকে দেখলেন। অমলা উল্টেওর মায়ের চেহারা পেয়েছে। মণীন্দ্রনাথ অমলার দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো অভিমান করে বসে আছেন যেন।

আশ্বিনের সূর্য নদীর ওপারে নেমে যাচ্ছে। গাড়িটা এগুচ্ছে! ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঠক ঠক। বেশ তালে তালে, ঘোড়াদুটো যাচ্ছে, সোনা যেন কোথায় কবে একবার এমন দুটো সাদা ঘোড়াকে গাড়ি টেনে নিতে দেখেছে। খুব বরফ পড়েছে, গাছে গাছে পাতা ঝরে গেছে, চারদিকে বরফের পাহাড়। মাঝে সিঁথির মতো পথ। কে যেন এমন করে তাকে কোথাকার রাজা-রানীর গল্প করেছিল। সোনা এবং মণীন্দ্রনাথ একদিকে, অমলা কমলা একদিকে। নানারকমের পাখি নদী পার হয়ে যাচ্ছে। ওপারের মানুষ প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই হয়। জল নদীর নিচে নেমে যাচ্ছে ক্রমে। লাল ইটের বাড়ি ওপারে প্রায় ছবির মতো মনে হচ্ছিল সোনার। সে কত রকমের কথা বলতে চাইছে। তার মনে হল, সেই আলো জ্বালার মানুষটা, আর কিছুক্ষণ পরই, যেই না সূর্য অস্ত যাবে, মানুষটা লম্বা পোশাক পরে আলো জ্বালবে। মানুষটাকে সোনার বড় ভালো লাগে, মেজ জ্যাঠামশাইকে মানুষটা যমের মতো ভয় পায়। কেবল দেখা হলেই আদাব দেয়। ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর পিঠের ছেঁড়া জামার ভিতর থেকে শীর্ণ শরীরটা কত রুগ্‌ণ ধরা যায়। মানুষটা সন্ধ্যা হলেই সেই কলটা চালিয়ে দেয়। ভটভট শব্দ হতে আরম্ভ করলেই ম্যাজিকের মতো সারা বাড়িতে লাল নীল আলো জ্বলতে থাকে।

লোকটা সোনাকে বলেছে, সে আজ আলো জ্বালার সময় সেই ম্যাজিক কলটা তাকে দেখাবে! ওর নাম ইব্রাহিম। সোনাকে সকালে উঠেই একবার আদাব দিয়েছে। সোনা দেখেছে বাড়ির নিয়মকানুন আলাদা। সকাল হলেই ফরাসের যত চাকর তারা সোনাকে আদাব দিয়েছে। তোষাখানার চাকরেরা আদাব দিয়েছে। এ বড় আশ্চর্য সংসার। জ্যাঠামশাইকে দেখে মানুষগুলি দূর থেকে আদাব দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। ইব্রাহিম নুয়ে গেছে কতকটা। আদাবের সময় আর তাকে নুইতে হয় না। যাত্রা গানে সোনা একবার আওরঙজেবের পালা দেখেছিল। সোনার কাছে প্রায় সেই বাদশার শামিল। সাদা দাড়ি নাভি পর্যন্ত নেমে গেছে। লোকটার হাতে এত বড় বাড়ি, এবং তার অন্ধকার, লোকটাকেও

সোনার মনে হয় মহাভারতের দেশের মানুষ! অমিত তেজ এই মানুষের। হাতে তার জাদুর কাঠি, যন্ত্রে ছোঁয়ালেই ফুসমন্তরে কথা বলে ওঠে। আলো জ্বলে ওঠে। ও মাঝে মাঝে চিৎকার করে। বলে দিলাম ফুস মন্তর কথা কবে যন্তর।

সে গাড়িতে বসে দেখল বেলা পড়ে আসছে। ফিরতে দেরি হলে ইব্রাহিম তার জন্য অপেক্ষা না করে যদি সেই জাদুর ঘরে গিয়ে বসে থাকে! সোনা কমলকে দ্রুত গাড়ি চালাবার কথা বলল।

কমল বলল, গাড়ি তো চলছেই।

—আমরা ফিরে যাব কমল। সোনা যতটা পারছে কমলের মতো কথা বলতে চাইছে। খুব বেশি কঠিন না বলা। একটু বইয়ের ভাষায় কথা বলতে হয় এই যা। তবু উচ্চারণ ঠিক থাকে না বলে, অমলা কমলা ঠোঁট টিপে হাসে। সে ভাবল এবার থেকে বড় জেঠিমার কথাগুলি মনে রাখার চেষ্টা করবে।

সোনা বলতে পারত, ফিরে না গেলে আলো জ্বলবে না। কারণ ইব্রাহিম বলেছে আমি গেলেই সে আলো জ্বালাবে।

কমল বলল, তোকে আমরা ছাদে নিয়ে যাব। সেখান থেকে ভালো দেখতে পাবি।

অমলা বলল, আমরা ছাদে আজকে লুকোচুরি খেলব। তুই আসবি সোনা?

অমলা সোনাকে দেখছিল। অমলা সোনার চোখ মুখ দেখে, কি সুন্দর চোখ, এবং কি মিষ্টি করে কথা বলে, আর এই বালক যেন সেই মায়ের মুখে বাইবেল বর্ণিত বালক, সাদা পোশাকে সোনাকে প্রায় মাঝে মাঝে তেমনই দেখাচ্ছে। সোনা এতটুকু আনন্দ পেলেই উৎসাহে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে ঘোড়ার ছুটে যাওয়া দেখছে। ওরা গাড়ি থামিয়ে নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল। এদিকটা গঞ্জের মতো জায়গা। সারি সারি লোক যাচ্ছে। অমলা কমলাকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে যাচ্ছে।

তারপরে ক্রমে গাড়িটা এসে এক মাঠে পড়ল। মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে এতক্ষণ নদীর দু'তীর দেখছিলেন, এখন মাঠ দেখছেন। আর ফিরে ফিরে অমলাকে দেখছেন। যেন তার পলিন, শৈশবের পলিন—কি যে চেহারা তার! ধীর স্থির মণীন্দ্রনাথ অমলাকে আদর করার জন্যে মাথায় হাত রাখলে অমলা ভয় পেতে থাকল। সোনা বলল, ভয় নাই অমলা। আমার জ্যাঠামশয় কাউকে কিছু বলে না। অনিষ্ট করে না। আর আশ্চর্য, এমন বলতেই মানুষটা ঠিকঠাক হয়ে বসলেন। ওরা সবাই যেন তীর্থযাত্রায় বের হয়েছে এমন মুখ মণীন্দ্রনাথের। অমলা গল্প করতে থাকল কবে সেই শিশু বয়সে ল্যান্ডোতে তারা এই মাঠে এসে পড়তেই ভীষণ কুয়াশা নেমে এসেছিল। ইব্রাহিম তখন ল্যাণ্ডো চালাত। দুই ঘোড়াকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে অমলা কমলা ছুটাছুটি করছিল মাঠে! কিন্তু সহসা কুয়াশা নামলে ইব্রাহিম ঘোড়া দুটোকে খুঁজে পেল না। শীতের দিন

ছিল। ইব্রাহিম দুই কাঁধে দুই মেয়ে নিয়ে ফেরার সময় দেখেছিল, এক বৃদ্ধ রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধের হাতে লাঠি। মেজবাবুর ফ্লুট শুনবে বলে দেশ থেকে বের হয়েছে। অমলার বাবা সুন্দর ক্ল্যারিওনেট বাজান। তিনি দেশে এসেছেন, তিনি রাতে ফ্লুট বাজাবেন। কিন্তু কুয়াশায় সেই মানুষ রাস্তা হারিয়ে ফেললে ইব্রাহিম হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল। আর আশ্চর্য, সেই মানুষ এক বড় ক্লারিওনেট বাজিয়ে। সে তার চেয়ে বড় ওস্তাদ মেজবাবু জেনে এখানে চলে এসেছিল। কিন্তু পরে জানা যায়, মেজবাবু তার নিচের ঘরে সেই মানুষকে আটকে রেখেছিলেন। এবং ওস্তাদ স্বীকার করে সব সুর তান লয়—যা কিছু ফ্লুটের রহস্য জেনে নিয়েছিলেন। সেই ওস্তাদ মানুষ এত ভাল ফ্লুট বাজায় যে, সে বাজাতে আরম্ভ করলে অকালে কাশের বনে ফুল ফুটতে থাকে, পাখি উড়তে থাকে মাথার উপর। মানুষটা সব কিছু উজাড় করে দিল মেজবাবুকে। নিজের বলতে কিছু আর রাখল না। এসেছিল কিছু নিতে, কিন্তু এসে দেখল, বড় কাঁচা হাত মেজবাবুর। এত বড় বাড়ির সম্মানিত ব্যক্তি তার কাছে হেরে যাবে, ভাবতেই সে কষ্ট পেয়েছিল বড়। নিচের ঘরে সারা রাত দিন তখন মেজবাবু মানুষটার কাছে পড়ে থাকতেন। তালিম নিতেন। নাওয়া-খাওয়ার সময় ছিল না। আর কি বিস্ময়ের ব্যাপার, সেই মানুষ সব দিয়ে থুয়ে নদীর জলে নেমে গিয়েছিল। মানুষটার আর কোনও সম্বল ছিল না। সে দুঃখী মানুষ ছিল, সে হাটে বাজারে গঞ্জে ফ্লুট বাজাত, বড়বাবুর মেজছেলে তাও নিয়ে নিল। তার আর অহঙ্কারের কিছু ছিল না। যেন সে তার স্বর হারিয়ে ফেলেছে, সুর হারিয়ে ফেলেছে। সে একা একা নদীর পাড় ধরে চলে যেতে চাইলে মেজবাবু বললেন, বুড়ো বয়সে আর কোথায় যাবে? থেকে যাও। কে আর তোমার ফ্লুট শুনবে। তুমি তো বলেছ, যা তুমি আমায় দিয়েছ, হাটে বাজারে আর তুমি তা বাজাবে না। তুমি পয়সা পাবে কোথায় তবে? খাবে কি?

খালেক মিঞা প্রথম জবাব দিতে পারেনি। পরে বলেছে, যে আজ্ঞে হুজুর। হুজুরের ল্যাণ্ডোতে সে সেই যে এসে বসল আর নড়ল না। চোখে দেখেনা ভালো, তবে গাড়িতে চড়ে বসলে খালেক মিঞা একাই একশ। খালেক এখন বাতাসের আগে ল্যাণ্ডো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কাশফুলের মাথায় ক্রমে জ্যোৎস্না উঠবে এবার। নদীতে যেসব নৌকা আছে তার লণ্ঠন এবার এক দুই করে জ্বলবে। নদীর পাড়ে এসেই ল্যাণ্ডোটা বাঁক নিল। সূর্যাস্ত হচ্ছে বলে এখন একটা লাল রঙের আভা নদীর দু'পাড়ে গ্রামে মাঠে। ল্যাণ্ডোর মানুষগুলোর মুখে পর্যন্ত সেই লাল রঙ। সূর্যাস্ত হলেই অন্ধকার, তারপর মাথার উপর নীল আকাশ। শরতের আকাশে জ্যোৎস্না উঠলে বুঝি ঝাউ গাছটার নিচে ল্যাণ্ডোটা এসে দাঁড়াবে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ তখন ল্যাণ্ডো থেকে নেমে যাবেন।

ঝাউ গাছটার নিচে পৌঁছাতে ওদের অন্ধকার হয়ে গেল। ঘোড়াগুলি এখন কদম দিচ্ছে। এখন আর দ্রুত ছুটছে না ঘোড়া। কারণ ওরা প্রাসাদের কাছে কালীবাড়ির মাঠটায় এসে গেছে।

মণীন্দ্রনাথ নেমে গেলে অমলা বলল, তোর মনে থাকবে তো সোনা!

সোনা ঘাড় কাত করে মনে থাকবে এমন সম্মতি জানাল। ছাদের ওপর যখন জ্যোৎস্না উঠবে, সে কমলা অমলার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে। ঢাকের বাদ্য বাজবে, ঢোলের বাদ্য বাজবে, আর ওরা লুকোচুরি খেলবে, ছাদে অথবা রান্নাবাড়ি পার হলে অন্দরের যে সব দাসী বাঁদীদের ঘর আছে তার আশেপাশে। কিন্তু কালীবাড়ির মাঠে আসতেই সোনার কি মনে পড়ে গেল। সে বলল, আমি নামব অমলা।

এখানে নামবি কেন? অমলাকে অধীর দেখাল।

সোনা বলতে পারত, সেই যে জাদুর মেশিনটা আছে যা ঘোরালেই তারে তারে বিদ্যুৎ খেলে যায়, আলো জ্বলে ওঠে, ঘরে নীল লাল রঙের আলো জ্বালা হয়, এবং পূজার দিন বলে ছোট ছোট গাছে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুনি ফুলের মতো আলোর মালা খেলা করতে থাকে—তার এখন সেই জাদুর মেশিনটার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো চাই। ইব্রাহিম বলেছে সে সেই মেশিনটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, হাতে তার জাদুর কাঠি ছোঁয়ালেই শব্দ হয় নানারকমের—কি বিচিত্র শব্দ যেন, নদীর জলে বৈঠা পড়ছে অথবা কাঠে বাড়ি মারছে খটখট—না শব্দটা ঠিক এমন নয়, শব্দটা ভটভট এই এক ধরনের শব্দ, আর ইব্রাহিম বড় বড় চোখে তার লম্বা জোব্বার ভিতর থেকে কত রকমারি জাদুর কাঠি বের করে দেখাবে বলেছে। সোনা সেই আশায় লাফিয়ে নেমে পড়ল ল্যাণ্ডো থেকে।

কোথায় ইব্রাহিম এখন! সে চারদিকে খুঁজতে থাকল। জাদুর মেশিনটা যে ঘরে থাকে, সে সেখানে গেল হাঁটতে হাঁটতে। ল্যাণ্ডোটা এখন সদরে ঢুকে যাচ্ছে। কোথাও যেন সে ঘোড়ার ডাক শুনতে পেল। এবং কিছু বালক-বালিকা—ওরাও এসেছে দেখবে বলে, কারণ পূজার ক'টা দিন এই প্রাসাদ যেন গ্রামের ছেলে-বুড়োদের কাছে আশ্চর্য এক মায়াপুরী, এই পূজার ক'টা দিন প্রাসাদের দালান-কোঠা, নীল রঙের মাঠ, হ্রদের মতো বড়ো দীঘি এবং বিচিত্র বর্ণের ফুলের গাছ সব মিলে এক মায়াকানন। দূর থেকে মানুষরা হেঁটে হেঁটে চলে আসে। সোনা যেতে যেতে সেইসব মানুষদের দেখতে পেল নদীর পাড়ে বসে আছে। অথচ ডানদিকে সেই গোল ঘরটা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। আশ্চর্য, ইব্রাহিমকে সে দেখতে পাচ্ছে না। ইব্রাহিম বলেছে, তাকে আলো জ্বালানো দেখাবে। এই আলো জ্বালানো সোনার কাছে প্রায় এক অলৌকিক ঘটনার মতো। সে আর দেরি করতে পারল না। সে ছুটে গিয়ে জালে মুখ রাখতেই দেখল, ইব্রাহিম যন্ত্রটার ওপর ঝুঁকে কি করছে!

সে ডাকল, ইব্রাহিম।

ইব্রাহিম কোনও উত্তর করল না। সূর্য অস্ত গেছে বলে এবং সন্ধ্যা নামছে বলে ঘরের ভিতরটা সামান্য অন্ধকার। ইব্রাহিমের মুখ অস্পষ্ট। ওর মুখে ঘাম। সে যেন যন্ত্রটাকে বশ মানাতে পারছে না। গোয়ার্তুমি করছে সেই জাদুর মেশিনটা। যত গোয়ার্তুমি করছে তত

সে টেনে টেনে কি সব খুলে ফেলছে, চারপাশে ঘুরে ঘুরে টেনে টেনে কি পরীক্ষা করছে, আর সে পাগলের মতো চোখ মুখ করে রেখেছে অথবা উদ্‌বিগ্ন চোখমুখ, এত যে বালক-বালিকা চারপাশে, সবাই ওর কৌশল দেখতে এসেছে, ইব্রাহিম মিস্ত্রী, নামডাক এত যে এই মানুষ প্রায় মরা হাতি লাখ টাকার মতো, সেই মানুষ এখন বিনা নোটিশে এমন ঘাবড়ে গেছে যে সোনা পর্যন্ত আর ডাকতে পারল না, ইব্রাহিম, তুমি আমায় আসতে বলেছিলে। কি করে এমন একটা জগৎকে নিমেষে জাদুর দেশের শামিল করে দাও দেখাবে বলেছিলে, এখন তুমি কিছু করছ না। তোমাকে ডাকলে সাড়া দিচ্ছ না।

সোনার এবার ভয় ভয় করতে থাকল। সে একা যাবে কি করে। ইব্রাহিম বলেছিল, আলো জ্বালা হলে, সে তাকে কাছারিবাড়ি পৌঁছে দেবে। এখন সেই ইব্রাহিম একেবারে মোল্লা মৌলবী হয়ে গেল। অথবা ফকির দরবেশ। কোনও কথা বলছে না। সে যে বিড়বিড় করে কোরানশরিফ পাঠ করছে। সোনা কিছুতেই বলতে পারল না, অ ইব্রাহিম, আমারে তুমি তবে আইতে কইছিলা ক্যান। এখন আমি যামু কি কইরা।

যদি সেই হেমন্তের হাতিটা ফিরে আসত এখন। ওরা গেছে ল্যাণ্ডোতে আর বড়দা মেজদা গেছে বাবুদের সঙ্গে। হাতিতে চড়ে ওরা হাওয়া খেতে গেছে। হাতিটার গলায় ঘণ্টা বাজলেই সে টের পেত হাতিটা ফিরছে। না কোথাও কেউ ফিরছে না। শুধু অপরিচিত বালক-বালিকা এবং মানুষজন যাদের সে চেনে না, যারা প্রতিমা দেখতে আসে একমেটে, দু'মেটে হলে, তারাই আবার এই আলো জ্বালা দেখতে এসেছে। বাবুরা থাকেন শহরে। পূজায় এলে এই বাড়ির কলের একটা মেশিন ঘুরতে থাকে। তখন এই বাড়িঘর নিয়ে প্রাসাদের আলো নিয়ে এবং রকমারি সব পাথরের মূর্তি নিয়ে এই গ্রামটা শীতলক্ষ্যার জলে শহর বনে যায়। সোনাও এসেছে এই শহরে। সে যা কিছু দেখছে তাতেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারটা ক্রমে ভারি হচ্ছে। গাছপালা ঘন বলে আকাশে যে সামান্য জ্যোৎস্না, তা এই ঘরে অথবা ঘাসের বুকে গাছের ডাল পালা এবং পাতা ভেদ করে নামতে পারছে না। সবাই বলছে, কি হইল ইব্রাহিম, তোমার পাগলি কথা কয় না ক্যান!

—কইব কইব। না কইয়া যাইব কই!

সোনা বলল, ইব্রাহিম, তুমি আইতে কইছিলা।

ইব্রাহিম যেন এতক্ষণে টের পেয়েছে সোনাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। সে বলল, কর্তা, পাগলির যে কি হইল!

—কি হইছে?

—কথা কইছে না।

আর তখনই সোনা দেখল, মেজ জ্যাঠামশাই এদিকে ছুটে আসছেন। সঙ্গে অন্দরের চাকর নকুল। চোখে মুখে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার ছাপ। এখানে যে সোনা একা এবং অপরিচিত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তিনি তা পর্যন্ত লক্ষ করছেন না। তিনি নিজে এবার ভিতরে ঢুকে টর্চ মেরে কি দেখলেন। ইব্রাহিমকে সরে যেতে বললেন, তারপর কি দেখে বললেন, এটা এখানে কেন!

সোনার মনে হল ডাক দেয়, আমি জ্যাঠামশয় এখানে!

কিন্তু সোনা মেজ জ্যাঠামশাইকে মস্ত বড় মানুষ ভাবতেই সে ডাকতে সাহস পেল না। যেমন তিনি এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। সোনা কেমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এখন আর অন্ধকার নেই। এত বড় আকাশ মাথার ওপর আর ছোট্ট এক ফালি চাঁদ এবং হাজার নক্ষত্রকে ব্যঙ্গ করছে এই মায়াকানন, প্রাসাদ। চারপাশে আলোর মালা। চার পাশে বড় বড় ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছ, তার বিচিত্র বর্ণের পাতা এবং ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের শব্দে সোনাকে কেমন মুহ্যমান করে দিল। সে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। তার ভয়ডর কিছু থাকল না। এত আলো চারপাশে, এত গাছগাছালির ভিতর অজস্র আলো, দূরে কারা এখন ছুটোছুটি করছে এবং পূজার বাজনা বাজছে নিয়ত—সোনার ভয়ডর একেবারে উবে গেল। ওর মনে একটা অতীব স্বপ্নের দেশ, দেশটার নাম কেবল সে এক মেয়ের মুখের সঙ্গে তুলনা করে মিল খুঁজে পায়—সে মেয়ে অমলা। তার অমলা পিসি। অমলা তাকে আজ ছাদে যেতে বলেছে। তুই সোনা ছাদে আসবি, আসবি কিন্তু। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করব। সোনা ল্যাণ্ডোর সেই সুন্দর মুখ মনে করতে পারল। এবং কলকাতার মেয়ে অমলা। কলকাতা খুব বড় শহর, ট্রামগাড়ি, হাওড়ার পুল কি সব অত্যাশ্চর্য সামগ্রী নিয়ে বসবাস করছে কলকাতা। অমলা সেখানে থাকে, সেখানে বড় হয়েছে। আশ্চর্য রকমের নীল চোখ। এবং আলোর মতো মুখে নিয়ত কথার ফুলঝুরি—সোনা এই আলোর রাজ্যে হাঁটতে হাঁটতে কেমন সরল এক মায়ার টানে ছুটতে থাকল।

সোনা দীঘির পাড়ে পাড়ে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে সোনা কাছারিবাড়ি ঢুকে গেল। কত লোকজন! কত আমলা কামলা চারপাশে! সে সব ফেলে ছুটছে। এত জোরে ছুটতে দেখলে জ্যাঠামশাই বকবে, সে চারদিকে একবার দেখে নিল। না, মেজ জ্যাঠামশাই কাছে কোথাও নেই। পূজামণ্ডপে নানা রকমের প্রদীপ জ্বালানো হচ্ছে। দেবীর মূর্তিতে গর্জন লাগানো হয়েছে। এবং ঝিলমিল রঙের সব গর্জন এখন চাকচিক্যময় হয়ে গেছে। সোনা এই প্রতিমার সামনে ধরা পড়ে যাবে, তুমি এক আশ্চর্য মায়ার টানে ছুটে যাচ্ছ সোনা—আমি সব টের পাচ্ছি। সোনা সেজন্য মণ্ডপে দেবীর মুখের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে ডানদিকের বারান্দায় উঠতে সোনা দেখল একটা ইজিচেয়ারে বড় জ্যাঠামশাই শুয়ে আছেন। মুখ বুজে পড়ে আছেন। গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে দামী জুতো, পুজোর সময়ে এই পোশাক মেজ জ্যাঠামশাইর—যা কিছু ভাল পোশাক পাগল জ্যাঠামশাইকে পরতে দিয়েছেন, অথবা নিজে হাতে পরিয়ে দিয়ে এখানে বসিয়ে রেখেছেন। পায়ের নিচে রামসুন্দর, একটু দূরে বসে তামাক কাটছে। রাশি রাশি তামাক কাটা হচ্ছে। রাশি রাশি

রাব ঢেলে এক সুগন্ধ তামাকের সৃষ্টি এবং পাশে পাগল জ্যাঠামশাই—সোনা আজ এখানে এসেও মুহূর্ত দেরি করল না। তার হাতে সময় নেই। ওর দেরি হয়ে গেছে। সেই কখন থেকে ছাদের ওপর অমলা ওর জন্য অপেক্ষা করছে। অমলা, অমলা-পিসি! কলকাতার অমলা। কত বড় শহর কলকাতা। মেমরিয়েল হল, রূপালী রঙের বেড়া এবং দু'পাশে সব সুরম্য অট্টালিকা। সুদূর সেই কলকাতার মতো অমলার শরীরে এক দূরের রহস্য নিমজ্জিত। সোনার বয়স আর কত! তবু এই টান সোনাকে কেমন পাগলের মতো ছুটিয়ে মারছে। সে পাগল জ্যাঠামশাইর কাছ থেকে পালাবার জন্য ডান দিকের বারান্দায় উঠে এল না। সে বড় থামের পাশে নিজেকে প্রথম লুকিয়ে ফেলল। তারপর আবার ছুটে ওপরের সিঁড়ি ভাঙতে থাকল।

সিঁড়ি ভাঙার সময়ই সে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল। দীঘির ওপারে মঠ। মঠে কেউ এখন বড় ঘণ্টায় শেকল টেনে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সকালে সোনা ভেবেছিল সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না উঠলে সে এবং পাগল জ্যাঠামশাই সেই মঠে চলে যাবে। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে সিঁড়িতে বসিয়ে রাখবে। যেখানে পাথরের বৃষ রয়েছে তার ডান দিকে সে দাঁড়াবে। শ্বেতপাথরের বাঁধানো মেঝে। মেঝের ওপর দাঁড়ালে সে শেকলটা হাতে নাগাল পায়। সে এক দুই করে ঘণ্টা বাজাবে আর জ্যাঠামশাই সেই ঘণ্টাধ্বনি এক-দুই করে গুনবেন। নিচে এসে বলবে—কত বার? জ্যাঠামশাই বলবেন, দশ বার। একমাত্র সে-ই যেন এভাবে ক্রমে মানুষটাকে নানা কাজের ভিতর অথবা জ্যাঠামশাই যা ভালোবাসেন, তার ভিতর নিয়ে যেতে যেতে এক সময় নিরাময় করে তুলবে। কিন্তু এই ঘণ্টাধ্বনি শুনে সোনা কেমন থমকে গেল। যেন পাগল জ্যাঠামশাই বলছেন, সোনা যাবি না, মঠের সিঁড়িতে ঘণ্টা বাজাবি না? আমি এক দুই করে গুনব। গুনতে গুনতে একশ ঠিক ক্রমান্বয়ে বলে যাব। সব ঠিক-ঠিক ক্রমান্বয়ে বলে গেলে দেখবি সোনা আমি একদিন ভাল হয়ে যাব।

সিঁড়িতেই সে থমকে দাঁড়াল। সে ওপরে যাবে, না নিচে নেমে পাগল জ্যাঠামশাইকে নিয়ে মঠের সিঁড়িতে গিয়ে বসে থাকবে। এমন একটা দোমনা ভাব ভিতরে তার কাজ করছে। বরং ওর এখন ঐ মঠেই চলে যেতে বেশি ইচ্ছে হচ্ছে। সে এত উঁচু মঠ কোথাও দেখেনি। হাজার হবে টিয়াপাখি, নীল রঙের। পাখিরা সব মঠের ভিতর বাসা বানিয়ে নিয়েছে। জ্যোৎস্না রাত হলে পাখিরা চক্রাকারে মঠের চারপাশে ওড়ে। মঠটার কথা মনে হলেই এমন সব পাখিদের কথা মনে হয়। পাখিদের কথা মনে হলেই ওর গুলতিটার কথা মনে হয়। মেলা থেকে রঞ্জিতমামা তাকে একটা গুলতি কিনে দিয়েছিল। সে সেই গুলতি দিয়ে কাক, শালিক, টিয়াপাখি এবং কাঠবিড়ালি যা পেত সামনে, মারার চেষ্টা করত। কিন্তু সে এদের সঙ্গে পারত না। জামরুল গাছটার নিচে ছোট খোঁদল, খোঁদলে সেই কাঠবিড়ালি, সকাল হলেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ত। সোনা পড়া ফেলে ছুটত জীবটার পিছনে। ছোট্ট জীব এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে পড়ত। সোনালী রোদে সে কটকট করে ডাকত। সোনা গুলতি মারলে বিড়ালটা হাতজোড় করে রাখত। কিন্তু সোনা কর্ণপাত না করলে তখন খেলা আরম্ভ হয়ে যেত। সোনার মনে হতো এই সে এক জীব, ছোট্ট

জীব! জীবের কি বড়াই! একেবারে ভয় পায় না। গাছের পাতায় পাতায় যেন উড়ে বেড়ায়। শুধু এই জীব কেন, যা-কিছু সুন্দর এবং সজীব, এই যেমন রোদ, মাটি, শরতের বৃষ্টি, সব কিছুরই পিছনে তাড়া করতে সে ভালোবাসে। অমলা তার কাছে খুব এক দূরের রহস্য বয়ে এনেছে। সে সেজন্য নড়তে পারছে না। কার কাছে যাবে? পাগল জ্যাঠামশাই, বড় মঠ এবং জ্যোৎস্না রাতের মাঠ না অমলা, কমলা। সে অন্ধকারে কিছু স্থির না করতে পেরে সিঁড়ির মুখে যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল।

একজন পাইক বরকন্দাজের মতো মানুষ ওর পাশ কাটিয়ে গেল। ওকে দেখতে পায়নি। দেখতে পেলেই বলত, কে? অন্ধকারে কে জাগে। তাকে তাড়া করত! আর অন্ধকার থেকে আলোয় এলেই, আরে, এ যে সোনাবাবু! আপনে এখানে কি করতাছেন? আশ্চর্য, সোনা এই সব মানুষদের দেখে—কি লম্বা আর উঁচু। সব সময় করজোড়ে থাকে। ওকে দেখলে পর্যন্ত করজোড়ে কথা বলে। ওর ইচ্ছা হল সিপাইটাকে একটু ভয় পাইয়ে দেয়। এবং সে মুখ বাড়াতেই দেখল সামনে অমলা কমলা এবং অন্য সব ছোট ছোট মেয়ে অথবা ছেলে! দাসীবাঁদীদেব ঘর পার হয়ে সব কোথায় যাবে বলে হৈ-হৈ করে নেমে যাচ্ছে।

সে এবারেও নড়ল না।

কমলার মনে হল কেউ যেন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, কে রে তুই?

সোনা আলোতে এসে বলল, আমি।

—তোকে খুঁজতে যাচ্ছি। সেই কখন থেকে আমরা তোর জন্য বসে আছি।

ওরা ফের ওপরে উঠে যাবে মনে হল। কিন্তু দোতলার সিঁড়িতে উঠেই ওরা ছাদে গেল না। ওরা একটা ফাঁকা মতো জায়গায় চলে এল। এখান থেকে রান্নাবাড়ির কোলাহল পাওয়া যায়! মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। ওরা একটা ঝুলন্ত বারান্দায় এসে গেল। এখন ওরা যে যার দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে। তারপর ছড়িয়ে পড়বে রান্নাবাড়ির চারপাশে।

সুতরাং ওরা অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ল। অথবা বলা যায় লুকিয়ে পড়ল। অমলা সোনাকে নিজের দলে রেখেছে। সে ভেবেছিল সোনাকে নিয়ে কোথাও সে লুকিয়ে পড়বে। কিন্তু সোনা যে কোথায় সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। সে একটা চিলেকোঠায় উঠে গেল। এখানে তাকে কেউ খুঁজে পাবে না।

আর সোনার এখন যেন এ-বাড়ির সব চেনা হয়ে গেছে। কোনদিকে তোষাখানা, কোনদিকে বালাখানা, কোথায় ঠাকুরবাড়ি, কোথায় সেই বৌরানীর মহল, এবং মহলের পর মহল পার হতে কত সময় লেগে যায় সে সব জানে। ওরা আর বেশি দূর যাবে না, গেলে সে বাদ যাবে।

সোনা কিন্তু কিছু দূর এসেই কেমন ভয় পেয়ে গেল। এদিকটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা! ভাঙা পাঁচিল নিচে। পাঁচিলের ওপাশে সেই বড় বনটা। সোনা বেশি দূরে যাবে না। বড় বড় দুটো আলোর ডুম জ্বলছে বলে এবং দাসী বাঁদীদের কি নিয়ে বচসা হচ্ছে বলে ভয়টা তেমন জোরালো হচ্ছে না। তবু সে এমন একটা জায়গা চাইছে, যেখানে সে পালালে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। সে তেমন একটা জায়গা না পেয়ে কেমন হতাশায় ডুবে যাচ্ছিল আর তখন দেখল অমলা ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন অমলা এতক্ষণ ওকেই খুঁজছে।

অমলা বলল, আমার সঙ্গে আয় সোনা।

অমলা সোনাকে সাহায্য করতে পারবে। সে অমলার পিছু পিছু নুয়ে নুয়ে হাঁটতে থাকল। মাথা তুলে দাঁড়ালেই ওপাশের রেলিং থেকে ওদের দেখতে পাবে।

সোনা এবং অমলা এই করে উত্তরের বাড়ি পর্যন্ত চলে এল। বড় বড় দরজা পার হয়ে যে যার মতো লুকিয়ে পড়ছে। অমলা ফিস্‌ফিস্‌ করে এদিকে আয়, এদিকে আয় করছে। একটা অন্ধকার মতো লম্বা বারান্দায় ওরা এসে পড়ল। এখান থেকে অতিথিশালার দিকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে গেছে। কাঠের সিঁড়ি। সোনা এবং অমলা ঘুরে ঘুরে নামছে। ওরা নামতে নামতে যেন একটা নির্জন জায়গায় চলে এল। নীল রঙের অল্প আলো। সোঁদা সোঁদা পাঁচিলের গন্ধ। সামনে একটা পরিত্যক্ত ঘর। হাট করে একটা পাট খোলা। কিছু ইঁদুর-এর শব্দ। উপরে একটা গাছ। কী গাছ এই আলোতে চেনা যায় না। দুটো-একটা বাদুড়ের মতো জীব ওদের শব্দ পেয়ে উড়ে গেল। ওরা দরজা অতিক্রম করে পাঁচিলটার পাশে একটা কিছু ধ্বংসস্তূপের মতো দেখতে পেল। এককালে বোধ হয় এখানে একটা কুয়ো ছিল। কুয়োটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে এসেই অমলা বলল, চুপ করে দাঁড়া। এখানে আমাদের খুঁজতে কেউ সাহস পাবে না। আমরা রান্নাবাড়ির পেছনটাতে চলে এসেছি।

সোনা ভয়ে জবাব দিল না।

—কি রে, একেবারে চুপ করে আছিস কেন? কথা বল।

—আমার বড় ভয় লাগছে।

—ভয় কি রে! এখানে আমি বৃন্দাবনীর সঙ্গে রোজ আসি। সকালে ফুল তুলতে আসি। তারপরই ওদের মনে হল কেউ যেন কাঠের সিঁড়িটা ধরে নিচে নেমে আসছে! অমলা কোনও কথা আর বলল না। সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। সোনা একেবারে অমলার পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে আছে। যেন সে এখন বলির পাঁঠা। অমলা যা-যা বলবে সোনা তাই তাই করবে। সোনাকে অমলা দুটো সন্দেশ দিল খেতে। তারপর যখন দেখল সিঁড়ি থেকে শব্দটা আর উঠে আসছে না, কেউ বোধ হয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাবাড়ির দিকে চলে গেছে, তখন অমলা বলল, তুই কমলার সঙ্গে ভাব করবি না, কেমন?

আবার শব্দ হচ্ছে কাঠের সিঁড়িতে। বোধ হয় কমলা তার দলবল নিয়ে ওদের খুঁজতে আসছে। মলিনা, আলো, মধু কিংবা আরও কেউ কেউ হবে। যে-ই হোক, এদিকে আসতে ওরা সাহস পাবে না। মাথার ওপর একটা লম্বা ডাল। পাঁচিলের ওপাশ থেকে ডালটা এপাশে ঢুকে গেছে। আর তারই নিচে সেই ভুতুড়ে ঘরটা। ঘরটার অন্ধকারে অমলা সোনাকে জড়িয়ে ধরেছে। বলছে, ভয় কি রে! এই দ্যাখ, দ্যাখ না সোনা। বলে অমলা সোনার হাত নিয়ে কেমন খেলা করতে থাকল।

সোনা আবার বলল, এখানে না অমলা। আমার এসব ভালো লাগে না। সোনা বার বার অমলার মতো কথা বলতে চায়, ওর অমলার মতো কথা বলতে ভালো লাগে।

তখন কমলার দলবলটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে। সোনা বলল, কমলা আমাকে বাইস্কোপের বাক্স দেবে বলেছে।

অমলা বলল, আমি তোকে রোজ একটা স্থলপদ্ম এনে দেব। বৃন্দাবনী বাবার জন্যে গোলাপের তোড়া বানাবে। তোকে আমি ফুলের তোড়া দেব। বলে আর সোনাকে কথা বলতে দিল না। ওর চুলে অমলা হাত দিয়ে আদর করতে থাকল। মাথাটা এনে নাকের কাছে রাখল। একেবারে রেশমের মতো নরম চুল। সোনা কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। কলকাতার মেয়ে অমলা কত কিছু জানে। এই বয়সে সোনা আর কী করতে পারে! অমলা ওকে নিয়ে কী করতে চায়! তুই কী সুন্দর সোনা! তোর চোখ কি বড়! তোকে আমি কলকাতা নিয়ে যাব। কত বড় শহর দেখবি। কত বড় চিড়িয়াখানা, জাদুঘর।

সোনা বলল, বইয়ে আছে জাদুঘরে বড় একটা তিমি মাছের কঙ্কাল আছে।

—তুই গেলে দেখতে পাবি, কত বড় কঙ্কাল।

সোনা বলল, আমার ভয় লাগে।

অমলা বলল, একটু নিচে। তুই কীরে! ভয় পাস কেন এত।

সোনা বলল, ঈশম একটা বড় মাছ ধরছিল।

অমলা যেন আর পারছে না। সোনার কাছে কী চাইছে। সোনার হাতটা কোন অতলে যেন নিয়ে যাচ্ছে। সোনার যেন কিছু জ্ঞানগম্যি নেই। যেন সে কিছু জানে না। অমলা কেমন বিড়বিড় করে বকছে, সোনা, কত বড় মাছ রে?

—খুব বড়।

—দে, তবে হাত দে।

সোনা বলল, না।

—তবে তোকে চুমু খাই।

—না।

—কেন কি হবে?

—গালে থুতু লাগবে।

—মুছে ফেলবি! তুই কি বোকা রে।

আবার সেই কথা সোনার মুখে। ওর ভয়, এটা যে কি, কোন ওষধিতে গড়া, একবার খেলে আর খেতে নেই, ধরা পড়ে গেলে ভয়, তা ছাড়া এ বড় এক পাপ কাজ। সোনা নিজের কাছে নিজেই কেমন ছোট হয়ে যাচ্ছে, অথচ একটা ইচ্ছা-ইচ্ছা ভাব, রহস্য নিয়ে জেগে আছে কলকাতার মেয়ে, সে এক দূরের রহস্য, যা সে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কেবল নদীর জলে শাপলা ফুলের মতো ফুটে থাকার স্বভাব তার, সে যেন জলের ওপর ভেসে আছে, লজ্জা ভয় সঙ্কোচ ওকে ক্রমে জলের ওপর ভাসিয়ে রাখছে, ওর হাত নিয়ে সেই অতলে ছেড়ে দিলেই সে জলের ভিতর ডুবে যাবে। পাপের ভিতর হারিয়ে যাবে।

সে বলল, না অমলা। না, না।

অমলা বলল, লক্ষ্মী সোনা। দে হাত দে। তুই আবার বাঙাল কথা বলিস কেন?

সোনা কেমন গুটিয়ে আসছে। সে যেন পৃথিবীতে একটা বিশুদ্ধভাব নিয়ে বেঁচে ছিল এতদিন, অমলা তাকে সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ওর এখন ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে। অথচ অমলার প্রীতিপূর্ণ চোখ, সোনালী চুল, চোখের নীল রঙ, আর শরীরে যেন উজ্জ্বল সোনালী বাতি জ্বলছে নিয়ত—এমন এক শরীর ছেড়ে ওর যেতে ইচ্ছা করছে না। সারাক্ষণ সে অমলার পাশে পাশে হাঁটতে ভালোবাসে, কিন্তু এখন অমলা যা ওকে করতে বলছে—তা, কেন জানি ওর কাছে একটা পাপ কাজ বলে মনে হচ্ছে।

অমলা সোনাকে আর সময় দিল না। সোনার মুখটা টেনে টুক করে একটা চুমু খেল। তারপর বলল, ভালো লাগছে না?

সোনা বুঝল কি বুঝল না টের পেল না। ভাঙা দরজাটা বাতাসে সরে গেছে। নীলচে আলোতে সোনার মুখ অস্পষ্ট। অমলা সেই মুখ দেখে বলল, কী রে, চুপ করে আছিস কেন? ভালো লাগছে না?

ভালো লাগছে না বললে অমলা রাগ করবে। অমলা ওকে আর ভালোবাসবে না। সন্দেশ দেবে না, ফুল-ফল দেবে না। সে বলল না কিছু। ঘাড় কাৎ করে সুবোধ বালকের মতো সম্মতি জানাল।

আর কথা নেই অমলার। যেন এবারে তার পাসপোর্ট মিলে গেছে। সে তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করছে। সোনারও কেমন ভালো লেগে যাচ্ছে। সেই হাত নিয়ে খেলা, নতুন খেলা, জীবনের এক অদ্ভুত রহস্যময় খেলা, আরম্ভ হয়ে গেল।

অমলা প্যান্টের দড়ি বাঁধার সময় বলল, কী রে তোর ভালো লাগেনি?

সোনা ফিক করে হেসে দিল।

—হাসলি যে?

সোনা কিছু না বলে বাইরে এসে দাঁড়াল। কিছু না বুঝেই সোনা বোকার মতো হাসল। এবং বাইরে আসতে আবার সেই হাসি।

—কি রে, তোর কি হয়েছে সোনা? এত হাসছিস কেন?

সোনা জোরে জোরে হাসতে থাকল। এটা কী একটা হয়ে গেল। অমলা-পিসি তাকে এটা শেখাল। বেশ একটা খেলা, তার জীবনে এসে গেল। এখন তার অমলাকে নিয়ে ছাদের ওপর অথবা একটা নীল রঙের মাঠে কেবল ছুটতে ইচ্ছা করছে। এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না। কী সুন্দর লাগছে অমলাকে, অমলা নিত্যনতুন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু মায়ের মুখ মনে পড়তেই সে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। তার মনে হল সে একটা পাপ কাজ করে ফেলেছে। তার আর কিছু ভালো লাগছে না। একা, নির্জন এই ভাঙা পাঁচিলে সে বড্ড একা একা। পাশের এই অমলাকে এখন আর সে যেন চিনতে পারছে না। সে তারপরই যথার্থই ছুটতে থাকল।

অমলা বলল, সোনা ছুটে যাস না। পড়ে যাবি সিঁড়ি থেকে! অমলাও দু' লাফে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যেতে থাকল। সোনা এখন যেভাবে ছুটছে, পড়ে গেলে মরে যাবে! সে সোনার চেয়েও দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে সোনাকে সাপটে ধরল। —সোনা, এই সোনা, তোর কী হয়েছে? এভাবে ছুটছিস কেন? অন্ধকারে পড়ে গেলে মরে যাবি।

সোনা অমলাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে দিল। অন্য সময় হলে অমলা কেঁদে ফেলত, কিন্তু এখন সোনার চোখ দেখে ভয়ে সে কিছু বলতে পারছে না। সে কাছে এসে বলল, তোকে একটা ভালো গল্পের বই দেব। আমার সঙ্গে আয়।

সোনা চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে। অমলা তাকে বার বার ডাকল—সে উত্তর করল না। ঢাকের বাদ্যি বাজছে মণ্ডপে। সে একটা বড় হলঘর পার হয়ে যাচ্ছে। কত রকমের ছবি ঘরটাতে! কতরকমের বাঘের অথবা হরিণের চামড়া! ঢাল তলোয়ার সাজানো এই হলঘরটাতে এলেই সোনা মনে মনে রাজপুত্র হয়ে যায়। মাথায় সোনার মুকুট, পায়ে নূপুর, কালো রঙের ঘোড়া এবং কোমরে রূপালী রঙের বেল্ট আর লম্বা তরবারি। এই হলঘরে এলেই সোনার এক রাক্ষসের দেশ থেকে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধারের ইচ্ছা জাগে। আজ

আর ওর সেই ইচ্ছাটা জাগছে না। হলঘর পর্যন্ত পিছু পিছু অমলা এসেছে। তারপর আর আসতে সাহস পায়নি। দরজার মুখে সে দাঁড়িয়ে সোনার চলে যাওয়া দেখছে।

দরজা পার হতেই সে একবার পিছন ফিরে তাকাল। অমলা এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক বন্দিনী রাজকন্যার মতো মুখ করে রেখেছে। রাজপুত্র সোনা। কিন্তু এখন সে কী করবে! কোথায় যাবে! ওর মনে হচ্ছিল সবাই ওর এই পাপ কাজের কথা জেনে ফেলেছে। পাগল জ্যাঠামশাইর পাশে বসলেই তিনি যেন সোনার শরীরের গন্ধ শুঁকে বলে দেবেন, তুমি সোনা বড় তরমুজের মাঠ দেখে ফেলেছ। রহস্য তোমার অন্তহীন। তুমি সোনা, আমার পাশে বসবে না। সোনার এখন কেবল কান্না পাচ্ছে।

থামের আড়ালে এসে থামতেই সোনা দেখল, পাগল জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে শুয়ে নেই। সব পরিচিত, অপরিচিত লোক গিজগিজ করছে মণ্ডপের সামনে। ওর সেখানে যেতে ইচ্ছা হল না। ওর কেবল কেন জানি মায়ের মুখ বার বার মনে পড়ছে। ঠিক পাগল জ্যাঠামশায়ের মতো মা-ও ওর হাতের গন্ধ শুঁকলেই টের পেয়ে যাবে। সে একটা পাপ কাজ করে ফেলেছে টের পেয়ে যাবে। এখন কি করলে যে সব পাপ তার ধুয়ে মুছে যাবে —সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। মা বলেছে, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সব বলে দিলে পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। সে জলের কাছে তার যা-কিছু পাপ সব বলে দেবে এবং ক্ষমা চেয়ে নেবে।

সে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে জল এবং জলের দেবতাকে বলবে, হে জলের দেবতা, আর তখনই সে দেখল কাছারিবাড়ি এসে গেছে। রামসুন্দর বসে রয়েছে একটা গোল টেবিলে। চারপাশে কাঠের চেয়ার। বাবুদের ছেলেরা গোল হয়ে বসেছে। রামসুন্দর সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারে। একটু দূরে পাগল জ্যাঠামশাই বসে আছেন। মাথার উপর আকাশ, আর মৃদু জ্যোৎস্নার আলোতে সে ভাবল, কাল ভোরে সে পাগল জ্যাঠামশায়কে নিয়ে নদীর পাড়ে চলে যাবে। মা যেমন দুঃস্বপ্ন দেখলে সকাল সকাল সোনালী বালির নদীতে চলে যান, জলের কাছে দুঃস্বপ্ন হুবহু বলে দেন, বলে দিলেই সব দোষ খণ্ডন হয়ে যায়, তেমনি সে বলে দেবে। দিলেই তার যত দোষ খণ্ডন হয়ে যাবে।

এমন মহাপাপ করে সোনার কিছুই ভালো লাগছিল না। এমন কি এখন যে রামসুন্দর গল্প বলছে তাও শোনার আগ্রহ তার নেই। সে কাছারিবাড়ির ভিতর ঢুকে মেজ জ্যাঠামশাইর বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং সারাদিনের ক্লান্তিতে তার ঘুম এসে গেল।

সে ঘুমের ভিতর একটা কুঠিবাড়ির স্বপ্ন দেখল। সামনে বিস্তীর্ণ এক মাঠ। মাঠে কোনও শস্য ফলে না। নুড়ি বিছানো পথ, পাশে খোয়াই। খোয়াই ধরে জল নেমে আসছে। সাদা, নীল, হলুদ রঙের পাথর। জল নির্মল বলে পাথরগুলির রঙ জলের উপর নানা রঙ নিয়ে ভেসে থাকছে। আর কুঠিবাড়ির পিছনেই একটা পাহাড়। তার ছায়া সমস্ত কুঠিবাড়িটাকে শান্ত স্নিগ্ধ করে রেখেছে। সোনা সকালের রোদে বের হয়ে পড়েছে। সে কার হাত ধরে যেন নিয়ত ছুটছে। সে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। পিছনের বেণী কেবল

ঝুলতে দেখছে। লাল রিবন বাঁধা চুলে রূপালী রঙের ফ্রক গায়ে মেয়েটা তাকে নিয়ে সেই খোয়াইর দিকে ছুটে চলেছে।

খোয়াইর পাড়ে এসে সোনা কেমন ভয় পেয়ে গেল। মনে হল তার, এমন গভীর জল এবং স্রোত পার হয়ে সে ও-পাড়ে উঠে যেতে পারবে না। মেয়েটা বলছে, কি রে, ভয় কি! আয়! আয় না, দেখ আমি কেমন তোকে পার করে দিচ্ছি।

আলগা হাতে সোনাকে যেন মেয়েটা খোয়াইর ওপারে নিয়ে যাবে বলে হাত বাড়াল। খোয়াইর জল পার হতে ছোট ছোট মাছ চার পাশে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। ঠাণ্ডা জল। এমন জল এই সুন্দর সকালকে যেন মহিমময় করে রাখছে। সোনা আর কিছুতেই ও-পাড়ে উঠে যেতে চাইছে না।

—কি রে, খুব ভালো লেগে গেছে! আর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না! সোনা মেয়েটার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ওর দিকে কেবল পিছন ফিরে থাকছে। সোনাকে কেবল পিছন ফিরে কথা বলছে। সোনা বলল, খুব ভালো লাগছে।

এত ভালো লাগছে যে সোনার কেবল জলের মাছ হয়ে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে। আর কি অবাক, যেই না তার ইচ্ছা জলের মাছ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গেই সে জলের মাছ হয়ে গেল। মেয়েটা হাসল ওর দিকে তাকিয়ে, কি রে, তুই জলের মাছ হয়ে গেলি? বলতে বলতে মেয়েটাও জলের নিচে টুপ করে ডুব দিল। আর কী আশ্চর্য! সে এবং মেয়েটা দু'জনেই হলুদ এবং নীল রঙের চাঁদা মাছ হয়ে খোয়াইর হাঁটুজলে সাঁতার কাটতে থাকল। তারপর দু'জন এক ভয়ঙ্কর স্রোতের মুখে এসে আটকে গেল। উজানে উঠে যাবার জন্য নীল রঙের মাছটা লাফ দিতেই পাড়ে এসে পড়ল। এবার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সোনা শ্বাস ফেলতে পারছে না। সে পাড়ে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। শ্বাসকষ্ট প্রায় মৃত্যুকষ্টের শামিল। সোনা ঘুমের ভিতর স্বপ্নে হাঁসফাস করছিল এবং এক সময় ঘুম ভেঙে গেল তার। সে ঘেমে গেছে! আর সে দেখল কে যেন তাকে পাঁজাকোলে রান্নাবাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। সে চোখ তুলে দেখল পাগল জ্যাঠামশাই নিয়ে যাচ্ছেন। এতক্ষণে মনে হল সোনার, সে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে বলল, জ্যাঠামশয়, মাছ দ্যাখলে কি হয়?

পাগল মানুষ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। এখন সোনা মুখ দেখে বুঝতে পেরেছে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, রাজা হয়। স্বপ্নে মাছ দেখলে রাজা হয়।

পরদিন সকালে সোনা সূর্য উঠতে না উঠতেই জ্যাঠামশাইকে টানতে টানতে শীতলক্ষ্যার পাড়ে নিয়ে গেল। সামনে ছোট চর, পাড়ে কাশবন। বাঁ দিকে মঠতলায় স্টিমার ঘাট। দশটায় স্টিমার আসার কথা। নারায়ণগঞ্জ থেকে আসে।

সকাল বলে এবং আশ্বিনের মাস বলে ঘাসে ঘাসে শিশির। জ্যাঠামশাই, সোনা এবং প্রিয় আশ্বিনের কুকুর নদীর পাড়ে হাঁটছে। এরা তিনজনে চরে নামতেই দেখতে পেল সেই হাতিটা, হেমন্তের হাতি। এখন আশ্বিনের শেষাশেষি চরের ওপর দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছা হল জোরে চিৎকার করে ডাকে, জসীম! আমারে জ্যাঠামশয়রে নিয়া যাও। আমি মার কাছে যামু গিয়া। আমার এখানে ভাল লাগে না। কিন্তু বলতে পারল না। ভয়ে সে বলতে পারল না। যদি আবার জ্যাঠামশাই হাতিতে চড়ে নিরুদ্দেশে চলে যান।

অথচ গত রাত্রের ঘটনা মনে হতেই সে তার মায়ের কাছে ফিরে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। এখন কেবল মনে হচ্ছে খালেক মিঞার মতো সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এই কুয়াশা পার হলেই এক জগৎ, সেখানে নিয়ে যাবার জন্য অমলা তার সুন্দর চোখ নিয়ে অপলক প্রতীক্ষা করছে। সোনা জ্যাঠামশাইর হাত ধরে নদীর ঘাটে দাঁড়াল। অথচ পাপের কথা কিছু বলতে পারছে না। কী বলবে! সামনের জলে কিছু কাশফুল ভেসে যাচ্ছে। এই ফুল দেখতে দেখতে সে তার মহাপাপের কথা ভুলে গেল। ওর কেবল মনে হচ্ছে এতদিনে সেই দূরের রহস্যটা সে যেন কিছু কিছু ধরতে পারছে। এখন ওর চারপাশের ফুল-ফল, পাখি, দু'পাশে নদীর চর, নদীর জলরাশি এবং এই যে হাতি চলে যাচ্ছে নদীর পাড়ে-পাড়ে, জ্যাঠামশাই পিছনে তার সূর্য ওঠা দেখাচ্ছেন, কুকুরটা সকালের রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর স্টিমার ঘাটে যাত্রীরা বসে আছে, কিছু কিছু ঘাসের নৌকা, খড়ের নৌকা মাঝনদীতে...সবাই যেন গান গায় তখন, কোনখানে ভাসাইলা নাও, দুই কূলের নাই কিনারা য্যান এই নাও ভাসাইয়া দিছে সোনা, অমলা অথবা কমলা অথবা ফতিমারে নিয়া সোনাবাবু মাঝ গাঙের মাঝি হইয়া গ্যাছে।

সোনা এই নদীকে সাক্ষী রেখে কোনও পাপের কথা বলতে পারল না। সে সোজা উঠে এল ফের জ্যাঠামশাইর হাত ধরে। সকালের রোদ সোনার মুখে পড়ছে। যেন মুখটা সূর্যের আলোতে জ্বলছিল।

পাগল মানুষ সোনার মুখ দেখে কি যেন ধরতে পারছেন। তিনি আশীর্বাদের মতো সোনার মাথায় হাত রাখলেন! ...তোমার ভিতর বীজের উন্মেষ হচ্ছে সোনা। এই হতে হতে কিছু সময় পার হলে তুমি কিশোর হয়ে যাবে! তখন দেখবে রহস্যটা যা এখন ছুঁতে পারছ না, তা ধরতে পারবে! আরও বড় হলে, দুই কূলের নাই কিনারা, তুমি জলের ভিতর ডুবে যাবে। না ডুবতে পারলে পাড়ে-পাড়ে তার সন্ধানে থাকবে। তারপর খুঁজে না পেলে আমার মতো পাগল হয়ে যাবে।

অন্দরের দিকে যেতে সারাদিন আর সোনার ইচ্ছা হচ্ছিল না। গাছের পাতার মতো নিরিবিলি এক লজ্জা অথবা সংকোচ ওকে ঘিরে ধরেছে। সুতরাং সে সারাদিন কাছারিবাড়ির বারান্দায় বসেছিল। এবং চারপাশে যে মাঠ আছে, সেখানে সে ঘোরাফেরা করছে। সে কিছুতেই অমলা কমলার সঙ্গে দেখা করেনি।

আজ নবমী। সুতরাং মোষ বলি হবে। সকাল থেকেই এই উৎসবের বাড়ি অন্যরকম চেহারা নিচ্ছে। লালটু পলটু কাছে কোথাও নেই। ওরা বাবুদের বাড়ি-বাড়ি দুর্গাঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছে। নদীর পাড়ে সড়ক। নদীর পাড়ে প্রাচীন মঠ। মঠের পাশ দিয়ে পুরান বাড়ির দিকে একটা পথ গেছে, সেই পথে সোনা গতকাল পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে গিয়েছিল পুরান বাড়িতে। সঙ্গে রামসুন্দর ছিল। সুতরাং এমন একটা নিরিবিলি পথ, দুপাশে বাবুদের ইটের দালান-কোঠা, এবং দীঘির কালো জল তার কাছে আতঙ্কের মনে হয়নি। দীঘির পাড়ে বড় অশ্বত্থ গাছ, গাছের নিচে আশ্রম। আশ্রমের পাশ দিয়ে পথটা কতদূরে গেছে সোনা জানে না। কেবল ওর মনে হয়েছিল, এই পথ ধরে গেলেই, সেই বুলতার দীঘি, এবং দীঘির দু'পাড় দেখা যায় না। বড় বড় মাছ, মাছের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। নদীর সঙ্গে যোগাযোগ দীঘির জলের, কালো জল, জলে অজস্র রূপালী মাছ, এবং একটা জলটুঙি আছে দীঘির মাঝখানে। মাঝে অতল জলের ভিতর বড় একটা দ্বীপ। সোনার এসব কোনও বড় দীঘি দেখলেই মনে হয়। আর মনে হয় বার-বার অমলার মুখ, এবং এটা যে কী একটা হয়ে গেল! সে পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে আর তেমন বেশি কথা বলতে পারছে না। কেবল চুপচাপ দীঘির পাড়ে কোন অশ্বত্থের ছায়ায় বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। কেবল ভাবছে অমলা তাকে রূপালী মাছের খেলা, জলের নিচে খেলা, কী-যে এক খেলায় সুন্দর এক রাজপুত্র বানিয়ে তাকে নদীর পাড়ে ছেড়ে দিয়েছে।

সোনা সেই পুরান বাড়ি—বাড়ি বলতে আর কিছু নেই, শুধু ইট-কাঠ, ভাঙা দালান এবং চুন-বালি খসা নাটমন্দির। মন্দিরে পূজা হয় দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে। এই বাড়িতেই বাবুদের প্রথম জমিদারী আরম্ভ হয়েছিল। কি যেন নাম সেই পূর্ব পুরুষের! সোনা এখন আর তা মনে করতে পারছে না। রামসুন্দর যেতে যেতে অন্য এক হাতির গল্প করছিল, হাতি, নদী পার হতে গিয়ে শেকলে পরশমণির স্পর্শ, এবং হাতি বাবুদের নসীব বদলে দিয়ে গেছে। এমন সব কিংবদন্তী রামসুন্দর কী সুন্দরভাবে গাছের ছায়ার বসে বলতে ভালোবাসে। আর সে কাছারিবাড়ির একটা টুলে নিরিবিলি বসে দেখতে পাচ্ছে, মাঠের

ভিতর নবমীর মোষটা ঘাস খাচ্ছে। মোষটা বলি হবে বলে সব ছেলেমেয়েরা ঘুরে ফিরে অথবা একটু দূরে বসে মোষটার খাওয়া দেখছে। একটু বাদে রামসুন্দর মোষটাকে স্নান করাতে নিয়ে যাবে। সোনা, একবার মোষের মাথা নিয়ে এক কাটা মোষ যায়, সে মাঠে কাটা মোষের মাথা দেখে ধড় দেখে বনের ভিতর পথ হারিয়ে ফেলেছিল। সে জ্যান্ত মোষ কোনও দিন দেখেনি। ওর মোষটার কাছে যেতে কষ্ট হচ্ছে। একবার ভেবেছিল মোষটার কাছে গিয়ে বসে থাকবে এবং ঘাস খাওয়া দেখবে। কিন্তু বলি হবে বলে ওর ভিতরে ভিতরে মোষটার জন্য কষ্ট হচ্ছিল। কাছে যেতে তার খারাপ লাগছে। মোষটার পিঠে একটা শালিক পাখি বসে আছে। পিঠে শালিক পাখি দেখেই সোনার কেন জানি মোষটাকে দুটো ঘাস ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছা হল। মোষটা জানে না কিছুক্ষণ পরই সে মরে যাবে।

সোনার খবর নিতে অমলা দু'দু'বার বৃন্দাবনীকে পাঠিয়েছে। দু'বারই সোনা কাছারিবাড়ির কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। সে সাড়া দেয়নি। বৃন্দাবনী তারপর হতাশ হয়ে চলে গেছে। সোনা শুনেছে এই বৃন্দাবনীই ওদের বড় করে তুলছে। মানুষ করে তুলছে। অমলা কমলার মা খুব সুন্দর। এবং চুপচাপ কলকাতায় নির্জন ঘরে একা বসে থাকেন। বড় একটা জানালা আছে। জানালায় দুর্গের র‍্যামপার্ট দেখা যায়। মেয়েদের জন্মের পর তিনি আর সেই ঘর থেকে বের হন না। রবিবারে শুধু গীর্জায় যান। কমলার বাবার চোখমুখ দেখলেও সোনার কেন জানি কষ্ট হয়। কেমন বিষণ্ণ আর উদাস। সেজন্য সোনা অমলা অথবা কমলার সঙ্গে যতটা সহজে ভাবে সে আর ভাব করবে না, কথা বলবে না, তত ভিতরে ভিতরে সে নিজেই যেন কেমন দুর্বল হয়ে যায়। তবু সেই ঘটনাটা মনে হলেই ওর কেমন ভয় করে। অমলা নিজেও কমলার সঙ্গে কাছারিবাড়ি চলে এসেছে। এই, তোরা সোনাকে দেখেছিস! সোনা কোথায়? সোনাকে দেখছি না! রামসুন্দরকে তখন জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, মইষডার কাছে বইসা আছিল সোনাবাবু।

ওরা মাঠে নেমে গেল। যেখানে মোষটা ঘাস খাচ্ছে সেখানে একদঙ্গল ছেলেপিলে। ওরা মোষটার চারপাশে বসে রয়েছে। অমলা সোনাকে সেখানে দেখতে পেল না।

সোনাকে ওরা দেখতে পাবে না কারণ সোনা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। চুপি চুপি অমলাকে দেখছে। সে অমলাকে ডাকতে পারছে না। সেই ঘটনার পর থেকেই সোনা কেমন নদীর পাড়ের সোনা হয়ে গেছে। সে যতটা পারল, কমলা অমলার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইছে। অথবা পালিয়ে পালিয়ে এ-কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ফের নৌকায় দেশে ফিরে যাওয়া। ওর আর ভালো লাগছে না। মায়ের জন্য ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, সে জানে না মায়ের কাছে কবে কীভাবে যাবে, কবে তাকে সকলে সেই ছোট্ট নদীটির পাশে পৌঁছে দেবে।

মেজ জ্যাঠামশাইকে সে কাছেই পায় না। তিনি কোথায় কখন চলে যান সোনা টের পায় না। মাঝে মাঝে স্নানের অথবা আহারের আগে তিনি বাক্স থেকে জামাপ্যান্ট বের

করে দেন। সোনা যেন তাড়াতাড়ি লালটু পলটুর সঙ্গে স্নান আহার শেষ করে নেয়। কারণ, উৎসবের বাড়ি, কে কার দেখাশুনা করে! শুধু পাত পেতে বসে পড়া।

অন্যদিন সকালবেলা সোনা, অন্দরে ঘি আর সুগন্ধ আতপ চালের ভাত মেখে ডাল দিয়ে অথবা কচু-কুমড়ো সেদ্ধ, বাবুদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে যায়। কাল সকালবেলা সে পুরান বাড়ি চলে গিয়েছিল না হলে খেতে গেলেই দেখা হয়ে যেত অমলার সঙ্গে। আজ কোথাও যেতে পারেনি বলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে খেতে ডাকবে কেউ-না-কেউ। বৃন্দাবনী এসেছিল, অমলা কমলা খুঁজে গেছে। তার ভাত নিয়ে ছোট বৌরানী বসে রয়েছে। সোনা এ বাড়িতে এসে ছোট বৌরানীরও বড় প্রিয় হয়ে গেছে। সেই সোনাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। দু'দিন থেকে সে অন্দরে ছোটদের সঙ্গে বাল্য-ভোগ খেতে আসছে না। বৌরানী সোনার খোঁজে বার বার কাছারিবাড়ি লোক পাঠিয়েছে।

ভূপেন্দ্রনাথ পূজামণ্ডপ থেকে নেমে আসার সময় এক ঠোঙা সন্দেশ এনেছিলেন। সেই খেয়ে সোনা নবমী পূজা দেখবে বলে সকাল সকাল পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে নদী থেকে স্নান করে এসেছে। পূজার নতুন জামা-প্যান্ট পরেছে। মোষ বলি হবে। ছোট শিং বলেই সোনার মনে হল মোষটার বয়স কম। কম বয়সের এই মোষ এখনও ঘাস খাচ্ছে। ঘাস খেলে ঘস-ঘস শব্দ হয়। সোনা শব্দটা শুনতে শুনতে চারপাশে তাকাল। আর কী সমারোহ—কী কচি-মোষ! ঘাস, ফুল, ফল খেতে দিচ্ছে মোষটাকে। সেই এক রক্তজবার মালা, এখন মালা পরে মোষটা যেন ঘাসের ভিতর রাজার মতো দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে যত কচি কাঁচা বালক সেই সকাল থেকে যারা জড়ো হচ্ছিল চারপাশে তারা এখন মোষটার নীল রঙের চোখ দেখছে। বলির সময় চোখদুটো লাল রঙের হয়ে যাবে। সোনা হাঁটতে হাঁটতে মোষটাকে পিছনে ফেলে কাছারিবাড়ির সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। লম্বা ঘর পার হয়ে নাটমন্দিরের চত্বরে ঢুকে গেলে দেখল, কি লম্বা আর চকচকে দুটো খড়্গা নিয়ে বসে রয়েছে রামসুন্দর। কিছু ছাগশিশু, অথবা পাঁঠা বলি হবে। মোষ বলি হবে। রামসুন্দর বসে আছে তো আছেই। দোতলার বারান্দায় কে যেন সব চিকগুলি ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। মোষ বলির সময় পাঁঠাবলির সময় সব বৌরানী, আর পরিজন যত আছে, চিকের ভিতর মুখ রেখে নৃশংস ঘটনা দেখতে দেখতে হা-মা দেবী কল্যাণী, তুমি কল্যাণব্রতী, সুন্দরী, মহাকালের আদ্যাশক্তি বলে করজোড়ে প্রণাম করবে। ভূলুণ্ঠিত হবে।

নবমী পূজার প্রসাদ এইসব পাঁঠার মাংস। মহাপ্রসাদ। পূজা শেষ হলেই এইসব আস্ত পাঁঠা গণ্ডায় গণ্ডায় রান্নাবাড়িতে চলে যাবে। বড় বড় টাগারি ধোয়া মোছা হচ্ছে। ছাল ছাড়াবার জন্য নকুল তিনজন মানুষকে নিয়ে রান্নাবাড়ির বারান্দায় দড়ি ঝুলিয়ে রাখছে। যেন বলি শেষ হলে আর কিছু পড়ে না থাকে। নিমেষে বড় বড় কড়াইয়ে এসব পাঁঠার মাংস জ্বাল হবে। মোষটাকে সেই বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে শীতলক্ষ্যার ওপারের মানুষেরা। রক্ষিত জ্যাঠামশাই কাটা-মোষ যারা নিতে এসেছে তাদের সঙ্গে পাওনা গণ্ডা নিয়ে রফা করছেন।

সোনা রামসুন্দরের পাশে চুপচাপ বসল। রামসুন্দর রামদা ধার দিচ্ছে। দুটো রামদা। উল্টে পাল্টে রামসুন্দর কি নিবিষ্ট মনে ধার দিয়ে চলেছে। সেই যে সোনা একবার সোনালী বালির নদীর চরে প্রথম তরমুজ খেতে হারিয়ে গিয়েছিল—ঈশম ছইয়ের ভিতর তামাক টানছে, সে নদীর জল থেকে একটা মালিনী মাছ ধরে এনে তরমুজের পাতায় রেখেছিল, এবং মাছটা এক সময় মরে যাবে ভাবতেই সে যেভাবে দ্রুত ছুটে গিয়ে বালির ভিতর গর্ত করে জল রেখে মাছটা ছেড়ে ভেবেছিল এবার আর ভয় নেই, মাছটা বেঁচে যাবে, এবং গর্তের পাড়ে বসে নিবিষ্টমনে প্রতীক্ষায় ছিল মাছটা বেঁচে যাচ্ছে কিনা—ঠিক তেমনি যেন রামসুন্দরের নিবিষ্ট মনে প্রতীক্ষা রামদায় ধার উঠছে কিনা! সে দু'বার ঘষেই হাতের আঙুলে জিভ থেকে একটু থুতু লাগিয়ে ধার পরীক্ষা করছে। এত বড় একটা জীবের গলা এক কোপে কাটা প্রায় যেন বিলের গভীর জলে ডুব দেওয়া। ভেসে উঠতে পারবে কিনা কেউ বলতে পারে না।

ঠিক দশটায় বলি। হাঁকডাক চারপাশে। কেউ যেন চুপচাপ বসে নেই। দু'বার ওকে অতিক্রম করে মেজ জ্যাঠামশাই লম্বা বারান্দা পার হয়ে গেলেন, দু'বার রামসুন্দর ধার দিতে দিতে চোখ তুলে লক্ষ করেছে ছোট একটা মানুষ এইসব দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছে। বড়দা, মেজদা, বাবুদের ছেলেরা সবাই ছুটে ছুটে কোথাও যাচ্ছে। ওকে কতবার যাবার সময় দেখছে—অথচ কেউ কথা বলছে না। নবমীর পূজা শেষ হলেই যেন আবার সবাই সবাইকে চিনতে পারার কথা ভাববে। সেজন্য সোনাও চুপচাপ আছে। ওর খুব খিদে লাগছে। কাউকে বলতে পারছে না। সকালে সে ভাত খায়নি। সকালে ওর ফ্যানা ভাত খাবার অভ্যাস। কষ্টটা প্রায় সেইদিনের মতো—যেদিন সে ফতিমাকে ছুঁয়ে দিয়েছিল বলে মা ভাত খেতে দেয়নি। সোনা চুপচাপ রামদা দুটো দেখছে। কি চকচক করছে! সোনার একবার রামদা দুটোতে হাত দিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু রামসুন্দর দা দুটো পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে। একটা পাঁঠা কাটার, একটা মোষ কাটার! সে দা দু'টোকে অপলক দেখছে। রামসুন্দরের এমন চোখ মুখ সে কোনওদিন দেখেনি। ওর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল।

বলি হবে দশটায়। ঠিক ঘড়ি ধরে দশটায়। সবাই যেন এখন ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে আছে। খুব জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ হচ্ছে মণ্ডপে। তন্ত্রধার দ্রুত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। দশটা ঢাক বাজলে দশটা ব্যাগপাইপ বাজবে। ঢোল বাজবে দশটা। সব দশটা করে। পাঁঠাও দশটা, শুধু মোষ একটা। মোষটা বলি হবে—কী আতঙ্ক তার। সোনা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মোষ বলির কথা মনে হলেই বুকটা কেঁপে উঠছে। ঠিক সেই ঠাণ্ডা ঘরটার মতো। যেমন সে লুকোচুরি খেলার রাতে কোনও এক প্রাচীন ঠাণ্ডা ঘরে শ্যাওলার ভিতর—একটা কাক কা কা করে ডাকছিল—রাত্রে কাক ডাকা ভালো না, অমঙ্গল হয়, সারাক্ষণ অমলা যে ওকে নিয়ে কী করছিল...! এখন রামসুন্দর দায়ে ধার উঠে গেছে বলে নিশ্চিন্তে গোঁফে তা দিচ্ছে।

এই রামসুন্দর আজ মোষ বলি দেবে। সকাল থেকেই সে অন্য মানুষ। সকাল সকাল সে নদী থেকে স্নান করে এসেছে। টিকিতে জবাফুল বেঁধেছে। ঘরে বসে সে গাঁজা

খেয়েছে। সে এখন একটা আসনে পদ্মাসন করে বসে আছে। রামদা দুটো সামনে। ডাকলেই সে মণ্ডপের দিকে দুই দা দুই কাঁধে নিয়ে ছুটে যাবে। সিঁদুরের ফোঁটা চক্ষুর মতো এঁকে দেবে দায়ের মাথায়। তারপর আর কার সাধ্য আছে ওর সামনে যায়!

সোনাকে এমন চুপচাপ পাশে বসে থাকতে দেখে বিরক্তিতে কেমন বলে উঠল, সোনাকর্তা এহনে যান। আমি দেবীর আরাধনা করতাছি। তারপর আর কোনও কথা নয়। একেবারে গুম মেরে বসে আছে।

তা চুপচাপ বসে থাকবে! এতবড় একটা জীবকে সে এক কোপে দু'খান করবে সোজা কথা! কি বড় আর মোটা গর্দান মোষের। কালো কুচকুচে সবল মোষ। দশটা বিশটা মানুষের যে মোষ সামলানো দায় সেই মোষ এক কোপে কাটতে চায়! মোষ যারা ধরবে তারা এক এক করে এসে পড়ল, গোল হয়ে বসল এবং গাঁজা খেল। ওরা উৎকট চিৎকার করে উঠল দু'হাত তুলে। সোনা তেমনি উবু হয়ে বসে আছে। সে নড়ছে না। সে কেমন এইসব মানুষজন দেখে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। দেয়ালে সেই সব সড়কি, বল্লম, নানারকমের লম্বা ফলা এবং তরবারি সাজানো এবং এই ঘরটাতেই রামসুন্দর দিনমান পড়ে থাকে বুঝি। হাতে তার নানারকমের শিকারের ছবি। বাঘ ভাল্লুকের ছবি এঁকে রেখেছে সে সারা শরীরে। সে যতবার ভাওয়ালের গজারি বনে বাবুদের সঙ্গে বাঘ শিকারে গেছে ততবার সে হাতে, বুকে পিঠে অথবা কব্জিতে উল্কি পরে এসেছে নারানগঞ্জ থেকে। সে ক'টা বাঘ শিকার করেছে, ক'টা হরিণ এবং অজগর ওর শরীর দেখলেই তা টের পাওয়া যাবে। সোনা মাঝে মাঝে রামসুন্দর পাশে বসে থাকলে উঁকি দিয়ে গুনত—এক, দুই, তিন। তারপর বলত, আপনে তিনটা বাঘ মারছেন। রামসুন্দর হাসত। তারপর সে তার হাত তুলে বগল দেখাত।—দ্যাখেন, এখানে একটা বাঘ আছে। বাঘটারে বগলের নিচে লুকাইয়া রাখছি।

সোনা বলত, ক্যান লুকাইয়া রাখছেন?

—বাঘটার লগে আমার খুব ভাব-ভালবাসা আছিল।

—ভাব-ভালবাসা কি?

—আপনের বিয়া হইলে টের পাইবেন।

সোনা বলত, যান! সে ঠেলে ফেলে দিত রামসুন্দরকে। তারপর বলত, আমাকে একটা হরিণের বাচ্চা আইনা দিবেন?

সোনার ধারণা বনে গেলেই হরিণের বাচ্চা ধরা যায়। এই যে চিড়িয়াখানা বাবুদের এবং চিড়িয়াখানায় বাঘ, কুমীর এবং জোড়া হরিণের খাঁচা, সবই এই মানুষের জন্য। যেন এই মানুষ যাবতীয় বন্য জন্তু এনে পোষ মানাচ্ছে।

সে বলত, বনে গেলে ধইরা আনবেন ত?

—রাখবেন কোনখানে?

—বাড়ি নিয়া যামু।

—খাওয়াইবেন কি?

—ঘাস খাওয়ামু।

—ঘাস খাইতে চায় না। বন থাইকা ধইরা আনলে গোসা কইরা থাকে।

—গোসা করব ক্যান?

—জঙ্গলের জীব যে জঙ্গলে যাইতে চায়।

—অমলা কমলার হরিণ আছে। অরা গোসা করে না ক্যান?

—সুন্দর মুখ, কি সুন্দর চক্ষু অগ কন? রঙখানা কি? অরা কথা বললে আপনের গোসা থাকে? কথা কইলে খেলা করতে ইসছা হয় না, ভালবাসতে ইসছা হয় না?

—যান। আপনে কেবল মন্দ কথা কন।

সেই মানুষটা এখন গুম মেরে আছে। কথা বলছে না। এমনকি এদিকে বড় এখন কেউ আসতেও যেন সাহস পাচ্ছে না, কপালে বড় রক্তচন্দনের ফোঁটা দিয়ে বসে রয়েছে, কাউকে সে ভ্রুক্ষেপ করছে না। এমন কি অমলার বাবা মেজবাবু একবার এসেছিলেন এদিকটাতে, তিনি রামসুন্দরকে এমন অবস্থায় পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখে পালিয়েছেন। কারণ ওর চোখ জবাফুলের মতো লাল। সকাল থেকে পাশের ঘরটায় ঢুকে কি খাচ্ছে পালিয়ে পালিয়ে—একটা উৎকট গন্ধ এবং ঝাঁজ। সোনা দু'বার ঘরটায় ঢুকে পালিয়ে এসেছে। সে এখন মণ্ডপের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-দিকে ঝাড়-লণ্ঠনে একটা জালালি কবুতর সেই কখন থেকে ডাকছে। সে ঝাড়-লণ্ঠনে নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করল। বাতাসে ছোট কাচের নকশি কাটা পাথরগুলি দুলছে। ঠিক প্রজাপতির মতো নকশি কাটা কাচগুলি ঘুরে ঘুরে দুলছে। কেমন রিনরিন শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দে চকিতে মুখ তুলতেই দেখল, মণ্ডপে দেবী ওর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছেন। সে সরে দাঁড়াল। মনে হল চোখ ঘুরিয়ে ওকে দেখছেন দেবী। সে কেমন ভয়ে ভয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। বলল, ঠিক অমলা কমলার মতো বলা, ভয় পেলে সে বইয়ের ভাষায় কথা বলতে চায় অথবা বড় জেঠিমা যেমন বলেন, তেমন ভাবে সে বলল, মা দুগ্‌গা, আমার জ্যাঠামশাইকে ভাল করে দাও।

গর্জনে দেবীর মুখ চকচক করছে। ধূপের ধোঁয়ায় যেন মুখ, নাকের নোলক কাঁপছে। হাতের ত্রিশূল দেবী আরও শক্ত করে চেপে ধরেছেন। মেজ-জ্যাঠামশাই একটা গরদের কাপড় পরে সারাক্ষণ চণ্ডী পাঠ করছেন। পুরোহিত ফুল-বেলপাতা চারপাশে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে দিচ্ছেন। রাশি রাশি ভোগের নৈবেদ্য এবং ফলমূলের গন্ধ। এখন বলির সময়। ঢাক বাজছে দশটা। মোষটাকে কারা আনতে গেছে মাঠে। দেবীর চোখ যেন ক্রমে লাল হয়ে যাচ্ছে। যে যার মতো মোষ বলি দেখার জন্য জায়গা করে নিচ্ছে। সোনা সেই দেয়ালে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর নড়তে পারছে না।

তখন সেই মানুষটা সহজে দু'কোপে দুটো বাচ্চা পাঁঠা কেটে ফেলল। সে চোখ বুজে ফেলছে। চোখ খুলতেই দেখল ধড়টা এবং পাগুলো তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। সে বলল, মা, আমি আর পাপ কাজ করব না।

সে একটা থামের আড়ালে আছে। দোতলার চিক ফেলা। বাবুদের পরিজনেরা, দাসদাসী সবাই সেই চিকের আড়ালে। ওরা বলি দেখার জন্য চলে এসেছে। অথচ কী যে করবে সোনা, ভয়ে সে নড়তে পারছে না, সারাক্ষণ দেবী তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন! — তুমি কী করেছ সোনা, এটা কী করেছ, এমন বলছে। দেবীর রক্তচক্ষু। এই তবে দেবী মহিমা!

সে বলল, আমি কিছু করিনি মা। তেমনি বাতাস বইছে। নকশি কাঁথার মতো ছোট ছোট বরফি কাচ আবার আগের মতো বাতাসে দুলছে। রিনরিন করে বাজছে। জালালি কবুতরটা চু পচাপ একটা ধুতুরা ফুলের মতো কাচের গেলাসে বসে পাঁঠা বলি দেখছে। জায়গা নেই। পাখিটা বেশ জায়গা মতো বসে গেছে। সারা মণ্ডপে এবং নিচে, চারপাশের বারান্দায় সর্বত্র লোক। আর দোতলার চিক ফেলা। অমলা কমলা এই ভিড়ের ভিতর পাঁঠা বলি দেখছে না, সোনাকে খুঁজছে। কোথায় যে গেল!

এখন কেউ তাকে দেখতে পাবে না। তাকে তার সামনের মানুষজন ঢেকে ফেলেছে। দুগ্‌গা ঠাকুর ওকে দেখতে পাচ্ছেন না। সে চুপি চুপি মাথা নিচু করে ভেগে পড়ার জন্য কিছু মানুষ ঠেলে সিঁড়ির মুখে আসতেই কে তার হাত খপ করে ধরে ফেলল। আর সেই মানুষটা তাকে কাঁধে তুলে দাঁড়িয়ে থাকল।

আর মোষটাকে তখন কারা টেনে টেনে আনছে। ধূপধুনোর গন্ধে কেমন নেশা ধরে গেছে। দুগ্‌গা ঠাকুরের মুখ দেখা যাচ্ছে না।

ধোঁয়ায় একেবারে সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মোষটা সব দেখে ফেলেছে। নাকে বড় নোলক দুলছে দুগ্‌গা ঠাকুরের আর কী অপার মহিমা দু' চোখে। মোষটা এবার আরাধনা করছে এমন মুখ তুলে তাকাল। তখনই ঠেলেঠুলে বিশ-বাইশ জন লোক মোষটাকে হাড়কাঠে ফেলে দিল। পায়ে দড়ি বাঁধা। গলাটা টেনে জিভ বের করে চারটা মানুষ পায়ের দড়িতে হ্যাঁচকা মারতে সবল জীবটা হুড়হুড় করে নিচে গাইগরুর মতো পড়ে গেল।

জিভ থেকে লালা বের করছে। গ গ শব্দ করছে। এবারে ঘাড়টা চেপে দিতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ মোষের আর্তনাদ শুনতে পেল না। ঢাক এত জোরে বাজছে

আর চারদিকে দালান কোঠা বলে এমন গমগম শব্দ যে, এই বাড়ি ঘর প্রাসাদ, প্রবল প্রতাপান্বিত মোষ আর সোনা দুলছে। সেই রিনরিন শব্দ বাতাসে জলতরঙ্গের মতো কাচের বরফি কাটা নকশাতে। সেই দুগ্‌গা ঠাকুরের মুখ ঝলমল করছে আর কেবল রক্তপাত হচ্ছে সামনে। পশু বলি হচ্ছে, মেজ জ্যাঠামশাই পশুর নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ১৯৭৩ মুণ্ড নিয়ে মণ্ডপে সাজিয়ে রাখছেন। মাথায় ঘিয়ের ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হচ্ছে। সব শেষে মোষ বলি। বাদ্যি যারা বাজাচ্ছে, তারা নেচে নেচে বাজাচ্ছে। হাত তুলে সকলে জয়ধ্বনি করছে, দুগ্‌গা ঠাকুর কি জয়! শ্রীশ্রী চণ্ডীমাতা কি জয়! মা অন্নপূর্ণা কি জয়! আদ্যাশক্তি মহামায়া কি জয়! অসুরবিনাশিনী, মধুকৈটবনাশিনী কি জয়! মা অন্নপূর্ণা কি জয়! রামসুন্দর সেই খাঁড়াটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। প্রতিমার মুখ কাপছে। যেন সে এখন মহিষমর্দিনী, এবং এই মহিষের রক্তপানে খড়্গ হাতে নিজেই নেচে বেড়াবে।

মোষটাকে যারা ঠেলেঠুলে হাড়িকাঠে ফেলে দিয়েছিল তারা সবাই মোষটার পিঠে চেপে বসেছে। তাঁবুর খোঁটা পোঁতার মতো চারজন লোক চার পাশে দড়ি টেনে রেখেছে। মানুষগুলির চাপে ঘাড়টা লম্বা হয়ে যাচ্ছে মোষের। কালো চামড়া নীল নীল হয়ে যাচ্ছে অথবা ফেটে যাচ্ছে মনে হয়। ক্রমান্বয়ে ঘি মাখানো হচ্ছে গর্দানে। সোনা উঁকি দিয়ে আছে। ওকে কে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন দেখার সময় নেই। সে চিকের আড়ালে আছে। এ-পাশে দাঁড়ালে চিক চোখে পড়ে না। সে এখন অপলকে একবার দেবীর মুখ দেখছে আর রামসুন্দর যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে খড়্গ হাতে এবং এসেই দেবীর শ্রীচরণে ভূপাতিত হয়ে—মাগো, তুই মা অন্নপূর্ণা, তোর কী করুণা মা, বলে হাউহাউ করে কাঁদছে রামসুন্দর, এসব দেখে সে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। এই যে খড়কুটো দিয়ে তৈরি মাটির প্রতিমা, চিমটি কাটলে রঙ এবং মাটি উঠে আসবে, এখন তার কী মাহাত্ম্য, করজোড়ে বাবুরা সব দাঁড়িয়ে আছেন আর পুরোহিত ঘণ্টা বাজাতেই, ফুল-বেলপাতা দিতেই রামসুন্দর মোষটার সামনে দাঁড়াল। এখন মোষটা লেজ গুটিয়ে নিচ্ছে। একটা লোক চুলের বেণীর মতো লেজটাকে দুমড়ে ধরে আছে। লেজটা সেজন্য কাঁপছে।

তখন রামসুন্দর মা মা বলে চিৎকার করে উঠল, মা তোর এত লীলা, মা মা, বলতে বলতে খড়্গ উপরে তুলল না বেশি। হাতখানেক উপর থেকে কোপ বসিয়ে দিল। খড়্গ সোনার চোখের সামনে দুলে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল—কি যে হয়ে যাচ্ছে, মুণ্ড ছিটকে পড়েছে, ধড়টা গড়িয়ে পড়ছে। কলসী থেকে জল পড়ার মতো মোষের ঘাড়টা এখন রক্ত ও গলাচ্ছে। মেজ জ্যাঠামশাই সেই মুণ্ডটা মাথায় তুলে নিলেন। তিনি যে কত শক্ত মানুষ, দেবীর সামনে তিনি যে কী মহাপাশে আবদ্ধ, এখন যেন সোনা তা টের পাচ্ছে। তিনি মাথায় মুণ্ড নিয়ে হাঁটতে থাকলেন। সোনা বস্তুত রামসুন্দর উপরে খড়্গ তুলতেই চোখ বুজে ফেলেছিল। সে চোখ খুলতেই দেখল জ্যাঠামশাই মোষের মুণ্ড নিয়ে মণ্ডপে যাচ্ছেন। সেই মানুষটা সোনাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে এখন মোষের রক্ত ধরার জন্য খুরি নিয়ে হাড়িকাঠের নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রক্ত নিয়ে সকলের কপালে ফোঁটা টেনে দিচ্ছে। মা

ঈশ্বরী করুণাময়ী! চিমটি কাটলে তোর মা রঙ মাটি উঠে আসবে, খড় বেরিয়ে পড়বে, তুই মা দেখালি বটে খেলা! সেই পাগল মানুষ এখন এইসব মানুষের উম্মত্ত অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছেন। সোনা ভিড়ের ভিতর জ্যাঠামশাইকে দেখতে পাচ্ছে না। যারা রক্ত কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে কচু পাতায় অথবা কলাপাতায়, যারা খুরি আনতে ভুলে গেছে তাদের থেকে সোনা সরে দাঁড়াল। ওরা কেমন পাগলের মতো হাতে পায়ে রক্ত লাগিয়ে ছুটোছুটি করছে। সে ভয়ে সিঁড়ির মুখে যেখানে পথটা অন্দরের দিকে চলে গেছে, তার একপাশে একটা থাম, সে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। এইসব দেখতে দেখতে ওর যে খুব খিদে পেয়েছে ভুলে গেল। নিজেকে বড় একা এবং অসহায় লাগছে। মার কথা মনে হল। কতদিন সে মার পাশে শুচ্ছে না। মার পাশে না শুলে তার ঘুম আসে না। মায়ের শরীরে একটা পা তুলে না দিলে, মাকে পাশবালিশের মতো ব্যবহার না করলে সোনার ঘুম আসে না। ভিতরে ভিতরে সে এখন মায়ের জন্য কষ্ট পাচ্ছে।

মার জন্য না ক্ষুধার জন্য বোঝা যাচ্ছে না—কারণ সোনা এখন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সকাল থেকে সে প্রায় কিছুই খায়নি, চোখ-মুখ কি শুকনো দেখাচ্ছে, সে চারপাশে এত লোক দেখছে, অথচ কিছু বলতে পারছে না। সে আজ মেজ জ্যাঠামশাইকে কিছু বলতে ভয় পাচ্ছে। বড়দা মেজদা ওকে আমল দিচ্ছে না। মোষ বলি হলেই ওরা আবার বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন রান্নাবাড়িতে দশটা পাঁঠার মাংস রান্না হচ্ছে। মহাপ্রসাদ হলেই পাত পড়বে বড় উঠোনে। সকলে খেতে বসবে, তখন সোনাও দুটো খাবে—সে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি রান্নাবাড়ি থেকে কখন খাবারের ডাক আসে সেই আশায় দাঁড়িয়ে আছে। এবং তখন কেন জানি মায়ের কথা মনে হলেই চোখ ফেটে জল আসছে সোনার।

সিঁড়িতে তখন দ্রুত নেমে আসছে মনে হল কেউ। সে পিছনে ফিরে দেখল অমলা কমলা। ওরা বলল, সোনা, তুই ফোঁটা দিসনি?

সোনা বলল, না।

—আয়, ফোঁটা দিবি। বলে অমলা কোথা থেকে একটা খুরি নিয়ে এল। জমানো রক্ত। সেই রক্ত থেকে সোনার কপালে ফোঁটা দিয়ে দিল। বলল, এদিনে ফোঁটা না দিলে তুই বড় হবি কী করে? তোর পুণ্য হবে কী করে?

কিন্তু সোনা কিছু জবাব দিচ্ছে না। সে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কেবল ওদের দেখছে। সেই এক জরির কাজ করা ফ্রক গায়ে। হাতে ছোট্ট দামি ঘড়ি এবং বালা, সরু আঙুলে হীরের আংটি! ববকাট চুলে সাদা রিবন বাঁধা।

গায়ে পদ্মফুলের মতো সুবাস।

সেই আবছা অস্পষ্ট জায়গাটিতেও অমলা ধরতে পারল, সোনা কাঁদছিল। সে বলল, কি রে, তোকে আমরা সেই সকাল থেকে খুঁজছি। তুই ছিলি কোথায়?

সোনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

কমলা বলল, চল, ছোট কাকিমা তোকে ডাকছে।

সোনা বলল, মোষ বলি আমি কোনকালে দেখিনি।

অমলা বলল, সোনা, তুই দাঁড়িয়ে কাঁদছিলি?

—যা, আমি কাঁদব কেন।

—তুই ঠিক কেঁদেছিস। আমি সব দেখেছি।

সোনা ধরা পড়ে গেছে ভাবতেই বলল, ফোঁটা দিলে আমার আর কোন পাপ থাকবে না?

—না। বলেই অমলা সোনার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, এদিকে আয়। সে সোনাকে একটু ভিতরের দিকে নিয়ে গেল। বলল, কি রে, কাউকে বলিস নি ত?

—না।

—তুই আমাকে পিসি বলতে পারিস না! আমি তো তোর চেয়ে কত বড়।

—পিসি ডাকতে আমার লজ্জা লাগে অমলা।

—তবু তুই আমাকে পিসি ডাকবি। মান্য করবি, কেমন!

সোনা জবাব দিল না।

—আজ আসবি সন্ধ্যার পর ছাদে।

—ধ্যেৎ। বলেই সে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

আর সেই নাটমন্দিরে এখন কাটা মোষ পড়ে। মণ্ডপে দশটা পাঁঠার মাথা, মাঝখানে মোষের মাথা। মাথায় প্রদীপ, প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে কোনটা নিভে গেছে। সবক'টা মাথার চোখ এখন দেবীর দিকে তাকিয়ে আছে। এখন ভিড়টা নেই। একটু রক্ত হাড়িকাঠে পড়ে নেই। ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। সোনা সোজা দীঘির পাড়ে চলে এল। রোদ উঠেছে খুব। শরতের বৃষ্টি সকালে হয়ে গেছে। সবকিছু তাজা, ঘাস ফুল পাখি সব। তবু কেন জানি সোনার কিছু ভালো লাগছে না। সে তখন দেখল পাগল জ্যাঠামশাই ময়ূরের ঘরটাতে বসে রয়েছেন। উত্তরের আকাশে একটা কালো মেঘ। সেই মেঘ দেখে ময়ূর পেখম মেলেছে। পাগল জ্যাঠামশাই সেই ময়ূরের পেখম দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেছেন।

সোনা ডাকল, জ্যাঠামশয়!

মণীন্দ্রনাথ যেন ধরা পড়ে গেছেন এমনভাবে তাকালেন। কেমন অপরাধী মুখ। সোনা সেসব লক্ষ করল না। শুধু চুপি চুপি বলল, চলেন, বাড়ি যাই গিয়া। ওর যে ভালো লাগছে না আর, এমন কথা বলল না।

কিন্তু মণীন্দ্রনাথ যেন ধরতে পেরেছেন সোনা কিছু খায়নি এখনও পর্যন্ত। ওর ক্ষুধায় চোখ মুখ কোথায় ঢুকে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন তিনি। এবং সোনাকে নিয়ে সোজা রান্নাবাড়িতে ঢুকে কোনওদিকে আর তাকালেন না। দুটো কলাপাতা নিজেই নিয়ে এলেন। মাটির গ্লাসে জল রাখলেন। তারপর বারান্দা পার হয়ে ঠাকুরকে হাত তুলে ইশারা করলেন।

নকুল বুঝতে পারছে, এই পাগল মানুষ তাঁর নাবালক ভাইপোটিকে খেতে দিতে বলছেন! মহাপ্রসাদ এখনও নামেনি। বড় উঠোনে লম্বা পাত পড়ছে। সেখানে সে উঠে যেতে বলতে পারত। কিন্তু তিনি যখন এসেছেন তখন কার সাধ্য না দেয়। নকুল নিজেই ওকে ভাত বেড়ে দিল। পাগল মানুষ নিবিষ্ট মনে ভাত মেখে সোনাকে বড় বড় গ্রাসে খাওয়াতে লাগলেন। জল খেতে দিচ্ছেন। নুন মেখে দিচ্ছেন। যেমনটি করলে সোনার খেতে ভালো লাগবে তেমনটি করছেন।

অথচ সোনা খেতে পারল না। কারণ আসার সময় সে মণ্ডপের সামনে কাটা মোষটাকে পড়ে থাকতে দেখেছে। এমন কুৎসিত দৃশ্য আর এই পাঁঠার মাংস—ওর কেমন ভিতর থেকে ওক উঠে আসছিল।

জ্যাঠামশাই খেয়ে এলে সে ওঁর সঙ্গে ঘুমাতে পারল না। সে দেখল পাগল জ্যাঠামশাই চুপচাপ একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন বারান্দায়। আশ্বিনের কুকুরটার জন্য তিনি ভিন্ন খাবার এনেছেন ঠোঙা করে। পেটভরে খেয়ে কুকুরটা পায়ের কাছে ঘুমাচ্ছে। তিনি ঘুমাননি। মেজ জ্যাঠামশাই সারাদিন পর দুটো খেয়ে শুতে-না-শুতেই নাক ডাকাচ্ছেন। সে বুঝল এ-ই সময় বের হয়ে যাওয়ার। সে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে এখন পিলখানার দিকে চলে যাবে। এ-ই সময়। হাতিটার কাছে গিয়ে একটু বসা যাবে। সেখানে গেলে বুঝি এই যে ভয়, এক ভয়, কাটা মোষ পড়ে আছে, কাটা মোষের ভয়ে সে যেন হাতিটার কাছে চলে যাচ্ছে অথবা এখন দেখে মনে হবে সে তার পাগল জ্যাঠামশাইকে হাতি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। হাতি দেখিয়ে, ঘাস ফুল পাখি দেখিয়ে সে তার পাগল জ্যাঠমশাইকে নিরাময় করে তুলবে।

বাগানের ভিতর দিয়ে ওরা হাঁটতে থাকল। সামনে শীতলক্ষ্যা নদী। নদীর পাড়ে ওরা হাঁটবে। মাথার ওপর নির্মল আকাশ। দু'পাশে পাম গাছ আর নদীর পাড়ে পাড়ে কত মানুষ। ওরা প্রায় পালিয়ে হাতি দেখতে চলে যাচ্ছে। কেউ দেখছে না এমনভাবে চুপি চুপি সোনা জ্যাঠামশাইর হাত ধরে চলে যাচ্ছে। কেবল কাছারিবাড়ি পার হলে যাত্রা পার্টির অধিকারী মানুষটি দেখে ফেলল। সে রামায়ণ পাঠ করছিল, চশমার কাচ ঘষে বাগানের ভিতর দিয়ে কারা যাচ্ছে লক্ষ করতেই বুঝল সেই পাগল মানুষ তাঁর নাবালক ভাইপোর

হাত ধরে কোথায় যাচ্ছেন। এই মানুষকে দেখলেই কেন জানি বাজা হরিশচন্দ্রের কথা মনে হয় অধিকারী মানুষটির। গাছপালার ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আবছা আবছা মুখ, হাত পা এবং কুকুরের ছায়া চোখে পড়ছে। সে যেন সারা জীবন পালাগানে এমন একজন উদাস মানুষের ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে—যিনি কেবল সামনের দিকে হাঁটেন কোনওদিকে তাকান না। সে পারেনি। মানুষটাকে দেখেই ওর কেন জানি বড় একটা নিঃশ্বাস উঠে এল।

সোনা কিন্তু জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বের হতে পেরেই যাবতীয় দুঃখ ভুলে গেল। সে আগের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। সে বার বার জ্যাঠামশাইকে সাবধান করে দিচ্ছে, যেন হাতির সঙ্গে জ্যাঠামশাই কোন দুষ্টুমি না করে। করলেই সে তার বাবাকে না হয় মেজ জ্যাঠামশাইকে বলে দেবে এমন ভয় দেখাতে লাগল।

ওরা কালীবাড়ি যাবার পথে এসে পড়ল। বাজারের ভিতর দিয়ে কালীবাড়ি যাবার একটা রাস্তা আছে। কিন্তু পিলখানায় যেতে হলে অতদূরে যেতে হবে না। ডানদিকের উমেশবাবুর মঠ, মঠের উত্তরে সুপুরির বাগিচা। বাগিচা পার হলেই একটা আমবাগান। বাগানের ভিতর হাতিটা বাঁধা থাকে। কিন্তু সে এখন কোথায় জায়গাটা আবিষ্কার করতে পারছে না। সে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই ঘণ্টার শব্দ পেল। এবং মনে হল বাগানের ভিতর ঢুকে গেলেই সে হাতিটাকে আবিষ্কার করে ফেলবে। কিন্তু কোন্ দিকে যে হাতিটা আছে! তারপরই মনে হল সকালে পিলখানায় থাকে, দুপুর হলে জসীম হাতিটাকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যায়, তারপর বনের ভিতর কিছুক্ষণ বেঁধে রাখে। খাবার দেওয়া হয়। কলাগাছ আর যত মাদারের ডাল। দশমীর দিনে হাতি থাকবে না। সকাল হলেই জসীম বাবুদের বাড়ি বাড়ি হাতি নিয়ে যাবে। চালচিড়া মুড়ি মোয়া সন্দেশ হাতির জন্য চেয়ে নেবে। খুব সকাল সকাল সে হাতিটার কপালে চন্দনের তিলক পরাবে। শোলার রঙ-বেরঙের লাল নীল অথবা জরির চাঁদমালা বেঁধে দেবে মাথায়। কমলা বলেছে ওরা কাল হাতির পিঠে চড়ে দশহরা দেখতে যাবে। অমলা বলেছে, সোনা, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি। সোনা কিছু বলেনি। সে এখন হাতিটা কোন দিকে, কোন বনের ভিতর এবং মাঠের পাশ দিয়ে যাবে, না সোজা দৌড়াবে বুঝতে পারল না। কেবল কুকুরটা সোজা বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে এবং ঘেউঘেউ করছে। সে বুঝল হাতিটাকে দেখে ফেলেছে তার আশ্বিনের কুকুর।

তাড়াতাড়ি ওরা কুকুরটাকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকে গেল। বনের ভিতর ঢুকে সোনা দেখল হাতিটা দুলছে, সামনে পিছনে দুলছে। এই বন গাছপালা পাখি নিয়ে তার হাতি বেশ আছে। হাতির পায়ে শেকল। সে বেশিদূর এগোতে পিছোতে পারছে না। সোনা, জ্যাঠামশাইর পাশে—যেন ওরা দুই মুগ্ধ বালক হাতিটাকে নিবিষ্ট মনে দেখছে। তখনই হাতিটা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। এবং সোনাকে, পাগল জ্যাঠামশাইকে চিনতে পেরে সেলাম দিল!

আর আশ্বিনের কুকুরটাও হিজ মাস্টার্স ভয়েসের মতো ওদের পাশে বসে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। যেন বলতে চাইল, আমাকে চিনতে পারছ না, আমি আশ্বিনের কুকুর। সোনাদের বাড়িতে আমি থাকি। তোমার সঙ্গে একবার নদী পার হয়েছিলাম, মনে নেই!

সোনা এবার হাতি না দেখে জ্যাঠামশাইর মুখ দেখল। শিশুর মতো হাতির দিকে তাকিয়ে হাসছেন তিনি। এই হাসি দেখে সহসা কেন জানি মনে হল, জ্যাঠামশাই ভালো হয়ে যাবেন। চোখে মুখে সরল অনাবিল হাসি। সে মায়ের কথা, অমলা কমলার কথা অথবা ফতিমার কথা ভুলে আনন্দে জ্যাঠামশাইর পিঠে দু'হাতে গলা জড়িয়ে দুলতে থাকল। সোনা বলল, জ্যাঠামশায় বলেন ত. এক। পাগল মানুষ বললেন, এক। বলেন, দুই। তিনি বললেন, দুই। হাতিটা তখন শুঁড় দোলাচ্ছে।

গলায় তার ঘণ্টা বাজছিল। জ্যাঠামশাই এক-দুই-তিন করে ক্রমান্বয়ে ঠিক ঠিক গুনে যাচ্ছেন। সোনা পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক দুই তিন অথবা একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ, তিনে নেত্র—যেন দুই নাবালক বনের ভিতর জীবনের নামতা পাঠ নুতন করে ফের আরম্ভ করেছে—সোনা সুর করে পড়ে যাচ্ছে, জ্যাঠামশাই ঠিক ঠিক অবিকল উচ্চারণ করে নামতা পড়ছেন।

সোনা হঠাৎ এই নির্জন বনের ভিতর আনন্দে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, বাবা, মা, মেজদা, বড়দা, ছোটকাকা, জেঠিমা, আমার জ্যাঠামশয় ভাল হইয়া গ্যাছে। এই বলতে বলতে সে বনের ভিতর ছুটে ছুটে ঘুরে বেড়াতে থাকল। কুকুরটাও ছুটে বেড়াচ্ছে। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছে। পাগল মানুষ চুপচাপ বসে কেবল গুণে যাচ্ছেন—এক দুই তিন, চার, পাঁচ, ছয় সাত, আট, নয়।

সেই যে মালতী শুয়ে থাকল আর উঠল না। দিন তিনেক বাদে কিছুটা যেন হুঁশ ফিরেছে। চোখ মেলে তাকিয়েছে। কি যেন বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে উঠছে। বলতে পারছে না। আঁচল দিয়ে মালতী নিজের মুখ ঢেকে রেখেছে। যত জোটন মুখ থেকে আঁচল টেনে কথা বলতে চেয়েছে, তত মালতী মুখের আঁচল তুলে দিয়ে কেমন শক্ত হয়ে পড়ে থাকছে।

মালতীর হুঁশ ফিরলে এই যে জোটন—যার যৌবন নেই শরীরে, যে পীরের দরগায় এসে গেছে এবং যার স্বভাব ছিল পান-সুপারি অথবা সামান্য খুদকুড়ার জন্য মালতীর বাড়ি ধান ভেনে দেওয়া, চিঁড়ে কুটে দেওয়া, সেই জোটনকে দেখে প্রথম মালতীর যেন হাতে আকাশ পাবার মতো অবস্থা। তার উপর কি মনে হতেই মালতী সব ভবিতব্য ভেবে শক্ত হয়ে গেল। এবং এখন মনে হচ্ছে জোটন ওর বড় শত্রু। বনবাদাড়ে সে কোথায় যে পড়ে ছিল মনে করতে পারছে না। কীভাবে এখানে এল তাও মনে করতে পারছে না, কেবল মনে পড়ছে সে হোগলার বনে ঢুকে লুকিয়ে ছিল। তারপর তিন জীব, মনুষ্যকুলের যেন তারা কেউ নয়, তাদের দেখে সে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। তারপর এখানে এবং এটা জোটনের কাজ। সে আস্তানাসাবের দরগায় এখন। তাকে ওরা বনবাদাড়ে ফেলে চলে গেছে। এই জোটন ওর এত বড় শত্রুতা কেন করল! বনবাদাড়ে পড়ে থেকে এক সময় মরে গেলে অন্তত এ পোড়ামুখ আর দেখাতে হতো না কাউকে। সে জোটনের কথায় সেজন্য কোনও উত্তর দিচ্ছে না।

ফকিরসাব দুধ এনে গাছতলায় বসে আছেন। এই দুধটুকু এখন গরম করে খেতে হবে। মালতীকে স্নান করতে হবে। মালতী হিন্দু বিধবা যুবতী। ভিজা কাপড়ে দুধটুকু গরম করে খেতে হবে। এই মাচান এবং ছই সব কিছুতেই এক অপবিত্র ভাব, মালতী জেগে গেলেই টের পাবে। জোটন ডাকল, ওঠ মালতী, তারপর সে বলতে চাইল, যেন উঠে স্নান করে আসে মালতী। কাঠ, নতুন সরা, দুধ সব ঠিক আছে, যেন গরম করে মালতী দুধটুকু খেয়ে নেয়। দুধটুকু গরম করে দিতে জোটন সাহস পাচ্ছিল না। কারণ হিন্দু বিধবার আচার-নিয়ম অনেক। জোটন সব ঠিক করে রেখেছে। কাঠ, উনুন, নতুন পাতিল সব। যেন বলার ইচ্ছা, এই যে মেয়ে তুমি এত কাল যৌবন বাইন্দা রাখছ, স্বপ্ন দ্যাখছ, সোয়ামির মুখ দেইখা মামদোবাজি খেলা খেলছ—আর এখন কিনা কিছু জান না। অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা—কি আছে, আর যা হইবার হইছে। এডা ত আর হাড়ি-পাতিল

না। এডা তো সোনার অঙ্গ। ছুঁইয়া দিলে জাত যায় না। কার জাত! তোমার না মানুষের? জোটন নানাভাবে মালতীকে বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছিল। —ওঠ মালতী, উইঠা খা। দুধ গরম কইরা খা।

মালতী উঠল না। শক্ত হয়ে পড়ে থাকল।

জোটন ফকিরসাবকে বলল, কি করন যায়?

—কি করতে কন?

—নরেন দাসরে একটা খবর দিতে হয়।

—তবে দ্যান।

—আমি দিমু কি কইরা? আমি একলা যাইতে পারি! জোটন ক্ষোভের গলায় বলল।

—এই যে কইলেন, পানিতে নাও ভাসাইলে আপনে লগি বাইবেন। দুগ্‌গা ঠাকুর দ্যাখতে যাইবেন কইলেন।

—তামাশা রাখেন। কি করবেন কন!

—আমি কি কমু?

—যা মনে লয় করেন। বলে জোটন বিরক্ত মুখে ছইয়ের নিচে ঢুকে বলল, ওঠ মালতী। লক্ষ্মী, আমার সোনা। দুধ গরম কইরা খা। তারপরে ল তরে দিয়া আসি।

মালতী এবার বিস্ময়ের চোখে তাকাল।

—তরে দিয়া আমু।

মালতী ধড়ফড় করে উঠে বসল।

—আমি আর ফকিরসাব তর লগে যামু।

মালতী দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকল। এ-পোড়ামুখ নিয়ে সে যাবে কী করে! সে ভিতরে ভিতরে হাহাকারে ডুবে যাচ্ছিল। না না, আমি কোথায় যাব! কার কাছে যাব! আমি যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব জোটন। আমি জলে ডুবে মরে যাব।

—কি হইছে তর? কিছু হয় নাই।

এই প্রথম কথা বলল মালতী। —আমি কই যামু?

ফকিরসাব এবার গাছতলা থেকে এলেন। —যাইবেন না তো খাইবেন কি? আমি ফকির মানুষ। গাছপাতা খাইয়া বাঁচি, আপনেরে কোনখান থাইকা দুধ ঘি আইনা খাওয়ামু?

মালতী এই মানুষের মুখ দেখে ভয়ে ফের বিবর্ণ হয়ে গেল। পাকা দাড়ি থেকে এখন জল টপটপ করে পড়ছে। ভিজা গামছা পরে বসে আছেন। হাতে গলায় বড় বড় পাথরের মালা। রসুন গোটার তেলে কাজল, সেই কাজলে সুর্মা টেনেছেন ফকিরসাব। জোটন ছইয়ের ভিতর বসে হাসছিল। ফকির সাব তেড়ে আসার মতো মাচানের কাছে উঠে এলেন। বললেন, ওঠেন কইতাছি। ওঠেন। সান করেন, দুধ গরম কইরা খান। বুড়া মানুষ আমি, পানি ভাইঙা সাঁতার কাইটা দুধ লইয়া আইছি। তাইন এখন খাইবেন না?

মালতী নড়ল না।

ফকিরসাব এবার চোখ গরম করে চোখ লাল করে ভয় দেখালেন মালতীকে। — খাইবেন না আপনে! আপনের চোদ্দ গুষ্ঠি খাইব। বলে, ফকিরসাব আস্ত একটা কাঠ এনে বললেন, ওঠেন। আমি কিন্তু পাগল মানুষ। এহনে সান কইরা দুধ গরম কইরা না খাইলে আগুন লাগাইয়া দিমু।

জোটন ফকিরসাবের কথায় সায় দিল। আ ল ওঠ তুই। পাগল ক্ষেইপা গেলে রক্ষা নাই। তুই না খাইলে সব ফিরা পাবি? পাইলে আমি তরে খাইতে কইতাম না। ওঠ।

ফকিরসাব বললেন, কার অঙ্গ! অঙ্গ আপনের, সোনার অঙ্গে কালি লাগলে ধুইয়া ফেলান। সোনার অঙ্গে কালি কতক্ষণ লাইগা থাকে! ঠাইরেন, গাঙ্গের পানিতে কত কিছু ভাইসা যায়, কিন্তু ঠাইরেন, মা জননীর কি কিছু হয়? যেন ফকিরসাবের বলার ইচ্ছা, মাগো জননী, নদীতে এঁটো থাকে না, বরফে এঁটো থাকে না। মাগো জননী, আপনেরা নিজের জলে নিজে ধুয়ে যান।

তবু মালতী উঠল না। ছইয়ের নিচে নেমে এল না! মাথা গুঁজে এক কোনায় বসে থাকল।

জোটন ফকিরসাবকে বলল, কি করবেন। চোখ মুখ কই গ্যাছে গিয়া। ক'দিন না খাইয়া আছে কে জানে। কিছু ত কয় না।

ফকিরসাব বললেন, যাই একবার। পানি ভাইঙ্গা যাই। বড় মিঞার কোষা নাওটা আনতে পারি কি না দ্যাখি! তারপর চলেন আল্লার নামে তরী ভাসাই।

এক ক্রোশ পথ সাঁতার কাটলে ডাঙায় হাঁটলে সেই দুই-চার ঘর বসতি। পথে যেতে যেতে একবার বমি করলেন ফকিরসাব। এই বর্ষা এলে বড় অনটন ফকিরসাবের। দুই ছাগল, তার দুধ আর শাপলা শালুক। এখন জল সাঁতরে মুশকিলাসান নিয়ে যেতে পারেন না, যা কিছু পান ইন্তেকালের সময়। শাপলা শালুক খেয়ে পেট কেমন ভার হয়ে আছে।

কোষা নৌকা নিয়ে আসতে আসতে বেলা হয়ে গেল ফকিরসাব কিছু খেলেন না। জোটন এক বদনা পানি ঢক ঢক করে খেল। দুধটুকু সঙ্গে নিল। সরা এবং কাঠ সব তুলে নিল পাটাতনে। একটা মাটির উনুন পর্যন্ত। সব ঠিক করে ফকিরসাধ বললেন, ঠাইরেন,

মা জননী, ওঠেন আইসা। ছাগল দুটোকে এনে মাচানের নিচে বেঁধে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এবার কিন্তু জোটন মালতীকে তুলতে গিয়ে দেখল, উঠতে পারছে না মালতী। কোমরে ভীষণ ব্যথা। রসুন গোটার তেল এক শিশি নিল সঙ্গে। মালতীকে বলে দিল এটা যেন বাড়িতে মালিশ করে।

জোটন মালতীকে শক্ত করে ধরল। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। কি চেহারা হয়ে গেছে! চোখমুখে কালি পড়ে গেছে। সোনার অঙ্গে কে আগুন ধরিয়ে চলে গেল! জোটন ভয়ে এখন মালতীর দিকে তাকাতে পারছে না। যেন আত্মহত্যার কথা ভেবে এই মেয়ে এখন বসে আছে। সুযোগ সুবিধা পেলেই আত্মহত্যার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভিতরে ভিতরে কষ্ট ফকিরসাবের। ফকির মানুষ বলেই অসুখ বিসুখ থাকতে নেই। জোটন এসে একদিনও মানুষটাকে অসুস্থ দেখেনি। এই সকালে পেটে এমন গণ্ডগোল— কিন্তু কারে বলা যায়? ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি হচ্ছে, কি যে এই পেটের ভিতর হচ্ছে জ্বালা মতো এক ভাব, তিনি যেমন অন্য সময়ে লতাপাতার রস খান, তেমনি বনের ভিতর ঢুকে দু'হাতে পাতা কচলে মুখের ভিতর কিছু রস ফেলে দিলেন। এই রস খেলেই শরীরের সব যন্ত্রণা মরে আসবে। ধীরে ধীরে নিরাময় হবেন তিনি।

ফকিরসাব জোটনকে বললেন, আপনে দুধটা না হয় অন্য কিছু মুখে দিয়া লইতে পারতেন। আমার খিদা নাই।

জোটন বলল, কি কইরা খাই কন। মালতী খাইল না। আমি খাই কি কইরা!

ফকিরসাব এবার খোলামেলা জায়গায় মালতীকে ভালো করে দেখলেন। সত্যি ওকে ভালো দেখাচ্ছে না। ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে দিলেন, যেন জোটন ওকে ধরে বসে থাকে। লক্ষণ ভালো না! কী যে হবে! কী যে করা! এখন এই যুবতীর মাথা ঠিক নেই। পাগল পাগল চেহারা। যুবতী নারী সতী হলে যা হয়। নদীর পাড়ে ফকিরসাব বালক বয়সে এক নারীর সতী হবার গল্প শুনেছিলেন। গল্পের সেই চোখ-মুখের চেহারা এই মালতীর চোখে মুখে। সারাক্ষণ বসে বসে কেবল আত্মহননের কথা ভাবছে।

জোটন মালতীকে কোষা নৌকার মাঝখানে বসাল ফকিরসাব মুশকিলাসানের লম্ফ নিলেন সঙ্গে। যখন বের হয়েছেন, দু'চারদিন কি দু'চার হপ্তাও হতে পারে। গাঁয়ে গাঁয়ে লম্ফ নিয়ে ঘোরা যাবে। কোষা নৌকা আনতে গিয়ে বলেছেন ফকিরসাব, যেমন বলে থাকেন, যামু একবার বিবিরে লইয়া, নদী-নালায় কয় রাইত ভাইসা থাকমু, তেমন এবারেও বললেন, লম্ফ নিয়া যাইতেছি পেটে টান পড়ছে বিবির। আর কি য্যান কয়, বিবি কয় বাপের বাড়ি দুগ্‌গা ঠাকুর দ্যাখতে যাইব। তা একবার দ্যাখাইয়া আনি। ফকিরসাব ইচ্ছা করেই মালতীর কোনও খবর কাউকে বলেননি। এমন খবর পেলে লোকজন ছুটে আসত দরগায়। তবে এই দরগাতেই থানা পুলিস আরম্ভ হয়ে যাবে। অথবা নাও হতে

পারে। কারণ এখন জাত মান কুল নিয়ে কথা। মালতীর মুখে চোখে সেই জাত মান কুলের কলঙ্ক লেপ্টে আছে অথবা সে এক কলঙ্কিনী যেন কী যে হয়, কী যে হয়, কী যেন তার কেবল জলে ভেসে যায়। রঞ্জিত, ছোট ঠাকুর, নরেন দাস এবং গ্রামের সকলে ওর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। এই মেয়ে বনবাসে যাবে। এই মেয়ের জাত মান নেই। কলঙ্কিনী।

এমন সব কথা মনে আসছিল মালতীর।

সহসা ফকিরসাব দেখলেন পাটাতনে মালতী অঝোরে কাঁদছে। এটা ভালো। কেঁদেকেটে আকুল হলে মনের সব গ্লানি মরে আসবে। আবার ধরণী সুজলা সুফলা মনে হবে।

মালতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যেন মনে মনে রঞ্জিতকে উদ্দেশ করে বলা, ঠাকুর, আমার সব হরণ কইরা নিছে। তোমারে কি দিমু ঠাকুর।

সারারাত শকুনের মতো তাকে নিয়ে কারা যেন কাড়াকাড়ি করেছিল। বোধ হয় আকাঙ্ক্ষা সব জলের মতো মরে যাচ্ছিল। কেবল পিচ্ছিল রক্তাক্ত শরীরে কারা যেন সারারাত নৃত্য করে গেছে ভূতের মতো। তিন অমানুষ নরকে ডুব দেবার লোভে পশুর মতো হামলে পড়ে ছিল—আর সেই অসংখ্য কালো সরীসৃপ সারারাত ওর শরীরের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছিল। যার শেষ নেই, শেষ হবে না। আঁচড় কামড়ে, খাবলে খুবলে কোথা থেকে কোথায় যে টানতে টানতে নিয়ে গেল, মালতী এখন কিছুতেই তা মনে করতে পারছে না। কেবল মনে পড়ছে তারা সেই কবরভূমির অন্ধকারে মাংসের লোভে কোনও শেয়াল যেমন মৃত মানুষের গন্ধে কবরে ঢুকে যায়—ওরা তেমনি পারলে ওর শরীরের ভিতর সদলবলে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। মালতী এখন কষ্ট পাচ্ছে। হাত দিতে পারছে না। বসতে পারছে না মালতী। ফুলে ফেঁপে আছে। আর বেহুঁশ শরীবের ওপর সেই সব দৃশ্য ভাবতেই গলা থেকে ওক উঠে এল।

ফকিরসাব দেখলেন মালতী ওক দিচ্ছে।

জোটন বলল, না খাইলে বমি হইব না, কন!

মালতী কেবল ওক দিচ্ছে। এখন আর অঝোরে কাঁদছে না। ধানখেতের ভিতর ফকিরসাব লগি মারছেন। লগি মারতে মারতে মাঠের ভিতর নেমে এলেন। সূর্য ক্রমে মাথার ওপর উঠে আসছে। গায়ের জোব্বা খুলে নিয়েছেন। কেবল এক নেংটি পরনে ফকিরসাবের। গলায় এবং হাতের কব্জিতে, কনুইতে সেই সব পাথরের মালা তাবিজের শব্দ। এবং মনে হয় তিনি যেন এক প্রাচীন পুরুষ, তপোবনে মহর্ষি কণ্বদেব, শকুন্তলাকে নিয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন। যে কোনও ভাবে গ্রামে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। ভিতরে ভিতরে হাঁসফাঁস করছেন, কিন্তু কাউকে কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছেন না। বেহুঁশের মতো লগি মারছেন কেবল।

জোটন বলল, মালতী ইট্টু দুধ খা। মালতী, না খাইলে ত তুই মইরা যাইবি।

মালতী কিছু বলল না। ওক দিতে দিতে পাটাতনে শুয়ে পড়ল।

এত দূরের পথ লগি মেরে এ বয়সে যে আর পার হওয়া যায় না, মাঠে নেমে যেন তিনি তা ধরতে পারছেন। সোজা পথে পাড়ি দিলেও রাত অনেক হয়ে যাবে। জল নেমে যাচ্ছে। ভাদ্র মাসের শেষ থেকেই জল নামতে শুরু করে। সোজা পথে যাওয়া যাবে না। মাঝে মধ্যে ডাঙা ভেসে আছে। মেঘনাতে পড়ে বাদাম দিলে পথ ঘুরতে হবে বেশি। তিনি বরং সনকান্দার পাশ দিয়ে নৌকা বাইবেন। গড়ি পরদির মঠ পার হয়ে নদীতে পড়তে পারলে আর কষ্ট হবে না। জলে উজানি স্রোত মিলে যেতে পারে। তবু ভিতরে ভিতরে কষ্ট। জ্বালা। পাতার রসে পেটের জ্বালা মরছে না। কেমন গলা এবং বুক শুকিয়ে উঠছে।

জোটন বুঝতে পারছিল মানুষটার কষ্ট হচ্ছে। সে তামুক সাজল। মানুষটা তামুক টানলে আবার গতরে শক্তি পাবে। সে ফকিরসাবকে তামাক খেতে দিয়ে নিজেই লগি বাইতে থাকল।

জোটন বলল, মালতী ত দুধ খাইল না। আপনে খান। খাইলে বল পাইবেন। এত দূরের পথ না হইলে যাইবেন কি কইরা!

—না গ বিবি, তা হয় না। বলে ঢক ঢক করে বর্ষার জল তুলে এক গলা খেয়ে ফেললেন।

এই ফকিরসাব এবং জোটন মালতীর জন্য প্রাণপাত করে যাচ্ছে। দরগায় কোন অমানুষ ফেলে রেখে গেল মালতীকে মালতী কিছুই বলছে না, কিছু বললে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন ভেসে উঠলে মালতী মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। দরগায় এমন একটা কাণ্ড, ফকিরসাব মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবলেন। তিনি তো রাতে কবরভূমিতে লম্ফ জ্বেলে ঘোরাফেরা করেন, দূরের মানুষেরা কবরভূমিতে সেই আলখাল্লা পরা মানুষের হাতে মুশকিলাসান দেখলে ভয়ে পালায়, আর কোথাকার কোন্ বেজম্মা মানুষ দরগা অপবিত্র করে রেখে গেছে। সব দায় যেন এখন ফকিরসাব আর জোটনের। মানুষ না মরলে, ইন্তেকাল না হলে ফকিরসাবের দাম বাড়ে না। দিনে দিনে তার অন্নাভাব বাড়ছে। দুধটুকু পাটাতনে রেখেছে জোটন। এত পীড়াপীড়িতেও দুধটুকু খাচ্ছে না মালতী। কি দামী আর মহার্ঘ বস্তু এই দুধটুকু। একটু দুধ উপচে পড়লে রাগে হাত পা কাঁপছে ফকিরসাবের।

প্রথম ফকিরসাব ঘাট চিনতে ভুল করলেন। অনেক দিন তিনি এ অঞ্চলে আসেননি! নবমীর চাঁদ ডুবে গেছে! নিঝুম মনে হচ্ছে। আঁধারে ধানখেতের ভিতর সেই এক কোড়াপাখির ডাক। দূর থেকে— প্রতাপ চন্দের দুর্গোৎসবের ডে-লাইট চোখে পড়ছিল। এখন নাও সোনালী বালির চরে। চর থেকে ফকিরসাব আলো লক্ষ করে এগোচ্ছেন। চোখ-মুখ ঘোলা। হাত পা শিথিল হয়ে আসছে। অন্ধকারে হড়হড় করে বমি উঠে এসেছে।

সবার অলক্ষ্যে তিনি বমি করে মুখ ধুলেন। যেন জলে কুলকুচা করছেন এমন শব্দ অন্ধকারে। গাছের ফড়িং ধানের ফড়িং অন্ধকারে উড়ে এসে পড়ছে। প্রতাপ চন্দের ঘাট পার হয়ে এসে নরেন দাসের ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে ফকিরসাব বললেন, আপনেরা নামেন।

মালতী সেই পাটাতনে শুয়েছিল আর ওঠেনি। কোথায় এই নৌকা ভেসে যাচ্ছে, কিসের উদ্দেশে ফকিরসাব নৌকা বাইছেন, জোটন হাল ধরেছে, সে যেন বুঝতে পারছে না। ঘাটে এসে নৌকা ভিড়লেই ওর সংবিৎ ফিরে এল। আরে, এই ত সেই ঘাট। সে এখানে হাঁস ছেড়ে সকালবেলা বসে থাকত। মাথার উপর একটা কদম ফুলের গাছ। গাছে কি অজস্র ফুল ফুটে থাকে বর্ষায় অথচ এই দু'তিনদিনে তার কাছে এরা সবাই যেন অপরিচিত, সে একটা নতুন দেশে এসে গেছে।

এমন আঁধারে সহসা খবর দেওয়ার একটা বিড়ম্বনা আছে। আজ কতদিন মালতী নিখোঁজ কে জানে। সহসা নেমে নরেন দাসকে ডাকলে সে হাউমাউ করে চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারে। মালতীকে দেখলে পাড়ার লোক জড়ো করে ফকিরসাবকেই বেঁধে রাখতে পারে তুমি তারে পাইলা কোনখানে? আরে মিঞা, মনে মনে তোমার এই খোয়াব আছিল! শেষে উপকার করতে এসে দায়ে অদায়ে ফেঁসে যাওয়া। সুতরাং কাজটা নির্বিঘ্নে করার জন্য গা মুছে ফেললেন ফকিরসাব। মুশকিলাসানের লম্ফ থেকে—যা তিনি অন্য সময় হলে করতেন অর্থাৎ মুখে চোখে তেল কালি মেখে বীভৎস করে ফেলা—এ সময়ে তিনি সেই সাজে সাজতে চাইলেন। যেন তিনি এই গ্রামে মালতীকে নিয়ে আসেননি, মুশকিলাসানের লম্ফ নিয়ে এসেছেন। বাড়ি বাড়ি উঠে যাবার মতো আলখাল্লা গায়ে দিয়ে সারা মুখে কালি লেপ্টে দিতেই চোখ দুটো বড় বড় আর লাল দেখাতে থাকল। তিনি এখন যথার্থ আর এ দুনিয়ার মানুষ নন। মালা তাবিজের ভিতর, কালো শতচ্ছিন্ন আলখাল্লার ভিতর, এখন এক হারমাদ মানুষ। হাতের মশালে ইচ্ছা করলে যেন এই গাছপালা, পাখি সব ভস্ম করে দিতে পারেন। অথবা তিনি যেন সেই মানুষ দূরে দূরে হেঁটে যান, হাতে মশাল, কিসের উদ্দেশে তিনি যেন ক্রমাগত হেঁটে যাচ্ছেন। আসমানকে আলো দিচ্ছেন, দু'লাফে ইচ্ছা করলে সমুদ্রে চলে যেতে পারেন। প্রায় এখন এক অলৌকিক মানুষের মতোই টলতে টলতে হাতে লম্ফ নিয়ে দাসের বাড়ির দিকে উঠে যেতে থাকলেন। এখন তাকে মনে হয় এক মানুষ, সেই যেন চাঁদবেনের পুত্রবধূ অথবা ঈশা খাঁর সোনাইবিবির মতো এক কিংবদন্তীর মানুষ! নিশুতি রাতে এমন কে গৃহস্থ আছে যার বুক এই মানুষের হাঁকে না কেঁপে ওঠে। তিনি তখন যথার্থই আর মানুষ থাকেন না। রসুলের মতো যেন আকাশ মাটি এবং মাঠের অন্ধকার ভেদ করে উঠে আসেন। কিন্তু ফকিরসাব ভিতরে ভিতরে শক্তি পাচ্ছেন না। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছেন। তবু রাতের আঁধারে সকলকে ভয় দেখাবার নিমিত্ত (হাতে পায়ে শক্তি নেই, পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে) তিনি কিছুই পরোয়া না করে প্রায় মাটি ফুঁড়ে ওঠার মতো হেঁকে উঠলেন—মুশকিলা সা...ন আসান করে। মনে হল তাঁর যত জোরে হেঁকে ওঠার কথা ছিল, তিনি যেন গলা থেকে তত জোরে হাঁক দিতে পারলেন না। আরও জোরে, এ তল্লাটের সব মানুষের বুক কাঁপিয়ে হাঁক দিতে হয়—আমি

এক মানুষ, যার নিবাস আস্তানাসাবের দরগাতে, যার কাম কাজ ইন্তেকালের সময় মোমবাতি জ্বালানো আর গাছের মগডালে আলো জালিয়ে অলৌকিক এক জীবনের ভিতর ঘুরে বেড়ানো। মা জননীরা, জন্ম-মৃত্যুর মতো এই বেঁচে থাকাও অলৌকিক এক ঘটনা আর ঈশ্বরের মতো সুখদুঃখের জীবনে মুশকিলাসান আসান করে মা জননীরা বলে তিনি প্রায় তাঁর যৌবনকালের মতো বুক চিতিয়ে হাঁটতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। কিছুটা গিয়েই তিনি কেমন হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। লম্ফটা তিনি কিছুতেই লাঠির ডগা থেকে নামাচ্ছেন না। ওঁর হাঁটু দুর্বল হলে লাঠি আর লম্ফতে তিনি শক্তি খোঁজেন। তিনি হামাগুড়ি দিতে পারতেন, দিলে ভালো হতো—ওঁর বমিটা বুঝি তবে হড়হড় করে আবার উঠে আসত না। কিন্তু বমিটা হড়হড় করে উঠে এলেই বিবি তাঁর দেখে ফেলবে, ফকির মানুষের আবার ব্যামো কি তিনি তাড়াতাড়ি আলোটা মাথার ওপর তুলে নিয়ে নিচে যে অন্ধকার মিলে গেল সেই অন্ধকারে বমিটা সেরে ফের এগুতে থাকলেন। জল আর শাপলা উঠে আসছে পেট থেকে। আশ্বিনের টানে পচা জল নামছে নদীতে, সেই জলের গন্ধ পর্যন্ত উঠে এল ওকের সঙ্গে।

নরেন দাস দরজা খুলে দেখতে পেল উঠোনের ওপর ফকিরসাব। হাতে সেই মুশকিলাসান। উঁচু লম্বা মানুষ। মাথায় পাগড়ি। সাদা চুল, সাদা দাড়ি, মুখ কালো, চোখ লাল। আলোটা গনগন করে মুখের কাছে জ্বলছে। কেমন চোখ ঊর্ধ্বনেত্র। স্থির। বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণের মতো গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য নানা রকমের বয়াৎ। লাল নীল হলুদ রঙের পাথর গলাতে ঝুলছে। সেসব পাথর চকচক করছে। শোভা, আবু দরজার বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছে। পিসি নিখোঁজ হবার পর থেকে রাতে কোনও শব্দ হলেই ওরা জেগে যায়। নরেন দাসের চোখে ঘুম নেই। কারা যেন বাড়িটার চারপাশে ফিসফিস করে কথা বলে বেড়াচ্ছে।

নরেন দাস কাছে গেলে একটা কাঠিতে সামান্য কাজল তুলে টিপ দিল কপালে। দাস একটা পয়সা ফেলে দিল লম্ফের ভিতর। মাটির লম্ফ। ছোট ছোট মুখ লম্ফের। এক মুখে আলো, অন্য মুখে কাজল, এবং আর একটা মুখে পয়সা ফেলার ফোকর। নরেন দাস ফোঁটা নেবার জন্য আভারানীকে ডাকল, শোভা আবুকে ডাকল। ওরা ফোঁটা নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলে খপ করে অন্ধকারের ভিতরে হাতটা চেপে ধরলেন ফকিরসাব —দাস, আপনের বইনের খোঁজ আছে।

—আমার বইনের খোঁজ!

—আছে। মা লক্ষ্মীরে আমি দরগার মাটিতে পাইছি।

—কি কন আপনে! অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠতে চাইল দাস।

—হ, পাইছি। মায় আমার বনদেবীর মত আর্তনাদ কইরা ছুটছিল। চিৎকার—বাঁচান বাঁচান। কেডা আছেন আমারে বাঁচান।

—আপনে বাঁচাইলেন!

—বাঁচাইলাম। বলেই আকাশ ফুঁড়ে দিতে চাইলেন যেন হাঁক, —পীর মানুষ দরবেশ মানুষ আমি, এই দ্যাখেন ফুস মন্তরে হাজির মা জননী, আমার সামনে হাজির। জননীরে কেউ অসতী করতে পারে নাই—ফকিরসাব মালতীর জন্যে মিথ্যে কথা বললেন। তারপরই সঙ্গে সঙ্গে ওক উঠে এল। লম্ফ ওপরে তুলে দিলেন। নিচে ছায়া ছায়া অন্ধকার। নরেন দাস একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন তামাশা দেখছে। সামনে মালতী নেই। কেউ নেই। সাধু সন্ত পীরের সামনে যেন দানের প্রতীক্ষায় দাস দাঁড়িয়ে আছে, এমন একটা ভাব মুখে। পীর সাহেব মুখটা আলখাল্লার ভিতর লুকিয়ে ওক দিয়ে কি সব বার করছেন, টক দুর্গন্ধে সামনে যাওয়া যাচ্ছে না।

এসব দেখে নরেন দাস কেমন হাবা গোবা মানুষ হয়ে গেল। ফকিরসাবের অনেক হিম্মতের গল্প সে শুনেছে। এবার সে এই হিম্মত দেখে বুঝি আশ্চর্য বনে যাবে। যা অবিশ্বাস্য, এই মানুষ বলছে মালতীকে পাওয়া গেছে। সে কেমন বিহ্বলভাবে আবুর মাকে ডাকছে, শুনছ আবুর মা, মালতীরে পাওয়া গেছে। ফকিরসাবের সামনে আছে। তুমি আমি দ্যাখতে পাইতাছি না।

নরেন দাসের চোখমুখ দেখে ফকিরসাব বুঝতে পারলেন ওর হাঁকডাকে কাজ হচ্ছে। রহস্যজনক ভাবে ওরা ফকিরসাবকে দেখছে। যেন মানুষটা এখন এইমাত্র আকাশ থেকে নেমে এসেছে। উঠোনের ও পর দাঁড়িয়ে ওদের ডেকে তুলে বলছেন—এই নাও মালতীরে। দিয়া গেলাম। লম্ফটা এত বেশি জ্বলছে যে মুহূর্তে এই বাড়িময় আগুন ধরে যেতে পারে, সব দিকে আলোতে আলোময়। কেবল পুবের দিকে ঠিক কুলগাছের নিচটা অন্ধকারে ডুবে আছে। ফকিরসাব পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কুলগাছের নিচে অন্ধকারে মালতীকে ধরে জোটন দাঁড়িয়ে আছে।

ফকিরসাব পাওয়া গেছে কথাটাকে বিশ্বাস করানোর জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লার মতো অথবা বিসমিল্লা রহমানে রহিমের মতো বলতে থাকলেন, দাস মায় আমার বনদেবীর মত ছুইটা যায়, কি ত্বরিতে ছুইটা যায়! তখন নদীর জলে স্রোত থাকে না, তখন পাখি বনে কূজন করে না, ময়নামতির হাটে তখন দোকানি লম্ফ জ্বালে না—মায় আমার দাস, ছুইটা গ্যালে গ্রাম মাঠ গাছপালা পাখি সব হায় হায় করতাছিল। দাস, আমি তাইনরে তুইলা আনলাম।

মালতী কুলগাছের অন্ধকার থেকে সব শুনছে। জোটনের ফকিরসাব, মেলাতে বান্নিতে যে মানুষ গাজির গিদের বায়ানদারের মতো হেঁটে বেড়ায়, যে মানুষ পীর দরবেশ বনে যা বার জন্য মেলাময় ঘোড়দৌড়ের বাজিতে ছুটে বেড়ায়, সেই মানুষ অভাগী মালতীর জন্য মিছা কথা কয়।

আভারানী ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, ফকিরসাব, তাইন কোনখানে? সামনে কিছু দ্যাখতে পাই না ফকিরসাব।

—আছে। যদি দোষ না নেন, হাজির করি।

নরেন দাস বলল, মিছা কথা কইবেন না ফকিরসাব। বিশ্বাস হয় না।

—হয়। বলে ফকিরসাব ডাকলেন, মায় কইগ আমার! বেলত লাকু লত লায় মায আমার যেইখানে থাকেন এ কবার আবির্ভূতা হন মা। বলে লম্ফের সলতে উসকে দিতেই পেটে আবার কামড়। তলপেট শক্ত হয়ে আসছে। ক্রমে কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন ফকিরসাব। কিছুতেই আব সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। মনে হচ্ছে তাবৎ সংসারের ধর্মাধর্ম এই মুহূর্তে পেটের ভিতর বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবু কোনও রকমে চোখ তুলে তাকালেন। হাসলেন জোরে। হাত পা ছুঁড়ে বললেন, আসেন, আসেন, —মা জননী, আসেন। আসমানে থাকেন, বাতাসে থাকেন নাইমা আসেন। প্রায় যেন ভোজবাজির খেলা দেখাচ্ছেন ফকিরসাব। প্রায় যেন এই গভীর রাতে কেউ যখন জেগে নেই তখন ফকিরসাব ভোজবাজির মতো নরেন দাসের উঠোনে খেলা দেখিয়ে দিলেন। প্রতিবেশীরা যে যার ঘরে। দীনবন্ধুর বৌ এবং দীনবন্ধু, ওর দুই ছোট-বড় বৌ টেব পেয়েছে, ফকিরসাব মুশকিলাসানের লম্ফ নিয়ে এসেছেন। ত খন দেবীর মতো মালতী উঠোনের অন্ধকারে হাজিব। আলোটা ঘুরিয়ে দিতেই আভারানী এবং নরেন দাস দেখল, ক্লান্ত মালতী, চোখ বুজে আসছে মালতীর, যেন পড়ে যাবে মাটিতে—ওরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতেই ফকিরসাব ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন। সুড়ুৎ করে টপকে কুল গাছ পার হয়ে চলে এলেন ঘাটে। জোটন সঙ্গে সঙ্গে গাবতলা পার হয়ে ঘাটে চলে এল। ফকিরসাব কোনওরকমে বললেন, জলদি নাও ভাসান পানিতে। দেরি করবেন না।

অন্ধকার পাটাতনে মলমূত্রে কাপড় ভেসে যাচ্ছিল। ফকিরসাব কিছু বললেন না জোটনকে। পেট সাফ হয়ে নেমে যাচ্ছে। তারপর কেবল শুধু মল, মূত্রের দেখা নাই। জোটন দুর্গন্ধে বসতে পারছে না। নদীর মুখে নৌকা ছেড়ে দিতে পারলে ভাটি পাওয়া যাবে। ফকিরসাব সেই ভাটিতে নৌকা ছেড়ে দিতে বললেন। আর কিছু বলতে পারছেন না। ওলাওঠাতে এখন প্রাণ সাবাড়ের সময়। স্রোতের মুখে নাও ছেড়ে বসে থাকতে পারলে ভাটি পাওয়া যাবে। শেষরাতের দিকে আলিপুরা গ্রাম পাওয়া যাবে। বাকি ক্রোশের মতো পথ নিশ্চয়ই জোটন রাত শেষ হতে-না-হতে দরগায় টেনে নিয়ে যেতে পারবে। স্রোতে এসে নৌকা পড়তেই ফকিরসাব কিছু কথা বললেন জোটনকে লক্ষ করে—বিবি, আমার প্রাণপাত হইতাছে। আমারে আপনে রাইত থাকতে দরগাতে তুইলা দিয়েন। সকাল হইলে হাউমাউ কইরা কাইন্দেন না। আলিপুরায় খবর দিবেন, ফকিরসাবের রাইতে ইন্তেকাল হইল। যদি কয়, রাইত কয়টায়?

জোটন বুঝতে পারছে না কেন এমন বলছেন তিনি। পাটাতনে এখন মানুষটা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাত দিতেই বুঝল, আলখাল্লা, জোব্বা সব ভেসে যাচ্ছে। জোটনের

ভিতরটা হায় হায় করে উঠল। সে বুক থাবড়ে বলল, রাইত কটায় কমু?

—রাইত দুই প্রহর শেষ না হইতে।

—তখন ত আপনে দাসের বাড়িতে আছিলেন।

—আপনের এত কথায় কাম কি বিবি। বলেই মানুষটার কথা বুঝি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

জোটন হাউ হাউ করে কাঁদতে চাইলে হাত তুলে ইশারায় ডাকলেন কাছে। জোটন মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকল। নাও জলের টানে দ্রুত নেমে যাচ্ছে। শুধু হালটা কোনওরকমে এক হাতে ধরে আছে জোটন। অন্য হাতে ধীরে ধীরে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে দিচ্ছে। ধুয়ে-পাখলে দিচ্ছে। খালি গায়ে মানুষটা লম্বা এই পাটাতনে হাত দুটো বুকে তুলে অপলক অন্ধকারে কি যেন দেখছেন। কাছে গেলে বললেন, কাইন্দেন না। ভাল না লাগলে দরগায় যাইবেন না বলতে বলতে ফকিরসাবের গলা বসে আসছে।

অন্ধকারে নদীর জল ধূসর। গ্রামে মাঠে জোনাকি জ্বলছে। জোটনের কেন জানি মানুষটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হল। আকাশে কত নক্ষত্র জ্বলছে। অন্ধকারে কত সব নক্ষত্র যেন তাকিয়ে তাকিয়ে ফকিরসাবের ইন্তেকাল দেখছে। এতকাল থেকে এই মানুষ, এক মানুষ-দিন নাই রাইত নাই, মাঠে মাঠে বনে বনে অথবা অনাহারে দিন কাটিয়েছেন, কবে শোনা যায় কোন এক হত্যার দায়ে এই মানুষ তাঁর ঘর ছেড়েছিলেন। বিটি-বেটাদের ছেড়ে, জমি-বাড়ি গোলা এবং পুকুরের পাড়ে পাড়ে অর্জুন গাছ, ধানের গোলাতে পাখি উড়ে বেড়াত, সেই মানুষ খুনের দায় এড়াতে বরিশালের ভোলা অঞ্চল থেকে হেঁটে পাড়ি দিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন সংগোপনে এখানে সেখানে বসবাসের পর-আস্তানাসাবেব দরগাতে এক রাতের রাতযাপন। দূর থেকে মানুষেরা এসেছিল করব দিতে। কবরের কিছু মোমবাতি তিনি তুলে এনে এই বনের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে কখন বাজাবাদশার মতো, মনে মনে এক ইচ্ছা পূরণের পালা। দিন যায় রাত যায়, বনের পাখ-পাখালি এবং গাছ-পালা বৃদ্ধ মানুষটার কাছে ক্রমে দোসর হয়ে যায়। তিনি একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে ফেললেন। বরিশালের কোথায় নিবাস ছিল মনে থাকল না। তিনি একটা মাটির লম্ফ সংগ্রহ করলেন। কিছু হাদিস এবং ধর্মাধর্মের ছোট বড় কথা কী করে যেন গড়গড় করে বলে ফেলতে পারলেন। তারপরে মানুষটা আর খুনী মানুষ থাকলেন না। ফকির মানুষ বনে গেলেন।

এই মানুষের এখন ইন্তেকাল হচ্ছে। জোটন বলল, আপনের ডর নাই। ফকিরসাব আপনে মানুষ আছিলেন না, পীর আছিলেন। এই বলতেই কেমন সাহস এসে গেল তার প্রাণে। এই মানুষকে রাতে রাতে দরগায় হাজির করতে হবে। ঠিক যেখানে বড় নিম গাছটা আছে, উঁচু মতো ভিটা জমি, তার উপর শুইয়ে রাখতে হবে। যারা আউশ ধান কাটতে এদিকে আসবে নৌকা নিয়ে তারা দেখবে জোটন গাছের নিচে এক মরা মানুষ

নিয়ে জেগে আছে কে এই মানুষ—এই মানুষ ফকিরসাবের রাইতের বেলা ইন্তেকাল হইল। রাইতে মানুষটা নিজের ভিতর ডুব দিলেন। এই বয়স পর্যন্ত মানুষটার কোন রোগ-শোক জরা ছিল না। শেষ বয়সের এই জরাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। কিছুই যেন হয়নি, জোটন তাঁকে ধুয়ে পাখলে একেবারে নতুন মানুষ করে ফেলল। শরীরে কোন মল-মূত্রের গন্ধ থাকতে দিল না। ওলাওঠাতে প্রাণ গেছে বুঝতে দিল না। এইবেলা জোটনের কসম, আপনে পীর বইনা গ্যালেন ফকিরসাব!

বিকেলের রোদ এখন জানালায়। বৃন্দাবনী সব দরজা খুলে দিচ্ছে। এই ঘরে আয়নার সামনে অমলা কমলা এখন সাজবে। বারান্দায় অমলা কমলা দাঁড়িয়ে আছে। দূরে শীতলক্ষ্যার পাড়। পাড়ে পাড়ে কাটা মোষ নিয়ে যাচ্ছে যারা, অমলা কমলা তাদের দেখছিল।

বৃন্দাবনী ডাকল, বড় ঠাকুরানী, আসুন।

ওরা দেখল বৃন্দাবনী বড় আলমারি খুলছে। ওদের ফ্রক বের করছে। এখন সে ওদের চুল বেঁধে দেবে। বেলা পড়ে আসছে। অন্দরে ল্যাণ্ডো লেগে রয়েছে। ওরা বিকালে অন্যান্য বাবুদের বাড়ি ঠাকুর দেখতে যাবে। সঙ্গে যাবে রামসুন্দর। আর বৃন্দাবনী ডাকলেই ওদের যেন এক খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। মার্বেল পাথরের মেঝে—খুব একটা জোরে ছোটা যায় না। অথচ এই দুই মেয়ে কি সুন্দর মসৃণ মেঝের উপর ছুটতে পারে। বৃন্দাবনী ডাকলেই—ওরা ছুটে পালাবে, কারণ সে ওদের চুল এত আঁট করে বেঁধে দেয় যে মাথায় বড় লাগে।

সুতরাং বৃন্দাবনী আর ডাকল না। ডাকলেই ওরা পালাবে। সে পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে ধরে ফেলবে ভাবল। কিন্তু তার আগেই দুষ্টু মেয়েরা টের পেয়ে গেছে। ওরা সেই খেলায় মেতে গেল—ঠিক যেন ওরা ছোট্ট দুই পরী হয়ে যায়—ওরা মেঝের ওপর সন্তর্পণে পা টিপে টিপে হাতের অদ্ভুত ব্যালেন্স রেখে ছুটতে থাকে—ঠিক ব্যালেরিনা যেন। হাত তুলে নদীর পাড়ে অথবা অদ্ভুত কায়দায় ওরা যেন ক্ষণে ক্ষণে মসৃণ বরফে পা তুলে তুলে নাচে। তখন বৃন্দাবনীর রাগ হয়। সে কেন ওদের ছুটে ধরতে পারবে! তখন সে অভিমান করে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলে না। মুখ দেখলে ওরা টের পায় সে রাগ করছে। তখন

ওরা আর দেরি করে না। এসে ধরা দেয়। কারণ এই বৃন্দাবনীর কাছেই ওরা শিশুবয়স থেকে বড় হয়ে উঠেছে।

অমলা বলল, আমি আজ চুল বাঁধব না পিসি।

বৃন্দাবনী কাজের ফাকে চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না।

অমলার ইচ্ছা ওর চুল ফাঁপানো থাকুক। ঘাড় পর্যন্ত বব করা চুল। চুলটা পিঠের নিচে নামলেই কেটে ফেলা ঠিক নয় বলার ইচ্ছে। এখন তোমাদের বয়স হচ্ছে মেয়ে। এই বয়সে চুল আর একটু বড় হতে দাও। আমি বেশ এঁটে বেণী বেঁধে দি। তবে চুলের গোড়া শক্ত হবে। মাথা থেকে, বড় হলে ঝুরঝুর করে চুল উঠে যাবে না।

অথচ ওদের মুখ ববকাটা চুলে বড় সুন্দর দেখায়। তাজা গোলাপের মতো। কতবার ভেবেছে মাথা ন্যাড়া করে দেবে, ন্যাড়া করে দেবে শুনলেই ওরা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। বৃন্দাবনীর তখন কষ্ট হয়। মেজবাবুকে আর চুল কাটা নিয়ে পীড়াপীড়ি করে না।

মেজবাবুকে বৃন্দাবনী যেমন ছোট থেকে বড় করে তুলেছে, যে যত্ন এবং সেবা ছিল প্রাণে—সেই যত্নে এই দুই মেয়ে বৃন্দাবনীর হাতে ক্রমে মানুষ হচ্ছে। ওরা ফের ছুটতে চাইলে বৃন্দাবনী ধমক দিল। রাগ করতে চাইল। দুমদাম আলমারির দরজা বন্ধ করে দিতে চাইল। মেয়েরা আসছে না। যে যার মতো সারা ঘরে ফের ছুটে বেড়াচ্ছে।

কলকাতার বাড়িতে হলে বৃন্দাবনী জোর ধমক দিতে পারত। কিন্তু এখানে সে কিছু করতে পারে না। কলকাতার বাড়িতে সে-ই সব। সে না থাকলে এই দুই মেয়ে মায়ের মতো ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ভিন্নধর্মী হতো। কি সুন্দর বাংলা বলে ওরা। পূজা-আর্চায় অগাধ ভক্তি। পূজা এলেই ওরা কবে দেশের বাড়িতে যাবে এই বলে মেজবাবুকে পাগল করে দেয়। সন্ধি পূজার সময় বাড়ির সব মেয়ের মতো করজোড়ে চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। মোষ বলি হলে রক্তের ফোঁটা কপালে, ফোঁটা দিলেই শরীরের সব পাপ মুছে যায়, শুধু তখন পবিত্র এক ভাব থাকে শরীরে। বৃন্দাবনী যেন ওদের মুখ দেখলেই টের পায়।

মেজবাবুর স্ত্রী এসব পছন্দ করেন না, করেন কি করেন না সেও সে ভালো করে জানে না, তবু প্রতিবারে ওঁদের পূজা দেখতে আসা নিয়ে একটা মনোমালিন্য এবং ক্রমে তা প্রকট হতে হতে কখন জানি ওঁরা দুজনেই পরস্পর দূরের মানুষ হয়ে যান। বৃন্দাবনী টের পায়—মেজবাবু ওদের নিয়ে স্টিমার ঘাটে নামলেই একেবারে সরল বালক, যেন কতদিন পর ফিরে আসা, কতদিন পর মুক্তি, নদীর পাড়ে নেমেই জন্মভূমিকে তিনি গড় হয়ে প্রণাম করেন, মেয়েদের বলেন, এই তোমার দেশ, বাংলাদেশ, এই তোমাদের পিতৃভূমি, তারপর চুপচাপ হাঁটেন। গাড়িতে উঠে তিনি বাড়ি যান না। চারপাশে নদীর জল, মাঠের ঘাস এবং সারি সারি পাম গাছের ছায়ায় নিজের বাল্যকাল স্মরণ করে কেমন অভিভূত হয়ে যান। এই পথে তিনি কৈশোরে কতদিন ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে পাড়ে কতদূর চলে গেছেন।

বৃন্দাবনী দেখেছে, এই নিয়ে কোনও বচসা হয় না, মেজবাবু কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে ক'দিন সকালে মহাভারত পাঠ করেন শুধু। সন্ধ্যায় ক্লাবে যান না। মেজবৌরানী তখন গীর্জায় যান। ফাদার আসেন বাড়িতে। দক্ষিণের দিকে যে দোতলা সাদা পাথরের হলঘর আছে সেখানে ফাদারের পায়ের নিচে তিনি বসে থাকেন।

এ বার অমলা দেখেছে, বাবা পূজার আগের ক'দিন মার ঘরের দিকে যাননি। মার মুখ ভীষণ বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত। রাতে বাবা নিজের ঘরে শুয়ে থাকেন। দুপুর রাতে সহসা বাবা ফ্লুট বাজান। কেন যে এমন হচ্ছে দু'জনের ভিতর—ওরা তা কিছুই অনুমান করতে পারত না। সকাল হলেই দু'বোন চুপ-চাপ স্কুলে চলে যায়। স্কুল থেকে এসে আর সারা বাড়িতে ছুটতে সাহস পায় না। মার মুখ বিষণ্ণ প্রতিমার মতো হয়ে গেছে। মা ক্রমে পাথর হয়ে যাচ্ছেন। এ-দেশে মা যেন বাবার সঙ্গে কিসের খোঁজে সমুদ্র পার হয়ে চলে এসেছিলেন। চোখ দেখলে মনে হয় তিনি তা পাননি। অথবা কখনও কখনও মনে হয় কোথাও তিনি কিছু ফেলে চলে গেছিলেন, এদেশে ফিরে আসায় তা আবার তাঁর মনে হয়েছে। তিনি সারাক্ষণ মাঠের দিকের বড় জানালাটায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঠ পার হলে সেই দুর্গ, দুর্গের মাথায় হাজার হাজার জালালি কবুতর উড়ছে। মা সে-সব দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। কী যেন খোঁজেন সব সময়।

এই যখন দৈনন্দিন সংসারের হিসাব তখন বৃন্দাবনী দুই মেয়েকে বাংলাদেশের মাটির কথা শোনায়। শরৎকালে শেফালি ফুল ফোটে, স্থলপদ্ম গাছ শিশিরে ভিজে যায়, আকাশ নির্মল থাকে, রোদে সোনালী রঙ ধরে—এই এক দেশ, নাম তার বাংলাদেশ, এদেশের মেয়ে তুমি। এমন দেশে যখন সকালে সোনালী রোদ মাঠে, যখন আকাশে গগনভেরি পাখি উড়তে থাকে, মাঠ মাঠে ধান, নদী থেকে জল নেমে যাচ্ছে, দু'পাড়ে চর জেগে উঠেছে, বাবলা অথবা পিটকিলা গাছে ছেঁড়া ঘুড়ি এবং নদীতে পোকা, তালের অথবা আনারসের, তখনই বুঝবে শরৎকাল এ-দেশে এসে গেল। তুমি অমলা এমন এক দেশে নীল চোখ নিয়ে জন্মালে। সোনালী রঙের চুল তোমার। তুমি যদি কোনওদিন কোনও হেমন্তের মাঠ ধরে ছুটতে থাক তবে তুমি এক লক্ষ্মীপ্রতিমা হয়ে যাবে। এমন মেয়েরা দুষ্টমি করে না। এস তোমার চুল বেঁধে দি।

বৃন্দাবনী ওদের এবার নিখুঁতভাবে সাজিয়ে দিন। ওরা যতক্ষণ সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে না গেল ততক্ষণ সে তাকিয়ে থাকল। ওরা ঘুরে ঠাকুমার ঘর হয়ে গেল কাকিমাদের ঘরে, দেখা করে গেল। মেজবাবু এই সংসারে ম্লেচ্ছ মেয়ে বিয়ে করার জন্য নানারকমের অবহেলা পাচ্ছেন—এই বলে হয়তো এই দুই মেয়ে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির একটা বড় অংশ দখল করে আছে অথচ কিছুই হয়তো শেষ পর্যন্ত পাবে না—এমন আশংকা থাকায়, কিছু করুণা কিছু ভালোবাসা এই মেয়েদের প্রতি কম-বেশি সকলের। ওরা এমন তাজা আর স্নিগ্ধ, এত বেশি অকারণ হাসে, আর এমন অমায়িক—মনে হয় কেবল দুই জাপানী কল দেওয়া পুতুল, কেবল হাত পা তুলে ঘুরছে- ঘুরছে-ঘুরছে। সুতরাং তারা নিচে নেমে গেলেই, কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে অন্দর।

ওরা ক্রমে নামছে, আর চারিদিকে তাকাচ্ছে। সোনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। একবার দুপুরের দিকে সিঁড়ির মুখে সোনাকে পেয়েছিল, কিন্তু কপালে রক্তের ফোঁটা দিতে-না-দিতেই ছুটে পালিয়েছে। সে যে গেল কোথায়!

নিচে নেমে দেখল খালেক মিঞা গাড়িতে বসে নেই। মাহুত জসীম এসেছে গাড়ি নিয়ে। পিছনে রামসুন্দর তকমা এঁটে দাঁড়িয়ে আছে।

অমলা খালেককে না দেখে বিস্মিত হল। বলল, তুমি জসীম!

—হ্যাঁ, মা ঠাইরেন। আমি।

—খালেক কোথায়?

—অর অসুখ মা-ঠাইরেন।

—কি হয়েছে?

—জ্বর, কাশি।

সকালের রামসুন্দর আর এই রামসুন্দরকে চেনাই যায় না এ-দিনের জন্য সে কারও বান্দা নয়। কেবল দেবীর বান্দা। কিন্তু যেই শুনেছে বড় খুকুরানী আর ছোট খুকুরানী যাবে পুজো দেখতে, অন্য বাবুদের নাটমন্দিরে যাবে, কুলীন পাড়ার ঠাকুর দেখতে যাবে—সে তখনই উর্দি পরে দৌড়েছে। এখন দেখলে মনে হবে রামসুন্দরকে সে দেবীর বান্দা আর বান্দা এই দুই মেয়ের।

রামসুন্দর নাগরা জুতো পরেছে, সাদা উর্দি পরেছে, কোমরে পেতলের বেল্ট। বেল্টের পাতে এই পরিবারের প্রতীকচিহ্ন। ওর মাথায় নীল রঙের পাগড়ি, জরির কাজ করা পাগড়ি দেখতে বুলবুল পাখির বাসার মতো। ভিতরটা উঁচু হয়ে টুপির মতো উঠে গেছে। সোনা এখন দেখলে বলত, রামসুন্দর তুমি কোন দেশের রাজা?

অমলা কমলা এসব কিছুই দেখল না। খুব গম্ভীর মুখে গাড়িতে উঠে গেল। বাড়ির দাসী বাঁদী অথবা ভৃত্যদের সামনে অথবা বের হবার মুখে কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, সে ভয়ে দুই বোনই একেবারে চুপচাপ পাশাপাশি বসে আবার চারদিকে কাকে যেন খুঁজল। সোনা যে কোথায়! অথবা এ অবেলায় সে কি ঘুমুচ্ছে! অমলার বলতে পর্যন্ত সাহস হল না ল্যাণ্ডো কাছারিবাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাও। এখানে এলেই কিছু আইনকানুনে পড়ে যেতে হয়। যেখানে সেখানে একা একা গেলে ঠাকুমা রাগ করেন। যে বাবা ওদের এত ভালোবাসেন তিনি পর্যন্ত অন্দরের বাইরে বের হতে দেখলে বলেন তোমরা এখানে কেন। ভিতরে যাও। অথচ কলকাতার বাড়িতে ওরা একেবারে স্বাধীন। মালীদের ছেলেরা ওদের হয়ে কতরকমের কাজ করে দেয়। পুতুলের ঘর বানিয়ে দেয়। এবং ওবা বাড়িময়, সেও তো বড় বাড়ি, বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি ছুটে শেষ করা যায় না, তেমন এক বাড়িতে ওরা

মানুষ হচ্ছে বলে এখানে এইসব নিয়ম মাঝে মাঝে ওদের খুব দুঃখী রাজকুমারী করে রাখে। অমলার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল সোনাকে নিয়ে পূজা দেখতে যায়। দু'বোনের মাঝে সোনা বসে থাকবে—কী যে ভালো লাগছে না, সোনার শরীরে চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে, এমন একটা গন্ধ যে সে পায় কোথায়? অথবা কেন যে মনে হয়েছে, গত রাতে দাতা কর্ণের পালা হয়েছে, বৃষকেতুর সেই সুন্দর উজ্জ্বল মুখ, টানা টানা লম্বা চোখ, ছোট মানুষ এবং কী অসীম পিতৃভক্তি, সোনা যেন ওর কাছে সারাক্ষণ বৃষকেতু হয়ে আছে। গত রাতে অমলা চিকের আড়াল থেকে দেখেছে, সোনা তার পাগল জ্যাঠামশাই-র পাশে বসে ছিল আসরে। যাত্রা দেখতে দেখতে সে পাগল জ্যাঠামশাইর হাঁটুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কী আশ্চর্য সেই মানুষ পাগল ঠাকুর! সারাক্ষণ শক্তভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে বসেছিলেন। হাত পা নড়লেই সোনার ঘুম ভেঙে যাবে। আর অমলা দেখছিল, ওদের পিসিরা অথবা কাকিমারা সবাই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে পাগল মানুষটাকে দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়লণ্ঠনে তখন নানারকমের লাল নীল আলো জ্বলছিল।

গাড়িটা ক্রমে গাছের ছায়ায় নুড়ি বিছানো পথে বের হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ে ক্লপ ক্লপ শব্দ হচ্ছে। দীঘির নিরিবিলি জলে কিছু পদ্মফুল ফুটে আছে। আর শরতের বিকেল মরে যাচ্ছে। নীল আকাশ, গাছের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র মানুষ দেখা যাচ্ছে নদীর পাড়ে। সবাই ঠাকুর দেখতে বের হয়ে পড়েছে।

অমলা কেমন বিরক্ত গলায় বলল, সোনাটা যে কি না!

—কেন কি হয়েছে?

—ওকে দেখছি না কোথাও।

অমলা দীঘির এ-পাড় থেকে ও পাড়ের কাছারিবাড়ি লক্ষ রাখছে। মঠের সিঁড়িতে সে যদি একা বসে থাকে, অথবা ময়ূরের কিংবা হরিণের ঘরগুলি পার হয়ে সে যদি কুমীরের খাদে উকি দেয়। না কোথাও গাছের ফাঁকে অথবা পাতার অজস্র বিন্দু বিন্দু জাফরিকাটা খোপের ভিতর সে সোনাকে আবিষ্কার করতে পারল না। তখন কমলা বলল, সোনা আর আমাদের কাছে আসবে না।

এমন কথায় অমলার বুকটা কেঁপে উঠল। —আসবে না কেন রে?

—ও রাগ করেছে।

—আমরা তো ওকে কিছু বলিনি।

—রাগ না করলে এমন হয়! আমাদের দেখলেই পালায়।

অমলার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে গেল। সোনা আবার কমলাকে বলে দেয়নি তো!

এখন গাড়িটা নদীর পাড়ে এসে পড়েছে। দুই সাদা ঘোড়া গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনি ক্লপ ক্লপ শব্দ ঘোড়ার পায়ে। তেমনি সূর্য অস্ত যাচ্ছে শীতলক্ষ্যার পাড়ে, তেমনি মানুষজন, গাড়ি দেখলেই দু'পাশে দাঁড়িয়ে এই প্রতিমার মতো দুই বালিকাকে গড় করছে! রাস্তা একেবারে ফাকা। ঘোড়া দুটো নিঃশব্দে দুলে দুলে কদম দিচ্ছে।

অমলা বলল, সোনাকে কোথাও দেখলেই এবারে সাপ্টে ধরব, বুঝলি। জোর করে ধরে আনব। দেখি ও যায় কোথায়।

কমলা বলল, তুই ওর হাত দুটো ধরবি, আমি পা দুটো। চ্যাঙদোলা করে ছাদে তুলে নিয়ে যাব। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে সোনা কি করে দেখব!

অমলা ভাবল সোনাকে রাগালে চলবে না, ওকে তোয়াজ করে রাখতে হবে। সে যে কী করে ফেলল সোনাকে নিয়ে! সে এমনটা কমলাকে নিয়ে কতবার করেছে। কিন্তু সোনাকে নিয়ে। সে যেন আলাদা রোমাঞ্চ। আলাদা স্বাদ। ওর ভয়, সোনাকে কমলা না আবার লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলে। সে বলল, ওকে চ্যাঙদোলা করে ছাদে তুলে আনব না। সোনা খুব ভালো ছেলে। ওকে আমি ভালোবাসব।

কমলা দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, আমিও তবে ভালোবাসব।

অমলা এমন কথায় কি যেন দুঃখ পেল ভিতরে। —তোর এটা স্বভাব কমলা। আমার যা ভালো লাগবে সেটা তোর চাই।

—আমার না তোর?

অমলা আর কথা বলল না। পিছনে রামসুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রায় একটা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সামনে শীতলক্ষ্যার চর। চরে মনে হল সেই পাগল মানুষ একা একা হেঁটে কোথায় চলে যাচ্ছেন।

কমলা বলল , ঐ দ্যাখ দিদি, সোনার পাগল জ্যাঠামশাই।

অমলা পিছন ফিরে দেখল সেই বালক, সঙ্গে সেই আশ্বিনের কুকুর। নদীর চর পার হয়ে এরা কোথাও যাচ্ছে।

কমলা বলল, পিছনে সোনা না!

অমলা বলল, রামসুন্দর, পিছনে কে সোনা না?

রামসুন্দর বলল, আজ্ঞে তাই মনে হয়।

—জসীম, গাড়ি চালাও। জোরে চালাও। বলে অমলা ফ্রক টেনে ঠিক-ঠাক হয়ে বসল।

প্রাচীন মঠ নদীর পাড়ে। মঠের ত্রিশুলে একটা পাখি বসে আছে। সোনা এবং তার পাগল জ্যাঠামশাই মঠ পর্যন্ত উঠে আসতে না আসতেই ওরা মঠের আগে উঠে যাবে। স্টিমার ঘাট পার হয়ে যাবে। এবং সোনা আর তার জ্যাঠামশাইকে ধরে ফেলবে। সোনাকে সঙ্গে নেবে, এর পাগল জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকবে। ওরা চারজন, ঠিক চারজন কেন, রামসুন্দর জসীম আর আশ্বিনের কুকুর মিলে সাতজন, এই সাতজন পরান বাড়ি, সে বাড়ির ঠাকুর মিলে বাড়ি বাড়ি দুগ্‌গা ঠাকুর দেখে বেড়াবে। সব দেখা হলেই ওরা ল্যাণ্ডোতে একটা বড় মাঠে নেমে যাবে শেষে যাবে। আশ্বিনের শেষাশেষি হিম পড়বে সাঁজ নামলেই। সাদা জ্যোৎস্না থাকবে। ওরা সকাল সকাল না ফিরে একটু রাত করে ফিরবে। সঙ্গে রামসুন্দর আছে—ভয় কি। সে উর্দি পরে একেবারে বীরবেশে ল্যাণ্ডোর পিছনে কাঠের পুতুলের মতো আর তখন সোনাও দেখতে পেল, নদীর পাড়ে দুই ঘোড়া কদম দিচ্ছে। গাড়িব পিছনে যাত্রাপার্টির সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।

মানুষের মতো কে একজন সোজা দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে সোনা, রামসুন্দর যে এমন একটা রাজার বেশে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ভাবতে পারল না। অমলা কমলা হাত তুলে ওকে ইশারায় ডাকছে।

সোনা তাড়াতাড়ি জ্যাঠামশাই-র হাত টেনে ধরল। সোনাকে দেখেই নদীর পাড়ে ওরা ল্যান্ডো থামিয়ে দিয়েছে। যেন সোনাকে তুলে নেবার জন্য ওরা দাঁড়িয়ে আছে। সে আর ওদিকে হাঁটল না! আবার সে পিলখানার মাঠের দিকে উঠে যাবে। সে জ্যাঠামশাই-র হাত ধরে ঠিক উল্টোমুখে হাঁটতে থাকল।

অমলা বলল, রাম, তুমি যাবে। সোনাকে নিয়ে আসবে।

কমলা বলল, দেখলি, কেমন সোনা আমাদের দেখেই পালাচ্ছে।

রামসুন্দর গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল। সে সারি সারি পাম গাছের আড়ালে আড়ালে এসে সোজা চরে নেমে গেল। এখানে বাবুরা নদীর পাড় বাঁধিয়ে দিয়েছেন। সে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে কাশবনের দিকে ছুটতে থাকল।

সোনা দেখল, সেই রাজার বেশে মানুষটা চরের ওপর দিয়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে। কাশবনের আড়াল পড়ায় ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি জ্যাঠামশাইকে নিয়ে সেই কাশের বনে কোথাও লুকিয়ে পড়বে ভাবল। অমলা কমলা ওকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছে মানুষটাকে। কিন্তু সে পালাতে গিয়েই দেখল কুকুরটা লেজ নাড়ছে, আর ঘেউঘেউ করছে। কুকুরটা রামসুন্দরকে তেড়ে যাচ্ছে।

সোনা আর পালাতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি চরের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকল। সে কাছারিবাড়িতে উঠে গিয়ে মেজ জ্যাঠামশাই-র পাশে গদিতে বসে থাকবে চুপচাপ। সে কিছুতেই অমলা কমলার সঙ্গে আর কোথাও যাবে না, লুকোচুরি খেলবে না। তখন বেশ মজা পাচ্ছিল আশ্বিনের কুকুর। পাগল জ্যাঠামশাই একা একা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। তালের, আনারসের নৌকা যাচ্ছে। হাঁড়ি-পাতিলের নৌকা পাল তুলে যাচ্ছে। নৌকা যাচ্ছে উজানে। কেউ কেউ গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। সোনাকে নিয়ে চরের ভিতর এখন ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, অমলা কমলা পর্যন্ত নেমে এসেছে—তিনদিক থেকে তিনজন ধীরে ধীরে সাঁড়াশি আক্রমণ করে সোনাকে ছেঁকে তুলবে, তারপর ল্যান্ডোতে নিয়ে উধাও হবে—সে সব তিনি খেয়াল করছেন না। তিনি যেন এখন নদীতে যেসব পালের নৌকা যাচ্ছে তা এক দুই করে গুনছেন।

মজা পেয়েছে আশ্বিনের কুকুর। সূর্যাস্তের সময় এ-একটা আশ্চর্য খেলা। সে পাড়ে দাঁড়িয়ে ঘেউঘেউ করছে। এদিক ওদিক ছুটছে সোনা, ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে। সোনার সঙ্গে সেও ছোটাছুটি করছে।

রামসুন্দর বলল, আপনেরা ক্যান নাইমা আইলেন!

অমলা বলল, এই সোনা, শোন। অমলা রামসুন্দর কি বলছে শুনছে না।

সোনা বলল, আমি যামু না।

—আমরা দুগ্‌গা ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি।

—যাও। আমি যামু না। সে তিনদিকে তিনজনের ভিতর আটকা পড়েছে। ওর আর পালাবার উপায় নেই।

রামসুন্দর বলল, আপনে না গ্যালে ওনারা কষ্ট পাইব।

—আমি যামু না। সে কেমন একগুঁয়ে জেদি বালকের মতো একই কথা বার বার বলে চলল।

তখন অমলা ছুটে এসে খপ করে সোনাকে জড়িয়ে ধরল। —কোথায় যাবি?

আর আশ্চর্য, সোনা এতটুকু নড়তে পারল না। কি কোমল সুগন্ধ শরীর, কি আশ্চর্য রঙের চোখ মুখ, সব নিয়ে অমলা সোনাকে নদীর চরে জড়িয়ে ধরেছে। এমনভাবে জড়িয়ে ধরলে কেউ বুঝি কখনও কোথাও আর ছুটে যেতে পারে না।

—চল্, আমাদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাবি। ফেরার পথে বড় মাঠে নেমে যাব। সাদা জ্যোৎস্না থাকবে। তোকে তখন একরকমের পাখি দেখাব। কোমল পাখিগুলি উড়ে উড়ে ডাকে। কি সাদা রঙ পাখিগুলির! তুই দেখলে আর নড়তে পারবি না।

সোনা বলল, কিন্তু তুমি আমাকে...! বলেই সে অমলার মুখ দেখে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখে কী মিনতি মেয়ের, কী করুণ মুখ-চোখ করে রেখেছে অমলা। সোনা যথার্থই

আর কিছু বলতে পারল না। সে জ্যাঠামশাইকে ডাকল, চলেন আমরা ঠাকুর দেইখা আসি। ল্যাণ্ডোতে যামু আর আমু।

পাগল জ্যাঠামশাই এবার মুখ ফেরালেন। সোনা মেজবাবুর মেয়েদের সঙ্গে উঠে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি নৌকা গোনা বন্ধ করে দিলেন যেন। তিনি সোনাকে ধরার জন্য উঠে যেতে লাগলেন।

অমলা বলল, তোর জ্যাঠামশাইকে সঙ্গে নিবি?

সোনা পিছন ফিরে দেখল, জ্যাঠামশাই সুবোধ বালকের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। সে বলল, যাইবেন?

কোনও জবাব না দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি। কমলা বলল, তুই আমার পাশে বসবি।

অমলা বলল, যা সে কি করে হবে! বাকিটুকু বলতে না দিয়ে সোনা বলে ফেলল, আমি জ্যাঠামশাই-র পাশে বসমু।

কমলা বলল, বসমু কিরে? বসব বলবি।

—বসব। সোনা কথাটা শেষ করতেই জসীম দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সোনা বলল, কি জসীম, আমার জ্যাঠামশয়রে চিন না!

—আপনের মায় ক্যামন আছে?

সোনা তো জানে না মা তার কেমন আছে! এ ক'দিনেই মনে হয়েছে দীর্ঘদিন সে মাকে ছেড়ে চলে এসেছে। এবং মাঝে মাঝে ওর কেন জানি মনে হয় বাড়ি গিয়ে সে আর মাকে দেখতে পাবে না। সে গেলেই দেখবে, জ্যেঠিমা চুপচাপ ঘাট পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর কেউ নেই। কেন জানি এটা তাব বার বার অমলার সঙ্গে পাপ কাজে লিপ্ত হবার পর থেকে মনে হয়েছে। সে কিছু জবাব দিতে পারল না। সে জোর করে বলতে পারল না, ভালো আছে—আমরা কবে যাব, এমন বলতে পারছে না মেজ জ্যাঠামশাইকে। বার বার মেজদা বড়দা ওকে শাসিয়েছে ভ্যাক করে কেঁদে দিলে চলবে না। বাড়ি যামু আমি, বললে চলবে না। যখন নৌকা ছাড়বে ঘাট থেকে তখন তুমি যেতে পারবে। সে বার বার কেন জানি আজ ঈশমের নৌকায় উঠে যাবে ভাবল। সেই নৌকায় গিয়ে বসে থাকলে ওর মনে হয়, সে তার গ্রাম মাঠের কাছাকাছি আছে।

জসীম সোনার কোনও সাড়া না পেয়ে বলল, মার জন্য মনটা আপনের ক্যামন করতাছে বুঝি?

জসীম ঠিক বলেছে। মার জন্য তার মনটা আশ্চর্য রকমের ভারি হয়ে আছে।

জসীম ফের বলল, আবার যামু আপনেগ দ্যাশে। শীতকাল চইলা আইলেই হাতি নিয়া চইলা যামু। আপনের মার হাতে পিঠাপায়েস খাইয়া আমু।

সোনা এসব কিছুই শুনছে না। সে ঘোড়ার দিকে মুখ করে বসে আছে। দুই ঘোড়া, সাদা রঙের ঘোড়া পায়ে ক্লপ ক্লপ শব্দ, পিছনে রাজার বেশে রামসুন্দর, মাথার ওপর কত সবুজ গাছপালা পাখি এবং নিরন্তর এই ঘোড়া যেন তাকে নিয়ে কোন দূরদেশে চলে যেতে চাইছে। সে দেখল, অমলা অপলক ওকে চুরি করে দেখছে। সে লজ্জা পেয়ে কী ভেবে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর কী যেন আশ্চর্য মজা, জীবনে এসে যাচ্ছে টের পেয়ে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। অমলার দিকে তাকিয়ে শেষে ফিক করে হেসে ফেলল।

অমলাও হাসল। —আমার পাশে বসবি?

সোনা জ্যাঠামশাই-র মুখ দেখল। মুখে যেন তাঁর সায় নেই। সে বলল, না।

অমলা বলল, কাল দশমী। বাবা বিকেলে ফ্লুট বাজাবেন। তুই আমি আমাদের ব্যালকনিতে বসে বাবার ফ্লুট বাজনা শুনব।

সোনা এখন নির্মল আকাশ দেখছে। সে শুনতে পাচ্ছে না কিছু।

অমলা ফের বলল, বাবা ফ্লুট বাজাবেন। কত লোক, হাজার হাজার মানুষ আসবে নদীর পাড়ে। বাবার ফ্লুট বাজনা শুনতে আসবে। আমাদের ব্যালকনিতে তুই আমি আর কমলা। কী আসবি ত?

সোনা বল, পিসি, পুরানবাড়ি কতদূর।

কমলা বলল, এ কিরে দিদি, সোনা তোকে পিসি ডাকছে। অমলা কেমন গুম মেরে গেল। সে বলল, অনেক দূর।

অমলার অভিমান টের পেয়ে সোনা বলল, আমি বিকালে যাব।

কমলা বলল, বিকাল নারে, ওটা হবে বিকেল।

—আমি জানি।

—বলতে পারিস না কেন?

—মনে থাকে না।

—তুই আমাদের সঙ্গে কলকাতা গেলে কথা বলবি কি করে?

সোনা চুপ করে থাকলে কমলা ফের বলল, তুই এভাবে বললে, তোকে সবাই বাঙাল বলবে।

কলকাতার কথা মনে হলেই কোন রাজার দেশের কথা মনে হয়। কত বড় বড় সব প্রাসাদের মতো হাজার হাজার বাড়ি, গাড়ি, ঘোড়া, দুর্গ, র‍্যামপার্ট, জাদুঘর, হাওড়া ব্রীজ, এসব ভাবতে ভাবতে সে একটা গোটা সাম্রাজ্যের কথা ভেবে ফেলে। রাজা পৃথ্বীরাজের কথা মনে হয়। রাজা জয়চন্দ্রের কথা মনে হয়। স্বয়ম্বর সভার কথা মনে হয়। সে যে কোন বন-উপবনে তার ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে। রাজকন্যা দেউড়িতে এসে মূর্তিতে মাল্যদান করলেই ঘোড়ার পিঠে তুলে সে দ্রুত ছুটবে আর কেন জানি দৃশ্যটাতে একটা সাদা ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে সে এবং তার পিছনে অমলা বসে রয়েছে। সে যেন অমলাকে নিয়ে নদী বন মাঠ পার হয়ে জ্যাঠামশাই-র নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে যাচ্ছে। সোনা এবার পাশের মানুষটির দিকে মুখ তুলে তাকাল। তিনি চুপচাপ নিরীহ শান্ত মানুষের মতো বসে আছেন।

সোনা বলল, অমলা, তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান না?

কমলা বলল, এই ত বেশ কথা বলতে পারিস্।

সোনা বলল, আমার জ্যেঠিমা কলকাতার ভাষায় কথা বলে।

—তাহলে তুই এতদিন বলিসনি কেন?

—আমার লজ্জা লাগে।

কমলা বলল, দিদি খুব ভালো ঘোড়ায় চড়া শিখেছে; খিদিরপুরের মাঠে সকাল হলেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে যায় দিদি।

সোনা চুপচাপ। বাড়ি বাড়ি ঠাকুর দেখে ফের মাঠের পাশ দিয়ে বড় মাঠে নেমে যাওয়া। মাঠময় সাদা জ্যোৎস্না, পাশে নদীর চর, কাশ ফুল। অস্পষ্ট নদীর জল, আকাশে অজস্র নক্ষত্র। তার প্রতিবিম্ব নদীর জলে। ঘোড়া সেই সাদা জ্যোৎস্নায় ছুটছে। ওদের গলায় ঘণ্টা বাজছিল। আশ্বিনের কুকুর সেই ঘণ্টার শব্দে নেচে নেচে পিছনে আসছে। ওরা মাঠের ভিতর নেমে যেতেই ওপারের বাঁশবন থেকে কিছু পাখি উড়ে আসছে মনে হল। ওরা গাড়িতে বসে রয়েছে। বড় বড় পাখি সাদা জ্যোৎস্নায় উড়ে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর কক্ কক্ করে ডাকছে! কেমন ভয়াবহ মনে হল। অজস্র পাখি এই রাতে যেন বিশ্ব চরাচরে উড়ে উড়ে কিসেব নিমিত্ত শোক জ্ঞাপন করছে।

তখনই মনে হল নদীর চরে একটা ঘূর্ণি ঝড় উঠেছে। রাশি রাশি কাশ ফুল হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। পাখিগুলি বনের ভিতর হারিয়ে গেল। পাখিদের আর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু কাশফু লের রেণু, অজস্র রেণু প্রায় তুষার পাতের মতো ওদের ওপর এখন ঝরে পড়ছে।

কমলা বলল, সোনা, চোখ বন্ধ কর। কাশফুলের রেণু চোখে পড়লে অন্ধ হয়ে যাবি।

সোনা চোখ বুজে ফেলল! সঙ্গে সঙ্গে, সবাই চোখ বুজে বসে থাকল। যতক্ষণ তুষারপাতের মতে। এই কাশের রেণু পড়া বন্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ ওরা চোখ বুজে থাকবে। অমলা না বললে গাড়ি ঘুরবে না বাড়ির দিকে। অমলা সোনাকে একটা আশ্চর্য ছবি দেখাতে এনেছে। সে জ্যোৎস্নায় তার ঘড়ি দেখল। স্টিমার আসার সময় হয়ে গেছে। স্টিমারের আলো এই মাঠে যখন পড়বে, ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে আলোটা যখন পাশের ডাঙা, নদীর চর খুঁজবে তখন মাঠে পাখিগুলির শরীরেও আলো পড়বে। অদ্ভুত মায়াবিনী এক রহস্যময় দৃশ্য ফুটে ওঠে তখন। উজ্জ্বল আলোর ভিতর পাখিদের চোখ, নীলাভ চোখ, সাদা ডানা এবং হলুদ রঙের পা যেন গভীর নীলজলে অজস্র মাছের মতো, একটা ঘূর্ণিস্রোতে মাছগুলি ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে—অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে। কী এক নেশায় পেয়ে যায়। দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে ইচ্ছা হয়—প্রায় ছায়াছবির মতো ঘটনাটা। সোনাকে সে সেই দৃশ্য দেখাতে এনেছে। স্টিমারের আলো দূর থেকে দেখলেই পাখিগুলি জঙ্গলের ওপরে চক্রাকারে উড়তে থাকে।

অমলা চোখ বুজেই বলল, সোনা, তোকে আমরা আজ কত খুঁজেছি।

সোনা কিছু বলল না। সে এবার চোখ খুলে তাকাল। আর দেখল সকলেই কেমন সাদা হয়ে গেছে। সে কাউকে চিনতে পারছে না। ওরা যেন সবাই গল্পের দেশের মানুষ হয়ে গেছে। অথবা সেই যে, সে একটা ছবির বই দেখেছিল—ইংরেজি ভাষায় ছোটদের গল্পের বই, কেবল পাইন গাছ, গাছে গাছে বরফ পড়েছে, এক বৃদ্ধ সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট এক বালক দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরে, ওদের পোশাকের ওপর, মাথায় বরফের কুচি পড়ে সাদা হয়ে গেছে—সে যেন তেমনি। সে একা কেন হবে, সকলে। জ্যাঠামশাই চোখ খুলছেন না, সোনা বললেই চোখ খুলবেন—তিনি সেই বুড়ো মানুষ হয়ে গেছেন। এতক্ষণ শুধু ঘোড়া দুটোই সাদা ছিল, এখন ঘোড়া, গাড়ি, রামসুন্দর, জসীম সকলে তার সেই গল্পের দেশের মানুষ। আশ্বিনের কুকুর পর্যন্ত সাদা হয়ে গেল।

তখনই সোনা দেখল এক আশ্চর্য আলো চারপাশের আকাশ, নদী, নদীর চর, কাশবন এবং মাঠের সব গাছপালা আলোকিত করে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সোনা চিৎকার করে উঠল, ঐ আলো ইস্টিমারের আলো।

সকলে চোখ মেলে সেই আলো দেখল। ওদের গাড়িতে এসে আলো পড়েছে। বলা যায় হাজার ডে-লাইট যেন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে সর্বত্র, সেই আলোতে আবার বন থেকে পাখিরা উড়ে এসেছে। ওরা সাদা হয়ে গেছে, মাঠে সাদা জ্যোৎস্না, সাদা পাখি এবং নীলাভ চোখ, সোনা অপলক দেখছে, দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ নিজেকে দেখছেন। সে কি সহসা পলিনের দেশে চলে এসেছে! এত কাশফুল তুষারপাতের মতো, চারপাশে সাদা আর নীলাভ চোখ পাখিদের। জ্যাঠামশাই সেই পাখিদের ধরার জন্য কেমন লাফ দিয়ে নামতে চাইলেন। জসীম বুঝতে পেরে বলল, এবাবে গাড়ি ফিরাতে হয় খুকুরানী।

রামসুন্দর বলল, তাই হয়।

কিন্তু অমলা কিছু বলছে না। ঘূর্ণিঝড় এসে ওদের এমন একটা গল্পের দেশের মানুষ করে দিয়ে যাবে সে নিজেও তা ভাবতে পারেনি। সে বলল, সোনা কী দেখছিস?

—পাখি দেখছি।

—আলো দেখছিস না?

—দেখছি।

—আর কি দেখছিস?

সোনা বলল, ইস্টিমার।

কিন্তু অমলা পাগল মানুষকে কিছু বলছে না বলে কেমন ক্ষেপে যাচ্ছেন তিনি। তিনি কী বলতে যাচ্ছিলেন, তখনই মনে হল কী যেন একটা অতিকায় জীব উঠে আসছে চর থেকে। প্রথমে ওরা কিছুই বুঝতে পারেনি, একটা সাদা রঙের জীব, প্রায় হাতির মতো উঁচু লম্বা, এই মাঠের দিকে উঠে আসছে। সোনা এবং সবাই হতবাক হয়ে দেখছে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, ওটা কী জসীম! ওটা কী উঠে আসছে! আলোটা এতক্ষণে সরে গেছে। কিন্তু সকলের আগে পাগল মানুষ চিনতে পেরেই লাফ দিয়ে নেমেছেন—সেই হাতি, কাশফুলে সাদা হয়ে গেছে—সেই অজস্র বন কাশের। ফুলে ফুলে হাতিটা পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। এবং শেকল ছিঁড়ে সে ছুটে পালাচ্ছে। অথবা জসীম ওর কাছে যায়নি বলে সে জসীমের জন্য এই মাঠে চলে এসেছে।

সোনা তাড়াতাড়ি নেমে জ্যাঠামশাইর হাত চেপে ধরল। সে এ-ভাবে ধরলে তিনি কোথাও যেতে পারেন না। অথচ চোখে কী মিনতি তাঁর। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। হাতিতে চড়ে আমি আবার কোথাও চলে যাব।

সোনা পাগল মানুষের হাত ছাড়ল না। জসীম বলল, আমি চলি রে, ভাই। সেই রামসুন্দরকে বলল, আবার লক্ষ্মী আমার খেইপা গেছে। বলে সে লাফ দিয়ে নামল এবং হাতিটা যেদিকে ছুটে যাচ্ছে ক্রমে সে চিৎকার করতে করতে সেদিকে ছুটে গেল। আর ওরা দেখল জসীমের ডাক শুনেই হাতিটা কেমন সাদা জ্যোৎস্নায় পলকে থেমে গেছে, থেমে দাঁড়িয়ে আছে আব দুলে দুলে শুঁড় নাড়ছে।

সোনা বলল, জ্যাঠামশাই, আমি বড় হলে আপনাকে নিয়ে কলকাতা চলে যাব। আপনি এখন গাড়িতে ওঠেন।

এই শুনে মণীন্দ্রনাথও একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। চুপচাপ হাতিটা দেখতে দেখতে মগজের ভিতর নিরন্তর যে ছবি পোষা আছে তা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে

দেখলেন—যেন সেই নদীর জলে ময়ূরপঙ্খী ভাসে, দুর্গের গম্বুজে পাখি ওড়ে এবং হুগলী নদীর দু-পাড়ে চটকলের সাইরেন—আর তখন ইডেনের নীল রঙের প্যাগোডার নিচে পলিন তাকে পাশে নিয়ে বসে থাকে। হাতে হাত রেখে বলে—তুমি অনেক বড় হবে মণি। বাবা তোমার কাজে খুব খুশি। বাবাকে বলে তোমার বিলেত যাবার ব্যবস্থা করব। একবার ঘুরে এলেই তুমি কত বড় হয়ে যাবে, আরও বড় কাজ পাবে। কার্ডিফে আমাদের বাড়ি আছে। ক্যাসেলের গা ঘেঁষে ছোট্ট ব্রীজ, তারপর রাউদ ইঞ্জিনিয়ারিং ডক এবং দূরে এক পাহাড়ের মাথায় লাইট হাউস। গ্রীষ্মের বিকেলে তুমি আমি লাইট হাউসের নিচে বসে থাকব। সমুদ্র দেখব। আমরা জাহাজে যাব, জাহাজে ফিরে আসব, মাই প্রিন্স। শুধু তুমি রাজি হলেই হয়ে যাবে।

এবং ঠিক তক্ষুনি অমলা এসে সোনার পাশে বসেছে। ওর শরীর থেকে কাশফুলের রেণু তুলে দিতে দিতে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। কানে কানে কি বলছে। এই মেয়ের মুখ দেখলেই পলিনের অনুভূতি পাগল মানুষের মাথায় ফিরে ফিরে আসে—যেন, তাঁর সামনে ছোট পলিন, তিনি যে এখন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না—কারণ পলিন ওকে সত্ত মানুষের মতো হতে বলছে। পলিন সে রাতে অধীর আগ্রহে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। উজ্জ্বল সাদা রঙের সিল্কের গাউন পরেছিল পলিন। ওর চাঁপা ফুলের মতো নরম আঙুল কী দ্রুত চলছে! অধীর উন্মত্ত এক ইচ্ছা—সে রাতে পলিন সারারাত ঘুমোতে পারেনি, আমাকে বাড়ি যেতে হবে পলিন। বাবা টেলিগ্রাম করেছেন। বাবা বড় অসুস্থ। এ যাত্রায় তোমার সঙ্গে আমার বুঝি যাওয়া হল না। তারপর কী, তারপর আর ভাবা যাচ্ছে না—আবার সব ঘোলা ঘোলা অস্পষ্ট পাগল মানুষ কিছুতেই আর বাকিটা মনে করতে পারলেন না।

অমলা এবার আরও কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলল, কাউকে বলিসনি তো?

সোনা কেমন বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। জসীম হাতি নিয়ে পিছনে ফিরছে। রামসুন্দর বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। ওরা হাতি নিয়ে ঘোড়া নিয়ে মিছিল করে বাজার মতো ফিরছে।

—তুই না সোনা, কিছু বুঝিস না।

তখনই পাগল মানুষ এক রহস্যময় কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন—

Still still we hear hear tender taken breath And to

live ever-or else swoon to death.

death, death death—

বার বার পুনরাবৃত্তি—ডেথ, এবং ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্লপ ক্লপ। হাতিটা সকলের পিছনে আসছে। আশ্বিনের কুকুর সকলের আগে যাচ্ছে! মাঝখানে দুই সাদা ঘোড়া, গাড়ি,

প্রাসাদে যেন রাজা ফিরেছেন। নিজেকে আজ সোনার উপকথার নায়কের মতো মনে হচ্ছে।

সকাল থেকেই বিসর্জনের বাজনা বাজছে। দেবীর চোখে মুখে বিষণ্ণতা। তিনি আবার হিমালয়ে যাচ্ছেন। আগমনী গান যে যার গাইবার এতদিন গেয়েছে। এবারের মতো আর গাইবার কিছু নেই।

এইদিন সব কিছুতেই একটা বেদনার ছাপ। এত যে রোদ ঝিলিমিলি আকাশ, এত যে উজ্জ্বল দিন, কোথাও মালিন্য নেই—তবু কী যেন সকলের হারিয়ে যাচ্ছে। এই মণ্ডপের সামনে সকলেই এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। বড় হুজুর সকাল থেকেই নাটমন্দিরে একটা বাঘের চামড়ার উপর বসে আছেন। পরিধানে রক্তাম্বর। কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। এই দিনে মা ভুবনময়ী, ভুবনমোহিনী, হে মা জগদীশ্বরী, তুই একবার নয়ন ভরে তাকা মা, হেন প্রার্থনা এই মানুষের।

মেজবাবু এবারেও প্রতিবারের মতো ফ্লুট বাজাবেন। নগেন ঢালি এসেছিল ঢোল নিয়ে। সে গতকাল হাটে বাজারে গঞ্জে ঢোল পিটিয়ে চলে এসেছে।

গ্রাম গ্রামান্তরে এই খবর রটে গেলে চাষী বৌ'র মুখের রঙ বদলে যায়। সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। শীতলক্ষ্যার তীরে গাঁ। জমিদারবাবুদের সব দালানকোঠা নদীর পাড়ে পাড়ে। আঁচলে একটা চৌ-আনি বেঁধে, পানে ঠোঁট রাঙা করে মাথায় ঘোমটা টেনে দশরায় যাবে, যাবার আগে দীঘির পাড়ে বসে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনবে। সকাল সকাল বের না হতে পারলে জায়গা পাওয়া যাবে না। নদীর পাড়ে পাড়ে যেসব গাছ আছে, সে সব গাছের নিচে রাত থাকতেই লোক এসে জমতে শুরু করেছে। চাষী মানুষেরা অথবা বৌ-রা সামিয়ানার নিচে যেতে পারবে না। কাছ থেকে দেখবে মেজবাবুকে এমন শখ এইসব চাষী বৌয়ের। কিন্তু সিপাইগুলি এমন করে, লাঠি নিয়ে তাড়া করে, কার সাধ্য ওরা সামিয়ানার নিচে গিয়ে বসে। কতবার চাষী বৌ ভেবেছে লুকিয়ে চুবিয়ে সে চলে যাবে সামিয়ানার নিচে, কাছ থেকে দেখবে মেজবাবুকে, ফ্লুট বাজনা শুনবে—কিন্তু তার মানুষ বড় ভীরু, সে কিছুতেই তার বৌকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। একটা ঝাউ গাছের নিচে বসে ওরা বাবুর ফ্লুট বাজনা শুনবে। যতক্ষণ না নদীর জলে, সব গ্রামের প্রতিমা বিসর্জন হবে, ততক্ষণ মেজবাবু ক্রমান্বয়ে ফ্লুট বাজিয়ে যাবেন। একের পর এক সুর, সবই তখন

বড় করুণ মনে হয়, নিরিবিলি এক জগৎ সংসারে কী যে কেবল বাজে, প্রাণের ভিতর কী যে বাজে—ফ্লুট শুনতে শুনতে তারা অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে যায়।

সকাল থেকেই জায়গা নেবার জন্য দূর গ্রামান্তর থেকে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। আমলা কর্মচারীদের কাজের বিরাম নেই। মঞ্চ করা হয়েছে। দীঘির পাড়ে এক মঞ্চ, রোশনচৌকি যেন বাজাবে সেখানে। সে মঞ্চে তিনি শীতলক্ষ্যার ও-পারে সূর্য ঢলে পড়লেই উঠে যাবেন। কলকাতা থেকে তাঁর আরও দু'জন শিষ্য এসেছে। ওরা বাজাবে। এখন খালেক কোথায়। খালেক পীড়িত। কাছারিবাড়ি পার হলে এক অশ্বশালা আছে, কিছু ঘোড়া আছে, সাদা রঙের, কালো রঙের ঘোড়া সেখানে আস্তাবলের এক পাশে খালেকের ছোট্ট ঘর। আলো নেই, বাতাস আসে না। সূর্য দেখা যায় না। খালেক সেই ঘরে শীর্ণকায় মানুষের মতো অনাহারী দুঃখী এবং চোখেমুখে ক্লিষ্ট এক ভাব। খালেক মিঞা শরীর শক্ত করে পড়ে আছে। খালেক আজই সূর্যাস্তের সময় মারা যাবে। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হাত পা স্থবির। পাষাণের মতো ভারি লাগছে সব। দশমীর দিন সেও ফ্লুট বাজায়। সেও মেজবাবুর পাশে বসে থাকে। আজ সে তার আঙুলগুলি এই দিনে নেড়ে নেড়ে দেখতে চাইছে—পারছে না। ভাবি ভারি—পাষাণের মতো ভারি। ইব্রাহিম একবার দেখে এসেছে। ভূপেন্দ্রনাথ দু'বার দেখে এসেছেন। ওষুধ বা পথ্য সে কিছুই খাচ্ছে না। সে টের পেয়ে গেছে সূর্যাস্তের সময় ফ্লুট বাজালেই সে এক অদ্ভুত সুরলহরীর ভিতর ডুবে যেতে যেতে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ ভুলে যাবে। সে মরে যাবে। তবু সে এই দুঃসময়ে এটা তার দুঃসময় কী সুসময়, সে মনে মনে এটা সুসময় জানে, সে যেন কার পদতলে বসে সারাজীবন ফ্লুট বাজাবে, তার জন্য তৈরি হচ্ছে।

যখন একটা মানুষ মরে যাবে বলে চিৎপাত হয়ে অশ্বশালার পাশে পড়ে আছে তখন একজন মানুষ, আদ্যিকালের এক তাল পাতার পুঁথি সামনে রেখে পড়ে চলেছেন—জয়ং দেহি, যশো দেহি। এই মানুষ মহালয়ায় চণ্ডীপাঠ করেন না। বিসর্জনের দিন চণ্ডীপাঠ। এমন উল্টো ব্যাপার ভূভারতে কবে কে দেখেছে! তিনি পদ্মাসন করে বসেছেন। বাঘছালের উপর বসে সামনে দেবীপ্রতিমা। বিসর্জনের বাজনা বাজছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে জগদম্বে, হে মা ঈশ্বরী, বলে সুর ধরে যেন বলে চললেন, অপরাধ ক্ষমা করতে আজ্ঞা হয় মা। তুই আজ চলে যাবি, অ মা উমা, এই বুঝি তোর ইচ্ছা ছিল, বলে শিশুর মতো করজোড়ে তিনি কাঁদতে থাকলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে তিনি মহিষাসুর বধে চলে এলেন। দেবীর গা থেকে কী তেজ বের হচ্ছে! শরীরে কাঁটা দিয়েছে। কি গ মা, তুই ভয় পেলি, তিনি পাঠ করতে করতে মাঝে মাঝে এইসব স্বগতোক্তি করছেন। —হে মা, তুমি এখন মধু পান কর। থেমে তিনি বললেন, মধু পান নিমিত্ত শরীরে অপার শক্তি সঞ্চয় করেছ—যা দেবী সর্বভূতেষু, দেবী তোমার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে হাজার দেবসৈন্য সৃষ্টি হচ্ছে, তারা যে সব মুহূর্তে বিনাশ হয়ে গেল মা। মহিষাসুর নিমেষে সব ধ্বংস সাধন করছে। মা, তোর বুঝি এই কপালে ছিল, মায়াপাশে আবদ্ধ করতে পারলি না! বলে তিনি যেসব ভক্ত পাশে বসে চণ্ডীর ব্যাখ্যা শুনছিল, তাদের ব্যাখ্যা করার সময়ই দেখলেন, এক

বালক নাটমন্দিরের পশ্চিমের বারান্দায় বড় একটা থামের আড়ালে ঈশমের গল্পের মতো মনোযোগ দিয়ে চণ্ডীপাঠ শুনছে। সেই এক কিংবদন্তী, গর্জে গর্জে কে গর্জন করছে! দেবীর গর্জন, না অসুরের!

এই বৃহৎ সংসারে তিনিই সব। অমলার ঠাকুরদা প্রভাবশালী মানুষ। একমাত্র দেবীর সামনে এসে তিনি শিশু বনে যান। শিশুর মতো কাঁদেন। কেবল ক্ষমাভিক্ষার মতো মুখ। সেই মুখে, চণ্ডীপাঠের সময় গর্জে গর্জে এমন শব্দ উচ্চারণে সোনা হেসে ফেলেছিল। তক্ষুনি চিৎকার। যেন গোটা বাড়িটা কাপছে। সকলে ছুটে এসেছে। —কে হাসে! সোনা পালিয়ে যাবে ভেবেছিল! কিন্তু চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা ঈগল পাখি প্রায়, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা এবং কাপালিক সদৃশ মুখ—ক্ষণে ক্ষণে মুখের কী পরিবর্তন—সোনা আর নড়তে পারেনি। বললেন, অঃ তুই। দেবীমহিমা শুনতে ভালো লাগছে!

সোনা ঘাড় কাৎ করে দিল।

—তবে দাঁড়া!

সোনা একটা থামের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ পরে হুঁশ হল কমলা ওকে পিছন থেকে চুপি চুপি ডাকছে। —সোনা, এখানে কী করছিস!

সে বলতে পারল না চণ্ডীপাঠ শুনছে। ঋষি পুরুষেরা নানারকম কিংবদন্তী লিখে গেছে তালপাতার পুঁথিতে, এখন সে সবই দেবীমহিমা হয়ে গেছে। ওর কাছে প্রায় সবটাই ঈশমের সেই যে এক সূর্য আছে না, জলের নিচে এক রূপালী মাছ আছে, মাছটা সূর্য মুখে অথবা সেই মাছটা কী জালালি? যে কেবল বিল পার হয়ে নদী পার হয়ে সাগরে চলে যায় সূর্য মুখে। সকাল হলেই পুবের আকাশে সূর্যটাকে লটকে ডুব দেয় ফের। সাগরে সাগরে মহাসাগরে ঘোরাফেরা তার। সে বলতে পারত, ঋষি পুরুষেরা কিংবদন্তী লিখে গেছে তালপাতার পুঁথিতে। আমি তাই শুনছি। বলতে পারত, আমাদের ঈশম ওর চেয়ে অনেক বেশি ভালো কিংবদন্তী জানে। সে ভাবল, বড় হলে তালপাতার পুঁথিতে সেও তা লিখে রাখবে। সুতরাং সে চণ্ডীপাঠ শুনছে, না কিংবদন্তী শুনছে পুরাকালের, এখন এই মেয়ে কমলাকে তা প্রকাশ করতে পারল না।

সোনা কিছু বলছে না দেখে ফের কমলা বলল, পাঁচটায় হাতি আসবে। হাতিতে আমরা দশরা দেখতে যাব। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি।

সোনা বস্তুত এখন জ্যাঠামশাইর সেই কালরাত্রি, মহারাত্রি বলা যেতে পারে জালালিকে তুলে আনছেন বিলের পাড় থেকে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত, শীতে পাগল জ্যাঠামশাইর মুখ সাদা ফ্যাকাসে—ঠিক জ্যোৎস্নার মতো রঙ, এখন সোনার এসব মনে হওয়ায় সে কমলার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

—এই শুনছিস আমি কি বলছি?

—কী?

—আমাদের সঙ্গে হাতির পিঠে দশরা দেখতে যাবি?

—যাব।

—একটু সকাল সকাল ভিতরে চলে আসবি। আমরা তোকে সাজিয়ে দেব। পাউডার মেখে দেব।

সোনা হাঁটতে থাকল।

—কি রে, মনে থাকবে ত?

সে ঘাড় কাৎ করে বলল, মনে থাকবে তার। তারপর বলল, আর কে কে যাবে?

—আমি দিদি, সোনাদি, রমা, বাচ্চু।

—আর কেউ যাবে না?

—আর কে যাবে জানি না। তুই কিন্তু আগে আগে চলে আসবি। মুখে তোর পাউডার মেখে দেব।

সোনা তার এই বয়স পর্যন্ত মুখে পাউডার মাখেনি। সে বেটাছেলে। বেটাছেলে পাউডার মাখে না, বাড়িতে এমন একটা নিয়ম আছে। মা জ্যেঠিমা কদাচিৎ মুখে পাউডার মাখেন। সে পাউডার মাখতে প্রায় দেখেই নি বললে চলে। দূর দেশের আত্মীয়-বাড়িতে যেতে হলে হেজলিন স্নো মেখেছে, শীতকালে মা তার মুখে স্নো মাখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই গরমের সময় সে পাউডার মাখবে এবং ওর মুখ আরও সুন্দর দেখাবে ভাবতেই লজ্জায় গুটিয়ে গেল।

সে বলল, জ্যাঠামশয় যাবে না?

—না।

—জ্যাঠামশয় না গেলে আমিও যাব না।

—তুই কি রে, সোনা! যারা ছোট তারাই যাবে। বড়রা হেঁটে যাবে। ঠাকুমা তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। এই বলে যেমন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিল তেমনি দ্রুত উপরে উঠে গেল। সিঁড়ির মুখে অমলা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, কি রে, পেলি সোনাকে?

—হ্যাঁ।

—কী বলল?

—বলল, যাবে।

—বলেছিস ত সকাল সকাল আসতে! পাউডার মেখে দেব মুখে, বলেছিস?

—সব বলেছি! তুই না দিদি..., কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। বাবা এদিকে আসছেন। বাবা দশমীর দিন ধুতি-চাদর পরে একেবারে বাংলাদেশের মানুষ হয়ে যান। তারপর কলকাতায় যাবার দিন এলেই একেবারে সাহেবসুবো মানুষ। তখন তিনি বাংলাতে পর্যন্ত কথা বলেন না। তখন বাবাকে বরং বেশি পরিচিত মানুষ মনে হয় ওদের। ওরা বাবার সঙ্গে সহজেই তখন কথা বলতে পারে।

কিন্তু এখন ওরা পালাবার পথ খুঁজছিল। এই অসময়ে ওরা নাটমন্দিরের কাছে চলে এসেছে—এটা ঠিক না। দেখলেই বাবা ধমক দেবেন। সুতরাং ওরা যতবারই সোনাকে কাছারিবাড়ির দিকে খুঁজতে গেছে, খুব সন্তর্পণে গেছে। এমন কি অন্দরের দাসী-বাঁদীদের চোখেও যেন না পড়ে। প্রায় লুকোচুরি খেলার মতো চলে যাওয়া, তারপর সোনাকে না পেলে বিমর্ষ হয়ে ফিরে আসা।

বাবা এখন করিডর পার হয়ে যাচ্ছেন, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবেন। বাবার ঘরটা বাবা না থাকলে সব সময় তালা দেওয়া থাকে। বড় বড় আলমারি—কত বই সব এবং কাচের জানালা দরজায় নানা-রকমের কারুকাজ। বাবার ঘরে পুরানো আমলের লম্বা আবলুস কাঠের খাট এবং পালঙ্ক বলা চলে, কতকাল থেকে পালঙ্ক খালি। বাবা এলে এই পালঙ্কে না শুয়ে ছোট একটা তক্তপোশে শুয়ে থাকেন। ডানদিকের ঘরটাতে বিলিয়ার্ড টেবিল। অবসর সময় বাবা একাই টেবিলে লাল-নীল রঙের বল নিয়ে খেলা করেন। আর দেওয়ালে বাবার কোর্টের ছবি। গভর্নরের সঙ্গে বাবার ভোজ খাওয়ার ছবি। বিলাতে লিঙ্কন হলে পড়ার সময়কার ছবি। মায়ের সঙ্গে তোলা ফোটো—বোধহয় জায়গাটা ওয়েলসের কোনও একটা গ্রামের। মামাবাড়িতে যাবার সময় বড় একটা ক্যাসল পড়ে। একটা ক্যাসলের ছবিও এ-ঘরে রয়েছে। ছাত্রাবস্থায় বাবার সেই সতেজ মুখ দেখার জন্য দুই বোন চুরি করে এই ঘরে ঢুকে যায়। বাবার কাছে ধরা পড়লে দু'বোন ছুটে পালায়। সোনা বলেছিল, বাবার ঘরটা দেখবে। অমলা বলেছিল, দেখাবে। কিন্তু কী করে দেখানো যায়! সোনার বুদ্ধি নেই মোটেই। কেবল কথা বললেই হাসে। চুপি চুপি দেখে চলে যাবে তেমন সে নয়। এটা কি, ওটা কেন, এই লাল-নীল রঙের বল দিয়ে কী হয়! আমি দুটো বল নেব। অথবা সে ওসব দেখতে দেখতে এমন অন্যমনস্ক হয়ে যাবে যে ধরা না পড়ে যাবে না। সোনা এমন ছেলে যে, ওকে নিয়ে কিছু করা যায় না। পালানো যায় না। সে বোকার মতো বারবার ধরা পড়ে যায়।

সোনা তখন ভূপেন্দ্রনাথকে বলল, জ্যাঠামশয়, দশরাতে যামু। কমলা আমারে নিয়া যাইব। হাতিতে চইড়া যামু কইছে।

দশমীর দিন এই হাতি আসে বিকেলে। জসীম জরির পোশাক পরে। মাথায় তার জরির টুপি। বাড়ির বালক এবং বালিকারা সকলে মিলে দশরা দেখতে যায়। হাতির শুঁড়ে শ্বেতচন্দনে ফুল-ফল আঁকা থাকে। কপালে কান পাতা এবং শরীরে নানারকমের কলকা আঁকা অথবা ধানের ছড়া এবং লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। গলায় কদম ফুলের মালা। যেই না মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা আরম্ভ হবে, হাতিটা নিয়ে জসীম রওনা হবে পিলখানার মাঠ থেকে। তারপর সোজা অন্দরমহলের দরজায়। সেখানে হাতিটা দাঁড়িয়ে থাকবে। কপালে চাঁদমালা তার। তখন বাড়ির বৌরানীরা সোহাগ মেগে নেবে প্রতিমার। প্রতিমার পায়ে সিঁদুর ঢেলে নিজের নিজের কৌটায় পুরে রাখবে। সম্বৎসর এই সিঁদুর কপালে দেবে আর মেজবৌরানীর জন্যেও সিঁদুর আসে সোনার কৌটায়। সেটা মেজবাবু কলকাতা যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যান। মেজবৌরানী কপালে সিঁদুর দেন না। লম্বা গাউন পরেন। গীর্জায় যান। তবু এক ইচ্ছা এই পরিবারের—বিশেষ করে বৌঠাকুরানীর অর্থাৎ মেজবাবুর মার মন আদৌ মানে না। তিনি সব বৌদের জন্য যেমন সোনার কৌটায় দেবীর পা থেকে সিঁদুর কুড়িয়ে রাখেন তেমনি মেজবৌরানীর জন্যও সিঁদুর কুড়িয়ে নেন। মেজবাবুকে দেবার সময় অনুরোধ করবেন একবার অন্তত সিঁদুরটা যেন কপালে ছোঁয়ায় বৌ! মেজবাবু তখন সামান্য হাসেন। তারপর যার জন্য দেবীর পা থেকে সিঁদুর সঞ্চয় করা—সে এই হাতি। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী এই পরিবারের। দশমীর দিনে কপালে নিজ হাতে বৌঠাকুরানী সিঁদুর পরিয়ে দেন। চাঁদমালা পরিয়ে দেন। তারপরই বাজনা বাজে। ঢাকের বাজনা, বিসর্জনের বাজনা। পরিবারের সব বালক-বালিকা সেজেগুজে হাতিতে চড়ে বসে। প্রতিমা নিরঞ্জনের লোকেরা, জয় জগদীশ্বরী, জয় মা জগদম্বা আর জয় বাড়ির বড় হুজুরের—এই সব জয় দিতে দিতে প্রতিমা বের করে নিয়ে যায়। এইসব জয়ের ভিতর শোনা যায় মেজবাবু মঞ্চের ওপর বসে ফ্লুট বাজাচ্ছেন। দক্ষিণের দরজা দিয়ে প্রতিমা যায়, উত্তরের দরজা দিয়ে হাতি যায়। আর মাঝখানে বড় চত্বর। তারপর দীঘি। দীঘির পাড়ে রোশনচৌকির মতো মঞ্চ, ক্রমান্বয়ে, এক সুরে বেজে চলেছে। নদীতে এক দুই করে প্রতিমা নামছে। ক্রমে সন্ধ্যা নামছে নদীর চরে কাশফুলের মাথায়। দশমীর চাঁদ আকাশে। আর ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। নৌকায় সারি সারি দেবী প্রতিমা, বিসর্জনের বাজনা, হৈচৈ আলো-আঁধারির খেলা। হাউই পুড়ছে আলো ফুটছে কত রকমের। থেকে থেকে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা। করুণ এক সুর এই বিশ্বচরাচরে অপার মহিমা নিয়ে বিরাজ করছে। মেজবাবু বুঝি এই সুরের ভিতর ফ্লুট বাজাতে বাজাতে স্ত্রীর ভালোবাসার জন্য কাঁদেন।

আজ আবার সেই দিন এসে গেছে। নিত্যকার মতো ভূপেন্দ্রনাথ সকাল সকাল স্নান করে এসেছেন নদী থেকে। নিত্যকার মতো ময়ূরের ঘর, বাঘের খাঁচা এবং হরিণেরা যে যেখানে থাকে সেসব জায়গায় ভূপেন্দ্রনাথ ঘোরাঘুরি করছেন। সাফসোফ ঠিকমতো হয়েছে কিনা, এসব যদিও ওঁর দেখার কথা নয়—তবু এতগুলি জীব এই প্রাসাদে প্রতিপালিত, প্রতি মানুষের মতো তাদের সুখ-দুঃখ বুঝে ভূপেন্দ্রনাথ নিজে দেখেশুনে সব বিধিমত ব্যবস্থা করে থাকেন। তাছাড়া আজ দেবী চলে যাচ্ছেন হিমালয়ে। কি এক বেদনা সব সময় সকাল থেকে প্রতিবারের মতো ওকে বিষণ্ণ করে রাখছে। তারপর নিত্যকার মতো

মঠের সিঁড়ি ভেঙে ভিতরে ঢুকে শিবের মাথায় জল, বৃষের পায়ে জল এবং শেকল টেনে এক দুই করে শতবার ঘণ্টাধ্বনি।

খালেকের অসুখ। কুলীন পাড়া থেকে ডাক্তার এসে দেখে গেছে। আর এখন যারা বিদায় চাইছে, যেমন পুরোহিত এবং অন্য অনেকে, তারা এখন সবাই কাছারিবাড়িতে ভূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষায় বসে আছে। তাছাড়া গত সন্ধ্যায় যারা কাটা মোষ নিয়ে গিয়েছিল তারা আসবে নতুন কাপড়ের জন্য। যে সব প্রজাদের জমি বিলি করার সময় ঠিক ছিল মায়ের পূজায় পাঁঠা অথবা মোষ এবং দুধ-কলা, আনাজ যার যা কিছু ফসলের বিনিময়ে দেবার কথা—তারা তা দিয়েছে কিনা, না দিলে তাদের ডেকে পাঠানো, এসব কাজও ভূপেন্দ্রনাথের জন্য পড়ে থাকে। আর এমন সব কাজের ভিতরে ভূপেন্দ্রনাথের দুপুর গড়িয়ে গেল। কিছুই আর তাঁর ভালো লাগছে না। বিষাদ-বিষণ্ণ প্রতিমার সামনে তিনি চুপচাপ অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বড়বৌ এবং ধনবৌর জন্য দেবীর পা থেকে সিঁদুর তুলে নিয়েছেন। আবার সেই নির্জনতা এই বাড়িকে গ্রাস করবে। এ ক'দিন কী ব্যস্ততা! কী সমারোহ! গোটা প্রাসাদ সারাদিন গমগম করেছে। আজ কারো কোনও ব্যস্ততা নেই। দীঘির চারপাশে সকলে জমা হচ্ছে।

বিকেলেই জসীম হাতিটার পিঠে পিলখানার মাঠে চেপে বসল। তখন গরদের কাপড় পরছেন মেজবাবু। গরদের সিল্ক। হাতে হীরের আংটি। কালো রঙের পাম্পশু জুতো। মেজবাবু তাঁর ঘর থেকে বের হচ্ছেন। তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন। আগে পিছনে পরিবারের আমলা কর্মচারী। আতরের গন্ধ সকলের গায়ে। সবার আগে ভূপেন্দ্রনাথ, পরে রক্ষিতমশাই এবং সকলের শেষে বাবুর খাস খানসামা হরিপদ। যেন একটা মিছিল নেমে যাচ্ছে দক্ষিণের দরজায়। ওরা নেমে এল নাটমন্দিরে। এখানে মেজবাবু গড় হলেন। দেবীর পায়ের বেল পাতা অঞ্জলির মতো করে হাতে তুলে নিলেন। ওরা বড় বড় থামের ওপাশে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেলে সোনার মনে হল, দেবী এখন ওর দিকে তাকিয়ে নেই। দেবী তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। চোখমুখ কাঁপছে। ঘামের মতো মুখটা চকচক করছে। সে আরও কাছে গেল। দুর্গাঠাকুরের চোখে জল পড়ছে কিনা দেখার জন্য একেবারে মণ্ডপের ভিতর ঢুকে গেল।

সে প্রথম সিংহটাকে একবার ছুঁয়ে দেখল। দীঘির পাড়ে সকলে এখন যে যার জায়গা নিচ্ছে বলে কেউ আর মণ্ডপে নেই। এই সময়, সুসময়ও বলা চলে, একবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা দেবীকে, অসুর অথবা সেই বাচ্চা ইঁদুরটাকে। গণেশের পায়ের কাছে যে একটা কাঁটালতায় বসে আছে। সে সিংহের মুখে প্রথম হাতটা ভরে দিল। অসুরের বুক থেকে যে রক্ত এ ক'দিন গড়িয়ে পড়েছে সেটা হাত দিয়ে দেখল—কেমন শুকনো হয়ে গেছে রক্তটা। এবং সিংহটা খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে। ওর কেন জানি এই অসুরের জন্য মায়া হল। সে অসুরের মাথায় হাত দিয়ে কোঁকড়ানো চুলে আদর করার মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এবার মজা দেখাচ্ছি। সিংহটার চোখে সে একটা চিমটি কেটে দিল। কিছু রং উঠে এল নখে। দেবীর মহিমায় সিংহটা সোনাকে ভয় পাচ্ছে না। সে এবার উঁকি দিয়ে দেবীর চোখ

দেখল, জল পড়ছে। তা তোমার এত কষ্ট যখন থেকে গেলেই হয়। দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাইল মনে মনে। ওর ভয় ছিল, কাছে গেলেই দেবী রাগ করবে। কিন্তু কী ভালোবাসার চোখ! সে বলল, তা তোমার এমন জীব কেন বাহন মা। আমি ওকে সুড়সুড়ি দেব নাকে। এই বলে সে ছোট একটা কাঠি যেই না নাকের কাছে নিয়ে গেছে অমনি এক শব্দ হ্যাঁচ্চো। কেউ নেই আশে পাশে—অথচ হ্যাঁচ্চো দিল কে। সিংহটা সত্যি তবে হাঁচি দিল! সে থতমত খেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে দেখল পাগল জ্যাঠামশাই মণ্ডপের সিঁড়িতে। তিনি হাঁচি দিয়েছেন। পাগল মানুষের ঠাণ্ডা লাগে না। সোনা এই প্রথম জ্যাঠামশায়ের ঠাণ্ডা লাগায় ভাবল তিনি তবে ভালো হয়ে যাচ্ছেন। সে জ্যাঠামশাইর হাত ধরে বলল, আমি হাতিতে চড়ে দশরা দেখতে যাব।

দীঘির পাড়ে তখন মেজবাবু ফ্লুট বাজাচ্ছেন। সোনার মনে হল ওর দেরি হয়ে গেছে। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে ফেলে কাছারিবাড়িতে ছুটে গেল। জামা-প্যান্ট বদলে নিতে হবে তাড়াতাড়ি।

যারা প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নাটমন্দিরে এসেছে তারা সবাই গামছা বেঁধেছে কোমরে। ওরা ঠাকুর কাঁধে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। রামসুন্দর যাচ্ছে মাথায় ঘট নিয়ে। ঠাকুর নদীর চরে নামানো হবে। সেখানে আরতি হবে, ধূপধুনো জ্বলবে। বড়দা, মেজদা ঠাকুরের সঙ্গে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। সে যেতে পারছে না। ওর জন্য অমলা কমলা বসে রয়েছে। সে যাবে হাতিতে।

ভূপেন্দ্রনাথ সোনাকে জামা-প্যান্ট পরিয়ে দিল। মাথা আঁচড়ে দিল। সোনা আর দাঁড়াতে পারছে না। সে কোনওরকমে ছুটতে পারলে বাঁচে। সবাই সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর জন্য কেউ কিছু রেখে যাচ্ছে না।

এখন রোদ নেমে গেছে। সেইসব হাজার হাজার লোক নদীর পাড়ে বসে পামগাছ অথবা ঝাউ গাছের ছায়ায় নিবিষ্ট মনে ফ্লুট বাজনা শুনছে। হাজার হাজার মানুষ, মানুষের মাথা গুনে বলা কঠিন কত মানুষ—এসেই যে যার মতো জায়গা করে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনতে বসে যাচ্ছে।

অশ্বশালার পাশে এক মানুষ আছে—তার বুঝি ইন্তেকাল হবে এবার। সেও এক মনে, দু'হাত বুকের ওপর রেখে সেই সুরের ভিতর ডুবে যাচ্ছে। সে চিৎপাত হয়ে, গঞ্জে শহরে যেমন ফ্লুট বাজাত, তেমনি বুকের ওপর দু'হাত নাড়ছে। সেও বুঝি শেষবারের মতো মেজবাবুর সঙ্গে মনে মনে ফ্লুট বাজাচ্ছে। এমন আশ্বিনের বিকেলে এই পৃথিবীর বুকে সে ফ্লুট না বাজালে আর কে বাজাবে! সে দু'হাত অনেক কষ্টে উপরে তুলে রাখল। যথার্থই সে আজ ফ্লুট বাজাচ্ছে। তারপর হাত দুটো ওর ক্রমে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বুকের উপর হাত, চোখ বোজা—মানুষটার দুনিয়াতে কেউ নেই, আছে শুধু দুই ঘোড়া, এক ল্যাণ্ডো আর এক ফ্লুট। সে চুরি করে মেজবাবু না থাকলে নিশুতি রাতে নদীর চরে একা বসে ফ্লুট বাজাত। সে নানারকম সুরের ভিতর তন্ময় হয়ে থাকত। তেমনি আজও সে তন্ময় হয়ে

যাচ্ছে। দীঘির পাড়, শীতলক্ষ্যার চর, নদী মাঠ সব যেন এই সুরের ভিতর হাহাকার করছে। সে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনতে শুনতে চোখ বুজে, এক আল্লা, তার কোন শরিক নেই...শরিক নেই...নেই... সে আর শ্বাস নিতে পারছে না। অসহ্য এক যন্ত্রণা ভিতরে। সে হাত দুটো আর উপরে রাখতে পারল না। অবশ হয়ে আসছে সব। এক আশ্বিনের বিকেলে ক্রমে এভাবে সে মরে যাচ্ছে। কেউ খেয়াল করছে না।

তখনই সোনা ছুটছিল। হাতিটা অন্দরে এসে গেছে। জসীম হাতির পিঠে বসে প্রতীক্ষা করছে নিশ্চয়। সবাই ওর জন্য হাতির পিঠে নদীর পাড়ে এখনও নেমে যেতে পারছে না। হাতি বুঝি ওকে ডাকছে! ফ্লুট বাজছে। দীঘির পাড়ে হাজার মানুষ। বিচিত্র বর্ণের মেলা। ইব্রাহিম কলের ঘরটাতে বসে আছে। সময় হলেই আলো জ্বেলে দেবে।

সোনা তার পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। যেন তার পাগল জ্যাঠামশাই, সে যা বলবে তাই শুনবেন। জ্যাঠামশাই দশরাতে চলে যাবেন একা একা। সে জ্যাঠামশাইর সঙ্গে দশরাতে মেলা দেখবে। হাতির পিঠে বসে থাকবে না! ফেরার সময় দু'জন হেঁটে হেঁটে লাড্ডু খেতে খেতে ফিরে আসবে।

কিন্তু জ্যাঠামশাই না দীঘির ঘাটে, না সেই সব মানুষের ভিতর। এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। হাতিটা অন্দরে দাঁড়িয়ে এখন শুঁড় নাড়ছে। কান দোলাচ্ছে! অমলা কমলা বিরক্ত হচ্ছে। জসীমকে হাতি ছাড়তে বারণ করে দিচ্ছে বুঝি। সে প্রাণপণে কাছারিবাড়ির মাঠ পার হয়ে এল! দারোয়ানদের ঘর অতিক্রম করে সেই নাটমন্দিরের উঠোন। সে এখানে এসে শ্বাস নিল! দেখল পকেটের পয়সাগুলি পড়ে গেল কিনা ছুটতে গিয়ে। সে চোদ্দটা তামার চকচকে পয়সা পেয়েছে। দশরা দেখার জন্য বৌরানীরা বাড়ির সব বালক-বালিকাদের মতো ওর হাতে একটা করে তামার পয়সা দিয়েছে। সে বলেছে, সে একা নয়। ওরা দু'জন। সে এবং তার পাগল জ্যাঠামশাই। সে পাগল জ্যাঠামশাইর জন্য একটা একটা পয়সা গুনে ভিন্ন পকেটে রেখে দিয়েছে। মেলা দেখা হলেই জ্যাঠামশাইর পকেটে পয়সাগুলি দিয়ে দেবে। কিন্তু সে কোথাও জ্যাঠামশাইকে পেল না। ওঁকে খুঁজতে গিয়ে ওর এত দেরি হয়ে গেল। সে সিঁড়ি ভেঙে ছুটছে। ওর বড় দেরি হয়ে গেল। সে লম্বা বারান্দা পার হয়ে গেল। রান্নাবাড়ির পথে গেলে সে তাড়াতাড়ি উত্তরের দরজায় ঢুকে যেতে পারবে। ওরা ওর মুখে পাউডার মেখে দেবে—সে পাগল জ্যাঠামশাইর উপর মনে মনে ভীষণ রাগ করছে। মুখে ওর পাউডার মাখা হল না। ক্ষোভে ওর এখন কান্না পাচ্ছে। সবাই এখন নিশ্চয় উত্তরের দরজাতে আছে। সে অমলা কমলাকে তাদের ঘরে গিয়ে পাবে না ভাবল। সে পড়ি মরি করে জোরে ছুটতে থাকল। আর পৌঁছেই দেখল, কেউ নেই। না হাতি, না অমলা কমলা। বাড়ির সব আলো জ্বলে উঠছে। সবাই ওকে ফেলে বুঝি চলে গেল। সে একা পড়ে গেল। সে যে এখন কি করে! তবু একবার অমলাদের ঘরে খোঁজ নিতে হবে। দাসীবাঁদী কেউ নেই যে বলবে, ওরা গেল কোথায়। সে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। বাড়ি ফাঁকা মনে হল। দু-একটি অপরিচিত মুখ। কেউ ওকে দেখে কথা বলছে না। সে ভয় পাচ্ছে। কোনওরকমে অমলাদের ঘরটাতে যেতে পারলেই আর তার

দুঃখ থাকবে না। অমলা কমলা ওকে ফেলে হাতিতে চড়ে মেলা দেখতে যেতে পারে না। এমন সময়ই সে দেখল প্রাসাদের সব আলো নিভে গেছে। এত যে ঝাড়লণ্ঠন, এত যে বৈভব সব কেমন নিমেষে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। দীঘির পাড়ে ফ্লুট বাজছে না। সেই ময়না পাখিটা তখনও অন্ধকারে ডাকছে, সোনা তুমি কোথায় যাও। কেউ নেই সোনা। আঁধার আঁধার।

এমন অন্ধকার সোনা জীবনেও দেখেনি। এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। কেবল ছায়া ছায়া ভাব। ছায়ার মতো মানুষেরা ছুটাছুটি করছে। ওর পাশ দিয়ে একটা লোক ছুটে বের হয়ে গেল। প্রায় অদৃশ্যলোকে সে যেন এসে পৌঁছে গেছে। সে ভয়ে ভয়ে ডাকল, অমলা!

তখন একটা শক্ত হাত অন্ধকার থেকে বের হয়ে এল। এবং ওর হাত চেপে ধরল—কাকে ডাকছ?

—অমলাকে?

—তুমি কে?

—আমি সোনা।

—কোথায় যাবে?

—অমলার কাছে। ওরা আমাকে নিয়ে দশরাতে যাবে বলেছে। আমার মুখে কমলা পাউডার মেখে দেবে বলেছে।

—ওদের ঘরে তুমি যেতে পারবে না। বারণ। কেউ ঢুকতে পারবে না। সোনা বলল, না, আমি যাব।

—না। সেই শক্ত হাত কার সোনা টের পাচ্ছে না। তবু সে যে স্ত্রীলোক সেটা সোনা বুঝতে পারল। সে বৃন্দাবনী হতে পারে। সোনা ভয়ে বিমূঢ়। রেলিঙে এসে দাঁড়াল। যদি কেউ ওকে এখন কাছারিবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। মনে হল সিঁড়ির মুখে লণ্ঠন। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল মেজবাবু উঠে আসছেন। সামনে ওঁর খাস খানসামা হরিপদ। সে ফের এখান থেকে ছুটে পালাতে চাইল। মেজবাবুকে ঘরে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। শোকাচ্ছন্ন মুখ। সোনা অবাক। এই সেই মানুষ যাকে সে কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছে মঞ্চে নিবিষ্ট মনে ফ্লুট বাজাচ্ছেন। এখন তিনি মূর্ছিত এক প্রাণ। সোনার ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। অমলা কমলার কিছু হয়নি তো! ওদের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতরে অমলা কমলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

হাতিটা একা অন্ধকার প্রাসাদ থেকে ফিরে গেল। কেউ দশরাতে যেতে পারল না। কোনও দুঃসংবাদ এ বাড়িতে এসেছে। কী সেই দুঃসংবাদ কেউ যেন বলতে পারছে না।

পরিবারের দু-একজন ব্যাপারটা জেনেছে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম। সে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। অন্ধকার প্রাসাদে সব বিসর্জন হয়ে গেছে, এখন একা এক নির্জন মাঠের ভিতর দিয়ে শুধু হেঁটে যাওয়া।

সোনা জেদী বালকের মতো বলল, অমলার কাছে যাব।

বৃন্দাবনী বলল, না। না।

সুতরাং সোনা বাইরের দিকে চলে এসে ওদের জানালার দিকে মুখ করে মাঠে বসে থাকল। আলো জ্বললেই ওরা জানালা থেকে সোনাকে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে সে হাঁটু মুড়ে সিঁড়ির ওপর ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে। কী যেন এক টান তার এই দুই মেয়ের জন্য, সোনা মনে মনে ভাবছে, ওদের কিছু হয়েছে, সে সবটা না জেনে কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না ভাবল।

তখনও হাতিটা যায়। অন্ধকারে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে হাতিটা যায়। ইব্রাহিম কলঘরে একটা টর্চ নিয়ে বসে আছে। কোথায় যে কি হল! সে আলোর ঘর অন্ধকার করে বসে থাকল। শুধু ঢাকের বাজনা ভেসে আসছে। হাতিটা এখন নদীর পাড়ে নীরবে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

আর কোথাও বোধ হয় প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছিল। পাগল জ্যাঠামশাই কোথায় আছেন কে জানে! সোনা কারও জন্য জীবনে কিছু কিনতে পারল না। দু'পকেটে ওর চকচকে তামার পয়সা। উপরে জানালা বন্ধ। তখন নদীতে শেষ প্রতিমা বিসর্জন। নদীতে যে আলো, ধূপধুনো, ঢাকের বাদ্যি ছিল এবার তা নিভে গেল। কোথাও আর কিছু জ্বলছে না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। উপরে আকাশ, নির্মল আকাশে সেই অন্তহীন হাজার হাজার নক্ষত্র। নক্ষত্রের আলোতে সে যেন পৃথিবীর যাবতীয় শুভবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। জানালা খুলে গেলেই সে ওদের জন্য কিছু করতে পারে। সে ওদের মুখ দেখার জন্য ঘাসের ভিতর বসে আছে। দু'হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে বসে আছে।

বিসর্জনের পর ভূপেন্দ্রনাথের হুঁশ হল। সোনা কোথায়! ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলের ফের অন্ধকারে ছুটোছুটি। রামসুন্দর আবিষ্কার করল সোনা মেজবাবুর দালান বাড়ির নিচে শুয়ে আছে। সোনা সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছে!

সকালে অন্দর থেকে একটা চিঠি পেল সোনা—আমরা ভোর রাতের স্টিমারে চলে যাচ্ছি সোনা। তোর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হল না।

কাছারিবাড়ির সিঁড়িতে সে সারাটা সকাল একা চুপচাপ বসে থাকল। তার কিছু আজ ভালো লাগছে না। তার মনে হল নদীর চরে কাশের বনে বনে কেবল কে যেন আজ চুরি করে বুকের ভেতর ফ্লুট বাজাচ্ছে।

এবার ওদের ফেরার পালা। ঈশম সকাল সকাল দুটো রান্না করে খেয়ে নিয়েছে। সে খুব সকালে গোটা নৌকার পাটাতন ধুয়েছে। গলুইতে জল জমে ছিল, সব ফেলে দিয়ে একেবারে নৌকা হালকা করে রেখেছে। পাল যেখানে যা সামান্য ছেঁড়া ছিল গতকাল সারাটা দিন সেখানে সযত্নে সূঁচ-সুতা দিয়ে মেরামত করে নিয়েছে। কোনও কারণেই যেন নৌকা চালাতে কষ্ট না হয়। গুণ টানার দড়ি ঠিকঠাক করে সে বসে থাকলে দেখল, মেজকর্তা আসছেন সকলের আগে। মাঝে সোনা লালটু পলটু, পাগল কর্তা, আশ্বিনের কুকুর পিছনে।

এখন স্টিমার ঘাটে খুব ভিড়। যে যার মতো পূজার দিনগুলি গ্রামে কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এই গ্রাম প্রায় শহরের শামিল। এখানে হাইস্কুল আছে। পোস্ট অফিস আছে। বাজার-হাট, আনন্দময়ীর কালীবাড়ি আর বড় বড় জমিদারদের প্রাসাদ মিলে এক জাঁকজমক এই পূজার কটা দিন—তারপর ফের বাবুদের কেউ ঢাকা চলে যান, কলকাতায় যান, গ্রাম থেকে একে একে সবাই চলে গেলে—পুরী খাঁ খাঁ করে।

ভূপেন্দ্রনাথের এমনই মনে হচ্ছিল। ওরা চলে যাচ্ছে। সকাল সকাল ওরা সেদ্ধভাত খেয়ে নিয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিলেন। যতক্ষণ নৌকাটা শীতলক্ষ্যার বুকে দেখা গেল ততক্ষণ তিনি পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ওঁর আর কেন জানি এ সময় কাছারিবাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা হল না। তিনি হেঁটে হেঁটে কালীবাড়ির দিকে চলে এলেন। ভাবলেন, চুপচাপ তিনি কালীবাড়ির বারান্দায় গিয়ে মাকে দর্শন করবেন। পুরোহিত কালু চক্রবর্তী মাঝে মাঝে এসে নানারকম কুশল সংবাদ নিলে হুঁ হাঁ করবেন। আর বারান্দায় বসে সেই ভাঙা প্রাচীর শ্যাওলাধরা দুর্গের মতো বাড়িটাতে কোনও মন্দিরের সাদৃশ্য খুঁজে পান কিনা দেখবেন। কী সাহস মৌলবীসাবের যে, এখানে হাজার লক্ষ মানুষ নিয়ে এসে নামাজ পড়তে চায়? কোরবানী দিতে চায়। এসব করলেই এ অঞ্চলে আগুন জ্বলে উঠবে! তিনি বললেন, মা, তুমি শক্তিদায়িনী। তুমি শক্তি দিও মা। তিনি মনে মনে যেন কোনও ধর্মযুদ্ধের স্বপ্ন দেখছেন। যেন এই মা, আনন্দময়ী, শক্তিদায়িনী মা হাজার হাজার দেবসৈন্য তৈরি করবে শরীর থেকে। এবং অসুর নিধনে উদ্যত হবে। যুগে যুগে মা তুমি মুণ্ডমালাধারিণী।

তারপর ভূপেন্দ্রনাথ মনে মনে হাসলেন। অবজ্ঞায় ওঁর মুখ কুঁচকে উঠল। থানার দারোগা, পুলিশসাহেব সদরের, মায় ম্যাজিস্ট্রেট সব বাবুদের হাতে। একটা তার করে দিলেই স্টিমার বোঝাই করে সৈন্যসামন্ত হাজির হবে। তিনি অবহেলায় মুখ কুঁচকে রাখলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি এত বেশি উত্তেজিত যে হাঁটতে হাঁটতে তিনি নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছেন। তিনি যেন একটা রণক্ষেত্রের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন।

তখন ঈশম হালে বসে সোনাকে বলল, কি গ কর্তা, মুখ কালা ক্যান?

সোনা মুখ ফিরিয়ে রাখল। যেন ঈশম ওর মুখ দেখতে না পায়।

—আর কি, এইবারে নাও ঘাটে লাগাইয়া দিমু। আপনের মায় ঠিক ঘাটে খাড়াইয়া থাকব। গেলেই আপনারে কোলে তুইলা নিব।

পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ নৌকার গলুইয়ে বসে আছেন। রোদ মাথার উপর। ঈশম বার বার অনুরোধ করছে ছইয়ের ভিতর বসতে—তিনি বসেননি। একেবারে অচঞ্চল পুরুষ। পদ্মাসন করে বসে আছেন। রোদে মুখ লাল হয়ে গেছে। সোনার এখন এসব ভালো লাগছে না। সে বাড়ি যাচ্ছে! অমলা কমলা এখন কত দূরে। সে বাড়ি গিয়ে মাকে কেমন দেখবে তাও জানে না। কেমন এক পাপবোধে সেই থেকে সে আচ্ছন্ন। অমলা কমলার কান্না, অথবা সেই রাত্রি ওকে যেন আরও বেশি সচেতন করে দিয়েছে। কেউ যেন বলছে, তুমি এটা ভালো করনি সোনা। সে যেজন্য সারাক্ষণ চুপচাপ বসেছিল নৌকায়।

বাড়ির ঘাটে নৌকার শব্দ পেয়েই ধনবৌ ছুটে এসেছিল। বড়বৌ এসেছে। সে খবর পেয়েছে পাগলমানুষ সাঁতার কেটে, কখনও গ্রামের পথে হেঁটে মুড়াপাড়া চলে গেছেন। যেদিন সোনা ফিরবে সেদিন তিনিও ফিরবেন।

সোনা নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নেমেই মাকে জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণ যে মনটা ভারি ছিল, এখন তা একেবারে হালকা হয়ে গেছে।

বড়বৌ বলল, কি সোনা, মার জন্য কাঁদিসনি ত?

সোনা ঘাড় কাৎ করে না করল।

—ঠিক কেঁদেছিস! তোর চোখমুখ বলছে। কি রে লালটু, সোনা কাঁদেনি?

—না, জ্যেঠিমা।

—তা'হলে আর কি, এবার জ্যাঠামশাইর মতো হয়ে গেলি। যেখানে খুশি চলে যাবি। কারো জন্য মায়া হবে না।

বড়বৌ যেন এই কথায় পাগল মানুষকে সামান্য খোঁচা দিল। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথও যেন সে খোঁচা ধরতে পেরে তাকালেন বড়বৌর দিকে।

বড়বৌ বলল, এস। যেন বলতে চাইল, তুমি কোথাও চলে গেলে আমার ভারি কষ্ট হয়। ভয় হয়। আমার আর কে আছে!

সোনা প্রায় যেন বিশ্ব জয় করে ফিরেছে। তার নূতন অভিজ্ঞতা, হরিণ, ময়ূর এবং বাইস্কোপের বাক্স, এসব তার সকলকে দেখাতে না পারলে অথবা বলতে না পারলে সে মনে মনে শান্তি পাচ্ছে না। প্রথম মালতী পিসিকে সে এসব দেখাবে ভাবল। গোপাটে ফতিমা এলে তাকে দেখাবে ভাবল।

সোনার মনে হল কত দিন পর সে এখানে ফিরে এসেছে, যেন সে দীর্ঘ দিন এখানে ছিল না। সবাইর সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না। সে প্রথমে বড়ঘরে ঢুকেই ঠাকুরমা ঠাকুরদাকে প্রণাম করল। তারপর উঠোনে নেমে এলে বড়বৌ বলল, সোনা, জামা প্যান্ট ছেড়ে খেয়ে নাও!

সোনা এসব শুনল না। ওরা সেই কখন খেয়ে বের হয়েছে, সুতরাং খিদে পাবার কথা। ওরা হাত পা ধুয়ে এলেই বড়বৌ খেতে দেবে। কিন্তু কেউ খেতে আসছে না। সোনা দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে গেল। অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়াল। দক্ষিণের ঘরে আবেদালি বসে আছে। ছোট কাকা বাড়ি নেই। পালবাড়ির সুভাষের বাবা নেই। হারান পালের বাড়ি খালি। সোনা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করল।

শুধু জলে এখন মালতী পিসির পাতিহাঁস সাঁতার কাটছে। সে পুকুরপাড় ধরে কয়েদবেল গাছটার নিচে চলে গেল। এখান থেকে শোভা আবুদের বাড়ি চোখে পড়ে। সে হাঁটুজলে নেমে সোজা ওদের বাড়ি উঠে দেখল নরেন দাস বাড়িতে নেই। সব কেমন খাঁ-খাঁ করছে। শোভা আবু নেই। ওদের মা নেই। এমন কী সে মালতী পিসিকেও দেখতে পেল না। কেবল মনে হল ওদের তাঁতঘরে কেউ বসে তামাক কাটছে।

সোনার কেমন ব্যাপারটা ভূতুড়ে মনে হল। কেউ নেই। সে একা। সূর্য অস্ত গেছে। অথচ বাড়ির পর বাড়ি সে দেখছে খালি পড়ে আছে। ওর কেমন ভয় ধরে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠোন পার হয়ে বাড়ির দিকে ছুটবে ভাবল, আর তখন দেখল মালতী পিসি একটা পিটকিলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। একা। নির্জনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

সে কাছে গেল। অন্য দিন হলে মালতী পিসি ওকে জড়িয়ে ধরত, আদর করত। কিন্তু আজ কেন যে মালতী পিসির চোখ মরা! চুল বাঁধেনি। কেমন রুক্ষ চোখ মুখ। মাঝে মাঝে থুতু ফেলছে। মাঝে মাঝে ঠিক নয়, যেন এক অশুচি ভাব সারাক্ষণ শরীরে—সব সময়ই সে থুতু ফেলে শরীর পবিত্র রাখতে চাইছে। এবং কার সঙ্গে যেন বিড়বিড় করে কথা বলছিল। সোনাকে দেখে আর কথা বলছে না। একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে যে সোনাকে চেনে এমন মনেই হচ্ছে না। সুতরাং সোনা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সোনা

এসেছিল ওর বাইস্কোপের বাক্স দেখাতে, আর এখন মালতী পিসির এমন চেহারা দেখে সে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। মালতী পিসির কী একটা অসুখ হয়েছে। অসুখ হলে মানুষের চোখ-মুখ এমন হয়। সোনা আর দাঁড়াতে পারল না। সে ছুটে এসে জ্যেঠিমাকে বলল, মালতী পিসি গাছের নিচে...সে বলে শেষ করতে পারল না। জ্যেঠিমা বললেন, ওর কাছে যাবে না। ওকে বিরক্ত করবে না!

সে জ্যেঠিমাকে বলল, ছোটকাকা বাড়ি নাই ক্যান? শোভা, আবু, নরেন দাস বাড়ি নাই। পালবাড়ির সুভাষের বাবা নাই! এসব শুনে বড়বৌ এক ফকিরের দরগায় মেলা বসেছে এমন বলেছে। গ্রাম ভেঙে মানুষজন দেখতে গেছে মেলা।

জ্যেঠিমার কথা শুনে সোনার মনে হল এই পৃথিবীতে আবার একটা কিংবদন্তী সৃষ্টি হচ্ছে।

এ এক অলৌকিক ক্রিয়া। কারণ, এক রাতে দুটো ঘটনা ঘটে কি করে! ঘটে না, ঘটতে পারে না। রাতের মাঝামাঝি সময় ফকিরসাবের অলৌকিক আবির্ভাব নরেন দাসের বাড়িতে। সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, অথবা জননীর মতো ফকিরসাব মালতীকে রেখে গেলেন। আর আশ্চর্য, দরগার মানুষেরা অথবা যারা ইন্তেকালে এসেছিল কবর দিতে তারা দেখছে, ফকিরসাবের বিবি, লম্ফ জ্বেলে সেই রাতে বসে আছে দরগায়। পাশে কফিনের ভিতর ফকিরসাবের মৃতদেহ। অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে এমন হয় না। দশ ক্রোশের ফারাক— নদী-নালার দেশ। জোয়ারের জল কখন আসে যায় কেউ টের পায় না। সেই জলে জলে ফকিরসাবের বিবি দিনমানের পথ মুহূর্তে পাড়ি দিয়েছিল। মানুষের মনে তেমন একটা অবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারেনি। গ্রাম-মাঠের জায়গা, নদী-নালার দেশ, খবর পৌঁছাতে সময় লাগল না। নরেন দাস সকলকে ফকিরসাবের অলৌকিক আবির্ভাবের কথা রটিয়ে দিয়েছিল। মধ্যরাতে, আল্লা রহমান রহিম বলে উঁচু লম্বা মানুষের আগমন এবং মৃত্যুর খবর শুনতেই নরেন দাসের মনে হয়েছিল, যোজন দূরে মাথা উঠে গেছে ফকিরসাবের, দুঃখিনী মালতীকে তিনি আলখাল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা পুতুলের মতো বের করে দিয়ে নিমেষে হাওয়ায় লীন হয়ে গেছেন। এই ঘটনায় ফকিরসাব রাতারাতি পীর বনে গেলেন। আবার কিংবদন্তী। ধর্মের মতো, অথবা সেই তালপাতার পুঁথির মতো কেবল কিংবদন্তী। বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে নিরন্তর বিবদমান দুই সাম্রাজ্য। একপাশে সোনা। মাঠ পার হলে গোপাট, গোপাটের ওপাশে ফতিমা।

ফতিমা এলেই সোনা সেদিন এই সন্ধ্যায় বাইস্কোপের বাক্স তাকে দিয়ে দিল।

—কেডা দিল সোনাবাবু?

—অমলা।

—ক্যান দিল?

—খুব ভালোবাসে আমারে।

ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে চুপচাপ বাবুর মুখ দেখল। তারপর বলল, বাইস্কোপের বাক্স আমার লাগে না।

সোনা বলল, ক্যান লাগে না?

—লাগে না। আমি নিমু না।

সোনা বলল, ক্যান নিবি না?

ফতিমা কথা বলল না। সোনাবাবু মুড়াপাড়া থেকে ফিরে এসেছে শুনেই সে জল ভেঙে চলে এসেছে পুকুরপাড়ে। জল বেশি নেই গোপাটে। পায়ের পাতা ডুবে যায় এমন জল। ফতিমা বাবুর সঙ্গে কথা না বলে শাড়িটা একটু ওপরে তুলে, জলে নেমে গেলে সোনা বলল, অমলা বলল, অমলা আমার পিসি হয়।

ফতিমা ঘাড় কাৎ করে তাকাল এবং উঠে এসে বাইস্কোপের বাক্সটার জন্য হাত পাতল।

সোনা দেবার আগে ফতিমাকে বাক্সের খোপে চোখ রাখতে বলল। সে ছবি পাল্টে পাল্টে দেখাচ্ছে। ফতিমা এই ছবিগুলির ভিতর আরব্য রজনীর রহস্যময় জগৎ আবিষ্কার করে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। যেন এবার ওর চোখ তুলে বলার ইচ্ছা—সোনাবাবু, এতদিন কোথায় ছিলেন। তারপর ওর চোখ মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়, সে বিকেল হলেই পুকুর পাড়ে পেয়ারা গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই গাছটার নিচ থেকে মাঠের এপারে এই অর্জুন গাছ স্পষ্ট! অর্জুন গাছের নিচে কেউ এসে দাঁড়ালেও স্পষ্ট। কেবল পাট গাছগুলি জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বড় হয়ে গেলে দুটো গাছের নিচই ঢাকা পড়ে যায়। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। তখন পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়ালে ওপারে অর্জুনের ছায়ায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা বোঝা যায় না। পাট কাটা হলে সব আবার খালি। ফতিমা বিকেলে গাছের নিচে দাঁড়ালেই টের পায় সোনাবাবু কোথায়। সে বিকেলে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অথচ সে বাবুর মুখ দেখতে পায়নি একবারও। কেমন একটা ক্ষোভ অভিমান এতদিন ভিতরে ভিতরে ছিল। বাইস্কোপের বাক্সটা দিতেই অভিমান ওর জল হয়ে গেল।

ফতিমা বলল, নানী কইছে একবার যাইতে।

সোনা বলল, বলবি নানী বলছে যেতে।

—এটা ত বইয়ের ভাষা।

—বইয়ের ভাষার কথা বলতে শিখবি।

—আমার লজ্জা লাগে।

আমারও। বলে সে হা হা করে হেসে উঠল। অমলা-পিসি জ্যেঠিমার মতো কথা বলে।

আমাকে বলে, সোনা যামু কিরে, যাব বলবি।

—আপনে কি কইলেন?

—কইলাম লজ্জা লাগে।

—আমারও লাগে। বলেই ফতিমা নেমে গেল জলে, তারপর সারা মাঠে জল ছিটিয়ে মাঠের ওপারে উঠে পেয়ারা গাছটার নিচে হাত তুলে দিল। সোনাও হাত তুলে দিল। সিগনাল পেয়ে যে যার গাড়িতে যে যার বাড়িমুখো রওনা দিল।

সোনা দক্ষিণের ঘরে ঢুকে দেখল, অলিমদ্দিও নেই। আবেদালি শুধু বসে রয়েছে। অলিমদ্দি এবং ছোট কাকার ফিরতে দেরি হবে। ফকিরের দরগায় গেছে ওরা। সুতরাং এতবড় বাড়িতে কোনও পুরুষমানুষ থাকবে না, রাতে চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব, সেজন্য শচীন্দ্রনাথ আবেদালিকে রেখে গেছেন বাড়ি পাহারা দিতে। আবেদালি থাকবে, খাবে এবং বাড়ি পাহারা দেবে। সোনা নিজে একটা হ্যারিকেন এনে বৈঠকখানার দাওয়ায় রেখে দিল।

সোনা আবেদালিকে বলল, আপনে গ্যালেন না?

—কোনখানে?

—ফকিরসারের দরগায়।

—কাইল যামু।

কারণ ঈশম যখন এসে গেছে তখন আর তার থাকবার কথা নয়। সবাই যাবে দরগাতে। সময় পেলেই চলে যাবে।

কোথাও যাবার নাম শুনলে সোনারও যাবার ইচ্ছে হয়। মেলার কথা মনে হলেই সেই সার্কাসের কথা মনে হয়, দুই বাঘের কথা মনে হয়। সে কি ভেবে এবার হ্যারিকেনের উপর ঝুঁকে বসল। আজও পড়া থেকে ওদের ছুটি! কাল থেকে, ঠিক কাল থেকে না, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শেষ হলে রাত-দিন জেগে পড়া! স্কুল খুললেই পরীক্ষা। সুতরাং সে একটু সময় পেয়ে আবেদালির মুখ দেখছে।

আবেদালি কেমন নির্জীব মানুষ হয়ে গেছে। জব্বর এখনও নিখোঁজ। আবেদালির শরীর ক্রমে ভেঙে আসছে।

জালালি মরে যাবার পর থেকে দ্বিতীয় পক্ষের বিবিটা আবেদালির অভাব অনটন বুঝতে চায় না। কেবল খাই খাই ভাব। যা রাঁধবে, নিজে একা খাবে, ওকে পেট ভরে

খেতে দেবে না। সে এই বাড়িতে আজ রাতে পেট ভরে খেতে পাবে। ওর কাঁচা পাকা দাড়ির ভিতর পেট ভরে খাবার লোভী মুখটা ধরা পড়ছে। কেবল চোখ দেখলে টের পাওয়া যায়, জব্বরটা ওকে বড় ছোট করে দিয়ে গেছে। থানা-পুলিশ হতো, কিন্তু ফকিরসাবের এমন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের পর সবাই সব ভুলে গিয়ে দরগার মেলা নিয়ে মেতে উঠেছে।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য এই মালতী। যে রাতে ফিরে এল মালতী, হল্লা করে লোক জড়ো করল না নরেন দাস। চেঁচামেচিতে বোঝা দায় সব—তবু ওর যা কথা তাতে বোঝা যাচ্ছে—ফকিরসাব, আর সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ফুসমন্তরে জ্বলে উঠেছিল এক অগ্নিশিখা—শিখার প্রচণ্ড আলোতে ঋষিগণের সহস্র মুখ যেন সারা উঠোনে ভেসে বেড়াচ্ছিল—যেন বলছেন ফকিরসাব, আমার জননীরে কেউ অসতী করে নাই নরেন দাস। তারে তুমি তুলে লও। প্রায় গোটা ব্যাপারটা নরেন দাসের কাছে সীতার বনবাসের মতো মনে হয়েছিল।

মালতী অন্ধকারে চুপচাপ। সে কোনও কথা বলছিল না। পাষাণ প্রতিমার মতো তার শক্ত মুখ। চোখ দুটো কেবল জ্বলছিল। তাকে প্রশ্ন করলে কোনও জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। সে ক্রমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সে ক্রমে চুপচাপ, অর্থহীন দৃষ্টি। সে বারান্দায় চিড়িয়াখানার জীবের মতো বসেছিল। পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে দেখে যাচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। ফকিরসাবের মতো মানুষ হয় না। আল্লার বান্দা তিনি এমন বলাবলি করছিল।

এভাবে একদিন গেল দু'দিন গেল। নরেন দাস তার বোনকে কেন জানি আর জলচল করে নিতে পারল না। জাতিতে যবন, এরা মানুষ না, ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে, সুতরাং বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, যবনে ছুঁলে ছত্রিশ। সে মালতীর জন্য ঢেঁকিঘরের বারান্দায় একটা খুপরি করে দিল। সেই খুপরিতে ঠিক একটা পাতিহাঁসের মতো মালতী এক সকালে ঢুকে গেল।

আর আশ্চর্য, খুপরি ঘরে এমন এক সুন্দরী বিধবা একা থাকতে সাহস পেয়ে গেল। শরীরে তার আর কি আছে যা মানুষ জোর করে কেড়ে নিতে পারে! সে এতদিন সোহাগে সব লালন করছিল। এবং আকাশে নানারকম নক্ষত্রের ছবি দেখলে তার যার কথা বেশি মনে হতো, সেই রঞ্জিত, যুবক এক, তাকে না বলে চলে গেছে, সে তাকে আর কিছু দিতে পারল না। এই উচ্ছিষ্ট শরীরের কথা ভাবলেই ওর মুখে থুতু উঠে আসে। সারাদিন জলে ডুবে থাকতে চায়। জলে নামলেই মনে হয় তার শরীর পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। জলে ডুবে গেলে মনে হয়, আহা কি শান্তি মা জননী জাহ্নবীর কোলে। সে ডুবে গেল কি-না, তার আঁচল অথবা চুল ভেসে থাকল কি-না, কী শীতের রাত, কী গ্রীষ্মের দাবদাহে শুধু তার এমন এক প্রশ্ন।

প্রতিবেশী বালকদের এটা একটা খেলা হয়ে গেল। মালতী পিসি কেবল ভোঁস ভোঁস করে একটা উদবিড়ালের মতো ডুবত ভাসত। ওরা পাড়ে দাঁড়িয়ে খেলা করত অথবা ঠাট্টা-তামাশা করত, পিসির আঁচল ভেসে আছে বলত। অথবা চুল, না না চুল না, তোমার পায়ের আঙুল দেখা যাচ্ছে, হাতের আঙুল, তোমার শাড়ি জলের ভিতর বাতাস পেয়ে পাল তুলে দিতে চেয়েছে। তোমার সব ডুবে যায়নি, তুমি কেবল কিছু-না-কিছু নিয়ে জলের ওপর ভেসে আছ। এমন যখন বলত বালকেরা, তখন মালতীর কী করুণ মুখ! আমার সব তবে ডোবে না, আমার কিছু-না-কিছু ভাইসা থাকে! দ্যাখ দ্যাখ সোনা, ডুবে আছি কি-না দ্যাখ।

সোনা বলত, পিসি, তুমি ডুইবা গ্যাছ।

তারপরই মালতী সারা ঘাটে জল ছিটিয়ে উঠে আসত। চারপাশে শুধু অপবিত্র এক ভাব। সে বালতি থেকে জল ছিটাত আর ঘরের দিকে এগিয়ে যেত। শুচিবাইগ্রস্ত মালতী এভাবে ক্রমে জলে ডুবে থাকতে থাকতে একসময় শ্রীহীন রুক্ষ, এবং পাগলপ্রায় হয়ে গেল। সারা রাত অভিমানে চোখ ফেটে জল আসে। চোখে ঘুম থাকে না। সোনা যখনই এসেছে, দেখেছে মালতী পিসি জলে সাঁতার কাটছে। জল থেকে কিছুতেই উঠতে চাইছে না। মুখ বড় করুণ। শরীর থেকে কারা যেন তার প্রাণপাখি নিয়ে পালিয়েছে। নরেন দাস বকে বকে জল থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে শরৎকালটা কেটে গেল সোনার। শশীভূষণ পূজার ছুটি শেষ হলে চলে আসবেন। হেমন্তের দিনে পড়ার চাপ বেশি। ওকে সকালে এবং রাতে বেশিসময় শশীভূষণ নিজের কাছে পড়ার জন্য বসিয়ে রাখবে। পাগল জ্যাঠামশাই কিছুদিন হল কোথাও যাচ্ছেন না। সোনার ধারণা সে-ই জ্যাঠামশাইকে শান্ত এবং ধীর স্থির করে তুলছে। জ্যাঠামশাই সেই যে হাতি দেখতে গিয়ে ভালো হয়ে যেতে থাকলেন যেন ক্রমে তিনি সেই থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছেন। সে মাঝে মাঝে জ্যাঠামশাইকে তামাক সেজে দেয়। তামাক খান তিনি। বসে বসে আপন মনে সেই কবিতা আবৃত্তি করেন। স্নানের সময় স্নান, আহারের সময় আহার। রাতে তিনি ওদের পড়ার টেবিলের একপাশে ছোট্ট পড়ুয়ার মতো সরল বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে বসে থাকেন। যেন খুব নিবিষ্ট পড়াশোনায়। তিনি কখনও সোনার শ্লেট নিয়ে পেনসিলে নানা রকমের প্রজাপতি, অথবা নদীর সাঁকো, কিংবা মাঠের ছবি আঁকেন। কাউকে তিনি আর বিব্রত করেন না। সোনা লক্ষ্মীপূজার জন্য টুনিফুল আনতে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই নৌকা বাইছিলেন। এবং যেখানে এই দুর্লভ টুনিফুল পাওয়া যায় ঠিক সেখানে, তিনি তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এইসব জীবনের ভিতর সোনা দেখেছে বড় জ্যেঠিমা খুশি। তিনি সারাদিন সংসারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন। জ্যাঠামশাই বাড়ি থাকলে, জ্যেঠিমার আর কোনও দুঃখ থাকে না। কপালে বড় গোল করে সিঁদুর, মাথায় লম্বা সিঁদুর, লাল পেড়ে কাপড়, কী ধবধবে এবং সাদা, আর শ্যামলা রঙের জ্যেঠিমাকে কখনও কখনও রামায়ণে বর্ণিত নারী চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।

এইভাবে কার্তিক পূজার দিন এসে গেল। ফতিমা অর্জুন গাছের নিচে এসে একদিন বলে গেছে, ওর এবার দুটো শ্রীঘট চাই। শ্রীঘটের কথা সে মাকে বলেছে, জ্যেঠিমাকে বলেছে। সে ওদের প্রত্যেকের কাছ থেকে শ্রীঘট নিয়ে রাখবে। এবং কার্তিক পূজার পরদিন ফতিমা এলে দুটো নয়, এবার চারটা দেবে। যেমন অমলা কমলা ওকে নানাবিধ দ্রব্য দিয়ে খুশি রাখতে চেয়েছে, সে তেমনি এই মেয়ে—কী যে মেয়ে, পায়ে মল, নাকে নোলক, ডুরে শাড়ি পরা মেয়ে তার জন্য অপেক্ষায় থাকে—সে তাকে কিছু দিতে পারলেই মহৎ কিছু করে ফেলেছে, এমন ভাবে।

আর কার্তিক পূজার দিনই ঘটনাটা ঘটল।

ওরা বিকেলে গেছে মাঠে। সন্ধ্যার সময় চার পাশের জমিগুলিতে আগুন জ্বালানো হয়েছে। 'ভাল-বুড়াতে' আগুন দিচ্ছে সবাই। সংসারের যাবতীয় পাপ মুছে, পরিবারের মানুষেরা হেমন্তের মাঠ থেকে পুণ্য তুলে আনতে গেছে। অলক্ষ্মী ফেলে লক্ষ্মী আনতে গেছে সবাই। সোনা লালটু পলটু তিনজন তিনটা 'ভাল-বুড়াতে' আগুন দিয়ে এখন মাঠের উপর ছুটছে। ওরা ওদের সবচেয়ে যে জমি ভালো ফসল দেয় সেখানে আগুনের দণ্ডগুলি পুঁতে দিল। তারপর চাই কার্তিক পূজার জন্য সবচেয়ে পুষ্ট ধানের ছড়া। এখন ওরা তিনজন এই হেমন্তের মাঠে সেই পুষ্ট ছড়ার জন্য জমি থেকে জমিতে ক্রমে সোনালী বালির নদীর চর পার হয়ে চলে যাবে। যে যত বড় ছড়া নেবে সে তত বেশি পুণ্য বহন করবে সংসারের জন্য। এভাবে এক প্রতিযোগিতা—সোনা একটা বড় ছড়া কেটে বলল, কি বড়, দ্যাখ দাদা! আর তখন পলটু বলল, কৈ দ্যাখি। দেখে বলল, বড় না ছাই। বলে আরও একটা বড় ছড়া দেখাল। এবং ক্রমে এভাবে ওরা ছড়ার জন্য দূরের মাঠে নেমে গেল। পছন্দ হচ্ছে না। মনে হয় এ জমি পার হয়ে গেলে বড় মিঞার জমি, জমিতে ফসল হয় সবার সেরা, অথবা কোথাও এমন জমি আছে যেখানে তাদের জন্য পুষ্ট ছড়া নিয়ে মা লক্ষ্মী অপেক্ষা করছেন। ওরা এখন মাঠে মাঠে মা লক্ষ্মীকে খুঁজছে।

ওরা তিনজন এভাবে অনেকদূরে চলে এল। পুষ্ট এবং বড় ধানের ছড়া না নিতে পারলে গৌরব করা যাবে না। বড় জেঠিমা বলবেন ও মা, দ্যাখ ধন, তোর ছেলে কত বড় ছড়া এনেছে! এই মাঠে পুষ্ট ধানের ছড়াটির জন্য ওরা জমি থেকে জমিতে ঘুরছে। আবছা অন্ধকার। হেমন্তের মাঠ বলে সামান্য কুয়াশা। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না আকাশে বাতাসে। ওরা নুয়ে একটা করে ধানের ছড়া হাতে নিয়ে দেখছে আর রেখে দিচ্ছে। হাত দিয়ে মাপছে। না, বড় ছোট! প্রায় হাত লম্বা না হলে কার্তিক ঠাকুরের গলায় মালার মতো দোলানো যাবে না।

তখন লণ্ঠন হাতে কারা যেন নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে এদিকে আসছে। লণ্ঠনের আলো দেখে মনে হল ওরা অনেক দূরে চলে এসেছে। ওদের খেয়ালই ছিল না, ওরা নদীর চর ভেঙে হাইজাদির মাঠে পড়েছে। লণ্ঠনের আলো দেখে ওদের বাড়ি ফেরার কথা মনে হল।

কাছে এলে সোনা দেখল, ফেলু যাচ্ছে। মাথায় বড় একটা ট্রাঙ্ক। ফেলু মাথায় বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে যাচ্ছে। পিছনে সামসুদ্দিন। এবং সবার পিছনে ফতিমা। ফতিমা আজ শালোয়ার পরেছে। লম্বা ফুল হাতা ফ্রক সোনালী রঙের। কাল ফতিমার আসার কথা অর্জুন গাছটার নিচে। সে ফতিমার জন্য চারটা শ্রীঘট রেখে দেবে। এ-সময়ে কোথায় যাচ্ছে ফতিমা সেজেগুজে! সে ফতিমাকে দেখেও কিছু বলতে পারল না।

সামসুদ্দিন এত বড় মাঠে ওদের তিনজনকে দেখে কেমন একটু বিস্মিত হল। সে বলল, আপনেরা!

—ধানের ছড়া খুঁজতে আইছি।

সামসুদ্দিনের এতক্ষণে মনে পড়ল আজ কার্তিক পূজা। সবাই বের হয়ে পড়েছে পুষ্ট ধানের ছড়া খুঁজতে মাঠে। সে বলল, পাইছেন নি!

ওরা যা সংগ্রহ করেছিল দেখাল।

সামুসুদ্দিন হাসল। —মা-লক্ষ্মী এত ছোট হইব ক্যান। আসেন আমার লগে।

ওরা ফের হাঁটছিল। সোনা কিছুতেই কিছু বলছে না। সে ফতিমার পাশাপাশি হাঁটছে তবু কথা বলছে না। ফতিমাও কিছু বলছে না। সে আর বেশিক্ষণ অভিমান নিয়ে থাকতে পারল না। বলল, তুই ছিরাঘট নিবি না!

—রাইখা দিয়েন। ঢাকা থাইকা আইলে নিমু।

—তুই ঢাকা যাইবি?

—আমরা সবাই ঢাকায় যামু। আমি স্কুলে পড়মু। বাড়িতে নানী একলা থাকব।

সোনা বলল, কৈ তুই আগে কস নাই ত?

—কমু কি! বা'জি সকালে সব কইল।

সোনা জানে ফতিমার বাবা বাড়ি এলে সে কোথাও যায় না। সোনা আবার চুপ করে গেল। ফতিমাও কিছু বলছে না। সে বলল, সোনাবাবু আপনে আমারে চিঠি দিবেন।

—যা! চিঠি দিমু কিরে!

—আপনে কেমন থাকেন জানাইবেন।

—ছোট কাকায় বকব।

ফতিমা বলল, বিকেলে আমি কানতে ছিলাম, বা'জি কইল, তুই কান্দস ক্যান? তর আবার কান্দনের কি হইল?

—কিছু হয় নাই কান্দনের?

তখন সামসুদ্দিন বলল, এই দ্যাখেন পুষ্ট ধানের ছড়া। সে বিলের জলে একটা গামছা পরে নেমে গেল। এতবড় ধানের ছড়া কোনখানে খুঁইজা পাইবেন না। এই বলে সে তিনজনের হাতে তিন গুচ্ছ বড় বড় ধানের ছড়া দিয়ে বলল, জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। কি বলেন কর্তা? লক্ষ্মীরে আনতে গেলে কষ্ট লাগে। এই বলে সে গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেলুকে বলল, তরা হাঁটতে থাক। আমি অগ দিয়া আসি। অরা চিনা বাড়ি উইঠা যাইতে পারব না।

সামসুদ্দিন অর্জুন গাছটা পর্যন্ত এল। পুবের বাড়ি সামনে এবং সেখানে মালতী আছে—জব্বর মালতীকে চুরি করার তালে ছিল। ফকিরসাব ওকে এখানে রেখে গেছেন—এবং জব্বর ওর দলের পাণ্ডা—সুতরাং এই অপরাধের জন্য সে কিছুটা দায়ী, ওকে দেখলে এমন মনে হয়। সামসুদ্দিন ভিতরে ভিতরে এই অসম্মানের জন্য পীড়িত। সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল। সে নানাভাবে মুসলমান মানুষের ভিতর আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, যা এতদিন নসিব বলে মেনে আসছিল সবাই, সে তা আঙুলে তুলে দেখিয়ে দিয়েছে—ওটা নসিব নয়। ওটা আপনাদের অসম্মান। আপনারা এতদিন তা গায়ে মাখেননি। কিন্তু জাতির আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে গেলে কিছু কঠিন উক্তি তাকে সময়ে অসময়ে করতে হয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে জব্বরের এমন ইতর কাজ! ভিতরে নিয়ে তার জন্য সে জ্বলে-পুড়ে খাক হচ্ছিল। সহসা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া নানা মানুষ নানাভাবে ব্যাখ্যা করবে। সে যাচ্ছে। যেন এখানে থাকলেই ওর মালতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সে কিছু বলতে পারবে না। সে মাথা নুয়ে অসম্মানের দায়ভাগ কাঁধে তুলে নেবে শুধু। মালতীর সামনে পড়ার ভয়েই বোধ হয় সে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। অবশ্য সে হাজিসাবের ছোট ছেলে আকালুকে দলের পাণ্ডা করে দিয়ে গেছে। শহরে কাজের চাপ বেড়ে গেছে। সে এখন থেকে শহরেই থাকবে।

সামসুদ্দিন আর উঠে আসতে সাহস পেল না। নরেন দাসের বাড়িতে কোনও লম্ফ পর্যন্ত জ্বলছে না। সে একা দাঁড়িয়ে থাকল অর্জুন গাছটার নিচে। যতক্ষণ না ওরা উঠে গিয়ে বলল, আপনে যান, ততক্ষণ সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বার বার লক্ষ রাখছে নরেন দাসের বাড়িতে লম্ফ জ্বলছে কিনা। সে কেমন এখানে ভীতু মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বার বার মালতীর লম্ফের আলোতে মুখ দেখার ইচ্ছা। মালতী, তুই আমার কসুর মাপ কইরা দেইস, এমন বলার ইচ্ছা। সে আবার মাঠের দিকে হেঁটে গেলে গাছের নিচটা কেমন খালি হয়ে গেল।

সোনা বাড়ি উঠে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দেখল মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। শশীভূষণ দেশ থেকে চলে এসেছেন। ওদের দেখেই তিনি বললেন, কী তোমরা অলক্ষ্মী ফেলে লক্ষ্মী এনেছ! দেখাও তো লক্ষ্মীরে।

ওরা ধানের ছড়া আলোতে তুলে দেখাল।

—খুব বড় ছড়া দেখছি। কোথায় পেলে?

সোনা তার ছড়াও দেখাল। ওরটা সবার বড় কি-না, না ছোট, সে তার মাস্টারমশাইর কাছ থেকে ছড়া দেখিয়ে তার সার্টিফিকেট চাইল।

শশীভূষণ সোনার ইচ্ছা বুঝতে পেরে বলল, সবার বড় সোনার ছড়া। সোনা সেই-না শুনে ছুটে গেল ভিতরে। মা জ্যেঠিমা কার্তিক পূজার ঘরে নানারকম আলপনা দিয়েছেন। হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। জলচৌকিতে কার্তিক ঠাকুর। নিচে সারি সারি শ্রীঘাট। ঘটে আতপ চাল, উপরে জলপাই। সে তার ধানের ছড়া মাকে দিল। মা দু'হাতে সোনার হাত থেকে ধানের ছড়া বরণ করে নিলেন।

কিন্তু শশীভূষণকে দেখেই সোনার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। সে আর খুব একটা এ পূজায় উৎসাহ পেল না। মাস্টারমশাই বড় কড়া প্রকৃতির লোক। তিনি খুব সকালে উঠবেন। সবার দরজায় গিয়ে ডাকবেন, সোনা ওঠ। লালটু ওঠ। পলটু ওঠ! হাত-মুখ ধুয়ে নে। তিনি সবাইকে ঘুম থেকে তুলে মাঠে নিয়ে যাবেন। প্রাতঃকৃত্যাদি হলে, মটকিলার ডাল দেবেন। দাঁত মাজতে বলবেন। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাঁত মাজা হলে বলবেন, উঠে এস। তার জন্য আলাদা একটা তক্তপোশ দিয়েছিলেন শচীন্দ্রনাথ। বড় তক্তপোশ। তিনি সেখানে রাজ্যের সব গাছগাছড়া জড়ো করে রেখেছেন। পেটের পীড়া, দাঁত ব্যথা, বাত এবং মাথাধরা এবং অন্যান্য যাবতীয় রোগে তিনি ওষুধ দেবেন। ওরা মুখ ধুয়ে এলেই ভিজা ছোলা দেবেন। গুনে গুনে দেবেন। এবং গুনে গুনে ফ্রি- হ্যাণ্ড একসারসাইজ করাবেন। পড়া হলে স্নান। তেল মেখে দেবেন সোনার মাথায়। সকলকে নিয়ে তিনি পুকুরঘাটে সাঁতার কাটবেন। তারপর গরম ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা এবং হেঁটে স্কুলে যাওয়া। শশীভূষণ এলেই ওরা একটা নিয়মের ভিতর আবার মানুষ হবে এমন ঠিক থাকে।

এই নিয়মের ভিতর শশীভূষণের যত রাগ লালটুর উপর। লালটুর ডনবৈঠক একশ দশ বার। সোনার পঞ্চাশবার। আর পলটুর একশ কুড়িবার। পলটু ঠিক ওঠবোস করে কাজ সেরে নেয়। সোনাও। কিন্তু লালটু দেরি করে ওঠ-বস করবে। মাঝে মাঝে উঠতে বসতে ওর প্যান্ট হড়হড় করে নেমে আসে। শশীভূষণ তখন কান ধরে তুলে দেন। এবং চিৎকার করতে থাকেন, ধনবৌদি, ধনবৌদি।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ধনবৌ ছুটে এসে দেখতে পায়, লালটু উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঠতে বসতে ওর প্যান্ট খুলে গেছে। প্যান্টে ওর দড়ি নেই।

—এটা কি!

—আমি কি করমু কন! ওর প্যান্টে কিছুতেই ডোব থাকে না।

—-আচ্ছা, দেখছি। বলে তিনি পাট দিয়ে বেশ শক্ত করে সুতলি পাকিয়ে ওর প্যান্টে ডোর ভরে দিতেন। লালটু ভয়ে ভয়ে আর প্যান্ট থেকে দড়ি খুলে ফেলত না। লালটু জব্দ এই মাস্টারমশাইর কাছে।

সোনা শশীভূষণকে দেখলেই এসব মনে করতে পারে।

মনে করতে পারে একটা উড়োজাহাজের কথা। সেই প্রথম এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে। ঢাকার কাছে কর্মিটোলাতে যুদ্ধের জন্য ঘাঁটি হয়েছে। মেজ-জ্যাঠামশাই বাড়ি এলে যুদ্ধের গল্প করেন। মাঠ থেকে উড়োজাহাজ দেখে সে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন রাস্তায় দেখা।

—এই খোকা, শোন!

সে বিদেশী শব্দ শুনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল।

— ঠাকুরবাড়ি কোন দিকে?

সে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

ছোট করে চুল ছাঁটা মানুষটার। তিনি নবদ্বীপের মানুষ। এখানে তিনি হাইস্কুলে হেডমাস্টার হয়ে এসেছেন। বারদি থেকে হেঁটে এসেছেন বলে হাতে পায়ে ধুলো। সোনা বাড়িটা দেখিয়েই ছুটে হারাণ পালের বাড়ির ভিতর ঢুকে সোজা চলে এসে ছোটকাকাকে খবরটা দিয়েছিল। দিয়েই সে আবার বারবাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল—কতক্ষণে সেই মানুষ পুকুর পাড়ে উঠে আসেন।

শশীভূষণ বাড়িতে ঢুকে বলেছিলেন, এটা তোমাদের বাড়ি! সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

—শচীন্দ্রনাথ তোমার কে হয়?

—কাকা।

—একবার কাকাকে ডাকো দেখি।

ততক্ষণে শচীন্দ্রনাথ বারবাড়ির উঠোনে চলে এসেছেন। ওঁকে দেখেই শশীভূষণ নমস্কার করেছিলেন। বলেছিলেন, এলাম।

—আসেন। শচীন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় নিয়ে ওঁকে বসিয়ে দিলেন। —এই আপনের ঘর, এই তক্তপোশ। আর এই তিন বালক।

সোনা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছিল, ওদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই—যাঁর আসার কথা অনেকদিন থেকে যিনি বরিশালের কোন অঞ্চলে শিক্ষকতা করতেন সেকেণ্ড

মাস্টারের, এখানে হেডমাস্টারের চাকরি পেয়ে চলে এসেছেন। শচীন্দ্রনাথই এ-ব্যাপারে বেশি স্কুলের জন্য খেটেছেন। এবং কথা ছিল হেডমাস্টারমশাই ঠাকুরবাড়িতেই থাকবেন, খাবেন। এবং এই তিন বালকের প্রতি নজর রাখবেন। শচীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তোমরা মাস্টারমশাইকে প্রণাম কর।

ওরা সেদিন কে কার আগে প্রণাম করবে— ঠেলেঠুলে প্রণাম করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পায়ে।

প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, তোমাদের দাঁত দেখি। সোনা দাঁত দেখিয়েছিল।

—ভালো করে দাঁত মাজা হয় না। বলে তিনি নিজে হাত পা ধুয়ে আসার সময় একরাশ মটকিলার ডাল কেটে আনলেন। এবং সবাইকে একটা করে দিয়ে—কী ভাবে দাঁত মাজতে হয়, দাঁত নিচ থেকে ও পরে মাজতে হয়, এই দাঁত মাজা আমরা আদৌ জানি না, দাঁত থেকেই সব রোগের উৎপত্তি এমন বলে তিনি নিজে দাঁত মেজে খাঁটি নমুনা দেখিয়েছিলেন।

সোনা, লালটু, পলটু বাইরে এসে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছিল।

সেই মাস্টারমশাই আবার এসে গেছেন। সোনা আর যখন তখন পড়া ফেলে অর্জুন গাছের নিচে ছুটে যেতে পারবে না।

সোনা হ্যারিকেন নিয়ে হাত পা ধুতে ঘাটের দিকে চলে গেল। সে কেমন বিমর্ষ। ফতিমা নেই এবং সে অন্যমনস্ক। অন্যমনস্ক না হলে সে একা ঘাটে হ্যারিকেন নিয়ে হাত পা ধুতে আসতে পারত না। ওর ভয় করত।

সে ঘাটে নেমে গেল। হ্যারিকেনটা তেঁতুল গাছের গোড়ায় রেখেছে। সে পা ধোওয়ার জন্য জলে নামতেই সামনে কি দেখে ভয় পেয়ে গেল। জলের ওপর ঠিক মাছরাঙা পাখির মতো এক জোড়া পায়ের পাতা ভাসছে। লাল। যেন সিঁদুর গুলে পায়ের পাতায়, কেউ মা লক্ষ্মীকে জলে ভাসিয়ে গেছে। লক্ষ্মীর পায়ের মতো দু'পা জলে ভাসিয়ে নিচে কেউ ডুবে আছে। সে দেখেই লাফ দিয়ে ছুটে পালাল! হ্যারিকেন পায়ে লেগে পড়ে গেল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে বলতে বলতে কেমন তোতলা বনে গেল!

শশীভূষণ মুহূর্ত আর দেরি করলেন না। শচীন্দ্রনাথ এবং নরেন দাস ছুটে এল। শশীভূষণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিচে মনে হল মাথার কাছে একটা শক্ত কিছু লাগছে। তিনি ডুব দিয়ে তুলে আনলে দেখলেন, মালতী। গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা। পায়ে আলতা পরেছে। কপালে সিঁদুর আর হাতে গলায় ওর যত গয়না ছিল সব পরে সে জলের নিচে অন্তর্ধান করতে চেয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ নাড়ি টিপে বুঝলেন, প্রাণটা ভিতরে এখনও আছে। চোখ দুটো বোজা। মালতী অজ্ঞান হয়ে আছে, গলগল করে জল বমি করছে। ফ্যাকাসে মুখ। কপালে বড়

সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, পায়ে আলতা। চারপাশে যে এত ভিড় শচীন্দ্রনাথ তা লক্ষ করলেন না। তিনি অপলক অভাগিনী মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছেন। ওরা নুন দিয়ে ওর শরীর ধীরে ধীরে ঢেকে দিতে থাকল। মেয়েটা চোখ বুজে এখন নুনের নিচে বুঝি নিভৃতে ঘুম যাচ্ছে। সকাল হলেই জেগে উঠবে। সেই আশায় সকলে আলো জ্বালিয়ে চারপাশে বসে থাকল। সোনা সে রাতে ঘুম যেতে পারল না। শিয়রে সেও জেগে বসেছিল। বার বার রঞ্জিতমামার কথা তার মনে পড়ছে। তার কেন জানি রঞ্জিতমামার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

উপরে হেমন্তের আকাশ। নিচে ধানের মাঠ। আর রাতের অজস্র তারার আলো এবং মানুষজনের ভিড় চারপাশে। মালতী নুনের নিচে শুয়ে আছে। যেন ঘুম যাচ্ছে। সোনা রাত বাড়লে আর জেগে থাকতে পারেনি। সে যে শতরঞ্জ পাতা আছে দক্ষিণের ঘরে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, আশ্চর্য, দেখল, রঞ্জিতমামা একটা লাঠি হাতে ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন। ছোটকাকা মামাকে কি সব বলছেন।

রঞ্জিত মালতীর পায়ের কাছে এসে বসল। ওর এটাচিটা সোনা এনে বড় জ্যেঠিমাকে দিয়ে দিল। মুখে ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ক'রাত জেগে জেগে হেঁটে-হেঁটে এতদূর এসেছে। ক্লান্ত এবং ঘুম যাবে বলে উঠে এসেছিল। ভিড় এবং হ্যাজাকের আলো রঞ্জিতকে প্রথমে বিস্মিত করেছিল, এবং এই বিস্ময় প্রচণ্ড ওকে নাড়া দিয়েছে। ওর মনে হল নরেন দাসই এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী।

নরেন দাস ওকে একটা খুপরিতে রেখে দিয়েছে। অথবা সেই জব্বর। সে এখন কোথায়! ওর অবশ্য এসব কথা ভাবার বেশি সময় ছিল না। সে ডানহাতটা নুনের ভিতর থেকে বের করে আনল। নাড়ি দেখল। ভালোর দিকে। সে পায়ের পাতায় কতটুকু গরম আছে দেখার জন্য নুন সরাল। পাতায় আলতার দাগ। ভিতরটা রঞ্জিতের ভীষণ কেঁপে উঠল। মালতীর মুখ দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে মুখ থেকে নুন সরিয়ে দিল।

এখন শেষ রাত। এখন সে একা পাহারায় আছে। নুন সরাতেই ওর কেন জানি মনে হল মালতী জোরে শ্বাস ফেলছে। ওর কপালে সিঁদুর, মাথায় সিঁদুর। কে বলে মালতী বিধবা। মালতীর এই সুন্দর মুখ এবং শরীর দেখে রঞ্জিত বিমূঢ়ের মতো বসে থাকল। সে

কপালে হাত রাখল। চিবুক দেখল। ভাগ্যিস সে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সকলকে ঘুমোতে পাঠাতে পেরেছে। সবাই এক সঙ্গে জেগে কী লাভ। সে মালতীকে চুরি করে ভালোবাসার চেষ্টায় আকাশের দিকে তাকাতেই মনে হল ভোর হয়ে আসছে। সে এবার মালতীকে নুন থেকে একেবারে আলগা করে দক্ষিণের ঘরে নিয়ে গেল এবং শতরঞ্জিতে শুইয়ে দিল। ডাকল, মালতী, আমি এসে গেছি। বস্তুত এই জলাজমির দেশে মাটি আর মানুষ জলের নিচে আশ্রয় খোঁজে। মালতী প্রাণ ধারণে কোনও আর উৎসাহ পাচ্ছে না। জলের নিচে তার সেই প্রিয় নিরুদ্দিষ্ট হাঁসটিকে খোঁজার জন্য বুঝি ডুব দিয়েছিল। আমি আর ভাসব না জলে, জলের নিচে ডুবে যাব, এই ছিল তার আশা।

সকাল হলে রঞ্জিত থানা-পুলিশের ভয়ে একবার শচীন্দ্রনাথকে থানায় যেতে বলল। ছ'ক্রোশের মতো পথ। সুতরাং কিছুটা হেঁটে থানায় যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন।

শচীন্দ্রনাথ থানায় চলে গেলে রঞ্জিত নরেন দাসের কাছে গেল। বলল, ওকে এ-ঘরে ফেলে রেখেছেন কেন?

নরেন দাস টানা হাঁটছিল। মালতী এখন ক্রমে গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে উত্তর করল না।

রঞ্জিত বুঝতে পারল, নরেন দাসের ইচ্ছা নয় মালতী বড় ঘরে থাকুক। লক্ষ্মীর পট আছে, ধর্মাধর্ম আছে। নরেন দাস এখন এসবে মাথা ঘামাতে চাইছে না। রঞ্জিত আর কিছু বলতে সাহস পেল না। সে মালতীর কে! সামান্য খুপরি ঘরেই এখন থাকার আস্তানা মালতীর! তাকে আর ভিতর বাড়িতে নেওয়া যাবে না! জীবনে তার আর খোলা বাতাস, মুক্ত মাঠ, বর্ষার বৃষ্টিতে উদোম গায়ে ভেজা হবে না! সব তার হারিয়ে গেল!

স্টিমারেও একজন মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। রেলিঙে দাঁড়িয়ে বিশাল মেঘনা নদী দেখতে দেখতে কেবল মালতীর কথা ভাবছে। দু'পাড়ে কত গাছ-গাছালি। স্টিমারটা যত এগুচ্ছে তত যেন কৈশোরের বালিকা গাছ-গাছালির নিচে নদীর পাড় ধরে ছুটছে। ওর চুল উড়ছে। খালি গা। কোমরে প্যাচ দিয়ে শাড়ি পরেছে। ক্রমান্বয়ে ছুটছে। দামোদরদির মঠ পিছনে। সামনে এবার উদ্ধরগঞ্জ পড়বে। কিন্তু মানুষটা কিছু দেখছে না—দেখছে শুধু নিরন্তর এক বালিকা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। কী যেন ছুঁতে চাইছে, পারছে ন। সামসুদ্দিন, মালতী নিখোঁজ হবার পর থেকেই কেমন যেন ভেঙে পড়েছিল। জব্বর তার জাতভাই, লীগের পাণ্ডা। সামান্য অর্থের লোভে সে কাজটা করেছে। একটা ফুলের মতো জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। যে তার কৈশোরে সারা মাস কাল নানাভাবে ফুল ফুটিয়েছিল, সে এখন নির্জীব পাগল প্রায়। এবং শিগগিরই যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে—সে ভয়ে ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

সেদিন ফেলু তার বাছুরটা নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। হেমন্তের সকাল। ধানের মাঠ শুধু চারপাশে। সে বাছুরটাকে ধানের মাঠে আল্‌গা ছেড়ে দিতে পারছে না। আলগা ছেড়ে

দিলেই ধান খেতে অথবা কলাই খেতে মুখ দেবে। এ মাসেই দু'বার গৌর সরকারের বান্দা লোক আবদুল বাছুরটাকেখোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে। সে পঙ্গু বলে কেউ আর তাকে ভয় পাচ্ছে না। জীবনে সে বহু গুনাহ করেছে, আল্লা তার ফল হাতে নাতে দিচ্ছেন, এমন ভাবে সব মানুষ। ওর মনে হয় তখন শালা এ-দুনিয়ার হালফিলে যত মাঝি-মাল্লা আছে, সকলের রক্তে সে খোঁচা দিয়ে দেখে—কিন্তু হায়! পারে না। হাতে তার শক্তি আর নেই। কালো-কড়ি তারে বাঁধা হাত মরার মতো শরীরের এক পাশে ঝুলে থাকে। এক এক সময় মনে হয় দেবে এক কোপে শেষ করে। গলা হ্যাৎ করার মতো শরীর থেকে হাতটা বাদ দিয়ে দেবে। কিন্তু পারে না। এই মরা হাতটার জন্যে তার বড় মায়া হয়। রোদে কোলের উপর হাত নিয়ে বসে থাকলে হাতটাকে তার নিজের সন্তানের মতো লাগে।

সে বাছুরটার দড়ি ধরে হাঁটতে থাকল। বাছুরটা কিছুতেই এগোতে চাইছে না। হাড় বের করা এই গরুর বাচ্চাটাকে সে কিছুতেই পেট ভরাতে পারে না। তার পঙ্গু হাত আর এই বাগি (ভাগে) বাছুর তাকে পাগল করে দিচ্ছে। আর দিচ্ছে আন্নু। সে তো আর ফেলু নেই, হা-ডুডু খেলোয়াড়ও নয়—বিবি তার এখন অন্য বাড়ি যায়—কারে সে কি কবে! রাতের বেলা বিবি পাশে না থাকলে চোখে ঘুম থাকে না। বিবি তার কোথাও রঙ্গরসে ডুবে আছে। হাজিসাহেবের ছোট বেটা আকালু বাঁশবনে লুকিয়ে থাকে। সে বাছুর নিয়ে বের হলে অথবা ফসল চুরি করতে গেলে—এবং যখন সে দূরে দূরে মনের দুঃখে বনবাসে যায় তখন যুবতী তার রঙ্গরসে ডুবে থাকে!

অথবা এখন সে যে কী করে খায়! দু'পেটের সংসার। সে কোনও কোনও দিন মনের দুঃখে নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়ায়—বাছুরটা সঙ্গে থাকলে সে ছুটতে পারে না। সে বাছুরটা নিয়ে হাঁটে, এবং ফসলের শীষ কেটে নেয় ঠিক জোটনের মতো। কলাই গাছ তুলে আনে রাতে। যব, গমের দিনে যব, গম। সে একা পারে না। বিবি তার মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকে। বিবি তার জ্যোৎস্না রাতে মাঠের ভিতর চুরি করে ফসল কাটে আর সে আলে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে জমির আল থেকে হাঁক আসে, কে জাগে? শিস্ দেবার মতো জবাব আসে, আমি জাগি।

—সঙ্গে কে জাগে?

—মিঞাসাব জাগেন। আন্নু খুশি থাকলে সে ফেলুকে মিঞাসাব বলে। আন্নু যেন এসময় তার নিজের আন্নু। পীরিত করে কার সনে— সে কথা তার মনে থাকে না। এই আন্নুকে নিয়ে ফসল চুরি করতে বের হলে ফেলু বুঝতে পারে, বিবি তার ঘরেই আছে। কিন্তু একা মাঠে নেমে এলে তার সন্দেহটা বাড়ে। বিবি তার চুরি কইরা অন্য বাড়ি যায়। সে তখন দুঃখে এবং অক্ষমতার জন্য বাগি বাছুরটার পাছায় লাথি মারে। —হালার কাওয়া, আমারে ডরায় না। এবং চারপাশে মাঠ, মাঠের দিকে তাকালেই শুধু এক মানুষ হেঁটে হেঁটে যায়। মাথায় তার নানা রকমের পাখি ওড়ে। সে তখন কর্কশ গলায় হাঁকতে থাকে, ঠাকুর, তুমি আমারে কানা কইরা দিলা।

শুধু সে ডান হাত সম্বল করে বাছুরটাকে টানছে। বাছুরটা হিজল গাছটার নিচে এসেই শক্ত হয়ে গেল। ফেলু বাছুরটাকে টেনে এতটুকু হেলাতে পারছে না। এমন এক ছোট্ট জীবকে সে হেলাতে পারছে না! রাগটা তার ক্রমে বাড়ছে। বাছুরটা মাঠে কী দেখে ভয় পাচ্ছে! সে আবার চারপাশে তাকাল। হালার হালা, খোদাই ষাঁড়! হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়টা দু'পা সামনে দু'পা পিছনের দিকে ঠেলে লেজ খাড়া করে শিঙ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ফেলুর বাগি বাছুরটাকে ভয় দেখাচ্ছে। অমিত তেজে সে যে ঘোরাফেরা করে — ফসল খায়, কেউ কিছু বলতে পারে না, শিঙ দিয়ে মাটি তুলে তা পরীক্ষা করছে। ধারালো শিঙ। ছুরির ফলার মতো। চক্‌চক্‌ করছে সব সময়। সে ছাড়া থাকে, ধর্মের ষাঁড় বলে কেউ কিছু বলে না। রাজা বাদশার মতো এখন শিঙে ধার দিয়ে ঘাড় গর্দান লম্বা করে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। ধানের মাঠে এমন এক জীব, জবরদস্ত জীব দেখলে ফেলুর প্রাণটা শুকিয়ে যায়। বাগি বাছুরটাকে দেখলেই তেড়ে আসার স্বভাব। কোনদিন বাছুরটার পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে! সে তবু ফেলু বলে, (তার ভয়ডর নাই বলে মানুষ জানে) সামান্য এক জীবকে সে মনুষ্যকুলের কেউ বলে, ডরায় না। ফেলু এমন একটা ভাব দেখাবার জন্য খোদাই ষাঁড়টাকে বলল, হালার পো হালা!

সে ধর্মের ষাঁড়কে হালার পো হালা বলল। তার কেন জানি কোরবানির চাকুটা পেলে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে জবাই করতে ইচ্ছা হয় ষাঁড়টাকে। এটা যে সে এখন কাকে ভেবে বলছে বোঝা দায়। কোন ষাঁড়টা বেশি বেইমান—এই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, না আকালু, কে বড় দুশমন ওর।

সে বলল, হালার কাওয়া। হালার আকালু। খোপকাটা লুঙ্গি পরে দাড়িতে আতর মেখে সে যায় উঠোন পার হয়ে। ফেজটুপি মাথায়। লাল রঙের লম্বা ফেজটুপি, একটা দাঁড়কাকের মতো, তুমি মিঞা আমার বিবির গায়ে হাত দ্যাও! হালার কাওয়া। উঠানের ওপর দিয়া আবার যাও কি কইরা দ্যাখি! বলেই সে ফিরে এসে উঠোনের ওপর মান্দারের ডাল দিয়ে বেড়া দিয়ে দিল। —এডা পথ না মিঞা! এডা সদর রাস্তা না। কিন্তু সকাল হলেই ফেলু দেখেছিল, সব মান্দারের ডাল কারা তুলে ফেলে দিয়ে গেছে। সে তখন বিবির মুখের দিকে তাকাতে পারে না পর্যন্ত। যেন প্রশ্ন করলেই ফ্যাচ করে উঠবে—আমি কি কইরা কই, কেডা মান্দারের ডাল তুইলা ফ্যালাইছে আমি তার কি জানি।

—হালির হালি! তুই আবার না জানস কি! ফেলু তখন চিল্লাচিল্লি করতে পারত। কিন্তু কাকে বলবে! সে যে পঙ্গু হাতে বিবিকে এখন ভয় পায়। সেই কবে জব্বর সবুজ রঙের ডুরে শাড়ি কিনে দিয়ে গিয়েছিল, গন্ধ তেল দিয়েছিল—বিনিময়ে জব্বর আন্নুর কাছ থেকে কি নিয়ে গেছে কে জানে। তবু সে হাত পঙ্গু বলে সব হজম করেছে। এখন বিবির এক গামছা আর ছেঁড়া শাড়ি সম্বল। মাঠে ফসল চুরি করতে যাবার সময় সে ছেঁড়া শাড়িটা পরে যায়। আর দিনমান আতাবেড়ার আড়ালে সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এক খাটো গামছা সম্বল। কখনও কখনও গামছাটা ভিজে গেলে আতাবেড়ার ওপর শুকাতে দেয়। তখন আন্নু একেবারে উলঙ্গ। আতাবেড়ার আড়াল। সামনে ঝোপ জঙ্গল। উঠোনের ওপর

দিয়ে গেলে কেউ টেরই পায় না আতাবেড়ার ওপাশে ফেলুর অন্দরে বিবি তার উলঙ্গ হয়ে বসে ধান সেদ্ধ করছে, গম ভাজছে, কাওন জলে ভিজাচ্ছে। যখনকার যা অর্থাৎ যা সব ফসল চুরি করে আনছে তা দিয়ে সম্বৎসর খাবে এই ভেবে দিনমান কাজ করে যাচ্ছে বিবি।

যতক্ষণ বিবিটা এভাবে উলঙ্গ হয়ে অন্দরে ঘোরাঘুরি করবে ততক্ষণ সে উঠোনে বসে থাকবে, গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানবে আর মনোহর সব দৃশ্য, আতাবেড়ার ভিতর বিবিব যৌবন কচি কলাপাতার মতো! অপটু হাতের ব্যবহাবে সব নষ্ট করে ফেলেছে ফেলু। বিবির চুলে তেল থাকে না। চোখে সুর্মা টেনে দিতে পারে না। পার্বণের দিনে বিবি ধার করে মাথায় মুখে তেল দিলে ফেলু যে ফেলু, তার পর্যন্ত আন্নুকে নিয়ে নৌকা ভাসাতে ইচ্ছা হয়।

যতক্ষণ সে বাড়ি থাকবে, দাওয়ায় বসে থাকবে। সে পাহারায় থাকবে। কেউ এলে তুড়ি বাজাবে হাতে। দু'বার তুড়ি বাজালেই আন্নু টের পায়। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে ডুরে শাড়ি পরে বসে থাকে। সব শস্যদানা হাঁড়ি পাতিলে ঢেকে রাখে। কেউ যেন টের না পায় ওরা রাত-বিরাতে ফসল চুরি করে আনছে।

এসব দৃশ্য দেখতে বড় মজা। সে চুরি করে আতাবেড়ার ফাঁকে আন্নুকে দ্যাখে আর মজা পায়। কখনও বিবির শরীরে জ্যালজ্যালে গামছা—প্রায় চিকের মতো। হাজিসাহেবের ঘাটের ও-পারে ঝোপের ভিতর যেমন সে ফণা তুলে বসে ছিল মাইজলা বিবিকে দেখবে বলে, সে ঘরের ভিতর তেমনি কখনও কখনও বসে থাকে। নিজের বিবির উলঙ্গ শরীর চুরি করে দেখতে ফেলু বড় মজা পায়।

এত অভাব অনটনেও বিবিটা যে কী করে এমন লাবণ্য জিইয়ে রেখেছে শরীরে—হায়, তখন ফেলু আকালুর লম্বা শরীর, শক্ত বুক, লাল রঙের ফেজটুপি কেবল মরীচিকার মতো দেখতে পায়। খুসবু আতর মাখে দাড়িতে আকালু। আকালু বড় চালাক! সে যখন রাস্তা দিয়ে যায়, আতর মেখে যায় দাড়িতে। বিবি আতরের গন্ধ পেলেই আতাবেড়ার আড়ালে নেচে ওঠে। মানুষ তার এসে গেছে। সে টের পায় আতরের গন্ধে এক মানুষ এই রাস্তায় জানিয়ে গেল সে বাঁশবনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বিবিটা তখন সবুজ রঙের জব্বরের দেওয়া শাড়িটা পরে যায়—কই যাও তুমি! যাই মতিউরের কাছে। চিড়ার ধান ভিজাইছে। চিড়া কুইটা দিলে দুই খোলা চিড়া দিব।

—আর কিছু দিব না?

—আর কি দিব?

—ক্যান, চুমা দিব না তরে?

বিবি বুঝতে পারে মানুষটা ওকে সন্দেহ করছে। আতরের গন্ধ সে টের পেয়ে গেছে। তা আল্লা মানুষটার শক্তি হরণ কইরা নিলা, ঘ্রাণ হরণ কইরা নিলা না ক্যান। জান হরণ কইরা নিলা না ক্যান। আন্নু কখনও কখনও ভালোবাসার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

ফেলু টের পায় এ-ভাবে আকালু তার বিবির ভালোবাসা হরণ করে নিচ্ছে। সে কোরবানির চাকুটার তালাশে থাকে তখন। কিন্তু কোনওদিন দুপুরের রোদে সে দেখতে পায় মাঠের উপর আকালু মাথায় লম্বা লাল রঙের ফেজটুপি পরে কালো রঙের ফিফিনে আদ্দি গায়ে খো পকাটা লুঙ্গি কোমরে—আকালু আর একটা ধর্মের ষাঁড় হয়ে গেছে। যেন তিন ষাঁড় তিনদিক থেকে ওকে পাগল করে দিচ্ছে। এক আকালু, দুই হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়, তিন পাগল ঠাকুর। সে বাছুরটাকে ফের টানতে থাকল।

মাঝে মাঝে ফেলু কোরবানির চাকুটা চালাঘরের এ-বাতায় ও-বাতায় লুকিয়ে রাখে। আন্নু ওর গলা কেটে সটকে পড়তে পারে। নিশিদিন ঘরের ভিতর এক অবিশ্বাস, বাতা অথবা চালের শণের ভিতর সে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখেওটা ঠিক আছে কি-না, না আকালু বিবিকে দিয়ে ওটাও হরণ করে নিয়েছে।

সে এ-ভাবে বাছুরটাকে টেনেও নড়াতে পারল না। ধর্মের ষাঁড়টা একইভাবে চারপায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহান জীব যেন সে। কোনওদিকে তার দৃপাত নেই। মাঝে মাঝে ষাঁড়টা তার চোখের উপর মিঞা আকালুদ্দিন হয়ে যাচ্ছে। ষাঁড়টা তার বাছুরটাকে তেড়ে আসবে বলে লেজ তুলে দিচ্ছে।

ষাঁড়টা এবার শিঙ উঁচিয়ে এদিকে ছুটে আসতে পারে। ষাঁড়টা ছুটে এলেই বাছুরটাও ছুটবে। ছুটে বাড়ির দিকে উঠে যাবে। ফেলু দড়ি ধরে থাকলে টানতে টানতে তাকেও নিয়ে বাড়ি তুলবে। ঐ শালা ষণ্ড, এক মহাজীব, জীবের চোখ লাল—যেন তার সামনে অথবা দূরে যা কিছু মাঠ, যা কিছু ফসল এবং কচি কচি ঘাস সব তার ভোজনের নিমিত্ত। আর কে আছে এ মহা-পৃথিবীতে ফসলে ভাগ বসায়! সামনে দিয়ে যায়। ফেলু জোর খিস্তি করল, ও হালা বাগি বাছুর সামনা দিয়া যাইতে ডর পায়।

বাগি বাছুরের আর দোষ কি! ফেলু নিজেও সামনে যেতে ভয় পাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি একটা ছিটকিলার ডাল ভেঙে ফেলল। এক হাতেই সে ডাল থেকে পাতা ফেলে ওটাকে একটা পাচনের মতো করে নিল। সে হাতের ওপর ডালটা ঘোরাতে থাকল। ষন্ডটা দেখুক ফেলুর কি দুর্জয় সাহস আর শক্তি। সে লাঠি ঘুরিয়ে এখন যণ্ডটাকে ভয় দেখাচ্ছে। এবং বাগি বাছুরটার কাছে সে নিজের প্রতিপত্তি কত বেশি, সে যে ফেলু, এক হাত গিয়েও সে ফেলুই আছে এমন বোঝাতে চাইছে। জীবটা কাছে এলেই থোতা মুখ ভোঁতা করে দেবে। একদিন ফেলু দেখেছে ষণ্ডটা ওর বাছুরটাকে তাড়া করে আসছে। সে পঙ্গু হাতে পেরে উঠছে না! বাছুরটা ওকে টেনে নিয়ে বাড়িতে তুলেছে। ষণ্ডটা তখন মহামারীর মতো তেড়ে এসে একেবারে উঠোনে উঠে গেছে। বাছুরটাকে সে চুরি করে ঘাস খাওয়াচ্ছিল। যণ্ডের প্রতাপ কত, যণ্ডটা উঠোনে উঠে এলেই হায় হায় রব। গেল গেল। চিৎকার চেঁচামেচি।

বাছুরটা ঘরে ঢুকে গেছে। বোধ হয় ঢুঁ মেরে ফেলুর কুঁড়েঘর উড়িয়ে দিত। কিন্তু আন্নুর হাতে ছিল গরম ফ্যানের পাতিল। সে জীবের রোষমূর্তি দেখে ভয়ে গরম ফ্যান ছুঁড়ে দিল যণ্ডের মুখে। আর তখন জীবটা হাম্বা হাম্বা করে ডাক দিল। মুখটা পুড়ে গেছে। মহাষণ্ড মাঠের ওপর দিয়ে তখন লেজ তুলে ছুটছে। সেই থেকে জীবটা তার সীমানায়, ফেলু নিজের সীমানায়। দুই জীব। পোড়া মুখ যণ্ডের। এক চোখ গলে কপালের ভিতর ঢুকে গেছে। ফেলুর বসন্তে গেছে একটা চোখ। দুই জীব এখন এক চোখে সময় পেলেই লড়ছে।

কি যে ডর ফেলুর! তবু হাতে লাঠি থাকায় ডর কমে গেল! সে বাছুরটাকে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকল। কচি ঘাস সে খুঁজছে। দেখল মাঝিদের মাঠে আলের ওপর নরম ঘাস। সে বাছুরটার দড়ি ধরে বসল। চারপাশে ধান খেত। সে আলে আলে বাছুরটাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। ঘাস খেতে খেতে বাছুরটার ছপ্ ছপ্ শব্দ ফু তফাৎ শব্দ। লেজ নেড়ে নেড়ে বাছুরটা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে। এই ঘাস খাওয়া দেখতে দেখতে ফেলু কেমন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং কেন জানি তার গত রাতের কথা মনে হচ্ছে বার বার। সে কাল সারা রাত ভয়ে ঘুমোতে পারেনি। আন্নু সন্ধ্যার পর ঘরে ছিল না। ছেঁড়া ডুরে শাড়ি পরে বিবি তার যে কোথা গেল! সে তাকে এ-বাড়ি ও বাড়ি খুঁজেছে। সে হাজিসাহেবের বাড়ি যেতে পারে না। গেলেই মাইজলা বিবি, ওলো সই ললিতে গানটা গায়। পাচনের গুঁতো মারতে পারেন হাজিসাহে। সে ফিরে এসেছিল। না ও কোথাও নেই। আন্নু যখন এল তখন রাত অনেক। মাথায় তার এক বোঝা কলাই গাছ। সে গাছ চুরি করে এনেছে হাজিসাহেবের জমি থেকে। এনেছে, না দোষ ঢাকবার জন্য এক বোঝা কলাই গাছ দিয়েছে আকালু সে বুঝতে পারছে না।

না বলে, না কয়ে গেলেই ফেলুর মনে হয় বিবি তার মসকরা করতে গেছে। অথবা আকালুর সঙ্গে বনে মাঠে পীরিত করতে গেছে। গতকাল রাতে কোথাও যাবার কথা নেই অথচ না বলে না কয়ে চলে গেল। লালসা পেটে পেটে। ফেজ টুপি মাথায় আনধাইর রাইতে দাড়িতে খুশবো মেখে আকালু নেমে গেছে। বিবি, কোন অন্ধকারে খোপকাটা লুঙ্গি পরে আকালু দাঁড়িয়ে থাকে, গন্ধ শুঁকে শুঁকে টের পায়। সে সেদিন গৌরচন্দ্রের বাড়ি গেল। ফিরতে রাত হবে কথা ছিল সেই ফাঁকে বিবিটা বনে মাঠে নেমে গেল।

না কী বিবি তার কাজ কারবার হয়ে গেলে, বাছুরের ঘাস নেই বলে অন্ধকারে সব কলাই তুলে এনেছে জমি থেকে। কী যে হচ্ছে! গাঁয়ের মানুষও জানে জবরদস্ত ফেলুর বিবি এখন পীরিত করছে। জবরদস্ত ফেলুর এই অবস্থা। বিবি তার পীরিত করে অন্য জনার সঙ্গে। সে ভিতরে ভিতরে আগুন। বিবি ঘাস মাথা থেকে নামাতে পারেনি। কোমর বরাবর লাথি। পা তো তার আর পঙ্গু নয়। বরং হাতের শক্তি এখন তার পায়ে এসে জমেছে। লাথি খেয়ে আন্নু সামলাতে পারেনি। উল্টে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আন্নুকে মারলেই সে দাওয়ায় বসে আগে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদত। মড়া মরেছে বাড়িতে এমন কান্না। কান্নার

সঙ্গে নানারকম অশ্লীল শব্দ সুর করে গাওয়া। মাঠের ধার দিয়ে কেউ গেলেই বুঝতে পারত শালা ফেলু আবার ক্ষেপে গেছে।

নিত্যকারের ব্যাপার বলে কেউ আসে না। আবার দ্যাখো কি পীরিত দু'জনায়।

কিন্তু আজ সবাই যেন টের পেয়েছে আন্নু মতিহার সাদাপাতা দাঁতে মাখছে। আন্নু গতকাল মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েও কাঁদেনি। কোথায় যেন সে একটা শক্ত জায়গা পেয়েছে পা রাখবার। কাঁদলে কাটলে কটূক্তি করলে ফেলুর ডর থাকে না। আজ সে কোনও কটূক্তি করছে না। কোনদিকে আন্নু না আবার যথার্থই চলে যায়। ফেলু শুধু জানে সে তালাক না দিলে বিবি কোথাও যেতে পারবে না। আকালু চায় ফেলু তালাক দিক। তালাক দিলে কিছু পয়সা পর্যন্ত মিলে যাবে এমন লোভ দেখিয়েছে আকালু। ফেলুর মুখ দেখলে তখন মনে হয় এই যে কথায় কথায় মারধোর করা সবই দাম তোলবার জন্য। কত দাম দিবা মিঞা। কিন্তু ফেলুর অন্তর জানে সে এ-সব পারে না! আন্নু না থাকলে সে মরে যাবে।

কিন্তু ফেলু যখন আন্নুর দাম-দর নিয়ে মাথা ঘামায়, এক চোখে মুচকি হাসে, তখন তার দাড়ির ভিতর গোটা মুখ কী যে বীভৎস—তা মিঞা বরাবর হইয়া যাউক। যুবতীর বিনিময়ে টাকা আসে। যতদিন বিবি আছে ততদিন অভাবে অনটনে টাকা ধার—আন্নু না থাকলে শালা হারামের ছাও ফেলুকে ভিটেমাটি ছাড়া করে ছাড়ত। তখন ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা হয় ফেলুর, ভাঙা মরা হাতে মারে এক বাড়ি। শালা ইতরের বাচ্চার পীরিত ছুইটা যাউক। পরক্ষণেই মনে হয় ওর হাত নেই—এক হাত সম্বল। তেড়ে গেলে হারামের বাচ্চা ওর ঘাড়টা ধরে ফেলবে এবং এমন মোচড় দেবে পঙ্গু হাতে যে ফেলু একটা পাগলা কুকুরের মতো চিৎকার করতে থাকবে। সেজন্য আকালু কোথাও গেলে সে হাসি হাসি মুখে বলবে —কৈ যান ভাইসাব? মাঠে ধান কেমন হইল? কার্তিকশাল ধানের ভাত কতকাল খাই না। ধান উঠলে আন্নুরে পাঠাইয়া দিমু। দুই কাঠা ধান দিয়া দিয়েন!

আকালুর চোখে সর্ষে ফুল ফুটে ওঠে। ফেলুটা তক্কে তক্কে আছে কবে ধান উঠবে। সে কী বলবে ভেবে পায় না। আন্নুটা কোথায়? আতাবেড়ার ফাঁকে চোখ ঠেলে দেয়। সে কী তার দাড়ির আতরের গন্ধ পায়নি? বাধ্য হয়ে আন্নুকে দেখবার জন্য উঠোনে দাঁড়ায়। কিছু কথা বলতে হয়। সে চোখ এধার ওধার করতে করতে বলল, বিবিরে পাঠাইয়া দিয় মিঞা দুই কাঠা ধান দিমু। গুয়া দিমু। তামাক পান যা লাগে দিয়া দিমু। তারপর আন্নুকে যে চুরি করে দেখার তালে আছে সেটা ধরা পড়লেই মিঞার মুখে থুতু দিয়ে চলে যাবার ইচ্ছা। আন্নুর কী জ্বালা এই মানুষকে নিয়ে। কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছে না। কী করে কোথা থেকে যে এমন একটা খুবসুরত বিবি ধরে এনেছে! কেউ জানে না বললে ঠিক হবে না, জেনেও জানে না যেন—এতদিনে এটাই নিয়ম হয়ে গেছে ফেলুর বিবি আন্নুর। ফেলু নিয়মমাফিক তালাক না দিলে সে ঘরে তুলে নিতে পারবে না। পারে আন্নুকে নিয়ে কোনদিকে চলে যেতে, আন্নুকে নিয়ে কোন গঞ্জে চলে গেলে কেউ টের পাবে না।

ফেলু যেন তখন টের পায় বিবি তার যথার্থই ভাগবে। শুধু ভাগবে না, যেমন সে হ্যাৎ করে মিঞাসাহেবের গলা দু'ফাক করে দিয়েছিল, তেমনি বিবি, তার গলা দু'ফাঁক করে ভাগবে। এবং এই ভাবে বসে বসে সে কেবল বিবির মুখ দেখছিল। একবার বিবি কাঁদল না। শক্ত হয়ে সারাক্ষণ কুপির আলোতে মুখ নিচু করে গোঁজ হয়ে বসে থাকল। ভয়ে ফেলু রাতের প্রথম দিকে ঘুম যেতে পারল না। হোগলা বিছিয়ে সে শুয়ে চুপিচুপি বিবির মুখ দেখছে। কঠিন মুখ শক্ত চোখ বিবর্ণ। চোখ জ্বলছে। বাইরে তখন কী একটা পাখি ডাকছিল। হেমন্তের মাঠে শিশির পড়ছে। কোড়াপাখিদের ডিম ফুটে নিশ্চয়ই এতদিনে বাচ্চা হয়েছে। ফেলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই মনে হল বিবি নড়েচড়ে বসেছে। এবং তার বুঝি একটু মায়া হল। বড় জোরে সে মেরেছে। সে বলল, কই গ্যাছিলি?

—মরতে গ্যাছিলাম।

—মরতে কই গ্যাছিলি?

—মাঠে।

—ক্যান, কি কামডা মাঠে?

—ঘাস না আনলে তর সাধের বাছুরডা খাইবে কি? সারাদিন কি খাইতে দিছস?

মনে হয় বিবির রাগটা কমে আসছে। সে উঠে বসল।

দে, দুইডা। খাইতে দে।

—পারমু না।

—ক্যান পারবি না! কেডা তরে ভাত দ্যায়? বলেই সে তেড়ে যাবে ভাবল। কিন্তু সেইরকমের গোঁজ হয়ে বসে থাকা দেখে সে উঠতে সাহস পেল না। বাতার যেখানে কোরবানির চাকুটা লুকিয়ে রেখেছিল সেটা সেখানে ঠিকমতো আছে কি-না দেখল। কিন্তু চাকুটা নেই। আতঙ্ক চোখে মুখ। একটা চোখে দেখতে হয় বলে ঘাড় পুরোটা না ঘুরালে সে দেখতে পায় না। একবার মনে হল অন্য কোথাও রেখেছে। সে অযথা বিবির ওপর রাগ করছে। খুঁজে দেখলেই হবে। তা ছাড়া সে বিবিকে কী সুখটা দিল! ক্ষণে ক্ষণে মায়া পড়ে যায়। ক্ষণে ক্ষণে তার অবিশ্বাস। সে মায়া পড়ে গেলে কাছে গিয়ে বসল। পিঠে হাত দিয়ে আদর করতে চাইল। সাপ্টে ধরে আদর করতে চাইল। আন্নু যেন এবার গলা কামড়ে ধরবে! সাপের মতো ফুঁসে উঠছে। মিঞা, তুমি আমারে ছুইবা না, তুমি ইবলিশ। তুমি না-পাক।

—কি কইলি! আমি ইবলিশ, না-পাক মানুষ! ফেলু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

ওকে যেন বিবি এতদিন পর চিনিয়ে দিচ্ছে—তুমি ইবলিশ, তুমি শয়তান। তোমার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই।

ফেলুর পায়ের রক্ত চড়াৎ করে মাথায় উঠে গেল। সে বুঝি কঠোর কঠিন কিছু একটা এবার করবে। সে বাইরের অন্ধকারে নেমে এল। ঘরে থাকলে এক্ষুণি হত্যাকাণ্ড ঘটবে। সে চালের বাতায় সেটা খুঁজল। না নেই। আমি, আমি ইবলিশ, না-পাক মানুষ, সে খুঁজতে খুঁজতে এমন সব বলল। নামাজ পড়ি না, আল্লার নাম মুখে আনি না, আমার গুনাহর শেষ নাই। তা তুই এহনে এগুলান কবি। বলেই সে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে বিবির সামনে ধপাস করে বসে গড়ল। তারপর বাঁ-হাতটা ডান হাতে তুলে মরা সাপের মতো বিবির চোখের সামনে দোলাতে থাকল। বলল, বিবি, তর সাহসের বলিহারি যাই। এডা আমার মরা হাত, হাত তরে সাহস দিছে। তুই আমারে না-পাক কইলি! না হইলে কার হিম্মত আছে, কাইন্দা মরে কত বান্দা লোক—তুই ত মাইয়া মানুষ আন্নু! হাসুয়াডা কোনখানে রাখছস! কোরবানের চাকুডা?

—ক্যান, তুমি আমার গলা কাটবা?

—দিলে দেহন যায় গলা তর কাটে কি না!

আম্মু এবার আরও শক্ত হয়ে গেল। —এই আছিল তর মনে! বলে সে খড়ের ভিতর থেকে হাসুয়া এবং কোরবানির চাকুটা ফস করে বের করে ফেলল। —আইনা দিলাম। ইবারে চালাও দ্যাহি। করছ একখানা কাম তবে বুঝি! বলে সে দুই চোখ বিস্ফারিত করে যেন রণরঙ্গিণী, ডুরে শাড়ি খুলে ফেলে প্রায় উলঙ্গ আন্নু সামনে গলা বাড়িয়ে দিল। হিম্মত মিঞা নাই! পার না পোচাইয়া গলা কাটতে! বলেই সে ফের কেমন শক্ত হয়ে গেল। ফেলুর যা মেজাজ, এক্ষুনি সে গলা চেপে নলি কেটে দিতে পারে। এক্ষুনি সে কিছু একটা করে ফেলব! কিন্তু আন্নু এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। কারণ চোখ দেখে সে টের পাচ্ছে—মানুষটারে ডরে ধরেছে। সে আগের মতো দুই চোখ বিস্ফারিত করে, যেন আগুন জ্বলছে চোখে—মাঠের ভিতর স্বামী হত্যার কথা শুনে সে যেমন হা হা করে হেসে উঠেছিল পালিয়ে আসার সময়, আজ আবার তেমনি পাগলের মতো হাসতে থাকল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেলু তার মরা হাতের মতো নিস্তেজ হয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি অস্ত্র দুটো হাতের পিছনে লুকিয়ে ফেলল। সে গোপনে অস্ত্র দুটোকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখল অন্ধকারে। আনু কঠিন চোখে দেখছে জবরদস্ত মানুষটা ক্রমে রাতের পোকা হয়ে যাচ্ছে। সে কঠিন গলায় বলল, পারলা না, মিঞা! জানে আর হেকমত নাই?

—নাই বিবি।

—তা'হৈলে পোড়ামুখ মাইনসেরে আর দ্যাখাইয় না।

ফেলুর মনে হল, সত্যি তার আর বাঁচার অর্থ হয় না। নিজের মুণ্ড নিজে কেটে দণ্ড দিতে পারলে অথবা দু'হাতে মুণ্ড নিয়ে নাচতে পারলে যেন বিবির কথার সঠিক জবাব দেওয়া হতো। কিন্তু অন্ধকার, ওপাশে গোয়ালে বাছুরের চোখ এবং চুরি করে ধান অথবা ফসল কেটে আনা— সবই কেমন মায়াময়— সে কিছুতেই কাটামুণ্ড নিয়ে এখন আর নাচতে পারে না। সে বিবির অলক্ষ্যে কোরবানির চাকু খড়ের গাদায় লুকিয়ে হোগলাতে শরীর টান করে দিয়েছিল। তারপর প্রায় সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। সে ঘুমিয়ে পড়লেই বিবি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ভেগে পড়বে। এক পোড়া মানুষ কুঁকড়ে থাকবে আগুনে—আগুন, হত্যার ছবি ফেলু একেবারে পাগল বনে যেত, যদি সে না দেখত এক সময় বিবিটা আঁচল পেতে এক পাশে শুয়ে আছে। সে সন্তর্পণে কাছে উঠে গেল। দেখল আন্নু যথার্থই ঘুমোচ্ছে কি-না, না ঘুমের ভান করে মটকা মেরে আছে। সে কুপির আলোতে দেখল আন্নু যথার্থই ঘুমোচ্ছে। ওর মনটা সহসা অদ্ভুত বিষণ্ণ হয়ে গেল। বিবিকে আদর করার ইচ্ছা হচ্ছে। সে মুখটা কাছে নিয়ে গিয়েও ফিরিয়ে আনল। ডর, বড় ডর। নাগিনীর মতো ডর। আদর করলেই গলা কামড়ে ধরবে। সে বিবির পাশে গামছা পেতে শুয়ে পড়েছিল। এবং সকালে আন্নুই তাকে ডেকে দিয়েছে—বাছুরডারে মাঠে দিয়া আস।

মাঠে বাছুর নিয়ে নেমে এলে এই কাণ্ড। এক ষণ্ড চার পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল মাঠ, ধানখেত, সোনালী বালিব নদীর চর উপেক্ষা করে ফেলুকে ভয় দেখাচ্ছে।

এবং হাজিসাহেবের ছোট বেটা, যত লম্বা মানুষ না, তার চেয়ে বেশি লম্বা হবার সখ। লাল রঙের টুপি মাথায়। খোপকাটা লুঙ্গি পরে তাজা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে। দাড়িতে খুশবো আতরের গন্ধ। বিবি বেমালুম গত রাতের পাছার লাথি ভুলে বাঁশ বনে নেমে যাচ্ছে।

সে এবং ষণ্ড আর আকালুদ্দিন, পাগল ঠাকুর সবাই ক্রমে পরস্পর প্রতিপক্ষ হয়ে যাচ্ছে। এক মহিমামণ্ডিত মানুষ হেমন্তের সকালে সোনালী বালির নদীর চরে শুয়ে আছে। কেবল তিনিই জানেন, যণ্ডটা কত বেগে ছুটলে ফেলুর পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে।

যেন যণ্ডটা ফেলুকে দেখে, পায়ের ওপর মরণ নাচন নাচছে। এবার যণ্ডটা বুঝি ছুটবে।

তখন মালতী হাসছিল। রঞ্জিতের কথা শুনে হাসছিল। এমন প্রতিশোধ স্পৃহা থাকে হাসিতে, রঞ্জিত মালতীর মুখ না দেখলে যেন টের পেত ন। কী করুণ আর অসহায় মুখ মালতীর। কী কঠিন হাসি!

খুপরি ঘরটার ভিতর মালতী একটা পাতিহাঁসের মতো বসেছিল। হেমন্তের শেষ রোদ নেমেছে ওর ঝাপের দরজায়। হেমন্তের শেষ বলে শীতশীত করছে। একটা পাতলা কাঁথা গায়ে মালতী ছোট কম্বলের আসনে বসে আছে। অশৌচের শরীর যেন। অবজ্ঞা চারপাশে। নরেন দাস রোদ থেকে খড় তুলে এক জায়গায় জড়ো করছে। আভারানী ধান ঝাড়ছে। শোভা আবু বাড়ি নেই।

মালতী সহজে ঘর থেকে আজকাল বের হতে চায় না। মাঝে মাঝে বাড়ির নিচে এক ছোট গাছ আছে, সেখানে গিয়ে বসে থাকে।

রঞ্জিত এলেই ঝাঁপটা খুলে দিয়েছিল মালতী। কারণ এই ঝাঁপ থাকলে অন্ধকার থাকে চারপাশে। সে ক্রমে অন্ধকার ভালোবাসছে। চিড়িয়াখানার জীবের মতো আর বেঁচে থাকতে পারছে না। সে যে এখন কী করবে। ভিতরে তার কী যে হয়েছে। সারাক্ষণ শীতশীত ভয় ভয়। বুকটা কাঁপে। কঠিন হাসি হাসলে নরেন দাস ভয় পায়। রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা হলেই বলে, যান, গিয়া দ্যাখেন, পাগলের মত হাসতাছে।

এমন শুনেই রঞ্জিত এসেছিল। এলেই মালতী বিনীত বাধ্যের যুবতী হয়ে যায়। সে একটা জলচৌকি ঠেলে দেয় বাইরে। মাথা নিচু করে বসতে বলে। রঞ্জিত বসলেই যেন মালতী কেমন বল পায় শরীরে। তার একমাত্র মানুষ, যাকে কথাটা বলবে বলে সে স্থির করেছে। সে যে এখন কী করবে বুঝতে পারছে না।

বুঝতে পারছিল না বলেই চোখে মুখে দীনহীন চেহারা। সে কিছুতেই কথাটা বলতে পারে না। সে কেমন মানুষটার মুখ দেখতে দেখতে মুহ্যমান হয়ে যায়।

রঞ্জিত বলল, তুমি এমন পাগলামি করলে চলবে কেন মালতী?

—কি পাগলামি ঠাকুর?

—মাঝে মাঝে তুমি গাব গাছতলায় ছুটে যাও। সেখানে চুপচাপ বসে থাক। কিছু খাও না!

—কিছু খেতে ভাল লাগে না ঠাকুর।

—ভাল না লাগলে তো চলবে না। খেতে হবে বাঁচতে হবে।

—তোমারে ঠাকুর কইলাম একটা চাকু দিতে। তুমি কিছুতেই দিয়া গ্যালা না।

—আবার তোমার এক কথা!

—আমার আর কোন কথা নাই।

—তুমি এমন করলে নরেনদা কি করবে তোমাকে নিয়ে?

—আমারে নিয়া কারো কিছু করতে হইব না।

—এমন বলে না। বলতে নেই। যেন অসুস্থ মালতীকে রঞ্জিত বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে।

—তোমার কি মনে হয় ঠাকুর আমারে ভূতে পাইছে?

—তুমি তো জান মালতী, এ-সব আমি মানি না।

—তবে তুমি দাদার কথা বিশ্বাস কর ক্যান?

—করি, কারণ তোমার মুখ দেখলে আমার ভয় হয়।

—কি ভয়?

—কেমন অস্বাভাবিক চোখমুখ তোমার। তুমি তো এমন ছিলে না মালতী। তুমি মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকো। তিনি তোমার সব ভাল করে দেবেন।

—ঠাকুর, তোমার এত বিশ্বাস ভগবানে?

—আর কি বলব তোমাকে! আমার কেবল ভয় হয় আবার তুমি কিছু করে না বস!

—আমি মরতে চাই না ঠাকুর। বিশ্বাস কর, আমি মরতে চাই না। তুমি কাছে থাকলে আমি মরতে পর্যন্ত সাহস পাই না। তারপর সে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, যদি চাকুটা দিতা। আমি এখন কী যে করি।

রঞ্জিতের মাথায় এখন হেমন্তের রোদ। আর কোথাও কোনও পরিচিত পাখির ডাক। ঘরে যুবতী মেয়ে অন্ধকারে বসে আছে। সে যেন দীর্ঘদিন থেকে রঞ্জিতকে কিছু বলবে বলে ঘুম যেতে পারছে না। চোখের নিচে কালি। হাত পা শীর্ণ। মুখে ক্লান্তি। এবং চারপাশে অদ্ভুত এক নির্জনতা। অথচ বার বার সে চাকুর প্রসঙ্গে ফিরে আসছে।

সে বলল, মালতী, তুমি কপালে সিঁদুর দিয়েছিলে। পায়ে আলতা। কি যে সুন্দর লাগছিল।

মালতী জবাব দিল না।

—তোমার এমন সুন্দর চোখ মালতী। আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারছি না। তোমাকে আর কি বলব।

মালতী মাথা নিচু করে রাখল। কিছু যেন ভাবছে।

রঞ্জিত বলল, আমি চলে যাব মালতী। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানি না। কবে দেখা হবে তাও বলতে পারি না। আমার অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেল। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলাম

মালতীর চোখ বড় বড় দেখাচ্ছে। সে বলল, আমি জোরে জোরে পাগলের মতো হাসি ক্যান জিগাইলা না?

—জিজ্ঞেস করে কী হবে। কিছু করতে পারছি না। জিজ্ঞেস করে লাভ কী!

মালতী বলল, তোমার অজ্ঞাতবাস শেষ। মালতীর বুকটা বলতে গিয়ে ধড়াস করে উঠল।

—শেষ। পুলিশ খবর পেয়ে গেছে আমি এখন এ-অঞ্চলে আছি। আজ কী কাল পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার হতে পারে ভেবে পালাচ্ছি।

মালতী এনকাউন্টার শব্দটা বুঝল না। সে এখন নিজের যে এক অতীব দুঃখ আছে ভুলে যাচ্ছে। সে কেবল তার প্রিয়জনের মুখ দেখছিল। এই মানুষ তার কাছে এলে কোনও সন্দেহের কারণ থাকে না। কারণ সে এই মেয়েকে কতদিন লাঠি খেলা ছোরা খেলা শিখিয়েছে। রঞ্জিত এক মহান আদর্শে নিমজ্জিত। সামান্য এক বিধবা যুবতী তার কাছে কিছু না। বরং মালতীর কঠিন চোখমুখ সে এলেই সহজ হয়ে যায়। নরেন দাসের ধারণা এবং অন্য সকলের ধারণা মালতী রঞ্জিতকে ভয় পায়। এখন সেই যুবক ফের নিরুদ্দেশে যাবে। নিরুদ্দেশে গেলে তার আর থাকল কী। সে এখন সবই ওকে বলে দিতে পারে। অথচ কীভাবে বলবে! এমন একটা কথা, যা নরেন দাস জেনেও বেমালুম চেপে যাচ্ছে। মালতী এবার কান্না কান্না গলায় বলে ফেলল, ঠাকুর, আমি মরতে চাই না। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল।

রঞ্জিত দেখল চোখ ফেটে জল পড়ছে মালতীর।

ক্রমে বিকেল মরে আসছে। মাঠ থেকে ধানের গন্ধ আসছিল। যেন মনে হয়, এই যে মাঠ চারদিকে, ফসল সর্বত্র এবং কলাই খেতের নীলচে রঙের ফুল এবং ধান উঠতে

আরম্ভ করেছে, দূরের মাঠে ধান কাটার গান শোনা যাচ্ছিল — সবই অর্থহীন মালতীর কাছে। মালতী কী করবে এখন! অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে রঞ্জিত কী বলে।

এতদিন রঞ্জিত তার সমিতির নির্দেশে কত বড় বড় কাজ অবহেলায় সমাধান করেছে। কুমিল্লাতে সে হাডসন সাহেবকে খুন করে পলাতক। পুলিশের লোক জানে সে আগরতলা হয়ে শিলচর এবং শিলচর থেকে আসামের কোথাও উধাও হয়েছে। নিখোঁজ। তার শৈশবের পরিচয় দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও পুলিশ সংগ্রহ করতে পারেনি। সে-ই রঞ্জিত, সে-ই সুখময় দাস, সে-ই কখনও চরণ মণ্ডল এবং সে যে নদী পার হতে গিয়ে একবার নীলের বাদ্যি বাজিয়ে ছিল গোপাল সামন্ত নামে— সে-সব পুলিশ খবর রেখেও রঞ্জিত নামে এক বালক এখানে কৈশোর কাটিয়ে পলাতক তা তারা জানে না। এ-অঞ্চলের মানুষেরা জানে রঞ্জিত দেশের কাজ করে বেড়ায়—এই পর্যন্ত। এখন মালতী তার সামনে গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে এবং জীবনপাত করে যে আদর্শ সবই অর্থহীন। মালতীর গোঁজ হয়ে বসে থাকা সে একেবারে সহ্য করতে পারছে না। সে বড় দুর্বল বোধ করছে।

তার সামনে কত বড় মাঠ, শস্যক্ষেত্র। সে সামান্য ফসলের জমি নিয়ে কী করবে! মালতীকে সে কোথাও পৌঁছে দিতে পারছে না। এই নিয়তি মালতীর। কিছু বলতে পারল না। মাথা নিচু করে হেঁটে হেঁটে গাছপালার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালতী যেমন খুপরি থেকে একটা হাঁসের মতো বের হয়ে এসেছিল তেমনি সে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে বসে থাকল। একটু পরে এল শোভা। বাঁ হাতে ওর লণ্ঠন। ডান হাতে কলাই করা থালাতে খই এবং গুড়, মালতীর রাতের আহার। খেতে দিলেই মালতী ঝাঁপ বন্ধ করে দেবে। তারপর এক অন্ধকার নিয়ে, চোখ কোটরাগত করে সে শুয়ে থাকবে। ঘুম নেই চোখে। কেবল মনে হয়, কোন মরুপ্রান্তে একটা পত্র পুষ্পহীন বৃক্ষ তাকে হাতছানি দিচ্ছে।

রঞ্জিত হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ে চলে এল। সেই এক অর্জুন গাছ, গাছটা ডালপালা মেলে বড় হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে ক্রমে অন্ধকার নামছে। দক্ষিণের ঘরে শশীমাস্টার ছেলেদের পড়াচ্ছেন। সোনা খুব জোরে জোরে পড়ে। সে তার কঠিন কঠিন শব্দ রঞ্জিত বাড়ি এলেই শুনিয়ে শুনিয়ে পড়ে। সে যে কত বড় হয়ে গেছে এবং কত সব কঠিন কঠিন শব্দ জেনে ফেলেছে এই বয়সে, সে রঞ্জিতমামাকে তা জানাতে চায়। সে এত দুঃখের ভিতরও মনে মনে হাসল। সে চলে যাবে। এসব ছেড়ে যেতে ওর সব সময়ই কেমন কষ্ট হয়। দিদির কাছে সে মানুষ বলে যা-কিছু টান এই দিদির জন্য। এবং স্বামী তার পাগল বলে সব সময়ই মনের ভিতর নানারকমের চিন্তা—মানুষটা এভাবে সারাজীবন বাঁচবে আর কবিতা আবৃত্তি করবে, দিদির জীবনটা বড় দুঃখে কেটে গেল। এখানে এলে সে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে এমন ভাবে! সব মাঠঘাট চেনা। তাই যেন যাবার আগে সব ঘুরে ঘুরে একটু দেখে যাওয়া। পুকুরপাড় থেকেই সে দক্ষিণের ঘরের আলোটা দেখতে পেল। শশীমাস্টার দুলে দুলে পড়ান। ইতিহাস থেকে তিনি—'জননী জন্মভূমিশ্চ

স্বর্গাদপী গরীয়সী' ছেলেদের বলার সময় কেমন মাটি এবং মানুষের নিমিত্ত তিনি উত্তাপ পান। শশীমাস্টার এই তিন ছেলেকে সন্তানের মতো স্নেহ করেন।

সে অন্ধকার থেকে এবার উঠে এল। সংসারে আপনজন বলতে তার দিদি। আর কেউ নেই। স্বামী পাগল মানুষ। সে সোজা বাড়ি উঠে এল এবার। নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টাল। ওর স্যুটকেসের ভিতর যা যা থাকার কথা ঠিক আছে কি-না দেখে নিল। মহেন্দ্রনাথ নিজের ঘরে বসে আছেন। এ-সময় তিনি সামান্য গরম দুধ খান। দিদি নিশ্চয়ই মহেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসে আছে।

সে দিদিকে বলে তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে নিল মহেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে প্রণাম করার সময় বলল, আমি আজই চলে যাচ্ছি।

বড়বৌ আর এখন এসবে বিস্মিত হয় না। কখন কোথায় থাকবে অথবা যাবে কেউ জানতে চাইলে সে চুপচাপ থাকে। আগে বড়বৌ এ-নিয়ে সামান্য অশান্তি করত রঞ্জিতের সঙ্গে। এখন আর করে না। অসময়ে কোথাও চলে যাচ্ছে বললে বিস্মিত হয় না। বরং সে সব ঠিকঠাক করে দেয়। কথা বেশি বলে না। রঞ্জিত বুঝতে পারে দিদি তার এই চলে যাওয়া নিয়ে ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাচ্ছে! দিদি চুপচাপ থাকলে সে টের পায়, চলে গেলে নিশ্চয় দিদি তার কাঁদবে। সে যাবার আগে যেমন প্রণাম করে থাকে, এবারেও তা করল। তারপর বিষণ্ন মুখ দেখে যেমন বলে থাকে,

কই তুমি হাসলে না? আমি যাব অথচ তুমি হাসলে না।

বড়বৌ জোর করে হাসে তখন। হেসে বিদায় দেয়। না হাসলে যাব কি করে? এই ছোট ভাইটিকে।

—এই তো আমার দিদি। বলে সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রথমে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেল। শশীমাস্টারকে বলল, চলে যাচ্ছি। সোনার মাথায় কী ঘন চুল হয়েছে, সে চুলে হাত ঢুকিয়ে আদর করল সোনাকে। বলল, যাচ্ছি আমি। তোমরা ভাল হয়ে থেক। মা'র কথা শুনবে। জ্যাঠামশাইকে দেখে রাখবে।

শশীমাস্টার বললেন, তা'হলে আবার বনবাসে যাচ্ছেন?

—যেতে হচ্ছে।

—ফিরবেন কবে?

—বোধ হয় আর এখানে ফিরতে পারব না।

—কেন?

—অসুবিধা আছে।

—আপনি স্বদেশী মানুষ, আপনাদের সব জানার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে আপনার মতো বনবাসে যেতে ইচ্ছা হয়। জাতির সেবা করতে ইচ্ছা হয়।

—জাতির সেবা তো আপনি করছেন। এর চেয়ে বড় সেবা আর কী আছে?

—কিন্তু কি জানেন, বলে শশীমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। দেশ স্বাধীন যে কবে হবে বুঝতে পারছি না।

—হয়ে যাবে।

—হবে ঠিক! তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছি না বলে দেরি হচ্ছে।

রঞ্জিত এমন কথার কোনও জবাব দিতে পারল না।

—আপনার কি মনে হয়?

—কিসের ব্যাপারে বলছেন?

—এই স্বাধীনতার ব্যাপারে।

—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লে সংসার চলবে কী করে?

—তা ঠিক বলেছেন। কিন্তু লীগ যে ভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে যে শেষ পর্যন্ত কি হয়!

রঞ্জিত এ-কথার জবাব দিতে হবে বলেই অন্য কথায় চলে এল।

—এরা কিন্তু আপনার খুব ভক্ত। এরা আজকাল যত্ন নিয়ে দাঁত মাজছে।

শশীমাস্টার বললেন, দাঁতই সব। আপনার দাঁত দেখি।

অন্য সময় হলে রঞ্জিত কি করত বলা যায় না। কিন্তু এখন সে চলে যাচ্ছে বলে খুব সরল সহজ হয়ে গেছে। তাই সে কোনও কুণ্ঠা প্রকাশ না করে শশীমাস্টারকে দাঁত দেখাল।

শশীমাস্টার লণ্ঠন তুলে সবকটা দাঁত দেখলেন। যেন কুশলী ডাক্তার ওর দাঁত দেখছেন। মাড়ি টিপে টিপে দেখলেন। তারপর পলটুকে এক ঘটি জল আনতে বলে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকালেন। —আপনার নিচের পাটির দাঁত কিন্তু ভাল না।

রঞ্জিত হাসতে হাসতে বলল, কি করলে ভাল হবে?

—রোজ বাতে একটা করে হরতুকি খাবেন। বলে তিনি বাইরে গেলেন। হাত ধুলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, হরতুকিতে দাঁত শক্ত হয়। লিভারের কাজ ভাল হয়। সুনিদ্রা হবে। এবং পরিপাকে এত বেশি সাহায্য করবে —বলে একটু থামলেন। কি যেন খুঁজে খেরোখাতাটা পেয়ে পাতা উল্টে গেলেন। 'হ' এই শব্দের পাতা থেকে হরতুকি কত নম্বর পাতায় আছে খুঁজে হরতুকির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে শোনাতে থাকলেন।

রঞ্জিত দেখল লম্বা খাতায় নানারকম আয়ুর্বেদীয় ফুল-ফলের নাম। তাদের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ। বঞ্জিত বলল, এদের এসব বলুন। দেশের মাটিতে যা হয় পৃথিবীর কোথাও তা পাওয়া যায় না।

শশীমাস্টার বলেন কি লালটু-পলটু, মামা কি বলছেন! তোমার মামা তো আজ চলে যাবেন। প্রণাম কর

সকলে একসঙ্গে উঠে এসে কে আগে প্রণাম করবে, দুপদাপ প্রণাম সেরে কে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে সবার আগে আগে বসবে তার প্রতিযোগিতা যেন। রঞ্জিত বলল, পরীক্ষা পাসের সময় এটা চাই। সবার আগে যেতে হবে। বারান্দায় বাড়ির পাগল মানুষ চুপচাপ বসে আছেন। সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, জামাইবাবু, আমি আজ চলে যাচ্ছি। বলে সে দু'পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করার সময় বলল, আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন ভালো কিছু করতে পারি।

তিনি বসেছিলেন। বসে থাকলেন। কোনও উচ্চবাচ্য নেই। তাঁর চোখ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবু বোঝা যায় সারাজীবন ধরে মানুষটি এক সোনার হরিণের পিছনে ছুটছেন। মানুষটার দিকে তাকালেই রঞ্জিতের চোখ ছলছল করে ওঠে।

সে তাড়াতাড়ি এবার পশ্চিমের ঘরে ঢুকে গেল। ধনবৌকে প্রণাম করার সময় বলল, ধনদি, আজ চলে যাচ্ছি।

ধনবৌ বলল, সাবধানে থাইক।

তারপর সে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে খুব ঘন অন্ধকারের ভিতর মাঠে নেমে গেল। শশীমাস্টার, সোনা, লালটু, পলটু হ্যারিকেন নিয়ে পুকুরপাড় পর্যন্ত এসেছিল। তারপর আর যায় নি। রঞ্জিত নিজেই বলেছে, আপনারা ফিরে যান মাস্টারমশাই। অন্ধকারে আমি ভালো দেখতে পাই। আলো থাকলে বরং চোখ ঝাপসা লাগে।

অন্ধকার নেমে আসতেই আবার সেই মাঠ, সোনালী বালির নদী, তরমুজের জমি এবং উপরে আকাশ, চিত্র-বিচিত্র সব নক্ষত্র আব মাঠের নির্জনতা ওকে শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শৈশবে সে, সামসুদ্দিন আর মালতী-মালতীকে নিয়ে তারা নদীতে সাঁতার কাটত। সাঁতার কেটে ও-পাড়ে উঠে যেত। গয়না নৌকার নিচে কখনও কখনও রঞ্জিত লুকিয়ে থাকলে মালতী ভয় পেত। সে ডাকত, ঠাকুর।

কে যেন তেমনি মনে হয় এখনও তার পিছনে ডাকছে। ঠাকুর, তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলা? তুমি দেশের কাজ করে বেড়াও, আমি কি তোমার দেশ না? তোমার এই জলা-জমি অথবা মাটিতে আমি বড় হয়ে উঠি না! আমার সুখ-দুঃখ তোমার সুখ-দুঃখ না! ঠাকুর, ঠাকুর, কী কথা বলছ না কেন?

রঞ্জিত যত দ্রুত হাঁটবে ভেবেছিল, সে তত দ্রুত হেঁটে যেতে পারছে না। কে যেন তাকে কেবল নিরন্তর বলে চলেছে আমি কী করি ঠাকুর! মনে হল সে যেতে যেতে কোনও গাছের ছায়ায় অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে পড়ছে। যত তাড়াতাড়ি সে এ অঞ্চল ছেড়ে যাবে ভেবেছিল, কেন জানি সে তত তাড়াতাড়ি যেতে পারছে না। বস্তুত ওর পা চলছিল না। তার মাথার উপর বড় এক আকাশের মতো পবিত্রতা নিয়ে মালতী জেগে রয়েছে। সে আর এক পা বাড়াতে পারল না।

মনে মনে সে আজ কখনও জীবনে যা ভাবেনি, যা-কিছু স্বপ্ন ছিল সব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অন্য জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়বে ভাবল। দেশ উদ্ধারের চেয়ে কাজটা কেন জানি কিছুতেই কম মহৎ মনে হচ্ছে না।

সে সেই অশ্বত্থ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্ধকার কী ঘন! আর কী প্রাচীন মনে হয় এই সব তরুলতা। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছু প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করছে। বিন্দু বিন্দু সব আলো গাঁয়ের ভিতর জ্বলছে নিভছে। রাত এখনও তেমন গভীর নয়। ভুজঙ্গ কবিরাজকে লাঠিখেলা ছোরাখেলার সব নির্দেশ, আর কোথায় আখড়া খুলতে হবে নূতন, সে গেলে কার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ রাখতে হবে সবই সে ঠিকঠাক বলেছে কি-না আর একবার এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল। কোথাও তখন কোনও কুকুর আর্তনাদ করছে। শেয়ালেরা ডাকছে। জালালির কবরে এক ঝোপ কাশের বন সৃষ্টি হয়েছে এতদিনে। সেই কাশের সাদাফুল এই অন্ধকারে এক ফালি জ্যোৎস্নার মতো দুলছে চোখে। বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ জীবনসংগ্রাম ছিল জালালির। মৃত্যুর পর একখণ্ড ভূমি পেয়ে সে এখন কী মনোরম হাসছে। জালালি তার নতুন এই ভূ-খণ্ডে এখন কাশফুল হয়ে বেঁচে আছে। গাছের গোড়ায় ভালোবাসার মাটি—সে তা পেয়ে ছোট্ট শিশুটির মতো হাসছে। কাশফুলের মতো পবিত্র হাসিটি মুখে লেগে আছে জালালির।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে হল, এই একখণ্ড জমি সকলের প্রাপ্য। সবাইকে এই দিতে হবে। অভুক্ত এবং ভূমিহীন মানুষ, ভূমিহীন বলতে পায়ের নিচে মাটি নেই এমন মানুষ সে ভাবতে পারে না। তার ঘর থাকবে, চাষ-আবাদের জমি থাকবে, সে কিছু খাবে, খেতে পাবে, খেতে না পেলে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ হয় না। মানুষের স্বাধীনতা বলতে সে এই বোঝে। তার কেন জানি এবার মনে হল, সে একখণ্ড জমি মালতীকেও দেবে।

অথবা এই অন্ধকারে, ঘন অন্ধকারে দাঁড়ালেই সে কেমন সাহসী মানুষ হয়ে যায়। ওর মৃত্যুভয় থাকে না। রাতের পর রাত, এমন সব মাঠ-জঙ্গল, নদী-বন, যদি কোথাও পাহাড় থাকে, সিংহ শাবকের মতো পাড়াড় বেয়ে ওঠা, যেন নিরন্তর এক গ্রহ থেকে অন্য

গ্রহে অভিযান—দুঃসহ এইসব অভিযান তাকে মাঝে মাঝে বড় বেশি বাঁচার প্রেরণা দেয়। কিছু না করতে পারলেই মনে হয় সে মৃত। একঘেয়ে জীবন তখন। বাঁচার কোনও প্রেরণা থাকে না। উৎসাহ-বিহীন মানুষের মতো তাকে অধার্মিক করে ফেলে। হাডসন সাহেবকে হত্যার পর সে আবার নতুন কিছু করতে যাচ্ছে। প্রায় এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে অভিযানের মতো এই ঘটনা। অন্ধকারে নরেন দাসের বাড়ি স্পষ্ট। বিন্দু বিন্দু আলো এখনও জ্বলছে। বোধ হয় নরেন দাস গোয়ালে গরু বাঁধছে এবং আভারানী ঘাট থেকে বাসন মেজে এলেই সে এগুতে পারবে। ওদের এবার শুধু শুয়ে পড়তে দেরি। মালতীকে নিয়ে ভয়ডর তাদের কমে গেছে। কারণ মালতীর শরীরে আর কোনও ঘোড়া দৌড়ায় না। মালভী রুগ্‌ণ, শীর্ণকায়, অবসন্ন এবং শরীরের ভিতর মালতীর ধর্মাধর্ম এখন ঢাকঢোল বাজাচ্ছে। মালতীকে ঘরে জায়গা দিচ্ছে না নরেন দাস। মালতী এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে।

ক্রমে রাত বাড়ছে। ভোর রাতের দিকে ঠাকুরবাড়ি পুলিশে ঘিরে ফেলবে। এমন খবরই তার কাছে আছে। সন্তোষ দারোগা নারানগঞ্জে গেছে আর্মড ফোর্সের জন্য। সামান্য একজন মানুষকে ধরবার জন্য সন্তোষ দারোগা গোপনে গোপনে সেখানে মহোৎসবের ব্যাপার করে ফেলছে। ভীষণ হাসি পেল দারোগার ভয় এত বেশি ভেবে।

কে সেই মানুষ, সে এখন ভেবে পাচ্ছে না—যে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। এখানে কার সঙ্গে শত্রুতা। কয়েক ক্রোশ দূরে থানা। যেতে আসতে সময় অনেক। জলা জায়গা বলে কেউ বড় এদিকটাতে আসতে চায় না। সে এখানে বেশ অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু চুপচাপও বসে থাকা যায় না। সমিতির কাছে সে নির্দেশ চেয়ে পাঠাল। তাদের নির্দেশমতো একের পর এক আখড়া খুলে চলেছিল গ্রামে গ্রামে। তারপর এক খবর, এক মানুষ বাউল সেজে চিঠি দিয়ে গেল—পুলিশ তার সূত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত। তাকে পালাতে হবে।

এবারে মনে হল নরেন দাসের বাড়ির যে বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলছিল, তা নিভে গেছে। সে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছে। ওপরে জহর কোট। কোটের নিচে হাত রেখে দেখল—না, ঠিক আছে। সে এবার সন্তর্পণে এগুতে থাকল, তার আর এখন ভয় নেই। দেখল সামনের অন্ধকারে একটা জীব ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। সে রিভলবাবটা চেপে ধরতেই মনে হল, ওটা বাড়ির আশ্বিনের কুকুর। সে চলে যাচ্ছে বলে

তাকে বিদায় জানাতে এসেছে।

রঞ্জিত বলল, বাড়ি যা। এখানে কী?

কুকুরটা তবু পায়ে পায়ে আসতে লাগল।

সে বলল, তুই যা বাবা। আমি এতদিনে একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি।

কিন্তু কুকুরটা পাশে পাশে হাঁটছেই।

—কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস না?

কুকুরটা এবার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

—হ্যাঁ হয়েছে। খুব হয়েছে। এবারে যা।

কুকুরটা যথার্থই এবার ছুটে পুকুরপাড়ে উঠে গেল। এবং অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত কোনদিকে যাচ্ছে দেখল।

রঞ্জিত মালতীর দরজার সামনে সন্তর্পণে দাঁড়াল। ঝাঁপের দরজা। টর্চ জ্বেলে সে ঝাঁপের দরজায় ফাঁক আছে কি-না দেখল। সে কোনও ফাঁক খুঁজে পেল না। সুতরাং খুব সন্তর্পণে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, মালতী। মনে হল তখন ভিতরের জীবটা জেগে আছে। সামান্য ডাকেই তার সাড়া মিলেছে।

সে উঠে বসেছে। গলাব স্বর চিনতে পেরে মালতীর বুক কাঁপছিল। সে কাঁপা হাতেই ঝাঁপ খুলে দিল।

—আমি।

মালতী কথা বলল না।

—এবার আমরা যাব।

মালতী বুঝতে পারছে না—আমরা যাব বলে রঞ্জিত কী বোঝাতে চাইছে। সে মাথা নিচু করে ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার সঙ্গে তুমি যাবে?

—কোথায়? সহসা মালতী রঞ্জিতের মতো প্রশ্ন করল।

—যেদিকে দু'চোখ যাবে।

—কিন্তু আমার যে কথা ছিল ঠাকুর।

—এখন আর কোনও কথা না মালতী। দেরি করলে আমরা ধরা পড়ে যাব।

—কিন্তু আমার ভয় করছে। তোমাকে সবটা বলতে না পারলে—

—রাস্তায় সবটা তোমার শুনব। তুমি তাড়াতাড়ি এস।

মালতী এবার খুপরির ভিতর ঢুকে দুটো সাদা থান, সেমিজ এবং পাথরের থালা নিল সঙ্গে।

—এত নিয়ে পথ হাঁটতে পারবে না।

সে পাথরের থালা রেখে দিল।

রঞ্জিত বলল, আমাদের রাতে গজারির বনে গিয়ে ঢুকে পড়তে হবে।

ওরা নদীর চরে নেমে আসতেই শুনল টোডারবাগের ওপাশে কারা টর্চ জ্বালিয়ে আসছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ। রঞ্জিত বুঝতে পারল, রাতে রাতে সন্তোষ দারোগা গ্রাম ঘিরে ফেলছে। সে মালতীকে বলল, জলে ঝাঁপিয়ে পড়।

পুলিশের লোকগুলি টর্চ এবার নিভিয়ে দিল। ওরা চলে যাচ্ছে। রঞ্জিত বলল, জলে ডুবে থাক।

ওরা জলের ভিতর যখন ডুব দিল, তখনই মনে হল কেউ টের পেয়ে গেছে। সে বলল, মালতী, সাঁতার কাটতে হবে। যত জোরে সম্ভব। বলে সাঁতার কেটে ওরা নদীর পাড়ে উঠলে দেখল টর্চের আলো এসে এ-পাড়ে পড়েছে। বুঝি রঞ্জিত ধরা পড়ে গেল। টর্চের আলোতে বুঝি ওকে খুঁজছে।

রঞ্জিতের এমন একটা ভয়াবহ ব্যাপারে যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। মালতীকে নিয়ে যা সামান্য অসুবিধা। সে মালতীকে বলল, বুঝতে পারছ ওরা কিছু টের পেয়েছে। ওরা আগে আগে এসে গেল।

মালতী কিছু বুঝতে পারছে না। সে বসে বসে এখন ওক দিচ্ছে।

—কি হয়েছে তোমার?

মালতী বলল, ঠাকুর, তুমি পালাও। দেরি করলে ওরা ধরে ফেলবে।

রঞ্জিত যেমন স্বভাবসুলভ হাসে, তেমনি হাসল। সে বলল, এটা তুমি পরো। এটা আমাকে বিপদ থেকে অনেকবার রক্ষা করেছে।

মালতী দেখল, কালো রঙের একটা বোরখা। ওরা বনের ভিতর ঢুকে পোশাক পাল্টে ফেলল। সে তার স্যুটকেস থেকে এক এক করে সব বের করল। বলল, এখানে টিপলে গুলি বের হবে। এই দ্যাখো। এটাকে বলে ট্রিগার। সে আলো জ্বেলে সব বোঝাল। এই ট্রিগার। ভাল হোল্ডিং চাই। এমিঙ খুব তীক্ষ্ণ দরকার। কিন্তু একি মালতী, ওক দিচ্ছ কেন? মালতী ওক দিতে দিতে কথা বলতে পারছে না।

রঞ্জিত বলল, তোমার কী হয়েছে মালতী তুমি ঠিক করে বল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মালতী যা এতদিন বলবে ভাবছিল, ঘৃণায় যা বলতে পারছিল না, এখন এই দুঃসময়ে রঞ্জিতকে সে তা মরিয়া হয়ে বলে ফেলল।

—ঠাকুর, আমি মা হইছি। তিন অমানুষ আমারে জননী বানাইছে। আর কিছু বলতে পারছে না। মালতী উপর্যুপরি ওক দিচ্ছে কেবল।

অন্ধকারে রঞ্জিত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মালতী পায়ের কাছে বসে ওক দিচ্ছে। ওপারে ইতস্তত টর্চের আলো। বনের ভিতর আলো ঢুকছে না। সেই আলোর কণা শুধু বৃষ্টিপাতের মতো পাতার ফাঁকে ফাঁকে সামান্য ঢুকছে। রঞ্জিত এবার হাঁটু গেড়ে বসল। মাথায় হাত রাখল মালতীর। বলল, আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে মালতী। আমরা কোথায় যাব জানি না। তুমি ওঠ।

এভাবে নদীর পাড়ে যে বন, যে বনে একবার সোনা পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে হাতিতে চড়ে মাঠ অতিক্রম করেছিল, সেই বনে মালতী এবং রঞ্জিত সারারাত সকাল হবার আশায় গাছের নিচে পাশাপাশি শুয়েছিল। রঞ্জিত আর একটা কথাও বলেনি। মালতী ভয়ে ঘাসের ভিতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। দু'জনই সারারাত জেগে ছিল। এরপর কী কথা বলে, যে আবার স্বাভাবিক হওয়া যায় রঞ্জিত ভেবে উঠতে পারছে না। কোথায় যাবে, কার কাছে নিয়ে যাবে এবং সে এমন এক মেয়ে নিয়ে এখন কী করে? গাছের শাখা প্রশাখা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। শেষ রাতের জ্যোৎস্না গাছের পাতায় পাতায়। সেই যেন পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। অথবা কে যেন আবার উচ্চৈঃস্বরে পড়ে চলেছে—অ্যাট লাস্ট দি সেলফিস জায়েন্ট কেম। খুব সকালে আকাশ ফর্সা না হতে মালতীই ডেকে দিয়েছে। রঞ্জিতের চোখে ভোর রাতের দিকে ঘুম এসে গেছিল।

রঞ্জিত ধড়ফড় করে উঠে বসল। সে নিজে একটা লুঙ্গি পরল। সে তার স্যুটকেস থেকে আঠা এবং রঙিন কিছু পাট বের করে একেবারে অন্য মানুষ সেজে গেল। বোরখার নিচে বিবি, আর রঞ্জিত এক মিঞাসাব। ভাঙা ছাতি বগলে। মিঞা-বিবি মেমান বাড়ি যাচ্ছে এমনভাবে রঞ্জিত খঁড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে থাকল।

যেতে যেতে মালতী বলল, তুমি ঠাকুর আমাকে জোটনের কাছে রাইখা যাও।

রঞ্জিত কথা বলল না। এ অবস্থায় ওকে কোথায় আর নিয়ে যাওয়া যাবে। সে দরগার উদ্দেশে হাঁটতে থাকল। দিনমানে হাঁটলে সে মালতীকে নিয়ে জোটনের দরগায় পৌঁছাতে পারবে। মালতীকে আপাতত জোটনের কাছে রেখে সে কোথাও চলে যাবে ভাবল।

আর সে হাঁটতে হাঁটতেই কার ওপর আক্রোশে বনের ভিতর চিৎকার করে উঠল, বন্দেমাতরম। আক্রোশের প্রতিপক্ষ জব্বর, না সন্তোষ দারোগা, ওর চোখমুখ দেখে তা ধরা গেল না।

|| প্রথম খণ্ড সমাপ্ত||

দ্বিতীয় খণ্ড

তখন ভালোবাসার যৌবন হরণ কইরা নেয় আকালুদ্দিন।

আন্নু ঘরের ভিতর। ফেলু বাছুর নিয়ে মাঠে গেছে।

ফেলু মাঠে নেমেই দেখল দুটো ঘোড়া পুকুর পাড়ে গোলাপজাম গাছটায় কারা বেঁধে রেখেছে। অনেক লোকজন ছুটে যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ি। বুড়োকর্তার শরীর খারাপ হতে পারে। ঘোড়া তারিণী কবিরাজের হবে। ঘোড়ায় চড়ে শ্বাসকষ্ট নিরাময় করতে এসেছেন তারিণী কবিরাজ। অন্য ঘোড়া মতি রায়ের হবে। ওরা বুড়োকর্তার বড় যজমান। কিন্তু তখনই ফেলু দেখল ক'জন পুলিশ পুকুর পাড়ে কি খুঁজছে। নীল পাগড়ি মাথায় দুজন মানুষ ঘোড়া দুটোকে কি খেতে দিচ্ছে। বুঝি থলের ভিতর চানা দিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছে। সে দূর থেকে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। হাতে চানা খাওয়াচ্ছে, না থলের ভিতর চানা। দফাদারের হাত চেটে দিচ্ছে না পিঠ চেটে দিচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দুই ঘোড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছে বোঝা যাচ্ছে।

আকালুদ্দিন বাঁশঝাড়ের নিচে টেনে এনেছে বিবিকে। লোকজন ছুটছে হিন্দু পাড়াতে, ছোটঠাকুরকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এমন একটা সোরগোল শুনেই আনু শাড়ি পরে বের হতে যাবে তখন আকালুদ্দিন সামনে। দাড়িতে আতর মেখে হাজির। সারারাত আজকাল আর আন্নু ঘর থেকে বের হতে পারে না। ফেলু মটকা মেরে পড়ে থাকে। ঘুমোয় না। হাতের কষ্টে সে সারারাত ছটফট করে। কিন্তু আর মনে হয় ওটা হাতের কষ্ট নয়—য্যান ভিতরে সেই সন্দেহের কোড়া পাখিটা কুরে কুরে খায়। ঘুম আসে না মিঞার চোখে। আকালুদ্দিন মিঞা তার ঘুম হরণ কইরা নিছে। আকালুদ্দিন সামুর পরই এ অঞ্চলে লীগের বড় নেতা।

সামু গাঁয়ে বড় আসে না। এলেও দু'একদিন থাকে তারপরই চলে যায়। আকালুদ্দিনের উপর সব ভার এখন। সে মুসলমান গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মানুষজনকে তার দলে টানছে। কারণ আবার নির্বাচন আসছে, যা শোনা যাচ্ছে এবারে পৃথক নির্বাচন হবে, কোন্ মাসে হবে কে জানে। ফজলুল হক সাহেবের তেমন আর রবরবা নেই। আকালুদ্দিন মাঠে নেমে যাবার সময় খালি বাড়ি পেয়ে এক লাফে ঘরের ভিতর। বিবিকে টানতে টানতে একেবারে বাঁশবনের ভিতর। —আরে মিঞা, কর কি! কর কি! সময় অসময় নাই!

—তুই চুপ কর দিহি! ঐ দ্যাখ, মরদ তর মাঠে। খোঁড়া মুরগের মত হাইটা যায়।

আন্নু কাপড় তুলে উঁকি দিয়ে দেখল, সত্যি ফেলু মিঞা মোরগ বনে গেছে।

আকালু তখন আন্নুকে একটা জবরদস্ত মুরগি বানিয়ে ফেলল। মুরগি বানিয়ে আকালু আন্নুকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। সে সেই আবছা মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে হেসে উঠল,

আমার মরদ লাথি মারে মিঞা! নালিশ দিতে দিতে সে আরামে বার বার পুষ্ট মুরগি বনে যাচ্ছে। আকালু দাড়ি ঘষে দিচ্ছিল ঘাড়ে।   বড় আরাম বোধ হচ্ছে দু'জনার।

সামান্য এক বাছুরও নাস্তানাবুদ বানিয়ে দিচ্ছে ফেলুকে। বাছুর লেজ তুলে ছুটছে ফেলুকে নিয়ে। আকালু দাড়ির আতর তখন বিবির মুখে ঘষে দিচ্ছে। পিঠে হাত রেখে ঘাড় চেটে দিচ্ছিল। তারপর যা হয়, পরের বিবিকে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে বনে জঙ্গলে ভোগ করে একেবারে তাজা মানুষ আকালু। অথবা যেন সে মোল্লা ব'নে যায়। পান খায়, গুয়া খায় এবং বারে বারে নদীর পাড় দিয়া হাইটা যায়।

আকালু পরের বিবিকে মুরগি বানিয়ে হাঁটছে নদীর পাড়ে। সেও দেখতে পেল দুটো ঘোড়া গাছের নিচে বাঁধা। সে মনে মনে কপট হাসল। কারণ তখন ফেলুর বাছুরটা লেজ তুলে মাঠের দিকে না নেমে বাড়িমুখো উঠে যাচ্ছে।

কে যেন বলে, ফেলু তর মরণ! তর বিবির শরীরে আতরের গন্ধ। তুই আতরের গন্ধ টের পাবি বলে, তোকে বাড়িমুখো উঠে যেতে দেখলে বিবি তর ঝাঁপ দিব পুকুরে। আর আছে ষণ্ড হাজি সাহেবের। সে তরে কেবল ভয় দেখায় চষা মাঠের উপর দাঁড়িয়ে। তোর যে কী হবে ফেলু। তুই তালাক দিবি বিবিকে। ফেলু মনে মনে হাসে। সে আজকাল একা থাকলেই মনে মনে কথা বলে। ওর এটা ক্রমে স্বভাব জন্মে গেছে। তখনই তার মাইজলা বিবির জন্য মনটা টনটন করতে থাকে। —আমার আছেডা কি আল্লা! সে এক হাত উপরে তুলে নসিবের কথা আল্লাকে জানাতে চাইলে দেখতে পায় আকালুদ্দিন মিঞা নদীর পাড়ে হাইটা যায়। মিঞা যাবে বক্তৃতা দিতে। পরাপরদির হাটে লীগের সভা-সকাল সকাল দলবল নিয়ে চলে যাবে। এখন গাঁয়ে গাঁয়ে সে চাষী মানুষ যোগাড় করতে যাচ্ছে। তারও ইচ্ছা হাটে সে যাবে একবার। তার এই লীগের মিঞাদের লম্বা কথা শুনতে ভালো লাগে। গায়ে কাঁটা দেয় যখন আকালুদ্দিন বলে, দ্যাখেন মিঞারা চক্ষু তুইলা দ্যাখেন! কি আছেড়া আপনে! খানা নাই, পিনা নাই, জানে নাই খুন, হিন্দুরা সব চুরি কইরা নিছে। তখন মনেই হয় না—অ-হালা হারামজাদা তার বিবির তালাকের জন্য বসে আছে। দশ কুড়ি দশ টাকার লোভ দেখাচ্ছে! তালাকনামা করে দিলেই সে তার মজুরা পেয়ে যাবে। তালাকনামা পেলে বিবি মল বাজিয়ে উঠে আসবে আকালুর উঠানে।

ফেলু তখন হাসে। সেই এক নিষ্ঠুর হাসি। —আরে মিঞা, এডা কি কও। বিবির দাম মিঞা খাবলা খাবলা জমির মতন তারে কম মূল্যে বিচা লাভডা কি কও দ্যাহি! যতদিন আছে তাইন, আমি আছি ততদিন! আমার মূলাডা তোমার কাছে আছে। দশ কুড়ি দশ ট্যাহা একডা ট্যাহা! টাকা পয়সা সব জলে, বিবি যদি চলে যায় তবে ফেলুর থাকে কি! আমি যে মিঞা ফেলু শেখ, আমার হাত ভাইঙা দিছে পাগল ঠাকুর। ঠাকুর তুমি আছ আর এক ষণ্ড। তিন ষণ্ডের মোকাবিলা করতে পারি আমি একা ফেলু! এক ষণ্ড হাজি সাহেবের খোদাই ষাঁড়, অন্য ষণ্ড মিঞা আকালুদ্দিন আর এক হাত ভেঙে দিয়ে পাগল ঠাকুর হয়ে

গেছে তিন যণ্ডের এক ষণ্ড। সে ফাঁক পেলেই এখন কোরবানীর চাকুতে ধার দিচ্ছে। কার গলা ফাঁক করবে তার আল্লা জানে!

তা যা আছে কপালে! দেবে পাড়ি একদিন মুড়াপাড়া। হাতের এই বাগি বাছুর কোরবানী দিয়ে আসবে ভাঙা মসজিদের মাজারে মুড়া পাড়ার বা বুরা সাতটা মসজিদের খরচ দেয়, কাছারি বাড়ি থেকে খরচ যায়, তবু তোমরা মিঞারা মা আনন্দময়ীর পাশে যে ভাঙা এক মসজিদ আছে, বন-জঙ্গল আছে, সেখানে নামাজ পড়তে পাবে না। মিঞা আকালুদ্দিন এই নিয়ে এ অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। মৌলবীসাব যার মুড়াপাড়ার বাজাবে সুতার কারবাব আছে সে এসেছিল একবার, সে এসে বলে গেছে, আল্লার দুনিয়ায় কাফের থাকুক, আল্লা তা চান না। বিধর্মী নিধন হউক। ইনসা আল্লা — পরবে পরবে, জিগির দ্যাও, দেশ চাই পাকিস্তান। হিন্দুর দেবী দুই ঠ্যাঙ ফাঁক কইবা কি যে কাণ্ড একখানা— সোনার মুণ্ডমালা গলায় ট্যারচা চখে চাইয়া থাকে। পারেন না মিঞা কোরবানী দিতে আল্লার নামে নিজের জান? নামাজ পড়তে পারেন না মিঞা ভাঙা মসজিদে? আপনারা যদি আল্লার দরবারে জেরার মুখে পড়েন, কি জবাবড়া দিবেন কন দিহি। আপনেরা আবার কন আল্লার বান্দা!

ফেলু মনে মনে কবুল করল, সত্যি আল্লার এই নামে তবে কাম কি! তা তুমি মিঞা আকালুদ্দিন এত কথা কও, মঞ্চে উইঠা নাচন কোঁদন কর, তুমি মিঞা তবে জিগির দ্যাও না ধর্মযুদ্ধের কে আছরে মিঞা, কোন গাঁয়ে কারা আছে, আল্লার বান্দা দুনিয়ায় আইসা তবে কামডা কি, চল যুদ্ধে, ধর্মযুদ্ধে, হাতে বল্লম সড়কি, বাঁশের লাঠি এবং তোমার যা আছে। যদি না থাকে তবে সুপারিব শলা। দ্যাও ইবারে আল্লা-হু-আকবর বলে ধ্বনি একখানা!

কিন্তু তখনই মনে হল ধ্বনি উঠছে ঠাকুরবাড়ি। সবাই মিলে ধ্বনি দিচ্ছে- বন্দেমাতরম্! কী কারণ এ-ধ্বনির! কারণ সন্তোষ দারোগা ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এসেছিল রঞ্জিতকে ধরতে, কিন্তু তাকে পেল না। নিজ বলে দারোগা সাহেব সমন খাড়া করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ঠাকুরকে। শশীভূষণ ধ্বনি দিচ্ছে, বন্দেমাতরম্। ধ্বনি দিচ্ছে, শচীন্দ্রনাথ কি জয়! ধ্বনি দিচ্ছে ভারতমাতা কি জয়! দেশের কাজে মানুষ জেলে যায়। ফেলু দুবার জেল খেটেছে। খুনের দায়ে জেল খেটেছে। আর শচী ঠাকুর খাটবে স্বদেশীর জন্য। সেও একবার এ-ভাবে জেলে যেতে চায়। ওদের দেখাদেখি সেও মাঠের এ-পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, আল্লা-হু আকবর। হিন্দুরা কিছুতেই ওদের জন্য দেশটা আলাদা করে দিচ্ছে না। পায়ের তলায় রেখে কেবল মজা দেখতে চায়। হালার হালা কাওয়া। হালার হালা কাফের।

কিন্তু ফেলুর হাঁক এত আস্তে হল যে সে নিজেই শুনতে পেল না। তবে কি ওর গলা বসে গেছে! গতকাল সে চিল্লাচিল্লি করেছে বিবির সঙ্গে। বিবি তার দুই কাঠা ধান এনেছে। ধান এনেছে গতর খেটে। সে একবার বিল থেকে বড় মাছ ধরে এনেছিল—কারণ বিবি

তার সব পারে, সব চুরি করে আনতে পারে, এই চুরি করার নামে বিবি তার মাঠে যায়—আর কতদিন পাহারা দিয়ে রাখবে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, বিবির খাইস মিটে না, পাল খাওয়া গরুর মতো লাফায়, চোখ সাদা করে রাখে। তখন ওর ইচ্ছা হয় মাজায় একটা দুম করে লাথি মারে। লাথি মারলেই পাল থেকে যাবে, থেকে গেলেই গরু তার গাভিন, আর লাফাতে পারবে না। এতে আর শরীরে মোহব্বত থাকবে না। চোখ মুখ সাদা ফ্যাকাসে আন্নু একটা উরাট জমির মতো খালি পড়ে থাকবে। আবাদ করতে কেউ আসবে না।

তখন হালার বাছুর একেবারে উঠানে। বাছুরটার পিছনে ফেলু ঠিক ছুটে আসবে। গালে মুখে আন্নুর আতরের গন্ধ। সে তাড়াতাড়ি বাছুর উঠানে দেখে মুখ ধুয়ে ফেল। কিন্তু পিঠে, ঘাড়ে গন্ধটা লেগে আছে। ফেলু কাছে এলেই টের পাবে। বাছুরটা যত নষ্টের গোড়া। সে ভাবল উঠানে নেমে ফেলু উঠে আসতে না আসতে আবার মাঠে তাড়িয়ে দেবে কি-না। এখন বাছুরটা না এলে মানুষটা আসত দুপুরে। যখন মাথার উপর সূর্য তখন ফেলু উঠে আসে। ঘাড়ে গলায় সামান্য পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ মেখে রাখল আন্নু। ফেলু যেন টের না পায় আকালু বিবিকে ভোগ করে গেছে।

এখন আম্মু তাড়াতাড়ি কী যে করে! আর তখনই হিন্দু পাড়াতে আবার সেই ধ্বনি। সে যেন অনেকদিন পর এমন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। সে এতক্ষণ আকালুর সঙ্গে ঝোপে-জঙ্গলে পীরিত করছিল বলে খেয়াল করেনি। কিন্তু আকালু চলে যেতেই একে একে হুঁশ ফিরে আসার মতো সে শুনতে পাচ্ছে—হিন্দু পাড়াতে জয় ধ্বনি উঠছে। দলে দলে লোক যাচ্ছে হিন্দুপাড়ার দিকে। সে,ঈশম এবং মনজুর কে চিনতে পারছে। মনে হল ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কারা। পুলিশের লোক! ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল। ফেলুটা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ওর য্যান পরাণে ভয়ডর নাই। ছোট ঠাকুর মাঝখানে। সামনে পিছনে পুলিশ! সোনা, লালটু, পলটু অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পাগল মানুষ তরমুজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। নরেন দাস আভারানী মাঠে এসে নেমেছে। গৌর সরকার, বেনে পাড়ার সব লোক নেমে এসেছে।

একটা ফড়িঙ এ-সময় আন্নুর মাথার উপর এসে বসল। সে ফড়িঙটা উড়িয়ে দেবার সময় দেখল, ফেলু উঠে আসছে। একেবারে কাছে এসে গেছে। এবার সে আতরের গন্ধ পেয়ে যাবে। মনেই নেই গায়ে পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ মেখে বসে আছে! কী করে! কী করে! সামনে ছিল হাজিদের পুকুর। সে পুকুরে ঝাঁপ দিল এবং জলে ডুবে গেল। ফড়িঙটা আন্নুর মাথার ওপর বসার জন্য জল পর্যন্ত উড়ে এসেছিল, জলের উপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। কিন্তু আন্নু জলের নিচে ডুবে গেলে কোথায় পাবে তারে। ফড়িঙটা আন্নুকে খুঁজে পেল না বলে আবার মাঠে উড়ে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেলু পাড়ে দাঁড়িয়ে ফড়িঙের মজা দেখবে না বিবিকে ডাকবে—কী যে করবে ভেবে পেল না। একটা হাব। মানুষের মতো পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে বিবি কখন জল থেকে ভেসে উঠবে সে আশায় দাঁড়িয়ে থাকল ফেলু।

হঠাৎ আন্নু মাঝপুকুরে একটা চিতল মাছের মতো ভেসে উঠল।

ফেলু হাঁকল, আমার বিবি রে!

বিবি ফের ডুব দিল জলে।

—বিবি রে, পানির নিচে তর কি হারাইছে? জলের নিচ থেকে তখন বুড়বুড়ি উঠছে।

পানির নিচে কার কী যে হারায়। আন্নু ডুবসাঁতারে এখন পুকুর পার হয়ে যাচ্ছে। ফেলু বিবির ডুবসাঁতার দেখছে। ওর জলের উপর ভেসে ওঠা দেখছে। আন্নুর শরীর জলে ভিজে থাকলে ফেলুর বড় কষ্ট হয়। টানা টানা চোখ। বোরখার অন্তরালে সে এমন খুবসুরত বিবিকে রাখতে পারল না। ওর হাত না ভাঙলে বিবির কপালে কত সুখ ছিল। সে বিবির জন্য বাবুরহাটের শাড়ি কিনে আনতে পারত এবং একটা ময়না পাখি কিনে দিতে পারত। পায়ে মল, হাতে বাজু এবং কপালে টিকলি আর গলায় বিছা হার। কোমরে রুপোর পাইছি রোদে চকচক করত। এমন পুষ্ট শরীরে এসব থাকলে বিবি তার বেগম বনে যেত। হায়, তার নসিবে এত দুঃখ। সে বলল, হালার কাওয়া! হালার পাগল ঠাকুর।

হুঁপ! আবার চিতল মাছটা জলে শরীর ভাসিয়ে দিল। এবং পাখনা খেলিয়ে, চিৎ হয়ে অথবা কাত হয়ে সাঁতার কাটলে আনু য্যান এক রূপালী মাছ! এই পুকুরের জলে একটা রূপালী-মোহ চোখের সামনে নাচছে। ওরও সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হচ্ছে, জলের নিচে মাছ হয়ে আন্নুকে ছুঁতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সে পারছে না। তার হাত ভাঙা। হালার কাওয়া।

সে ডাকল, আম্মু তুই উঠ দিনি।বাছুরটা ছুইটা গ্যাছে। ধরতে পারতেছি না।

আর কোনও কোনও দিন যখন সাঁজ নামে, যখন কুয়াশায় এই অঞ্চল ঢেকে যায়, যখন শীতের ঠাণ্ডায় পুকুরের মাছ, বিলের মাছ, নদীনালার মাছ এবং জলের তাবৎ জীব চুপ হয়ে থাকে তখন আন্নু যায় চুপি চুপি, পিছনে যায় ফেলু। সামনে শুধু মাঠ, মাঠে নাড়া এবং সর্ষে ফুল থাকে। সর্ষে ফুল, বোঝা বোঝা নাড়া এবং ধনেপাতা—এইসব মাঠময় পড়ে থাকলে বিবি তার সে রাতে চুপি চুপি সব তুলে আনে। এমনভাবে আনে যেন সে বেছে আনছে। এক জায়গা থেকে সব তুলে নেয় না। ফাঁকে ফাঁকে তুলে আনে। জমি যার, সে আলে দাঁড়ালে টেরই পাবে না ফাঁকে ফাঁকে কেউ ফসল চুরি করে নিয়ে গেছে।

অথচ এই অসময়ে জলে সাঁতার আন্নুর—ফেলুর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। বাছুরটা ষণ্ড দেখে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। কার জমিতে গিয়ে মুখ দেবে এখন কে জানে। একমাত্র আন্নু সম্বল। সে বাছুরটা ধরে আনতে পারে। আর বাছুর যখন মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ায়, পিছনে আন্নু কাপড় সামলাতে পারে না— বলিহারি যাই, আন্নু একেবারে তখন বনদেবী। সে হাঁকল, হালার কাওয়া। তর গরম বাইর কইরা দিমু।

আন্নু যেন টের পেল জলের নিচে, ফেলু হাঁকপাঁক করছে পাড়ে। সে উঠে বলল, কোনখানে?

ফেলু হাত তুলে দিলে আন্নু ছুটল। বাছুরটা অনেক দূরে। আন্নু দ্রুত ছুটছে। ভিজে কাপড়ে ছুটছে। চুল ভিজা, কাপড় ভিজা, সব লেপ্টে আছে গায়ে। শাড়িটা হাঁটুর ওপর উঠে গেছে—সামনে সেই এক ধানের মাঠ, আন্নু ছুটছে সেই মাঠের উপর দিয়ে। বিবিকে দেখে বাছুরটাও ছুটছে আর দূরে ছুটছে আকালুদ্দিন। নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। নামাজের আগে পরাপরদির মসজিদে পৌঁছাতে হবে। নামাজ শেষে সে তার সব জাত-ভাইদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে, আল্ল-হু- আকবর।

কিছুদিন আগে এই দেশে ছোট ঠাকুর ছোট ঠাকুর বড় এক সভা করেছিলেন। নেতা মানুষটির মাথায় গান্ধী টুপি। কালো বেঁটে মানুষ। আগুনের মতো তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি এমন সব কথা বলছিলেন যে ক্ষণে ক্ষণে হাততালি পড়েছে। বক্তৃতার শেষে নেতা মানুষটি বললেন, আমরা এক অখণ্ড দেশ চাই। সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। এক দেশ, এক জাতি, হিন্দু-মুসলমানের এক পরিচয়, আমরা ভারতবাসী। আকালুদ্দিন গিয়েছিল সভাতে। কত লোক! কী আগুন বক্তৃতায়! সে মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে মনে হেসেছিল—এক জাতি, এক পরিচয়—আমরা ভারতবাসী!

আর তখন ঈশম গোপাট পর্যন্ত নেমে এল। কারণ সে বেশীদূর যেতে পারছে না। সে গেলে বাড়িঘর কে দেখাশুনা করবে। পাওনাগণ্ডা কে বুঝে নেবে। সে না থাকলে, এই যে এক পরিবার থাকল, পাগল মানুষ থাকলেন, এবং বুড়ো মানুষটি যিনি যে-কোনওদিন আপন নিবাস থেকে ঈশ্বরের নিবাসে গমন করতে পারেন, তাঁদের এখন দেখেশুনে রাখার সব দায় এই মানুষের। সোনা, লালটু, পলটু অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বড়বৌ ধনবৌ পুবের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। শশীমাস্টার অর্জুন গাছটার নিচে ওদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং নানারকম বোঝ প্রবোধ দিচ্ছেন—দূর বোকা, কাঁদে নাকি! কত বড় সম্মান! দেশের কাজ করছে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। আমাদের কোনও দুঃখ থাকবে না। কত সম্পদ আমাদের। সব ইংরেজরা এখন সাগর পারে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের তাড়িয়ে দিলে কোনও মানুষ না খেয়ে থাকবে না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা যাবে না। আমাদের দেশ কত বড়, আর কী মহান এই দেশ। আমরা এই মহান দেশের মানুষ। আমাদের গর্বের শেষ নাই।

সোনা শশীমাস্টারের এমন সব কথা শুনে কান্না থামিয়ে দিল। সে চোখ মুছে বলল, কবে স্বাধীন হইব?

—তা আর দেরি নেই মনে হয়।

সোনার মনে হল স্বাধীন হলেই সব হয়ে যাবে। যেমন জালালি, যে খেতে পেত না, স্বাধীন হলে খেতে পেত। জলে ডুবে মরতে হতো না। ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল জালালির জন্য। সে আর দুটো দিন দেরি করতে পারল না! স্বাধীন দেশের মানুষ সে হতে পারত। তার মনে হল এখন ঠাকুরদাও একদিন মরে যাবেন। তিনি স্বাধীন হবার আগে মরবেন,

না পরে মরবেন, পরে মরলে সে একদিন ঠাকুরদাকে তরমুজ খেত পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। বলবে, ঠাকুরদা আপনি তো সারা জীবন পরাধীন দেশের উপর দিয়ে হেঁটে গেছেন, এবার স্বাধীন দেশের মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আপনার ভালো লাগছে না! বাতাসটা পাতলা মনে হচ্ছে না! বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছেন না! মনে হচ্ছে না এবার আপনি আরও বেশীদিন বাঁচবেন!

ঠাকুরদা নিশ্চয়ই সোনার মাথায় হাত রেখে বলবেন তখন, তোরা কত ভাগ্যবান। তোরা স্বাধীন দেশের মানুষ। কত সংগ্রামের পর এ স্বাধীনতা, জালিয়ানওয়ালাবাগ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, দেশবন্ধু ওদের কথা সব সময় মনে রাখবি। ওদের জন্য এই স্বাধীনতা। ওদের ভুলে যাবি না। তোরা কতকাল বাঁচবি রে আহা স্বাধীন, স্বাধীনতা এই শব্দ কি এক আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত কথা! সোনার চোখ বুজে আসছিল।

তখন শশীমাস্টার দেখলেন, ধানের জমির উপর দিয়ে এক যুবতী মেয়ে ছুটছে। কে যায়! ওঃ, সেই ফেলুর ডানাকাটা পরী যায়। কার গলা হ্যাত করে কেটে ধরে আনা বিবি। বাছুরটাকে ধরে ফেলেছে। ফেলু দাঁড়িয়ে আছে জালালির কবরের পাশে। কবরের সাদা কাশ ফুল দুলছে বাতাসে। কবরটার উপর সবুজ ঘাস। বৃষ্টিতে বর্ষায় কবরটা আর কবর নেই। মসৃণ মাঠ হয়ে গেছে। সেখানে আবার নতুন জীবনের উন্মেষ হচ্ছে।

আকালুদ্দিনের পরাপরদি পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা হয়ে গেছে। সে ফজরের নামাজে হাজির হতে পারেনি। জোহরের নামাজ সে সকলের সঙ্গে পড়তে পারবে। দূর দেশ থেকে লীগের নেতারা এসেছে। মসজিদের পাশে মাদ্রাসা। মাদ্রাসার সামনে বড় মাঠ, মাঠে শামিয়ানা টাঙানো। নিশান উড়ছে। সেই কবে একবার তার গাঁয়ের পাশে সামুভাই জালসা করেছিল, শিন্নির জন্য তামার বড় ডেগ আর তখন মুড়াপাড়ার হাতি এসে সব তছনছ করে দিয়েছিল—জালসা হতে পারেনি, কিন্তু এখানে কার হিম্মৎ আছে জালসা ভেঙে দেয়। সাহাদের ঘাট নদীর অপর পাড়ে—নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র, তার পাশে পুরানো ভাঙা সব বাড়ি, এক সময় এ-গঞ্জের মতো জায়গায় সাহাদের প্রতিপত্তি ছিল কত! এখন সাহারা নারায়ণগঞ্জে তেজারতির কারবার করে বড় ব্যবসা ফেঁদেছে। গাঁয়ের পুরানো ভাঙা বাড়ি ফেলে চলে গেছে তারা। বড় বড় অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে পাঁচিলে। আর শুধু চারপাশে মুসলমান গ্রাম এবং নদী পার হলে এই মাদ্রাসা মৌলানাসাবের প্রাণ। এখানে কলকাতা থেকে জনাব আলি সাহেব এসেছেন। তিনি যখন বক্তৃতা করেন, কাচের গ্লাসে ফুৎ ফুৎ জল খান। আকালু ভাবল সেও জল খাবে কাচের গ্লাসে। তা'হলে গলা শুকাবে না। কারণ এইসব নামী মানুষের সঙ্গে আকালুদ্দিন আজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তৃতা করবে। জল খেলে মাথায় বুদ্ধি আসে বুঝি! সামুভাইও জল খান বারে বারে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জল খাওয়া বড় নেতার স্বভাব। সে এইসব নামী মানুষের সামনে কী আর বলবে! ভাবল, কী আর বলা যায়, শুধু প্রথমে বলা ইনসা আল্লা, তারপর কিছু হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে পড়া।

সে চারদিকে দেখল নিশান উড়ছে। কোথাও ইস্তাহারে লেখা আছে নারায়ে তকদির অথবা লাল নীল সবুজ রঙের ফেস্টুন, ধর্মাধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, হিন্দু বিধবা রমণীর মুসলমান দর্শনে ঘৃণ্য মুখ, অস্পৃশ্যতার কঠিন দৃশ্য এবং কার কত জমি, হিন্দু শতকরা কতজন, হিন্দু কত আয় করে, সেখানে অঞ্চল বিশেষে কত মুসলমান, তার আয় কত—এসব পরিসংখ্যান। সহসা দেখলে মনে হবে—শ্রেণীসংগ্রামের ডাক দিয়েছে তারা।

এবং কবে প্রথম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁরা করেছেন তাঁদের ছবি। বিখ্যাত সব মসজিদের ফোটো থামের লাল-নীল মোড়া কাগজের উপর সাঁটা। এবং হজে গেলে যেসব ছবি সংগ্রহ করে এনেছেন হাজিসাবেরা সেইসব ছবি ঝুলিয়ে পবিত্র ইসলামের বাণী বহন করছে এই সভা। শামিয়ানার নিচে এইসব দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আকালুদ্দিন মোড়লের মতো হেঁটে যাচ্ছিল। সে মানীজনদের আদাব দিল। শামিয়ানার দক্ষিণ দিকে বড় বড় উনুনে তামার ডেগ। যাঁরা মানী-গুণীজন তাঁদের খাবার ব্যবস্থা। সে এখানে এসেই প্রথম খোঁজ করল সামসুদ্দিনের। সামুভাই থাকলে সে গলা ছেড়ে বলতে পারবে। সে মনে বল পাবে। সামুভাই যে কোন্ দিকে! কেউ বলল, তাইন গোসল করতে গ্যাছেন। কেউ বলল, তিনি আলি সাহেবকে নিয়ে মাঠে নেমে গেছেন। এবং এইসব গ্রামদেশের কী অসহায় দারিদ্র্য তাই দেখাতে নিয়ে গেছেন।

ওরা এবার সকলে রান্না হলেই আহার করতে বসবে। তারপর জোহরের নামাজ। নামাজে কে ইমাম হবে আজ! আকালুদ্দিনের কতকালের খোয়াব সে এমন এক বড় মাঠের জমায়েতে ইমাম হবে। সামুভাই থাকলে সে একবার মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে পারত।

সে হন্যে হয়ে সামুভাইকে খুঁজছিল। আর খুঁজতে খুঁজতেই পেয়ে গেল। সামুভাই সেই লম্বা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজটুপি পরে মাঠ থেকে উঠে আসছে। পায়ে বুট জুতো। মোজা নেই। সঙ্গে এক দঙ্গল লোক। রোদে ওদের সকলের মুখ পুড়ে গেছে। জল তেষ্টা পেতে পারে বলে বদনা হাতে পাঁচ-সাতজন লোক সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। ওরা এবার সকলে খেতে বসে গেল। পাটির উপর পাঁচ-সাতজন করে গোল হয়ে বসে গেল। বড় থালায় ভাত। ছ'সাতজন করে একটা খালার চারপাশে বসেছে। থালার মাঝে মঠের মতো ভাত সাজানো। কিনার থেকে যে যার মতো ভাত ভেঙে ডাল নিয়ে চেটে চেটে ভাত-ডাল-গোস্ত খাচ্ছে। সামু আকালু এক গাঁয়ের লোক। এবং যারা কাছাকাছি তারা পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। যে যার মতো একই থালায় ভাত ভেঙে মেখে খেয়ে উঠে মুখ ধুল। নদীর ঘাটে অজু করে এল। একসঙ্গে সার বেঁধে নামাজ পড়ল। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে আকালুদ্দিনের। সে ইমামের কাজ করছে। তারপর মঞ্চে উঠে যে যার মতো বলে গেল। সবাই প্রায় কথায় কথায় হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের কথা বলল। মাঠের দিকে হাত তুলে দেখাল। বলল, দু'চার বিঘা জমি বাদে, সব জমি কার?

—হিন্দুর।

—ভূমিহীন কারা?

—আমরা।

—উকিল বলুন ডাক্তার বলুন কারা?

—হিন্দুরা।

শিক্ষা-দীক্ষা কাদের জন্য?

—হিন্দুর জন্য।

—ওদের জমিতে খাটলে আপনি খান, আপনার নাম মুসলমান।

এবারে হাততালি পড়ল।

সামসুদ্দিন কিন্তু খুব যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে—এই যে আমরা, মুসলমানেরা আলাদা একটা দেশ চাই—তার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা রাখল। সে একটা সালের উল্লেখ করে বাংলাদেশে হকসাহেবের পরিণতির কথা বলল। হিন্দু মুসলমান একই রাষ্ট্রে একই পতাকার নিচে বসবাস করতে পারে না, তার কারণ ব্যাখ্যা করল। সে বলল, আপনেরা জানেন মিঞাভাইরা আমার দিলের চাইতে আপন পীরিতের মানুষেরা, আপনেরা জানেন, ১৯৩৭ সালের কথা। হকসাহেবের কৃষক প্রজা দল যেহেতু মুসলিম প্রধান দল, তাকে নিয়ে কংগ্রেস যৌথ সরকার গঠন করলেন না। আপনেরা জানেন, উত্তর প্রদেশের মুসলিম লীগ দাবি করেছিল যৌথ সরকারের—নেহেরুজী তা বানচাল করে দিলেন। আপনেরা জানেন, হকসাহেবের দল কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়, সাধারণ মেহনতী মানুষ নিয়ে এই দল, কৃষক প্রজা নিয়ে এই আন্দোলন, অথচ হিন্দুদের এমন মুসলিম বিদ্বেষ যে, তাঁরা কিছুতেই যৌথ সরকার গঠন করলেন না। বরং কংগ্রেস হকসাহেবের সব প্রগতিশীল কাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকল। হকসাহেব তখন বুঝতে পারলেন তাঁর তখৎ-ই-তাউস পদ্মা, মেঘনা, বুড়ি গঙ্গায় ভেঙ্গে পড়েছে। বলে সামসুদ্দিন একটু থামল। এক গ্লাস জল খেল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেমন ভিড় হয়েছে। তারপর ফের বলতে থাকল, আপনাদের কাছে আমি এখন পীর পুরের রিপোর্ট তুলে ধরব। কী প্রকট এই মুসলিম বিদ্বেষ! কী অমানুষিক অত্যাচার! তাজা খুনের হোলি খেলেছে তারা। আপনার আমার খুনে ওরা গোসল করেছে। সে এসব বলে আবার জল খাবার সময় কী যেন এক ছবি, ছবিতে মালতীর মুখ, সেই করুণ মুখ, তুই সামু এডা কি কস, সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন গলা শুকিয়ে গেল। কোনওরকমে তারপর বলল, আপনাদের ভিন্ন দেশ বাদে গতি নাই। সে নিজেকে বলল, হে আল্লা, এ ছাড়া এ-জাতির উদ্ধার নাই।

কী ভাবল সামান্য সময় ফের সামু। এমন ভিড়ে সে যে কেন বার বার সেই করুণ মুখ দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারছে না। যেন কেবল বর্ষায় মালতী তার হারানো হাঁসটা খুঁজছে। এবং সে মালতীকে নিয়ে ধানখেতের আলে আলে লগি বাইছে। মালতীর হাঁসটা খুঁজে পেলেই সে তাকে দিয়ে আসবে বাড়িতে।

এসব সাময়িক দুর্বলতা। এতগুলি মানুষ তার মুখ থেকে আরও কী শুনতে চাইছে। সে এত কম বললে নিজের জাতির প্রতি বেইমানী করবে। সে গলা সাফ করে বলল, উত্তর প্রদেশের খালিকুজ্জমান সাহেবের কী অনুনয় বিনয়, আমাদের সরকার পরিচালনায় সামান্য স্থান দিন। কে কার কথা শোনে। বল্লভভাই প্যাটেল সব অনুনয় যমুনার জলে ভাসিয়ে দিলেন! সে এবার ঘড়ি দেখল। পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে সময় দেখে বলল, আমার পরবর্তী বক্তা আছেন। তাঁরাও তাঁদের বক্তব্য রাখবেন, আপনাদের কাছে। কেবল মেহেরবানী করে আপনারা যাবার আগে মোতাহার সাহেবের কাছ থেকে একটা করে বই নিয়ে যাবেন। তারপর সাঁজে যখন আজান শুনতে পাবেন, কুপির আলোতে পড়বেন এই রিপোর্ট। মুসলিম নিপীড়নের খুঁটিনাটি তথ্য পড়লে আপনাদের খুন টগবগ করে ফুটবে। সে বড় সহজ ভঙ্গিতে কথাগুলি বলল এবং হাতটা মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিল।

আকালুদ্দিন বড় নিবিষ্ট মনে শুনছে এবং সামুর অবয়বে কী কী রেখা ফুটে উঠছে সে লক্ষ রাখছে। সেও এমনভাবে মুখের রেখার দ্বারা তার ক্রোধ উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা সকলের ভিতর ছড়িয়ে দেবে। শেষে সামু যেভাবে কথা শেষ করে হাত ঘুরিয়ে এনেছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে, সেও অন্যমনস্কভাবে নকল করতে গিয়ে কেমন সকলের কাছে ধরা পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ হতেই সহসা হেঁকে উঠল, আল্লা-হু-আকবর।

জনাব আলি সাহেব বললেন, দেশটা ইংরেজরা আমাদের হাত থেকে নিয়েছিল। আশা করব যাবার সময় ইংরেজ শাসনভার আমাদের হাতে দিয়ে যাবেন। গোলামের জাত দেশ শাসনের বোঝে কি!

সবাই হাততালি দিচ্ছে একসঙ্গে।

বড় মজার কথা বলেছেন সাহেব। ওরা খুব খুশি এমন কথায়।

বিকেলবেলা আকালু মসজিদের নিচু জমিটাতে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। এক এক করে এবার বিদায় নিচ্ছে সবাই। গয়না নৌকায় আজই সামুভাই নারায়ণগঞ্জে যাবে। কাল ঢাকা চলে যাবে। সে একটু সুবিধা মতো সামসুদ্দিনকে একা পাবার ইচ্ছাতে আছে। আলি সাহেব দু'দিন থাকবেন মৌলানাসাবের বাড়িতে। এখন সবাই চলে গেলে কেবল থাকে সামুভাই। সামুর অঞ্চল এটা। সে-ই সবাইকে বিদায় দিচ্ছে। বিদায় দিয়ে সামু এদিকে উঠে আসছে। দু'জন লোক পিছনে। ওরা সামসুদ্দিনকে শামিয়ানার নিচে পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এ-ই সময়। সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলল, দ্যাশে যখন আইলেন, বাড়ি একবার ঘুইরা যাইবেন না?

—সময় খুব কম। কাইল আবার বন্দরে সভা আছে।

আকালু এবার সামুকে চুপি চুপি বলল, ছোট ঠাকুরকে ধইরা নিয়া গ্যাছে।

কেমন বিস্ময়ের গলায় বলল, ছোটকর্তারে!

—হা ছোটকর্তারে।

—কবে?

—আইজ। আইছিল ধরতে রঞ্জিতরে। পাইল না। ধইরা নিয়া গেল ছোটকর্তারে।

—রঞ্জিত কই গ্যাছে?

—রঞ্জিত মালতীরে নিয়া পালাইছে।

সামসুদ্দিনের মুখটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সে আর কিছু বলতে পারল না।

আকালু কত কাজের, লীগের জন্য সে কতটা জীবন পাত করেছে এমন দেখানোর জন্য বলল, দিলাম খবর থানায়। কইলাম, একজন রাজনৈতিক কর্মী আত্মগোপন কইরা আছে।

—তর কী দরকার ছিল আকালু। তুই এমন করতে গেলি ক্যান?

—কাফের যত বিনষ্ট হয় তত ভাল না?

—না।

এমন চোখমুখ দেখবে সামসুদ্দিনের, সে আশাই করতে পারেনি। সামু আবার চুপ হয়ে গেল। শামিয়ানার নিচে হ্যাজাকের আলো। সে এক দরগার যুবক, অথবা এক ফকির যায়, তার হাতে লণ্ঠন, কত দূর যে সে এভাবে যাবে কেউ যেন বলতে পারে না। সামু শেষে বলল, আর কিছু কইবি?

সে কেমন থতমত খেয়ে গেল। সে আরও যা বলবে ভেবেছিল সামসুদ্দিনের মুখ দেখে সেসব ভুলে গেল।

পীরের মাজারে জোটন তখন সব করবী ফুল পরিষ্কার করছে। সে সাঁঝ লাগলেই মোমবাতি জ্বালায়। এবং মাজারের ওপর গত সন্ধ্যা থেকে যেসব ফুল ঝরে পড়েছে সেসব ফেলে দিচ্ছে। তকতকে মাজার। চারপাশে সবুজ ঘাস। নিচে ফকিরসাব শুয়ে আছেন। আর উপরে এই করবী ফুলের গাছ। নিশিদিন ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার ঘরটার দিকে উঠে যাবে এবার। এখনও ভালো করে অন্ধকার হয়নি। কিসের শব্দে সে শরবনের দিকে তাকাতেই দেখল, বাতাসে শরবন কাঁপছে। এবং শরবন ফাঁক করে কেউ এদিকে উঠে আসছে।

এই অসময়ে মানুষ! এক মিঞা মানুষ। কিন্তু একি! পিছনে বোরখা পরে এক বিবি। এমন একটা অঞ্চলে এক মিঞা বিবি! সে কেমন বিস্মিত চোখে মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে

ব্যাপারটা দেখছে।

রঞ্জিত কাছে গেলেও জোটন কোনও কথা বলতে পারল না। অপরিচিত মানুষজন আসে, সকালের দিকে আসে, পীরের মাজারে বাতাসা অথবা ফুল দিয়ে যায় কেউ। কেউ আসে জড়ি বুটি নিতে। সন্তান-সন্ততি না হলে কেউ আসে। আর আসে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগলে। কেউ তার গাছের প্রথম লাউ, কুমড়ো মাজারে দিতে আসে। ফকিরসাবের সব জড়িবুটির গুণাগুণ জোটন জেনে নিয়েছে। এই করেই জোটনের সংসার। সেও ক্রমে এই অঞ্চলের পীরানি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা বিবর্জিত জায়গায় থাকলেই সে আর মানুষ থাকতে পারে না, জীন পরী হয়ে যেতে পারে অথবা পীর পয়গম্বর। ফলে জোটনের কিছু জমি হয়েছে। কেউ ফসল দিয়ে যায়। কেউ মুরগি দিয়ে যায়। মুরগি বেচে, ফসল বেচে তেল নুন নিয়ে আসে তিন ক্রোশ দূর থেকে। এক হাট আছে। হাটবারে এই দরগা ভেঙে মাইলখানেক হেঁটে গেলে হাটের পথ, হাটের মানুষেরা সে পথে যায়। যারা যায় তাদের হাতে সে মুরগি দিয়ে দেয়, ফসল দিয়ে দেয়। ওরা এসব বিক্রি করে তেল নুন ডাল এসব দিয়ে যায়। আজ হাটবার নয়। সে কাউকে মুরগি দেয়নি যে, বেচে তাকে তেল নুন দিয়ে যাবে। এই সূর্যাস্তের সময় কেউ এমন নেই এ অঞ্চলে বিবি নিয়ে এখানে চলে আসে! সুতরাং জোটন কী যে বলবে এই অপরিচিত মিঞাসাবকে বুঝতে পারল না। কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

রঞ্জিত দাড়ি-গোঁফ তুলে বলল, আমাকে চিনতে পারছিস না জোটন!

চিনতে পারছে না জোটন। যে মানুষ খুদকুঁড়া পেলেই কী খুশি, সে যে এখন পীরানি তা রঞ্জিত জানবে কী করে! কেবল জোটন বুঝতে পারল, এই মানুষ এসেছে তার বাপের দেশ থেকে। নতুবা তার নাম ধরে কে ডাকতে সাহস পাবে। বোরখার নিচে বিবি মুখ লুকিয়ে রেখেছে। বয়সে কত ছোট এই মানুষ, তার হাঁটুর সমান বয়সী! সে বলল, কোন গাঁ তোমার?

—আমি রঞ্জিত। গ্রাম রাইনাদী।

—আপনে রঞ্জিত ঠাকুর! অমা, এডা কি কয় তাইন! বোরখার নিচে কারে আনছেন? আপনে কত বড় হইয়া গ্যাছেন।

—মালতীরে।

—আরে এডা কি কন! মালতীরে! কই দ্যাখি।

মালতী বোরখা খুলে ফেলল।

জোটন মালতীর মুখচোখ দেখে ভয় পেয়ে গেল। কী শীর্ণ চেহারা! চোখ কোটরাগত। কঙ্কালসার। কী যুবতী কী হয়ে গেছে! জোটন বলল, ভিতরে আয় মালতী। কর্তা, আসেন।

রঞ্জিত কি বলতে গেলে জোটন বাধা দিল। বলল, ব্যাখ্যা লাগব না। পীরের থানে যখন আইসা পড়ছেন আর ডর নাই।

এই জোটন, নিবাসী এই বনে, এবং বনের ভিতর এক রহস্য আছে। সেই রহস্যে সে ডুবে গেছে। এই দরগার ঝোপ-জঙ্গল, কড়ুই গাছ, রসুন গোটার গাছ ফেলে সে আর এখন কোথাও যেতে চায় না। বনবাদাড়ে অন্ধকারে একটা করবী গাছের নিচে কবরের পাশে বসে থাকলে মনেই হয় না মাটি কার? মাটি হিন্দু না মুসলমানের? সে এতদিন পর দু'জন বাপের দেশের মানুষ দেখে খুশিতে ঝলমল করে উঠল, বলল, অ পীরসাহেব, দ্যাখেন আপনার দরগায় কেডা আইছে! বলে সে দুই অতিথি নিয়ে হাঁটতে থাকল।

সেদিনই শশীমাস্টার খবর নিয়ে গেলেন মুড়াপাড়া। শচীন্দ্রনাথকে সন্তোষ দারোগা ধরে নিয়ে গেছে। কিছু খোঁজখবর পেতে চায় রঞ্জিত সম্পর্কে। কিছু কিছু রাজনৈতিক কর্মী এখানে ওখানে ধরা পড়ছে। জেলে নিয়ে যাচ্ছে। শচীন্দ্রনাথ, উমানাথ সেনের মতো বড় কর্মী নয়। সাধারণ সদস্য সে। সে যতটা না কর্মী তার চয়ে বেশী সৎ এবং সাহসী মানুষ। এই অসময়ে ওকে ধরে নেবার অর্থ হয় না। একমাত্র অর্থ থাকতে পারে সব কংগ্রেস কর্মীদের যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন ফাঁক বুঝে শচীন্দ্রনাথকে একটু ঘুরিয়ে আনা। ওরা শচীন্দ্রনাথকে আগামী কাল নারায়ণগঞ্জে চালান করে দেবে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ যদি শহরে-গঞ্জে গিয়ে উকিল ধরে জামিনে খালাস করে আনতে পারেন—এমন উদ্দেশ্য নিয়ে শশীমাস্টার মুড়াপাড়া রওনা হয়ে গেলেন।

ছোটকাকা বাড়ি না থাকায় বাড়িটা খালি লাগছে। মাস্টারমশাই দুপুরে রওনা হয়ে গেলেন। এখন একমাত্র বাড়িতে পুরুষ বলতে ঈশম আর পাগল জ্যাঠামশাই। ঠাকুর পূজা কে করবে? জ্যেঠিমা বড়দাকে পশ্চিমপাড়া যেতে বলেছে। সেখানে আর এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার আছে। গোলক চক্রবর্তী খবর পেয়েই চলে এসেছে। ঠাকুমা পূজার আয়োজন করে দিয়েছেন। শ্বেত চন্দন রক্ত চন্দন বেটে এবং কোষাকুষি ঠিক করে, ফুল ফল সাজিয়ে তিনি বসে আছেন। সোনা ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে রয়েছে। ছোটকাকা বাড়ি নেই। কাজকর্ম দেখেশুনে করতে হবে। সে, ঠাকুমা কি আনতে বলবেন, কখন কি আদেশ করবেন, সেজন্য বসে রয়েছে। ঠাকুমা আয়োজন করার সময় সারাক্ষণ স্তব পড়ছিলেন। এই মন্ত্রপাঠ সোনাকে মাঝে মাঝে বড় বেশি মুগ্ধ করে রাখে। জ্যেঠিমা আজ রান্নাঘরে।

মার শরীর ভালো যাচ্ছে না। ক'দিন থেকে শুয়ে আছে কেবল। এবং ছোটকাকাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই কি যেন এক বিষণ্ণতা সারা পরিবারে ছড়িয়ে আছে।

ঈশম গরুগুলি গোপাটে দিয়ে এসেছে। সে জমিতে তরমুজের লতা লাগিয়ে দিয়েছে। হেমন্ত পার হলে শীতকাল আসবে, শীত পার হলেই বসন্ত। বসন্তে সেই বড় বড় তরমুজ। খর রোদ, কাঠফাটা রোদে তরমুজের রস। এখন থেকে লতার যত্ন না নিলে গাছ বড় হবে না, লতা বাড়বে না। সে গাছ, লতা এবং মূলের প্রতি যত্ন নেবার জন্য মাথায় করে একটা ছই—যেমন নৌকায় ছই দেয়া থাকে, তেমনি সেই ছই চরের বুকে নিয়ে ফেলবে। কারণ বর্ষার আগে সে ছইটা তুলে এনেছিল ডাঙাতে, এখন জল নেমে গেছে চর থেকে, সে চরের বুকে আবার মাথায় করে ছই নিয়ে যাচ্ছে। ছোটকর্তা বাড়ি নেই বলে ঈশম বড় বেশি লক্ষ রেখে কাজকর্ম করছে। সোনা দেখল ছই মাথায় ঈশমদাদা নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। কত যে কাজ সংসারে। সারাক্ষণ মানুষটা কোন-না-কোন কাজের ভিতর ডুবে থাকে। ছোটকাকা বাড়ি নেই বলে তার যেন আরও বেশি কাজ। সে আর সোনাকে দেখা হলেও কথা বলছে না। এ-বছর মামাবাড়ি যাবে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই মামাবাড়ি যাবার কথা। কবে যাবে, সেও জানে ঈশম। সেই খবর আনবে, ফাউসার খাল থেকে জল নেমে গেছে কি-না। জল না নামলে ধনবৌ বাপের বাড়ি যেতে পারে না। বৌ-মানুষ খালের জল ভাঙে কী করে। এখানে বেহারা যারা আসে বিহার অথবা পূর্ণিয়া থেকে তারা আসেনি। ওরা আসবে পৌষে। ঈশমই খবর নিয়ে আসবে ওরা দক্ষিণপাড়াতে এসেছে কি-না। কিন্তু এবার খবর নিয়ে এলেও ওরা যেতে পারছে না। ছোটকাকা বাড়ি নেই। তিনি বাড়ি না থাকলে যাবার অনুমতি কে দেবে! সোনা কী ভেবে ছুটে গেল পুকুর পাড়ে।

সে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই ফ্লুট বাজনা, অমলা-কমলার মুখ মনে পড়লে এই অর্জুনগাছটার নিচে এসে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে ভিটাজমি ফসলবিহীন। ফতিমা চলে গেছে ঢাকায়। ফতিমা বাড়ি থাকলে ওকে দেখতে পেত। দেখতে পেলেই চলে আসত চুপি চুপি। একা একা সে নানারকম গাছপালার ভিতর দিয়ে পালিয়ে চলে আসত। চলে এলেই মনের ভিতর সেই রহস্যটা জেগে যেত। অমলা রহস্যের স্পর্শ দিয়ে সহসা উধাও। কমলা কী করছে এখন! কলকাতায় বড় বাড়ি, কি প্রাচুর্য—এসব মনে হলেই ওর রাতের কথা মনে হয়, লুকোচুরি খেলার কথা মনে হয়, ছাদের কথা মনে হয়। আর মনে হয় এমন যে মাঠ সামনে পড়ে আছে—অমলা-কমলা যদি একবার এ-দেশে আসত! সে তাকে নিয়ে যেত নদীর চরে।

সামনের মাঠে তার নেমে যেতে ইচ্ছা এখন। কারণ মার শরীর ভালো না। ওর কেন জানি কিছু ভালো লাগছে না। অথচ এই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালেই তার মনের ভিতর অদ্ভুত একটা আশা জাগে। কেউ যেন কোথাও ওর মতো বড় হচ্ছে। কোথাও কেউ ওর মতো ছুটছে। এবং নিত্যদিনের এই যে গাছপালা, সবাই তাকে ভালোবাসছে। সোনার এভাবে এক মায়া বেড়ে যাচ্ছে। মায়ায় মায়ায় সে গাছপালার ভিতর বড় হয়ে গেলে তাকে

কোন নদীর পাড়ে চলে যেতে হবে বুঝি। যেমন বাবা আছেন দূর দেশে। ন'মাসে ছ'মাসে আসেন। মা কেমন অসহায় চোখ তুলে তাকে আজ দেখছিল সারাদিন! সে যে কী করবে!

তখন দেখল হন-হন করে কে মাঠ ভেঙে এদিকে আসছে। কাছে আসতেই বুঝল সেই পোস্টম্যান মানুষটি। সে এ-গাঁয়ে আসে। রোজ আসে না। সপ্তায় একদিন। সবুজ রঙের থলে থেকে বাড়ি বাড়ি চিঠি দিয়ে যায়। বাবার চিঠি, জ্যাঠামশাইর চিঠি। কখনও কখনও মামাবাড়ি থেকে চিঠি আসে। সে চিঠি পাবে বলে ছুটে গেল গোপাটে। বলল, চিঠি আছে? চিঠি?

বলল সে, আছে।

তারপর একটা চিঠি। নীল খামে চিঠি। সে বলল, কার চিঠি? কারণ সে বিশ্বাস করতে পারছিল না এ-চিঠি তার। নীল খামে সুন্দর হস্তাক্ষরে কে লিখেছে, অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। কেয়ার অফ শ্রী শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক। তার নামে চিঠি! তার নামে চিঠি কে দিল! মানুষটি বলল, অতীশ দীপঙ্কর কার নাম?

—আমার। যেন অপরাধ করে ফেলেছে সোনা। সে যে কী করে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেবে বুঝতে পারছে না। তার নামে চিঠি। ছোটকাকা এসে শুনলে কী ভাববে! মা জ্যেঠিমা কী ভাববে! অমলা যদি চিঠিতে সেই কথা লিখে থাকে! ওর বুকটা কেমন কেঁপে উঠল।

তখন কবরভূমিতে জোটনের ভিতরটাও কেঁপে উঠল। সে বলল, কর্তা, কী কইলেন?

—যা বললাম জোটন তা সত্যি। তুই মালতীর মুখ দেখলেই টের পাবি। মালতীকে জব্বর জননী বানিয়ে গেছে।

জোটন আর কোনও কথা বলতে পারল না। তার মুখ ভীষণ কাতর দেখাচ্ছে। মালতী কাছে নেই। বোধহয় ফকিরসাহেবের কবরের পাশে সেই করবী ফুল গাছটার নিচে বসে রয়েছে। রঞ্জিত সামনে, একটা হোগলার আসনে বসে রয়েছে। ওর মাথার ওপর ডেফল গাছের ছায়া। গাছে ফল নেই। পাতা ঝরে যাচ্ছে। গাছটা নেড়া নেড়া। সূর্য মাঠের ওপাশে অস্ত যাচ্ছে। জোটন সব নিয়তি ভেবে বলল, তা'হলে কি করবেন এখন?

—তাই ভাবছি, নরেন দাসের কাছে রেখে আসতে সাহস পেলাম না। হিন্দু বাড়ি, বিধবা যুবতীর পেটে জারজ সন্তান, সন্তানের বাপ যে কে, সুতরাং বুঝতেই পারছিস মালতীর অবস্থা! একবার কলসী বেঁধে ডুবে মরতে গেল, আমরা তাকে মরতে দিলাম না। সে আবার মরতে যাবে, তুই তো দেখেছিস ওদের বাড়ির নিচে বড় গাবগাছটা, সারাটা দিন মালতী সেখানে বসে থাকত। বিড়বিড় করে বকত।

ওরা দু'জনই আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকল। রঞ্জিতের মুখে এখন দাড়ি গোঁফ নেই বলে এই সমস্যায় সে কতটা চিন্তিত বোঝা যায়। জোটন বুঝতে পারল, মানুষটি মালতীকে বড় ভালোবাসে। সেই শৈশবে সে দেখেছে মালতী এই মানুষের সঙ্গে কতদিন দালানবাড়ি

থেকে স্থলপদ্ম চুরি করে এনেছে। কতদিন নৌকায় ঘোর বর্ষার মাঠে ছিপ দিয়ে দু'জনে মাছ ধরেছে। গ্রীষ্মের দিনে ঝড়ের বিকেলে এই দুইজন আর সঙ্গে থাকত সামু তিনজন মিলে বাগের পিছনে বড় সিন্দুরে গাছের আম কুড়াত। এই দু'জন আবাল্য এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, তারপর এই বড়মানুষের শ্যালকটি নিরুদ্দেশে চলে গিয়েছিল। এবং কবে ফিরে এসেছে সে তা জানে না। এখন মালতীর দুর্দিনে সে আবার ফিরে এসেছে। সেই যে কবে একবার ফকিরসাব ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন, সে না খেয়ে ফকিরসাবকে সব ক'টা ভাত খাইয়েছিল, কী যে তখন প্রাণের আবেগ, এই এক আবেগ সে এখন রঞ্জিতের মুখে ধরতে পারছে। সে দেখেছিল সেদিন বিধবা মালতী চুপচাপ ঘাটে তার হাঁসগুলি ছেড়ে দিয়েছে। এবং হাঁসের কেলি অথবা বলা যায় যৌনলীলা সে ঘাটে বসে চুপচাপ চুরি করে দেখেছে। ওর কেবল মনে হয়েছিল—হায় খোদা, এমন যুবতী শরীর বিফলে যায়। আল্লার মাশুল তুলছে না মালতী। বড় কষ্ট হয়েছিল তার। সে আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। সেই মালতী আবার এমনভাবে উঠে এল—কী বলবে এখন, কী করবে এখন, জোটন বুঝতে পারছে না।

লোকালয়-বর্জিত এই এক কবরভূমি। মানুষজন দেখাই যায় না। দূরে হোগলার বন পার হলে অথবা শরবনের পর যে মাঠ, মাঠে কিছু গরু-বাছুর দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট এবং অস্পষ্ট ছায়ার মতো গরু-বাছুর। এটা টিলার মতো জায়গা বলে অনেক দূর দেখা যায়। এবং মনে হয় জোটন তার নিবাস দেখে-শুনেই সবচেয়ে উঁচু ভূমিতে তৈরি করেছে এবং খুব দূরে দু'একজন চাষী মানুষ দেখা যাচ্ছে অথবা এই যে অঞ্চল, অঞ্চলের চারপাশে শুধু বেনা ঘাস, হোগলার বন শরের জঙ্গল সব পার হয়ে মানুষের আসা খুব কঠিন। অগম্য স্থান। এমন একটা অঞ্চলে জোটন থাকে। রঞ্জিত শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ঢুকে গেছে। সুতরাং আর কোনও ভয় নেই। মুখে-চোখে সেই নিশ্চিন্ত ভাবটাও কাজ করছে রঞ্জিতের। জুটির এখন আর সেই খেটে-খাওয়া চেহারা নেই। পীরের নিবাসে বাস করে ওর মুখে-চোখেও কেমন পীরানি-পীরানি ভাব। সে শরীরটা ডেফল গাছের গুঁড়িতে এলিয়ে দিল। সে যে এসব বলছে, মালতী শুনতে পাচ্ছে কি-না আবার এই ভেবে চারদিকে তাকাতেই দেখল মালতী দূরে কবরের নিচে করবী গাছের ফুল তুলছে কোঁচড়ে।

জোটন আবার কথা আরম্ভ করল। —পানি আইনা দেই। গোসল করেন। ছাগলের দুধ আছে আতপ চাউল আছে, সীম আছে। সিদ্ধ ভাত খান। মালতীরে খাইতে দ্যান। পরে ভাইবা যা হয় কিছু ঠিক করতে হইব।

জোটন এবার কবরের কাছে গেল। রঞ্জিত পিছনে-পিছনে হাঁটছে। একটা লাউ এর টাল, সেটা অতিক্রম করে যেতে হয়। ওরা দু'জনই টালের নিচে গুঁড়ি মেরে ওপারে উঠে গেল। জোটনের শীত-শীত করছে। সে ওর কাপড় দিয়ে শরীর ভালো করে ঢেকে নিল। ওরা দেখল কবরের ওপারে দু'পা ছড়িয়ে এখন মালতী বসে রয়েছে। কোঁচড়ে করবী ফুল। ফুলগাছগুলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেবল কী খুঁজছে যেন। বুঝি সে তার যা হারিয়েছে তা ফিরে পেতে পারে কি-না, ফুলের ভিতর হাত রেখে তার অনুসন্ধান। এখানে উঠে এসেই

তার ফের মনে পড়ছে পেটের ভিতর এক বৃশ্চিক বাড়ে দিনে-দিনে। লেজে হুল, মুখে কাঁটা, দু'পায়ে সাঁড়াশি। মাঝেমাঝে এটা ওর চোখের সামনে খুব বড় হয়ে যায়। যেন সেই নির্জন মাঠের উপর দিয়ে অতিকায় এক বৃশ্চিক যার পা যোজন প্রমাণ, যার হুল আকাশে উঠে গেছে, প্রায় হাতির শামিল এক জীব ওকে দলে-পিষে মেরে ফেলার জন্য ছুটে আসছে। অথবা সাঁড়াশি দিয়ে গলা টিপে মারবে। সে তখনই হাঁসফাঁস করতে থাকে। সে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে—না-না-না। যেন সেই হুল ভিতরে বারেবারে দংশন করছে। আতঙ্কে সে শিউরে উঠছে। তার লাবণ্য আর নেই। সেও মরে যাচ্ছে বুঝি। আগামী শীতে এভাবে বাঁচলে সে মরে যাবে।

জোটনের চোখ ফেটে জল আসছিল। কী সুন্দর মুখ কী হয়ে গেছে! জোটন যতটা পারল কাছে গিয়ে বসল, ওঠ মালতী।

রঞ্জিত দেখল জোটনের কথায় মালতী উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং জোটনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। সেও হাঁটছিল। কোনও কথা নেই। পায়ের নিচে ঘাস এবং শুকনো পাতা। ওরা আবার লাউ গাছের টাল অতিক্রম করে এল। ডেফল গাছটা পার হলেই জোটনের চটি। চটির ভিতর ঢুকলে জোটন বলল, হাত পা পানিতে ধুইয়া নে। কর্তা দুধ গরম কইরা দ্যাউক, তুই খা। খাইলে শরীরটা ভালো লাগব।

জোটন ছাগল দুয়ে দিল। নতুন মাটির হাঁড়িতে দুধ। সে তিনটে কচার ডাল কেটে আনল। তিনটে ডাল খোঁটার মতো পুঁতে ওপরে দুধের হাঁড়ি রেখে সে বলল রঞ্জিতকে, ইবারে আগুনডা জ্বালেন।

শুকনো ঘাস পাতা এনে দিয়েছে জোটন। এত বড় বনে জ্বালানির অভাব নেই। সে ঘর থেকে টিন বের করেছে। চিড়া বের করে দিয়েছে হাঁড়িতে। মালতীকে জল আনতে বলেছে কুয়ো থেকে। সব কিছু বের করে দেবার সময় জোটনের কত কথা—এত-এত খাইছি ঠাকুরবাড়ি। ধনমামী বড়মামী কি না খাওয়াইছে। ঠানইদি ভাল যা কিছু হইছে আমারে না দিয়া খায় নাই। অর্থাৎ এসব বলে জোটন পুরানো দিনের স্মৃতি স্মরণ করছে। সে কী করতে পারে তার মেমানদের জন্য! এই মেমান এসেছে ঠাকুরবাড়ি থেকে। ঠাকুরবাড়িতে সে অভাবে অনটনে খেয়ে বড় হয়েছে। খুদকুঁড়া যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, বড়মামী জোটনকে ডেকে দিয়ে দিত। সে যে একটু ওদের আদর আপ্যায়ন করতে পারছে, সে যেন সবই আল্লার মেহেরবানি।

ওরা জোটনের অতিথি। জোটন এখন দু-চার-দশজনকে ইচ্ছা কবলে দু'দশ মাস ধরে খাওয়াতে পারে। যখন মেলা হয়েছিল, মানুষজন এসেছিল কত। দোকানপসরা, লাল-নীল বেলুন, তালপাতার বাঁশি, পীরের মাজারে কত পয়সা, বাতাসার থালায় কত চৌআনি, টাকা। সে সবই পীরানির প্রাপ্য। সে এভাবে দু'বিঘা ধানের ভুঁই—কারণ মোড়লের বেটা হয়নি, পীরের মাজারে মানত করে বেটা হয়েছে, সে দুই বিঘা ভুঁই লিখে দিয়ে গেছে জোটনকে। সকালের দিকে কেউ-কেউ আসে, ব্যারামি নাচারি মানুষকে তারা ধরাধরি করে

তুলে নিয়ে আসে। জড়িবুটি যা কিছু ছিল ফকিরসাবের, সে অসুখে-বিসুখে সে-সব ব্যবহার করে। কেউ এলেই দরগার অনেক নিচে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, পীরের দরগায় মানুষ উইঠা যায়। হাঁক পেলেই জোটন তাড়াতাড়ি চটিতে উঠে যায়—কারণ জোটনের কাছে এই বন উদাসী এক জগৎ। ওর চোখে-মুখে পীরানি পীরানি ভাব। বনের দিকে তাকালে মনে হয় আল্লা কিছুই দিয়ে পাঠায়নি কাউকে। শরীরের বসন-ভূষণ অধিক মনে হয়। লজ্জা নিবারণের কী আছে এত বড় বনে! বনের ভিতর একা-একা জ্যোৎস্নায় তার হিন্দুদের দেবীর মতো হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছা হয়। সে শরীরে বাস রাখে না। খালি অঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায় বনে, মানুষ দরগায় উঠে এলেই বেনা ঘাসের অন্তরালে উঁকি দেয়। তারপর হাঁকে—মানুষ উইঠা যায়। কেয়ামতের দিন কবে জানতে চায়। কে জাগে দরগায়?

পীরানি তাড়াতাড়ি তখন জোটন হয়ে যায়। বসন-ভূষণ পরে গলায় মালাতাবিজ পরে সে তাড়াতাড়ি পীর সাহেবের ছইটার নিচে গিয়ে বসে থাকে। তারপর হাঁকে, পীরানি জাগে। তখন মানুষটা দরগায় উঠে আসতে সাহস পায়। নতুবা সে যতক্ষণ হাঁক না দেবে, পীরানি জাগে—ততক্ষণ সেই জড়িবুটির জন্য যারা আসবে ঘাসের অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করবে। কখন বনের ভিতর থেকে ডাকটা ভেসে আসবে—পীরানি জাগে। পীর মুর্শিদ নিয়ে রঙ্গরস করা যায় না, চুরি করে তাদের লীলাখেলা দেখা পাপ। সুতরাং সোজাসুজি কেউ দরগায় উঠে আসতে সাহস পায় না। কেবল বছরের যেদিন অষ্টমী তিথিতে মেলা বসবে সেদিন হাঁক দেবার নিয়ম নেই। সোজা তুমি দরগায় উঠে আসবে—এমন একটা নিয়ম এ ক'মাসই চালু হয়ে গেছে।

জোটন মনে মনে বড় প্রসন্ন। কতদিন পর দরগায় বাপের দেশ থেকে মেমান এসেছে। মালতী যে গর্ভবতী এবং রঞ্জিত যে পলাতক—ওরা দু'জন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে—সে-সব ভুলে কোথায় কি পাওয়া যাবে এখন, যেমন সীমের মাচানে সীম, লাউয়ের মাচানে লাউ সে তলে বেড়াচ্ছে। অতিথিদের রাতের খাবার ব্যবস্থা করছে। সে মালতীকে ডাকল, আয়, দেইখা যা। সে তার নিজের হাতে লাগানো সীমের মাচান, লাউয়ের মাচান এবং পুঁই মাচায় হলুদ রঙের উচ্ছে ফুল দেখাল। সে যে এখন পীরানি, তার নসিব পাল্টে গেছে এবং বড় মায়ায় চারদিকে সে তপোবনের মতো এক দরগা গড়ে তুলছে, সে-সবও দেখাল মালতীকে।

আজকাল রাত হলে আর ভয় থাকে না জোটনের। কবর দিতে আসে যারা তারা পর্যন্ত পীরের দরগায় কিছু দিয়ে যায়। অথবা মোমবাতি জ্বালাতে আসে কেউ। সে তখন রসুনগোটার তেলে প্রদীপ জ্বেলে, গলায় মালা-তাবিজ পরে এবং মুশকিলাসানের লম্ফ জ্বালিয়ে অন্ধকারে চোখ রক্তবর্ণ করে বসে থাকে। মানুষের এক ভয়, মৃত্যুভয়। যম-দুয়ারে দিয়া কাঁটা আমার ভাইয়েরে দিলাম ফোঁটা। জোটন যেন ভাইফোঁটার মতো বিড় বিড় করে কী বলে তখন। মানুষেরা অনেক দূরে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে। মানুষেরা তার কাছে পর্যন্ত আসতে সাহস পায় না তখন।

জোটন বলল, তর কোন অসুবিধা হইব না মালতী। ল, তুই সান করবি।

রঞ্জিত মালতীকে দুধ গরম করে খেতে দিল। দুধটা খেয়ে মালতী স্নানের জন্য বসে থাকল। ছাগলটা আনতে গেছে জোটন। সে ছাগলগুলি বেঁধে রাখল ডেফল গাছে। বলল, ল যাই। সান করলে শরীর ঠাণ্ডা হইব।

জোটনের আছে বলতে এক ছই। আর চটিতে আছে দুটো ঘর। ভাঙা ইটের পাঁচিল। সে ঘর দুটোর একটাতে ছাগল-গরু এ সব রাখবে বলে করেছে। অন্য ঘরটা করেছে মেলার সময় তার বাপের দেশ থেকে কেউ এলে থাকবে। তার সারাটা দিন বনে বনে কেটে যায়। কখনও সে ছইয়ের নিচে বসে নামাজ পড়ে। অথবা মালা-তাবিজের ভিতর পা মুড়ে কেমন মাথা নিচু করে বসে থাকে। ঘর দুটো তার বাবহারের দরকার হয় না।

যেটাতে এলে বাপের দেশের মানুষ থাকার কথা সে-ঘরে এখন চুপচাপ রঞ্জিত একটা কাঠের জলচৌকিতে বসে রয়েছে। জোটন মালতীকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে। দরগায় থাকে বলে কেমন বন্য স্বভাব জোটনের। রঞ্জিত এসেই যেন সেটা টের পেয়ে গেছে। জোটন রাতে ছইয়ের ভিতর থাকে এবং বাইরে রসুনগোটার গাছে মুশকিলাসানের লম্ফটা সারারাত জ্বললে সে নির্ভয়ে ঘুম যেতে পারে।

জোটন কবর পার হয়ে এসেই কেন জানি মালতীকে একটু থামতে বলে আবার ডেফল গাছটার নিচে চলে গেল। বলল, কর্তা, মালতীর কাপড়টা ঘাটের সিঁড়িতে রাইখা আসেন।

রঞ্জিত মালতীর পোঁটলা থেকে সাদা এক থান বের করল। জোটন ওদের কিছুই ধরছে না। হিন্দুর ধর্মাধর্ম এই। অন্য জাতি ছুঁলে জাত বাঁচে না। সে ছুঁয়ে দিলে মালতী সারারাত না খেয়ে থাকবে। এমন কী সে যে সীম, বরবটি, লাউ এবং দুটো পেঁপে পেড়েছে—সব একসঙ্গে আলাদা রেখে দিয়েছে। জোটন রান্না করার জায়গাটা গোবর দিয়ে লেপে দিয়েছে। গোবরে লেপে দিলেই সব পবিত্র হয়ে যায়। চারপাশটা গোবর ছড়া দিয়ে জায়গাটাকে একজন হিন্দু বিধবা রমণীর উপযুক্ত করে তুলেছে। অথচ পেটে মালতীর জারজ সন্তান। গাছপালায় বাতাসের শনশন শব্দ। জোটন নিরামিষাশী। ফকিরসাবের মৃত্যুর পর মাছ-মাংস আহার করে না—যেন ফকিরসাবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মাছ মাংস বলতে যা কিছু সম্পর্ক বোঝায় তা ছেড়ে দিয়েছে। সে আর আল্লার মাশুল তুলছে না ভেবে বলে না, আমারে একটা পুরান-দুরান যা হয় ঠিক কইরা দ্যান। কিন্তু মালতীর এমন কাঁচা বয়স, রঞ্জিতের এমন সুন্দর মুখ, এক ঘরের এক বিছানায় ওদের বড় মানাবে।

মালতী তার মেমান। রঞ্জিতও। ওর দিদি ক্ষুধার দিনে কত যত্ন নিয়ে খাইয়েছে তাকে। সে-সব মনে পড়লে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে। সে রঞ্জিতকে বলল, সিঁড়িতে নিয়া রাইখা দ্যান। মালতী কাপড় ছোঁবে না। জোটন একটা গাছে বিচিত্র নীল রঙের ফুল দেখবার সময় মালতীকে ছুঁয়ে দিয়েছে। স্নান না করা পর্যন্ত মালতী পবিত্র হবে না। সে

মালতীকে বড় এক সরোবরে নিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে সব বড়-বড় ঝাউ গাছ। গাছের নিচে কত সব বিচিত্র ঘাস ফুল। কাঠবিড়াল গণ্ডায়-গণ্ডায়। সাদা রঙের ডাহুক। ডাহুকের ছানা।

রঞ্জিত হাতে কাপড় নিয়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে গেল! জোটন আগে, মালতী মাঝে এবং রঞ্জিত পিছনে। ওরা টিলা থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এই পথেই জোটন সারাদিন মরা ডাল, শুকনো পাতা, গাছের ফল কুড়িয়ে বেড়ায়—সে এই পথেই নেমে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের আলো পাতার ফাঁকে ওদের মুখে পড়েছে। চারপাশে সব গাছ, বড় গরান গাছ, গজারি গাছ, রসুনগোটার গাছ—নিচে তিন মানুষ, এবং ক্রমে শুধু নেমে যাওয়া। যেন জোটন এবং রঞ্জিত এক বন্দিনী বনদেবীকে খোলা মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। দূরের বিল থেকে হাঁস উড়ে আসে এ-সময়। কচ্ছপেরা উঠে আসে ডিম পাড়ার জন্য। এখানে সব জীবজন্তু, এমন কি কচ্ছপেরা জোটনকে ভয় পায় না। জোটন তাদের মতো জলে-জঙ্গলে থাকে বলে বনের জীব হয়ে গেছে। রঞ্জিত যেতে-যেতে দেখল দুটো কচ্ছপ খালের পাড়ে উঠে রোদ পোহাচ্ছে। রোদ পোহাচ্ছে কি ডিম পাড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। ওরা রঞ্জিত এবং মালতীকে দেখেই জলে নেমে গেল। জোটন একা থাকলে কচ্ছপেরা ভয় পেত না। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই কেমন ডেকে যাবার মতো বলে গেল, আমার মেমান। ডর নাই জীবেরা। তোমার কেউ অনিষ্ট করব না।

অদ্ভুত এক ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। আস্তানাসাবের দরগা এটা। মাঝে একটা জলটুঙি। সেখানে আস্তানাসাবের কবর। পাশে ফকিরসাবের দরগা। এক সময় আস্তানাসাবের দৌলতে এই সরোবর কাটা হয়েছিল এবং কথিত আছে, এই সরোবরের ঠিক মাঝখানে জলের উপর বসে আস্তানাসাব নামাজ পড়তেন, খড়ম পায়ে জল পার হয়ে যেতেন, মৃত্যুর আগে তিনি মন্ত্র-বলে জলটুঙি বানিয়ে গেলেন একটা। সেই জলে স্থলে তাকে সমাহিত করা হল। জোটন আস্তানাসাবের দরগায় ঢুকেই বলল, পীর সাহেব আপনের সরোবরে সান করাইতে আনছি মালতীরে। অরে মুক্ত কইরা দ্যান।

সিঁড়িতে নেমে রঞ্জিত মালতীর কাপড় রেখে দিল।

জোটন বলল, ডুব দেওয়নের সময় মনের বাসনা আস্তানাসাবের কাছে কইস।

মালতী ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে জলে নেমে গেল।

—তর যা বাসনা, তুই যদি সরোবরে ডুব দিয়া কস তবে বিফলে যাইব না।

জলে দাঁড়িয়ে মালতী কি ভাবছে! জলটা নাড়ছে। কি কাচের মতো স্বচ্ছ জল। দুটো একটা মাছ ওর পায়ের কাছে এসে ঘোরাফেরা করছে। সে জলের নিচে এই সব ছোট ছোট মৌরলা মাছ দেখে—জীবন এভাবে কতদিন আর, এমন ভাবছিল।

জোটন দেখল মালতী জলে ডুব দিচ্ছে না। সে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখল রঞ্জিত দাঁড়িয়ে আছে। জোটন কাছে এসে বলল, আপনে যান। মালতীর সান হইলে আমি নিয়া যামু।

রঞ্জিত হেঁটে হেঁটে চলে এল। এই কবরভূমিতেই জব্বর মালতীর পিছনে ছুটেছিল। আর সেই লোকগুলি। মালতী বলেছিল, সে তিন চারজনের মুখ এক সঙ্গে পায়ের কাছে ভোস উঠতে দেখেছিল। তিন চারজন মিলে সারারাত ওর ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। এই যে সন্তান জন্ম নিচ্ছে, সে কে। তার অবস্থা এখন কি। এ কোন দেবতার আশীর্বাদ। জন্ম নিলে তার পরিচয় কী হবে! জোটন কী এই অশুভ দেবতার হাত থেকে মালতীকে রক্ষা করতে পারবে না! সে তো পীরানি। জড়ি-বুটি আছে তার! সে কী বলবে জোটন এখন তুমি দ্যাখো কী করতে পার। একে তুমি রক্ষা কর।

তখন জলে ডুব দিল মালতী। যেন একটা মাছরাঙা পাখি জলের নিচে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল। কত বড় সরোবর। পাড়ে পাড়ে বিচিত্র সব গাছগালা। একটা অপরিচিত পাখি বার বার একই স্বরে ডেকে চলেছে। জোটন পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মালতী কেবল ডুব দিচ্ছে। জোটন বলল, উইঠা আয় মালতী। তর বাসনার কথা কইতে কিন্তু ভুইলা যাইস না।

জোটনের কথামত ডুব দিয়ে তার বাসনার কথা বলল। —আমারে আস্তানাসাহেব মুক্তি দ্যান। যেন বলার ইচ্ছা—আমাকে আগের মালতী, পবিত্র এবং সুখী মালতী করে দিন। আমি আবার নদীর পাড়ে পাড়ে হাঁটি।

মালতী স্নান করে উঠে এলেই বড় পবিত্র লাগছে চোখ-মুখ। জোটন বলল, কি কইলি?

ছলছল চোখে মালতী বলল, আমারে মুক্তি দিতে কইছি।

জোটন আর তাকাতে পারছে না মালতীর দিকে। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। বোধ হয় জোটন আর মালতীর সঙ্গে কথাও বলতে পারত না। যদি না মালতী হেসে বলত, জুটি, তর একলা ডর করে না?

—না!

মালতীর এই হাসি জোটনকে কেমন সাহসী করে তুলল। বলল, আমার লগে আয়। তর কোন ডর নাই।

—কত বড় বন! আগের বার চোখ খুইলা সব দ্যাখাতে পারি নাই।

—এই বনে ঢুইকা গ্যালে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না।

ওরা ফিরে এলে রঞ্জিত দেখল মালতী খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এমন কী মালতী ওকে স্নান করে নিতে বলছে। এতটা পথের কষ্ট, স্নান করলেই দূর হয়ে যাবে এমনও বলেছে। মালতী আবার যেন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে কতক্ষণ! এই বন, নির্জনতা, এবং জোটনের কাছে সাময়িক আশ্রয়, জোটনের অতিথিপরায়ণতা কিছুক্ষণের জন্য ওকে মুগ্ধ করে রেখেছে। পেটে যে একটা আজব জীব বাড়ছে এবং রক্তের অন্তরালে সে জীবটা, অতিকায় নৃশংস এক জীব, মুখ কেবল ব্যাদান করে আছে—সেই মুখ স্মৃতিতে ভাসলেই মালতী আবার অধার্মিক হয়ে যাবে। ভ্রূণ হত্যার জন্য সে নিজের শরীরের ভিতর অন্য একটা শরীর খুঁজে বেড়াবে।

শুধু এই এক ভয় রঞ্জিতের। সে এই যুবতীকে নিয়ে যায় কোথায়! কারণ, এই অঞ্চল থেকে তার সরে পড়ার একমাত্র পথ নারায়ণগঞ্জে উঠে যাওয়া। এবং সেখান থেকে রেল অথবা স্টিমারে দূর দেশে সরে পড়া। কিন্তু সে জানে তাকে ধরার জন্য জাল পাতা আছে শহরে-গঞ্জে। ওর সব বয়সের ছবি আছে পুলিশের ঘরে। সে একা থাকলে ভয় পেত না, কিন্তু এই যুবতী মেয়ে—পেটে হাত পড়লেই হিক্কা এবং বমির ভাব, চারদিকে তখন পাগলের মতো থুথু ছিটাতে থাকে।

রঞ্জিতের ইচ্ছা মালতীর সন্তান নাশের ব্যাপারে একটা পরামর্শ করে জুটির সঙ্গে। মালতী দলাদলা হিং খেয়েছে। আভারানী এনে খাইয়েছে। কিছুই হয়নি। মূল এবং গাছের শেকড়-বাকড় আছে, তা ব্যবহার করা হয়নি। আভারানী সাহস পায়নি এটা দু'কান করতে। নরেন দাস, যত বমি করছে মালতী তত ভালোমানুষ হয়ে যাচ্ছিল। এখন জুটিকে বলার সময় নয়। দু'চারদিন থাকার পর কথাটা সে তুলবে। আপাতত এই এক জোটন যে তাদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আছে। প্রায় সে আত্মসমর্পণের মতোই এসে উঠেছে। এবং জোটনের এই আশ্রমের মতো জায়গায় মালতীর যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়! সে নিজে কথাটা পাড়তে পারছে না। জোটন এই নিয়ে কথা তুললেই সব পরিষ্কার করে খুলে বলতে হবে। তুই কিছুদিন ওকে রাখ জোটন। অন্তত সন্তান প্রসবের দিন ক'টা পর্যন্ত। তারপর আমি ওর আস্তানা ঠিক করে নিয়ে যাব। আর তার আগে যদি গর্ভপাত হয়ে যায়, তবে তো কথাই নেই। আমি আর মালতী কোনদিকে চলে যাব। ঘর বাঁধব।

রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে জোটন বলল, এত ভাবছেন! বলে সে হা হা করে হাসল। বলে সে হাঁড়ি-পাতিল সব বের করে দিল। সবই নূতন। কিছু সাদা পাথর। মেলা থেকে সে কিনেছে। সাদা পাথর সে কোনটা কত দিয়ে কিনেছে, তা এক এক করে বলছে। রঞ্জিত বসে বসে দেখছে সব। ওর শৈশবের কথা মনে পড়ছে। এই জুটি কচ্ছপের ডিম পেলে, হিন্দু গ্রামে উঠে যেত। সে শাকপাতা, যেমন গীমাশাক এবং গন্ধপাদাল, বেতের নরম ডগা কেটে হিন্দু বাড়ি উঠে কচ্ছপের ডিম, শাকপাতা দিয়ে খুদকুঁড়া চেয়ে নিত। ধান ভেনে চিঁড়া কুটে তার আহার সংগ্রহ। ওর স্বামী তালাক দিলেই আবেদালির কাছে চলে আসা। আবেদালির কথা মনে হতেই রঞ্জিত বলল, আবেদালির নয়া বিবি এখন ওকে

ঠিকমতো খেতে দেয় না। যেন জোটন ইচ্ছা করলে এখন আবেদালিকে কাছে এনে রাখতে পারে।

জোটনের মুখ বড় কাতর দেখাল। সে এটা পারে না। সে পীরানি, পীরানির ভাব-ভালোবাসা থাকতেই নাই। সংসারে তার আপনজন থাকতে নাই। তার আপনজন সকলে।

—এই যে আমরা আইলাম।

—সকলে আমার আপনজন কর্তা। কিন্তু কোন মায়া নাই। অর্থাৎ কোনও মায়ায় আর জড়িয়ে পড়তে চায় না জুটি। সে একা। কেবল একা থাকতে চায়। আর আল্লা অথবা নবীদের নামে সে মনের ভিতর ডুবে থাকে। রাত বাড়লেই ছইএর নিচে ঢুকে কালো রঙের আলখাল্লা পরবে ফকিরসাবের। গলায় মালা-তাবিজ ঝোলাবে এবং কোরানের পর পর বয়াত মুখস্থ বলবে। মুশকিলাসানের লম্ফের দিকে চোখ রেখে।

রঞ্জিতকে মালতী রান্না করতে দিল না। জোটন ভাজা মুগের ডাল বের করে দিল। গরুর দুধের ঘি। তেল-ঘিতে দোষ নেই। বাটনা বাটার শীলনোড়া আছে। ওটা জোটন ব্যবহার করে বলে দিল না। কোনওরকমে রাতের রান্না আজ সেরে ফেললে কাল জোটন সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। মালতী হলুদ এক টুকরো আস্ত ডালে ফেলে দিল। হলুদ না দিলে রান্নার ত্রুটি থেকে যায়। হলুদ দিতেই হয়। কোথায় এখন বাটা হলুদ পাবে। সে আস্ত হলুদ ফেলে দিল গরম ডালে, মেতি মৌরি তেজপাতা সম্ভারে মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, পেঁপে এবং সীম সেদ্ধ। আতপ চালের ফেনা ভাত। বড় কলাপাতা কেটে এনেছিল জোটন। ওরা খেলে পর যা থাকবে, এক পাশে আলগা হয়ে খেয়ে নেবে। সে নিজের জন্যও একটা কলাপাতা কেটে রেখেছে।

জোটন খেতে বসে মালতীকে অপলক দেখছিল। জব্বর এই যুবতীকে বিনষ্ট করেছে। মালতী বছরের পর বছর আল্লার মাশুল না তুলে আছে কী করে! অথচ জব্বর জোরজার করে পবিত্র যুবতীকে অশুচি করে দিল। জোটনের নিজেরই কেমন শরীর গোলাচ্ছে। সে জব্বরকে শিশু বয়স থেকে বড় করেছে। জব্বর এই কাজ করেছে! অপরাধের দায়ভাগ জোটনের। সে ভিতরে ভিতরে জব্বরকে কাছে পেলে যেন গলা টিপে ধরত, এমন চোখ-মুখ এখন। মালতী রঞ্জিতকে খাইয়ে আলাদা পাতায় যত্নের সঙ্গে ভাত এবং ডাল বেড়ে দিল জোটনকে। মালতী রঞ্জিতের পাতায় ভাত বেড়ে নিয়েছিল। ওরা আল্‌গা হয়ে একটু দূরে বসে পরস্পর নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে। কিন্তু জোটন খেতে পারছে না। সে অপলক চুরি করে মালতীকে দেখছে, যেন সেই ঠাকুরবাড়িতে বসে সে খাচ্ছে। সে খেতে খেতে মালতীর রান্নার খুব তারিফ করল।

রঞ্জিত পাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার রাত! লম্ফের আলোতেই দুই নারী মূর্তি বনের ভিতর চুপচাপ খাচ্ছে। এক সময় জোটন বলল, মামা-মামিরা কেমন আছে?

—ভাল। বস্তুত সারাদিন পর এই খাওয়া, একটু ঘি, সীমসিদ্ধ, বেগুন সিদ্ধ, ভাত এবং মুগের ডাল, বেগুন ভাজা অমৃতের শামিল। আর মালতীর এতদিন পর, স্বপ্ন তার সফল হচ্ছে—সে তার প্রিয়জনকে দুটো রান্না করে দিতে পারছে, তার পাতে খেতে পেরেছে, পেটের ভিতর যে এমন একটা দানব দিনে দিনে বাড়ে চন্দ্রকলার মতো, সে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করছে না—ঘরে লম্ফ জ্বেলে রেখে এসেছে জোটন—একই ঘরে আজ রঞ্জিত আর মালতী থাকবে। জুটি সেই কবে থেকে প্রায় বলা যায় মালতীর জন্ম থেকে বড় হওয়া, ওর বিয়ের সব সে চোখের ওপর দেখেছে। স্বামীর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর মালতীর ফিরে আসা। সেই শোক বিহ্বল চেহারা জোটন যেন ইচ্ছা করলে এখনও মনে করতে পারে—তারপর দীর্ঘকাল একা একা মালতী একটা গাছের নিচে সারাদিন বসে থাকল, কেউ এল না হাত ধরে নিয়ে যেতে—নদীর পারে যাবার ইচ্ছা তার বার বার। কিন্তু সে একা। গাছের পাতা কেবল সারা মাসকাল ওর মাথার উপর ঝরে পড়েছে। গাছের নিচে আজ তার সত্যি একটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। মালতী আজ কিছুতেই রঞ্জিতের দিকে তাকাতে পারছে না। কেবল ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উচ্ছিষ্ট এক যুবতী সে। সোনার মতো মানুষ, তার কাছে দেবতার শামিল রঞ্জিত এখন ঘরে চুপচাপ হোগলার উপর শুয়ে আছে। সে গেলে মানুষটা আলো নিভিয়ে দেবে। অথচ রঞ্জিতকে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। সে তার কাছে কিছুতেই যেতে সাহস পাচ্ছে না। তার হাত-পা কাঁপছে।

এখানে থাকলে মালতী ঘরের ভিতর ঢুকবে না। জোটন তাড়াতাড়ি ছইএর নিচে ঢুকে যাবার জন্য কবর পার হয়ে চলে গেল। পিছনের দিকে তাকাল না। কেবল মনে মনে হাসল। মালতী তুই মনে করিস আমি কিছু বুঝি না। তুই বিধবা বইলা তর বুঝি কিছু ইচ্ছা থাকতে নাই। মাচানে উঠেই জোটনের মনে হল সরোবরে আজ দুটো মাছ সারাদিন জলের নিচে ঘুরে বেড়াবে। সরোবরে দীর্ঘদিন একটা মাছ ছিল। জোয়ারের জলে আর একটা ভেসে আসতেই সরোবরের মাছটা লাফিয়ে জলে ভেসে উঠল। ওর কাছে সরোবরের মাছ মালতী। কি যে দুঃখ মেয়েমানুষের স্বামী বিহনে জীবনযাপন—সে মর্মে মর্মে তা জেনেছে। জোটন মুশকিলাসানের আলোতে এবার নিজের মুখ দেখল। সে কেমন তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনীর মতো হয়ে যাচ্ছে। এক সুদূর আলোর রেখা ক্রমে বড় হতে হতে গাছপালা ভেদ করে উপরে উঠে যাচ্ছে। মালতী ক্ষুধায় পীড়িত। একটা মানুষ তাকে আজ কী যে আনন্দ দিচ্ছে। আহা, বসুন্ধরার মতো, অথবা আবাদের মতো, ফসলের জমি খালি ফেলে রাখতে নেই। আজ, আজ রাতে দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আকাশ ভেঙে ঢল নামবে। জোটনের আরামে চোখ বুজে এল। সে ফকিরসাবের উদ্দেশে মাথা নিচু করে এবার বসে থাকল। মনে হচ্ছে সামনে সেই সোনালী বালির চর—আকাশ ভেঙে ঢল নেমেছে। একটা সাদা বিনষ্ট পবিত্র ফুল জলে চুপি চুপি ভিজছে। সে এবার মনে মনে উচ্চারণ করল, খুদা মেহেরবান। সে বিনষ্ট হতে দেবে না ফুলকে। আবার, আবার পরিচ্ছন্ন করে তুলবে সব। মালতীর পেটে জারজ সন্তান। জারজ সন্তান পেটে রেখে সে কিছুতেই এমন নিষ্পাপ যুবতীকে বিনষ্ট হতে দেবে না। হাতে তার কত তন্ত্রমন্ত্র আছে, গাছ-গাছালি আছে—সে কী না পারে! কারণ তার নিজের মানুষ ফকিরসাব। মরার আগে

সব তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁক ওকে দিয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সারাজীবন ধরে যে মাশুল আল্লাকে দেবার কথা, আজ সে তাই বিনষ্ট করতে যাচ্ছে। সে তার লাখেটিয়া চিজ সেই মাশুলের ওপর ছুঁড়ে দেবে। তবু মালতী আবার পবিত্র হোক সুখী হোক। সে মুশকিলাসানের লম্ফ নিয়ে চুপিচুপি উঠে এল। এসে দেখল মালতী তখনও একা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জিত পরিশ্রান্ত। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে ডাকল, এই মালতী। মালতী কাছে গেলে বলল, ভিতরে যাস নাই?

—না।

—পানি আন।

মালতী ভেবে পেল না, কেন এসব! সে তবু জোটনেব এমন রুদ্র চোখ-মুখ এবং পীরানি পীরানি ভাবটা দেখে কেমন আবিষ্টের মতো এক ঘড়া জল নিয়ে এল। জোটন বলল, নে, হাত পাত। পানিতে গিলা খা। জলটা খেয়ে ফেললে বলল, যা ভিতরে। আর ডর নাই। বলেই সে যেমন এসেছিল সহসা তেমনি ছইয়ের ভিতর লম্ফ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সে ছইয়ের নিচে বসে এই মুহূর্তে হাজার হাজার অথবা লক্ষ লক্ষ শয়তানের বিরুদ্ধে করতালি বাজাল। সে গুনাহ্ করল অর্থাৎ মহাপাপ, ভ্রূণ হত্যার মহাপাপ। সে জোরে জোরে হাঁকল, ফকিরসাব, কবরে জাইগা আছেন? সে চিৎকার করে বলল, কন খুদা আমারে বেহেস্তে পাঠাইব না দোজকে পাঠাইব? কন ত কি হইব জবাবডা! বলেই সে লক্ষ লক্ষ শয়তানকে কলা দেখিয়ে কাঁথা-বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। তারপর খুব ফিসফিস গলায়, যেন ফকিরসাব কবরে নেই, মাচানে এসে তার পাশে শুয়েছে—জোটন এমনভাবে নালিশ দিচ্ছে—কি, জবাবডা দ্যান! কিন্তু ফকিরসাব কিছু বলছেন না। পাশ ফিরে শুলেন। এবার তার যেন বলার ইচ্ছা, এই ভ্রূণ হত্যার জন্য দায়ী কে? আমি, মালতী, আপনি, না জব্বর! কেডা হইব কন? সে দু'হাতে বুক চাপড়ে মাচানে পড়ে তার এই মহাপাপের জন্য বনের ভিতর কাঁদতে থাকল।

গাছ-পাতার ফাঁকে সূর্যের আলো—ছায়া ছায়া ভাব, হেমন্তের শীত। সোনা চিঠি হাতে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শীত এসে যাচ্ছে বলে সকাল সকাল দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। চিঠিটা অমলা লিখেছে। নতুবা কে তাকে চিঠি দেবে! অমলার কথা মনে হলেই সে নীল

রঙের আবছা আলো, পুরানো পাঁচিলের গন্ধ টের পায়। সেই ভাঙা কুঠির অন্ধকার এবং অমলার মুখ, চোখ, শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চোখের ওপর ভেসে ওঠে। তার ভিতরে কেমন একটা অনুভূতি হয়—মনে হয় জ্বর আসছে কম্প দিয়ে। শীত করছে। সে, ভিতরে ভিতরে মায়ের মুখ মনে ভাবলে শক্ত হয়ে যায়। সে একটা পাপ কাজ করে এসেছে। মা বুঝি টের পেয়েছে। মুড়াপাড়া থেকে ফিরে আসার পরই মা ভালোভাবে কথা বলে না। মা যেমন ওর সামান্য অসুখ করলে মুখ দেখে টের পায় তেমনি টের পেয়ে গেছে। গায়ের গন্ধ শুঁকে মা টের পেয়েছে বুঝি সোনা আর পবিত্র নেই। সোনা মুড়াপাড়া থেকে নতুন একটা অসুখ বাধিয়ে এসেছে।

সোনা বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকল। আজ সে খেলতে গেল না পর্যন্ত। প্রতাপ চন্দের মাঠে ভলিবল নেমেছে। সোনা খেলে না। বোধহয় আগামীবার সে খেলতে পারে। এখনও মাঠ থেকে বল কুড়িয়ে দেয়। এবং খেলা হলে ওর মতো সমবয়সীরা মাঠে নেমে কিছুক্ষণ বল নিয়ে লাফালাফি করে—সেই লাফালাফির নেশাও কম নয় তার। বিকেল হলেই সে ছুটবে। কিন্তু এই চিঠি সারাক্ষণ তাকে নানাভাবে বিব্রত করেছে। সে কোথাও এমন জায়গা খুঁজছে যেখানে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়লে কেউ টের পাবে না। চিঠি পড়ে অমলাকে লিখবে, তুমি আমাকে আর চিঠি দিও না। কারণ সোনার ভয়, অমলা হয়তো লিখবে, তুই কাউকে বলে দিস নি তো! এসব কথা কিন্তু কেউ কখনও বলে দেয় না। বলতে নেই। শুধু আমি তুই জানি। আবার যখন তুই মুড়াপাড়া আসবি তখন আমরা আরও বড় হয়ে যাব। কী মজা হবে না তখন!

সোনা শোবার ঘরে ঢুকে আয়নায় মুখ দেখল। সে মাঝে মাঝে আজকাল চুরি করে আয়নায় মুখ দেখছে। আয়না ধরলেই মা জ্যেঠিমা রাগ করেন। জ্যেঠিমা বলবেন, কী এত মুখ দেখা! এমন বয়সে এত বেশি মুখ দেখতে নেই। কখনও বলবেন, আয়না ধরবে না সোনা। তোমাদের জ্বালায় কিছু রাখা যায় না। সব ভেঙে ফেলছে। সে চুরি করে মুখ দেখছে। মা বিছানায় শুয়ে আছে। সোনা টেবিলের ধারে খুটখুট করছে। ধনবৌ মাথা তুলে দেখল, সোনা নিবিষ্ট মনে আয়নাটা মুখের কাছে এনে দেখছে। নানাভাবে দেখছে মুখ। চোখ বড় করে, কপাল টানটান করে দেখছে। টেবিল থেকে চুরি করে মার স্নো মাখছে। সুন্দর করে চুল আঁচড়ে সে বিছানার দিকে তাকাতেই মায়ের চোখে চোখ পড়ে গেল। ভারি লজ্জা পেল সোনা। ধনবৌ ছেলের সাজগোজ দেখে কাছে ডাকল। সোনা কাছে গেলে চুলটা আরও ভালো করে পাট করে দিল। স্নো যেখানে মুখের সঙ্গে মিশে যায়নি, সেটা সুন্দর নরম হাতে মিলিয়ে দিল। বড়বৌ এসেছে দেশলাই নিতে। এসে দেখল মা ছেলেকে সাজিয়ে দিচ্ছে। এই অবেলায় সোনা কোথায় যাবে! অন্যদিন এ-সময় খেলার জন্য ওকে কিছুতেই আটকে রাখা যায় না বাড়িতে। সে জামা-কাপড় পাল্টেই ছুটতে থাকে মাঠের দিকে। তাকে ধরে রাখা যায় না। গোপাটে নেমে গেলে বড়বৌ ডাকবে, সোনা, লক্ষ্মী আমার, চাদর গায়ে দিয়ে যা। ঠাণ্ডা লাগলে জ্বর হবে। কে কার কথা শোনে! সে ছুটে মাঠে নেমে যায়।

অথচ আজ সোনা খেলার মাঠে যায়নি। বড়বৌ সামান্য বিস্মিত হল। বড়বৌ বলল, কিরে সোনা, মাঠে গেলি না?

সোনা মাকে, জ্যেঠিমাকে দেখল। সে কিছু বলল না। সন্তর্পণে পকেটে হাত রাখল। নীল রঙের খামটা ওর পকেটে। সে তাড়াতাড়ি এ ঘর থেকে পালাতে চায়। সোনা বের হবার মুখে শুনল, জ্যেঠিমা বলছেন, সোনা তোমার মাকে এক গ্লাস জল এনে দাও।

সোনার ভারি রাগ হল মায়ের ওপর। মা ফাঁক পেলেই শুয়ে থাকে। শরীর খারাপ। কী যে অসুখ মায়ের সে বুঝতে পারে না। অন্য অনেকদিন সে চুরি করে আয়নায় মুখ দেখলে মা তাকে ডাকে, তাকে সাজিয়ে দিতে চায়। সে কাছে যায় না। গেলেই ধরা পড়ে যাবে এমন ভয়ে সে দূরে থাকে। নিজেই মাথার চুলটা ঠিক করে নেয়। মা রোগা হয়ে যাচ্ছে। ভাত খেতে চায় না। তবু জ্যেঠিমা সাধ্য সাধনা করে দু'মুঠো খাওয়ান। মার সেই খাবার দৃশ্য দেখলে সোনার কান্না পায়। খেতে খেতে কোনওদিন মা মালসাতে বমি করে ফেলেন। মার জন্য সে যে কী করবে ভেবে পায় না। অথচ আজ এই জল আনতে বলায় মার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। কী দরকার ছিল বলা জ্যেঠিমাকে, জল দিতে। জ্যেঠিমার হাতে গুচ্ছের কাজ। সেজন্য তিনি সোনাকে জল দিতে বলেছেন। সে বের হয়ে যাবার পর কেন মা জল চাইল না। সে এখন পাল বাড়ির পুকুরপাড়ে চলে যাবে। পাড়ে পাড়ে কত লটকন গাছ। ছোট ছোট গাছের ডাল বেয়ে অনায়াসে সে উপরে উঠে যেতে পারে। ডালপালা শাখার কোনও ঝোপের ভিতর বসে সে যদি চিঠিটা পড়ে তবে কেউ টের পাবে না।

তার এখন তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে। সাঁঝ নামলে সে দূরে কোথাও যেতে পারে না। ভয় হয়। আর এসময় মা বলেছেন, জল দিতে। সে জল না দিয়েই চলে যেত, কিন্তু ঈশম বলেছে জল না দিলে পরের জন্মে মাছরাঙা হয়। সে কিছুতেই মাছরাঙা হতে চায় না। সে মাছরাঙা হবার ভয়ে মার শিয়রে জল এনে রেখে দিল।

দরজার মুখে এলেই ধনবৌ আবার ডাকল, সোনা।

সোনা পিছন ফিরে তাকালে, ধনবৌ বলল, কোনখানে যাবি? সোনা বলল, কোনখানে যামু না।

—আমার শিয়রে একটু বসবি? আমারে বাতাস দিবি। শরীরটা আমার ভাল না।

একথা শুনে সোনার রাগ বাড়ছে। সে সব সময়ই মায়ের অনুগত। মেজদার মতো সে নয়। মেজদাকে মা কোনও কিছু করতে বললেই পারবে না বলে চলে যায়। মা নিরীহ স্বভাবের। মেজদা শুধু ছোট কাকাকে ভয় পায়। সোনাই মার ফুটফরমাশ খেটে দেয়। অথচ আজ তার এমন কথায় রাগে কান্না পাচ্ছে।

এবং এখন কত কথা মা তাকে বলছে। সে শিয়রে বসে থাকলে মায়ের খুব ভালো লাগবে। মার একা-একা ভালো লাগছে না। বাবাকে মা রাতে চিঠি লিখেছে, এই নিয়ে তিনটে চিঠি সে ডাকবাক্সে ফেলে এসেছে—অথচ বাবা একটা চিঠির জবাব দেয়নি। আর কিছুক্ষণ সে মার কাছে বসে থাকলেই বলবে, হাঁ রে সোনা, পিয়ন আইছিল?

বাবার চিঠি এলেই মা সেদিন খুব সুন্দর সাজে। ভালো কাপড় পরে। লাল বড় সিঁদুরের টিপ কপালে এবং চুলে নানারকম ক্লিপ এঁটে মা বাবার জন্য কেবল কি প্রার্থনা করে।

সে আর মায়ের কাছে গেল না। কাছে গেলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তার পকেটে একটা নীল খামের চিঠি। সে বলল, আমার ভালো লাগে না। সে মায়ের সঙ্গে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলল, আমি মাঠে যামু মা।

ধনবৌ এবার উঠে বসল। মুখে খুব অরুচি। কিছু খেতে ভালো লাগে না। আমলকী খেলে জিভের স্বাদ ফিরে আসতে পারে। সে বলল, সোনা, আমার লাইগা আমলকী আনবি? মাঝি বাড়ির আমলকী গাছে খুব আমলকী হইছে।

মাঝিদের বাড়িতে আমলকী গাছ। সোনা গাছটা চেনে। সময়ে অসময়ে গাছটায় ফল ধরে থাকে। সে বল মার জন্য দুটো আমলকী চেয়ে নেবে। সে কতদিন আমলকী ফল খেয়ে জল খেয়েছে। আমলকী খেয়ে জল খেলেই মিষ্টি মিষ্টি লাগে জলটা। সে একটা আমলকী খেত, এবং এক ঢোক কবে জল খেত।

এতক্ষণ মা তাকে এই অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতে চেয়েছিল, যেমন অমলা তাকে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—তখন চরাচরে কদম ফুল ফোটে, কদম ফুল ফুটলেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়— কেমন যেন একটা নতুন অসুখের জন্ম হচ্ছে শরীরে। ভালোবাসা, ভালো লাগার— কী একটা ব্যাপার, সে বুঝতে পারছে না, ছুঁতে পারছে না, ছুঁতে পারছে না নিজেকে—কেবল ঘুরে ঘুরে লটকনের ডালে ডালে সে একটা নিরিবিলি ঝোপ পেতেই চিত হয়ে ডালের ওপর শুয়ে পড়ল। কেউ গাছের নিচে হাঁটছে। সে তাড়াতাড়ি আবার চিঠিটা লুকিয়ে ফেলল। তারপর মুখ নিচু করে দেখল, না, কেউ নেই। গাছের মাথায় একটা সাদা বক এসে বসেছে। সে যে এক বালক, অমলার চিঠি নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে, বকটা টের পায়নি। সূর্যের মুখে মুখ করে বসে আছে। কুক কুক শব্দ করছে।

সোনা খুব যত্নের সঙ্গে নীল খামটা খুলল। জায়গাটা যথার্থই নির্জন। গ্রামের এটা উত্তর দিক। শীতকালে ভালো রোদ পায় না। পালেদের বাঁশ বাগান সামনে। পশ্চিমে ছোট একটা নালা। এখনও জল আছে নালাতে। কত রকমের সব হেলঞ্চা কলমি লতা এবং জল সেঁচি আর কত সব ফড়িং, বিচিত্র বর্ণের হেমন্তের পরেই শীত আসবে। শীত শেষ

হলে নালাতে জল থাকবে না। তখন সোনা এবং সকলে খাল পার হয়ে খেলার মাঠে যাবে।

এই খালটায় জল আছে বলে এখনও এ-পথে মানুষ নেমে আসে না। সোনা পাড়ে পাড়ে সব লটকন গাছ দেখতে পাচ্ছে। গাছে গাছে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে আসবে—কতবার শীতের শেষে ওরা গাছের নিচে বসে থাকত নীলকণ্ঠ পাখি দেখবে। কিন্তু পাখি এল না। সূর্যাস্ত হল। কোনও কোনওদিন সাদা জ্যোৎস্নায় সে ঈশমের হাত ধরে বের হতো। জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকতেন। তালি বাজাতেন হাতে। সোনা ভেবেছিল তিনি তালি বাজালেই ওরা কোন দূরের সরোবর থেকে অথবা পাহাড় থেকে নেমে আসবে। সে নীল খামটা খুলতে গিয়ে একটা পাখির চোখ দেখতে পেল। পাখিটা কি তবে সেই তার নীলকণ্ঠ। যা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, জ্যাঠামশাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চোখে তার কি দুঃখ! সে দেখল পাখিটা সেই পাখি, সাদা পাখি—একটা বক্, সে কক্ কক্ করছে। সে খামটা এবাব ছিঁড়ে ফেলল।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। বেশ বড় বড় করে লিখেছে অমলা। ধরে ধরে লিখেছে সোনাকে।

সোনার মুখে এসে শেষ হেমন্তের রোদ পড়ছে পাতার ফাঁকে। মা তার শুয়ে আছে ঘরে। মার অসুখ। সে নিতান্ত বালক। সে চিঠিটা পড়ার জন্য এমন একটা গোপন জায়গায় চলে এসেছে।

সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা—প্রিয় সোনা। আশা করি তুই ভালো আছিস। কেমন বড় মানুষের মতো লিখেছে। অমলা, কলকাতার মেয়ে। তার তো সবই তাড়াতাড়ি জানার কথা। সে সুন্দর ভাষায় চিঠি তো লিখবেই। প্রিয় সোনা, এই কথা ভাবতেই ওর মুখটা লজ্জায় মহিমময় হয়ে গেল। তোর জন্য আমাদের মন খুব খারাপ। কিছু ভালো লাগে না রে। বড় একঘেয়ে। সকালে স্কুল, বিকেলে দু'জনে আমরা টেবিল-টেনিস খেলি আর রাতে মাস্টারমশাই আসেন। এখানে আসার পর থেকেই বাবা আমাদের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না। তারপর কিছু শব্দ অমলা কেটে দিয়েছে। এমনভাবে কেটেছে যে সোনা বুঝতে পারল না। আমরা আসার সময় তোর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি। সারা রাস্তায় আমরা কেঁদেছি। কারণ আগামী শীতে শুনেছি মা মরে যাবেন। খবর পেয়ে আমরা চলে এসেছি। এসে দেখি মা একটা সাদা বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাদের চিনতে পারছেন না। সাদা চাদরের নিচে মায়ের নীল রঙের পা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি, কমলা মায়ের সুন্দর পা ছুঁতেই দক্ষিণ দিকের জানালাটা খুলে গেল। দেখি সেখানে কারা একটা সিলভার ওক লাগিয়ে রেখেছে।

কি যে হয়েছে মায়ের!

চিঠিটা পড়তে পড়তে সোনার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

মা এখন আমার জানালায় শুয়ে থাকেন। দক্ষিণের জানালাটা কারা খুলে রাখে। দুর্গের র‍্যামপার্ট জানালা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। মনে হয় বাবা আর মাকে কোনও কষ্ট দিতে চান না! যা যা ভালোবাসেন বাবা তাই করছেন। সারাদিন শুয়ে থাকেন। ওঠার ক্ষমতা নেই। গভীর রাতে রেকর্ডে বাবা কিছু ধর্মীয় সঙ্গীত বাজান, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি। কোনও কোনও দিন ঘুম ভেঙে গেলে এসব টের পাই।

সকালবেলাতে বাবা মাকে পাঁজাকোলে বারান্দায় নিয়ে আসেন। নার্সরা তখন কাছে থাকে না। রেলিঙের ধারে বসে থাকেন তিনি। যতক্ষণ না সিলভার ওকে রোদ এসে নামবে ততক্ষণ বসে থাকবেন। তারপর গাছটায় রোদ এসে পড়লেই বাবা আবার মাকে খাটে শুইয়ে দেন। যেদিন কলকাতার আকাশে রোদ থাকে না—সেদিন মায়ের যে কি কষ্ট! মার মুখ দেখলেই মনে হয় তখন, আজ অথবা কাল তিনি মরে যাবেন।

কেন যে এমন হল সোনা!

মা মরে গেলে আমরা কার কাছে থাকব সোনা!

আমরা স্কুল থেকে এসে কিছুক্ষণ মায়ের পাশে বসি। বৃন্দাবনী মাকে সাজিয়ে দেয় রোজ। মা এখন আর বব চুল কাটেন না। চুল বড় হয়ে যাচ্ছে। বড় চুলে মাকে যে কী সুন্দর লাগে! মা গাউন পরেন না। সাদা রঙের সিল্ক, লাল পাড়ের সিল্ক, মা সিল্ক পরে সারা দিন বড় খাটে প্রার্থনার ভঙ্গিতে শুয়ে থাকেন। আমরা ডাকি, মা মা! মা আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলেন না। বুঝি শুধু দুর্গের র‍্যামপার্টে একটা নীল রঙের পাখি খোঁজেন।

মা বড় করে সিঁদুরের টিপ পরেন। কিসের কবিতা মায়ের খুব পছন্দ। আমরা পায়ের কাছে বসে ছুটির দিনে কিসের কবিতা আবৃত্তি করি। মা শুনতে পান কি-না জানি না। বাবা বলেছেন, তোমাদের মা যা ভালোবাসেন তাই করবে। আমরা মাকে আবৃত্তি করে কবিতা শোনাই। সেই সব স্তবক যা মার খুব পছন্দ। বাবা সময়ে সময়ে যা-ই বলেন, সবই মাকে কেন্দ্র করে, বাবার সঙ্গে কার্ডিফের কোনও পার্কে মার প্রথম দেখা, বাবা মাকে কি বলতেন, বাবা ভারতবর্ষের মানুষ, বাঙালী, কলকাতায় তাঁদের বাড়ি, বাবা প্রথমে মাকে এমনই বলেছিলেন। বাবা বলেন, জানি না তোর মা কলকাতা বললেই বিষণ্ণ চোখে তাকাত।

যেমন সেই স্তবক—

I made garland for her bead And bracelets too and fragrant zone; She looked at me as she did love, And made sweet moan.

কখনও কখনও বাবা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গলা মেলান।

সোনা কবিতার কোনও অর্থ ধরতে পারল না। সে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ল। সোনার স্মৃতিশক্তি প্রবল। সে দু'বার পড়তে না পড়তেই কবিতাটা মুখস্থ করে ফেলল।

চিঠিটা পড়তে পড়তে এক সময় সোনা নিজেই কেমন একটা গাছ হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে সে স্থবির হয়ে যাচ্ছে। কারণ তার মা বিছানায়। মার অসুখ। কিছু খায় না। আগামী শীতে কি তার মাও মরে যাবে! অমলা আমি কী করি! আমিও কী মার পায়ের কাছে বসে থাকব। সেই অন্ধকার ঘরে, অমলার সাপ্টে ধরা, ওর ভালো লাগা এবং নদীর কাছে গিয়েও পাপ কাজের কথা বলতে না পারা, বলতে পারলে নদী অর্থাৎ এই জল, জল মানেই জীবন, জীবন হচ্ছে প্রাচুর্যের দেবতা, দেবতা তাকে পাপ থেকে মুক্তি দিতেন। অসময়ে তুমি, সোনা, নদীর পাড়ে হেঁটে গেলে। বন্যা এসে তোমাকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। সোনা নিচে নেমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। সে বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে তার বড় কষ্ট হচ্ছে। মার পায়ের কাছে বসে কমলা অমলা আবৃত্তি করছে। সে কী করবে! মা বলেছে তাকে আমলকী ফল নিতে। সে খালপাড়ে এসে প্যান্ট খুলে ফেলল। তারপর খাল পার হয়ে ফের প্যান্ট পরে ছুটল। ঘুরে গেলে রাত হয়ে যাবে। সে খাল পার হয়ে সোজা ঢুকে গেল মাঝিবাড়ি। কিছু আমলকী ফল নিয়ে গাঁয়ের পথে বাড়ির দিকে ছুটে চলল।

সে ঘরে ঢুকেই মায়ের শিয়রে দাঁড়াল। সে খুব হাঁপাচ্ছে। যেন ভয় পেয়ে সে ঘরে ঢুকেছে। অথবা কেউ ওকে পিছনে তাড়া করেছে।

ধনবৌ ছেলের কাতর মুখ দেখে বলল, তর কি হইছে?

সোনা কিছু বলল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে খেলার মাঠে। জানালাগুলি খোলা। দিনের আলো মরে আসছে। সে ফলগুলি মায়ের হাতে দিল।

ধনবৌ ভেবেছিল, সোনা আমলকী না বলে এনেছে। মাঝিদের কেউ ওকে কিছু বলতে পারে সে তাই ছুটে পালিয়ে এসেছে। সে তাই বলল, অরা কিছু কইছে তরে?

—না মা। কিছু কয় নাই?

কিন্তু অদ্ভুত, সোনা কিছুতেই ফল হাতে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে না। মায়ের শিয়রে চুপচাপ বসে রয়েছে। ধনবৌ অপলক ছেলের মুখ দেখছে। সোনা যেন কিছু বললেই কেঁদে ফেলবে। ধনবৌ মাথায় হাত রেখে বলল, কী রে, তুই কথা কস না ক্যান? কথা না কইলে আমার ভালো লাগে!

এ-সময় বড়বৌ এসে ঘরে ঢুকল। সোনা শিয়রে বসে রয়েছে। চুপচাপ। মাথা গোঁজ করে হাঁটুর ভিতর মুখ রেখে বসে রয়েছে।

—ধন, তুমি রাতে কি খাবে?

—কিছু খামু না বড়দি।

—কিছু না খেলে চলবে কেন! তোমার জন্য পাতলা করে কই মাছের ঝোল করে দিচ্ছি। দুটো হেলঞ্চার ডগা ফেলে দেব। খেতে ভাল লাগবে। শিয়রে লেবুর পাতা রেখে গেলাম। ওক উঠলেই পাতা শুঁকবে। তারপর সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, সোনা, তুমি খেলতে গেলে না?

সোনা এবারেও জবাব দিল না। সে মাথা গুঁজে একগুঁয়ে বালকের মতো বসে থাকল।

বড়বৌ ধনবৌকে বলল, ওর হয়েছে কি?

—কি কই কন। চুপচাপ বইসা আছে। কথা কইলে জবাব দেয় না।

—তুই ওকে বকেছিস?

—না দিদি।

—তবে ও এমন শক্ত হয়ে বসে আছে কেন?

—জানি না।

—সোনা এস। বলে বড়বৌ ওকে টেনে তুলতে চাইল। কিন্তু সে মায়ের শিয়র থেকে কিছুতেই উঠল না।

বড়বৌ বলল, ছোটকাকাকে ধরে নিয়ে গেছে! তাতে কি হল! ওরা কিছু করতে পারবে না, আবার চলে আসবে।

কিন্তু সোনা একইভাবে বসে থাকল।

বড়বৌ ভাবল, তবে কি রঞ্জিত নেই বলে! সে বলল, তোর মামাকে ধরে সাধ্য কার! ধরা পড়লে তো ওর ফাঁসি হবে! বলতেই বুকটা কেঁপে উঠল বড়বৌর।

এবং সোনার প্রতি বড়বৌ আরও কোমল হয়ে গেল। চল বাইরে। দেখ তো তোর জ্যাঠামশাই কোনদিকে গেছেন। খুঁজে আনতে পারিস কিনা।

সোনার ভ্রুক্ষেপ নেই। সে উঠল না।

বড়বৌ কেমন বিরক্ত গলায় বলল, কি হয়েছে সোনা, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?

সোনা বলল, না।

—তবে এভাবে বসে আছ কেন! খেলতেও যাওনি কেন! শরীর খারাপ?

সোনা ফের নির্বাক। এই অসময়ে সোনা ঘরের ভিতর মায়ের শিয়রে চুপচাপ বসে রয়েছে। এভাবে বসে থাকা ভালো না। এবার বড়বৌ বলল, দ্যাখ তো সোনা তোর ঈশম দাদা তরমুজের খেত থেকে উঠে এসেছে কি-না!

কিছুতেই কিছু সে শুনল না। সে যেমন মায়ের শিয়রে বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। মার কপালে ওর হাত। কী ঠাণ্ডা মার কপাল, শরী! মা তার নিশিদিন বমি করে কেন! মাঝে মাঝে সে দেখেছে বমি করতে করতে মার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে কোনও কোনওদিন শিয়রে দাঁড়িয়ে মাকে বাতাস করেছে। বড় জ্যেঠিমা দুধ গরম করে দিয়েছেন। দুধ খেয়েই মা হড়হড় করে সব ফের তুলে দিয়েছে। একবার গোপাল ডাক্তার এসেছিল। মায়ের অসুখ দেখে জ্যেঠিমাকে হাসতে হাসতে কি বলে গেছে। তখন মনে হয়েছিল তার, চুরি করে ডাক্তারের সাইকেল পানচার করে দেবে। সোনাকে এমন শক্ত থাকতে দেখে ধনবৌ পর্যন্ত উঠে বসেছে। মা তার সব টের পায়। মা বলল, আমার কিছু হয় নাই সোনা। এই যেই না বলা, সোনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—আমলকী ফল খাইলেই ভালো হইয়া উঠুম।

বড়বৌ এবার হাসতে হাসতে বলল, সোনাবাবুর সে জন্য কান্না। হ্যাঁ রে, তোর মার কিছু হয় নি। তোর এবার দেখবি বোন হবে একটা। বোকা। বলে সোনাকে জোরজার করে চৌকি থেকে তুলে আনল। বোকা কোথাকার। তা তুমি বলবে তো ধন। সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, সেজন্য তুই মার কাছে বসে আছিস! আয়। বড়বৌ সোনাকে বাইরে নিয়ে গেল। সে জ্যেঠিমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ টলটল করছে।

—বিশ্বাস হচ্ছে না?

ঈশম এতক্ষণে চলে এসেছে। সে বলল, তাই নাকি! এর লাইগ্যা কান্দন!

কী যেন এক পুলক শরীরে। আনন্দে সোনার ভিতরটা সহসা আকাশের নিচে খেলা করে বেড়াতে চাইল। সে ঈশমের কথায় ফিক্ করে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল।

ঈশমও ছুটে গেল সোনার পিছনে। সে এসে ওকে নদীর চরে আবিষ্কার করল। কিছু খড়কুটো পাতার দরকার ছইয়ের নিচে। সে হাঁটতে হাঁটতে ছইয়ের দিকে গেল। সোনাকর্তাকে কিছু বলল না। ছোট্ট বাবুটি এখন নদীর চরে ঘাসের ওপর বসে আছে। আনমনা। নদী জল আকাশ দেখছে।

শীত পড়তে পড়তেই চন্দ্রনাথ চলে এলেন বাড়িতে। ভূপেন্দ্রনাথ আসবেন মাঘ মাসের সতেরো তারিখে। কারণ সেই তারিখে শচীন্দ্রনাথ ছাড়া পাচ্ছেন। কোর্ট-কাছারি অথবা কী করে কী যে হয়েছিল সোনা জানে না। ছোটকাকা ফিরে আসছেন। ছোটকাকা ছাড়া পাচ্ছেন এটাই এখন সুখবর। ওরা শীতের মাঠে রোদে পিঠ দিয়ে জোরে জোরে পড়ছিল।

এই শীতকালটা পড়ার চাপ কম। নতুন বই, নতুন চাদরের মতো, গায়ে দিলেই কী রকম একটা গন্ধ যেন, সোনা নতুন বই পড়তে পড়তে নাকের কাছে এনে গন্ধটা শোঁকে। নতুন বই এলেই শীতের ভোরে রোদে পিঠ দিয়ে গাছের নিচে পড়তে বসে ওরা। অর্জুন গাছের নিচে বড় একটা শতরঞ্চ পেতে দিয়ে যায় ঈশম। সকাল হলেই রোদ এসে নামে গাছটার নিচে। খুব ঘন পাতা বলে গাছের নিচে তেমন শিশির পড়ে না। ওরা সকালে মাস্টারমশাইকে ঘিরে পড়তে বসে। তখন তেলে মেখে রোদে পাঠিয়ে ঠাকুমা ডালায় করে গরম মুড়ি দেন। গাছের নিচে নরেন দাসের পেঁয়াজ খেত। লালটু কোনও কোনওদিন চুপি চুপি পেঁয়াজকলি তুলে আনে। মাস্টারমশাই যেন জানতে না পারে সে এমনভাবে যায়। কোনওদিন পলটু যায় মাঠে। শিশিরে পা ভিজে যায়। সে খেত থেকে ধনে পাতা তুলে আনে। পেঁয়াজকলির কুচি, ধনে পাতার কুচি তেলেমাখা মুড়ি, কাঁচালঙ্কা, হুসহাস ঝালের শব্দ আর পিঠে শীতের রোদ্দুর—সামনে নতুন বই, নতুন ছবি এসব মিলে সোনার এক ঐশ্বর্যভরা জগৎ। তিনজন তখন জোরে জোরে পড়ে।

পড়ে না কাঁসর-ঘণ্টা বাজায় বোঝা দায়। কারণ অনেক দূর থেকে মনে হয় শীতের ভোরে কয়েকটা মোরগ লড়াই করছে।

সেই শীতের সকালে চন্দ্রনাথ বাপের পায়ের কাছে বসেছিলেন। তিনি বাপের পা টিপে দিচ্ছেন। শীত এলেই বুড়ো মানুষটার শ্বাসকষ্ট বাড়ে। কফের টানে এসময় তিনি খুব কষ্ট পান। হাত-পা-মাথা সব গরম কাপড়ে ঢাকা থাকে। ফ্লানেলের লম্বা টুকরো দিয়ে বুকে-পিঠে যেন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কাছে এলেই কেমন কপূরের গন্ধ এবং কফের গন্ধ। গলায় গরম উলের মাফলার, পায়ে গরম মোজা এবং মাথায় ফেটি বাঁধা। শ্বাসকষ্ট এত প্রবল যে জানালায় শীতের রোদ, গাছে কামরাঙা ফুল, ফুলে মধু, মধু খেতে এসেছে পাখিরা সে-সব কিছুই টের পাচ্ছেন না। লেপ-কম্বলে শরীর ঢেকেও শীত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। পৃথিবীর সর্বত্র বুঝি তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছে। পৃথিবীর শেষ উত্তাপ শেষ সুখ বুঝি

কেউ হরণ করে নিচ্ছে। নতুবা সারা রাত তিনি শীতে এত কষ্ট পাবেন কেন। সারা রাত উত্তাপের জন্য আর্তনাদ করবেন কেন! খাটের নিচে পাতিলে তুষের আগুন—সারা রাত তুষের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে বড় বৌ। তবু মানুষটা উত্তাপ পায়নি। হাত-পা কী যে ঠাণ্ডা। সূর্য কি তবে পলাতক বালকের মতো সৌরজগতের অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। পৃথিবীকে সে সামান্য উত্তাপটুকু পর্যন্ত দিতে পারছে না। কবে একবার সূর্যোদয় দেখবেন বলে বের হয়ে ছিলেন আর বের হতে পারেন নি। এখন একবার যে বলবেন, অথবা তার বলার ইচ্ছা, পৃথিবীতে কি আর সূর্যোদয় হবে না! আমাকে তোমরা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে সূর্যোদয় দেখাবে না! আমি কি সত্যি এভাবে ঠাণ্ডায় মরে যাব? তিনি বলতে পারছেন না। বললেই যেন তাঁর সন্তানেরা পায়ের কাছে এসে বসবে, যেমন এখন বসে রয়েছেন চন্দ্রনাথ, বলবে, সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বেঁচে আর কি লাভ! এবারে চন্দ্রায়ণটা তবে করে ফেলি। এবং এ সময়েই তিনি শুনতে পেলেন তাঁর তিন নাতি জোরে জোরে পড়ে চলেছে। নতুন বই এলেই ওরা এভাবে পড়ে। কঠিন যা কিছু শব্দ আছে ঘুরেফিরে বার বার পড়ে। পড়ে বুঝি জানায়, এই যে আমরা বালকেরা আছি, আমরা কত কিছু শিখে ফেলেছি, আমরা পৃথিবীর কত খবর এনে দিচ্ছি তোমাদের। তোমরা কিছু জানো না। আর নতুন বই পুবানো হলেই শরীরের মতো জরাজীর্ণ অবস্থা! -আর কতকাল পৃথিবীর জায়গা আপনি আটকে রাখবেন। এবার চন্দ্রায়ণটা করে ফেলি। তারপর বলহবি হরিবোল বলে আ পনাকে আমরা নিজহাতে আপনি যে গাছ রোপণ করেছেন তার নিচে দাহ করি। আর কতকাল! শতবর্ষ পার হতে আর বাকি কি!

ফলে মহেন্দ্রনাথ গলার কাছে যে কাশিটা উঠে আসছে তা আটকে রেখেছেন। তিনি কিছুতেই ধরা পড়বেন না, ভালো নেই তিনি, ভীষণ কাশি, শরীর দুর্বল, হাত-পা ঠাণ্ডা। যেন তাঁর যথার্থই কোন কষ্টবোধ নেই। পায়ের কাছে ছেলে তাঁর বসে আছে। তিনি কত সবল দেখানোর জন্যই যেন লেপের ভিতর থেকে শীর্ণ হাতটা বের করার চেষ্টা করলেন। হাওয়ার ওপর দুলিয়ে দেখাতে চাইলেন, তিনি কত সবল আছেন, সুস্থ আছেন। চন্দ্রায়ণের সময় তাঁর এখনও হয়নি।

চন্দ্রনাথ বাপের এসব বোঝেন। মনে মনে তিনি হাসলেন। কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। চন্দ্রনাথ হাতটা আবার লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, আমি চন্দ্রনাথ বাবা।

—তুমি যে চন্দ্রনাথ, তা বুঝি আমি টের পাই নাই মনে কর?

একেবারে বালক হয়ে গেছেন তিনি। চন্দ্রনাথ পাছে চন্দ্রায়ণের কথা বলে, ভয়ে এমন বলছেন মানুষটা। তিনি এবার বললেন, সোনা, লালটু, পলটুর উপনয়ন দিতে চাই। মাঘ-ফাল্গুনে দিন আছে।

—তা ভাল। বলেই যে কাশিটা এতক্ষণ গলার কাছে আটকে ছিল সেটা মুখে তুলে আনলেন। তারপর কোৎ করে গিলে ফেললেন কফটা। চন্দ্রায়ণ করতে বলবে এই ভয়ে

তিনি শরীর শক্ত করে রেখেছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু ছেলে যখন বলছে উপনয়নের কথা তখন একবার উঠে বসা যায় কিনা চেষ্টা করা যাক।

—আমারে চন্দ একটু ধর। উইঠা বসতে পারি কিনা দ্যাখি। চন্দ্রনাথ বললেন, বারান্দার রোদ নামুক, আপনেরে নিয়া যামু বারান্দায়।

বুড়ো মানুষটা এবার যথার্থই প্রাণ ফিরে পেলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, ধনবৌমার দিকে লক্ষ রাইখ। সন্তানাদি পেটে। সন্তানাদি কথাটা বললেন এই জন্য যে, পৃথিবীতে এই যে একটা জগৎ মা জননীরা গর্ভের ভিতর সৃষ্টি করে রাখে, সেই জগৎ সম্পর্কে এখন তার শিশুর মতো পুলক অথবা কৌতূহল, ক্রমে ছোট হতে হতে একেবারে অণুর মতো হয়ে যাওয়া, এবং সেই সৃষ্টির আঁধারে প্রবেশ করা, প্রবেশ করার আগে অন্ধকারের ভয়। একবার প্রবেশ করে গেলে ভয় থাকে না। সেই জগৎ, যেখানে তিনি কিছুক্ষণের জন্য বিচরণ করবেন। অন্তহীন নীহারিকাপুঞ্জে তার অস্তিত্ব ক্ষণে ক্ষণে নক্ষত্রের মতো আকাশের গায়ে জ্বলতে থাকবে। তারপর তিনি শিশির পাতের মতো কোনও ঝিনুকের অন্ধকারে টুপ করে একদা ঝরে পড়বেন পৃথিবীর মাটিতে। তার জন্ম হবে আবার। আবার সেই শৈশবের খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে এই বৃক্ষের নিচে সেই আদি অন্তহীন আঁধারের প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার না করে পারলেন না। প্রায় যেন গৌরবে বহুবচনের মতো। সুতরাং তিনি সন্তান না বলে সন্তানাদি কথাটা ব্যবহার করলেন।

চন্দ্রনাথ বসে বসে বাবার মুখ দেখলেন। বাবার সেই মহিমান্বিত চেহারার সাদৃশ্য এই মানুষের মুখে কোথাও খুঁজে পেলেন না। কতকাল থেকে তিনি এই বিছানায় কালাতিপাত করছেন। এবং এই কালাতিপাতের সময় শরীর ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে। হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। এত হাল্কা যে চন্দ্রনাথ কত অল্প আয়াসে তাঁকে একটা ডল পুতুলের মতো পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়। বারান্দায় যেখানে রোদ এসে নেমেছে সেখানে দু' পাশে বালিশ দিয়ে এক ছোট্ট পুতুলের মতো বসিয়ে দিলেন। বসতে পারেন না, তবু দুহাত সামনে বিছিয়ে যেমন শিশুদের ছবি তোলা হয় তেমনি তাঁকে চারপাশের বালিশে রেখে দেওয়া হল। দাঁত নেই। চোখ অন্ধ। এক বীর্যবান মানুষ এই সংসারে শতবর্ষের আয়ুতে আবার সেই আঁধারে ভ্রূণের মতো প্রবেশ করবেন। ক্রমে ভ্রূণ থেকে কীটে এবং তারপর সেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলে পৃথিবীর শস্যভরা মাঠে নতুন আলোক বর্ষিত হবে। তখন সাদা জ্যোৎস্নায় উপনয়নের বালক সন্ন্যাসীরা মাথা নেড়া করে নদীর জলে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাতের অঞ্জলিতে নদীর জল পূর্বপুরুষকে করবে। বাপের তৃষ্ণার্ত মুখ জলদান দেখে, চন্দ্রনাথের এমনই মনে হল।

আবার সেই বাদ্য বাজছিল। ঢাক-ঢোল-সানাই বাজছে। জল ভরতে গেছে মেয়েরা। মাথা নেড়া করছে সোনা লালটু পলটু। উৎসবের বাড়ি, কত আত্মীয়-কুটুম। তাদের সন্তান-সন্ততি। সব ছেলেপুলে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা বুঝি তামাশা দেখছে— এমন এক ভাব চোখেমুখে। ওরা কেউ কেউ ঠাট্টা-তামাশা করছে। সোনা শক্ত হয়ে বসে আছে, সে মাথা নেড়া করবে না। তাদের তাড়িয়ে না দিলে মাথা নেড়া করবে না। যারা হাসছিল তাদের তাড়িয়ে দিল ঈশম। এবার মাথা পেতে দিয়েছে সোনা। ঈশমের এমন খুচরো কাজ কত। ঈশম অবসর পাচ্ছে না। সে এইমাত্র নয়াপাড়া থেকে ঘুরে এসেছে আবার তাকে বিশ্বাসপাড়া যেতে হবে। যাবার আগে সে গাছে উঠে আমের শুকনো ডাল, বেলপাতা, পল্লব, হোমের জন্য পেড়ে রেখে দিয়েছে।

রান্নাঘরের পাশে কাল সারাদিন খেটে ঈশম একটা নতুন চালাঘর তুলেছে। বড় বড় ডেগ, হাঁড়ি, পেতলের বালতি, মালসা চালার নিচে। ফুলকপি, বাঁধাকপি কাটছে হারান পালের বৌ। বড় মাছ কাটছে দীনবন্ধুর দুই বউ। বড় ডেগে গরম হচ্ছে দুধ। মুসলমান পাড়া থেকে সবাই দুধ দিয়ে যাচ্ছে। শচি সব দুধ মেপে রাখছে।

এই উৎসবের বাড়িতে একমাত্র ধনবৌ কিছু করতে পারছে না। পেটে তার সন্তান। সন্তান্ পেটে নিয়ে শুভকর্মে হাত দিতে নেই। ধনবৌ চুপচাপ বারান্দার এক কোণে বসে শুধু পানের খিলি বানাচ্ছে। সুতরাং বড়বৌর উপরই চাপ বেশি। বড়বৌ এই শীতেও ঘেমে গেছে। খুব ভোরে উঠে স্নান করেছে বড়বৌ। লালপেড়ে গরদ পরেছে। আত্মীয়স্বজনদের জন্য সকালের জলখাবার ঠিক করতে হয়েছে। দক্ষিণের ঘরে ফরাস পাতা হয়েছে। পঞ্চমীঘাট এবং ভাটপাড়া থেকে বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন। ওঁরা ধর্মাধর্মের তর্কে ডুবে আছেন। ওঁদের জন্য বাটিতে গরম দুধ এবং মুড়ি, দুটো সন্দশ জলখাবার গেছে। সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য ঘাটের পাড়ে জমি সাফ করে দেওয়া হয়েছে। সারা সকাল পণ্ডিতেরা সেখানে বসে আহ্নিক করেছেন।

যারা দূর থেকে আসছে তাদের চন্দ্রনাথ দেখাশোনা করছেন। ভূপেন্দ্রনাথ টাকা-পয়সা এবং কোথায় কি প্রয়োজন হবে সারাক্ষণ তাই দেখাশোনা করছেন। কেউ বেশিক্ষণ

এক জায় গায় দাঁড়াতে পারছে না। শশীভূষণ বৈঠকখানায় পণ্ডিতদের সঙ্গে ন্যায়নীতির গল্পে ডুবে গেছেন।

মাঝে মাঝে ভূপেন্দ্রনাথ কাজ ফেলে পণ্ডিত প্রবরদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকছেন। কোনও ত্রুটি যদি হয়ে থাকে—মার্জনা ভিক্ষার মতো মুখ—আমাদের এই পরিবারে আপনাদের আগমন বড় পুণ্যের শামিল। এভাবে তিনি ঘুরে ঘুরে সবার কাছে পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। আপনাদের আগমনেই এই উৎসব সফল, এমন নিবেদন করছেন।

শচীন্দ্রনাথ তখন শশীবালার কাছে গিয়ে বললেন, মা, তোমার আর কি লাগবে?

শশীবালা আলু, বাঁধাকপি, পটল, কুমড়ো এসবের ভিতর ডুবে ছিলেন। যত লোক খাবে তার হিসাব মতো সব বের করে দিচ্ছেন শশীবালা। মায়ের পাশে শচীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না।

সুলতানাদির বাজারে আর বারদীর হাট থেকে মাছ এসেছে। তবু মাছে কম হবে কি-না, একবার দেখা দরকার। পুকুরে জাল ফেলা যদি দরকার হয়, সেজন্য গগনা জেলে জাল নিয়ে পুকুর পাড়ে বসে রয়েছে। তিনি গগনা জেলেকে কিছু মাছ তুলে দিতে বললেন।

তা ছাড়া শচির পকেটে ঘড়ি, তিনি মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে কখন বিদ্ধিতে বসাব সময় কাটার ভিতর চলন দেওয়া হবে এবং হোম ক'টা থেকে ক'টার ভিতর শেষ করা দরকার, আহ্নিক হোমের আগে না পরে করাতে হবে এসব হিসাব রাখছেন বলে ভূপেন্দ্রনাথ আর তাঁকে অন্য কোনও কাজের ভার দেন নি।

তিনি তাড়াতাড়ি পুকুরপাড়ে এসে দেখলেন এখনও কামানো হয়নি। সোনার মাথার অর্ধেকটা চাঁচা হয়েছে। সাদা ধবধবে মাথা, পিঠে চুল, শীতে সোনা কাঁপছে। সোনা জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে। কান ফুটো করা হবে এই বলে সকলে ওকে ভয় দেখাচ্ছে। সে ভয়ে শক্ত হয়ে আছে! ভূপেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, না কান তোমার কেউ ফুটা করবে না। ভূপেন্দ্রনাথ সোনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। যারা পুকুরে জল ভরতে গেছে ওরা ফিরে এলেই স্নান। হলুদ রাঙানো কাপড় পরেছে সোনা। হলুদ মেখে স্নান করানো হবে। স্নানের শেষে ওরা নতুন কাপড় পরবে। সোনার মাথা নেড়া হলে ভূপেন্দ্রনাথ মাথায় হাত রাখলেন। ছোট্ট একটা শিখা তালুতে। সোনা দু'বার শিখাতে হাত রেখে কেমন পুলক বোধ করল।

এবং তখন গান হচ্ছিল পুকুরপাড়ে। যারা জল ভরতে গেছে তারা গান গাইছে। সুর ধরে অদ্ভুত সব গান। সোনা, লালটু, পলটুর মঙ্গল কামনায় গান গাইছে। এরা এই সংসারে বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে ওরা এক ধর্ম প্রচারে ডুবে যাবে—সে ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের ভিতর তুমি মহাভারতের

মানুষ, এমন যেন এক বোধ গড়ে দিতে চাইছে তারা।

সোনা যেন একবার নদীর পাড়ে ল্যাণ্ডোতে ফিরতে ফিরতে ভেবেছিল—সে ক্রমে উপকথার নায়ক হয়ে যাচ্ছে, আজও সে তেমনি নায়ক, তার জন্য কী সব জাঁকজমক। এদিনে ফতিমা কাছে নেই। থাকলে কী না সে খুশি হতো।

কিন্তু নতুন কাপড় পরার সময়ই যত গণ্ডগোল দেখা গেল। পিসিমার ছোট ননদের মেয়ে দীপালি দাঁড়িয়ে আছে। শীতের রোদে ওদের স্নান করানো হচ্ছে। সেই ঢাক-ঢোল বাজছে, সানাই বাজছে। শুভকার্যে উলুধ্বনি, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ওড়ার মতো যেন ওদের মাথায় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সোনা কাপড় পরে না, পরার অভ্যাস নেই। সে কাপড় পাল্টাবার সময় দেখল ভিড়ের ভিতর থেকে দীপালি তাকিয়ে আছে। ওর ভীষণ লজ্জা লাগছিল। সে দু'হাতে দশহাতি কাপড় কোমরে জড়িয়ে রেখেছে, ছাড়তে পারছে না, ছেড়ে দিলেই সে নেংটো হয়ে যাবে। নেংটো হয়ে গেলে দীপালি ওর সব দেখে ফেলবে—সে শীতের ভিতর হি হি করে কাঁপছে অথচ কাপড় ছাড়ছে না। সোনা এ-সময় তার জেঠিমাকে খুঁজছিল।

পিসিমা বললেন, কাপড়টা ছাড়।

সে কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

মেসোমশাই এসে বললেন, কি সোনা! শীতে কষ্ট পাইতাছ ক্যান? কাপড় ছাড়।

সোনা আবার তাকাল।

লালটু বলল, কী আদর আমার! জ্যেঠিমা না আইলে তিনি কাপড় ছাড়তে পারতাছে না।

তখন এল বড়বৌ। —কী হয়েছে সোনা? এখনও তুমি ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছ!

সোনা এবার চার পাশের ছোট ছোট মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বড়বৌ বলল, ও তার জন্য। বলে সে সোনার হাঁটুর কাছে পা ভাঁজ করে বসল। —আমার কত কাজ সোনা! তোরা যদি এমন করিস তবে কাজের বাড়িতে চলে?

সোনা কিছু শুনছে না মতো হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বড় বৌ শুকনো কাপড়টা আলগা করে আড়াল দিয়ে ভিজা কাপড়টা খুলে ফেলল। তারপর সুন্দর করে ধুতিটা কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিল। কাপড়টা সোনার মাপ মতো নয়। বড় বলে কিছুটা জবুথবু অবস্থা সোনার। সে নিজের কাপড়ে প্যাঁচ খেয়ে কখনও উল্টে পড়ে যেতে পারে। সেজন্য বড়বৌ কাপড়ের কোঁচাটা কোমরে গুঁজে দিল।

এবার ওরা গিয়ে বসল আচার্যদেবের সামনে। আচার্যের আসনে বসে আছেন পণ্ডিত সূর্যকান্ত। তিনি দীর্ঘ এক পুরুষ এবং সূর্যের মতোই আজ তাঁর দীপ্ত চোখ-মুখ।

তিনি যেন তিন বালককে, কঠোর চোখে দেখতে থাকলেন। হে বালকেরা তোমাদের পুনর্জীবন হচ্ছে, এমন চোখে দেখছেন। বালকদের মুখ দেখে তিনি বুঝতে পারছেন, এত বেলা হয়ে গেছে, এখনও সামান্য জলটুকু পর্যন্ত ওরা খেতে পায়নি। ফলে চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। এবার তিনি হাঁক দিয়ে জানতে চাইলেন, ষোড়শ মাতৃকার কতদূর, বিদ্ধি শেষ হল কিনা, না হলে এই ফাঁকে চলনের কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারে।

পাল্কিতে বসার সময় সোনা দেখল দীপালি ওর ও-পাশে চু পচাপ উঠে বসে আছে। সোনার গলায় পদ্মফুলের মালা। কপালে চন্দনের ফোঁটা। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হরিণের চামড়ার ওপব সে বসে রয়েছে। আর কত রকমের ফুল ছড়ানো সেই হরিণের চামড়ার ওপব। তিনটে পাল্কি যাত্রা করবে। ওরা যতদূর প্রতিদিন গ্রাম-মাঠ ভেঙে নদীব পাড়ে যায় ততদূর এই পাল্কিতে ওরা চলে যাবে।

সোনা দীপালিকে পছন্দ করে না। কারণ দীপালি ঢাকা শহরে থাকে। সে বড় বড় কথা বলে সোনাকে অযথা ছোট করতে চায়। আজ সে দেখছে সেই দীপালি সব সময় কাছে কাছে থাকতে চাইছে।

সোনা প্রায় ভিতরে বরের বেশে বসেছিল। সে দীপালির দিকে তাকাচ্ছে না। পাল্কিটা দুলছে। ওর ভয় ভয় করছিল। কিন্তু চলতে থাকলে ওর আর ভয় ভয় করল না। পিছনে বাজনা বাজছে। সানাই বাজছে। প্রতিবেশীরা সকলে নেমে এসেছে। ওরা নরেন দাসের মাঠে এসে নামল। তারপর গোপাটে। গোপাট ধরে অশ্বত্থ তলা পার হবার সময় মনে হল পাল্কি টোডারবাগের কাছে এসে গেছে।

দীপালি বলল, সোনা, আমারে দ্যাখ।

—কি দ্যাখুম?

—আমি কি সুন্দর ফ্রক পরেছি।

সোনা বলল, বাজে ফ্রক।

দীপালি বলল, তুই কিছু জানিস না।

সোনা উঁকি দিল এবার। আর তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল মঞ্জুর মিঞার বড় বটগাছের নিচে অনেকের সঙ্গে ফতিমা দাঁড়িয়ে আছে। সে কোন পাল্কিতে সোনাবাবু যায় দেখতে এসেছে। বড় দ্রুত যাচ্ছিল বেহারা। নিমেষে মুখটা মিলিয়ে গেল। সোনা উঁকি দিয়েও মুখটাকে ভিড়ের ভিতর আর খুঁজে পেল না।

পাল্কিটা পাশ কাটিয়ে গেল ফতিমার। কী সব সুমিষ্ট ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেল। ভুর-ভুর গন্ধে চারপাশটা ভরে গেল। সোনাবাবু ফুলের ওপর বসে আছে। প্রায় যেন রাজপুত্রের শামিল। পাশে কে একটি মেয়ে। ফতিমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল আসছে। সে সোনাবাবুর সঙ্গে একটা কথা বলতে পারল না।

সামুর মা সাদা পাথরের রেকাবিতে তিনটে তাঁতের চাদর এবং তিনটে আতাফল রেখে দিয়েছে। ওর কোমরের ব্যথা আবার বাড়ছে। মাঝে কিছুদিন বিছানায় পড়েছিল, এখন সে লাঠি ঠুকে চলাফেরা করতে পারছে। ঠাকুরবাড়িতে উপনয়ন। সে বাবুরহাট থেকে তিনটে তাঁতের চাদর আনিয়ে রেখেছে। এ-সব নিয়ে তার যাবার কথা। কিন্তু এই শরীরে সে যাবে কী করে। সামুর স্ত্রী অলিজানও চিন্তিত। এই উপনয়নে অথবা বিবাহে, যখন যা কিছু হয়, সামুর বাপ বেঁচে থাকতে কিছু-না-কিছু দিয়েছে। এবং সামুর বিয়েতেও বুড়ো কর্তা নারায়ণগঞ্জ থেকে পাছা পেড়ে শাড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন।

এমন শুভ দিনে, এমন উৎসবের সময়ে ফতিমা সোনা বাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারল না—ওর ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল খুব। সে দেখল, মা একটা সাদা পাথরের রেকাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাকে দিয়ে যে পাঠায়! ফতিমা বলল, মা, আমি নিয়া যামু। দাও আমারে।

তখন সেই পণ্ডিত সূর্যকান্ত আচার্যদেব, ঋজু চেহারা— বয়সের ভার যাকে এতটুকু অথর্ব করতে পারেনি। নামাবলী গায়ে, সাদা গরদ পরনে এবং শিখাতে জবাফুল বাঁধা— তিনি জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন এবং সাধুভাষায় নানারকম নির্দেশাদি সহ: মানবক ক্ষৌরাদিকার্য সমাপন পূর্বক স্নান করিয়া গৈরিকাদিরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিবেন। পৈতা উপলেপনাদি মোক্ষণ সংস্কারান্ত কর্ম করিয়া যথাবিধি চরু গ্রহণ করিবেন, যথা— সদাসম্পতয়ে জুষ্টং গৃহামি, এই বলে তিনি আঃ আঃ আঃ যেন অগ্নেহ স্বাহা-আঃ আঃ অনেক দূরে দূরে এই উচ্চাবণ প্রতিনিয়ত বাতাসে ধ্বনি তুলে গ্রামে মাঠে ছাড়িয়ে পড়ছে। ফতিমা গ্রাম থেকে নেমে গো পাটে পড়তেই সেই গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। যেন কোনও মহাঋষি হাজার হাজার হোমের কাষ্ঠ জ্বেলে কলসী কলসী ঘি ঢেলে দিচ্ছেন। তেমন এক পূত পবিত্র ধ্বনি ফতিমাকে আপ্লুত করছে। সে মাথায় রেকাবি আব কোঁচড়ে আতাফল নিয়ে ছুটতে থাকল।

অতঃপর আচার্যদেব বলিলেন, সমস্ত কার্য সমাপন পূর্বক একটি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধাবলম্বনভাবে কুমারের বাম স্কন্ধে দিবে। মন্ত্রক যথা— ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং... এমন সব মন্ত্র সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

সোনা আচার্যদেবের সামনে এবার অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বলল, ওঁ উপনয়ন্তু মাং যুগ্মৎ পাদাঃ।

আচার্যদেব বলিলেন, ওঁ উ পনেষ্যামি ভবস্তম। অনন্তর আচার্য অগ্নির উওবদেশে গমন পূর্বক চারিটি ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন। তাহার পর আচার্যদেব অগ্নির দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান হইলেন।

সোনার সম্মুখে যজ্ঞের কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইতেছিল। উজ্জ্বল অগ্নিশিখায় তাহাব মুখমণ্ডল কম্পমান হইতেছে। মনে হইতেছে মুখমণ্ডলে কে তাহার দেবীগর্জন লেপন করিয়াছে। মাথায় কিরণ পড়িতেছে। সেই আদিত্যের কিরণ। ক্ষুধায় কাতর। মুখমণ্ডল বড় বিষণ্ণ। ক্লান্ত। সে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিতেছে না। তার ঊরু কাঁপিতেছে। সে তবু আচার্যদেবের সম্মুখভাগে করপুটে দণ্ডায়মান। যজ্ঞ হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। ওর চক্ষুদ্বয় সহসা লাল অগ্নিবর্ণ ধারণ করিতেছে এবং সুবাসিত হোমের যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে মন্ত্রের মতো এক অপরিচিত বোধ ও বুদ্ধি উদয় হইবার সময়ে ভিতরে কী যেন গুড়ু গুড়ু করিয়া বাজিতেছে। সোনার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমি তৃষ্ণার্ত, জলপান নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত।

আচার্যদেব হাসিলেন। হাসিতে বিষাদ ফুটিয়া উঠিল। কৃচ্ছ্রসাধন নিমিত্ত এই উপবাস অথবা বলিতে পার সন্ন্যাস জীবনযাপন। তিনি এইবার ধীরে ধীরে ওর অঞ্জলিতে জল সিঞ্চন করিলেন। অতঃপর সেই অঞ্জলিতে স্বীয় অঙ্গুলি মিশ্রিত পূর্বক কহিলেন, বশিষ্ঠ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ ছন্দো অগ্নিদেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগ। তিনি কুমারকে অভিষেক করিলেন।

আত্তর আচার্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সূর্য দর্শন করাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, কিম নামাসি?

—শ্রী অতীশ দীপঙ্কর দেবশর্ম্মাহং ভোঃ! আচার্যদেবের পুনরায় প্রশ্ন, কস্য ব্রহ্মচার্য্যাসি?

এবার আচার্যদেব খুব আস্তে আস্তে কিছু মন্ত্র পাঠ করিলেন। সে তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিল না। সে সেই মুখের প্রতি অবলোকন পূর্বক অধোবদনে নিবিষ্ট হইল।

এভাবে সোনা যেন ক্রমে অন্য এক জগতে পৌঁছে যাচ্ছে। যা সে এতদিন দেখেছে এবং শুনেছে—এই জগৎ তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে সকালে উঠে যে সোনা ছিল, আর সে তা নেই। সে অন্য সোনা, সে পুত এবং পবিত্র। চারপাশে তার পবিত্রতার বর্ম পরানো হচ্ছে। মন্ত্র সে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারছে না, না পারলে চুপচাপ আচার্যদেবের দিকে তাকিয়ে থাকছে। কারণ আচার্যদেব এত দ্রুত মন্ত্র পাঠ করছিলেন যে সোনার পক্ষে অনুসরণ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সে শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকছে। হরিণের চামড়ার ওপর সে বসেছিল। সামনে কোষাকুষি, গঙ্গাজল, হাতে কুশের আংটি এবং বিচিত্র বর্ণের সব ফুল, দুর্বা, বেলপাতা, তিল, তুলসী।

আচার্যদেব কহিলেন, আচমন কর। সোনা আচমন করিল। আচার্যদেব কহিলেন, কুশের দ্বারা মাথায় জল সিঞ্চন কর। সে মাথায় জল সিঞ্চন করিল।

মন্ত্র পাঠের পর আচার্যদেব সন্ধ্যা পাঠের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিলেন।

তিনি কহিলেন, একদা সন্দেহ নামক মহা বলিষ্ঠ ত্রিংশতকোটি রাক্ষস মিলিত হইয়া সূর্যের সংহারার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণপূর্বক সন্ধ্যার উপাসনাকরতঃ সেই সান্ধ্যোপসনাকৃত বজ্রভূত জল প্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দৈত্যের বিনাশ সাধন করেন। এইজন্য বিপ্রগণ নিত্য সান্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। তারপরই তিনি কহিলেন, ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নৃপ্যাঃ...মরুদেশোদ্ভব জল আমাদের কল্যাণ করুক, অনুপদেশজাত জল আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউক, সাগরবারি আমাদিগের শ্রেয় বিধান করুক, এবং কূপজল আমাদিগের শুভদায়ী হউক। স্বেদাক্ত ব্যক্তি তরুমূলে থাকিয়া যে প্রকার স্বেদ হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নাত ব্যক্তি যেইরূপ শারীরিক মল হইতে মুক্ত হয়, জল আমাকে তদ্রুপ পাপ হইতে পরিত্রাণ করুক। হে জলসকল. তোমরা পরম সুখপ্রদ; অতএব ইহকালে আমাদিগের অন্ন সংস্থান করিয়া দাও এবং পরলোকে সুদর্শন পরম ব্রহ্মের সহিত আমাদিগের সম্মিলন করাইয়া দাও। স্নেহময়ী জননী যেমন স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ-বিধান করেন, হে ভুলসমূহ, তোমরাও তদ্রূপ ইহলোকে আমাদিগকে কল্যাণময় রসের দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। হে বারিসমূহ, তোমরা যে রস দ্বারা জগতের তৃপ্তি করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমাদিগের যেন তৃপ্তি জন্মে। তোমরা আমাদিগের সেই রসভোগের অধিকার প্রদান কর।

মন্ত্রপাঠের দ্বারা সোনার মুখমণ্ডল নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছিল। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের রৌদ্র। সম্মুখে সেই হোমাগ্নি। এবং কোষাকুষিতে তাহার হাত। আর আচার্যদেব যেন নিরত্তর তাঁহার নাভি হইতে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সোনা এইসব ক্রিয়া- কর্মাদির ভিতর এক দুয়ে রহস্যে প্রোথিত হইতেছিল।

তিনি কহিলেন, মহাপ্রলয় কানে কেবল ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। তখন সমস্ত অন্ধকারাবৃত ছিল। তদনন্তর সৃষ্টির প্রাক্কালে অদৃষ্টবশে সলিলপূরিত সাগর সমুৎপন্ন হইল। সেই সাগর-বারি হইতে জগৎ-সৃষ্টিকারী বিধাতা সঞ্জাত হইলেন। সেই বিধাতাই দিবা প্রকাশক সূর্য ও নিশা প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসরের কল্পনা করেন অর্থাৎ সেই সময় হইতে দিবারাত্রি, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত হইল।

সোনা ভাবছিল, তাহার নাম শ্রী অতীশ দীপঙ্কর দেবশর্মা। দেবশর্মা ভোঃ। ভোঃ শব্দ উচ্চারণে তাহার মনে হাসির উদ্রেক হইল। সে তাড়াতাড়ি হাসি নিবারণার্থে কহিল, সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম-ঋষি...

আচার্যদেব কহিলেন, 'সূর্য্যশ্চ মা' মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। প্রকৃতি ইহার ছন্দ। জল-দেবতা, এবং আচমন কর্মে ইহার প্রয়োগ হয়।... সূর্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি অমরগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞজনিত পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর ও শিশু দ্বারা যে পাপ করিয়াছি দিবা তাহা বিনষ্ট করুন। আমাতে যে পাপ আছে,

তৎসমস্ত এই সলিলে সংক্রামিত করিয়া, এই পাপময় সলিল হৃৎপদ্ম মধ্যগত অমৃতযোনী জ্যোতির্ময় সূর্যে সমর্পণ করিলাম। উহা নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক।

সোনা আর পারছে না, ওর তেষ্টা পাচ্ছে। সে বোধহয় পড়ে যেত—ফতিমা ঠাকুরঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। সে আলগাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সে নাকে নথ পরেনি। পায়ে মল পরে আসেনি। ওর লম্বা ফ্রক ঝলমল করছে এবং ওড়না দিয়ে মাথায় ঘোমটা। সোনা জানে না ওর ঠিক পিছনে এক বালিকা চুপচাপ বসে সোনাবাবুর মন্ত্রপাঠ শুনছে। যত শুনছে তত বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে। সে এইসব সংস্কৃত শব্দ জানে না। সে কোনও অর্থ বুঝতে পারছে না। অথচ কেমন এক ভাবগম্ভীর আওয়াজ এই উৎসবকে মহিমামণ্ডিত করছে। বাবু যে দাঁড়াতে পারছে না, পা কাঁপছে, সে শেফালি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে তা টের পাচ্ছিল।

সূর্যকান্ত বুঝতে পারলেন উপবাসে সোনা কাতর। তিনি তাকে এক গ্লাস জল খাবার অনুমতি দিলেন। সে এক নিঃশ্বাসে জলটুকু খেয়ে ফেলল। ফতিমার মনে হল এবাব সোনাবাবু ওর দিকে তাকাবে। সে তিনটে চাদর তিনটে আতাফল এবং তিনটে আমলকী নিয়ে এসেছে। এগুলি সে মাটিতে রেখে দিলে, বড়বৌ গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে নিয়ে গেছে। গঙ্গাজল বড় দুর্লভ বস্তু। একঘটি জল এনে সেই জল শিশি করে বাড়ি বাড়ি এবং এক কলসি জলে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো ব্যবহার ফতিমা জানে গঙ্গাজল ছিটিয়ে না নিলে এই উৎসব ওদের পবিত্র থাকবে না। বড়বৌ ওকে গাছটার নিচে বসতে বলে গেছে। সে বলে না গেলেও বসে থাকত। এত কাছে এসে সে সোনাবাবুর পৈতে হচ্ছে, না দেখে চলে যেতে পারত না। সোনাবাবু কখন ওকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে সেই আশায় অপলক তাকিয়ে আছে।

এবার ওরা পুবের ঘরে ঢুকে যাবে। এই ঘরে ঢুকলে ওবা আর তিনদিন বের হতে পারবে না। এই তিনদিনের অজ্ঞাতবাস সোনা অথবা লালটু পলটুর কাছে প্রায় বনবাসের মতো। ওরা ঘরে ঢুকে গেল। এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ফতিমার দিকে সোনাবাবু একবারও তাকাল না।

ওরা তিনজন পাশাপাশি দাঁড়াল। হাতে বিশ্বদণ্ড। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, গৈরিক রঙের একখণ্ড কাপড় কোমরে জড়ানো। প্রথমে ধনরৌ এবং বড়বৌ এল ডালা সাজিয়ে। ওরা তিনজনকে তিনটে সোনার আংটি দিল।

সোনা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ভবভু ভিক্ষাং দেহি।

ভিক্ষা দিতে গিয়ে সোনার মুখ দেখে ধনবৌ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একেবারে ঋষি বালকের মুখ। যেন কোন অরণ্যের ছোট্ট বিহারে ভিক্ষু বিদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এখন মুখ দেখলেই ধনবৌর ভয় হয়। পাগল মানুষের কথা মনে হয়। বংশের কেউ -না-কেউ কোনও না কোনওদিন নিরুদ্দেশে চলে যাবে। সোনার মুখ ঠিক এর পাগল জ্যাঠামশাইর

মতো। সোনা মাকে দেখছে। কারো ছেলের মুখের দিকে আর তাকাতে পারছে না। যেন এক্ষুনি জড়িয়ে ধরে ধরে কেঁদে ফেলবে।

লালটুর এ জন্য ধনবৌর এত কষ্ট হয় না। সে মায়ের পাশে শোয় না। সে আলাদা শোয়। নিজের দায়িত্ব যেন নিজেই নিতে পেরেছে। ধনবৌ সোনাকে ভিক্ষা দিয়েই তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল।

বড়বৌ তখন এক ছোট্ট হাড়িতে নানা রকমের মিষ্টি সাজাচ্ছিল। খুব ঘড়ের সঙ্গে কলাপাতা দিয়ে মুখটা বেঁধে দিয়েছে। ঈশম, এত লোকজন পা পা ফেলতে পারছে না। কখন কাকে ছুঁয়ে দেবে এই ভয়। সে ফতিমাকে নিয়ে এল। বড়বৌ ঈশানের পঙ্গু বিবির জন্য আলাদা একটা বাসনে এটা মিষ্টি তুলে রাখল। ফতিমাকে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যা। তোর নানীকে বলবি, শরীর ভালো হলে যেন একবার আসে। ওদের যেন আশীর্বাদ করে যায়। কতদিন দেখি না।

ফতিমা ঘাড় নাড়ল।

—তোর বাবা এসেছে?

ফতিমা বলল, না।

—নিয়ে যেতে পারবি তো? না ঈশম দিয়ে আসবে?

ফতিমা বলল, পারমু।

—ফেলে দিস না কিন্তু।

ঈশম মিষ্টির হাঁড়িটা ওর হাতে দিল। কিন্তু হাতে নিতে অসুবিধা। ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে এসেই হাঁড়িটা মাথায় তুলে নিল। তারপর যেমন সে গোপাটে নেমে এসেছিল সাদা পাথরের থালাতে তিনটে তাঁতের চাদর নিয়ে, আতাফল নিয়ে, তেমনি সে এখন মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে ছুটছে। ছুটছে আর সোনাবাবু তার দিকে তাকাল না ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। সে কতক্ষণ থেকে শেফালি গাছটার নিচে বসেছিল—একবার অন্তত দেখুক সোনাবাবু, সুন্দর ফ্রক পরে সে এসেছে, সে তার সবচেয়ে ভালো ফ্রক গায়ে দিয়ে এসেছে। সে কত কথা বলবে বলে এসেছিল অথচ সোনাবাবু একবার চোখ তুলে তাকাল না। ফতিমা এখন অভিমানে ফেটে পড়ছে। আর তখন দেখল হাজিসাহেবের সেই খোদাই ষাঁড়টা। টের পেয়েছে ছোট্ট এক বালিকা হাঁড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে। ষাঁড় তো এখন আর জীব নেই। ধর্মের ষণ্ড হয়ে গেছে। সে ফতিমাকে দেখেই শিঙ বাগিয়ে ছুটে আসছিল।

ফতিমার প্রাণ তখন উড়ে যাচ্ছে। এক চোখ কানা ষণ্ডটা ওকে দেখে ছুটে আসছে। পাগলের মতো, উন্মত্তপ্রায় ছুটে আসছে। কে কাকে রক্ষা করে-তাবৎ জীবের ওপর রোষ তার। মুখের একটা দিক পুড়ে বীভৎস। চামড়া ঝুলে গেছে। ষণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে

হলে যেদিকে চোখটা নেই, সেদিকে লড়াই আরম্ভ করতে হয়। মেয়েটা হা হা করে চিৎকার করতে করতে ছুটছে, লেজ তুলে ধর্মের ষণ্ড ছুটছে। পাগল মানুষ অশ্বত্থের ডালে বসে মজা দেখছেন। মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। এই দুপুরে সহসা এই চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না কেউ। সামনে শীতের মাঠ। মেয়েটা কিছুতেই মিষ্টির হাঁড়িটা ফেলে দিচ্ছে না। প্রাণপণ সে চেষ্টা করছে গ্রামে উঠে যাবার। কিন্তু পিছনে তাকাতেই সে আর নড়তে পারল না। ষণ্ডটা ক্ষেপা ঝড়ের মতো ওকে ফালা করে দেবে। ফতিমা ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

আর কী এক জাদুর মায়া, পাগল মানুষ যেন সব জানেন, তিনি সেই গাছের ডালে বসে বুঝেশুনে কোন ফ্রন্ট থেকে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই চালানো যায়, এই ভাবতেই মনে হল, গাছের ডাল নিচু—অনেকদূর পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা জমিতে চলে গেছে। সে ডালে বসে হাত বাড়ালেই মেয়েটাকে তুলে নিতে পারবে। এক চোখ কানা জীব টের পাবে না কোথায় গেল সামুর মেয়েটা। ক্ষেপা ঝড়ের মতো ষণ্ডটা যেই না এসে পড়ল তিনি হাতে আলগোছে যেমন এক দৈত্য ছোট্ট পুতুল তুলে নেয় তেমনি তুলে নিয়ে ডালে বসিয়ে দিলেন ফতিমাকে আর হা হা করে হাসতে থাকলেন। ষণ্ডটা ভীমরুল কামড়ালে যেমন এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছুটে বেড়ায় তেমনি সে ছুটে বেড়াতে থাকল। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ গায়ের জামা খুলে ষণ্ডটাকে নিচে দোলাতে থাকলেন। যেন তিনি ষণ্ডের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন। তাঁর হাতের কাছে ফতিমা। কাঁপছে। চোখ বুজে আছে। মৃত্যুভয়ে চোখ খুলতে পারছে না। আর তখন মানুষটা ষণ্ডটাকে নিয়ে খেলায় মেতে গেছেন। সে পা দিয়ে জামাটা দোলালেই ওটা ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে আসে, সে জামাটা ওপরে তুলে নিলে ষণ্ডটা সামনের একটা কাফিলা গাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বার বার এমন হচ্ছে। এক সময় ফতিমা চোখ খুলল। দেখল যন্তের মুখ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, শিঙ দিয়ে রক্ত পড়ছে। আর পাগল মানুষের সঙ্গে ফতিমাও খেলাটা বড় মজার ভেবে গাছের ডালে বসে উকি দিয়ে থাকল।

ষণ্ডটা এক সময় বোকা ব'নে মাঠের দিকে চলে গেল।

ফতিমা এখন গাছের ডাল থেকে ইচ্ছা করলে লাফ দিয়ে নামতে পারে। কিন্তু ষণ্ডটা ভিটাজমিতে গিয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওদিকে তাকাচ্ছে না। শুধু বড় অশ্বত্থ গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন গাছের ডালে ওরা দু'জন পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দু'জনের মাঝখানে মিষ্টির হাঁড়ি। মণীন্দ্রনাথ হাঁড়িতে কি আছে দেখার জন্য উঁকি দিলেন। ছেঁড়া কলাপাতার ভেতর থেকে তিনি দেখতে পেলেন, সব রকমের মিষ্টি একসঙ্গে মিশে গেছে। ফতিমা হাত দিয়ে একটা বের করে মণীন্দ্রনাথের মুখের কাছে নিয়ে গেল। বলল, খাইবেন?

মণীন্দ্রনাথ হাঁ করলেন।

ফতিমা প্রথম একটা দিল। তারপর একটা। আবার একটা। দিচ্ছে আর খাচ্ছে। ফতিমার কী যে ভালো লাগছে। কৌতূহল ফতিমার এই মানুষ পাগল মানুষ, পীর না হয়ে যান না—যেন কথা ছিল এই দিনে ফতিমা যখন গাঁয়ে উঠে যাবে তখন এক ধর্মের ষণ্ড তাড়া করবে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে—এই পীর মানুষ বুঝি জানতেন। তিনি আগেভাগে এসে অশ্বত্থের ডালে বসে আছেন। সে দেখল এবার আর একটা মিষ্টিও নেই। ফতিমা বলল, আর কি দিমু খাইতে?

মণীন্দ্রনাথ এবার হাঁড়িটা তুলে যে রসটুকু পড়েছিল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেন।

ফতিমা বলল, বাড়িতে নিয়া যামু কি?

মণীন্দ্রনাথ এবার লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লেন। তার পর মেয়েটাকে কাঁধে তুলে খালি হাড়িঁটা হাতে নিয়ে গোপাট ধরে হটিতে থাকলেন।

বাড়িতে উঠে মণীন্দ্রনাথ অর্জুন গাছটার নিচে খালি হাঁড়ি নিয়ে ফতিমার সঙ্গে বসে থাকলেন। ওরা দু'জন যেন এ-বাড়িতে অনেক দূরদেশ থেকে উৎসবের খবর পেয়ে চলে এসেছে। সবাই খেয়ে গেলে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে—ওরা পাত পেতে খাবে।

ঈশম খালি হাঁড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। ফতিমা এবং পাগল মানুষ উভয়ের ভিতর যেন কতকালের আত্মীয় সম্পর্ক। ফতিমা মণীন্দ্রনাথকে ছেড়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ ষণ্ডটা ঠিক সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঈশম বলল, তুই বাড়ি যাস নাই?

—না।

বড়কতার লগে তর কি কাম?

ফতিমা দুষ্টুমি করে বলল, তাইন আমার সব মিষ্টি খাইয়া ফেলছে।

এই না যেই শোনা, ভূপেন্দ্রনাথ ছুটে এলেন। কি যে হবে! আবার মানুষটার পাগলামি বেড়ে গেল। ঈশমকে বললেন, আবার একটা হাঁড়ি নিয়া আয় মিষ্টির। হাঁড়িটা ঈশম তুই দিয়া আয়।

মণীন্দ্রনাথ বললেন, গ্যাৎচোরেৎশালা!

ফতিমা বলল, তাইন মিষ্টি খাইতে চায় নাই। আমি তাইনরে খাওয়াইছি।

ঈশমের মাথায় বজ্রাঘাত। সে তেড়ে গেল।—মাইয়া, তুই আর খাওয়ানের মানুষ পাইলি না। কী একটা অপরাধ হয়ে গেল! ঈশম বলল, মাইজা মামা, পোলাপান মানুষ, বোঝে না কিছু।

ভূপেন্দ্রনাথ কিছু বললেন না। বড়বৌ মিষ্টির হাঁড়ি আবার পাঠিয়েছে। ঈশম ওটা নিয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ ফতিমাকে নিয়ে ঈশমের পিছনে হাঁটছেন। তিনি ফতিমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। বাড়ি পৌঁছে না দিলে ষণ্ডটা আবার ঈশম এবং ফতিমা উভয়কে তেড়ে আসতে পারে। তিনি ষণ্ডটাকে ভয় দেখাবার জন্য অর্জুনের ডাল ভেঙে নিলেন। পাতা ছিঁড়ে ডালটা মাথার ওপর পাইক খেলার মতো বার বার ঘোরাতে থাকলেন।

তখন সারাদিন পর সোনা একটু কাঁচা দুধ, গণ্ডূষ করে ঘি এবং কিছু ফল আহার করছে।

বড়বৌ ওদের দেখাশোনা করছে। সে আর বের হবে না। বাটিতে কাঁচা মুগ ভিজিয়ে রেখেছে।

নানা রকমের ফল, তরমুজ ফুটি সব একটা পাথরে কেটে বেখেছে বড়বৌ।

লালটু হাপুস হাপুস ঘি খাচ্ছে। কাঁচা দুধ খেতে গিয়ে সোনার ওক উঠে আসছে। সে মধু খেল সামান্য। বেলের শরবত খেল। আর খেল দু'টুকরো ফুটি। আর কিছু সে খেতে চাইছে না।

বড়বৌ নানাভাবে ওকে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। তার কম বয়সে পৈতা। এত ছোট বাসে পৈতা হচ্ছে বলে ওর আদর বেশি। লালটু দু'তিনবার খেঁকিয়ে উঠেছে। বড়বৌ তখন ধমক দিয়েছে ওকে। তোমার এত মাথাব্যথা কেন। আমি তো খাওয়াচ্ছি ওকে। বলে দুটো কাঁচা মুগ ওর মুখের কাছে নিয়ে গেল। সোনা আর কিছুতেই খেল না।

বড়বৌ বলল, রাতে চরু হবে। খেয়ে দেখবি ভালো লাগবে।

সোনা উঠে পড়ল। সে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল সবাই খাচ্ছে।

বড়বৌ বলল, এই, কী হচ্ছে তোমার। এ-সব দেখতে নেই। দরজা বন্ধ করে দাও।

সোনা দরজা বন্ধ করে ফের এসে জ্যেঠিমার কাছে বসল। সে ভেবেছিল ক্ষুধার জন্য পেট ভরে খেতে পারবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে আর কিছুই খেতে পারবে না। পেটে যেমন ক্ষুধা ছিল তেমনি আছে। উঠানে সবাই খাচ্ছে, সে কিছু খেতে পারছে না, মাছ এবং বাঁধাকপির তরকারির গন্ধ আসছে। জিভে জল চলে আসছিল। যত জল চলে আসছিল তত সবার উপর তার রাগ বাড়ছে। সকাল থেকে তাকে নিয়ে যে কী সব হচ্ছে।

বড়বৌ বলল, তুই সোনা যদি এটুকু খেয়ে নিস তবে একটা আতাফল পাবি। সে আতাফল খেতে ভালোবাসে। সে বলল, কই দ্যাখি।

বড়বৌ তিনটা আতাই দেখাল। —তুই যদি আর একটু খাস তবে দেব।

সোনা শেষবার চেষ্টা করল, কাঁচা মুগের সঙ্গে নারকেল দিয়ে খেতে চেষ্টা করল। কোনওরকমে পাথরের সবটুকু খেয়ে হাত পাতল।

বড়বৌ একটা আতা দিল সোনাকে। সে তিনদিনে তিনটা আতা পাবে। এই আতাফলের লোভে যেন সোনা অনায়াসে তিনদিন এই ঘরে বনবাসী হয়ে কাটিয়ে দেবে। অথবা প্রায় সবটা ওর অজ্ঞাতবাসের মতো। সব সমবয়সী আত্মীয়স্বজনেরা এসে গোল হয়ে বসেছে। দীপালি আসছে বার বার। কেউ কেউ গল্প জুড়ে দিয়েছে এবং এক সময় রাত গভীর হলে বড়বৌ একপাশে, মাঝে সোনা লালটু পলটু এবং সব শেষে পাগল মানুষ খড়ের ওপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়বে।

ঠিক জানালার নিচে মাটির গাছা। তার উপর প্রদীপ। তিনদিন অনির্বাণ এই প্রদীপশিখা ওদের শিয়রে জ্বলবে। বড়বৌ রাতে ঘুম যেতে পারবে না ভালো করে। সলতে তুলে না দিলে কখন সলতে প্রদীপের বুকে এসে একসময় নিভে যাবে। নিভে গেলেই অমঙ্গল হবে ওদের বড়বৌর প্রায় সারারাত জেগে থাকার মতো, লক্ষ রাখা প্রদীপ না নিভে যায়। প্রদীপ নিভে যাবার আশঙ্কায় কিছুতেই ঘুম আসে না চোখে।

তখন স্মৃতির ভিতর বড়বৌকে ডুবে যেতে হয়। বালিকা বয়সেব কথা মনে হয়। যেন কোন কনভেন্টের সবুজ মাঠে সে ছুটছে। পাশে গীর্জা, গীর্জার চূড়োয় সোনালী রোদ, এবং ভাব ছায়ায় লম্বা আলখাল্লা পরে ফাদার দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে স্মিত হাসি। সব কিছু দেখছেন। গীর্জার ছায়ায় তাঁর অবয়ব কেন জানি বড়বৌর বড় দীর্ঘ মনে হত। তিনি বলতেন, আদিতে ঈশ্বর, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর শূন্য ছিল তখন। এবং অন্ধকার জলধির উপর ভাসমান এই জগতে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। ঈশ্বর, দীপ্তির নাম দিবস এবং অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। তখন বড় বেশি বালিকা বড়বৌ, বড় বেশি চঞ্চল, অথচ ফাদার গীর্জার বেদিতে উঠে দাঁড়ালেই সে কেমন গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই ঈশ্বর প্রতিম মানুষের কথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাইবেলের প্রাচীন মানব-মানবীর ভিতর হারিয়ে যাবার ইচ্ছা হতো। অথবা কোনও কোনও রাতে কেন জানি মনে হতে। সেই প্রাচীন মানব-মানবী আর কেউ নয়, সে নিজে। এবং অন্য একজন মানুষ কোথাও নিষিদ্ধ ফল খাবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে তখন। সে মাঝে মাঝে স্বপ্নে সেই মানুষের সঙ্গে নিষিদ্ধ ফল খাবার লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হতো সামনে এক নীল বর্ণের নদী। পাড়ে সে এবং তার প্রিয় পুরুষটি। ফাদার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছেন। যেন তিনি আর ফাদার নন। একেবারে দেবদূত। তিনি বলছেন হাত তুলে, দেয়ার ইজ লাইট। এমন কথার গীর্জার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বড়বৌর ঘণ্টা বাজাবার ইচ্ছা হতো। সংসারে সবাই পাগল মানুষকে ভালো করার জন্য সব কিছু করেছে, কেবল কেউ তাকে গীর্জায় নিয়ে যায়নি। বলতে পারেনি কেউ, দেয়ার ইজ লাইট। সিঁড়িতে উঠে গীর্জার সেই সুন্দর পবিত্র ধ্বনি শুনলে হয়তো তিনি আর পাগল মানুষ থাকতেন না। গীর্জার ছায়ায় দাড়িয়ে ফাদারের মতো প্রিচ করতেন। তিনি ভালো হয়ে যেতেন। তিনিও বলতেন, দেয়ার ইজ লাইট।

আবার এও মনে হয় বড়বৌর, মানুষটা এ পৃথিবীর মানুষ নয়। অন্য সৌরলোকের মানুষ তিনি। তাঁকে বুঝে ওঠার ক্ষমতা কারও নেই। সংসার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এই মানুষ নদীর পাড়ে পাড়ে বেঁচে থাকার রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি।

এখন সেই মানুষ ঘুমোচ্ছেন না জেগে আছেন টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁর জন্য দুটো আলাদা বালিশ রেখেছিল বড়বৌ। কিন্তু তিন বালক শুয়ে আছে, শিয়রে তাদের কোনও বালিশ নেই, শক্ত খড়কুটোর উপর কম্বলের উপর শুয়ে আছে এবং তাদের গায়ে কম্বল, আর কিছু নেই, নেই মানে থাকতে নেই, তাদের এই কৃচ্ছ্রতার প্রতি সমবেদনা জানানো বুঝি তাঁর ইচ্ছা, তিনি বালিশে মাথা রাখেননি। আলগা শুয়েছেন। ওদের মতো কম্বল গায়ে শুয়েছেন। বড়বৌ যতবার শিয়রে বালিশ দিয়ে এসেছে ততবার তিনি তা সরিয়ে দিয়েছেন।

সোনা ঘুমের ভিতর গায়ে কম্বল রাখছে না। সে দুপুরবেলায় কাপড় ছাড়ার সময় লজ্জায় ম্রিয়মাণ ছিল। এখন তার গৈরিক কাপড় খুলে কোথায় সরে গেছে। একেবারে সেই আদি মানব। বড়বৌ কম্বলটা ফের তুলে ওর শরীর ঢেকে দিল। এইসব কাজ তার এখন এই ঘরে। কে বালিশ রাখছে না মাথায়, কার হাত কম্বলের বাইরে এবং প্রদীপের আলো কমে গেলে বাড়িয়ে দিতে হবে—এইসব কাজের ভিতর তার রাত কেটে যাচ্ছে। পাগল মানুষ, ঘি-এর প্রদীপ, ফলমূলের গন্ধ আর রাতের নির্জনতা এবং পাখিদের ডাক তাকে বার বার অন্যমনস্ক করছে। মালতী নিখোঁজ। রঞ্জিত এখন কোথায়? ওর মনে হল তখন রাত পোহাতে বেশি আর দেরি নেই। সে এবার পুবের জানালাটা খুলে দিল। সে দেখল অনেক দূরে মাঠের ওপর দিয়ে লণ্ঠন হাতে কেউ এদিকে উঠে আসছে। যেন অর্জুন গাছটার নিচে উঠে আসার জন্য প্রাণপণ হাঁটছে। কে মানুষটা! সবাই যখন এ-পৃথিবীতে ঘুমিয়ে পড়েছে এমন কি কীট-পতঙ্গ, তখনও একজন মানুষের কাজ থাকে। তার কাজ ফুরোয় না। এতক্ষণ মনে হল, এ নিশ্চয়ই ঈশম হবে। সূর্যকান্ত পণ্ডিতকে বারদীর স্টিমারঘাটে তুলে দিয়ে ফিরে আসছে। এসে লণ্ঠন রাখবে দক্ষিণের ঘরে। হাত-পা ধোবে। নামাজ পড়বে। তারপর বালির চরে নেমে তরমুজ খেত পাহারা দেবে।

ঈশম বলেছিল, সাদা জ্যোৎস্নায় যখন বালির চরে পাতার ভিতর তরমুজ ভেসে থাকে এবং নদীতে যখন রাতের পাখিবা নামতে শুরু করে, দূরের মসজিদে আজান শুনলে তখন তার দু'হাত উপরে তুলে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তার ঘুম আসে না চোখে। সে সেই এক জগতের মায়ায় জড়িয়ে যায়। নির্জন মাঠে তার তখন কেবল মনে হয়, আল্লা এক, তার কোনও শরিক নেই।

বড় বৌ বলেছিল, আমায় একবার নিয়ে যাবে? সাদা জ্যোৎস্নায় আমি তোমার তরমুজ খেত দেখব। তোমার আল্লার করুণা দেখব।

ঈশম বলেছিল, গেলে আর ফিরতে ইচ্ছা হইব না।

বড়বৌ বলেছিল, কেন, আমি কি সেই মায়ায় জড়িয়ে যাব?

সাদা জ্যোৎস্না, নদীর চর এবং তরমুজ খেত আর নির্জন রাতের কোন এক দূরবর্তী আলোর মায়া বড়বৌকে টানে। কে জানত এই মায়ার টানে যথার্থই বড়বৌ এক রাতে পাগল মানুষের পিছু পিছু প্রায় সেই আদম ইভের মতো নদীর চরে নেমে যাবে।

সেটা এক বসন্তকালের ঘটনা।

আজ দণ্ডী বিসর্জনের দিন। খুব সকালে উঠে সোনা, লালটু, পলটু, আহ্নিক করল। সূর্যোদয়ের আগে ওদের আজ নদীর পাড়ে হাজির হতে হবে। আহ্নিক শেষে ওরা এসে উঠোনে দাঁড়াল। তরমুজ খেত পার হলেই নদী। সেই নদীতে ওরা ডুব দিতে যাবে। নদীতে বিল্বদণ্ড, যে দণ্ড এ-তিনদিন ওদের হাতে ছিল, তা আজ বিসর্জন দিতে যাবে। তারা গেরুয়া বসন ছেড়ে ফেলবে নদীর পাড়ে। ডুব দেবে জলে, ডুব দিলেই ফের তারা গৃহী হয়ে যাবে।

সূর্যোদয় না হতে আজ ঠাকুরবাড়ির সবাই নদীর পাড়ে নেমে যাবে—সোনাবাবুদের আজ দণ্ডী বিসর্জনের দিন, সে দিনে কি কি হয় সব জানে সামসুদ্দিনের মা। রাতে যখন ফতিমাকে পাশে নিয়ে শুয়েছিল, তখন গল্প করেছে, খুব ভোরে উঠে বাবুরা যাবে নদীতে ডুব দিতে। যা কিছু বসন-ভূষণ সন্ন্যাসীর সব ছেড়ে ফেলবে। ছেড়ে সব নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে।

ফতিমা ভোর রাতের দিকে একটা স্বপ্ন দেখল। রাজপুরীর পাশে এক বন। বনে এক রাজপুত্র জন্ম নিচ্ছে। বৈশাখী পূর্ণিমা। এক মহামানবের জন্ম হচ্ছে। তারপরই সে স্বপ্ন দেখল—কিছু জরাগ্রস্ত মানুষ হেঁটে যাচ্ছে শহরের উপর দিয়ে, কারা যেন হাজার হাজার মৃতদেহ ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে এবং এক পাগল মানুষ সবাইকে ঘরে ফিরতে বলছেন। পাগল মানুষের সঙ্গে সে-ও সবাইকে ঘরে ফিরতে বলছে। কিন্তু কেউ ফিরছে না। এমন কি সোনাবাবু ওর প্রিয় জ্যাঠামশাইকে ফেলে পালাচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেল ফতিমার। সে উঠে বসল। স্বপ্নটার সঙ্গে তার বইয়ের পড়া একটা ইতিহাসের দৃশ্য কিছু কিছু মিলে যাচ্ছে। সে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপরই সহসা মনে হল খুব সকালে, সুর্যোদয়ের আগে, এমন কী মনে হয় যখন কেউ ঘুম থেকে জাগবে না তখন ওরা নদীতে যাবে।

ফতিমা বাইরে এসে দাঁড়াল। মোরগগুলি ডাকছে। সে নেমে যেতেই মোরগগুলি মাঠে শস্যদানা খেতে বের হয়ে গেল। সে চুপি চুপি পেয়ারা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। মাঠ ফাঁকা। শস্যদানা কিছু আর এখন পড়ে নেই। সে দেখল, সোনাবাবুর নেড়া মাথা, হাতে বিশ্বদণ্ড, গায়ে গৈরিক বসন। সেই মহামানবের মতো মুখ চোখ সব। যেন খুব বড় হয়ে গেছে, লম্বা হয়ে গেছে সোনাবাবু। পাগল কর্তার মতো কোনওদিকে না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে একা মাঠের ভিতর নেমে গেল।

একটা মিছিল যাচ্ছে মানুষের। সবার আগে পাগল মানুষ। পরে সোনা লালটু পলটু। পিছনে আশ্বিনের কুকুর এবং চন্দ্রনাথ। শশীভূষণ, ভূপেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আরও পিছনে হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে যাচ্ছেন। সবার শেষে যাচ্ছে ঈশম। সে ভোর রাতে জেগে গেছে, কারণ তাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হবে সবাইকে। ভোর হয়ে গেছে, এবারে উঠতে হয়। সূর্য উঠতে দেরি নেই। সবাইকে ডেকে দেবার ভার ছিল তার।

ঈশম এই তিন ব্রহ্মচারীকে দেখবে না বলেই সকলের পিছনে আছে। দেখলে যা কিছু পুণ্য এই তিন বালক উপবীতের ঘরে অর্জন করেছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সে সেজন্য সবার শেষে, সবার পিছে থাকছে। ডুব দিয়ে উঠলেই আর কোনও বাধা-নিষেধ থাকবে না। সে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত পারবে।

ওরা যাচ্ছিল, ওদের উপবীত গলায়। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে। ওদের মুখ উপবাসে কাতর। তিনদিন শুধু ফলমূল আহার এবং দুপুরে চরু রান্না হয়েছিল গতকাল। খেতে বিস্বাদ। আজ পুকুরে জাল ফেলবেন চন্দ্রনাথ। এবং বড় মাছ, পাবদা কই অথবা রুই মাছের ঝালঝোল। এই নদীর জলে নেমে গেলে সেই এক খাদ্য বস্তু মনোরম গন্ধ বয়ে আনে। চন্দ্রনাথ, ওরা নদীতে ডুব দিয়ে উঠলেই পুকুরে গিয়ে জাল ফেলবেন।

সোনা ধীরে ধীরে জলে নেমে গেল! পাশাপাশি দাঁড়াল তিনজন। পুবের আকাশ গাঢ় লাল। ঠাণ্ডা। কনকনে শীত। মনে হচ্ছিল সমস্ত শরীর এই হিমঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাচ্ছে। তবুও ওরা দাঁড়াল। মন্ত্রমাঠ করল। প্রথমে উত্তরীয় ফেলে দিল জলে। তারপর বিশ্বদণ্ড জলের নিচে গুঁজে দিল। সেই দণ্ডী বিসর্জন দিয়ে আবার মন্ত্রপাঠ করল ওরা। এবার পরনে যে বাসটুকু ছিল তাও জলে ভাসিয়ে দিল। ওরা এবার সূর্য প্রণাম সেরে উঠে আসার সময় দেখল, ঈশম দাঁড়িয়ে আছে তরমুজ খেতে। ফতিমা ঈশমের পাশে দাঁড়িয়ে বাবুর দণ্ডী বিসর্জন দেখছে।

তখন পাগল মানুষ নদী সাঁতরে ও-পারে চলে যাচ্ছেন।

এ-ভাবেই ফতিমা দাঁড়িয়ে থাকে, বড় জ্যাঠামশাই নদী পার হয়ে যান। ফতিমা কী যেন বলতে চায় তাকে। মেলাতে যাবার সময় কী একটা কথা বলেছিল যার অর্থ সোনা বোঝেনি। মেলাতে ওরা একসঙ্গে পুতুলনাচ দেখেছিল একবার। রাবণের সীতা হরণ। এ-ভাবেই বর্ষা আসার আগে পাটগাছগুলি ক্রমে বড় হতে থাকে। শীতের ছুটিতে এসে দেখে

গেছে ফতিমা ফসলবিহীন মাঠ, আর গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে দেখতে পায় ফতিমা পাটগাছগুলি বড় হয়ে গেছে মাঠে। পাটগাছ বড় হলেই সে চুপি চুপি অতি সহজে এ-গাঁয়ে উঠে আসতে পারে। কেউ দেখতে পায় না, শহরের এক মেয়ে প্রায় চুপি চুপি অর্জুন গাছটার নিচে এসে বসে আছে। বাবুর জন্যে সে ঢাকা থেকে নানারকমের জলছবি নিয়ে আসে। কখনও রাজারানীর, কখনও প্রজাপতির। সে বাঘ-হরিণের ছবি আনে না। রাবণের সীতা হরণের ছবি আনতেও সে ভয় পায়।

এ-ভাবেই এ-দেশে নিদারুণ গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে। থেকে থেকে এ অঞ্চলে ঝড় হতে থাকে। বৃষ্টি হতে থাকে। আবার কী রোদ! রোদের উত্তাপে শস্যের চারা সব জ্বলতে থাকে।

ঈশমের শরীর ভালো ছিল না বলে মাঠে যায়নি। সে কয়েতবেল গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল। সোনা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবুজ মাঠ দেখছে। মাঠে মাঠে কত কামলা। ওরা রোদের ভিতরে মাথলা মাথায় জমিতে নিড়ি দিচ্ছে। এবং গান গাইছে। সোনা এবং ঈশম বুঝি সেই গান শুনছিল। বেশ জারি জারি সারি সারি গান, গমকে গমকে আকাশে বাতাসে বাজছে।

ঈশম গাছের ছায়া দেখে এখন বেলা কত বলতে পারে। এই বেলায় বেলায় জমিতে যারা নিড়ি দিচ্ছে, বেলাবেলি শেষ করতে পারবে কিনা, পারলে আকাশের যা অবস্থা, ঈশান কোণের একটা বড় মেঘ দেখে টের পায় ঈশম ঝড় উঠবে এখুনি। তাড়াতাড়ি মাঠে যা কিছু আছে, যেমন গাই-বাছুর, ঘাস পাতা সব নিয়ে আসতে হবে।

ঈশম পাশের জামরুল গাছটার দিকে তাকাল। গাছের ডাল, বড় বড় পাতা সব জামরুলে ঢেকে গেছে। সাদা সাদা ফল, কি মনোরম দেখতে, যেন সারা অঙ্গে লাবণ্য। ঝড় উঠলেই সব ঝুরঝুর করে পড়বে। মনে হবে কেউ যেন শুভ কাজে গাছের নিচে বড় বড় খৈ বিছিয়ে গেছে। ওর এই গাছ এবং ফলের জন্য মায়া হবে তখন।

তখন কালো রঙের মেঘটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কেমন ঘুরে ঘুরে অথবা আসলে নিজেই একটা মেঘের সমুদ্র তৈরী করে ফেলেছে। ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড ঢেউ তুলে মেঘগুলি ক্রমে কালো রং হয়ে যাচ্ছে। আকাশের অবস্থা বড় খারাপ। ঈশম বলল, চলেন কর্তা বাড়ি যাই।

কোথাও বজ্রপাতের শব্দ। দুটো একটা পাতা বাতাসে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে গেল। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল শরীরে। দারুণ যে গ্রীষ্ম গেছে এই বৃষ্টি অথবা ঝড়ে তা ঠাণ্ডা হবে। সোনার এই বৃষ্টিতে বড় ভিজতে ইচ্ছে হচ্ছে।

জমিতে, যারা পাট ধান নিড়ি দিচ্ছে, জমি থেকে তারা এখনও উঠছে না। তারা বৃষ্টির ঢলে জমি কাদা না হলে উঠবে না। ওরা প্রাণপণ কাজ করছে এবং উতরোলে গাইছে জারি জারি সারি সারি গান। যেন ঝাড় অথবা বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমস্বরে

গেয়ে চলেছে। এই শেষ সময়—আর ওরা এসে জমিতে বসতে পারবে না, নদীনালা পুকুর সব জলে ভরে আছে—বড় ঢল নামলেই নদীনালা উপচে জল জমিতে উঠে আসবে, তারপরই জোয়ারের জলে সরপুটি, বোয়াল মাছ। কাজ-কাম তখন কম। সারাদিন বৃষ্টি। বৃষ্টিতে মাছ মারো খাও।

সারা মাঠে মাথলা মাথায় মানুষ। জমিতে জমিতে জোয়ারের জল। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও পায়ের পাতা ডোবে না সারাদিন সারারাত বৃষ্টি। মাঠে মাঠে মানুষ। মাথলা মাথায় কোচ পলো হাতে মানুষ। ওরা সকাল-সন্ধ্যা কেবল মাছ মারবে। লণ্ঠন হাতে, কেউ পলো হাতে ঝুপঝাপ জল ভেঙে বড় মাঠে নেমে যাবে অন্ধকারে। অন্ধকারে মাছেরা মানুষকে এ-দেশে ভয় পায় না।

সুতরাং এই যে সব ঘাস এতক্ষণ রোদে পুড়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল দাবদাহে পৃথিবীর শেষ রসটুকু বুঝি এবার বিধাতা শুষে নেবেন, তখন আকাশে আকাশে মেঘের খেলা। জলে আবার দেশ ভবে যাবে। ওরা দু'জন তখনও ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ভিতর গান শুনছিল। কত ঘাস এবং প্রজাপতি এই মাঠে। পঙ্গু বিবির কথা মনে পড়েছে ঈশমের। আগামী হেমন্তে অথবা শীতে বুঝি তার বিবিটা মরে যাবে। ক্রমে বিবি বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এত কাজ এই সংসারে, সময় করে দু'বারের বেশি যে যাবে তা পর্যন্ত পারে না। মনে হয় কেবল কিছু-না-কিছু কাজ বাকি থেকে গেল।

ঝুপ ঝুপ করে এবার ঢল আরম্ভ হল। ঘাস পাতা সব ভিজে যাচ্ছে। জল পড়ছে টুপটাপ। সোনা, ঈশম, পাগল জ্যাঠামশাই সবাই দক্ষিণের ঘরে জানালাতে বসে আছে। বৃষ্টির শব্দ শুনছে। ঘাস পাতা কেমন বর্ষার জলে ভিজে ভিজে নাচছে। কোথাও একটা গরু ডাকছে—হাম্বা। বোধহয় ওর বাছুরটা এখনও মাঠে, বৃষ্টিতে ভিজছে।

টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছিল—ঝুমঝুম। সোনা দুটো হাত দু'কানে চেপে রাখছে, সহসা হাত দুটো আবার আলগা করে দিচ্ছে। দিলেই বিচিত্র এক শব্দ। কান থেকে হাত আলগা করে দিলেই, বৃষ্টির ক্রমান্বয় অন্বেষণের মতো এই শব্দ। বার বার কান চেপে, হাত মৃদু আলগা করে -ওর এক ধরনের কানের ভিতর ঝমঝম খেলা, বেশ মজা পেয়ে যাচ্ছে সে। সে এমন একটা মজার খবর জ্যাঠামশাইকে দেবার জন্য ইজিচেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। হাত কচলে কবিতা আবৃত্তি করছেন। সমস্বরে সেই গানের মতো। যেন বলছেন, মায়া মাখানো জগতে কোথায় যে তুমি ঈশ্বর, এই মাটি এবং ঘাসে কখন কী ভাবে নেমে আস জানি না।

সোনা জ্যাঠামশাইর দু'কানে দু'হাত চেপে তালে তালে হাত খুলে দিয়ে তালি বাজাতে থাকল। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে বলল জ্যাঠামশাইকে—শুনতে পাইতাছেন না! ওঁয়া ওঁয়া কইরা কাঁদছে কারা? সে এমন বলল।

এই পৃথিবীতে নিয়ত কারা যেন কাঁদছে। আমরা জন্ম নেব এবার। ধনবৌ তখন বারান্দায় একটা বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেও সেই কান্না শুনতে পাচ্ছে। আমি এবারে জন্ম নেব। ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে ধনবৌ'র মুখ। উঠোন জলে ভেসে গেছে। জলে বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড়। অজস্র তারার মতো জলের উপর ফুটছে। উঠোনে আঁতুড়ঘর। শুকনো কাঠ ফেলে দিয়ে গেছে ঈশম। পাটকাঠির বেড়া। উপরে শণের চাল। ঝাঁপের দরজা। ঈশম সারা দিন খেটে ঘরটা করেছে। ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে ধনবৌ'র মুখ। এ-ঘরে কেউ নেই। তার ডাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কারণ সারা আকাশ যেন এখন মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে। আকাশ ভেঙে প্লাবন নেমেছে। ব্যাঙ ডাকছে। কচু পাতায় পুতুলনাচ হচ্ছে। পাতাগুলি জলের ভারে নাচছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ অথবা রাবণের সীতা হরণ। ধনবৌ'র মুখটা ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে। সে আর পারছে না!

বড়বৌ ভাবল, একবার খোঁজ নিয়ে যাবে। রাতের খাবার তৈরি করতে যাবে সে। সন্ধ্যা না হতেই রাতের খাবার করবে। খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা। রান্নাঘরে যাবার সময় ধনের খবর নিতে হয়।

সে হাঁটু জলে কাপড় তুলে রান্নাঘরে উঠে যাবার সময়ই দেখল ধন একটা বাঁশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে টের পেল, পৃথিবীতে ঈশ্বর আসছে। সে তাড়াতাড়ি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ডাকল, ঈশম, একবার যাও নাপিত বাড়ি। নাপিত বৌকে ডেকে আন। ধন বড় কষ্ট পাচ্ছে ব্যথায়।

ঈশম যখন দরজায় এসে দাঁড়াল, বড়বৌ দেখল, ওর চোখ লাল।

—তোমার শরীর খারাপ?

—না মামি।

—চোখ লাল কেন?

—ইট্টু জ্বর হইছে। সাইরা যাইব।

এবার বড়বৌ বলল, লালটু কোথায়? পলটু!

—জানি না মামি।

—সোনা, এদিকে এস।

সোনা এলে বড়বৌ ছাতা খুলে দিল।—তুমি যাও। নাপিত জ্যেঠিকে ডেকে আনো।

—আমি যামুনে! ঈশম তাড়াতাড়ি গামছা মাথায় বের হয়ে এলে বড়বৌ বলল, ঈশম, তোমার শরীর ভালো না, তুমি শুয়ে পড় গে। রাতে ভাত খাবে না। বার্লি খাবে। ছেলেরা সব বড় হয়েছে। তোমার যা কাজ, এবার থেকে ওরা কিছু কিছু করবে।

বড়বৌ'র এমন কথায়, ঈশমের চোখ জলে ভার হয়ে এল। সে বলল, শুকনা গাছের গুঁড়ি আরও আছে। গোয়ালঘরে তুইলা রাখছি। অশুজ ঘরে লাগলে কইয়েন! দিয়া আমু।

সোনা এমন দিনে বৃষ্টিতে ভেজার একটা কাজ পেয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি নেমে এল উঠোনে। এবং ছাতা মাথায় যাবার সময় দেখল মা বাঁশে হেলান দিয়ে কেমন ঝুলে আছে যেন। মা, তার মা। কী সুন্দর আর সজীব ছিল। এখন তার মা ক্রমে কি হয়ে যাচ্ছে! ঘরের বারান্দা টিন কাঠের, দুটো খুঁটির ওপর বাঁশ ঝুলছে এবং মা এখানে অন্যদিন তার ভিজা কাপড় মেলে দেন। কিন্তু আজ কাপড় নয়, ভিজা কাঁথাও নয়, মা নিজেই কেমন ঝুলে আছেন। সোনার বড় কষ্ট হল মাকে দেখে।

মাটিতে মার পা দুটো ঈষৎ ঝুলে অথবা ছুঁয়ে আছে যেন মাটি। চোখ দুটো বড় বিষণ্ণ মায়ের। সে কেমন নড়তে পারছে না আর।

বড়বৌ বলল, দাঁড়িয়ে কী দেখছিস! তাড়াতাড়ি যা! বলবি এক্ষুনি যেন চলে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে ধনবৌ কাতর গলায় বলল, যা বাবা, নাপিত বাড়ির জ্যেঠিরে ডাইকা অন। লালটু কই গ্যাছে? অরে কখন থাইকা দ্যাখতাছি না। মার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকল না। সে এক দৌড়ে যাবে, এক দৌড়ে ফিরে আসবে। কোথাও কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলবে না গল্প করবে না।

সে ছুটল ছাতা মাথায়, জলে ভিজে ছুটল। ছাতায় জল আটকাচ্ছে না। গাছের নিচে জল পড়ছে টুপটাপ। ওর শরীর ভিজছে। কাদা-জল ছলাৎ ছলাৎ ছড়াচ্ছে চারপাশে। সে মার কষ্টের মুখটা ভাবছে আর ছুটছে। পালবাড়ি র বাঁশবাগান অতিক্রম করে সে মাঝিবাড়িতে উঠে গেল। নাপিতবাড়ির জেঠি, এখানে কি একটা কাজে এসেছে। সে ডাকল জেঠিকে, জেঠি তুমি লও যাই। মায় কেমন করতাছে।

মাঝিবাড়ির ছোটবৌর দাঁতগুলো ভোঁতা। কী সব বলছে মার সম্পর্কে! ওর এ-সব শুনতে ভালো লাগছে না। বৌটার দাঁত কালো। মার বয়সী কী তারও বড়, মনে হয় জ্যেঠিমার বয়সী। কালো কুচকুচে দাঁত কালশুটি কাল পাহাড়ের মা! সোনা এবার উঁকি দিল ঘরে। কালপাহাড় ঘরে নেই। কাল পাহাড় নিশ্চয়ই জোয়ারের জলে মাছ ধরতে গেছে। এমন বর্ষার দিনে সে মাঠে নেমে যেতে পারল না, জোয়ারের জলে সে সরপুঁটি, পিরের বোয়াল ধরতে পারল না। ওর ভিতরে কষ্ট! বড়দা মেজদা হয়তো পালিয়ে চলে গেছে মাছ ধরতে। তার ভিতর থেকে এমন দিনে মাছ ধরতে না পারার কষ্ট ঠেলে ঠেলে উঠে আসছে। সে বলল, অ জ্যেঠি, লও যাই! মায় কেমন করতাছে।

নাপিত জ্যেঠিকে খবর দিয়েই সোনা ছুটতে থাকল। ছুটছে আর ছুটছে। কাদা-জলে ওর জামা প্যান্ট নষ্ট। তবু সে ছুটছিল। কারণ এখন জল নামছে অবিশ্রান্ত ধারায়। আহা, কী বৃষ্টি! মাঠ জমি সব জলে ভেসে যাচ্ছে। সে এসেই খবর দিল মাকে, মা, জ্যেঠিরে কইছি। সে বড় জ্যেঠিমাকে খবর দিল, জ্যেঠিমা, নাপিত জ্যেঠি আইতাছে। বড়বৌ তখন

জল গরম করছে। আভারানী এসেছে ছুটে। দীনবন্ধুর দুই বউ মানকচু পাতা মাথায় এসেছে খবর নিতে। বড়বৌ সবার সঙ্গে জল গরম করতে করতে কথা বলছে।

সোনা দেখল, মা তখন টিনকাঠের ঘরটা থেকে কেমন খুড়িয়ে খুড়িয়ে ছোট ঘরটায় ঢুকে যাচ্ছে। সোনার ইচ্ছা হচ্ছিল মার মাথায় ছাতা ধরে। মার মুখ এমন নীল বর্ণ হয়ে গেছে কেন! সেই যে সে একবার নীল রঙের একটা আলো জ্বলতে দেখেছিল একটা ঘরে, নীল রঙের আলোর ভিতর সে এবং অমলা, অস্পষ্ট মুখের ছবি, মার মুখ কী কষ্টে যেন তেমন নীলবর্ণ ধারণ করছে। মার কষ্ট আর সহ্য করতে পারছে না।

ঈশম তখন বৃষ্টিতে ভিজে আরও দুটো শুকনো কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে গেল। মা ঘরে ঢুকে গোঙাচ্ছে। সোনার ভারি কষ্ট হতে থাকল। সে ঝাঁপ খুলে মাকে বলবে ভাবল, তোমার কষ্ট হচ্ছে মা, আমি কী করতে পারি! আমি জোয়ারের জলে মাছ ধরতে যাব, বড় বড় সরপুঁটি সব জোয়ারের জলে উঠে আসছে।

আভারানী বলল, বৌদি মুখটা দ্যাখছেন?

সোনার রাগ হচ্ছিল বড় জ্যেঠিমার ওপর। এখনও জ্যেঠিমা রান্নাঘরে কী করছে! বের হচ্ছে না।

বড়বৌ বলল, মুখ দেখেছি। সময় হয়নি। তুই ঘরে যা। আমি যাচ্ছি। ধনের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাক।

সোনা রান্নাঘরে এসে দেখল বড় জ্যেঠিমা আবু- শোভার মার সঙ্গে ফিসফিস করে কী কথা বলছে। সে বুঝতে পারছে না কিছু। নিরামিষ ঘরের পাশে বৃষ্টির জল বড় বড় ফোটায় পড়ছে। জলে দুটো ব্যাঙ লাফাচ্ছিল। এমন বৃষ্টির দিনে মার কষ্ট, অথবা ছোট ঘরটায় মার গোঙানি সে সহ্য করতে পারছে না। তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে গেলে এ-সব শুনতে হবে না, দেখতে হবে না, সে পলোটা নিয়ে ছাতা মাথায় মাঠে নেমে গেলে জ্যেঠিমা বলল, ভালো হবে না সোনা। জলে ভিজলে জ্বর হবে।

সোনা বৃষ্টির শব্দে জেঠিমার কথা শুনতে পেল না। সে ছাতাটা মাথায় দিল, এবং পা টিপে টিপে জল ভেঙে হাঁটছে। হাতে পলো। সে হাঁটছে। চারপাশে সতর্ক নজর, মাছ উঠে আসতে পারে। সে কালোজাম গাছটা পার হতেই শুনল কচুর ঝোপে কি খলবল করছে। সে উঁকি দিল ঝোঁপের ভিতর। মাছ। কৈ মাছ। পালেদের পুকুর থেকে নতুন জলের গন্ধ পেয়ে কৈ মাছ উঠে আসছে। সে পলো দিয়ে চাপ দিল। ভেবেছিল সব কটা কৈ পলোর নিচে, সে হাত দিয়ে দেখল মাত্র দুটো। রান্নাঘরের দরজায় সে মাছ দুটো ছুঁড়ে দিল। বলল জ্যেঠি, দুটো কৈ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে টাপুর-টুপুর। সে তখন দুটো কৈ মাছ ফেলে দিয়ে আরও মাছের জন্য মাঠের ভিতরে নেমে গেল।

বৃষ্টি ফের জোর নামছে। আকাশটা ছাই রঙের। সুতরাং এসব দিনে বৃষ্টি ভিজে হাঁটুজল ভেঙে কোথাও যাওয়া অথবা ধানখেতে জোয়ারের জলে মাছ ধরা সবই সুখী ঘটনার মতো, আর ব্যাঙেরা ডাকছে চারদিকে। ডালে বসে কাক ভিজছে। পাখিরা আকাশে উড়ছে না। ঘন মেঘ সব এখন আকাশে পাখিদের মতো ডানা মেলে ঝাপটাচ্ছে। চারদিকে জল নামার শব্দ পুকুরগুলি সব মাঠের জলে ভরে গেছে এবং কচুর পাতায় তখন পুতুলনাচ হচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ, পাতা ভিজছে, টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটায় কচুর পাতা নাচছে। সোনা পুতুল খেলা দেখছে—রাম-লক্ষ্মণ- সীতা, রাবণ-শূর্পণখা। এখন কচুর পাতা পুতুলনাচের মতো। জলের ফোঁটায় ওরা হাত-পা তুলে নাচছে। কখনও হেঁটে যাচ্ছে যেন। কখনও ডগাগুলি বৃষ্টির ফোঁটায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কচুর ঝোপটায় সোনা অনেকক্ষণ পুতুলনাচ দেখল। ওর মন ভালো না। সে ধানখেতে নেমে একটা পাতা ছিঁড়ল ধানের। ভাবল ফতিমা ওর সঙ্গে মেলায় পুতুলনাচ দেখেছে। ফতিমা ফেরার সময় সোনাকে একটা মন্দ কথা বলেছে। এই যে ঈশ্বর তাকে একটা ভাই দেবে, মাকে ভগবান একটা ভাই হতে পারে, বোন হতে পারে, দিয়ে যাবেন—সেটা যেন ঠিক না। ফতিমা মন্দ কথা বললে সোনার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাতে মাকে চুপি চুপি কথাটা বলে দিয়েছিল।

মা বলেছিল, ফতিমা নচ্ছার মেয়ে।

মা হয়তো আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, তুমি ওর সঙ্গে যাবে না সোনা। তুমি ওর সঙ্গে কোথাও একা যাবে না।

মা তাকে বলেছিল, ঘরটায় ঢুকে মা বসে থাকবে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বর ভাইটাকে মার কাছে দিয়ে যাবে। ওর বড় জানার ইচ্ছা তখন, সে কী করে এসেছে মার কাছে?

মা বলত, ওকে কারা রাস্তায় ফেলে গিয়েছিল, মা তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে।

সোনা তখন হাউহাউ করে কাঁদত। কোনও কোনও দিন সে তার জামা প্যান্ট নিয়ে চলে যেত গোপাটে। সে অন্ধকারে একা-একা সেখানে বসে থাকত। মা তাকে খুঁজে নিয়ে আসত। কোলে তুলে বলত, সোনাকেও তার ভগবান কোল আলো করে রেখে গেছে।

এখন সোনার জানার বড় ইচ্ছা, মা এই যে আজ, ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে গেল, কাঠের শুকনো সব শুঁড়ি, গুঁড়িতে আগুন জ্বালানো হবে, ধূপ ফেলে মা আগুন জ্বেলে আরাধনা করবে, সেই এক ছোট ঘর থেকে মা তাকে নিয়ে তেমনি বের হয়েছিল কি-না।

কিন্তু কেন জানি, কি এক বহস্য এই জন্মের ভিতর, সে বুঝতে পারে না, ছুঁতে পারে না রহস্যটাকে। ধান পাতাগুলি নড়ছে। টুপটাপ বৃষ্টি। সে ছাতা মাথায় অল্প জলে দাঁড়িয়ে আছে। জল আর জল, পুকুর খাল বিল ভরে জমিতে জল উঠে আসছে। ধানের গোড়া জলে ডুবে গেছে, পাতাগুলি বাতাসে নড়ছে। সে বুঝতে পারে না, ছুঁতে পারে না

রহস্যটাকে। জোয়ারের জলে পা ডুবে যাচ্ছে। চারপাশের জমি, ধানখেত পাটখেত জোয়ারের জলে ভেসে যাচ্ছে। মা-র নীলবর্ণের মুখ দেখে সে-ও কেমন ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে।

আর তখনই সে দেখল একটু দূরে ধান গাছগুলি তিড়িং করে সরলরেখায় ছুটে যাচ্ছে। আবার দূর থেকে তিড়িং তিড়িং করে ধান গাছগুলি বৃত্ত সৃষ্টি করে ক্রমাগত এক জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে। খেলাটা বড় মজার। গাছগুলি প্রাণ পেয়ে যাচ্ছে। কখনও সরলরেখায়, কখনও ছোট ত্রিভুজের মতো কোণ সৃষ্টি করে গাছগুলি ছুটে বেড়াচ্ছে। গাছের পাতা বৃষ্টির ফোটায় নড়ছে না। জলের নিচে মাছ ছুটে আসছে, খেতের ভিতর ঘুরছে—একটা দুটো নয়, অনেক ক'টা মাছ। জোয়ারের জলে তার পায়ের পাতা ডুবে গেছে কখন। হাঁটুর নিচে জল উঠে এসেছে। গাছের গোড়ায় জোয়ারের জলে খেলা করছে বলে ধানগাছগুলি এখন তিড়িং তিড়িং করে ছুটে বেড়াচ্ছে।

সে এবার সন্তর্পণে ডাহুকের মতো পা বাড়াল। কারণ জলে বেশি শব্দ করতে নেই। বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙের শব্দ, ঝিঁঝিপোকার শব্দকে ডিঙিয়ে জলে তার পায়ের শব্দ কিছুতেই বেশি হবে না। মাটি জল শুষে নিচ্ছে বলে ফুরফুরর্ এক শব্দ এবং জলের উপর অজস্র ফুটকরি। জলের উপর অজস্র ফুটকরি ভেসে উঠে ভেঙে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে। এত সব শব্দের ভিতরও সোনা সন্তর্পণে পা সূচালো করে একটা ডাহুকের মতো শিকারের আশায় এগোতে থাকল।

সে মাছগুলির পিছনে হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে এসেছে। আর দুটো জমি পার হলেই ফতিমাদের পুকুর, মোত্রাঘাসের জঙ্গল। মোত্রাঘাসের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জমির জলটা ওদের পুকুরে পড়ছে। মোত্রাঘাসের ভিতর ঢুকে ফতিমা নিশ্চয়ই মাগুর মাছ ধরার জন্য বঁড়শি ফেলেছে।

সামনের জমি উঁচু, জল কম। মাছগুলি এখনও গাছের গোড়ায় নড়ছে। কম জলে উজানে উঠে যাচ্ছে মাছ। সে মোত্রাঘাস অতিক্রম করে যেখানে ফতিমার মাছ ধরার কথা সেখানে গিয়ে বসে থাকবে কি-না ভাবল। কারণ সে বুঝতে পারছে না, এই যে চারপাশে সব ধানগাছ দ্রুত ছুটে বেড়াচ্ছে তার নিচে কি সব মাছ আছে। মাছ হতে পারে আবার সাপও হতে পারে। জলের নিচে মাছ না সাপ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

তখন একটা শোল মাছ কিছুতেই ধানখেতের আল পার হতে পারছিল না। আলে এসে মাছটা আটকা পড়েছে। এবং বাধা পেয়ে মাছটা জলে লাফ দিতেই দেখল সোনা ছাতা মাথায় পলো হাতে দাড়িয়ে আছে। মাঠময় জোয়ারের জল। সবাই জোয়ারের জলে মাছ ধরার জন্য কোচ পলো নিয়ে হাঁটছে। সোনা জলে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। মাছটা ভয়ে ভয়ে লেজ নেড়ে সহসা মোত্রাঘাসের জঙ্গলে অদশ, কারা গেল। মাছটাকে এত সামনে পেয়ে ও সোনা ছুটে গেল না। সে জানত মাছটার সঙ্গে সে ছুটে পারবে না। ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে আবার ডাহুকের মতো সে ধানখেতে হাঁটতে থাকল। যদি কোথাও বোয়ালের

পির চোখে পড়ে। অথবা সোনার ইচ্ছা এখন বৃষ্টি আরও ঘন হোক, এবং পাটখেতে ঘন অন্ধকার নামুক। আকাশ ছেয়ে মেঘ তাড়কা রাক্ষুসীর মতো ছুটে বেড়াচ্ছে এবং ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের শব্দ। পৃথিবী যেন ভেসে যাবে। মাছেরা নিরাপদে জলের ভিতর খেলে বেড়াচ্ছে তখন। সোনাও খুব নিরাপদে ফতিমার পাশে চুপি চুপি দু'জনে ছাতা মাথায় মাছ ধরার নামে পাশাপাশি বসে থাকবে। এক সঙ্গে বসে জল নামার শব্দ শুনবে। কোথাও তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ চমকালে সে আর ফতিমা পরস্পর ভয়ে জড়িয়ে ধরবে। তারপর ছোট একটা কথা বলে ফতিমার মুখ দেখবে। মুখের বেখায় কি রং ফুটে ওঠে দেখবে।

যদি রঙটা জান পাড় আমগাছের সিঁদুরে আমের মতো হয়, যদি পাতার মতো রঙ ধরে, যদি ফতিমা রাগ করে অথবা ওদের চাকরটাকে বলে দেয়...ছিঃ ছিঃ, সোনা কি সব জোয়ারের জলে দাঁড়িয়ে ভাবছে! মার মুখটা মনে পড়ল। নীলবর্ণ মুখ। ঘরের কোণে শুকনো কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। আগুনের চারপাশে মা, জ্যেঠিমা সকলে গোল হয়ে বসে আছে। ওরা প্রার্থনা করছে হাতুলে। রাত হলেই ঈশ্বর নেমে আসবেন পৃথিবীতে। আগুনের পাশে এক শিশুকে শুইয়ে দেবেন। সে যে কী নাম রাখবে ভাইটার! ভাই না বোন! বোন হলে ভালো হয়। আকাশে কী প্রচণ্ড মেঘের গর্জন। যেন সব দেবদূত মিলে পৃথিবী থেকে সব দুঃখ তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাড়কা রাক্ষুসীকে তাড়িয়ে ওরা আকাশের অন্য প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা সে যেন দেখতে পেল চারপাশে আগুন, মা মাঝখানে। জ্যেঠিমা, নাপিত জ্যেঠি, আবুর মা আগুনের চারপাশে নৃত্য করছে। ভয়ে মা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শালুক পাতার মতো রঙ মুখে। মা যদি সোনার মনের ভাবটা এখন জানতে পারত! মা সোনার মা, জগতে একটি মাত্র মা, সোনার মা। সে মা-মা বলে ডেকে উঠল।

বিচিত্র সব চিন্তা সোনা আজকাল করতে শিখেছে। সেই অমলা ওকে কী যে শেখাল! তারপর থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কী সব আজে-বাজে দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতে থাকে। আঁধার রাত, গ্রামের সব কুকুর-কুকুরী এবং মেনি গাইর বাচ্চা হবার আগের ঘটনা, বাচ্চা হবার আগে কোনও গ্রীষ্মের দিনে গরুটা সারা মাঠে ছুটে বেড়াত। কেউ কাছে যেতে সাহস পেত না। কাছে গেলেই লাফাত। তারপর ঈশমদা ওটাকে কত কায়দায় ধরে আনত। ঈশমদা আর ও-পাড়ার হরিপদ গরুটাকে নিয়ে সকালে কোথায় চলে যেত। গরুটা তখন হাম্বা করে ডাকত কেবল। হরিপদ কাঁধে দুটো বাঁশ, ঈশমদা গরুটার দড়ি ধরে রাখত। আর ফিরত রাত করে। এসেই ছোটকাকাকে কৌশলে কি বলত। সোনা কিছু বুঝতে পারত না। এই মেনি তখন গোয়ালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠাকুমা বার বার সাবধান করে দিতেন ঈশমকে, ঈশম মেনিরে খাওয়ান দেইস না, দিলে পাল থাকব না।

ঠাকুমার কথা শুনে মনে হতো গরুটা সারা মাঠ ছুটিয়ে মেরেছে সকলকে। তার শাস্তি দিচ্ছে ঠাকুমা। সোনা তখনই দেখল অনেকগুলি ধানগাছ নড়ে উঠছে। নিশ্চয়ই ধান গাছের গোড়ায় জলের ভিতর অনেকগুলি মাছ এক সঙ্গে খেলা করছে। সোনা এবার পলোটা চেপে বসাল মাটিতে। সে পলোর উপর উঠে দাঁড়াল। উঠতেই একেবারে সর্বনাশ

—ওর চোখের তারা বড় হয়ে গেল। গোল গোল হয়ে গেল। দূরে ধানগাছের আড়ালে জলে ডাঙ্গায় কী বড় সাদা বোয়াল! মাছটা চিৎ হয়ে আছে। ফোটকা মাছের পেটের মতো সাদা বোয়ালের পেট জলের ওপর ভাসছে। মাছটার সে সবটা এখন দেখতে পাচ্ছে। মাছটা খুশিতে এমন জোয়ারের জলে, মেঘলা দিনে লেজ নাড়ছে।

সোনা এর আগে কোনও দিন পিরের বোয়াল ধরেনি। ঈশমদা, চন্দদের চাকর, কালপাহাড় পিরের বোয়াল ধরেছে। এবং এমন সব গল্প সোনা ঈশমদার কাছ থেকে শুনেছে। সোনা পিরের বোয়াল ধরা দূরে থাকুক, সে দেখেনি পর্যন্ত। আজ প্রথম দেখল। দেখে বুঝতে পারল, এটা মেয়ে বোয়াল, ডিমে পেট উঁচু। চিৎ হয়ে আছে। ওর কেন জানি সহসা মনে হল মা ঠিক বোয়াল মাছটার মতো অশুজ ঘরে শুয়ে আছে। আগুন জ্বলছে চারপাশে। জ্যেঠিমা ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে। মার নীলবর্ণ মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে।

সোনার মনে হল জলের ভিতর এত বড় মাছটাও কাতর। ব্যথায় নীলবর্ণ না হলে এত বড় মাছটা এমন কম জলে উঠে আসবে কেন!

আবার সেই ডাহুক, ডাহুকের মতো সে হাঁটছে। কিছু সাদা বক ধানখেতের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। ওরা কম জলে কুচো মাছ ধরে খাচ্ছে। সোনার ইচ্ছা হল সাদা বকেরা যেমনি সন্তর্পণে পা বাড়ায়, জলে সে তেমনি হাঁটবে। বকগুলি গঙ্গাফড়িং খাচ্ছে এবং ছোট-ছোট পুঁটিমাছ ধরছে। ডারকিনা মাছ ধরছে। ডারকিনা, পুঁটি শাড়ি পরেছে বর্ষার জলে। লাল চেলি, তসর গরদ, ঠিক যেন পুজো মণ্ডপে মার মতো। তখন কে বলবে এই মা তার একটা ছোট ঘরে ঢুকে আগুন জ্বেলে বসে থাকবে।

কাল পাহাড় হলে এতক্ষণ কোচ ফিকে দিত বোয়ালটার গায়ে। এবং বোয়ালটাকে ডিমসুদ্ধ; ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু সে তা চাইল না। খেলাটা জমুক। বোয়ালের আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অন্য বোয়ালগুলি যখন ওর উঁচু পেট কামড়াতে আসবে অথবা পির বাঁধবে সকলে মিলে, তখন সুযোগ মতো পলোতে এক চাপ এ বং সঙ্গে-সঙ্গে আট-দশটা বোয়াল পলোর নিচে। একসঙ্গে সে এতগুলি বোয়াল নিয়ে যাবে কী করে!

গাভীন বোয়ালটার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল সোনা। ভয়, ওকে দেখে মাছটা না আবার গভীর জলে নেমে যায়। কিন্তু একটা খবর সে রাখে, গাভীন বোয়ালের ব্যথা উঠলে বেশি নড়তে পারে না। বোয়ালটার এখন নিশ্চয়ই ব্যথা উঠেছে। ডিম পাড়ার ব্যথা। মাছটার ভয়ঙ্কর কষ্ট। বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয়ে পড়ছে না এখন। ছোট ছোট ফোটা। ঝোড়ো হাওয়া থেমে গেছে। কড়াৎ-কড়াৎ শুধু বজ্রপাতের শব্দ। গুটিকয় অন্য বোয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো মাঠে। প্রসবের এক নিমজ্জিত গন্ধ এই জলের ভিতর অন্য মাছেদের উত্তেজিত করে তুলছে। এবং ওরা মেয়ে বোয়ালটার কাছে আসবেই। না এলে পেট ফুটে ডিম বের হবে না। পুরুষ বোয়ালেরা, কী ওরা মেয়ে বোয়ালও হতে পারে—জোরে জোরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে পেটে, পেট থেকে ডিম বার করে দেবে। মাছটা তাই নড়তে পারছে না। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং সোনা একটা শ্যাওড়া গাছ হয়ে গেল। সে ছাতা

মাথায় চুপচাপ ঠিক একটা ছোট্ট গাছের মতো মাঠের ভিতর মাছটাকে দেখতে থাকল। সে নড়ল না। উলানি পোকা পা কামড়ে ফুলিয়ে দিয়েছে। সে তবু চুলকাল না। চুলকালেই নুইতে হবে, নড়তে হবে।

শ্যাওড়া গাছ ইচ্ছামতো নড়তে পারে না। সে অনেকক্ষণ নিজেকে শ্যাওড়া গাছ করে রাখল। অন্যান্য মাছেরা ডিমের গন্ধে উঠে আসুক, না আসা পর্যন্ত সে শ্যাওড়া গাছ হয়েই থাকবে। তখন কিনা একটা ছোট্ট বোয়াল ওর পা ঘেঁষে চলে গেল। কী আশ্চর্য, মাছটা ওকে শ্যাওড়া গাছ ভেবে ফেলেছে। মাছটা গা ভাসিয়ে বড় মাছটার পেট কামড়ে ধরল। পেট থেকে ডিম বার হচ্ছে। জলে জলে ডিম ভেসে স্রোতের মুখে কাগজের নৌকার মতো ভেসে গেল। সোনা সারাক্ষণ শ্যাওড়া গাছ হয়ে কাগজের বিন্দু-বিন্দু নৌকা জলের উপর ভাসতে দেখল।

জীবের এই জন্মরহস্য সোনাকে কিছুক্ষণ অভিভূত করে রাখল। গাছপালা পাখি নিয়ত তার চারপাশে বাড়ছে। বড় হচ্ছে আবার বিনষ্ট হচ্ছে। এই সব গাছের নিচে কত মাছ হবে আবার। বিন্দু-বিন্দু কাগজের নৌকা আবার মাছ হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে, বড় হলেই জোয়ারের জলে উঠে আসবে। খেলা করবে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে। সোনা এমন মজার খেলা দেখতে দেখতে ক্রমে কেমন প্রস্তরীভূত হয়ে যাচ্ছে। ওর হুঁশ নেই যেন। তখন মনে হচ্ছে গ্রামের ভিতর থেকে তাকে কে ডাকছে—সোনাবাবু, আপনের আর মাছ ধরতে হইব না। বাড়ি আসেন।

সোনা দেখল বৃষ্টি মাথায় ঈশমদা গাছতলা থেকে ডাকছে। সে উঠে দাঁড়াল। একটা মাছও নেই সামনে। মাছগুলি এই জলে এসেছিল সন্তানের জন্ম দিতে। ওরা জন্ম দিয়ে চলে গেছে। কেবল কিছু জল আর ধানগাছ, আর বৃষ্টি, তাড়কা রাক্ষুসীর মতো মেঘেদের ভেসে বেড়ানো, এবং এক গভীর অন্ধকার চারপাশে যেন নামছে। সোনা খালি হাতে উঠে যাচ্ছে। সে এত সামনে এমন পিরের বোয়াল পেয়েও ধরতে পারল না। কেমন এক অন্য পৃথিবী ক্রমে তার রহস্য খুলে ধরছে। যত ধরছে তত সে সোনা থাকছে না, অতীশ দীপঙ্কর হয়ে যাচ্ছে। সে ফতিমার খোঁজে তাড়াতাড়ি মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গেল। দেখল ফতিমা নেই। তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

বৃষ্টির ফোঁটা এবার বড় হয়ে পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাটল। টিলা ধরে বাড়ির সীমানায় উঠে দেখল, কচুর ঝোপে আবার পুতুলনাচ হচ্ছে। রাম-রাবণ-শূর্পণখা। সে মুখ ভেংচে দিল শূর্পণখাকে। শুধু রাম-রাবণ এখন কচুর ঝোপটায় যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। ওর মন ভালো নেই বলে কচুর ঝোপ বৃষ্টির ফোঁটায় রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে থাকল।

ঈশম আবার ডাকল, কি করতাছেন কচুর ঝোপে?

সোনা জল ভেঙে উঠানে উঠে এল। ঈশম দক্ষিণের ঘরে চলে গেছে। সে এখন একা। কেউ নেই চারপাশে। রান্নাঘরের শেকল তোলা। ছোট্ট ঘরটার চার পাশে কত বড়-বড় সব সোনা ব্যাঙ। ওরা মুখ তুলে কেবল ডাকছে, তুমুল আর্তনাদের মতো মনে হচ্ছে, এই বৃষ্টির শব্দ, এবং কীট-পতঙ্গের ডাক। অজস্র বেত পাতা ঘরটার চারপাশে। ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ বের হচ্ছে। পিরের বোয়াল গেছে, মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ফতিমা নেই, মা ছোট ঘরটায় চুপচাপ আগুন জ্বেলে শুয়ে আছে। ওকে আজ মেজদার সঙ্গে একা থাকতে হবে। একা থাকতে হবে ভয়ে ওর এই বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল।

তখনই মনে হল ছোট্ট ঘরটায় মা, ভীষণ কষ্টে গোঙাচ্ছে। মার মুখ নীলবর্ণ। বড় জ্যেঠিমার গলা সে পাচ্ছে। নাপিতবাড়ির জ্যেঠি কথা বলছে। আবুর মা হারান পালের বৌ ঘরের ভিতর কী যেন করছে। মার কষ্টের আওয়াজটা কিছুতেই থামছে না। তার মতো অথবা মেজদার মতো মা আবার একটা ভাই ভগবানের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে। সে যে এখন এখানে একা দাড়িয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না। পলোটা ফেলে দিল উঠানে। এবং মা, তার মা, পুজোমণ্ডপের মা ছোট্ট ঘরটায় কী করছে এখন! সে স্থির থাকতে পারছে না। চুপি চুপি সে ছোট ঘরটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। পিরের বোয়াল ধরার সময় অথবা ফতিমা পাশে বসার মতে। উত্তেজনায় ও কাঁপছে। ঠিক প্রার্থনা নয়, ঠিক কষ্ট নয়, ঠিক অন্য কিছু হচ্ছে এই সংসারে যা সে এতদিন জানতে পারেনি। সে চারপাশে যখন দেখল কেউ নেই, বেড়ার ফাঁকে গোপনে মুখ গুঁজে দিল।

তারপর, তারপর সোনার এই সংসার জগৎময় বিশ্বময় পাক খেতে থাকল। সে চোখের উপর এসব কী দেখছে! সে আশ্চর্য, না কী সে ক্রমে বোবা হয়ে যাচ্ছে! তার মা, তার একমাত্র মা জগতে যার নাই তুলনা, মরা সাপের মতো অথবা ধাড়ি বোয়ালের মতো পেট উঁচু করে পড়ে আছে। বড় জ্যেঠিমা, নাপিতবাড়ির জ্যেঠি, হারান পালের বৌ সবাই খোলা পেটের উপর উবু হয়ে আছে। ওর এবার সহসা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল—মা! গলার রগ ফুলে উঠছে তার। পুজোর সময় বাবুদের বাড়ি পাঁঠা বলি হয়—ছাল তুলে নেওয়া বলির পাঁঠার মতো মাকে দেখতে। বীভৎস। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এ যেন তার মা নয়, সে তার এ-মাকে চেনে না। কারণ তখন পৃথিবীতে আর এক ঈশ্বর নামছিলেন। নাপিতবাড়ির জ্যেঠি তিনবার উলু দিতে বলছে! সবাই একটা জীবের পাশে দাঁড়িয়ে উলু দিচ্ছে। সোনা সেই ঈশ্বরকে দেখল। সে ওর জন্ম দেখল এবং নিজের জন্মের কথা ভেবে সে কেমন বেদনায় মুক হয়ে গেল। জল ভেঙে সে দক্ষিণের ঘরে উঠে গেল চুপচাপ। তেমনি বৃষ্টি পড়ছে বড় বড় ফোঁটায়। ঈশম বৃষ্টির শব্দ শুনছে দরজায় বসে। পাগল জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে বসে আছেন। ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি এসব দেখে তিনি কেমন উদ্‌বিগ্ন। সোনা জলে ভিজে শীতে কাঁপছে। শশীভূষণ ওর গামছা দিয়ে শরীরের জল মুছে দিলেন। বললেন—তোর একটা বোন হয়েছে সোনা।

সোনা কথা বলতে পারছিল না। শীতে থরথর করে কাঁপছিল। শশীভূষণ চাদর দিয়ে ওর শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন। সোনা তক্তপোশের উপর বসে স্থবিরের মতো চোখ

মেলে তাকাল বাইরে। ভয়ঙ্কর কঠিন কিছু দেখে সে স্থবির হয়ে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই পর্যন্ত ওর এমন মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। সোনা একা জানালার পাশে চাদর গায়ে বসে থাকল। ক্রমান্বয় বৃষ্টি হচ্ছে। ক্রমান্বয় কচুর পাতায় পুতুলনাচ হচ্ছে। সব হয়ে যাচ্ছে একভাবে। বৃষ্টি, বজ্রপাত, পুতুলনাচ এবং জীবের জন্ম, সব একভাবে হয়ে যাচ্ছে। গাছের গুঁড়িতে কাগজের বিন্দু বিন্দু নৌকা মাছ হয়ে গেল। পূজামণ্ডপের মা আর মা থাকল না। কেমন একটা মরা সাপ হয়ে গেল। সে আর এই মাকে কাছে নিয়ে শুতে পারবে না। কেমন এক দুরারোগ্য ব্যাধি মানুষের শরীরে, মাকে ছুঁতে গেলেই তার এমন মনে হবে। সে এবার ভীষণ কষ্টে দু'হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে দিল। মার নীলবর্ণের মুখটা কিছুতেই আর মনে করতে পারল না। কেবল সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

জানালা খোলা। কামরাঙা গাছের অন্ধকারে কিছু জোনাকি জ্বলছে। বেতঝোপ পার হলে মাঠ। মাঠে আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না। বড়বৌ সেই সাদা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়েছিল, না ঘরের আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল বোঝা যাচ্ছে না। গলায় চন্দ্রহার পরেছে বড়বৌ। নীল রঙের বেনারসী পরেছে। হাতে চূড়। চোখে বড় করে কাজল টেনেছে। মুখে স্নিগ্ধ প্রসাধন। মানুষটা যদি আসে, এই আশায় দরজা খোলা রেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সকালে এ-বাড়িতে কিছুটা উৎসবের মতো ঘটনা ঘটেছে। কারণ ভূপেন্দ্রনাথ দু'জন মানুষ নিয়ে এসেছিলেন। ওরা সন্ন্যাসী মানুষ। ওরা এ-বাড়িতে সারা রাত ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। এবং পাগল মানুষকে নিরাময় করার জন্য অপার্থিব সব ঘটনা ঘটিয়ে বাড়ির মানুষদের তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল। ওদের ভোজনের নিমিত্ত নানাবিধ পায়েস হয়েছে। বড়বৌ সারাদিন খেটে স্বামীর শুভ কামনায় রাত হলে নিজের ঘরে চলে এসেছে। তিনি এখনও আসছেন না। এলেই দরজা বন্ধ করে দেবে বড়বৌ। শীতকালটা অন্যবার বেশ শান্ত থাকেন। এবারে তাও না।

আজকাল রাত হলে বড়বৌ নানাভাবে সাজতে থাকে। যে যে চেহারায় ওকে বিদেশিনী মনে হতে পারে সে তা করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও বড়বৌ একেবারে অন্য জগতের ভিতর ডুবে যায়। সে যেন তার স্বামীকে নিয়ে পুতুল খেলতে বসে। সেই ছোট্ট বয়সের মুখ-চোখ তার চারপাশে খেলা করতে থাকে তখন খেলা করতে করতে কবে সে প্রথম এ-মানুষের সঙ্গে সহবাসের আনন্দ পেয়েছে এমন ভাবে। বোধহয় সেটা এক বসন্তকালই হবে, এবং বোধহয় আকাশে সেদিন আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না ছিল।

কেন জানি বড়বৌ'র, আজ ঠিক সেই দিনটি, এমন তার মনে হল। সে জানে এখনও মানুষটা দক্ষিণের বারান্দায় বসে রয়েছেন। না ডাকলে বোধহয় আসবেন না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। তবু ভারি লজ্জা করছে এই সাজে উঠোনে নেমে যেতে। প্রায় অভিসারে যাবার মতো। গেলেই তিনি উঠে পড়বেন। তাঁর মনে হবে তখন বড়বৌ তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে জানালায়। এ-সব ভাবতে ভালো লাগে। সে নেমে যাবে কি-না ভাবছিল, তখন দেখল তিনি হেঁটে এদিকে

আসছেন। তাড়াতাড়ি বড়বৌ জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মানুষটার জন্য যে তার প্রতীক্ষা, তিনি না এলে যে বড়বৌ'র অভিমানে চোখে ঘুম আসে না এমন বুঝতে দিতে চাইল না। সে শক্ত হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল।

মানুষটা এসেই আজ কেমন পাগলের মতো বড়বৌকে জড়িয়ে ধরল। দরজা খোলা। কেউ দেখে ফেলতে পারে। দরজা বন্ধ করে দিলে ভালো হতো। কিন্তু এমন আবেশ মানুষটার যদি দরজা বন্ধ করতে গিয়ে হারিয়ে যায়, দরজা বন্ধ করতে গেলে তিনি যদি রাগ করেন, অথবা পাগলের মতো চোখ মুখ আলগা করে রাখেন তবে এ-রাতের নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ হয়ে উঠবে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। সে এমন কী মুখ ঘুরিয়ে মানুষটাকে দেখল না। মানুষটা তার নীল রঙের এমন সুন্দর শাড়িটা টেনে খুলে ফেলল। ফের হুঁশ হল বড়বৌর। দরজা খোলা। তবু সে দরজা বন্ধ করতে ছুটে গেল না। মানুষটা যা খুশি করুক। অন্যদিন এই মানুষই দরজা বন্ধ করলে ক্ষেপে যান। হঠাৎ হঠাৎ টেবিল ঠেলে ফেলে দেন। থাম ধরে ঝাঁকাতে থাকেন। কখনও কখনও টেবিলে ঘুষি মেরে সব কাচের বাসন ঠেলে ফেলে দেন। তারপর এক প্রলয়-নাচন নাচতে আরম্ভ করলেই বড়বৌ ডাকে, ঠাকুরপো, ও ছোট ঠাকুরপো! দেখুন এসে কি আবার আরম্ভ করেছেন! সঙ্গে সঙ্গে ভীতু মানুষের মতো মণীন্দ্রনাথ খাটের ওপর উঠে লেপের ভিতর ঢুকে যান। যেন কিছুই করেননি। তিনি বড় ভাল ছেলে। আর সেই মানুষ কী যে করছেন তাকে নিয়ে। বসন ভূষণ খুলে ফেলছেন। আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় যেন স্বপ্নের মতো ঘটনা। এমন ভালোবাসা সে কতদিন চেয়ে চেয়ে তবে পেয়েছে। ভিতরে ভিতবে বড়বৌ অস্থির হয়ে পড়ছিল। দু'হাতে যা খুশি করুন এমন ইচ্ছাতে বড়বৌ শরীর খাটে বিছিয়ে দিল। নরম শরীর, স্তন এবং কোমল হাত এবং কোথায় যেন প্রপাতের মতো জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, সে ঠেলে সেই মানুষকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু মানষটা যেন প্রপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না—কী যে করণীয় এই শরীর নিয়ে বুঝতে পারছেন না যেন। মানুষটাকে এবার জোরে চুমু খেল। এবং পাগলের মতো অস্থির হয়ে পড়তেই মণীন্দ্রনাথ একেবারে ঠাণ্ডা মোর গেলেন। মণীন্দ্রনাথ খাট থেকে নেমে জানালায় এসে দাঁড়ালেন।

বড়বৌ বলল, এই শোন। আমি আর এমন করব না।

মণীন্দ্রনাথ শক্ত শরীরে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

—আমি কিছু করব না বলছি। এস আমার পাশে শোবে।

মণীন্দ্রনাথ সাদা জ্যোৎস্না দেখছেন এখন।

—তুমি আমার পাশে শুধু শোবে। বলে হাতটা নিয়ে বুকের ভিতর খেলা করতে থাকল।

দরজা খোলা। সে দরজা বন্ধ করে দিল এবার। এবং জানালার পাশে এসে দাঁড়াল।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে! একটা পাখি ডাকছিল। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলি পাখি ডেকে উঠল। ভিতরে বড় কষ্ট বড়বৌর। মানুষটা এখন পাহাড় বেয়ে ছুটতে পারেন, আবেগে ডুবে যেতে পারেন—তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সে যেন স্বপ্ন দেখে উঠে এসেছে। সব বৃথা। কারণ কতভাবে—বড়বৌ যে চেষ্টা করছে! এই দ্যাখো আমার শরীর, এই দ্যাখো নীল শিরা উপশিরায় কি প্রসন্ন আলো খেলা করে বেড়াচ্ছে। তুমি একটু ছুঁয়ে দ্যাখো, মনে হবে তোমার, দীর্ঘদিন তুমি বনবাসে ছিলে। দ্যাখো এই চোখ, মুখ। তুমি আমার কপালে হাত রাখো। আমি তো তোমার কাছে কিছু চাইনি। কিছু চাইনি! কেবল তুমি যদি একবার আমাকে অপলক দেখতে। আমার মনে হয় তবে তুমি এমনভাবে গ্রামে মাঠে ঘুরে বেড়াতে না। আমাকে আর একবার জড়িয়ে ধর না গো। আমি কিছু করব না। সত্যি বলছি। তিন সত্যি।

মানুষটা বড়বৌকে কিছুতেই আর স্পর্শ করলেন না। চোখ দেখলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা আর রক্তমাংসের পৃথিবীতে নেই। ফোর্টের গম্বুজে তিনি জালালি কবুতর উড়ছে দেখতে পাচ্ছেন।

বড়বৌ ডাকল, শুনছ!

তিনি কিছুই শুনছেন না। নদীর জলে তিনি শুনতে পাচ্ছেন শুধু ঝমঝম শব্দ। জাহাজের প্রপেলার ঘুরছে। কিছু অপরিচিত পাখি মাস্তুলে। রেলিঙে সেই সোনার হরিণ দাঁড়িয়ে! হাত দিলেই যে দূরে হারিয়ে যায়। কাছে যা কিছুতেই পাওয়া যায় না। পলিন রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বড়বৌ বলল, আমি সত্যি বলছি কিছু করব না। তোমার যা খুশি যেমনভাবে খুশি আমাকে নাও।

বড়বৌ বড় অবুঝ হয়ে গেছে। চোখ দেখলেই সব টের পাওয়া যায়। সে কেন যে এমন করছে তবু, সে কেন বুঝতে পারছে না মানুষটা আর মানুষ নেই। মানুষটার ভিতর নদীর নীল জল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

বড়বৌ এবার হাত ধরে খাটে নিয়ে যেতে চাইল তাঁকে। তিনি গেলেন না। তিনি জানালার একটা পাট বন্ধ করে দিলেন। তারপর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। নিজের বসন-ভূষণ সব আলগা করে ছুঁড়ে ফেললেন খাটে। শেষে কী দেখলেন, বড়বৌর মুখে। মুখ দেখে হাসলেন। দুষ্টু বালকের মতো হাসিতে মুখ ভরে গেল। যেন বললেন, এস. আমরা সাদা জ্যোৎস্নায় হেঁটে হেঁটে নদীর চরে চলে যাই। কেউ দেখবে না। আমরা চুপি চুপি সেখানে দু'জনে পালিয়ে বসে থাকব। আকাশের নিচে সাদা জ্যোৎস্নায় বসে থাকতে কী যে ভালো লাগবে না!

বড়বৌ কিছু বুঝতে পারল না। কেন এমন সরল বালকের মতো তিনি হাসছেন! সে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি তখনও হাসছেন। হাসতে হাসতে দরজা খুলে ফেলছেন। বড়বৌ

তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিল। মানুষটা উঠোনে নেমে যাচ্ছেন। কি হবে এখন! বড়বৌ তাড়াতাড়ি সেই বেনারসী শাড়িটাকে কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে নিল। পাগল মানুষের কাপড়টা খাট থেকে তুলে নিল। এই মানুষ এমন এক অবয়বে বের হয়ে গেলে কবে ফের ঘরে উঠে আসবেন কে জানে! লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা যাবে। অন্তত কাপড়টা পরিয়ে দিতে পারলে মানুষটাকে আর পাগল মনে হবে না। নিরীহ মানুষ, অবলা জীবের মতো তাঁর চোখ তখন। গ্রামের পর মাঠ, মাঠে মাঠে তিনি এক সন্ত পুরুষের মতো হেঁটে যাবেন।

বড়বৌ উঠানে নেমে দেখল ধীরে ধীরে বাঁশতলা দিয়ে তিনি নেমে যাচ্ছেন। সে শেকল তুলে দিয়েছিল ঘরের। শেকল তুলে চারপাশে তাকাল। কোনও ঘরে আলো জ্বলছে না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। একবার ভাবল শচীন্দ্রনাথকে ডাকে, উঠে দেখুন কিভাবে বের হয়ে যাচ্ছেন! কিন্তু নিজের প্রসাধনের কথা ভেবে ডাকতে সংকোচ বোধ করল। বরং সে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে, দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালে আর তিনি নড়তে পারবেন না।

কুয়োতলায় এসে দেখল মণীন্দ্রনাথ দ্রুত মাঠে নেমে হাঁটছেন। সেও মাঠে নেমে এল। স্বামী তার এমন বেশে গ্রামে মাঠে ঘুরে বেড়াবে ভাবতেই কান্না পাচ্ছে। সে, যে করে হোক কাপড়টা পরিয়ে দেবে। তারপর যেমন খুশি, যেদিকে খুশি তিনি চলে যাবেন। সে মানুষটার সঙ্গে মাঠের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকল।

বসন্তের মাঠ ফসল নেই। শুধু কিছু জমিতে পেঁয়াজ রসুনের গাছ লঙ্কা গাছ। চারপাশে জমির বেড়া। মাঠে নেমেই মনে হল মানুষটা কোথাও যেন তার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে কেবল ছুটে নাগাল পাচ্ছে না। সে দেখল তখন তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বড়বৌকে মাঠে নেমে আসতে দেখে বুঝি সামান্য বিস্মিত হয়েছেন। বড়বৌ জমির ওপর দিয়ে ছুটছে। ছুটে ছুটে আর পারছে না। হাঁপিয়ে উঠছে। কাছে গিয়ে সে কথা বলতে পারছে না। তুমি এ-ভাবে বের হয়ে গেলে লোকে কি বলবে! এসব বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে যাচ্ছে। —লক্ষ্মী, কাপড় পরে নাও। তারপর যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এমনও বলার ইচ্ছা। কাপড়টা বড়বৌ পরিয়ে দেবে, পরিয়ে দিলেই সোনার হরিণের খোঁজে অথবা নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে বের হয়ে যাবেন। এমন সময় এক সুদৃশ্য শরীরে পাশে টান টান হয়ে দাঁড়ালে, বড়বৌর আর ভয় থাকবে না। ভাবল, কাপড়টা পরিয়ে দিয়েই বলবে, হ্যাঁ গো, আমাকে বাড়ি দিয়ে আসবে না? একা আমি যাব কী করে!

সে কী ভাবল আর কী হয়ে গেল! হতভম্ব সে। ভেবেছিল কাপড় পরিয়ে দিলেই মানুষটা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। তাকে এত বড় মাঠে একা ফেলে যাবেন না। কিন্তু মানুষটার চেহারা অন্যরকম। বড় বেশি হাসি হাসি মুখ। তিনি এক টানে বড়বৌর কাপড় খুলে ফেলেছেন। খুলে ফেলেই একেবারে বালক। বালকের মতো সাদা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে

হা হা করে হাসছেন। কুয়াশার ভিতর মাঝে মাঝে মুখ তাঁর অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্নায় আবছা কুয়াশার ভিতর এক রহস্যজনক ভাব তাঁর মুখে। বগলে কাপড় নিয়ে চিরদিনের তীর্থযাত্রীর মতো তাঁর যেন ভ্রুক্ষেপহীন যাত্রা। বড়বৌকে এসব ভীষণ আড়ষ্ট করে দিল। কিছু সে বলতে পারল না। খেলাচ্ছলে তিনি যেন এমন সব করছেন। দূরে দূরে সব বন মাঠ, সাদা জ্যোৎস্না এবং হালকা কুয়াশা দেখে বড়বৌকে নিয়ে স্থির থাকতে পারছেন না। কেবল ছোটার ইচ্ছা তাঁর। কোথাও সেই যে তিনি একটা নীল বর্ণের লতা নিয়ে এসেছিলেন কলকাতা থেকে, যেখানে ঈশম নদীর চরে একা রাত যাপন করে, এবং এক নীল বর্ণের লতা থেকে কত হাজার নীলবর্ণ লতা ফুল ফল সৃষ্টি হচ্ছে এখন—তেমন জায়গায় তাঁর চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কিছু ভালো লাগছে না তাঁর। তিনি যখন কলকাতা থেকে শেষবারের মতো ফিরে এলেন, সঙ্গে সব নানারকমের গাছ ছিল তাঁর। এখন আর মনে করতে পারছেন না কী গাছ সে-সব। কী লতা সে-সব। কেবল মনে পড়ছে, একটা নীলবর্ণের লতা ছিল। সবাই সেটা ফেলে এসেছিল নৌকায়। কেবল ঈশম তুলে এনে চরের জমিতে লাগিয়ে দিয়েছিল। যখন কিছু ভালো লাগত না, তিনি তখন নদীর চরে নেমে লতার গোড়ায় সাবা বিকেল জল ঢালতেন। এই মাঠে নেমে বড়বৌর আড়ষ্ট মুখ-চোখ দেখে তাঁর সে-সব মনে পড়ছিল।

বড়বৌ ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সে বলল, দাও লক্ষ্মী। আমার কাপড়টা দাও।

আমরা কোথাও যাব বলে বের হয়েছি। সংসারে কোথাও যাব বলে বের হলে ফিরতে নেই।

—তুমি কী চাইছ বল! কী পেলে তুমি সুখী হবে বল, সব দিচ্ছি। আমি চলে যাব এ-দেশ ছেড়ে। আমি চলে গেলে সুখী হবে! বল তুমি? তুমি যা বলবে আমি তাই করব!

—এ-ভাবে কিছু হয় না। আমরা শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারি না। তবু হাঁটি। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হই। মনে হয় সামনেই একটা সরাইখানা আছে। একটা অদৃশ্য সরাইখানার পিছনে সবাই আমরা ছুটছি।

—কেউ দেখে ফেললে কি হবে বলতো! মান-সম্মান সব যাবে। তোমার বৌ আমি। কেউ দেখে ফেললে কত বড় অসম্মান হবে বলতো!

—জীবনের নানারকমের খেলা আছে। লাল নীল বল নিয়ে তেমন একটা খেলা। কোনটা যে কী রকমভাবে চোখের ওপর ফেঁসে যাবে জানি না। তবু খেলি। মনে হয় খেলার মাঠে জয়-পরাজয় হবে। এবং খেলার মাঠ পার হয়ে এলে একটা সেতু দেখতে পাই। সেতুর ওপর একজন ফকির মানুষ দাঁড়িয়ে থাকেন। যে বলটা ছিল আমাদের খেলার বস্তু, সেই বলটা ফকির সাহেবের প্রাণ মনে হয়।

—শোন, এ-ভাবে আমাকে কতদূর পিছু পিছু নিয়ে যাবে? তুমি কী ভেবেছ! আমরা টোডার বাগের কাছে চলে এসেছি।ছিঃ ছিঃ, কী বিপদে আমাকে ফেললে বলতো! সামনে নদী। নদীর চর। একটু দূরে তরমুজ খেত। তুমি আমার মান-সম্মান রাখলে না! দাও। শাড়িটা দাও। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। কী করে ফিরব! এত বড় মাঠ পার হয়ে একা যাব কী করে! কেউ দেখে ফেললে কী হবে বলতো? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

—মাঠ কেউ পার হতে পারে না বড়বৌ। পার হব হব বলে সবাই বের হয়ে পড়ি। তারপর রাতদিন ক্রমান্বয় হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বিষণ্ণ। কোথাও কোনও জলছত্রের কাছে তারপর নিরিবিলি বসে থাকা। কেউ আমাদের বলে দিতে পারে না কতদূর গেলে এই মাঠ শেষ হবে। শুধু জলছত্রের মানুষটি তোমাকে জলদান করবে আর বলবে, জল খেলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সামনে যে বন আছে, তার ওপারে একটা কদম ফুলের গাছ পাবে। সেখানে আমার মতো আর একজন মানুষ জলছত্র খুলে বসে রয়েছে। মাঠ পার করে দিতে কেউ পারে না বড়বৌ। আমরা সবাই ইচ্ছা করলে শুধু তেষ্টার সময় জলদান করতে পারি। আর কিছু পারি না।

—তুমি কী কিছু বলবে না! নদীর চরে তোমার কী আছে। তুমি ওদিকে হাঁটছ কেন! আমি তোমার সঙ্গে জোর করে কিছু ফিরে পাব না জানি। আমাকে এ-ভাবে কেউ দেখে ফেললে ঠিক আত্মহত্যা করব বলছি।

এবারে পাগল মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। শাড়িটা বগল থেকে বের করে বড়বৌর হাতে দিলেন। তারপর হাঁটতে থাকলে সহসা কেন জানি বড়বৌ'র মনে হল, মানুষটার অভিমানে বুক ফেটে যাচ্ছে। এই সাদা জ্যোৎস্নায় তিনি তাকে নিয়ে হয়তো এভাবেই হাঁটতে চান। এবং কেন জানি ওর মনে হল—আর সে একা ফিরে যেতে পারবে না। এক অত্যাশ্চর্য মায়া, এখন এই নিরিবিলি সাদা জ্যোৎস্নায় এবং কুয়াশার ভিতর। বড়বৌ মানুষটার পিছু পিছু হেঁটে গেল। নদীর চর, চরের পারে ছইয়ের ভিতর ঈশম ঘুমোচ্ছে। ওরা দু'জন চু পচাপ নদীর চরে বসে থাকলে কে আর টের পাবে! কুয়াশার ভিতর সবই অস্পষ্ট এবং মায়াজালে ঢাকা। বড়বৌ তার পাগল স্বামীকে নিয়ে নির্জনতায় ডুবে গেল। বলল, আমার কে আছে! তু মি বাদে আমার আর কী আছে?

ঈশম খকখক করে কাশছিল। কাশির জন্য সে ঘুমোতে পারছে না। খুব বেশি কাশি পেলে সে উঠে তামাক খায়। তার হুঁকা-কলক এবং পাতিলে আগুন সব ঠিকঠাক। এখন রাত ক'প্রহর সে টের পাচ্ছে না। ছইয়ের বাইরে এলে সে আকাশে চাঁদের অবস্থান দেখে টের পেত-রাত ক'টা বাজে। অথবা সে চুপচাপ শুয়ে থাকলে টের পায়–ক' প্রহর রাত। প্রথম প্রহর, ঠাকুরবাড়ির আরতির ঘণ্টা বাজে, দক্ষিণের ঘরে আলো জ্বালা থাকে। যে-সব খরগোশ হাসান পীরের দরগা থেকে বের হয়েছে নদীর চরে আসবে বলে, তরমুজের পাতা ওদের বড় প্রিয়, তারা প্রথম প্রহর শেষে জমির আলে এসে পড়লে টের পায় ঈশম,

ওরা আসছে। সে কান পেতে রাখলে টের পায়—ওরা খরগোশ না সজারু। সে এখন খুব কাশছে বলে টের করতে পারছে না, সজারু কী খরগোশ, খাটাশ না শেয়াল—কারা এসে আলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাত গভীর হলেই ওরা চুপি চুপি ঢুকে পড়বে জমিতে। ঈশম ওদের তাড়ানোর জন্য টিনের ডঙ্কা বাজায়। প্রহর শেষ হলেই সে ডঙ্কা বাজায়। আর তখন যত এইসব খরগোশ, খাটাশ অথবা শিয়াল সজাক সব ছুটতে শুরু করে নদীর দিকে।

তখন ওর মনে হয় কে যেন হাঁকছে নদীর চরে—কে জাগে?

—আমি আল্লার বান্দা ঈশম জাগি। সে খালি মাঠে চিৎকার করে ওঠে।

এই নদীর চর, সাদা জ্যোৎস্না, বড় বড় তরমুজ এবং নদীর জল তার কাছে তখন এক বেহেস্তের শামিল। সে হাতে তালি বাজায়। চুপচাপ এই নিশীথে ধরণী কি শান্ত। কেবল সব নিশীথের জীবেরা আহারের অন্বেষণে বের হয়েছে। সে টের পাচ্ছে না তারা কতদূর এসে গেছে। সে উঠে বসল। তামুক না খেলে তার কাশি কমবে না। সে ছইয়ের বাতা থেকে কলকি টেনে নিল। তামাক ভরে খড়কুটো জ্বেলে সামান্য আগুন নিল কলকিতে। ওর কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে যেমন অন্যদিন তরমুজের জমিতে একা নিশীথে দাঁড়িয়ে তামুক খায়, পাখ- পাখালি অথবা বন্য জীব তাড়ায় তামুক খেতে খেতে, আজ তা পারছে না। কাশিটা ওকে বড় বেশি জব্দ করে ফেলেছে। সে তামুক খেতে খেতে টিনের ডঙ্কা বাজাল। ছইয়ের বাইরে কী সাদা জ্যোৎস্না! কালো কালো ঐ পাখির ডিম! চুপচাপ সেই ডিমের ওপর বসে থাকা, তামুক খাওয়া, নদীর জল যেন কলকল করে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। সে-সব শব্দ শোনা বড় মনোরম। আর আকাশের অজস্র নক্ষত্র দেখতে দেখতে ঈশম যে বার বার কতবার এই জমিতে রাত কাবার করে দিয়েছে, একফোঁটা ঘুমায় না, এখন ঈশমকে দেখলে তা বোঝা যাবে না। আজ ঈশম এমন সাদা জ্যোৎস্না দেখেও ছইয়ের বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বের হল না। সামান্য কুয়াশা নদীর পাড়ে পাড়ে। এই কুয়াশার ভিতর সে অস্পষ্ট এক ছবি দেখে চমকে উঠল।

সে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে ভাবল, ওরা কারা এল! ওর তরমুজ খেতে এমন গভীর রাতে কারা আসতে পারে! তরমুজ চুরি করতে আসে যারা, তাদের চাল চলন অন্যরকম। সে দেখলেই টের পায়, মানুষেরা তরমুজ চুরি করতে এসেছে। কিন্তু সে যে দেখছে তরমুজের ওপর ওরা নিবিষ্ট মনে বসে রয়েছে। দু'জন দু'মুখে। একজন পূবে, অন্যজন পশ্চিমে। ওরা যেন একটা তরমুজের উপর বসে পূর্ব পশ্চিম দেখছে। এবং ওরা যেন একেবারে শরীর নাঙ্গা করে রেখেছে— এই কুয়াশার ভিতরও যেন তা স্পষ্ট। কুয়াশা প্রবল নয়। হালকা। জমির ওপর নদীর পাড়ে কুয়াশা একটা পাতলা সিল্কের মতো বিছিয়ে আছে। সবুজ সব তরমুজের পাতায় শিশির জমেছে। আর দুই মানুষ, মনে হল একজন স্ত্রীলোক হবে, তা হউক, সংসারে কত জীব ঘুরে বেড়ায়, ওরা নিশীথে এই পৃথিবীর মায়ায়

নেমে আসে, ওদের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা, অথবা বলা যায়, এমন নদীর পাড়ে তরমুজ খেতে নিশীথে নেমে আসতে না পারলে তাদের আত্মা বড় কষ্ট পায়।

তা তোমরা নেমে এসেছ জীবেরা আত্মা তোমাদের কান্নাকাটি করছে, এই জমিতে সাদা জ্যোৎস্নায় বেড়াবার সখ তোমাদের, বেড়াও। আমি ঈশম আল্লার বান্দা চক্ষু বুইজা থাকি। দ্যাখি না কিছু। তোমাদের লীলাখেলা দেখতে নাই। সে এই ভেবে আর বের হল না ছইয়ের ভিতর থেকে। এমন মায়া এই গাছপালা পাখির, কেউ যেন তা ফেলে চলে যেতে চায় না। আবার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা। এবং তারা নিশীথে নেমে আসে।

ওর মনে হল সেও এই জমিতে আবার একদিন নেবে আসবে। তখন সে থাকবে না। তার আত্মা বিনষ্ট হবে কি-না সে তা জানে না। সে নিজ হাতে তৈরি করেছে এই মাটি, মাটির প্রতিটি খণ্ড অংশ। সে যেন মাটি হাতে নিলেই বলতে পারে চাষের সময় কত বাকি। কোন লতা এবারে জমিতে লাগালে বড় বড় তরমুজ হবে। সে তখন তার বড় বড় তরমুজ দেখতে নেমে আসবে। ঠিক মতো চাষাবাদ হচ্ছে কি-না, চাষাবাদ হলেও সে না এসে থাকতে পারবে না।

অথবা তার মনে হল সংসারে কিছুই বিনষ্ট হয় না। কারণ, যারা এই মাটিতে জন্মেছে এবং যারা এখন আকাশে বাতাসে ঘোরাফেরা করছে, তারা এমন সুন্দর এক জগৎ দেখে স্থির থাকতে পারেনি। মানুষের অবয়বে এই তরমুজ খেতে নেমে এসেছে।

এবং এও সে ভেবেছে, দুই ফেরেস্তা, অথবা জীন পরী ঘোরাফেরা করছে এই জমিতে। সে ছইয়ের বাইরে বের হয়ে ওদের এমন লীলাখেলায় বাধার সৃষ্টি করল না। এমন কী সে যে কাশছিল, তাও দম বন্ধ করে থামিয়ে রাখছে। ধীরে ধীরে তামাক টানছে। তামাক টানলেই বুকটা হালকা লাগে। কাশি কমে যায়। সে কাশি কমাবার জন্য তামাক খাচ্ছিল, আর দূরে ফেরেস্তার লীলাখেলা দেখছে। ঈশম নিশীথের মানুষ। দিনে তার ঘুম যাবার অভ্যাস। সে যৌবনে গয়না নৌকার মাঝি ছিল। তার মনে আছে, সে রাতে রাতে গয়না নৌকা চালাত। ওর গয়না নৌকা বামন্দি, ফাওসার খালে খালে পরাপবদির নদীতে পড়ত। তারপর মহজমপুর হয়ে, আলিপুরার বাজার পার হয়ে মাঝের চর এবং পরে নাঙ্গলবন্দ, শেষে সকাল হতে না হতে নারায়ণগঞ্জের ইস্টিমার ঘাটে ইস্টিমার ঘাটে নৌকা লাগিয়ে বসে থাকা আবার সাঁজ নামলে মানুষ নিয়ে ফিরে আসা ঈশমের। সেই নিশীথের যাত্রা সুগম ছিল না। নানা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তী, ফাঁসির মানুষ ঝোলে কোথাও, পেঁচার আর্তনাদ বড় নিম গাছটায় রাতে কী যে ভয়াবহ লাগে! একবার সে ফাওসার বিলে বড় শিমুল গাছের মাথায় আগুন জ্বলতে দেখে পথ হারিয়ে ফেলেছিল—এই সবই এখন ঈশমকে নানাভাবে ভাবাচ্ছে। এই যে সে শিশু বয়স থেকে মাটির কাছাকাছি বড় হচ্ছে, সে পাইক খেলত, সামসুদ্দিনের বাপ ছিল তার শাগরেদ, ঠাকুরবাড়িতে তখন দুগ্‌গাঠাকুর আসত শরৎকালে। সামসুদ্দিনের হাত ধরে ওর বাপ আসত অষ্টমীর দিনে, আর পাইক খেলা, ছোট লাঠি হাতে ঈশম বুকের শক্ত পেশী তুলে

দাঁড়ালে গ্রামের সব মানুষ ভেঙে পড়ত। ওর অসীম শক্তি ছিল তখন। লাঠি খেলায় সে সামসুদ্দিনের বাপকে কতদিন হারিয়ে দিয়েছে, দিয়েই ওরা দুই দোস্ত হাতে পায়ে কাদা মতো ধুয়ে ফেললে কে বলবে—কিছুক্ষণ আগে রক্তচক্ষু দুইজনের, দুইজনাতে লড়ালড়ি, কে মরে কে বাঁচে ঠিক থাকে না তখন।

আর ঠাকুরকর্তা পূজা বন্ধ করে দিলেন। সেই দিন, এক দুঃখের দিন বড়, বড় ছেলে পাগল হল, তিনি ঠাকুর নদীর জলে ফেলে দিয়ে এসে বসলেন বারান্দায়, মা, আমার তুমি তামাশা দ্যাখলা! পোলা আমার ভালো না হইলে তোমার পূজা কে দেয়! তিনি পূজা বন্ধ করে দিলেন। ঈশমের লাঠি খেলা সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল। সে মহরমের দিনে লাঠি খেলায় জুত পেত না।

কী যেন সে দেবীর সামনে এতদিন দেখিয়েছে, পূজা বন্ধ বলে তার মনে ভয়, সে ভয়ে ভয়ে আর হাওয়ায় লাঠি দোলাতে পারত না। কেবল যেন এক দেবী, মা জননী, ঈশমকে বলত, তুই আমাকে আর লাঠি খেলা দেখাবি না ঈশম? আমাকে নদীর জলে রেখে আসবি না?

দশমীর দিনে ওরা যখন নৌকা ভাসাত দুগ্গা প্রতিমা নিয়ে—কি যে বিজয় উৎসব! সে তো তখন লাখের ভিতর এক। সে বড় নৌকার বড় মাঝি। সে জানত প্রতিমা দুলবে কি-না, সে জানত স্রোতের মুখে নৌকা পড়ে গেলে দেবীর চালচিত্র উল্টে যাবে কি-না। সে হালে দাঁড়িয়ে হাঁকত, মার টান হেইয়। দুই দিকে মাঠ, সামনে নদী, পানিতে শাপলা ফুল, মা জননী ভাইসা যায় জলে। এই ছিল ঈশম, সে কতবার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেবীর তরবারি জল থেকে ডুবে-ডুবে তুলে এনেছে। তরবারি, শঙ্খ, গদা-পদ্ম, সব সে এক-এক করে তুলত। কারণ, প্রতিমা জলে উপুড় হয়ে ভাসত। সে ডুবে ডুবে মাছের মতো গিয়ে তুলে আনত। কারণ, বাড়ি গেলে দোস্তের বেটা সামু জেগে বসে থাকবে। যতক্ষণ এই তরবারি সামুকে না দিতে পারবে, ততক্ষণ মনে তার শান্তি থাকে না। একবার কর্তাঠাকুরের কোন আত্মীয় এসেছিল, সে বিসর্জনের আগেই সব খুলে নিতে চেয়েছিল। কারণ বাবুর সখ, ছেলেপুলের হাতে তরবারি, চক্র এবং সেই লম্বা টিনের পাতে তৈরি ত্রিশূল দিয়ে দেবেন। নদীর জলে ডুবে গেলে তুলে আনা যাবে না।

কিন্তু ঈশম হেসে বলেছিল—কি কইরা হয়! জননীর গায়ে হাত দিতে নাই। পানিতে জননীরে না ভাসাইলে কার হিম্মত দেবীর গায়ে হাত দেয়।

সেই আত্মীয়, এমন এক চাকর মানুষের মুখে এত বড় কথা শুনে হেঁকে উঠেছিল, কেরে বেটা তুই! নাক টিপলে দুধ গলে, ভাতেরে কস অন্ন।

ঈশম বলেছিল, কর্তা, অত সোজা না। আমার নাম ঈশম। দেবীর গায়ে হাত দ্যান ত দ্যাখি।

লাগে মারামারি আর কী। ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, ওরা কত ছোট তখন। মণীন্দ্রনাথ মাত্র শৈশবের মানুষ। মণীন্দ্রনাথ বলেছিল, মামা, তা হয় না। সংসারে এমন নিয়ম ছিল তখন। ঈশম পূজার ক'দিন গয়না নৌকার কাজ বন্ধ রাখত। পূজার ক 'দিন তার নানাভাবে কেটে যাবে। সে- সব দিনে সে ভাবতেও পারেনি, ঠাকুরবাড়ির এই উড়াট জমিতে কখনও বড়-বড় তরমুজ ফলবে। সে যদি তখন থেকে এই জমিতে এসে নামতে পারত জমির চেহারা কত পাল্টে যেত আরও! বড় সে দেরি করে ফেলেছে। কত সে আত্মার বিচিত্র লীলা দেখতে পেত। অথবা তার সেই সব ফেরাস্তারা, কে যে নেমে এসেছে এখন সে টের পাচ্ছে না। সে চুপচাপ ছইয়ের নিচে বসে দেখতে পাচ্ছে না। ওরা এখন বালিয়াড়িতে কী একটা বিছিয়ে দিল। প্রায় মন্ত্র পাঠের মতো জোরে জোরে কী সব বলছে। যেন প্রায় কেউ নদীর জলে দাঁড়িয়ে কোরান শরিফ পাঠ করছে। অথবা মনে হয় নদীর জলে কেউ তর্পণ করছে। গুরুগম্ভীর আওয়াজ, আকাশ বাতাস মথিত করে উপরে উঠে যাচ্ছে। বৃদ্ধ ঈশম চুপচাপ দেখতে দেখতে এমন ভাবছে। সে আরও ভাবছে কিছু, সে মনে করতে পারছে না, সেটা কোন সাল, কোন সালে বড়কর্তার বিয়ে হল। বিয়ের বছরই তিনি পাগল হলেন, না পরে! বিয়ের পর তিনি সাত-আট মাস এখানে ছিলেন না। চাকরিতে গিয়ে সাত-আট মাস নিজের এই পাগলামি রোখার চেষ্টা করেছিলেন। সরকারি চাকরি, কতদিন আর পাগলামি করে রাখা যায়। সেবারেই তিনি ঘরে ফিরে আসেন, নানা রকমের লতাপাতাব ডাল এবং মূল নিয়ে আসেন। অদ্ভুত মানুষের ইচ্ছা। সবাই ওঁকে আনতে গেল, ফাওসার খালে গয়না নৌকা লেগে আছে। ঈশম নৌকা বেঁধে বসে রয়েছে। এত গাছপালা, বিচিত্র সব গাছ, সে জানেও না কোনটা কী গাছ। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে লোক আনিয়েছে সে। যারা এসেছিল তারা দেখল মণীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সব বিদেশী লতা এবং মূল নিয়ে এসেছেন। তার ভিতরে ছোট একটা পাইন গাছ, কিছু ঝাউ জাতীয় গাছ, এবং একটা তরমুজের লতা। বুড়োকর্তা নিজে এসে যখন এমন দেখলেন, চোখ ফেটে তার তখন জল আসছিল। একেবারে মাথাটা গেছে। কিছু নেই সঙ্গে। শুধু কিছু গাছপালা এবং কীট-পতঙ্গ নিয়ে ফিরছেন।

নৌকা খালি করে সব তুলে নিয়ে যেতে হল। না নিলে মানুষটা ঘরে ফিরবেন না, কেবল অলক্ষ্যে যা-কিছু ফেলে দেওয়া যায়। ওঁরা অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং শচি সব কীট-পতঙ্গ মাঠে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিছু ফুলের ডাল, যেমন বোগেনভেলিয়ার ডাল, ম্যাগনোলিয়ার শাখা এবং নানা জাতীয় ঝাউ গাছের চারা টবে ওঁরা বাড়ি এনে হাজির করেছিলেন। ঈশম নৌকা সাফ করতে গিয়ে দেখল একটা লতা, এ অঞ্চলে তরমুজ হয় না, ক্ষিরাই হয়, এর মনে হয়েছিল ওটা ক্ষিরাই লতা। কিন্তু নীল-নীল আভা এবং পাতাগুলি বিচিত্র রঙের। সে ওটা নিয়ে গয়না নৌকার গেরাফি ফেলে উঠে এসেছিল। এসে বলল, ঠাইনদি এডা রাখেন। এড়া একড়া লতা। কি লতা দ্যাখেন।

সবাই দেখল। বড়বৌ কেবল দেখল না। সে বিছানায় পড়ে তখন নাবালিকার মতো কাঁদছে। শিয়রে শচীন্দ্রনাথ বসে ছিলেন। দক্ষিণের ঘরে, মানুষজনের ভিড়। ভূপেন্দ্রনাথ

সবাইকে ভিড় করতে বারণ করছে। তরমুজের লতাটা কেউ ভালোভাবে দেখল না। একটা বিষাদ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। কেউ এ-নিয়ে কিছু বলছে না। সে লতাটা ফেলে দিতেও পারছিল না। সে কী যে করে তখন—সে ভাবল যেখানে নদীতে চর জেগে উঠেছে, এবং উড়াট জমি, কিছুই ফলছে না, বালি জমিতে কোনও চাষাবাদ হয় না, সেখানে এই লতা রোপণ করে রাখলে হয়। যদি ক্ষিরাই হয়, তবে মাস না ঘুরতেই ফুল ফুটবে। হেমন্তকালেই লতা লাগানো হয়। সে বড় নৌকার মাঝি, এবং দায়ে আদায়ে সে বাড়ির মানুষের শামিল, তার কিছুতেই লতাটা ফেলে দিতে ইচ্ছা করল না। সে নদীর চরে নেমে খুব যত্ন করে লতাটা রোপণ করল। চারপাশে মাদারের ডাল দিয়ে বেড়া দিল। এবং প্রতি সন্ধ্যায় সে গিয়ে দেখতে পেত, গাছটা ক্রমে বড় হচ্ছে—কী গাছ অর্থাৎ কী লতা এটা, কী ফল দেয়, কোন মাসে ফল ধরে, নাকি কোন বন্য লতা, এসব দেখার এক অতীব বাসনা ঈশমের। সে গয়না নৌকা নিয়ে এলেই, ফাওসার খালে গেরাফি ফেলে উঠে আসত। সে বিবির কাছে প্রথম উঠে না গিয়ে এই গাছটার পাশে দাঁড়াত। বড় বেশি সজীব এই গাছ। সে একদিন দেখল কী সুন্দর লতা ছড়িয়ে দিয়েছে চারপাশে। সে একদিন এসে দেখেছিল গাছটায় পাগল ঠাকুর নদী থেকে জল এনে দিচ্ছে। এবং হলুদ রঙের ফুল ফুটলে সে দেখল গোড়ায় তার কালো রঙের ফল। কুমড়ো নয়তো আবার। না তা হবে কেন। সে সব জানে, গাছ চেনে, শুধু এ গাছটা বিবি তার মাঝে-মাঝে বিরক্ত হতো। কী এত আকর্ষণ সেই গাছে! সারাক্ষণ একটা লতা নিয়ে উড়াট জমিতে সে ডুবে আছে!

আর কিনা সেই বৎসরই দুটো বড় তরমুজ হল। তরমুজের লতা তবে এটা। ভিতরটা কী লাল। যেন চিনির রসে ভেসে যাচ্ছে ভিতরে। সে তরমুজ তুলে সব লতা কেটে-কেটে জাগ দিয়ে রাখল। এবং যখন গয়না নৌকার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, দুই গরু নিয়ে সে হাল চাষে নেমে পড়ল। বুড়োকর্তা বলেন তুই কী পাগল! ও জমিতে কিছু হয় না। উড়াট জমি। তর এই প্রাণপাতে কী কাজ! বলে তিনি বুঝি বুঝতে পেরেছিলেন, অভাব-অনটনে ঈশম এবার কাজ চায়। বয়স হয়ে যাচ্ছে। আর মুরদ নাই শরীরে গয়না নৌকার দাঁড় বাইবার। সে এ বার কাছে-পিঠে বিবির কাছে থাকার জন্য একটা কাজ চায়।

তিনি বললেন, তুই তবে বাড়িতে থাক। কাজ কাম কর। তর বৌটার অসুখ। তারিণী কবিরাজের কাছ থাইকা অষুধ নিয়া আয়।

সেই থেকে সে বুঝি থেকে গিয়েছিল। না, ঠিক সেই থেকে নয়। ওঁরা যা বুঝেছিলেন তা নয়। জমি বন্ধ্যা, চাষ-বাস হবে না, এমন নদীর পাড়ের জমি, জমিতে তরমুজ ফলবে, জমিতে সব ফসল হয় না—যার যা, তার তা। আসলে সে প্রাণপাত করে এই মাটির সঙ্গে প্রায় সেদিন লড়াইয়ে নেমেছিল।

সেই এক লড়াই। মাটির সঙ্গে মানুষের লড়াই। পুরাকালে যেমন মানুষ আগুন জ্বালতে জানত না, পশুপাখি মেরে কাঁচা খেত, ফলমূল আহার করত, ঈশমেব মুখ দেখলে তখন এমনই মনে হতো। সবাই কী হাসাহাসি করত ঈশমকে নিয়ে। সবাই বলত ,

ঈশমটাও পাগল হয়ে গেছে। দু'তিন বিঘার মতো শুধু বালির চর। এ-অঞ্চলে এমন জমিতে কে আবার চাষাবাদ করে! কিন্তু ঈশম সূর্যের মতো লাল রঙ নিয়ে এল মাঠে। চৈত্র মাসে মানুষের চোখে বিস্ময়। ঈশম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে খেতের তরমুজ কেটে খাওয়াচ্ছে। ভিতরটা তরমুজের কী লাল! কী লাল! সে সবাইকে বলত, ক্যামন লাগে? মিসরির শরবত কইরা দিছি। চৈত মাসের আগুন জ্বলছে চাব পাশে। খরা দাবদাহে সূর্য পর্যন্ত আকাশ ছেড়ে পালাচ্ছে আর তখন কিনা ঈশম বলছে, কি লাল দ্যাখেন ভিতরটা। খান। য্যান মিসরির দানা।

সেই ঈশম এখন কাশছে। সে তরমুজের সব লতার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছে—ওরা নদীর পাড়ে পাড়ে এবং তরমুজ খেতের ভিতর হাঁটাহাঁটি করছে। কখনও ছুটছে স্ত্রীলোকটি পুরুষটি পিছনে তাড়া করছে। কখনও ওরা চুপচাপ একটা তরমুজের ওপর পাশাপাশি বসে থাকছে। কিছু বলছে না। আকাশে কি সব দেখছে। আবার কখনও ধীরে-ধীরে ওরা ঘন হচ্ছে, সংলগ্ন হয়ে আলিঙ্গনে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকছে। ঈশম নিজেকে বলল, হ্যাঁ, মনুষ্যকুলের তুমি, দেব-দেবীর সুধা পান কর।

সে ভেবেছিল কিছু দেখবে না। কিন্তু এমন খেলা না দেখে থাকা যায়! নতুন কিংবদন্তী ফের ধর্মের মতো একদিন ঢাক-ঢোল বাজাবে! এই নদীর চরে, তরমুজ খেতে মনুষ্যকুলের কেউ হবে। ইহলীলা সাঙ্গ হলে ওরা সবাই আবার নেমে আসে। পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দর দৃশ্য এখন এই জমিতে। সে কিছুতেই কাশছে না। দম বন্ধ করে পড়ে আছে। এখানে একজন মনুষ্য জাগে, টের পেলেই ওরা অন্তর্ধান করবে।

আহা, কী সুন্দর সুদৃশ্য এই জগৎ। পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কী সুখ। অনন্তকাল এই পৃথিবী এবং সৌরজগৎ আপন মহিমায় আবর্তন করছে। মানুষ কীট-পতঙ্গ পশু-পাখি দলে-দলে মিছিলের মতো, ঘুরছে-ফিরছে। হাজার লক্ষ অথবা কোটি-কোটি বছর ধরে ঘুরছে-ফিরছে। এই যে এক তরমুজের জমি, এখানে এবার নেমে এস তোমরা। এলেই দেখতে পাবে—প্রায় সাদা মোমের মতো এক নারী-মূর্তি, এবং হাতির মতো শক্ত অবয়বে এক পুরুষের আশ্চর্য লীলা। কেউ টের পেল না। একমাত্র ঈশম চুরি করে সব দেখে ফেলেছে। সে বলল, আমি ঈশম, বড় ভাগ্যবান মানুষ। যেন বলার ইচ্ছা, আমার আর কষ্ট কী! আমার জমিতে জিন ফেরেস্তার আবাস। সুখের আমার অন্ত নাই।

ঘুম ভাঙতে ঈশমের বেশ বেলা হল। খুব সকালে ঘুম ভাঙার অভ্যাস। আজ বেলা হওয়ায় সে নিজের কাছেই কেমন ছোট হয়ে গেল। খুব সকাল সকাল সে ঠাকুরবাড়ি উঠে যায়। গোয়াল থেকে গরু বের করতে হবে। মাঠে গরু দিয়ে আসতে হবে। গরুর ঘর পরিষ্কার করা, তারপর বাজারে যেতে হতে পারে। তাকে এত বেলা পর্যন্ত না দেখে ছোটকর্তা আবার এদিকে নেমে আসতে পারেন। সে ছইয়ের ভিতর থেকে উকি দিল। না, আসছেন না। একটু তামাক খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভোরের দিকে এখনও ঠাণ্ডা ভাবটা থাকে। ক'দিন থেকে কুয়াশা পড়ায় সকালের দিকে ঠাণ্ডা ভাবটা কিছুতেই যেতে চায় না।

ঘুম ভাঙার পর আর একটা চিন্তা বেশ ওকে পেয়ে বসেছে। গত রাতে সে কিছু যক্ষ রক্ষ অথবা জিন পরী কিংবা ফেরেস্তা হতে পারে—নাকি প্রথম মানব-মানবী সেই আদম-ইভ! কারা যে সারারাত জমিতে বিহার করে গেল, সে যে এখন কাকে কীভাবে এর ব্যাখ্যা দেবে বুঝতে পারছে না। সে স্বপ্ন দেখছে। না, তা' কী করে হয়! সে তখন তামাক খাচ্ছিল, খুব কাশি পাচ্ছে বলে তামাক খাচ্ছিল এবং যতক্ষণ ওরা বিহার করেছে ততক্ষণ সে দম বন্ধ করে বসেছিল—তবে সে কী করে স্বপ্ন দেখবে! সে স্পষ্ট মনে করতে পারছে, ভোর রাতের দিকে ওরা নদীর পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্তর্ধান করেছে। ছইয়ের ভিতর মানুষ আছে বলেই তার কাছাকাছি ওরা আসেনি।

সে গ্রামে উঠে যাবার সময় দেখল শশীমাস্টার অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছেন। বাড়ির ছেলেরা ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। ছুটির দিন। স্কুলে যাবার তাড়া নেই। দাঁত মটকিলা ডালে ঘষে ঘষে ফেনা তুলে ফেলেছে। সে ওদের দেখেই বলল, বুঝলেন নি, মাস্টারমশায়, এক তাজ্জব ঘটনা খেতের ভিতর।

—কি তাজ্জব ঘটনা? মুখের ভিতর বোধ হয় ডালের দুটো একটা আঁশ ঢুকে গেছিল। সেগুলি থুথু ফেলার মতো ফেলে দিতে দিতে কথাটা বললেন শশীমাস্টার।

—কি যে কমু আপনেরে! ওডা যে কার দেবতা, আপনেগ না আমাগ ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না!

—কী হয়েছে বল না?

—দুই ফেরোস্ত মাস্টারমশয়।

—ফেরেস্তা!

—ফেরেস্তা না হইলে মনে লয় আপনেগ দুই দেব-দেবী। রাইতের জ্যোৎস্নায় একেবারে পাগল হইয়া গ্যাছে। তরমুজ খেতে সারা রাইত ঘুইরা ফিরা বেড়াইছে।

শশীভূষণ হা হা করে হেসে উঠলেন। —খুব আজগুবি গপপো তুমি যা হোক বললে একটা।

—কি কাণ্ড! আপনের বিশ্বাস হয় না?

—তুমি কী মিঞা বুড়ো বয়সে আফিং ধরেছ?

—কি যে কন! সে কেমন ছোট হয়ে গেল মাস্টারমশাইর কাছে। সে আর দাঁড়াল না। ভিতরে ভিতরে সে চটে গেছে। —তা আপনেরা লেখাপড়া জানেন। আপনেগ কাছে এডা আফিংখোর মানুষের গল্প। তারপর সে হাঁটতে আরম্ভ করল। এ সব মানুষেরা আল্লা যে কত মহান, কী তাঁর বিচিত্র লীলা কিছু বোঝে না। সামান্য মনুষ্যজাতির কী সাধ্য তাঁরে বোঝে—সে খুবই অকিঞ্চিৎকর মানুষকে লীলারহস্য বলতে গিয়েছে। যাঁকে বললে চোখ বড় বড় করে শুনবে তিনি বড়মামি, এ-সংসারের বড়বৌ। সে দেখল বড়মামি স্নান করে তারে কাপড় মেলছেন। চুল থেকে টপটপ করে জল পড়ছে বড়মামির। কাপড় রোদে মেলে দিয়েই চলে শুকনো গামছা পেঁচিয়ে খোঁপা বাঁধবেন। খোঁপা বাঁধার অপেক্ষাতে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

বড়বৌ দেখল আতা বেড়ার পাশে ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলবে, কিছু বলার সময়ই সে চুপচাপ এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। —কিছু বলবে আমাকে?

—বড়মামি, কাণ্ড একখানা।

—কী কাণ্ড ঈশম?

ঈশম সব বললে, বড় বৌ বলল, তা হবে। এমন নদী আর তার বালুচর, তরমুজের খেত, আর ঈশমের মতো মানুষ যেখানে আছে—সেখানে ওনারা নামবেন না তো কারা নেমে আসবেন!

—তবে তাই কন। শশীমাস্টার মনে করেন বইয়ের ভিতরই সব লেখা থাকে।

—তা কি থাকে! কত কিছু আছে এ জগতে, যার মানে সামান্য মানুষ কী করে বুঝবে! বইয়ে সব লেখা থাকে না ঈশম তুমি ঠিকই বলেছ।

—আমি নাকি আফিং খাই বইলা এমন দ্যাখছি।

—তোমাকে ঠাট্টা করেছে।

—না মামি, এ-সকল আউল-বাউল নিয়া আমার ঠাট্টা-তামাশা খারাপ লাগে। ওনারা লীলাখেলা করেন। আমি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বইসা থাকি। কাছে যাই না। কাছে গ্যালে ওনারা রুষ্ট হন! কী, হন কি-না কন!

—তা হয়। এ ছাড়া বড়বৌর আর কিছু বলার ছিল না। সাদা জ্যোৎস্নায় কুয়াশার ভিতর সে বোধ হয় অন্য এক জগতে যথার্থই চলে গেছিল গত রাতে। সেই রহস্যময় জগতে তাকে আবার নেমে যেতে হবে। না গেলে মানুষটাকে এত কাছে আর জীবনেও

পাবে না। জানালা খুলে রাখলে সাদা জ্যোৎস্নায় তার আবার কোনও না কোনওদিন তরমুজের জমিতে নেমে যাবার ইচ্ছা হবেই। সে দেখেছে গত রাতে মানুষটা তার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছিল। আত্মনিগ্রহে আর নিজেকে কোনও কষ্ট দেয়নি। এই আত্মনিগ্রহ থেকে রক্ষার জন্য বড়বৌ সুযোগ এবং সময়ের অপেক্ষায় থাকে। মধ্যরাতে তারা বালির চরে আদম-ইভের মতো ঘোরাফেরা করে। ঈশম ছইয়ের ভিতর তেমনি বসে থাকে। কোনও কোনও দিন ঘুমিয়ে থাকে। কখনও ডঙ্কা বাজায়। কখনও সে আর এক নূতন কিংবদন্তী সৃষ্টির জন্য তামুক খেতে খেতে এই ভিটা জমিতে বড় একটা অশ্বত্থ লাগিয়ে দেবে ভাবে এবং একদিন সে সিন্নি দেবে গাছের নিচে এমনও ভাবল। মনে হয় তার তখন, হাসান পীর অথবা অন্য আউলেরা আসবে গাছের নিচে। ওরা সবাই বলবে আল্লার নামে সিন্নি দে ঈশম। আমরা দুইটা খাই। কারণে অকারণে ঈশম ছইয়ের নিচে শুয়ে থাকলে, মধ্য যামিনীতে এমন সব আধিভৌতিক রহস্যের ভিতর ডুবে যায়।

কিন্তু একবার বড়বৌ ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। ওরা দু'জন বালির চরে চুপচাপ বসে মধ্য যামিনীতে গল্প করছে। সেই শৈশবের গল্প। মানুষটা তার শুনছেন কি শুনছেন না সে বুঝতে পারছে না। কখনও দুটো একটা কথা সংগোপনে বলতেন। সেও খুব সহসা সহসা! বলতেন যেমন, বড়বৌ, আমাকে কি দরকার ছিল বাবার মিথ্যা তার করার?

তিনি বলতেন, দেখা হলে আমি কি বলব তাকে। সে তো আবার ফিরে আসবে।

বড়বৌ মনে মনে হাসত। মানুষটার বিশ্বাস এখনও সে কোথাও না কোথাও তার অপেক্ষায় আছে। বড়বৌ তখন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলত—তুমি যাবে! আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব! কিন্তু কথা দিতে হবে অকারণে তুমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে না। গ্যাৎচোরেৎশালা বলতে পারবে না! কথা দাও আমাকে, তুমি ভালো হয়ে যাবে। তুমি ভালো হয়ে গেলেই, আমি যে-ভাবে পারি তাঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

তিনি আর তখন কথা বলতে পারতেন না। সারাক্ষণ বড়বৌর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর বুঝি কখনও কখনও ঘুম এসে যেত। নদীর চরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বড়বৌ জেগে থাকত শিয়রে। মানুষটা এ-ভাবে ঘুমাতে পারলেই ভালো হয়ে যাবেন। সে এক রাতে শিয়রে পাহারা দেবার সময় নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালির চরে পাতলা সিল্কের ওপর ওরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে ছিল। খুব সকালে মসজিদের আজানে ঘুম ভেঙে গেল তার। সে উঠে দেখল মানুষটার আগেই ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি পদ্মাসন করে বসে আছেন। সকাল হয়ে যাচ্ছে তবু ভ্রুক্ষেপ নেই। বড়বৌর খোঁপা খুলে গেছে। উঠেই সে তার খোঁপা বেঁধে মানুষটাকে বলল, তাড়াতাড়ি এস। ভোর হতে বাকি নেই। বড়বৌ প্রতিবেশীদের কাছে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে ভোর রাতের অন্ধকারে ছুটছিল। কারণ, আর একটু হলেই ঈশমের কাছে ধরা পড়ে যেত।

পথে মঞ্জুরের সঙ্গে দেখা। —ঠাইরেন, এই সাতসকালে মাঠে!

বড়বৌ বলল, আপনার দাদার কাণ্ড। ভোর রাতে বের হয়ে যাচ্ছেন। ধরে আনলাম নদীর চর থেকে।

সেই থেকে বড়বৌ আর সাহস পায় না। মানুষটা মাঝে মাঝে ঘুমাতে পারলে ভালো হয়ে যাবেন—সেই আশায় মরিয়া বড়বৌ নেমে যেত। কলঙ্ক রটতে কতক্ষণ।

একা একা স্বামীর হাত ধরে অন্ধকারে অথবা ম্লান জ্যোৎস্নায় স্বামীর জন্য সে কিছুই ভ্রুক্ষেপ করত না। কিন্তু এখন আর পারে না। কারণ ভালো হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই তাঁর। জানালা খোলা থাকলে সে তেমনি দূরের মাঠ দেখতে পায়। কোনওদিন সেই মাঠে তার প্রিয় মানুষ পাগল ঠাকুরকে দেখতে পায়। একা একা মানুষটা আত্মনিগ্রহে চলে যাচ্ছেন। যেন পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত এই আত্মনিগ্রহ। সে জানে, যদি এই মানুষের সঙ্গে নদীর চরে নেমে যাওয়া যেত তবে আর তিনি দূরে যেতেন না। সকাল না হতেই সে তার ঘরের মানুষ ঘরে নিয়ে ফিরতে পারত।

মানুষটার জন্য আর যা হয়, যখন তখন অবোধ মন তার ভার হয়ে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রাতে এই মানুষ ফিরে না এলে সে জানালা থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। মনে হয় তার মানুষটা তখন কোন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ-ভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একদিন রাতে বড়বৌ দেখল মাঠের ও-পাশে কিছু মশাল জ্বলে উঠছে। একটা দুটো করে অনেক ক'টা মশাল। মশালগুলি নদীর পাড়ে পাড়ে অদৃশ্য হতে থাকল। ওরা ধ্বনি দিচ্ছিল, আল্লা-হু-আকবর।

তখন সকলে যে যার মতো ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা এ-সব হিন্দুগ্রামে আগুন দেবে বলে উঠে আসতে পারে। বড়বৌ এবং ছোট ছোট শিশুরা, ধনবৌ গ্রামের নারী এবং শিশুরা যে যার মতো ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিত। বাসন পত্র সব কুয়োতে ফেলে দেওয়া হতো। ছাই গাদার নিচে গয়নার বাক্স। আর হিন্দু যুবকেরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোপাটে ধ্বনি তুলত, বন্দে মাতরম্!

হাজিসাহেবের ছোট ছেলে আকালুর কাণ্ড এসব, সে-ই এখন এসব করাচ্ছে। পাশের গ্রামে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সে দশ-বিশ ক্রোশ দূরে-দূরে কোনও কোনও হিন্দু গ্রামে আগুন দিয়ে ফিরছে। তাকে ধরা যাচ্ছে না। সে আছে বেশ তার মতো। কারণ, ওরা দলে ভারি। শহর থেকে মানুষ আসে। কেউ বলছে ওরা ঢাকা শহরের মানুষ না, ওরা এসেছে কলকাতা থেকে। কেউ কেউ বলছে আকালুর এতে হাত নেই। আরও বড় গোছের নেতা এসব করাচ্ছে।

কী যে হয়ে গেল দেশটাতে!

ঈশম নদীর চরে বসে তামাক খায় আর আবোল তাবোল বকে। মিঞারা খুব যে খোয়াব দ্যাখতাছ! অগ খেদাইবা কোন দ্যাশে। নিজের দ্যাশ ছাইড়া কবে কেডা কোনখানে

যায়!

তখন সে শুনতে পায় নিশীথে কারা সব চিৎকার করছে নদীর ও পাড়ে। আল্লা-হু আকবর ধ্বনি দিচ্ছে। নারায়ে তকদির ধ্বনি উঠছে। এ-পাশের হিন্দু গ্রামে ধ্বনি উঠছে—বন্দে মাতরম্।

ভারত মাতা কী জয়! ওপাশে ধ্বনি উঠছে-পাকিস্তান জিন্দাবাদ। তখন ঈশম মাঝখানে বসে হা হা করে হাসে। কার দ্যাশ, কে বা দিবে, কে বা নিবে!

এ দুটো সাল বড় দুঃসময়ের ভিতর কাটছে। যে যার মতো সুপারির শলা শানাচ্ছে। যেন দুঃসময়ের শেষ নেই। আগে পলটু ওর ছোটকাকার সঙ্গে শুত, কিন্তু এখন শোয় সে তার মার সঙ্গে। রাতে মা আজকাল একা শুতে ঘরে ভয় পান। বাবা থাকেন না রাতে। ওর এক ভয়। যখন মুসলমান গ্রামগুলিতে ক্রমে ধ্বনি উঠতে থাকে—নদীর পাড়ে পাড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সেই ধ্বনি বড় ভয়াবহ। বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সবাই কেমন ঘোলা ঘোলা চোখ মুখ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। দূর দেশের নানা রকম দাঙ্গার খবর আসে। নৃশংস সব ঘটনা ঘটছে কোথাও। কিভাবে যে এটা হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। কেবল সামসুদ্দিন জানে—ডাইরেক্‌ট অ্যাকশানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সুরাবর্দি সাহেব পরের হুঁকোতে তামাক খাচ্ছে। নদীর জলে মরা গরু-বাছুর ভেসে যায়। গরু-বাছুর না মানুষ কেউ ইচ্ছা করে আর দেখতে যায় না।

ঘোর দুঃসময়ে বড়বৌ যত ভাবে এটা দীর্ঘস্থায়ী নয়, সব ঘোর কেটে যাবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, তরমুজ খেতে সাদা জ্যোৎস্না উঠবে—তবু নিশীথে তার প্রাণে ভয়। সে এখন একা আর ঘুম যেতে পারে না। কারণ, আজকাল কী যে হয়েছে তার! সেই যে আছে না এক ষণ্ড, অতিকায় ষণ্ড, নদীর পাড়ে, তরমুজ খেতে, ভিটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, এক চোখ যে ষণ্ডের, কালো রঙ, গলকম্বল তার ধরণীতে লুটায়— চার পা যেন কাঠের আর এত শক্ত এবং এমন বলশালী যে মনে হয় এত দিনের এক সঙ্গে বসবাস মুহূর্তে বিদীর্ণ করে দেবে। সেই ষণ্ডের দিকে ভয়ে আর তাকান যাচ্ছে না। সেই দিনের মতো ষণ্ড আবার ক্ষেপে গেছে। সেই যে একদিন আন্নু, মরি-মরি করে প্রাণ বাঁচানো দায়, শিংয়ের গুঁতো মারলে পেট এফোঁড়-ওফোঁড়—কে আর তখন কাকে রক্ষা করে! প্রাণভয়ে আম্মু সে যাত্রা গরম ফ্যান ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

রক্ষা পেল আন্নু, আর চোখ গেল ষণ্ডের। গরম ফ্যান মুখে ঢেলে দিতেই একটা দিক সাফ হয়ে গেল। দগদগে ঘা। ঘায়ের জ্বালায় কী বড় বড় ডাঁসের (প্রকাণ্ড মাছি) জ্বালায় ছুটত বোঝা যেত না। অনবরত মাঠে নিশিদিন লেজ তুলে ছুটছে। বড়-বড় ডাঁস কামড়ে খোদল করে ফেলেছে ঘা। ঘায়ের জ্বালায় ষণ্ড মরে। রাতদুপুরে দিনদুপুরে ষণ্ড দৌড়ায় ঘায়ের জ্বালায়, সেই যে বলে না-জ্বালা মরে না জলে, জ্বালা সহে না প্রাণে, জ্বালায় মাসাধিককাল মাঠে-মাঠে একবার পুবে আবার পশ্চিমে ছুটছে ষণ্ড। আন্নু যে ষণ্ডের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল, কখনও সে কাউকে ভুলেও বলেনি। কারণ ষণ্ড, ধর্মের ষণ্ড,

হাজিসাহেবের পেয়ারের ধন। ছোট পোলার মোতাবেক মানুষ। সে গোপন রেখেছে। না রেখে তার উপায় ছিল না। সে এই ষণ্ডের মুখ না পোড়ালে প্রাণে বাঁচত না, ফেলু মরত, বাছুরটা হাওয়া হয়ে যেত। সে এমন এক বেতমিজ কামকাজ করেই দেখল ষাঁড়টা সুড়সুড় করে পোষ-মানা জীবের মতো মাঠের দিকে নেমে যাচ্ছে। তারপরই যন্ত্রণায় এবং জ্বালায় মাঠের উপর দিয়ে সেই যে লেজ তুলে ছুটতে থাকল, ছোটার আর বিরাম নেই। তবু ষণ্ড আগে দু'চোখে দেখতে পেত। এখন এই দুঃসময়ে ষণ্ডের এক চোখ গিয়ে ঠেকেছে, শালা এক চোখে আর কত দেখতে পাবে! ফলে তার ভয় ফেলুকে, ফেলুর বিবিকে। কেবল ফুঁসে-ফুঁসে মরছে ষণ্ড। কী করে যে বাগে পাবে ফেলুকে আর তার সেই আদরের বাগি গরুটাকে। পেলেই লম্বা শিঙে পেটে শূল বসাবে।

ঠিক এই ষণ্ডের মতো এক অতিকায় ভয় এই দুঃসময়। বড়বৌ এবং তার পরিবার অর্থাৎ এই হিন্দু পল্লীতে-পল্লীতে অতিকায় একচক্ষু দানব ক্রমে বড় হচ্ছে। ক্রমে নিশীথে ঘোরাফেরা করছে তারা। হাত-পা তার নিকষ কালো। এবং ঘন-ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাসে যেন সব নিঃশেষ করে দেবে এবার। সে নিশীথে শুয়ে থাকলে টের পায় হাজার হাজার মশালের আলোতেও কেউ সেই দানবকে পুড়িয়ে মারতে পারছে না। একচক্ষু দানবের ভয়ে গোটা দেশ রসাতলে যাচ্ছে।

আল্লা-হু আকবর ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে শশীমাস্টার শচী আর যুবা পুরুষেরা উঠে পড়ে বিছানা থেকে। কখনও কখনও ওরা সারা রাত ঘুম যায় না। গ্রাম পাহারা দেয়। আবার কোনও রাতে ওরা অন্ধকারে দরজা খুলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। আলো জ্বালে না কেউ। ভয়ে গুটি গুটি বের হয়ে ডাকে, আপনারা কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছেন না! একটা গুম-গুম আওয়াজ উঠছে! মনে হয় না হাজার-হাজার মানুষ অন্ধকারে চুপি-চুপি আপনাদের পুড়িয়ে মারার জন্য ছুটে আসছে! সবাই আর ঘুম যেতে পারে না তখন। জেগে বসে থাকে —কখন আক্রমণ ঘটবে এই আশঙ্কায়।

কী যে হল এই দেশে! মুড়াপাড়ার সেই গণ্ডগোলের পর থেকেই এমন হল। সেদিন যে কী তারিখ ছিল, মনে করতে পারছে না বড়বৌ। সব এখন ভুল হয়ে যাচ্ছে। সকালে উঠেই বড়বৌ পুকুর পাড়ে দেখেছে কারা যায়। সার বেঁধে যায়। লুঙ্গি পরে, মাথায় কালো রঙের ফেজ এবং হাতে সবুজ রঙের নিশান। ওরা ধ্বনি দিতে-দিতে যাচ্ছিল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। ওদের ভিতর কোনও চেনা মুখ চোখে পড়েনি। কেবল সে ফেলুকে দেখেছে। ফেলু ভাঙা হাত নিয়ে যাচ্ছে। একটা দড়ি ডান হাতে। কোমরে কোরবানীর চাকু গোঁজা। আর ওর সাধের বাগি গরুটাকে সে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে— সে মাঝে মাঝে লেজ মুচড়ে দিচ্ছে। নয়তো যেন একসঙ্গে যাওয়া যাবে না। মিছিলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যেতে না পারলে নামাজ পড়া হবে না।

তার ক'দিন আগে ঢোল বাজছিল নিশিদিন। শচী এসে বাড়িতে খবর দিয়েছেন— হাটে হাটে একটা লোক ঢোল পিটিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ঢোল বাজাতে-বাজাতে বলছিল,

তার নাম মহম্মদ, ধর্মের নাম পবিত্র ইসলাম। ধর্মকর্ম সব তুইলা নিজেরা কাফের বইনা যাচ্ছেন! এমন বলছিলেন। বলছিলেন, যান দ্যাখেন গিয়া। কালী বাড়ি পার হয়ে, মসজিদে তিনি যে আছেন, থাকেন, কতকাল আছেন টের পান না, খান দান ঘুমান আর কাফের তার কালীবাড়ির পাশে নামাজ পড়তে দিব না কয়। নামাজ না পড়লে গোনাগার হইতে হয়। তারপর সে ড ড ড করে ঢোল বাজাতে-বাজাতে বলে, দীন এলাহি ভরসা। এই সব বলে কী যে বলতে হয় সঠিক সে জানে না, তাকে লিখে দিয়ে গেছে লীগের পাণ্ডা আলি সাহেব। তিনি ভাল ভাল ভাষায় লিখে দিয়ে গেছেন। ঢুলি মুখস্থ করে ব্যাকরণের ধর্ম মানছে না। নিজের মতো করে বলে যাচ্ছে, আর ঢোল বাজাচ্ছে। বলছে, সেই এক গাঁ জমিদারবাবুদের। ফ্লুট বাজে দশমীর দিনে। বাবুদের বাড়ি-বাড়ি হাতি বাঁধা। কিবা বাহার দ্যাখ রে হাতির। হাতি যায় যুদ্ধে। তারপরই সে ফের ঢোলের কাঠি পাল্টাল। বলল, মানুষ যায় যুদ্ধে। ধর্মযুদ্ধে। হাজার হাজার মানুষ শীতলক্ষ্যার চরে দাঁড়িয়ে ধর্মযুদ্ধের জিগির দিচ্ছিল সেদিন।

হাতিটা এখন আর পীলখানার মাঠে বাঁধা নেই। যুদ্ধের সময় হাতিটাকে সেই যে নিয়ে গিয়েছিল কর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আর ফিরিয়ে আনতে পারেনি। হাতি যুদ্ধে গিয়ে পাগল হয়ে গেছিল এবং হাতির প্রাণনাশ হতেই জসীম একা-একা ফিরে এসেছিল। সেই জসীম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে একা-একা বকবক করেছে।

জসীম সকাল থেকেই গাছটার নিচে বসে বসে দেখছে। সেই সকাল থেকে পায়ে হেঁটে নৌকায় করে হাজার-হাজার মানুষ জড় হচ্ছে চরে। ওরা সেই ভাঙা মতো শ্যাওলা-ধরা, ভগ্নস্তূপের পাশে হাঁটু মুড়ে নামাজ পড়বে। মিনার অথবা গম্বুজের কোনও চিহ্ন নেই। ভাঙা ইটের সারি সারি কঙ্কাল। আর অজস্র ঝোপঝাড়। বাজারের দোকানপাট বন্ধ। দু'জন সিপাই কালীবাড়ি ঢোকার রাস্তায় বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দলটা লুট পাট আরম্ভ করতে পারে। নামাজ পড়া শেষ হলেই ওরা মশাল জ্বালিয়ে বাজারের সব হিন্দু দোকানগুলিতে আগুন দিতে পারে, বাবুদের বাড়ি-বাড়ি মশাল নিয়ে আক্রমণ করতে পারে। বাড়ির ছাদে-ছাদে তখন সব মানুষ। লোহার সব দরজা বন্ধ। একটা পাখি পর্যন্ত উড়ছে না ভয়ে। কেমন নদী মাঠ চর চার পাশটা থমথম করছে। সে ভূপেন্দ্রনাথকে গতকাল স্টিমারে নারায়ণগঞ্জে যেতে দেখেছে। আজ সকালে স্টিমারে তিনি ফিরে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে পুলিশ সাহেব নিজে। এবং এক কুড়ি হবে বন্দুকধারী সিপাই। রূপগঞ্জের দারোগাবাবু বাবুদের কাছারি-বাড়িতে দু'দিন থেকে পাহারা দিচ্ছেন। বাবুদের বৌরা-মেয়েরা শহরে চলে গেছে। ওঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। যারা জোয়ান, যারা বন্দুক চালাতে জানে এবং লাঠিখেলায় ওস্তাদ সেইসব মানুষ আছে কেবল। ওরা এখন গ্রামটাকে পাহারা দিচ্ছে।

কালীবাড়ি, আর সেই ভাঙা ইট-কাঠের জঙ্গলের চার পাশটায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে। কোন্ মানুষের সাধ্য সেদিকে এগুবে। এপারে বন্দুক হাতে সিপাই। শীতলক্ষ্যার চরে হাজার-হাজার মানুষ। মাঝখানে সড়ক। ওরা সড়ক অতিক্রম করে

নামাজ পড়ার জন্য উঠে আসতে পারে। ভয়ে সিপাইরা বন্দুক উচিয়ে রেখেছে। একটা গরু দেখতে পাচ্ছে চরে। কোরবানীর জন্য গরুটাকে বোধ হয় কেউ নিয়ে এসেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। এত বড় একটা ধর্মযুদ্ধের মোকাবিলা প্রায় বলতে গেলে তাঁকেই সবটা করতে হয়েছে। সাধারণ মনুষ্য তোমরা। তোমাদের ধর্মের

ক্ষেপিয়ে দিয়ে পিছনে মাতব্বর মানুষেরা তামাশা দেখছে। আমাদের রক্ত সনাতন। মা করুণাময়ী মায়ের আশ্রয়ে আমরা। আমাদের আবার ভয় কি! তবু এত সব যে আয়োজন সবই মার অশেষ কৃপায়। তাঁর ইচ্ছা না হলে সাধ্য কি সে এত বড় একটা উন্মত্ত জনতার বিরুদ্ধে লড়ে। তিনি বড়-বাবুর জন্য একটা দূরবীন কিনেছিলেন। বড়বাবুর ঘোড়ার মাঠে যাবার অভ্যাস ছিল। তাঁর সেই দূরবীনটা এখন বড় কাজে লাগছে। তিনি এবং বাবুদের যুবক ছেলেরা ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। নিচে বন্দুক হাতে সুন্দর আলি। উপরে ওরা ওদের গুপ্ত স্থান বেছে জায়গা নিয়ে নিয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্তপথে সব বাবুদের বাড়ি হেঁটে-হেঁটে আক্রমণের মোকাবিলা করার সব রকমের ফন্দি-ফিকির করে এইমাত্র ছাদে উঠে চরের দিকে তাকাতেই দেখলেন, হাজার হাজার মানুষ চরে গিজগিজ করছে। ও-পাশে তারকবাবুর বৈঠকখানার নিচে সবুজ যে মাঠ, মাঠের পাশে সিপাইরা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পুতুলের মতো। তিনি চরে ফের দূরবীনে দেখতেই তাজ্জব বনে গেলেন। ফেলু এসেছে এই চরে। আর তার হাতের কাছে ওর সেই বাগি গরুটা। গরুটাকে সে এত দূরে টেনে নিয়ে এসেছে। এই গরুর জন্য ফেলুর প্রাণপাত। সে এই গরুটাকে শেষে কোরবানী দিতে নিয়ে এসেছে! তার বড় প্রিয় এই জীব। জীবের জন্য সারাটা শীতকাল এবং হেমন্তে অথবা বর্ষায় কী না কষ্টে ঘাস সংগ্রহ করে আনত!

দূরবীনে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে গরুটার। নীল চোখ। অবলা জীব এমন মানুষের ভিড়ে পাগল হয়ে গেছে। সেই হাতিটার মতো। ক'জন সিপাই এসেছিল কর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে। হাতিটাকে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন এ অঞ্চলে যত নৌকা ছিল যুদ্ধের জন্য সব ইজারা নিচ্ছে সরকার। হাতিটাকেও ওরা ইজারা নিয়ে নিল। হাতি কেন এসব মানবে। হাতিটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না। জসীমের উপর ভার তাকে ঘাঁটিতে দিয়ে আসার। জসীমের স্ত্রী বেঁচে ছিল না। মাতৃহীন এক শিশুকে সে বড় করেছে। আর বড় করেছিল যেন এই হাতিকে। সে সারাক্ষণ হাতির সুখদুঃখে নিমজ্জিত। নিজের বলতে সে কিছু জানত না। সে হাতি নিয়ে আর পুত্র ওসমানকে নিয়ে হেমন্তের মাঠে আকাশের নিচে হেঁটে হেঁটে কত দূরদেশে চলে যেত। সেই হাতি ঘাঁটিতে যেতে না যেতেই কেমন পাগলের মতো করতে থাকল। জসীম কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছিল না হাতিটাকে। জসীমকে কিছুতেই পিঠ থেকে নামতে দিচ্ছিল না। নেমে গেলে, ফের শুঁড়ে ওকে তুলে পিঠে বসিয়ে দিয়েছে হাতি।

এই গরু নিয়ে এমনি কতদিন দেখছেন ভূপেন্দ্রনাথ, ফেলু ঝোপঝাড়ের ভিতর বসে থাকত। সে চুরি করে কতদিন অন্যের ফসল খাওয়াত। মেরে ওর হাড় ভেঙে দিতে পারে প্রতাপ চন্দের মেজ ছেলে অথবা গৌর সরকারের চাকরটা, সে সব তুচ্ছ করে জীবনপাতে বাগি বাছুরটাকে বড় করে তুলে এখন তাকেই নিয়ে এসেছে কোরবানী দেবে বলে।

ভূপেন্দ্রনাথ চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে ছাদের আলসেতে ভর দিলেন। চরের মানুষেরা সহসা সহসা ধ্বনি দিচ্ছে। পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে দীঘির পাড়ে যারা দাঁড়িয়েছিল। তারা সব গ্রামের মানুষ, সবাই এসে দীঘির পাড়ে জড়ো হয়েছে। ছাদের রেলিঙের পাশে পাশে গরম জল ফুটছে, ভাঙা ইট জমা করছে এবং বল্লম সড়কি নিয়ে পাহারা। মেয়ে-বৌদের ঠেলে সব মণ্ডপের দালানে, ভিতর বাড়িতে রান্নাবাড়ির পাশে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি ওদের ছাদে পর্যন্ত উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের মেয়ে-বৌরা পর্যন্ত আলাদা আলাদা ফ্রন্ট করে দাঙ্গার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এতক্ষণ পর কেমন ভূপেন্দ্রনাথ সব দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ওরা নামাজ পড়তে না পারলে অন্যদিকে হল্লা করবে। লুঠপাট করবে। সুতরাং সবদিক থেকেই যাতে মোকাবেলা করা যায়, করতে না পারলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটবে। ঠিক যেমন কোরবানীর পশু দু'চোখ উল্টে থাকে তেমনি সনাতন ধর্ম চোখ উল্টে থাকবে—যা সব আয়োজন, চোখ উল্টে থাকার আর ভয় নেই। যেদিক থেকেই আক্রমণ আসুক তাকে প্রতিহত করার সব সুবন্দোবস্ত আছে ভেবে তিনি রুমালে নিশ্চিন্তে মুখ মুছলেন। আর মনে হল তখনই নদীর চরে একটা অবলা জীব হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। ভূপেন্দ্রনাথের শরীরের ভিতর সব রক্ত এক সঙ্গে টগবগ করে ফুটতে থাকল।

এই নামাজে ফেলু পর্যন্ত এসেছে দশ ক্রোশ পথ হেঁটে। সূর্য এখন নদীর ওপারে অস্ত যাবে। ওরা কী তবে রাতে রাতে উঠে আসবে গ্রামে। দুশ্চিন্তায় ফের ভূপেন্দ্রনাথের মুখটা বেজার হয়ে গেল। বাবুরা সব এখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন। মাঝে মাঝে সব খবর পাঠাতে হচ্ছে। বড়বাবু একবার ছাদে উঠে দূরবীনে সব দেখে গেছেন। এবং কীভাবে ভূপেন্দ্রনাথ এই আক্রমণের মোকাবেলা করছেন দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছেন তার ওপর।

দূরবীনে নদীর চর বড় দেখাচ্ছে। নদীর জল শান্ত। কাশবনে কোন ফুল ফুটে নেই। জল খুব নিচে নেমে গেছে। নদীতে একটা নৌকা নেই। যারা নৌকায় এসেছে, তারা নৌকা চরে টেনে তুলে রেখেছে। কালো রঙের সব নৌকা, আর মাথা গিজগিজ করছে। মাথার উপর নিশান উড়ছে এবং হাতের সব সড়কি আসমানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলছে তারা, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। তখন শঙ্কায় ভূপেন্দ্রনাথের বুকটা কাঁপছে।

ভূপেন্দ্রনাথ দূরবীনেই দেখলেন ফেলু এক হাত সম্বল করেই চলে এসেছে। আর সম্বল তার এক চোখ।

আর ঠিক সেই প্রকাণ্ড ষণ্ডের মতো এক চোখ নিয়ে দুই পাড়ে দুই জনতা মোকাবেলায় প্রস্তুত। জসীম গাছের নিচে দুই চোখ খুলে রেখেছে। আর দুই চোখ আছে বলেই বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে। যেমন সে বিমর্ষ ছিল, হাতিটাকে ছেড়ে আসার দিন। সে বার বার হাতিটার পিঠ থেকে নেমে এলে হাতিটা তাকে পিঠে বসিয়ে দিতে থাকল। প্ল্যাটুন কমাণ্ডার বললেন, জসীম তুমি এবার নেমেই ছুটে চলে যাবে। হাতির পায়ে শেকল, শেকল বাঁধা বলে হাতি ছুটতে পারবে না।

সে নেমে যেতে পারছিল না। শুঁড় দিয়ে ওকে পিঠে তুলে নিচ্ছিল ফের। সে কত অবলা জীব, জসীম কাছে না থাকলে সে বাঁচবে না এমন আকুল চোখ হাতির। হাতির কষ্ট কমাণ্ডার সাব কি জানবেন! সে এই হাতির জন্য নিজের বিবির কথা ভুলে গেছিল। সে যেদিন তার সন্তানের হাত ধরে বিবিকে মাঠে কবর দিয়ে ফিরছিল, কী তখন অন্ধকার চোখে! কার কাছে রেখে যাবে এই ওসমানকে। ওসমান এখন থেকে কার কাছে থাকবে! ওসমানকে নিয়ে বাবুদের বাড়িতে এসে হাতির পিঠে চড়ে বসল, তার আর বিরির দুঃখ থাকল না। উন্মুক্ত আকাশের নিচে হাতি, সে এবং তার পুত্র ওসমান। ঘাস কাটতে নদীর চরে নেমে গেলে ওসমান থাকত হাতিটার কাছে। সে বলত, লক্ষ্মী, তর কাছে থাকল ওসমান। আমি ঘাস কাটতে যাইতাছি।

তখন যত খেলা হাতির এই ওসমানের সঙ্গে। ওসমান হাতিকে ছোট ছোট ডাল এগিয়ে দিত, সে হাতির পায়ে শেকলে প্যাঁচ লেগে গেলে খুলে দিত। অঙ্কুশ চালিয়ে যেখানে ঘাড়ে সামান্য ঘা, সেখানে বড় বড় মাছি উড়ে এসে বসলে খুব কষ্ট হাতির। ওসমান হাতির পিঠে বসে মাছি তাড়াত। বাপ যে মালিশ এনে দিত, সে সারাক্ষণ ঘায়ে মালিশ মেখে দিত। কোনও কোনওদিন সে এইভাবে ঘুমিয়ে পড়ত শানে। অথবা হাতির পেটে পিঠ রেখে শুয়ে থাকত। হাতি অবলা জীব, লক্ষ্মী এবং পয়মন্ত বলে জসীম এসে দেখতে পেত ওসমান হাতির পেটে পিঠ দিয়ে দুপুরে আমগাছের ছায়ায় ঘুম যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডেকে তুলত। হাতি এবং ওসমান উভয়কে সে নদীর জলে স্নান করিয়ে এনে খেতে দিত দু'জনকে। ওসমানের জন্য চিড়া-গুড়, আর হাতির জন্য কলাগাছ। বিবি মরে গেলে এই হাতিই ছিল প্রায় বিবির মতো। সে সময়ে অসময়ে ডাকত, লক্ষ্মী। অ লক্ষ্মী তরে দিমু ধান্যদূর্বা, তুই বাঙলাদেশের নদী পার হইয়া আর কোনখানে যাইবি। তুই থাইকা যা আমার লগে। হাতি বুঝি জসীমের বুকের ভিতর যে একটা কোড়াপাখি ডাকছে, শুনতে পেত। শহরে গঞ্জে কত দূরদেশে গিয়েও হাতি কখনও পথ ভুল করত না। একবার জসীমের কি জ্বর! বাবুরা গিয়েছিল বাঘ শিকারে। শিকার শেষে ওরা জয়দেবপুর থেকে ট্রেনে আর জসীম মৃত বাঘ নিয়ে একা। হাতির পিঠে বাঘ, জসীম। জসীমের এমন প্রবল জ্বর যে সে খর রোদে চোখ মেলতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে জলতেষ্টা পাচ্ছে। বেহুঁশ জসীম। হাতি যেন সব বুঝতে পেরে নদী থেকে জল তুলে দিয়েছিল শুঁড়ে। পয়মন্ত হাতি নদীর পারে জসীমকে নামিয়ে শুঁড়ে জল তুলে এনে মাথায় ঢালল। জসীম চোখ মেলে তাকিয়েছিল। কোথায় যে যাচ্ছে লক্ষ্মী সে টের পাচ্ছে না। সে

পিঠের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অথচ লক্ষ্মীর যেন জানা, সে দ্রুত পা চালিয়ে সোজা পথ চিনে চলে এসেছিল। পথ সে এতটুকু ভুল করেনি।

সেই লক্ষ্মীকে ওরা মেরে ফেলল। জসীম চলে যাচ্ছে আর আসছে না, বুঝি টের পেয়ে গিয়েছিল হাতি। তাকে কিছুতেই পিঠ থেকে নামতে দিচ্ছিল না। সে সোজা নিচে নেমে এসে শুঁড়ে হাত বুলাতে থাকল। আবার সে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই নিতে আসবে এমন বলল। পাগলামি করলে চলবে কেন। বাবুরা যারা আছে এখানে সবাই ভালোবাসবে তাকে। কেউ কোনও কষ্ট দেবে না। এত সব বলেও জসীম পার পেল না। সে একটু দূরে গেলেই হাতি প্রথম শুঁড় তুলে কি দেখল। তারপর জসীম ক্রমে দুরে চলে যেতে থাকল। হাতি শুঁড় তুলে চিৎকার করতে থাকল। যখন আর জসীমকে দেখা গেল না, হাতি শেকল ছিঁড়ে ছুটতে থাকল। সামনে যে প্ল্যাটুন কমাণ্ডার -সে রোখকে রোখকে বলে এগিয়ে গিয়েছিল। আর দ্যাখে কে, একেবারে হাতির পায়ের তলায়। তখন সোরগোল চারপাশে। সামনে যেসব তাঁবু পড়ছে সব ভেঙে দিচ্ছে। জসীমের কাছে যাবার জন্য সে সব বাধা লোপাট করে এগুচ্ছে। জসীম দূর থেকে দেখল হাতিটা ছুটে আসছে। আর সোরগোল। হাতি পাগল হয়ে গেছে! পর পর তিনজন মানুষকে পায়ের তলায় পিষ্ট করেছে! সুতরাং দুম্ দুম্। হাতির সামনে কাপ্তান দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছিল। জসীম ও তখন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছিল-হা আল্লা! সে দেখল তার লক্ষ্মী গুলি খেয়েও পড়ে যায়নি। টলতে টলতে জসীমের পায়ের কাছে এসে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়ল। কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুখটা চেনা যাচ্ছে না লক্ষ্মীর। সমস্ত মাথা লাল হয়ে গেছে। মরতে মরতেও লক্ষ্মী, কি যে ভালোবাসা তার, মাঠের মতো অথবা আকাশে পাখি ওড়ার মতো ভালোবাসা। লক্ষ্মী অতিকষ্টে শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল। যেন এই শুঁড় বেয়ে জসীম তার পিঠে উঠে বসে। এবং তাকে নিয়ে সেই নদীর পাড়ে সে চলে যায়।

জসীম লক্ষ্মীর মাথার কাছে সেদিন চুপচাপ বসেছিল। কত মানুষ চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় সাহেবসুবা এল, তাকে নানারকম প্রশ্ন করল, সে কোনও জবাব দিতে পারছিল না। ডিভিশনের তাবৎ মানুষ এসে ওকে দেখে গেছে-এক হাতি আর তার মাহুত, সারাজীবনের সঙ্গি। কবর খোঁড়ার সময় সে শুধু উঠে কবরে নেমে গিয়ে লক্ষ্মীর ঠাঁই হবে কি-না, এই মাটিব নিচে না অন্য কোথাও সে তাকে নিয়ে যাবে, কোথায় আর যাবে, পারলে সে তাবৎ এই মনুষ্য কুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, বলে আমি তরে নিয়ে যামু নদীর পারে। এখানে তরে কবর দিমু না। কিন্তু সে জানে তার ক্ষমতা সামান্য, সে কি আর করতে পারে! সারাদিন সে হাতির মাথার কাছে বসেছিল। মাটি খোঁড়ার শব্দ উঠছে। বুকে এসে শব্দটা ভীষণ তার ধাক্কা মারছে। এই ঝোপের ভিতর বসে জসীম এখন আর এক ধাক্কার ভিতর পড়ে গেল। সে যাবে কার দলে! সে চরে নেমে যাবে, না বাবুদের রক্ষার্থে তাদের বাড়ি উঠে যাবে! পিলখানার ও পাশের রাস্তায় সে সেই শক্ত মানুষটিকে দেখতে পেল। তিনি যাচ্ছেন মা আনন্দময়ীর বাড়ি। মুণ্ডমালা গলায় মা হাত তুলে আজ অসুরনাশিনী। জসীম বলতে চাইল-ক্যাডা অসুর মা জননী! তখন সে দেখল কোমর থেকে

কোরবানের চাকুটা ফেলু শাঁ করে বের করে ধরছে রোদে। রোদ ইস্পাতের ওপর সহসা এক ঝিলিক খেয়ে গেল। ফেলু কোরবানের চাকুতে সূর্যের আলোকে ধরে নানা বর্ণের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। কী ভয়াবহ! চাকুটা দেখেই বাগি গরুটা লাফ মারছে। গরুটা লাফ মারছে, কী মরণ নাচন নাচছে বোঝা যাচ্ছে না। চারপাশে মানুষের বড্ড ভিড়। সে এখন ইস্পাতের ওপর সূর্যের আলো ধরে রাখতে চাইছে।

ফেলু দেখল, তখনই আকালুদ্দিন ছিক করে পানের পিক ফেলছে। চালে-ডালে এখন খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। বড় বড় মেটে হাঁড়িতে ডাল-চাল সেদ্ধ। যে যার মতো গলা পর্যন্ত খেয়ে নিচ্ছে! নামাজ পড়ার আগে অভুক্ত থাকতে নেই। আকালুদ্দিন কোথা থেকে একটা পান পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনেছে ফেলু বলল, হালার কাওয়া! পান খাইয়া ঠোট লাল করছে হালার কাওয়া। সে এবার লক্ষ রাখল ভিড়ের ভিতর আকালুদ্দিন কোনদিকে যায়। যেন আকালুদ্দিন না এলে এই ধর্মযুদ্ধে সে আসত না। সে সব সময় আকালুর উপর কড়া নজর রেখেছে। ধর্মগত প্রাণ তার, নতুবা সে আসত না। পবিত্র ইসলামের জন্য কিছু করা চাই। সে প্রায়ই খোয়াব দেখেছে, এক নির্জন মাঠে, ভাঙা ইট-কাঠের সামনে দাঁড়িয়ে সে নামাজ পড়ছে। ভাঙা ইট-কাঠ এবং গম্বুজ কাবা মসজিদের শামিল। মসজিদের পাশে হিন্দুদের দেব-দেবীরা পাথর হয়ে আছে। ভাঙা হাত-পা নিয়ে ওরা পড়ে আছে। এমনিতেই ঘুম আসে না। কখন আন্নু রাতে চুরি করে মাঠে নেমে যায় এই এক ভয় তার, আর যখনই ঘুম আসে তখন শুধু একটা দৃশ্য চোখে ভাসে— সে একটা জঙ্গলের সামনে সবুজ ঘাসের ওপর বসে নামাজ পড়ছে। বাবুরা ভাঙা মসজিদের চার পাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছে। সাতটা মসজিদের খরচ চালায় বাবুরা। তবু তোমরা মিঞা মানুষেরা মা আনন্দময়ীর পাশে এই বনজঙ্গলে নামাজ পড়তে পাবে না।

এ-ভাবেই জিদ বেড়ে গেছে ফেলুর। সে চলে এসেছে। আসার সময় সারাটা পথ সে নজর রেখেছে আকালুর ওপর। হালার কাওয়া—সে আবার সবাইকে ধর্ম যুদ্ধে পাঠিয়ে নিজে একা গাঁয়ে থেকে যেতে পারে। আন্নুর সাথে বড় তার পীরিত, পীরিতের ভয়ে সে সারাটা পথ, এমনকি এখনও সব সময় আকালুকে চোখের উপর রেখেছে। চোখের উপর থেকে আকালু হারিয়ে গেলেই সর্ষে ফুল দেখছে সে। কিন্তু এখন মুখ দেখে মনেই হয় না আকালুর, সে আন্নুর কথা ভাবছে। ফেলু ভীষণ উত্তেজিত, যেমন সবাই উত্তেজনা নিয়ে এই চরে ঘোরাফেরা করছে এবং নির্দেশের অপেক্ষায় আছে—কখন ওরা সব ভেঙে তছনছ করে দেবে।

অথচ এই চরে ফেলুর কোরবানের চাকুটা রোদে ঝলসে উঠলে সে দেখতে পেয়েছিল- পিলখানার মাঠ পার হলে একদল পুলিশ সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। ওর কেন জানি প্রাণের জন্য মায়া হতে লাগল। তবু রক্তে উত্তেজনা। আল্লা সব দেখতে পাচ্ছেন। মাথার ওপর এত বড় ফকির মানুষটা যখন রয়েছেন, তখন আর ডর কিসের! সব বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বের হবে, কোনওদিন আর গুলি বের হবে না। কারবালা প্রান্তরে হাসান-হোসেনের যুদ্ধ, অথবা এজিদ, কারা যে কী করে! ধর্ম সার জেনে সে তার মন শক্ত করে

রাখল এবং এক হাতে বাগি গরুটাকে টেনে রাখল। হালার কাওয়া! গরুটা ভয়ে লেজ তুলে ছুটতে চাইছে। অবলা জীব সে এ সবের কোনও মানে বুঝতে পারছে না। ফেলু এবার প্রাণের দায়ে হা হা করে হাসছিল।

তখন দু'পক্ষ থেকেই ধ্বনি উঠছে। এক পক্ষ এই যে দেবী আমাদের সনাতন ধর্মের প্রতীক, গলায় মুণ্ডমালা মা জননীর হাতে খাঁড়া, চোখে বিদ্যুৎ খেলছে—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের দেবী মন্দিরে আছে, থাকেন, কার সাধ্য তাঁরে অপবিত্র করে! তাঁর পাশে এক দল মানুষ নামাজ পড়ে কোরবানী দিয়ে যাবে সে হয় না। রক্তের ভিতর হিন্দু মানুষের হাজার লক্ষ অসুর। ওরা নাচছে টগবগ করে। রক্ত ফুটছে। ওরা চরে একটা গাইগরুর হাম্বা ডাক শুনে স্থির থাকতে পারছে না। হাত তুলে বর্শা নিক্ষেপ করে চিৎকার করে উঠল, বন্দে মাতরম! মা আনন্দময়ী কী জয়! ভারতমাতা কী জয়!

এভাবে জয়ধ্বনি চরের দু'পাশে। চরে আর পিলখানার মাঠে। দুই দল যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। কালীবাড়ির চার পাশটায় যুবকেরা দাঁড়িয়ে সৈনিকের মতো পাহারা দিচ্ছে। পাশের বনটায় শুধু একশো চুয়াল্লিশ ধারা আর যা আছে নিজেরা রক্ষা করো-কিংবা সবটাই আছে, সীমানা কেউ জানে না। কতদূর পর্যন্ত এর বিস্তার। যেমন কেউ জানে না বস্তুত এই ঝোপে জঙ্গলে আদতে এটা কী, মসজিদ, মন্দির না কোনও বোম্বেটেদের দুর্গ, কী হাজার রূপসী এখানে নেচে গেয়ে গেছে। কেউ সঠিক জানে না অথচ যে যার মতো একে মসজিদ মন্দির বানিয়ে নিচ্ছে। ভিতরে কেউ যেতে পারে না। রাজ্যের শেয়াল খাটাশ এখানে বসবাস করে। রাত্রিবেলা আরতির ঘণ্টা বাজলে গণ্ডায় গণ্ডায় শিয়ালের হুককা হুয়া। নিশীথে শিবা ভোগ হলে অন্ধকারে একশোটা নীল চোখ জীবের, বনের ভিতর উঁকি দিয়ে থাকে। সুতরাং এই সব মাংসাশী প্রাণী এখন ঝোপের ভিতর থেকে এত মানুষ দেখে বড় তাজ্জব বনে গেছে।

শেয়াল খাটাশের বাস। দিনের বেলা ঢুকতে ভয়। কত সব বিষাক্ত সাপখোপের বসবাস। সূর্যের আলো পর্যন্ত বনের ভিতর ঢুকতে পায় না। এমন সব নিবিড় জঙ্গল। কী যে ছিল এটা! গম্বুজ দেখে মুসলমানেরা ভেবেছে এটা মসজিদ, খিলান দেখে বাবুরা ভেবেছে এটা মন্দির এবং ঐতিহাসিকদের মতে আখড়া, কারণ তারা মিনারে নানারকম হলুদ নীল কাচের সন্ধান পেয়েছিল, স্থাপত্যশিল্পে পর্তুগীজদের কাছাকাছি — সুতরাং জলদস্যুদের আখড়া না হয়ে যায় না। এই হাস্যকর অবস্থায় মানুষেরা এখানে এসে ভয়ঙ্কর এক দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। মানুষের জন্য মানুষ, না কোরবানীর জন্য মানুষ বোঝা যাচ্ছে না। কারণ ভাবলে বিশ্বাসই করা যায় না, এই এক হাস্যকর ব্যাপারে এ দেশে, গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। পারে না হয়তো, কোনওদিনই পারে কিনা তাও ভাবা যায় না-যদি না এর ভিতর আলি সাহেবের হাস্য জেগে উঠত। এই দেশে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ জাগিয়ে দাও। অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা এখন বলা যাবে না। শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলা যেত, কিন্তু কিছু উপর তলার মানুষ রয়ে গেছি আমরা, আমাদের তবে কী হবে! তার চেয়ে ভালো ধর্ম জাগরণ। ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আখের গুছিয়ে নাও।

সুতরাং ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আপাতত আখের গোছানো হচ্ছে। জসীম বসে আছে মাঝখানে। পিলখানার মাঠে। সে হাতির স্নানের সময় হলেই পিলখানার কাটা গাছের গুঁড়িতে এসে বসে থাকে। তার এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সে যে রয়েছে পথ থেকে টের পাওয়া যায় না। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ সে সব দেখতে পাচ্ছে। সে আছে মাঝখানে। সে বসে দুদিকে দু-দল মানুষের লম্ফঝম্প দেখছে।

আর দেখছে ঈশম। সে দেখছে সকাল থেকেই হাটুরে মানুষের মতো লোক যাচ্ছে সেই ভাঙা মসজিদে নামাজ পড়বে বলে। সে যায়নি। সে তরমুজ খেতে বসেই নামাজ পড়ছে। নামাজ পড়ছে না চুপচাপ বসে আছে হাঁটু মুড়ে বোঝা দায়। দু'হাত সমান প্রসারিত। পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে থাকা শান্ত মূর্তি এবং লম্বা সাদা দাড়ি, সবুজ রঙের তফন, বিস্তীর্ণ বালুবেলা, সোনালি বালির নদী আর এক পাগল মানুষ কেবল নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে হেঁটে যান— কোথায় যে যান, কী যে চান মানুষটা! অথচ তিনি না হেঁটে গেলে কেমন খালি খালি লাগে এই মাঠ এবং নদী। এদেশে তিনি এমন হয়ে গেছেন— তিনি না হেঁটে গেলে যেন সূর্য উঠবে না, পাখি ডাকবে না এবং গাছে গাছে ফল ধরবে না, ফুল ফুটবে না। এই পাগল মানুষ আছেন, নিশিদিন তিনি মাঠে মাঠে বনে বনে অথবা বালুবেলাতে পায়ের ছাপ রেখে যান; যেন নিত্য বেড়ে ওঠা ঘাস ফুল পাখির মতো তিনিও এই জন্মভূমিব খণ্ড অংশ হয়ে গেছেন। তাঁর এই ক্রমান্বয় হাঁটা, কবিতা আবৃত্তি, বড় বড় চোখে তাকানো, সরল শিশুর মতো ঈশ্বরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকো তোমরা, এমন মুখ ঈশমকে কখনও কখনও বড় স্তব্ধ করে রাখে। সে বলল, কর্তা, বাড়ি যান, আসমানের অবস্থা ভাল না।

অথচ দ্যাখো, আকাশ কী নির্মল। অথচ ঈশম এমন কথা কেন যে বলল! ঈশম কী টের পেয়ে গেছে এখানে এবার দাঙ্গা বেধে যেতে পারে! এই নিষ্পাপ মানুষটাকে কেউ হত্যা করতে পারে! সে তার এমন নির্মল আকাশের নিচে বসে পাগল মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছে কেন! আসমানের অবস্থা ভালো না বলছে কেন! ওর ভিতর কী একটা ভয়ঙ্কর আদিম অন্ধ বিবেক বুঝতে পারছে অদৃশ্য এক আকাশের নিচে ভয়ঙ্কর কালো একটা মোষ দিনরাত ফুঁসছে। সুযোগ পেলেই পাগল মানুষটাকে ফালা ফালা করে দেবে!

তখন কোরবানের পশুটা ভয়ে হাম্বা হাম্বা ডাকছে। যেন সে তাব বাছুর হারিয়ে এই মানুষের মেলায় চলে এসেছে। সে তার অবলা চোখে সব দেখছিল। ভিড় ক্রমে বাড়ছে। ফেলুর একটা হাতে এত শক্তি! অন্য হাতটা তো ওর মরা। শুকনো লতার মতো শুধু গায়ে লেগে আছে। যে কোনও সময় ফেলুর ইচ্ছা হয় ওটাকে ছিঁড়ে শরীর থেকে ফেলে দিতে।

ফেলু জীবটাকে এক হাতেই মসজিদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক হাতেই সে ধর্মের নামে কত কিছু করতে পারে মানুষেরা দেখুক। অঞ্চলের মানুষেরা দেখুক, ফেলু, যে ফেলুর হাত গেছে বলে সবাই পঙ্গু ভেবেছিল, যার বিবি আতরের গন্ধে পাগল বনে যায়, দিগ্‌বিদিক ফাঁক পেলেই ছোটে, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, সেই ফেলুর কী সাহস! সে আজ এক হাতে এমন পুষে বড় করা জীবকে, জীব থেকে সে কত বেশি অনুদান পাবে আশা করেছিল, দিন নেই রাত নেই ঘাস চুরি করে এনে খাইয়েছে, দুবলা বাছুরটাকে সে কী আশ্চর্যভাবে সবল করে তুলেছে, সেই বাছুরকে সে এখন বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে ধর্মের নামে কোরবানী দেবে। কত বড় ফেলু এই যেন দেখানোর ইচ্ছা। যেমন সে হা ডু ডু ডু ডু বলে প্রতিপক্ষের উপর চেপে বসত তেমনি সে এখন ধর্মের নামে শরীরে জুস পাচ্ছে। এক হাত গেছে বলে তার কোনও শরম নেই। বরং অন্য হাতটা এত বেশি শক্ত, এবং এত বেশি সাহস তার প্রাণে যে ধর্মের নামে এক কোপে দশটা কাফেরের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জ্বালা এই কোরবানীর পশু নিয়ে। এতটা পথ সে বেশ টেনে এনেছে। শিঙে দুটো প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে বলে খুব বেশি একটা ছুটতে পারেনি। এখন কী বুঝতে পেরে চার পায়ের ওপর শক্ত হয়ে গেছে। নড়ছে না। এতবড় মেলার ভিতর তাকে ছোট করে দিচ্ছে। সে যে ফেলু এটা কেন হালার গরু বোঝে না!

এই দশ ক্রোশের মতো পথ মোটামুটি ভালোয় ভালোয় চলে এসেছে। কোনও গোঁয়ার্তুমি ছিল না। কিন্তু মসজিদে নিয়ে যেতে যত গোঁয়ার্তুমি। তা তুমি এক বাগি গরু আর আমি এক একচক্ষু ফেলা। কে কারে খায় দেখা যাক। বলেই সে শক্ত হাতে আবার লেজ মুচড়ে দিল। পাশের লোকেরা বলছে, আরে দ্যাখো মিঞা সিপাইগ কাণ্ড। নলে গুলি নাই। ফাঁকা আওয়াজ করে। তোমারে ডর দেখায়।

ফেলু তাচ্ছিল্য করে সব। তার তো সব জানা। জানা বলেই সে ভোররাতে আজান দিয়েছে। লোক জড় করেছে মিছিলের জন্য। মশাল জ্বালিয়ে সে সারারাত এ গাঁ ও গাঁ ঘুরেছে। সে মিছিলের শেষে। মিছিল যায়, ধর্মের মিছিল। মিছিলে হাজার সবুজ পতাকা, লাঠি, সড়কি এবং ধুলো উড়ছে। ওরা যায় আর যায়। যারা আরও দূরের মানুষ রাতে রাতে ওরা মশাল জ্বেলে বের হয়েছে। ওরা এসে গোলাকান্দালের বড় বট গাছটার নিচে সবাই থামবে। সেখান থেকে আবার লম্বা মিছিল। বিশ্বাসপাড়া, নয়াপাড়া, লতব্দি, বলব্দি এবং দন্দির মাঠ থেকে যারা মিছিল বের করেছে ওরা হাসান পীরের দরগায় এসে থেমেছে। ওরা দেখেছিল হাসান পীরের দরগাতে তখন পাগল ঠাকুর। এতবড় মিছিল দেখেই তিনি বের হয়ে এসেছেন। তিনি বুঝি পীরের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন। আর কোরবানের পশুটার কথা ছিল হাসান পীরের দরগা পর্যন্ত জোরে কদম দেবে—কারণ, তখনও মিছিলটা পুরো মিছিল নয়, এদের আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শুনে আরও মানুষ এই মিছিলে যোগ দেবে, যারা দেবে না, কাফের তারা, তারা পবিত্র ইসলাম নয়, এমন সব লেখা আছে বড় বড় ইস্তাহারে। দরমাতে সব বড় বড় ইস্তাহার এঁটে নিয়েছে। মাথার ওপর সেই সব ইস্তাহার। আর ক্রমে ওরা এগুচ্ছিল। হিন্দু গ্রামের পাশে এলেই ভয়াবহ ধ্বনি। সাধারণ হিন্দুগৃহস্থরা ভয়ে বের হচ্ছে না মাঠে। কেবল পাগল ঠাকুর হাসান পীরের দরগায় মরা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার ওপর অজস্র শকুন। ওরাও দেখেছে একটা ধর্মের মিছিল যায়। কেউ কেউ উড়ে গেল। কতদূর যাচ্ছে মিছিলটা দেখতে।

কোরবানের পশুটা পথে বেশ হাঁটছিল। আর এখন শক্ত হয়ে আছে। ফেলু কিছুতেই নাড়াতে পারছে না; ঠিক যেমন হাসান পীরের দরগা পার হলে একটা মশালের মিছিল দেখে চার পা শক্ত করে দিয়েছিল। সে এটা জানত। দলটা বড় হলে, মিছিলে মশাল জ্বললে কোরবানের পশুটা ভয় পাবে। গলাটা টান টান করে রাখবে। দড়ি টানলে এক পা নড়বে না। চোখেমুখে আতঙ্ক। আমারে তোমরা কোন পীরের দরগায় নিয়া যাইবা। এই ত আছিল একডা পীরের দরগা, হাসান পীরের দরগা — এহানে আমারে রাইখা যাও। মনের সুখে ঘাস খাই। তারপর শালীর শালী কোরবানীর জীবটা একেবারে দুলকি চালে সেই যে হাঁটছিল আর থামে না। মাঝে মাঝে ঘাস দেখলে মুখ দিতে চেয়েছে, কিন্তু ফেলুর পা যাবে কোথায়! এক পা তুলে হড়কে শালা নাথি। যেন এই লাথি সে জীবের পাছায় মারছে না, মারছে বিবির পাছায়। শক্ত পা ওর নিমেষে এত বেশি রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর হয়ে যায় যে আজ হোক কাল হোক বিবি তারে খাবে। খেতে না পারলে নিশুতি রাতে পালাবে। নাকি মানে মানে সে তালাক দেবে বিবিকে! তালাক দিলে লাভ হবে বিঘা দুই ভুঁই আর জমি যা আকালুদ্দিন দশ কুড়ি টাকায় বন্ধক রেখেছে সব খালাস পাবে। সে যে এখনি কী করে বুঝতে পারছে না। এতবড় ধর্মযুদ্ধে এসেও সে তার সামান্য ক্ষয়-ক্ষতির কথা ভুলে থাকতে পারছে না। দিমু এক হাতে গলার নালি ছিঁড়া। বোঝবা মিঞা মরদ আমি ক্যামন একখানা! হালার কাওয়া।

হালার গরু! গরু তোমার মুখ দিমু ভাইঙ্গা! তুমি নড়তে চড়তে চাও না। কেবল মুততে চাও।

গরুটা ভয়ে কেবল মুতছে। যে জীবটা এতক্ষণ বেশ আসছিল, বেশ হাঁটছিল, যেন সেও সবাইর সঙ্গে নামাজ পড়তে রওনা হয়েছে, সেই জীব এখন ঘাড় শক্ত করে পা বালিতে ঢুকিয়ে টান টান করে রেখেছে গলা। আর টানাটানি করলেই হড়হড় করে মুতে দিচ্ছে। সে যে কী করে চরে! এত ভিড়ের ভিতর তাকে জীবটা কী যে ছোট করে দিচ্ছে! কিছুতেই সে হাঁটিয়ে নিতে পারছে না। ক্রমে সবাই নদীর পাড়ে উঠে যাচ্ছে। দলে দলে ইস্তাহার মাথার উপর তুলে নাচাচ্ছে। আলি সাহেব একটা চোঙ মুখে ঢিবির উপর উঠে একের পর এক হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের কথা বর্ণনা করছে। ধর্মের প্রতি আবহমানকাল ধরে যে হিন্দুদের ঘৃণা, সেই ঘৃণার কথা তির্যক ভাষায় প্রকাশ করছে! সবাই শুনতে শুনতে কান খাড়া করে দিচ্ছে। গরম রক্ত এবার টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে। পুব দেশে যত কাফের আছে, কাফের নিধন করে পতাকা ওড়াও। কোরবানীর পশুটা পর্যন্ত গলা তুলে শুনতে পেল সেই যেন ঢাক বাজে ঢোল বাজে। জীবের গলা কাটলে শুধু থাকে রক্ত, অবলা জীবের মুখে টগবগ করে রক্ত ফুটছে, এ জীবের তবে নিদান হাঁকা দায়। ফেলু মরিয়া হয়ে হ্যাঁচকা টান দিল জীবটাকে। এবং হ্যাঁচকা খেয়ে সে পড়ে যেত, ফলে আর এক হাত সম্বল থাকত না, হাতটা তার ভাঙত। কিন্তু তখনই দুটো ফাঁকা আওয়াজ পীলখানার মাঠ পার হল। ভিড়ের ভিতর থেকে ফেলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না! ফাঁকা আওয়াজেই যে যেদিকে পারছে ছুটছে এবং চরের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু দূরে এসেই ফেলু বুঝি টের পেল ওটা ফাঁকা আওয়াজ। সে একটা মানুষের উপব হুমড়ি খেয়ে পড়তে বুঝে ফেলল সবই ফাঁকা আওয়াজ। গরুটা ফাঁক বুঝে লেজ তুলে ছুটতে চাইছে। সেও শালা টের পেল ফাঁকা আওয়াজ। সে বলল, হালার কাওয়া। তুমি গরুর পো টের পাইয়া পলায় তোমার আমি চাক্কু চালামু। আল্লার নামে কোরবানী দিমু।

আলি সাহেব তখন ঢিবিতে উঠে চেঁচাচ্ছে।—ভয় নেই। আপনারা ভয় পাবেন না। সব ফাঁকা আওয়াজ। আল্লার কুদরতে বন্দুকের নল থেকে গোলাগুলি বের হবে না। সব ধোঁয়া বের হবে। সব ধোঁয়া। ধোঁয়া। আপনারা কদম কদম বাড়ায়ে যান।

কদম কদম বাড়ায়ে যান, দাঁড়ায়ে যান সামনে। আজ সবে-বরাত। সব মৃত আত্মা বের হয়ে পড়ছে। তারা আজ মুক্ত। তারা দেখছে আপনাবা যা সব ছাওয়াল আছেন—আল্লার দুনিয়ায় কিডা করছেন। আলি সাহেব কলিকাতা শহরে থাকেন। কথায় বার্তায় পুব দেশের মানুষের মতো কথা বলে আপনার জন হয়ে যান মাঝে মাঝে। তিনি বললেন, গরু, ভেড়া, দুম্বা যা কিছু কোরবানী দেবেন, সবই তারে দিবেন। আল্লাহর কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরায়ে দেবেন। না পারেন নিজেরে দেবেন।

এই শুনে সবাই আবার এগুতে থাকল।

বাবুবা ছাদ থেকে দেখছিলেন এক ফাঁকা আওয়াজেই সব ছুটে পালাচ্ছে! বাবুদের ছেলেরা এমন দেখে কি হল্লা! আনন্দে ছুটে এসেছে নদীর পাড়ে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ দূরবীন নিয়ে বসে বয়েছেন। মাঝে মাঝে বড়বাবুকে দেখতে দিচ্ছেন। শঙ্কা তাঁর কমছে না। কারণ, আবার সবাই চরে এসে জমা হচ্ছে। ওরা বুঝতে পেরে গেছে পুলিশ সাহেব ভিড়টা এগুতেই ফাঁকা আওয়াজের নির্দেশ দিয়েছেন। ওরা টের পেয়ে ফের মরিয়া হয়ে গেছে। সে দেখল, যারা কোরবানীর জন্য পশু নিয়ে এসেছে তারা এবার সকলের আগে হাঁটছে। ভয় নেই। বিন্দুমাত্র শঙ্কা নেই। আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরায়ে দেবেন-না পারেন, নিজেরে দেবেন। ওরা যেন নিজেকে দিতে এবার যাচ্ছে।

বল্লমের ইস্পাতে সূর্যাস্তের রোদ পড়ে ভীষণ এক কাণ্ড। হাজার হাজার এমনি সব ইস্পাতের ফলা আকাশের দিকে কারা ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওরা কদম কদম এগিয়ে আসছে। কেউ যেন দামামা বাজাচ্ছে। তালে তালে উঠে আসছে কালীবাড়ির দিকে। বাজার বাঁয়ে রেখে ঠিক তারকবাবুর মাঠ বরাবর উঠে আসছে। মাঠে এখন কেউ নেই। কিছু কনেস্টবল। হাতে বন্দুক। একপাশে গোরা পুলিশ সাহেব। বাবুরা কৃতী লোক। ভূপেন্দ্রনাথ বাবুদের চিঠি নিয়ে সদরে দেখাসাক্ষাৎ করে এতবড় একটা বন্দোবস্ত করেছেন। নতুবা সুরাবর্দি সাহেবের আমল। লীগের রাজত্ব দেশে। সামসুদ্দিন বড় গোছের নেতা। সে আর এ-সবে মাথা দিতে পারে না। হরদম সে কলকাতা যাচ্ছে। আসছে। বাবুরা কৃতী না হলে এমন হয়! বন্দুকের সঙ্গীনে সূর্যাস্তের আলো। ওরা সবাই এখন নিলিং পজিশানে আছে। কেবল আদেশের অপেক্ষায়। হিন্দু-মুসলমানে এমন মারমুখী দাঙ্গা তাদের রুখতেই হবে।

ওরা উঠে আসছে তো আসছেই। ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাচ্ছে না। শুধু অবলা জীবের চোখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। কান ঝুলে গেছে তার। ফেলু একটু হড়কে পেলেই বাগি গরুটা লেজ তুলে পালাবে। এই যে তামাশা—শালা সে কে, সে কিসের নিমিত্ত এসেছে এখানে বুঝেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। একবার ফেলুর হাত হিলে গেলেই হল, তখন দেখবে কার সাধ্য তারে আটকায়। কিন্তু ফেলুর এক হাতই এত শক্ত যে গরুটা তা গলায় টের পাচ্ছে। দড়িটা টানাটানিতে গলায় বসে যাচ্ছে। জীবটা শ্বাস নিতে পারছে না। সুতরাং শ্বাস ফেলার জন্য সেও কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে।

—হল্ট। একসঙ্গে বিশটা রাইফেলের ট্রিগারের শব্দ। ওরা সেফটি অন করে দিয়েছে। আর এক পা এগুলেই ট্রিগার টিপবে।

আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরায়ে দেবেন। দামামা বাজছে তালে তালে। মহরমের মতো ঢোল বাজছে। আর তালে তালে সেই এক পবিত্র কোরআনের বাণী ভেসে বেড়াচ্ছে যেন কানে, না পারেন নিজেরে দেবেন। ওরা নিজেদের দিতে যাচ্ছে।

রূপগঞ্জ থানার ইসমাইল দারোগা চোঙ মুখে হাতে লেখা কাগজ পড়ে যাচ্ছিল, আপনারা আর অগ্রসর হইবেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই আইন ভঙ্গ করা হইবে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করিলে গুলি করিতে বাধ্য থাকিব। আমাদের গোস্তাকি ক্ষমা

করিবেন। অন্যত্র আমরা আপনাদের ধর্মকর্মের দাসানুদাস। বলেই সে পুলিশ সাহেবের সামনে এসে সেলুট করল এবং কানে কী ফিসফিস করে বলল। তারপর কাগজটা ফিরিয়ে দিল।

লাল বর্ণের মানুষ। চোখমুখ এমনিতেই লাল। সূর্যাস্তের জন্য সে মুখ আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। বয়স খুব অল্প। দেখে মনে হয় শঙ্কায় ওর গলা শুকিয়ে আসছে। দামামার শব্দে কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না! ওরা এগিয়ে আসছে তো আসছেই।

নানা রকমের শব্দ উঠছে, গরু-ভেড়ার শব্দ ঢাক-ঢোলের শব্দ, চোঙ মুখে বক্তৃতা। উত্তেজনা জিইয়ে রাখা চাই। সাহেবের মাথায় সব শব্দ রেল গাড়ির চাকার মতো ঝনঝন করে বাজছে। এবং ঠিক তক্ষুনি ওরা এত কাছে এসে গেছে যে হাতের কাছে পেলে মশালে আগুন জ্বেলে ওদের সবাইকে পুড়িয়ে মারবে। একটা বর্শা ঠিক তক্ষুনি ইসমাইল দারোগাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারল কে! জনতার ভিতর থেকে হাজার হাজার বর্শা যেন ছুঁড়ে দেবে এবার তারা। এত প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে গেল যে ইসমাইল টের পেল না, পিছনের দিকে তাকাতেই দেখল সাহেবের কান উড়ে গেছে।

ইসমাইল এবার চোখের উপর সর্ষে ফুল দেখতে থাকল।

যেন এতগুলি মানুষের জীবন রক্ষার্থে সাহেব নিজের রক্তাক্ত মুখ ঢেকে হুকুম দিলেন, ফায়ার!

বাস, ফায়ার। বাস, গুলি ছুটতে থাকল। বন্দুকের নল থেকে এবার আর ধোঁয়া বের হচ্ছে না! কেবল গুলি বের হচ্ছে। বিশ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েই সিপাইরা ফের অ্যাটেনশান হয়ে গেল। হুকুম পাবার জন্য ফের কান খাড়া করে রাখল। কিন্তু কে কাকে হুকুম দেবে! আহত পুলিশ-সাবকে এখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাছারিবাড়িতে। শিলাবৃষ্টির মতো সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতা চরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। নিমেষে চর ফাঁকা! সূর্যাস্তের লাল রঙ, আর কত মানুষের তাজা রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। আর সেই কোরবানীর পশুগুলি পড়ি-মরি করে ছুটছে। ফেলু ছুটছে! ধুন্ধুমার লেগে গেল চোখে কানে। ফেলু টের পাচ্ছে না কখন ওর মরা হাত উড়ে গেছে। হাতটা যে এতদিন রক্তশূন্য ছিল, অচল অসাড় হাত, যা সে বার বার কতবার ভেবেছে সময় ও সুযোগ মতো একদিন কলার ফ্যাতা কাটার মতো শুকনো হাতটা হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলবে, পারেনি। বড় মায়া তার হাতের জন্য। অসাড় হাতটার জন্য সে কষ্ট পায়, তবু সে পারে না ফেলে দিতে—আজ একটা বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হয়ে সোজা ওর হাত উড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রাণটা উড়ে যেত, একটু ডান দিকে ঘেঁষে গেলেই বুকের কলিজাটা ফালা ফালা হয়ে যেত।

এমন তার ধন্ধুমার লেগে গেছে যে এই অন্ধকারে কোথায় ছুটে যাচ্ছে টের পাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে হাতটা থেকে একটু একটু করে পানশে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে কোরবানী দেবে বলে একটা পশু নিয়ে এসেছিল— সেটা না থাকলে খালি খালি লাগার

কথা—তা পর্যন্ত সে টের পাচ্ছে না। সে একা, কেউ নেই পাশে। সে দাঙ্গার আসামী। তাকে ধরার জন্য এবার যেন লাশগুলি বের হয়ে পড়েছে। কেউ পাশে নেই। সবাই যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। ওর চোখের সামনে ত্রিশ-চল্লিশটা মানুষ জবাই করা পশুর মতো হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। এই অন্ধকারেও সেইসব লাশ তাকে ধরার জন্যে ছুটছে, -কোনখানে যাও মিঞা! আমাগ কার কাছে রাইখা যাও!

ফেলু ঊধ্বশ্বাসে ছুটছে! অন্ধকারে মাঠের ওপর বলতে বলতে যাচ্ছে—হা আল্লা, এডা কি হইল! কোথায় গ্যালা মিঞা ভাইরা! এই রক্ত এখন কার বদলে যায়?

কেবল মনে হতে লাগল ওর মাথার ভিতর এখন কে মহরমের ঢোল বাজাচ্ছে। কেউ তার কথায় জবাব দিচ্ছে না। দিলেও সে শুনতে পাচ্ছে না। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই।

পঙ্গু হাতটা নেই বলে শরীর হাল্কা। শুধু ক্ষতস্থানটা টনটন করে ব্যথা করছে। তাও সে কানে চোখে ধুন্ধুমার লেগে যাওয়ায় টের পাচ্ছে না। সে উথালপাথাল ছুটছে। কোনদিকে যে যেতে হবে, কোথায় কী ভাবে ছুটলে পথ সংক্ষিপ্ত হবে সে তা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। কেবল সে যেখানে হিন্দু গ্রাম পড়ছে, সে-সব গ্রাম এড়িয়ে যাচ্ছে। সে একটাও মিছিলের লোক পাশে দেখতে পেল না। কোনও লোক ছুটছে দেখতে পেলেই সে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। ওকে ধরতে আসছে হয়তো। বাবুদের সব জঙ্গী কুকুরের মতো ছেলেরা বন্দুক কাঁধে বের হয়ে পড়তে পারে, এবং খবর রটতে কতক্ষণ। সবাই জেনে গেছে বুঝি ত্রিশ-চল্লিশটা লাশ পড়ে আছে শীতলক্ষ্যার চরে। সে হেরে যাওয়া মানুষ। বড় মাঠের অন্ধকারে সে টের পাচ্ছে না সে এখন কোথায় আছে। বাগি গরুটা থাকলেও এ-সময় ওর সামান্য বুঝি সাহস থাকত। নিজের বলতে তার এখন কিছু নেই। এমন কি এতদিনের হাতটা যা পাগল ঠাকুর হাতি দিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন, সে যে কী ভালোবাসায় হাতটা শরীরে ঝুলিয়ে রেখেছিল, এবং কত হেকিমি দানরি যে করেছে হাতটার জন্য, হাতে কালো তারে কড়ি বেঁধেছে, এই ধর্মযুদ্ধে এসে তার তাও গেল। এখন হালার কাওয়া, সে কানা ফেলু, সে টুণ্ডা ফেলু। হালার কাওয়া, পাগল ঠাকুর তারে এমন করেছে। সে কেন জানি একা। এই অন্ধকার মাঠে এসে সে তার হাতটার জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সবাই দেখতে পাবে সকাল হলে একটা মরা হাত নদীর চরে পড়ে আছে। লাশগুলোর সঙ্গে মরা হাতটা বড় বেমানান। লাশের সঙ্গে মরা হাতটার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে আর পারছে না। চারপাশে ঘন অন্ধকার এবং কিছু জোনাকি জ্বলছে ভুতুড়ে চোখের মতো। সে যে কতক্ষণ তাড়া খেয়ে ছুটছে এবং কতটা পথ এসে গেছে এক তাড়ায় অনুমান করতে পারল না। মনে হল সে একটা বড় গাছের নিচে কখন দাঁড়িয়ে আছে। সে এবার গাছটার নিচে শুয়ে পড়বে ভাবল। সকাল হলে সে বুঝতে পারবে কোথায় এসেছে এবং কীভাবে যে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে, আকালুদ্দিন যদি আগে আগে ফিরে যায়। সে নেই গাঁয়ে। ওর তবে পোয়াবারো। সে ফের উঠে আবার ছুটবে ভাবল।

কিন্তু দাঁড়াতেই মনে হল, শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। অবশ হয়ে গেছে পা। এত শক্তি পায় তার আর এখন সে এক পা নড়তে পারছে না। সে বসে পড়ল এবং তার ঘুম এসে গেল।

সকালবেলায় তাজা রোদের ভিতর তাকে কে যেন ঠেলছে। তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। শেষ রাতের ঘুমে সে এমন অচেতন যে, সে কিছুতেই চোখ মেলতে পারছে না। ওর পিঠ কে চেটে চেটে দিচ্ছে। পিঠে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে। তবু সে আলস্যে উঠতে পারছে না। চোখ মেলতে পারছে না। সে যে দাঙ্গা করতে গেছিল গতকাল তা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে। এবং চোখের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়লে সে ধড়ফর করে জেগে গেল। প্রথম সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, ওর বাগি গরু এটা। গরুটা ওর পিঠে যা নুন ছিল চেটে খেয়েছে। হালার গরু বড় সেয়ানা। পথ চিনে ঠিক চলে এসেছে না কী গরুটা ওর সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। সে খেয়াল করে নি। গরুর আর ধন্ধুমার লাগার কথা নয়। সে তাড়াতাড়ি ভাবল গরুটার মুখে একটা চুমু খাবে। কিন্তু খেতে গিয়েই মনে হল ওর বাঁ হাতটা কাঁধে আর ঝুলে নেই। গরুটা দেখে ফেললে ভীষণ সরমের ব্যাপার। সে তাড়াতাড়ি গামছা দিয়ে ক্ষতস্থানটা ঢেকে দিল। গাইগরু আর বিবি সব সমান। দুবলা স্বামী টের পেলে কেবল মাঠে পালাবার চেষ্টা করে।

সে বাগি গরুটা নিয়ে উঠে চারদিকে তাকাতেই এবার বুঝল—সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঠিক পথেই চলে এসেছে। এই সেই ফাওসার বিল সামনে, এখানে কাটা মোষের মুণ্ড ফেলে চলে গিয়েছিল কারা। এখানেই জালালি জলে ডুবে মরেছিল আর পাগল ঠাকুর জালালির মৃতদেহ নিয়ে মাঠের উপর ভয়ে ছুটছিলেন সাদা জ্যোৎস্নায়।

সে গরুটাকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দুলকি চালে। য্যান সে তার বিবিকে নিয়ে মেমানবাড়ি বেড়াতে গেছিল। দেখলে কে বলবে ওর মরা হাতটা নদীর চরে পড়ে আছে। হাতটা কার, এই হাত, দুবলা হাত, না কি সারা রাত রক্ত পড়ায় হাতটা এমন শীর্ণ হয়ে গেছে—হাতটা নিয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড বেঁধে যাবে। মানুষটা কে, কোন মানুষের এমন একটা শীর্ণ হাত থাকতে পারে!

কিন্তু গ্রামের কাছে এসেই ওর বুকটা শুকিয়ে গেল। বিবিটা ওর ঘরে আছে তো! যদি থাকে তবু ভয়। ওর কাটা হাত দেখে বিবিটা আড়ালে হাসবে। ক্ষতস্থানে দুব্বা ঘাসের রস ঢেলে দিতে দিতে মুখ গোমড়া করে রাখবে। য্যান কত ভাব-ভালোবাসা। ফেলুর দুঃখে আন্নুর ঘুম আসছে না। তবু ছিনালি দ্যাখলে নিজের গলায় কোরবানীর চাকু চালাইতে ইসছা হয়। আমারে ফালাইয়া কোনখানে যাইস না। তুই ঘরে থাকলে বাথানের গরুর মত আমি হাম্বা হাম্বা করমু! আমি বেইমানি করমু না। কথা দে, যাইবি না। সে নিজেই কেমন একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

এখন ফেলুকে দেখলে মনেই হয় না গতকাল সে গিয়েছিল ওই জীব নিয়ে শীতলক্ষ্যার চরে। সে জীবটাকে কোরবানী দেবে বলে নিয়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা বড় বৌ দেখেছিল ফেলু যাচ্ছে মাঠের উপর দিয়ে। গরুটাকে সে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। বরং গরুটাই তাকে যেন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গরুটা আগে আগে হাঁটছে। ফেলু পিছনে। সে তার আদরের পশুটাকে নিয়ে গিয়েছিল কোরবানী দেবে বলে। কিন্তু কী ব্যাপার। ফেলু ফিরে এসেছে। সঙ্গে এসেছে বাগি গরুটা। শীতলক্ষ্যার চরে নামাজ পড়ার কথা। বাড়িতে ওরা সারা দিন রাত দুশ্চিন্তায় থেকেছে। কোনও খবর আসেনি। দাঙ্গা বেঁধে যেতে কতক্ষণ। একবার ইচ্ছা হল ঈশমকে দিয়ে খবর নেবে। কী খবর নিয়ে এসেছে ফেলু।

বিকেলে ঈশম গিয়েছিল ফেলুর কাছে। ফেলু ঈশমের সঙ্গে কথা বলেনি। সে একটা ছেঁড়া কাঁথায় শরীর ঢেকে শুয়েছিল। আর এ-গ্রামে থেকে গেছে আকালুদ্দিন। আকালুদ্দিনের খবর নিয়ে জানল, সে ফিরে আসেনি। আন্নুকে হাতের ইশারায় বড় কাফিলা গাছটার নিচে ডেকে নিয়ে গেলে, আন্নু বলেছে, তাকে কিছু বলছে না মানুষটা। উঠছে না। এমনকি আন্নুকে খুব কাছে যেতে দিচ্ছে না। এসেই যে কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়েছে আর। কেবল মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে।

সুতরাং বিকেলের দিকে ঈশম কোনও খবর নিয়ে আসতে পারল না। আর কার কাছে খবর পাওয়া যায়। সে সুলতানসাদি যাবে কিনা ভাবল। অথবা নদীর চরে চুপচাপ বসে থাকলে টের পাবে, হাটুরে মানুষেরা যাবে, তারা ঠিক খবর নিয়ে আসবে। বিকেলে সে আর বাড়ি বসে থাকল না। ছইয়ের নিচে বসে তামাক খেতে থাকল এবং হাটুরে মানুষেরা যখন ফিরছে, কী বলাবলি করছে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

ঈশন সন্ধ্যার পর এসে খবর দিয়েছিল, খুব দুঃসংবাদ। জমিদারবাবুরা চল্লিশটা লাশ নামিয়ে দিয়েছে। সময় বড় খারাপ। বড়মামির চোখের দিকে তাকালেই ঈশম যেন ভয় পেয়ে যায়। সে বলল, বড়মামি, এটা যে কি হইতাছে বুঝি না।

শচি বললেন, তুই কাইল চইলা যা মুড়াপড়া। ঠিক ঠিক কি হইছে জাইনা আয়।

—কাইল ক্যান। আইজই রওনা দেই। তবে কাইল বিকালবেলা ফিরা আসতে পারমু।

ঈশম পরদিন বিকেলে এসে সব বিস্তারিত বললে, হিন্দু গ্রামের সব মানুষ ভীষণ খুশি হয়েছিল। ওরা সেদিন রাতে বিজয় উৎসব করেছিল গ্রানে। ওরা খোলকরতাল বাজিয়ে হরিসংকীর্তন দিয়েছে।

এর ভিতর সেদিন দু'জন মানুষ এসেছিল ফেলুর বাড়ি। মাথায় তাদের কালো রঙের টুপি। লাল রঙের পুচ্ছ টুপিতে। কালো রঙের পাতলা সস্তা আদ্দির পাঞ্জাবি। নিচে কালো গেঞ্জি। গেঞ্জিটা ভেতর থেকে জেল্লা মারছে। পরনে খোপ-কাটা লুঙ্গি। পাতলা নুর থুতনিতে। ওরা এসে লম্বা কাফিলা গাছটার নিচে দাঁড়াল। গরুর ঘরটা ফেলুর এখন পড়ে গেছে। একটা ঘর সম্বল। শোলার বেড়া ঘরে। নাড়া দিয়ে আন্নুর জ্বালায় একটা আতাবেড়া

পর্যন্ত করতে হয়েছে। একটু আড়াল না করে রাখলে বিবি ধনেখালি শাড়ির মতো। চিৎপাত হয়ে থাকে খালি উঠোনে। যারা পথ দিয়ে যায়—এক খুবসুরত বিবি বান্ধা আছে এই ঘরে, ওরা চোখ মেরে যায়। ফেলু এটা বোঝে। এখানে, এই বড় কাফিলা গাছটার নিচে এলেই শালা মনুষ্য জাতির লোভ বেড়ে যায়। উঁকি দিয়া দ্যাখে—ফেলু বাড়ি আছে কি নেই। বিবিটা তার কি করছে! দেখে ফেললে আন্নুকে, লোভে দু'ঠোঁট চুকচুক করতে থাকে। হালার কাওয়া!

সে সেজন্যে এক হাতেই সব ঠিকঠাক করে রাখছে। কেউ যেন তার বিবিকে যখন তখন দেখতে না পায়, চারপাশে নাড়ার বেড়া, সব সময় বিবি ভিতরে থাকুক এমন ইচ্ছা তার। এটা শীতকাল নয়। গ্রীষ্মের দিন। এ-দিনে বড় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। কারণ সেই যে সূর্য মাথার উপর উঠে কিরণ দিতে থাকে, কিছুতেই আর পশ্চিমে নেমে—হালার কাওয়া, অস্ত যেতে চায় না। চারপাশটায় যত জমি সবই রোদে খাঁ খাঁ করছে। গাছের পাতা ঝরছে। উড়ছে। পুকুরের জল শ্যাওলায় নীল রঙ। নদীতে পায়ের পাতা ডোবে না। মানুষের দুর্দিন বলতে যা বোঝায়, একটা পাতা পর্যন্ত পড়ে থাকে না গাছের নিচে। গরীব-দুঃখী মানুষেরা সব গাছের পাতা সংগ্রহ করে রাখছে। বর্ষার দিনে আগুন জ্বালাবে বলে। সারাদিন এখন আন্নু পাতা জড়ো করছে বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকারে। আতাবেড়ার আড়ালে বলে ফেলুর পরাণে ডর থাকে না। ফেলুর বাঁ-হাতটা উড়ে গিয়ে যে ঘা-টা হয়েছে, কিছুতেই শুকোচ্ছে না। এখন প্রায় কুষ্ঠের আকার ধারণ করেছে। সারাক্ষণ ভনভন করে মাছি বসছে। সে বসে গামছা দিয়ে ঘায়ের মাছি তাড়াচ্ছিল তখন। আর ঘা-টাতে গরম রসুন গোটার তেল লাগাচ্ছিল! ঘায়ের ভিতরটা সারাক্ষণ জ্বলে। খাঁ খাঁ করে দাবদাহের মতো। হেকিমি কবিরাজিতে কাজ দিল না। গোপাল ডাক্তারের কাছে গিয়ে ছিল চুপি চুপি ওষুধ আনতে। কিছুতেই কিছু হয়নি। মুলে আছে এর এক মানুষ। পাগল মানুষ। মুড়াপাড়ার হাতি দিয়ে মানুষটা তার এমন শক্ত শরীর বিনষ্ট করে দিল। সে যে কী করে! হালার কাওয়া, এখন বাতাসে ফুঁ দিয়ে পাখি ওড়ান। পদ্য কন দুই চাইর লাইন। মেম সাহেবানির কইলজা চিবাইতে না পাইরা গাছের নিচে থাকেন বইসা। হেসে কন গ্যাৎচোরেৎশালা। মাইনসে কয় সাধুসন্ত। ফকির! পীর হইতে পারেন। ফেলু কয়, ঐ হালার কাওয়া যত নষ্টের গোড়া।

তখন সে দেখল, কাফিলা গাছটার নিচে মোল্লাজানের মতো দুই মানুষ। ফিক্‌ফিক্ করে দুই গালের ফাঁকে হাসছে। ফেলু মানুষ দু'টাকে দেখেই দ্রুত চোখ নামিয়ে আনল। আবার দুই মোল্লা মোতাবেক মানুষ। তারা কেন এসেছে সে জানে। গত সালেও একবার এসেছিল ওরা। সে সেদিন হাঁসুয়া নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল। সে শালা কারে ডরায়। সে টুণ্ডা ফেলু। তবু মনের রোগটা ঠিক বেঁচে আছে। এখনও ফেলু হাঁক দিলে আন্নুর কলিজা কাঁপে। সে তেমনি হাঁকল, কেডা মিঞা গাছের নিচে খাড়াইয়া আছেন?

—আমি ভাইসাব আমিনুল্লা।

—আবার কি মনে কইরা?

—আইছিলাম একবার আকালুসাবের খুঁজে।

—তা সাহেব কি উঠানে আমার খাড়াইয়া আছে?

—তা ঠিক না।

—তবে কি ঠিক! উঠানে পাখি খুইজা বেড়ান?

ওরা এবার আমতা আমতা করতে থাকল।

—মিঞা, মনে করেন বুঝি না কিছু?

— ঠিক না! মনে হইল একবার ফ্যালু মিঞার খবর নিয়া যাই।

—তা ভাল কাম করছেন। তামুক খান তাইলে।

—খাই তবে। যখন কইলেন খাইতে।

ফেলুর চোখটা এবার আতাবেড়ার ও-পাশে উঠে গেল। আন্নুটা আবার মানুষের গলা পেয়ে উঁকি দিচ্ছে কি-না! উঁকি দিলেই সে যদি হাতের কাছে হাঁসুয়া পায় তবে ফিকে দেবে বেড়ার ফাঁকে। এমন চোখেমুখে যখন ফেলু আতাবেড়ার দিকে তাকাচ্ছে, তখন আমিনুল্লা বলল, নাই।

চমকে উঠল ফেলু। —কি নাই?

—আকালুসাব নাই।

—নাই ত কই গ্যাছে! ফেলুর পরাণে জল এল।

—গ্যাছে নারায়ণগঞ্জে।

—গ্যাছে ক্যান?

—গ্যাছে মামলা করতে।

—তা পয়সা থাকলে মামলা করবে না! আপনের মত গাছের নিচে খাড়াইয়া থাকব?

—সেই কথা।

ওরা এসে এবার নির্ভয়ে হোগলার ওপর বসল।

—নেন, তামুকটা টান দ্যান। নিভা যাইব।

আমিনুল্লা বলল, আপনের ভাইসাব কড়া তামাক পছন্দ।

ফেলু দেখল বিবিটা কোথায় এখন! বলল, বড় পছন্দ। তারপর সে ডান হাত দিয়ে গামছায় আড়াল করা ঘা থেকে মাছি তাড়াল। ফেলুর শরীর থেকে কেমন একটা পচা গন্ধ উঠছে। ফেলু বুঝি টের পেয়ে গেছে বিবি মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঁশ ঝাড়ের নিচে থেকে উঠে এসেছে। কোন এক অদৃশ্য স্থান থেকে সে তাজা মানুষদের দেখছে।

ফেলু উঠে যাবার সময় ওরা দেখল, সে তার ঘা-টা গামছার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। ওরা বুঝতে পারল দুর্গন্ধ উঠছে ঘা থেকে। তা'ছাড়া ওরা এই হাতটা কবে গেল জানে না। ওরা জানত, এই মানুষের হাত পাগল ঠাকুর হাতি দিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। বাঁ-হাতের কব্জি কতকাল ফুলেফেঁপে ছিল। তারপর হাতটা একদা শুকিয়ে গেল। শুকনো লতার মতো হাতটা ওর শরীরে দুলত। হাতটার কোন ধর্মকর্ম ছিল না। কোন বোধ ছিল না। রক্ত চলাচল না হলে যা হয়। সেই হাত ওর ব্যাঙের লেজের মতো কবে খসে পড়েছে কেউ জানে না। সে সারাক্ষণ বাঁ দিকের হাতে একটা গামছা ফেলে রাখে। কাঁধের নিচে লাল দগদগে ঘা। ঘা দেখে ওদের শরীর কেমন গুলাতে থাকল। এত বড় একটা ঘা নিয়ে মানুষটা বেঁচে আছে কী করে! ওরা এসেছিল এই পথে আন্নুকে একবার দেখবে বলে। বিবি নাকি এ-তল্লাটে চান্দের লাখান মুখখান আর আকালুসাব আছে বিবির পিছনে এবং ফেলু এই বিবিকে নিয়ে রাত-বিরাতে ঘাস বিচালি ধানের ছড়া, মটর দানা যা পায় জমি থেকে চুরি করে আনে।

ফেলু ভিতরে কী যেন খোঁজাখুঁজি করতে গেছে। সে ফের আসছে। কলকিতে আগুন। সে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আসছে কলকিতে। আর একটা চোখ ওর সজাগ, সে গোপনে দেখছে দুই মিঞার চক্ষু কি কয়, কোন দিকে চক্ষু তাড়া করে। বিবি তার বড় লবেজান। ওরা এসেছে চুরি করে বিবিকে দেখে যাবে বলে। এরা সবাই আকালুর বান্দা। আকালুকে খুশি করতে পারলে এই ইবলিশদের আর কিছু লাগে না। তবু ডেকে তামুক সেবন, যেন আল্লা মেহেরবান বলে বসে যাওয়া মুখোমুখী, তারপর হাঁক দেওয়া—তোমরা মিঞা মনে কর আমি কিছু বুঝি না?

না কী সে মনে মনে আকালুকে ভয় পায়। ভয় পায় বলে ডেকে এনেছে— বইসা যান মিঞা, গরীবখানায় বইসা যান। আবার কখনও কখনও ফেলুর মনে হয় ওরা সব এসেছে গরু-ছাগলের ব্যাপারির মতো। আকালুই হয়তো পাঠিয়েছে। জমি বাড়ি সব তার বন্ধক। তালাকনামা লিখে দিলে যদি বন্ধক ছুটে যায়, সব মিলে যায়, তবে মন্দ হয় না। এবং দুই বিঘা ভুঁই মিলে গেলে সে কিছু একটা ফসল করে বাকি দিন গুজরান করে ফেলতে পারবে। ওরা ব্যাপারির মতো খোঁচা দিয়ে দ্যাখতে চায় ফেলুর বিবির দামদর কত।

কিন্তু মিঞা দু'জন ফুতফাত তামুক খেয়ে বসে থাকল। কিছু আর বলছে না। ওরা আতাবেড়ার ফাঁকে আন্নু বিবির মুখ দেখে ফেলেছে। দেখেই কেমন গুম হয়ে গেছে। ঘরে

য্যান শয়তানটা একটা পরী মন্ত্র পড়ে বেঁধে রেখেছে। ডানা কেটে দিয়েছে। উড়তে পারছে না। কষ্টে বিবির চোখ মরা গাঙের মতো।

বেড়ার ফাঁকে উকি দিয়েই আন্নু অদৃশ্য হয়ে গেল!

শুধু আতাবেড়ার ও-পাশ থেকে কচ্ছপের মতো গলা বের করেছিল। আর কিছু ওরা দেখতে পায়নি! আন্নু আর অধিক বের করতে পারে না। ওর গায়ে ফুটা-ফাটা হাজার রকমের তালিমারা শাড়ি।

একবার আকালু একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল। শাড়ি দেখে ফেলু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। এবং যা হয়, কেউ কিছু দিলেই আন্নুর পিঠ আর ঠিক থাকে না। ভয়ে আন্নু তেল সাবান, গন্ধ তেল এবং চিরুনি খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখে! পরবের দিনে অথবা মানুষটা মেঘনাতে ঢাইন মাছ শিকারে গেলে পটের বিবি সেজে বসে থাকে আকালু কখন আসবে। অবশ্য আন্নু জানে ফেলু কোনও নির্দিষ্ট তারিখে ফিরে আসে না। আগে অথবা পরে আসে। ফেলু ফেরার আগেই সে ফের তার ফুটা-ফাটা শাড়ি অথবা গামছা পরে বাঁশঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফেলু ফিরেই শুকনো মুখ দেখে বলবে, তুই এহানে বিবি?

—তোমার লাইগা মনডা বড় কান্দে।

আর সেই ফেলুর এখন কিছুই নেই। সে মেঘনা নদীতে আর ঢাইন মাছ শিকার করতে যেতে পারে না। সে টের পায় বিবি তার কাছে আসে না। কেবল দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গন্ধে টেকা দায় এমন চোখমুখ তার। এখন বিবি কেবল আকালুর বিবি হতে চায়। আকালুর বিবি হওয়ার জন্য সে হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে পারত, আমারে তালাক দ্যাও মিঞা, আমি যাই সাগরেরি জলে, তুমি আমারে ছাইড়া দ্যাও। কিন্তু পারে না। প্রাণে বড় ভয়। মান্ধাতা আমলের কোরবানীর চাকুটার ভয়। সেই ভয়ে বাড়ির চারপাশটায় বিবি ঘুরঘুর করে। বিবি তার হকের ধন। আন্নু তার দু'বিঘা জমি-জিরানোর মতো। ওর বাড়িঘরের মতো সে বিবিকে ভোগের নিমিত্ত পেয়েছে। তার ভোগ শেষ না হলে কোন শালা লেবে! যেমন তার দুটো মাটির সানকি, একটা পেতলের বদনা, বাঁশঝাড়, পাটকাঠির ঘর উড়াট জমি, এক বিবি, সে তো দশটা পাঁচটা বিবি রাখেনি ঘরে, তবু তার এই সামান্য সম্পত্তির জন্য কি লোভ আকালুর! তার হাতে গিয়ে সে এখন এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সে মরলেই আকালু তাজিয়া নাচাবে উঠানে। ফেলু এবার বলল, তা মিঞা আকালু মামলা করতে গ্যাল ক্যান?

কালু মিঞা বলল, ওডা তো তোমার জানার কথা।

—আমার জানার কথা! কি যে কন! ফেলু একেবারে বিনয়ের অবতার বনে গেল। সে যে এ-সব টের পায় না তা নয়। সব টের পায়। এই দুই হোমন্দির পুত আইছে আকালুর

পক্ষে। আকালুর ছিনালি করতে আইছে।

আমিনুল্লা মোল্লা মোতাবেক বলল, গ্যাছে তোমার নামে এক নম্বর ঠুইকা দিতে।

ফেলু চোখ বড় বড় করে ফেলল। সে মামলা মোকদ্দমাকে বড় ভয় পায়। ওর নামে মামলা রুজু করলেই দু'দিন পর পর ছোটো নারায়ণগঞ্জে। তার তাজা বিবিটা একা একা থাকবে। ফাঁক বুঝে তাজিয়া নাচাবে আকালু। সে ভীষণ শক্ত হয়ে গেল। সে মামলা করতে গেলে বিবিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তবু সে মামলার নামে ঘাবড়ে গেল। তার এখন প্রায় ভিক্ষা সম্বল। তার নামে এতবড় মানুষটা মামলা করতে গেল!

বস্তুত এই আমিনুল্লা আর কালু মিঞা এসেছিল যেনতেন প্রকারেণ ফেলুকে ঘাবড়ে দিতে। বুদ্ধিটা আকালুসাবেরই। সে-ই ফেলুকে যখন তখন ভয় দেখাতে বলছে। টাকার জোরে আকালু বাজি ফাটাচ্ছে। আকালুর দল ভারি, সে পঙ্গু, তার অর্থবল নেই। সে গরিব। সে আকালুর কাছে কিছু না। তবু সে তার পিছনে কেন লাগে! একটা বিবি তার। —দ্যাশে কত খুবসুরত বিবি আছে মিঞা। তোমার টাকার অভাব নাই। শহরে যাও, ধইরা আন। ফেলু বড় অসহায় বোধ করল। এই কামডা ভাল না মিঞা। ফেলু দু'হাত তুলে মোনাজাত করল আন্নার কাছে। আমি অমানুষ আল্লা। তুমি আমার কসুর ক্ষেমা দিয়। বিবিরে নিয়া রঙ্গ তামাশা করে না য্যান। গলার নালি হ্যাৎ কইরা দিমু তবে ছিঁড়া।

আমিনুল্লা বলল, তা মিঞা কথা কওনা ক্যান?

—কি কমু কন?

—একটা ফয়সালা কইরা ফ্যাল। আকালুসাব নেতা মানুষ, তার লগে তুমি পার?

—কি ফয়সালা?

—তালাকনামা লিখা ফ্যাল। গোপনে কাজটা হইয়া যাউক।

ফেলুর মনে হল বজ্রাঘাত মাথায়। অথবা মনে হচ্ছে ওর মাথায় কারা হাতুড়ি পেটাচ্ছে। সে সেই দিনের মতো উঠে দাঁড়াল। ঘা-টা গামছায় ঢাকা। তবু মাছি ভনভন করছে। খড়ি উঠে গেছে শরীরে। তার শরীর সেই আদ্যিকালের একটা গাছের মতো। ডালপালা ভেঙে গেছে। তবু সে মহাসমারোহে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। মহাসমারোহে পৃথিবীর ঝড় জল রোদ সহ্য করতে করতে সহসা নিজের ভিতর দুটো হাত গজিয়ে নিতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে আর পারছে না। ভয়ঙ্কর কঠিন উক্তি ওর মুখে এসে গেছিল। সে তা প্রকাশ করল না। করলেই ওরা পালাবে। সে ঘরের ভিতর টলতে টলতে ঢুকে গেল। তখন দুই মিঞা বুঝতে পারল ফেলু ক্ষেপে গেছে। ওরা উঠানে এখন বসে থাকলে এই দিনের বেলাতেই সে হাঁসুয়া নিয়ে গলা দু'খান করে দেবে। ফেলু যত সত্বর ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে তার চেয়ে দ্রুত ওরা মাঠে দৌড়ে নেমে গেল।

ফেলু ঘর থেকে বের হয়ে দেখল ওরা উঠানে নেই। হাতে ওর সেই কোরবানের চাকুটা। উঠানের এক কোণে ওর বাগি গরুটা ফেলুকে জাবর কাটতে কাটতে দেখছে। ফেলু উঁকি দিয়ে কী যেন মাঠে খুঁজছে। উঠানের চারপাশে তাকাচ্ছ। ফেলু তাকাতেই দেখল জাফরি যেন সব বুঝে গেছে। সে তার বাগি গরুটাকে বলল, দুই মিঞা কোনদিকে গ্যাল জাফরি! গলার নালিতে কত খুন আছে একবার দ্যাখতাম।

বাড়ির শেষে ফেলু বড় কাফিলা গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। গাছটা থেকে আঠা পড়ে পড়ে গোড়া আর চেনা যায় না। ডালপালা নেই, পাতা দুটো একটা। দেখলে মনে হয়, গাছটা মরে গেছে। শুধু ফেলু জানে গাছ ভিতরে তেমনি তাজা, এখনও এক কোপে কত আঠা যে ওগলায়। গাছটা মাথায় খুব লম্বা নয়। খুশি মতো ফেলু ডাল পালা কেটে বাড়ি র চার পাশে বেড়া দেয়। কাণ্ড এখনও এত নরম যে সে একবার শাবল দিয়ে গাছটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে ছিল। সে এই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালেই বড় মাঠ দেখতে পায়। আর দেখতে পায় সেই ষণ্ড। সে দেখল আজ দুই মিঞা ভয়ে প্রায় মুখপোড়া যণ্ডের মতোই লুঙ্গি তুলে ছুটছে। সে এবার চিৎকার করে উঠল, অঃ হালার পো হালারা, কুত্তার মত পালাও ক্যান। খাড়াও। দ্যাহি মরদখানা ক্যামন! বিবিরে নিয়া আমার তাজিয়া নাচাইতে পার কিনা দ্যাহি!

তখনই দেখল ফেলু কোত্থেকে সেই ধর্মের ষণ্ড মাথা নিচু করে উঠে আসছে। কালো রঙ। কী কালো, প্রায় ঈশান কোণের কালবোশেখিতে মেঘের রঙ এমন হয়। দুই শিঙ তরবারির মতো আকাশের দিকে উঠে গেছে। কী ধারালো, নিমেষে সে বসুন্ধরা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে যেন।

ফেলু তার এক চোখে দেখছে যণ্ডটাকে। যণ্ড ও-পাশ থেকে আর এক চোখে দেখছে। ফেলু একটা গোলাপফুলের মতো কোরবানীর চাকুটা দু'আঙুলে ধরে রেখেছে। যণ্ডটা এতক্ষণে ফেলুকে হয়তো তেড়ে এসে কাফিলা গাছটায় গেঁথে দিত—কিন্তু হাতে এক কোরবানীর চাকু। দেখলেই ষণ্ড টের পায়, বড় ধারালো ওটা, গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিলে নালি ফাঁক। যেন ফেলু ওটা একটা গোলাপফুল তুলে এনেছে বাগান থেকে। আও মিঞা, খাড়াইলা ক্যান। বাগিচা থাইকা তোমার লাইগা ফুল তুইলা আনছি। আও। আও। বলে এক হাতে ফেলু ষণ্ডটাকে উদ্দেশ্য করে উরু থাবড়াতে থাকল। আর চাকুটাকে নাচাতে থাকল হাতের উপর।

যণ্ড নিমেষে বেমালুম ভালোমানুষ হয়ে গেল। শিঙ দিয়ে আর মাটি তুলল না। গোঁত্তা খেল না আর মাটিতে। সরল যুবার মতো হেঁটে পাখপাখালি দেখতে দেখতে নেমে যেতে থাকল। যেন এক পোষমানা জীব, ফেলুকে দেখেই মাঠে ঘাস খেতে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু ফেলুর কেমন দুই মিঞাকে কাছে না পেয়ে জিদ চড়ে গেল। মিঞার বদলে এই ষণ্ড। সে মাঠে নেমে লড়াই করবে, সে হাঁকল, হাঁ হাঁ হাঁ। যণ্ডটা এবার ঘুরে দাঁড়াল। মাঠের দুই পাশে দুইজনা। দুই জীব। আদিম এবং উৎকট চোখমুখ দুই জীবের। ফেলুর

নেই ডানদিকের চোখ, যণ্ডের নেই বাঁ দিকের চোখটা। জীবের চার পা। ফেলুর দু'পা, এক হাত। এখন ওরা এত কাছাকাছি যে উভয়ে উভয়ের অর্ধেকটা দেখছে। সবটা দেখতে পাচ্ছে না। ফেলু এখন যেন চিনতেই পারছে না, এটা জীব না অন্য কিছু। কী তার ধর্ম, কী তার স্বভাব। যণ্ডটাও বুঝতে পারছে না। সামনের জীবটা মানুষ, না পীর, না ইবলিশ। যণ্ডের মনে হল, হালার এক আজব জীব। সে ভয়ে লেজ খাড়া করে বিলের দিকে ছুটতে থাকল। পথে আসছিলেন তারিণী সেন। তারিণী কবিরাজ। ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। এত বেশি জোরে ছুটছে যণ্ড যে তারিণী সেনের ঘোড়া পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে।

ফেলু জোরে জোরে হাঁকল, হাজিসাব, আপনের ষণ্ড আমারে ডরাইছে।

তারিণী কবিরাজ যাচ্ছেন ঠাকুরবাড়ি। বুড়ো ঠাকুরের এখন-তখন অবস্থা। সঙ্গে রেখেছেন মকরধ্বজ। পকেটের ভিতর ঘোড়ার পিঠে কত রকমের সব লাল নীল রঙের বড়ি। ঘোড়ার পিঠে তারিণী কবিরাজ উঠছেন আবার নামছেন। মাঠের উপরে এমন একজন মানী লোককে আসতে দেখে সে ভাবল একবার যাবে কবিরাজমশাইর কাছে। হাতের ঘা-টা তাকে দেখাবে। এই না ভেবে সেও ঘোড়ার পিছনে লেজ খাড়া করে ছুটতে থাকল।

সকাল থেকেই বাড়ির ভিতরে সবাই ব্যস্ত। সোনা অর্জুন গাছের নিচে এসেছিল পাগল জ্যাঠামশাইকে ডেকে নিয়ে যেতে। তিনি গাছটার নিচে বসে আছেন। কিছুতেই বাড়ির ভিতর যাচ্ছেন না। সোনা নিয়ে যেতে না পারলে বড়বৌ আসবে। তখনই সে দেখল সম্মান্দীর তারিণী কবিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। সে জ্যাঠামশাইকে ফেলে ছুটে গেছে বাড়িতে—তারিণী দাদা আইতাছেন। বড়বৌ এবং শচীন্দ্রনাথ খবর পেয়ে উঠানে নেমে এলেন। নরেন দাস ছুটে এল। কবিরাজমশাই বড় ঘরে ঢুকে বললেন, ঠাকুরদা, কেমন আছেন?

বড়বৌ সব উত্তর দিচ্ছিল কবিরাজমশাইকে। কারণ বৃদ্ধ মানুষটির কথা বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল ভোরে তিনি সবাইকে কাছে ডাকলেন। বড়বৌ, শচি, শশীবালা, ধনবৌ সবাইকে। তাঁর বড় ইচ্ছা নৌকাবিলাস পালাগান শোনার। মহজমপুরের যোগেশ চক্রবর্তীকে খবর দিতে হবে। ঈশম যাবে ভাবছিল—তখনই হঠাৎ চোখ বুজে যেন কী বুঝতে পারলেন, বললেন, না দরকার নেই। কাল আমার একশ বছর পূর্ণ হবে। তোমরা আত্মীয় স্বজন সবাইরে খবর দ্যাও। তারপর থেকেই হৈচৈ বাড়িতে। তিনি বলেছেন, পরদিন ভোররাতে সবার মায়া কাটাবেন। আর সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকবেন না।

ফেলু দৌড়ে এসেছিল গো পাট পর্যন্ত। সে আগে এসে ধরতে পারল না। ঠাকুরবাড়ি সে কোনওদিন উঠে যেতে সাহস পায় না। সে হারমাদ মানুষ। ওকে দেখলেই ভয় পায় সকলে। সে সেজন্য গোপাটের মাদার গাছের নিচে বসে থাকল, কখন কবিরাজমশাই আবার ঘোড়ায় চড়ে গোপাটে নেমে আসবেন।

তারিণী সেন বললেন, ঠাকুরদা, আমি তারিণী। কি কষ্ট হইতাছে কন!

মহেন্দ্রনাথ হাত সামান্য ওপরে তুলে ইশারায় যেন বললেন, কোনও কষ্ট না। এখন তাঁর সব কৃপা। তোমরা আর আমাকে তাড়না করবে না, এমন মুখচোখ তাঁর।

শচি বললেন, তারিণীকাকা, কি মনে হয়?

—টিকব না। যা কইছে ঠিকই কইছে।

—কিছু খাইতে চায় না।

—সবাই কাছে বইসা থাক। অষুধ দিয়া আর কোন দরকার নাই।

মন মানে না। বড়বৌ বিকেলে ঈশমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারিণী কবিরাজের কাছে। তিনি প্রবীণ মানুষ। প্রবীণ বদ্যি। তিনি এই সংসারের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত। এবং প্রায় আত্মীয় সম্পর্ক। সেই থেকে মানুষজন সব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আত্মীয়স্বজন যা আছে সবার কাছে এবং তারিণী কবিরাজকে খবরটা দিতে বলা হয়েছিল। খবর পেয়েই চার ক্রোশ পথ ঘোড়ায় চড়ে চলে এসেছেন। ঈশম আসেনি। সে আসবে দক্ষিণে যত আত্মীয়স্বজন আছে তাদের খবর দিয়ে। হারান পাল গেছে উত্তরে, নরেন দাস গেছে পুবে আর শশীমাস্টার গেছেন মুড়াপাড়া। তিনি যাবার সময় গোলাকান্দাল, পেরাব, পোনাব এবং দূরে দূরে যে সব গ্রামে আত্মীয়স্বজন আছে সবাইকে খবর দিয়ে চলে যাচ্ছেন— তিনি বলে যাচ্ছেন, মুড়াপাড়া যাচ্ছি। ঠাকুরের দুই ছেলে আছে তাদের খবর দিতে! ঠাকুরকর্তা আগামীকাল দেহ রাখবেন।

আর দীনবন্ধু থাকল নানারকম কাজকর্মের তদারকিতে। কোথায় দাহ করা হবে ঠিক আছে। অর্জুন গাছটার নিচে রাখা হবে। তিনি গাছ লাগিয়ে তাঁর দাহ করার জায়গা ঠিক করে রেখেছেন। কোন আমগাছ কাটা হবে, সেটাও ঠিক করে রাখতে হয়।

তারিণী কবিরাজ বললেন, পাগল কর্তারে দ্যাখতাছি না।

—অর্জুন গাছের নিচে বসে আছেন।

—ডাইকা আনেন। কাছে বইসা থাকুক।

বড়বৌ সোনাকে পাঠিয়েছিল ডাকতে। কিন্তু তিনি আসছেন না। দীনবন্ধু একবার খবর নিয়ে গেল, কি রকম লাগছে। কেমন আছে?

বড়বৌ বলল, বিকেলের টানে চলে যাবে মনে হয়।

—ধনবৌদিরে কন রান্নাবান্না শেষ করতে। পোলাপান যা আছে অগ খাওয়াইয়া দ্যান। আপনেরা-অ দুইডা মুখে দ্যান।

বড়বৌ সে-সবের কোনও উত্তর দিল না। বলল, দেখুন তো ঠাকুরপো, আপনার দাদাকে নিয়ে আসতে পারেন কিনা?

—তাইন কোনখানে?

—অর্জুন গাছটার নিচে বসে আছে। সোনাকে পাঠিয়েছিলাম। আসছে না।

—আপনি যান বৌদি। আপনি না গ্যালে আসবেন না।

—যাই কি করে বলুন। তারিণীকাকা এসেছেন, ওর জন্যে জলখাবার করতে হবে। ধন রান্না করছে। মা তো বিছানাতেই চুপচাপ বসে আছেন। কাল থেকে কিছু খাচ্ছেন না। কোন দিকে সামলাই বলুন।

সুতরাং দীনবন্ধু অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে ডাকল, এখানে বইসা থাকলে হইব? বাড়ি যান।

পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ দেখলেন দীনবন্ধু তাকে নিতে এসেছে। তিনি পিছন ফিরে বসে থাকলেন।

শচি এলেন। সেও নিয়ে যেতে পারলেন না। শচি ফিরে এসে বললেন, আপনি যান। দেখেন আনতে পারেন কিনা।

অগত্যা সব কাজ ফেলে বড়বৌ পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল। দেখল, তার মানুষ এখন ঘাসের ওপর বসে আছেন। দুটো-একটা পাতা গাছ থেকে ওঁর মাথার ওপর ঝরে পড়ছে। সে কাছে গেলেও মানুষটা চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। কাছে গিয়ে মাথাব চুলে নরম আঙুলে বিলি কাটতে থাকল। প্রায় সন্তানের মতো যেন তার আদর। সে বলল, ওঠ। এ সময় এখানে বসে থাকতে নেই। চার পাশে তিনি হাতড়াচ্ছেন। সবাই বলছে তিনি তোমাকে খুঁজছেন। ওঠ, ওঁর পায়ের কাছে বসে থাকবে। কোথাও আজ বের হবে না।

বড়বৌ একটু থেমে দূরের গোপাটে কাকে যেন আলগা হয়ে বসে থাকতে দেখল। কে বসে আছে এমনভাবে! ঝোপজঙ্গলের জন্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বড়বৌ উঁকি দিলে জঙ্গলের ও পাশে মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সুতরাং ফের বলা। এই মানুষকে কিছু-না-কিছু একা একা বলে যেতেই হয়, তিনি তো তার কোনও জবাব দেবেন না। সে বলল, মেজ ঠাকুরপো, ধন ঠাকুরপোকে খবর দেবার জন্য শশীমাস্টারমশাই গেছেন। কবিরাজকাকা এসেছেন। এসেই তিনি তোমার খোঁজ করেছেন। তোমার বোনের কাছে লোক পাঠানো হয়েছে। পশি, ইছাপুরা লোক গেছে। তোমার মামাবাড়িতে খবর দিতে গেছে হারান পাল।

সে সব খুলে বলছে। কীভাবে কী সব কাজ হচ্ছে সংসারে, সব বলছে। এই মানুষ বাড়ির বড় ছেলে! তাঁর সব জানা উচিত। তিনিই দাঁড়িয়ে থেকে সব করতেন। তাঁর হয়ে

বুঝি বড়বৌ আর শচি সব করছে। সুতরাং ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, না কোথাও ভুল থেকে গেল, মানুষটাকে এমন জানানো। বলতে বলতে নিজের কাছেই ভুল ধরা পড়বে। অঃ, তাই তো, সোনার মামাবাড়িতে লোক পাঠানো হয়নি। তাউইমশাই খুব দুঃখ পাবেন। সে তাড়াতাড়ি সোনাকে ডেকে বলল, তোর ছোটকাকাকে ডাক তো।

শচি এলে বলল, সোনার মামাবাড়িতে কে গেছে?

—কেউ যাই নাই।

—কাউকে পাঠিয়ে দিন।

এ-সময় কী কী করণীয়, বড় ছেলে বলেই তাঁর সব জানা উচিত। অথবা এই যে সব করা হচ্ছে, আত্মীয় পরিজনদের খবর দেওয়া হচ্ছে—তিনি যেন সবই জানেন এবং তাঁর পরামর্শ মতোই হচ্ছে এমন সম্মান দেখানো প্রয়োজন। বড়বৌ এ-জন্য সব বিস্তারিত বলে যাচ্ছে মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে।

বড়বৌ বলল, কি দেখছ?

মণীন্দ্রনাথ গাছের ডালের দিকে চোখ তুলে দিলেন।

বড়বৌ বলল, সামনে শুধু মাঠ। ফসল নেই। জমি চাষ করা। বৃষ্টি পড়লেই পাটের বীজ বুনে দেওয়া হবে। এ-সময়ে তুমি কিছু দেখতে পাবে না।

মণীন্দ্রনাথ পা ছড়িয়ে বসলেন। যেন তিনি কোনও বড় নদীর পাড়ে বসে আছেন। সকালবেলা। রোদের তাত তেমন প্রচণ্ড নয়। দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছে। কী ঘন চুল এই বয়েসে! চুল তাঁর একটাও পাকেনি। ছেলেমানুষের মতো বড় বড় চুল। বাতাসে চুল উড়ছে। ঘাটে জল কম। ঘোলা জল। কলমিলতার সবুজ আভা মরে যাচ্ছে। রুক্ষ কঠিন মাঠ। ধু ধু বালিরাশি আর কিছুক্ষণ পরই নদীর চরে উড়তে থাকবে।

বড়বৌ বলল, তিনি যাই করে থাকেন, তোমার ভালো ভেবে করেছেন।

মণীন্দ্রনাথ ছোট ছেলের মতো অভিমানের চোখ নিয়ে দেখলেন বড়বৌকে। কোনও কথা বললেন না! কথা বলেনও না তিনি। বেশি পীড়াপীড়ি করলে তাঁর প্রিয় কোনও কবিতা আবৃত্তি করেন। বড়বৌ এই অভিমানী মানুষটিকে দেখে ভাবল, তিনি হয়তো এখুনি কোনও কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। বড়বৌ তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, এ-সময় সবাইকে কাছে থাকতে হয়। তুমি তাঁর বড় ছেলে। কত আশা ছিল তাঁর তোমাকে নিয়ে।

মানুষটা এবার মাথা গুঁজে দিল দু'হাঁটুর ভিতর। ওঁর কি কান্না পাচ্ছে! অথবা রাগে, অভিমানে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন! বড়বৌ প্রায় এসেছে এখন জননীর মতো।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। লক্ষ্মী এস। এমন করতে নেই। তুমি যদি পাশে না থাক, তিনি মরেও শান্তি পাবেন না।

পাগল মানুষ সেই যে মাথা গুঁজে দিয়েছেন হাঁটুর ভিতর, কিছুতেই মাথা তুলছেন না। বড়বৌ হাত ধরে টানছে। ওর মাথার ঘোমটা সরে গেছে সামান্য, বাঁ হাতে ঘোমটা টেনে ঠিক রাখছে। বুকের আঁচল সরে যাচ্ছে। ঝোপের ও পাশে একটা লোক লুকিয়ে বসে আছে। সব দেখছে বসে বসে। সকালের রোদ্দুর গাছের ডালে, পাতার ফাঁকে, মাটিতে এসে পড়েছে। মুখে বড়বৌর সকালের রোদ্দুর বড় মায়াময়। মুখে কপালে তার ঘাম। কপালে সিঁদুর বাসি দাগের মতো দাগের মতো। লালপেড়ে কাপড়, শ্যামলা রঙ তার আর এই শ্রী সকালবেলার মাঠে বড় মাধুর্য বয়ে আনছে। ফেলু কবিরাজের আশায় বসে থেকে ঝোপের ভিতর সব দেখছে। সুন্দর লাবণ্যময় পা, পাতার ওপর লালপেড়ে শাড়ি কি শরিফ্ মনে হচ্ছে। অথচ এত টানাটানিতেও মানুষটা উঠছেন না। সামনের জমিতে সেই ষাঁড়টা এখন নিরিবিলি ঘাস খাচ্ছে। কোথায় কি হচ্ছে কিছু দেখছে না।

বড়বৌ টেনে তুলতে না পেরে বলল, তুমি তো জানো, তোমাকে ভালো করার জন্য তিনি কী না করেছেন!

পাগল মানুষটার হাই উঠছে। তাঁর এ-সব শুনতে আর ভালো লাগছে না।

বড়বৌ এক এক করে এবার এ-সংসারের পুরানো ইতিহাস বলে গেল। মানুষটার তবু যদি চৈতন্য হয়। এমন সময় এ-পাগলামি বড়বৌরও ভালো লাগছে না। কবে একবার মহেন্দ্রনাথ নদী পার হয়ে শ্মশানে চলে গিয়েছিলেন, মৃতদেহের জন্য সেই শ্মশানে একা একা রাত্রিবাস এবং মৃতদেহ চুরি, তারপর সেই কাপালিকের জন্য কত কিছু হোমের কাঠ বিল্বপত্র আর অমাবস্যা রাতের অন্ধকারে নিশীথে শিবাভোগ এবং নদীর পাড়ে শ্মশানভূমিতে এক ভয়ঙ্কর কঠিন যাগযজ্ঞে এই মানুষের আরোগ্য কামনা করেছিলেন, সে সব মনে করিয়ে দিতে চাইলেন। যেমন তিনি জীবনে একবার মিথ্যা তার করে, সন্তানের ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি তিনি প্রৌঢ় বয়সে প্রায় তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে হারজিতের বাজিতে পড়ে গিয়ে — যা কিছু অকল্পনীয়, যা কিছু মানুষের দ্বারা সিদ্ধ, ভূত অথবা পিশাচ কোনও কিছুই বাদ রাখেননি। যেন তিনি দৈবের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য ক্রোশের পর ক্রোশ নিশীথে হেঁটে যেতেন, কোনও ফকির অথবা আউলবাউলের উদ্দেশে। তাঁর বড় ছেলে পাগল। কেউ বাণ মারতে পারে, বন্ধন করে দিতে পারে — তিনি মন্ত্রসিদ্ধ মানুষের খোঁজে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও তেমন মানুষ খুঁজে পেলেন না। শুধু মিথ্যার অহঙ্কার। যাগযজ্ঞ, তুকতাক সব মিথ্যার সঙ্গে লড়াই। যেদিন যথার্থই হেরে গেলেন, সেদিন থেকে আর ঘরের বার হলেন না। সবাই দেখল মানুষটা অন্ধ হয়ে গেছেন। কেউ কেউ বলেছে মানুষটা হেরে গিয়ে সারারাত মাঠে শীতের ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে মানুষটার দুটো চোখই চলে গেল। এখন সেই মানুষ নিজেও চলে যাচ্ছেন। বড়বৌর মায়া হতে লাগল। কোনও রকমে একবার নিয়ে যাওয়া, এই শেষ

সময়ে শিয়রে অথবা পায়ের কাছে বসিয়ে রাখা। সে কেমন কাতর গলায় বলল, তোমার এতটুকু মায়াদয়া নেই? তিনি তোমাকে কীভাবে চারপাশে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছেন!

পাগল মানুষ দেখল তখন একটা ষাঁড়, বড় ধর্মের ষাঁড় ঘাসের জন্য ফোঁপাচ্ছে। কঠিন মাটি, জল নেই কতদিন। ঘাস পুড়ে গেছে। সূর্য মাথার ওপর থেকে যেন নামে না। কঠিন দাবদাহে যাঁড়টা লাফাচ্ছিল। এমন কি সেটা এই পুকুর-পাড়ে উঠে আসতে পারে। কেমন ভয়ে ভয়ে পাগল ঠাকুর এবার উঠে দাঁড়ালেন।

মনের ভিতর ভয় জাগলেই তিনি দেখতে পান এক কাটামুণ্ড হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। দুই কান তার লম্বা। সাপের চোখের মতো চোখ। নীল এবং অন্ধকার। তিনি দেখতে পান কখনও মুণ্ডটা অতিকায় বাদুড় হয়ে তাঁর চোখের ওপর ঝুলছে। তিনি তখন কাটা মুণ্ডর ভয়ে পিছনে ছুটতে থাকেন। নিশিদিন সেই কাটামুণ্ড কে যেন সুতো দিয়ে অদৃশ্য এক স্থান থেকে তাঁর চোখ বরাবর ঝুলিয়ে দিয়ে বলছে, এই দ্যাখো, এই হচ্ছে তোমার ধর্ম। তার সবটা থাকে না। কিছুটা থাকে। যা দেখলেই সত্যিকারের মানুষ ভয় পায়। নিশীথে সে এক অতিকায় বাদুড় হয়ে যেতে পারে। যক্ষ রক্ষ সব তার দোসর। তুমি তার ভয়ে কীটের শামিল। খুশি মতো তখন তোমাকে বলি অথবা জবাই দেওয়া চলে। তখনই ভয়ে মণীন্দ্রনাথের নিরিবিলি এক আশ্রয়ের কথা মনে হয়। বড়বৌ সেখানে সাদা পাথরে লাল বর্ণের ফলমূল আহার নিমিত্ত রেখে দিয়েছে। পানীয়ের নিমিত্ত রেখেছে ঠাণ্ডা জল। তিনি তখন একা একা সেই জানালায় যাবেন বলে হাঁটতে থাকেন।

বড়বৌ দেখল মানুষটা এবার ঘরের দিকে ফিরছেন।

সোনা বিকেলের দিকেই দেখল এই বাড়ি মানুষজনে গিজগিজ করছে। ঘোড়ায় চড়ে এলেন তারিণী সেন, তিনি ঘোড়ায় চড়ে ফের নেমেও গেলেন। ব্রাহ্মন্দী থেকে রায়মশাইরা খবর পেয়ে বের হয়ে পড়েছেন। গোপালদি থেকে এসেছে অর্জুন সাহা, তার বৌ মা সবাই। লতব্দি থেকে এসেছেন অম্বিকা রায়। এসেছেন হাজিসাহেব, তাঁর দুই ছেলে। আবেদালি, হাসিমের বাপ মনজুর, সবাই এসেছে। ওরা বৈঠকখানা ঘরে বসে রয়েছে। মনজুর আমগাছ কেটে কাঠ করার দায়িত্ব নিয়েছে। যেখানে যা কিছু খবর এখন, সে শুধু এক খবর, বুড়োকর্তার মহাপ্রয়াণ হচ্ছে। শতবর্ষ পার করে মানুষটা আর একদিনও সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বাঁচবেন না।

সারাদিন ধরেই এ-ভাবে মানুষজন আসছে যাচ্ছে। ছোটকাকা শিয়রে বসে গীতা পাঠ করছেন। রায়মশাই পিঁড়িতে বসে মহাভারত থেকে বিরাট পর্ব পড়ে শোনাচ্ছেন। ঠাকুমা পায়ের কাছে সারাদিন বসে আছেন। জ্যাঠামশাইকে ধরে এনে পাশে বসিয়ে দিয়েছেন জেঠিমা। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে ডেকেছে, বাবা, বাবা।

তখন যেন এই মানুষ কত দূরে চলে যেতে যেতে কার ডাক শুনে চোখ মেলে একটু তাকাচ্ছেন, তারপরই চোখ বুজে আবার কোন দূরাগত মায়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন।

জ্যেঠিমা ডাকছে বাবা, বাবা, ও আপনার বড় ছেলে। বলে জ্যেঠিমা শীর্ণ হাতখানা তুলে, পাগল মানুষের মাথায় ধরে রাখছেন। বাবা, বাবা, আপনি আশীর্বাদ করুন আপনার পাগল ছেলেকে। তাকে বলুন, তুই আর কোথাও যাবি না। ওকে আপনি বলে যান সে কি করবে!

সোনা দেখেছিল তখন ঠাকুরদার চোখে জল। দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। জ্যেঠিমা খুব ধীরে ধীরে সেই জল মুছিয়ে দেবার সময় ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। সবারই চোখ ছলছল করছে। ছোটকাকা বোধ হয় দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি কিছুক্ষণের জন্য গীতা পাঠ বন্ধ রেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। বুঝি এ-সময় ঠাকুরদার পাশে জ্যাঠামশাইর এই চেহারা সহ্য করা যায় না। বুক ভেঙে কান্না উঠে আসে।

জ্যেঠিমা বললেন, আপনি, ওকে কিন্তু চোখে চোখে রাখবেন সব সময়।

সোনার কেমন অস্বস্তি লাগছিল। বুকের ভিতর ওরও একটা কষ্ট হচ্ছে। যা সে ঠিক এখন ছুঁতে পারছে না। ঠাকুর্দা মরে গিয়ে স্বর্গ থেকে সবসময় চোখে চোখ রাখবেন। জ্যেঠিমা কাঁদছেন। সোনার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আর ভয় কি! এখন থেকে সবসময় একজন পাহারাদার পাওয়া গেল। তিনি সব লক্ষ রাখবেন। তবে আর কান্নার কী আছে! তবু কেন জানি কান্না পায়। সোনারও কান্না পাচ্ছিল! এতক্ষণ যে বুকের ভিতর অস্বস্তি, এই কান্নার জন্য। ঠাকুর্দা মরে যাবেন। এটা ভাবতেই এখন ওর কান্না পাচ্ছে। অর্জুন গাছের নিচে ঠাকুর্দাকে পোড়ানো হবে, বাবা জ্যাঠামশাই মন্দির বানিয়ে দেবেন। সোনা বিকেলে মন্দিরের চাতালে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে বসে থাকবে। বর্ষাকাল এলে চাতালের পাশে জল উঠে আসবে। জলের নিচে রূপালি রঙের পুঁটিমাছ। সে এবং জ্যাঠামশাই ছিপ ফেলে পুঁটিমাছ ধরবে।

সে নিজে এ-ভাবে জ্যাঠামশাইকে কোন-না-কোন কাজের ভিতর নিযুক্ত করে রাখবে। কোথাও যেতে দেবে না। কোনও কাজের ভিতর, এই যেমন মাছধরা, ফলের দিনে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ফল-পাকুড় পেড়ে আনা, ফসলের দিনে ঈশমদাদার পাশে বসে জমি পাহারা দেওয়া, বিদ্যালয়ে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং কোনও গাছের নিচে বসিয়ে রেখে ক্লাস সেরে আসা, ফেরার পথে কোঁচড়ে জাম-জামরুল, অথবা চিনা বাদাম। চৈত্রমাসে দু' পকেটে খিরাই, দু'জনে পথে পথে খেতে খেতে আসা—এমন একটা ছবি ওর চোখের ওপর ভেসে উঠল। ঠাকুরদার কানের কাছে এ-সব বলে দেবার ইচ্ছা তার। ঠাকুরদা, কেন কাঁদেন আপনি। আমি তো আছি। সারাজীবন জ্যাঠামশাইর সঙ্গে সঙ্গে আমি থাকব। তাঁকে ফেলে কোথাও যাব না।

কিন্তু এত মানুষজন ঘরের ভিতর, ওরা আসছে যাচ্ছে, ঠাকুরদাকে দেখে উঠানে নেমে যাচ্ছে, ঠাকুরদার সততা সম্পর্কে ওরা কথাবার্তা বলছে, এমন মানুষ হয় না, কথিত আছে রাম রাজত্ব করেন, সীতা বনবাসে যায়... প্রায় যেন, এ-সংসারে তেমন চিত্র, এক

পাগল মানুষ নিশিদিন হাটে মাঠে ঘুরে বেড়ান, এক সীতার মতো সাধ্বী নারী জানালায় দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করে অথবা সংসারের কাজকর্মে ডুবে থাকে সে।

সোনা ঠাকুরদার কানের কাছে গিয়ে বলতে পারল না, আমি সোনা কথা বলছি, আপনার ছোট নাতি। জ্যাঠামশায়কে আমি দেইখা রাখুম। আপনে কাঁদছেন কেন? কিন্তু এত লোকজনের ভিতর সে যে কী করে বলবে! তবু সে কোনওরকমে শিয়রের দিকে ভিড়ের ভিতর মাথা ঠেলে শিয়রের ডানদিকে এসে গেল। একটা মোটা কম্বলে শরীর ঢাকা ঠাকুরদার। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন। সব শরীরটা তাঁর কাঁপছে। সোনা কোনওরকমে মাথার কাছে মুখ নিতেই, কারা যেন তাকে জোর করে সরিয়ে নিল। ওর চোখে জল। সবাই হয়তো ভেবেছে, সোনা এখন ঠাকুর্দার গলা জড়িয়ে কাঁদবে। সে বলতে পারল না, আমি কাঁদছি না, আমি গলা জড়িয়ে কাঁদব না। সোনাকে এখন তবু কারা জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওকে বোঝ-প্রবোধ দিচ্ছে, ঠাকুরদা বুড়ো হয়েছে, মরে যাচ্ছে, কাঁদছ কেন? কী ভাগ্যবান মানুষ তিনি। তাঁর কত সুনাম। তোমরা কাঁদলে ঠাকুরদার আত্মা শান্তি পাবে না।

সে এসে দাঁড়াল জামরুল গাছটার নিচে। তারিণী কবিরাজ গোপাটে ঘোড়ার ওপর বসেই একটা মানুষের কী যেন দেখছেন। সেই মানুষ ফেলু শেখ। সে একজন প্রবীণ মানুষকে তার কুষ্ঠের মতো ঘা দেখাচ্ছে। এবং লোকজন চারপাশে। সোনার মনটা ক্রমশ ভারি হয়ে আসছিল। তারিণী সেন ঘোড়ায় চড়ে চলে যাচ্ছেন। যারা দূরের মানুষ তারা উঠে আসছে। তারা কত রকমের সব মহৎ গল্প ঠাকুরদা সম্পর্কে বলছে। সব প্রাচীন গাঁথার মতো মনে হয়। একজন মানুষ মরে গেলে বুঝি তার অতীত সবার চোখে ঘুরেফিরে আসে। সোনার এখন এ-সব শুনতে ভালো লাগছে। সে সব মানুষদের ভিতরে ঘুরেফিরে —তার ঠাকুরদার অতীত ইতিহাস, সত্যবাদিতা, পৌরুষ এবং দানশীলতা সম্পর্কে সব শুনছে। কিন্তু একজন শুধু বলছে, তিনি একবার মিথ্যা তার করেছিলেন, তাঁর বড়ছেলেকে। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। অথচ তার করলেন, তিনি অসুস্থ, বাঁচা দায়। তিনি সেই মিথ্যা তার করে ছেলেকে আনিয়েছিলেন, এবং বড় ছেলে তাঁর ফিরে এলেই বিবাহ। বড় ছেলে তাঁর বৈঠকখানায় সারাটা দিন মাথা নিচু করে বসেছিল। পিতার সম্ভ্রমের কথা ভেবে কেমন নিরন্তর দুঃখী মানুষের মতো মুখ। সে মানুষটা, সবাইকে রামায়ণ গানের মতো তার বর্ণনা দিচ্ছিল। যেন পিতার সত্যরক্ষার্থে পুত্রের বনে গমন। জীবনের সব কিছু ভালোবাসা বনবাসে রেখে আসা।

সোনার কেন জানি মনে হল, মানুষ কখনও সারাজীবন সত্য কথা বলতে পারে না। ঠাকুরদা যখন পারেননি, তখন আর কেউ পারবে না। বড় জ্যাঠামশাই কেন যে পাগল হয়ে গেলেন। এমন একটা মিথ্যা তার না করলে তার বড় জ্যেঠিমা এ-সংসারে আসতেন কি করে! বড় জ্যেঠিমার, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেবল সেবাশুশ্রূষা সকলের, নিজের বলতে তাঁর কিছু নেই—আর কী সুন্দর তাঁর কথা! সোনা, জ্যেঠিমার মতো অনায়াসে এখন কথা বলতে পারে। তার কখন খিদে লাগে তিনি টের পান। সে কখন অসুস্থ বোধ করে

জ্যেঠিমা চোখ দেখে ধরে ফেলেন। এবং সোনা যে বড় হয়ে গেছে তাও তিনি আজকাল ধরতে পেরে কেমন মাঝে মাঝে বলে দেন, আর কি, তোমাদের এখন পাখা হয়েছে, উড়ে যাবে। আমাদের কথা তোমরা কেউ ভাববে না।

সে শুধু তখন বলতে পারে — না জ্যেঠিমা, আমি কখনও এমন হব না। ভালো হব আমি। আমি এই পরিবারের জন্য সব করব। ঠাকুরদা মরে যাচ্ছে বলে কী হয়েছে আমরা তো আছি। আমি মেজদা বড়দা। সংসারের সব দুঃখ আমরা মুছে দেব। কত কিছু তার এখন বলতে ইচ্ছা হয়। সুন্দর, যা কিছু মহৎ এই পৃথিবীতে আছে সব কিছু তার হতে ইচ্ছা হয়। সে জামরুল গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠাকুরদা মরে যাচ্ছেন। মৃত্যু সম্পর্কে নানা রকম ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তার। ওর মনে হয় ঠাকুরদা মরে কোথাও যাবেন না। সবাই অনর্থক কাঁদছে। সংসারের এমন ভালোবাসা ফেলে কেউ কখনও দূরে গিয়ে থাকতে পারে না। তিনি এ বাড়িতেই থাকবেন। তবে অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। মরে গিয়ে মানুষ কোথাও বেশিদূর যেতে পারে না। ঠাকুরদাও বেশিদূর যেতে পারবেন না। সংসারে তার বড় জেঠিমার মতো বৌ আছে, পাগল জ্যাঠামশাইর মতো ছেলে আছে, ঈশমদাদার মতো মানুষ আছে, মার মতো ধনবৌ আছে, তবে তিনি যাবেন কোথায়। তিনি থাকবেন, এ সংসারেই থাকবেন। সকলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। বিপদে আপদে তিনি সকলকে দেখবেন।

আবার এও কেন জানি মনে হয় সোনার, ঠাকুরদা মরে গেলে আকাশের নিচে বড় বটগাছটার মাথায় একটা নক্ষত্র হয়ে জ্বলবেন। তিনি বড় ধার্মিক মানুষ, পুত্রের ম্লেচ্ছ আচরণের জন্য জীবন পণ করে বাজি ধরা ঈশ্বরের সঙ্গে—এ সব তাঁকে দেবতা বানিয়ে দেবে। তিনি এত পুণ্যবান যে, সে দেখল এখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। লণ্ঠন জ্বেলে মানুষজন আসছে। সে মাথা তুলে আকাশ দেখে বুঝল, চাঁদের চারপাশে গোল মণ্ডল। সেখানে দেবতারা সব চুপচাপ বসে একজন গুণী জ্ঞানী মানুষের অপেক্ষায় আছেন। তিনি এলে তাঁর নিবাস ঠিক করা হবে। একজন পুণ্যবান মানুষ মাটি ছেড়ে চলে আসছে—সে কোথায় থাকবে, তার বাড়ি, বাগান, ঠাকুর পূজার ঘর এ-সবের আয়োজন করছে তারা। তার ঠাকুরদা যথার্থই পুণ্যবান মানুষ। তিনি আকাশে নক্ষত্র হয়ে যাবেন। এবং তাঁর পাগল ছেলে কোথায় নিরুদ্দেশে যান ঠিক তিনি সেখান থেকে টের পাবেন এবং তাকে চোখে চোখে রাখবেন। ঠাকুরদার আর জন্ম হবে না। তিনি আকাশ থেকে দেখতে পাবেন সোনা কী করছে, জ্যাঠামশাই হেঁটে হেঁটে কোথায় চলে যাচ্ছেন, ঈশমদাদা তরমুজ খেতে পাহারা দিতে দিতে ঘুমোচ্ছে কি না—যেন সংসারের সব ফাঁকি এবার তিনি ধরে ফেলবেন। এবং রাতে ছোটকাকাকে স্বপ্নে বলে দেবেন, আগামী বছর দুর্দিন কি সুদিন। সোনাকে বলে দেবেন, জ্যাঠামশাই কোথায় কোন গাছের নিচে বসে আছেন। দুঃখ বলতে যেটুকু সংসারে আছে ঠাকুরদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে যাবে।

সোনা যখন এসব ভাবছিল তখন কেউ বলে গেল—তুমি সোনা যাও, ঠাকুরদার মুখে গঙ্গাজল দ্যাও—তখন ফেলু ট্যাবার পুকুর পাড়ের দিকে ছুটছে। সে জোনাকি ধরার জন্য

ছুটছে। একটা জোনাকি ওকে সেই মাঠ থেকে উড়ে উড়ে এতদূর নিয়ে এসেছে।

—কবিরাজমশয়, আমার ঘাডা সারাইয়া দ্যান। আপনের গোলাম হইয়া থাকমু। সে এমন বলেছিল কবিরাজমশাইকে।

—তুই কেডারে?

—আমি ফেলু। আপনেগ ফ্যালা। হাডুডু খ্যালছি কত। আপনের মনে নাই আমার নামডা?

—অঃ, তুই ফ্যালা। তা তর কি হইছে?

—ঘাও হইছে।

—কাছে আয় দ্যাখি।

—এই যে কবিরাজমশয়। দ্যাখেন।

ফেলুর মাথার ওপর মাছি উড়ছিল। কাছে যেতেই কী পচা গন্ধ। —আরে ফ্যালু, তুই ত মইরা যাইবি।

—এডা কি কন কবিরাজমশয়! আমি মইরা গ্যালে আন্নুডার কি হইব?

—তর যে বড় কঠিন অসুখ শরীরে।

—ঘাওড়া আর সারব না!

তারিণী কবিরাজ ঘা-টার চারপাশে টিপে টিপে দেখল।

—জ্বলে?

—হ জ্বলে। দাবদাহের মত জ্বলে।

—জোনাকি জ্বললে নিভলে যেমন জ্বলে?

—হ কবিরাজমশয়, ঠিক ধরছেন। জ্বালাডা দপ কইরা নিভা যায় আবার দপ কইরা জ্বইলা ওঠে।

—বড় কঠিন অসুখ রে ফ্যালা। তুই এক কাম করতে পারস?

—কি কাম কন দেখি। যা কন মাথা পাইতা দিমু।

—শতমুলের গাছ চিনিস?

চিনতে কতক্ষণ! বলে সে গামছা দিয়ে ওর ঘাটা ফের ঢেকে দিল। তারিণী সেন ঘোড়ার উপর বসে রয়েছেন। তিনি নামছেন না। ফেলুকে খুব কাছে আসতে বারণ করছেন। তিনি চোখ বুজে কী যেন ভাবছেন। তারপরই যেন বলে দিলেন, ঠিক কবিরাজিতে তর ব্যারামের অষুধ নাই। এডা আমি শিখছিলাম এক হেকিমদার মানুষের কাছে। তিনি কইছেন, বৃশ্চিক রোগে এডা লাগে।

—আমার কি বৃশ্চিক হইছে কবিরাজমশয়?

—ঠিক বৃশ্চিক না। তবে তর এই ঘাও আর ছাড়নের কথা না। সূর্যমুখি ঘাও। রোদ উঠলেই জ্বালাটা বাড়ে, রোদ পইড়া আইলে কমে জ্বালা।

—হ, বাড়ে কমে।

—সারে না। কবিরাজি মতে এর অষুধ নাই।

—আমি যে কি করিগ কবিরাজমশয়।

—এটা কইরা দ্যাখতে পারস। আর তুই উবুৎল্যাঙরার গাছ চিনস?

—না গ কবিরাজমশয়, চিনি না।

—চিন কি তবে? সারা জন্ম শুধু ভাত গিল্যে চলে!

—তা চলে কবিরাজমশয়। হায়, কি যে আমার হইল!

—আজই ত পূর্ণিমা। বৈশাখি পূর্ণিমা।

—হ কবিরাজমশয়!

—দিনটা ভাল আছে। শুক্লা তিথিতে এই জ্যোৎস্নায় একশটা জোনাকি ধইরা ফ্যাল। পক্ষকাল জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ। তারপর যখন দ্যাখবি জলটা ঘোলা ঘোলা হইয়া গ্যাছে তখন শতমূলি গাছের মূল গোলমরিচ গণ্ডা দুই জোনাকির জলে বেটে লাগাবি। কবিরাজিশাস্ত্রে এ-সব লেখা নাই। পেঁয়াজ রুসুনে তগ শরীরটা ত আর শরীর থাকে না। দুরমুস বইনা যায়। কবিরাজি অষুধ কামে লাগব না। দিয়া গ্যালাম, একবার লাগাইয়া দ্যাখতে পারস। লাগানোর আগে জোনাকির জল দিয়া ঘা ধুইয়া নিবি।

—কবিরাজমশয় ওবুল্যাওরা গাছের নিমিত্ত কি কইলেন যেন?

—পক্ষকাল কষ্ট পাইবি। তার আগে গাছটা সিদ্ধ কইরা কিছু বাসকের ছাল, অর্জুনের ছাল, জায়ফল, লবঙ্গ ফেইলা দিয়া একটা পাচন খাইতে পারস। শরীরের রক্ত তর খারাপ। কালোমেঘের পাতা সিদ্ধ কইরা খাইতে পারস। রক্তটা ঠিক হইলে ঘাও শুকাইতে সময় লাগব না। বলেই তারিণী সেন মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালেন। ফেলু দেখল চারপাশে

তার জ্যোৎস্না। একটা জোনাকি, একটা একটা করে একশটা। একশটা জোনাকি। ওর চোখের ওপর এখন জীবনের সবচেয়ে দামী এবং নামী বস্তু জোনাকি। তখনই সে দেখল মরীচিকার মতো একটা জোনাকি বেশ পুচ্ছ তুলে উড়ে যাচ্ছে।

সে জোনাকিটাকে ডান হাতে খপ করে ধরতে গেল।

হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে দুলে জোনাকিটা যাচ্ছে। ফেলু ছুটছে তার পিছনে। মাঠের ভিতর ওর মনে হল আর একটা জোনাকি। এত কাছের জোনাকি হাতের বাইরে চলে যাবে, সে স্থির থাকতে পারছে না। যত সোজা মনে করেছিল জোনাকি ধরা, যত সহজে সে ভেবেছিল খপ করে ধরে কোঁচড়ে ফসলের মতো তুলে নেবে তত সে দেখল মরীচিকার মতো হাতের ফাঁকে জোনাকি উধাও। সে বলল, হালার কাওয়া।

সে সুতরাং জিদের বশে, অথবা এক দুই মিলে এক গণ্ডা পাঁচ গণ্ডা মিলে এক কুড়ি পাঁচ কুড়িতে শ। একশ জোনাকি। সে গণ্ডার হিসাব জানে। কুড়ির হিসাব জানে। শয়ের হিসাব তার জানা নেই। সে যে এত বড় হাডু ডুডু খেলোয়াড় ছিল, নাম তার ফেলু ছিল, ভয়ে তাকে কেউ কাঁইচি চালাত না, তার নামে কিংবদন্তী ছিল কত, ফেলু খেলার দিন সারারাত তেল মাখে গায়ে, রসুন গোটার তেল। তেলটা তার ভিতর বসে যায়। সে পিছল করে রাখে শরীর। ঠিক পাঁকাল মাছের মতো সে বের হয়ে যায়। যত বড় প্যাঁচ দাও, যত বড় কাঁইচি চালাও, কি জুতসই সে যে ফুসফাঁস বের হয়ে আসে কেউ টের পায় না। কেউ বলে মানুষটা এক ফকিরের কাছে তাবিজ নিয়েছে, গলায় মাদুলি বড় ঝোলে তার, পারো তো সেটা কেড়ে নাও। দেখবে কেমন ভূতের ভয়ে মামদোবাজি খেলা খেলে ফ্যালা।

এখন সেই ফ্যালা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। গলায় তার সেই কালো তার জড়ানো রুপোর চাকতি। সে একটা জোনাকির সঙ্গে পারছে না। তার সব কেড়ে নিলেন এক মানুষ। পাগল মানুষ। মনে হল তার তখন ঠাকুরবাড়ি লণ্ঠন হাতে কারা উঠে যায়। বুড়ো ঠাকুর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। কত লোক যাচ্ছে দেখতে তাঁকে, আর ফেলু এখন কানা খোঁড়া বলে কেউ একবার তাকাচ্ছে না। তার যা ইজ্জত, ধর্ম সব কেড়ে নিয়েছেন মানুষটা। সে উন্মত্ত হয়ে ছুটছে। জোনাকিটা সাদা জ্যোৎস্নায় ভারি খেলা করছে বটে। কাছে এসে যাচ্ছে, খপ করে ধরতে যাচ্ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে, সে ভেবেছে ছেড়ে দেবে, অন্য ঝোপে খুঁজবে জোনাকি। যেখানে জল ঘোলা, অথবা পচা ডোবা সে সেখানে চলে যাবে, তখনই আবার জোনাকিটা চোখের সামনে নেমে আসছে। যেন ধরা দিতে আসছে। সে বলল, আহারে, আমার সুন্দর জোনাকি। আয় তরে ধইরা লই। পরাণ আমার তর লাইগা কত না কান্দে।

সে খপ্ করে ধরতে গেল। আর উড়ে গেল ফের জোনাকি। হাওয়ায় দুলতে দুলতে কঠিন রুক্ষ মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল সে।

ফেলুর মনে হল শরীরে তার পাখা গজিয়েছে। জোনাকির মতো দুই পাখা মেলে সেও যেন উড়ছে। কঠিন রুক্ষ মাঠের ওপর দিয়ে সে ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে সে ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যত দূলে দুলে যাচ্ছে, সেও তত দুলে দুলে যাচ্ছে। সে কী হাজার আরব্য রজনী গল্পের নায়ক হয়ে যাচ্ছে! তার যে কী ইচ্ছা এখন, আহা, সে কোথায় যাচ্ছে, তার যে কী ইচ্ছা, আল্লার কুদরতে সে আবার সব ফিরে পাবে, এমনকি এটা যখন ফকির প্রদত্ত ওষুধ, দানরি ফানারিতে কী না হয়, মনে হয় তার জোনাকিটা উড়ে উড়ে তাকে আল্লার দরবারে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা এই জোনাকি বুঝি তাকে একশটা জোনাকির খবর দেবে। খবর দিলেই সে খপ্ করে ধরে ফেলবে, জলে ভিজিয়ে একবার শতমূলি বেটে লাগাতে পারলেই নিরাময় হবে শরীর। এমন কি তার সেখানে একটা ব্যাঙের লেজ গজানোর মতো সুন্দর হাত গজাতে পারে। সে তার ডান হাতটা নেড়ে বাঁ হাতটা আবার গজালে কি কি করবে, প্রথমেই তার কি করণীয় এমন ভাবতে ভাবতে সে যে কোথায় চলে যাচ্ছে!

ফেলু ট্যাবার পুকুরপাড়ে এসে দেখল জোনাকিটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়েছে। সে ভাবল, বা রে, বেশ মজা, তুমি কুহেলিকা, পদ্ম ফোটালে না চক্ষে, লক্ষ্মী তুমি আমারে কোনখানে নিয়া আইলা! বলেই সে ঝোপটার অন্তরালে উঁকি মারল, ঠিক মাইজলা বিবির সনে যেন এখন পীরিত তার। সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঝোপের ভিতর, যেমন সে একবার বটগাছের নিচে উঁকি দিয়েছিল, কখন মাইজলা বিবি তারে দেখা দেবার তরে পানিতে নেমে আসে।

এখানেও ঠিক সেই উঁকি দিয়ে থাকা! জোনাকিটা ঝোপের এ-পাশে উড়ে এলেই খপ্ করে ধরে ফেলবে। আর কী আশ্চর্য, সে দেখল জোনাকিটা তার দলে ভিড়ে গেছে। এখানে সে যে উড়ে এল, সে তার দলে ভিড়ে যাবার জন্য। মরি হায় হায়! কলিজা কামড়ায়, সে নাগাল পাচ্ছে না, জোনাকিডারে। একডা দুইডা জোনাকি না, হাজার গণ্ডা জোনাকি। কেবল ঝোপের ভিতর বসে থাকছে ডালে। নাড়া খেলেই উড়ে চলে যাচ্ছে।

সে বুঝল নড়লে উপায় নেই। চুপি চুপি চিৎ হয়ে পড়ে থাকা। যেই না উড়তে উড়তে কাছে চলে আসবে খপ করে ধরে ফেলা। ফেলু সেই আশায় ঝোপের ভিতর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল। শিকারী মানুষের মতো সে জোনাকি ধরার কায়দা শিখে ফেলেছে। সে চুপচাপ শুয়ে থেকে বেশ ফল পেল। গণ্ডা দুই জোনাকি এখন তার করতলে। কোঁচড়ে রেখে সে অবাক, মরা মানুষের মতো সে পড়ে আছে, টুপটাপ কী যেন পড়ছে ডাল বেয়ে। সে সে-সব লক্ষ রাখছে না। ওরা বেশ উড়ে উড়ে আসছে। কোনওটা ধরতে পারছে, কোনওটা ধরতে পারছে না। ওর বুক জ্বালা করছে। গামছা দিয়ে ঘা ঢেকে রেখেছে। মনে হল ফোঁটাগুলো শরীরে পড়ে নিচে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত নয়। কারণ, আকাশ পরিষ্কার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিপাতের মতো কিছু পড়ছে। এক ফোঁটা দু'ফোঁটা পড়ছে। সে আঙুল দিয়ে দেখল আঠা আঠা। তখনই আবার ওর বুকের কাছে দুটো জোনাকি খেলা দেখাচ্ছে। সে হাতটা তুলে একটা ধরে ফেলল। অন্য জোনাকিটা দূরে সরে গেল। দলে ভিড়ে গেল। ওরা

সবাই কেন উড়ে আসছে না। চারপাশে গুঞ্জন করছে না। ফোঁটা পড়ছে। বুকে পিঠে ফোঁটা আঠার মতো। সে সে-সব ভ্রুক্ষেপ করছে না। পড়ুক। উঠে গেলেই এমন রাত আর মিলবে না। কাল, পক্ষ বিচার ঠিক না থাকলে অষুধে কাজ দেয় না। সে বলল, আন্নুরে, আবার আমি ফেলু শেখ। তরে নিয়া উজানে যামু। আমার শরীরে পচা গন্ধ থাকবে না। তরে নিয়া যামু শহরে। আকালু তরে আর কি আতর আইনা দ্যায়, আমি দিমু তরে পারস্য দেশের আতর। আমার শরীর সবল হইলে কি দিতে না পারি তরে। খপ্ করে সে ফের আর একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আকালু ঘরে যায় নাই তো! বিবি, তুই আমারে দুইটা মাস সময় দে। তরে আমি জোনাকির মত উড়াইয়া নিমু বাতাসে। খপ্।

সে খপ্ করে আরও একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আর কী আশ্চর্য! খপ্। সে দেখল বুকের উপর আঠায় একটা জোনাকি আটকে গেছে। খপ্। সে তুলে কোঁচড়ে রেখে দিল। আঙুলে সে আঠার মতো বস্তুটি ঠোঁটে ছোঁয়াল। আরে হালার কাওয়া, এয় রে কয় মধু। মধু বর্ষণ হইতাছে। ওপরে কোন বড় বৃক্ষ আছে। বৃক্ষ তুমি কার?

—রাজার।

—এখন কার?

—এখন তোমার।

—তবে মধু বর্ষণ কর। ডালে তোমার মধুর চাক যখন আছে বর্ষণ কর। চান্দের রাইতে মধুতে আমার শরীর ভাইসা যাউক আমি শুইয়া থাকি। জোনাকিরা উইড়া আসুক। মরা কাঠ ভাইবা বসলেই, খপ্। সে খপ্ করে আরও একটা জোনাকি পায়ের পাতা থেকে তুলে আনল। ওর গোটা শরীর আঠাময় হয়ে গেছে। এখন সে ওদের না ধরলেও পারে। গোটা শরীরে জোনাকি, বিন্দু বিন্দু জোনাকি এক দুই করে এসে পড়তে থাকল।

তাকে আর মানুষ মনে হচ্ছিল না। প্রথম একটা কাঠের গুঁড়ি মনে হচ্ছিল। উপরে ঝোপঝাড়। তার ওপর বড় বৃক্ষের ডাল ডালে প্রকাণ্ড মধুর চাক। কোনও বন্য জীব হয়তো মধুভাণ্ডে মুখ দিতে এসে কামড় খেয়ে চলে গেছে। সব মধু এখন ঝোপের ওপর বৃষ্টিপাতের মতো পড়ে পড়ে নিচের মানুষটাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। সে নড়ছে না। নড়লে জোনাকি উড়ে আসবে না। ওকে একটা কালো কাঠের গুঁড়ি ভেবে এক দুই করে সব জোনাকি শরীরে বসে গেলে সে যেন জোনাকির রাজা হয়ে গেল। তার ঘরে বিবি আয়ু যে এখন একা আছে, একেবারে সে তা ভুলে গেছে আন্নুর কাছে সে আবার রাজার মতো ফিরতে পারবে, সে আবার ফসলের মাঠে ছুটতে পারবে—কী আনন্দ, কী আনন্দ। সে মশগুল হয়ে গেছে। নানারকম লতাপাতার স্বপ্ন দেখছে। চাই একশটা জোনাকি। সে গুনে আরও এক কুড়ি পাঁচ গণ্ডা করে ফেলেছে। সে উঠে বসল। এখন রাতের শেষ প্রহর। কালো মোষের মতো এক খণ্ড মেঘ আকাশের চাঁদ ঢেকে দিলে সে দেখল, ফেলু এক

আশ্চর্য মানুষ হয়ে গেছে। তার শরীরে এখন অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু জোনাকি জ্বলছে। আঠায় ওরা আটকে গিয়ে আর উড়তে পারছে না।

আর তখনই শচীন্দ্রনাথ বলছেন, বাবা জল খান। গঙ্গাজল। হাইজাদির পরান আইছে আপনের মুখে গঙ্গাজল দিতে।

বুড়ো মানুষ হাঁ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর শ্বাসকষ্ট প্রবল। নাকের বাঁশি ফুলছে। নাভিশ্বাসে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। গোটা শরীর দুলছে তাঁর। ঝড়ের ভিতর সমুদ্রের তরঙ্গে যেন এক পালবিহীন নৌকা দুলে দুলে এই সসাগরা ভূমণ্ডল পার হচ্ছে।

সোনা ঠাকুরদার মুখে সেই যে গঙ্গাজল দিতে এসেছিল আর নড়েনি। সেও পায়ের কাছে চুপচাপ বসে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত চন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ কেউ ফিরে আসেন নি। তাঁরা আসেন নি বলেই এখনও আত্মাটা আছে। এঁদের জন্য ঠাকুরদার প্রাণপাখিটা বুকের ভিতর এখনও বসে আছে। এঁরা এলেই ওঁদের দেখে সে উড়ে যাবে। নাক অথবা কানের ভিতর দিয়ে সে বের হবে। চোখের ভিতর দিয়েও বের হয়ে আসতে পারে। চোখের ভিতর দিয়ে বের হলে চোখটা খোলা থাকবে। নাকের ভিতর দিয়ে বের হলে ডগা হেলে যাবে। আর মুখের ভিতর দিয়ে বের হলে তিনি হাঁ করে থাকবেন। ওর বড় ইচ্ছা দেখার, ঠাকুরদার প্রাণ পাখিটা কীভাবে বের হয়ে আসে।

সোনা, সেই আত্মা পাখির মতো, না পাখির হৃৎপিণ্ডের মতো, আত্মার কী চেহারা, বুকের কোন জায়গাটায় থাকে, কী খায়? নিঃশ্বাস ফেলে কী করে, বের হবার মুখে সে আত্মাটাকে দেখতে পাবে কি-না, সংসারে এই আত্মা কেউ কোনওদিন দেখেছে কি-না, অথবা একটা ছোট্ট হাওয়ার মতো, তাই হয়তো সেটা দেখা যায় না—তবু ওর মনে হয়েছে, নিরিবিলি চুপচাপ বসে থাকলে টের পাওয়া যাবে, আত্মা বড় অভিমানী বস্তু। চারপাশের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে কোথায় যাবে তুমি, আবার ফিরে এসে এই দেহে তোমাকে আশ্রয় নিতে হবে। অথচ সোনা ঘরটার চারপাশে তাকালে দেখল, দরজা-জানালা বন্ধ করলেও অজস্র ফাঁকফোকর রয়েছে। সে কিছুতেই আত্মাকে আর আটকে রাখতে পারবে না। সেই চাঁদসদাগরের পুত্রবধূর মতো ওর ইচ্ছা এখন নিশ্ছিদ্র কোনও ঘরে ঠাকুরদাকে নিয়ে তুলতে পারলেই—তিনি আবার শতবর্ষ বেঁচে যাবেন। কেন যে মানুষ মরে যায়, বাঁচে না, সে-ও একদিন মরে যাবে, ভাবতে ভারি কষ্ট হল তার। ঠাকুরদার মতো, বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, ছোটকাকা সবাই মরে যাবেন। সে বড় হলে একটা এমন ঘর তৈরি করবে, যেখানে হাওয়া ঢুকতে পারবে না। ঘরটায় সে তার বাবা মা অথবা জ্যাঠামশাইকে রেখে দেবে। অভিমানী আত্মা বের হয়ে যখন দেখবে উড়ে যাবার পথ নেই, তখনই ফের সে ভিতরে ঢুকে যাবে অথবা সে যদি বের হয়ে যায়, সে ঈশ্বরকে বলবে, আমাকে দিব্যদৃষ্টি দাও ভগবান। আমি আত্মার পিছনে পিছনে ছুটব। খপ্ করে ধরে ফেলব তাকে। যার আত্মা তাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

তখনই কে যেন বলল, বের করে আনুন। ঘর থেকে বের করে আনুন। বাইরে এই ধরণীর শান্ত চন্দ্রালোকে শতবর্ষ পার করে মানুষটা এবার মুক্ত হোক। ঠাকুরদাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাবার সময় হুঁশ হল সোনার, এতক্ষণ সে কী সব আজেবাজে ভেবেছে। ঠাকুরদাকে সেও ধরাধরি করে উঠানে নিয়ে নামাল। শিয়রে একটি লণ্ঠন রেখে দেওয়া হল। শেষ প্রহরে ফিরে এলেন ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ। তাঁরা ঠাকুদার পায়ে ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকলেন। দেখলে মনে হবে ওঁরা যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। দেখলে মনে হবে ফেলুও যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সে বাড়িতে উঠেই ডাকল আন্নু, দ্যাখ আমি আইছি। তারিণী কবিরাজ ধন্বন্তরি। তার অষুধ পাইছি আমি। দ্যাখ আমার শরীরে কি জ্বলতাছে। দ্যাখ। তুইলা রাখ। পানিতে ভিজাইয়া রাখ। আর মাসাধিককাল আমার কষ্ট। আন্নু, আন্নু তুই ঘরের ভিতর আছস, রা করস না ক্যান! ভাল হইব না কিন্তু। কথা ক! কথা ক কইতাছি। কাফিলা গাছটার নিচে আমি খাড়াইয়া আছি। তুই আয়। খুইটা খুইটা জোনাকি তুইলা নে শরীর থাইকা।

কোনও সাড়াশব্দ নেই ভিতরে। ঝাঁপের দরজা ভেজানো। বাগি গরুটা ফেলুর সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, আন্নুডা কথা কয় না। কি কারণ। কার উদ্দেশে যে বলা! যেন সে জাফরিকে বলেছে, আমারে চিনতে কষ্ট হয় জাফরি। আমার শরীরে কি জ্বলতাছে দ্যাখ। আমি ইবারে ভাল হইয়া যামু। দ্যাখবি, তগ আর অভাব-অনটন থাকব না। আন্নু, আন্নু রে!

না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। বড় অভিমানী মেয়ে। সে এই ভেবে বলল, রাইতে ফিরি নাই, কারণ, ধন্বন্তরি আমারে কইল, ফ্যালা, পূর্ণিমার রাইতে একশডা জোনাকি ধইরা রাখ। কামে লাগব।

—তা কি কাম? সে নিজেই প্রশ্ন করছে নিজেকে। যেন সে আন্নুর হয়ে জবাব দিচ্ছে। কাম হইছে দুরারোগ্য ব্যাধি ছাইড়া যায়। আমি ঝোপ-জঙ্গল থাইকা দ্যাখ কি কৌশলে জোনাকি ধইরা আনছি।

তবু সাড়া দিচ্ছে না কেউ। তা দেবে না। ঘুম তো ওর ষোলআনা। ঘুমালে আর উঠতে চায় না। সে এবাব ঝাঁপেব দরজায় সামান্য ঠেলে ভিতরে উঁকি দেবে ভাবল, অথবা ডাকবে, আন্নু ওঠ। আর ঘুমাইস না। ভোর হইতে আর দেরি নাই।

এটা কী হয়ে গেল! দরজাটা পড়ে যাচ্ছে কেন! ভিতরের দিকে একটা বাঁশে আটকানো থাকে দরজাটা। ঘুমোবার আগে আন্নু বাঁশটা ঠেলে দেয়। বাইরে থেকে ঠেলে দিলে দরজাটা ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু এমন অদ্ভুত, সে দেখল দরজাটা পড়ে যাচ্ছে। ভিতবে কেউ যেন বাঁশ সরিয়ে রেখেছে। সে বলল, আমার লাইগা দরজা খোলা রাখছস! তা ভাল। তর ঘুম বিধবা মাইয়ার মত, ঘুমাইলে আর হুঁশ থাকে না কাপড়চোপড় উইঠা যায়। একখানে তুই, অন্যখানে তর কাপড় তা তুই এডা ভাল করস নাই। আকালু

নারায়ণগঞ্জে যাইব মোকদ্দমা করতে। তারে আমি কোরবানী দিমু। বলেই সে হাঁ হয়ে গেল।

যা ভেবেছিল তাই। ঘর খালি। সে এতক্ষণ জোরজার করে মনকে প্রবোধ দিয়েছে। যেন পাশেই আছে, সাড়া দেবে। জলের তরঙ্গ ভাইসা যায় মত বিবি তার লুকোচুরি খেলছে। সে বলল, তা ভাল হইছে। সে জোরে বলল, তা ভাল হইছে! সে চিৎকার করে আসমান-জমিন কাঁপিয়ে হেঁকে উঠল, তা ভাল হইছে! ওর হাতের মুষ্টিতে সেই কোরবানীর চাকু! ভাল হইছে। আমার পরাণ কাইরা নিছে আকালুদ্দিন।

—তুমি, আকালুদ্দিন কই যাইবা। হালার কাওয়া। বলতে বলতে সে কেমন স্থবির হয়ে গেল! মেঝের উপর সেও ভূলুণ্ঠিত হল। বালকের মতো কাঁদল, আন্নু, তুই আমারে ফালাইয়া কই গ্যালি! আমার মাটি জমিন কার লাইগা!

সুতরাং এ অঞ্চলে আবার দুটো খবর কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকল। হাটে মাঠে এখন এ-দুটো খবরই। প্রথম খবর, এ-অঞ্চলের মহিমামণ্ডিত মানুষ দেহরক্ষা করেছেন। দেহরক্ষার আগে তাঁর তিনপুত্রকে সজ্ঞানে বলে গেছেন, শ্রাদ্ধের মালিক হবে ভূপেন্দ্রনাথ। মণীন্দ্রনাথকে তিনি কিছু বলেননি। পাগল ছেলের দিকে শুধু মুহূর্তের জন্য অপলক তাকিয়ে ছিলেন। বলে গেছেন, সে বড়, শ্রাদ্ধের মালিক তারই হবার কথা। কিন্তু পাগল বলে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ার পাঠ তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে দিয়ে গেছেন। আর বলেছেন, বিষয়সম্পত্তি যা আছে সব তোমাদের। কেবল বড়বৌ এবং মণীন্দ্রনা ভরণপোষণ পাবে। পলটু সাবালক হলে তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেওয়া হবে। যতদিন না হচ্ছে ততদিন ভূপেন্দ্রনাথই এদের হয়ে দেখাশোনা করবে। এবং উইলের যাবতীয় মুসাবিদা তিনি তাঁর সিন্দুকে করে রেখে গেছেন। মৃত্যুর পর সেটা বের করে যেন দেখা হয়।

আর খবর ফেলুর বিবির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওর সারা গায়ে ঘা ফুটে বের হয়েছে। এবং ঘাগুলো আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলছে। অন্ধকারে যারাই ওকে দেখেছে দেখে তারাই ভয় পেয়ে গেছে। কী হয়ে গেছে ফেলু! চুল খাড়া। দাড়ি শণের মতো, চোখ আরও কোটরাগত। ঘাড়টা মোষের মতো ছিল, এখন কী করুণ চেহারা ফেলুর! সে ঘর থেকে বের হয়ে নানা জায়গায় বিবিকে খুঁজেছে। গোয়ালে থাকতে পারে,

না নেই। বাঁশঝাড়ে র নিচে থাকতে পারে, তাও নেই। মাঠে নেমে গেল, না নেই, ওর কেন যে মন মানছে না, সে খুঁজে মরছে। এমন নিষ্ঠুর নিয়তি তার জেনেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি। হাজিসাহেবের বাড়িতে সে ঢুকতে পারে না। সে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, আন্নু। না, কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও কোনও বনঝোপে লুকিয়ে থাকতে পারে—হাহা করে হেসে উঠতে পারে—এই আমার মরদ, একটু না দেখলেই চক্ষু অন্ধকার। সে জোরে জোরে ডাকল, আকালুদ্দিন সাহেব আছেন! জবাব নেই। সে চিৎকার করে উঠল, আন্নু আছস! বার বার সে পাগলের মতো এখানে সেখানে ডাকছে, আছস নাকি! আমি ফ্যালা। আমার আর কি থাকল ক দিনি! খোদা, তুই ক। আমি পারি না তর দরবারে আগুন লাগাইতে! আমি কি যে না পারি আল্লা!

এ ভাবে এ-অঞ্চলে সূর্য উঠে গেল আকাশে। হাল-বলদ নিয়ে চাষীরা মাঠে নেমে যাচ্ছে। খর তাপে আবার বসুন্ধরা জ্বলতে থাকল। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। বৃষ্টি নেই। এখনও কালবৈশাখী আরম্ভ হল না। নদীর পাড় ধরে কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। ওরা খবর পেয়েছে, এক মহিমামণ্ডিত মানুষ ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। পুকুরের পাড়ে দাহ করা হবে। মানুষজন সব এখন জড়ো হচ্ছে ক্রমে।

ফেলু আর পারল না। সে কেমন কঠিন এবং শক্ত হয়ে গেল। অঞ্চলের সব মানুষ যখন একজন বুড়ো মানুষের মৃত্যু-সংবাদ শুনে ছুটছে ঠাকুরবাড়ি তখন তার পিয়ারের বিবিকে নিয়ে পালিয়েছে আকালুদ্দিন। মামলা-মোকদ্দমার নাম করে সে শহরে পালিয়েছে। সে আর দেরি করল না। শহরে যাবার আগে এইসব গ্রাম মাঠ খুঁজে যাবে। সে জানে বিবিকে সে আর ঘরে তুলতে পারবে না। বিবি তার না-পাক, আকালু নিকা করে আবার তাকে পাক (পবিত্র) করে নেবে। মিঞা, তুমি আকালু আর আমি ফেলু। আমার বিবিরে নিয়া যাবে কোনে!

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে শুকনো পাতার মতো অসহায় দেখাচ্ছে ফেলুকে। কেউ সমবেদনা জানাচ্ছে না। ফেলুর এমনই হবে যেন কথা ছিল। তার চেহারা দেখে কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। শুধু সে দেখল, হাজিসাহেবের যণ্ডটা এদিকে উঠে আসছে। ওর পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে এক হাত সম্বল করে কিছুই করতে পারবে না। সুতরাং সে সাপে-বাঘের খেলার মতো খেলতে খেলতে বাড়িতে উঠে এলে জমিতে ষণ্ডটা দাঁড়িয়ে থাকল। যণ্ডটা ফেলুর বাড়িতে উঠে আসতে ভয় পায়। ফেলু ঘরে ঢুকে বাতা থেকে কোরবানীর চাকুটা বের করে নিল। —মিঞা আকালু, তোমার খোঁজে, বিবির খোঁজে বাইর হইলাম। ঠিক মহরমের দিনের মতো আবার তরবারি ঘুরানো।

সে সামনে কখনও দেখতে পাচ্ছে যণ্ডটা ওর প্রতিপক্ষ, কখনও আকালু, কখনও পাগল ঠাকুর। সে খোঁচা মারছে হাওয়ায়, দু'পা পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার সামনে নেচে নেচে হাত ঘুরিয়ে, সামনে- পিছনে হাত রেখে উঠে বসে, যথার্থ খেলা। সে হাওয়ার সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে মেতে গেছে। জমি থেকে ষণ্ডটা উঠানের উপর ফেলুর এমন কাণ্ড দেখে দে ছুট।

বিবি পালিয়ে গিয়ে ফেলুকে পাগল করে দিয়েছে। হাতে তার কোরবানীর চাকু। হাওয়ার সঙ্গে সে যুদ্ধে মেতে গেছে।

যারাই ওর বাড়ির পাশ দিয়ে গেল ফেলুর এমন কাণ্ডকারখানায় হাসতে পর্যন্ত সাহস পেল না। হাসলেই সে নেমে এসে পেটে খোঁচা মারবে চাকুতে। —কি মিঞা, কেমন মজা লাগে! বিবি আমার ঘরে নাই বইলা তামাশা দ্যাখতাছ?

কেউ কথা বলছে না বলে সে আরও ক্ষেপে যাচ্ছে। ক্ষেপে যাচ্ছে মাছির তাড়নায়। ভনভন করে সব সময় চারপাশে মাছি উড়ছে। সে যেন মৃত পচা জন্তু। হাতের ঘা থেকে সেই পচা দুর্গন্ধ ওকেও মাঝে মাঝে ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো করে দেয়। সে তখন কী করবে, ভেবে উঠতে পারে না। কিছুক্ষণ কাফিলা গাছটার নিচে বসে থাকল। আঠার গাছ এটা। খাঁ খাঁ করছে রোদ, আঠা শুকিয়ে গেছে। ওর কোনও হুঁশ নেই। শরীরে যে অজস্র জোনাকি জ্বলছে তা পর্যন্ত তার খেয়াল নেই। সে বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছে এখন। কোরবানীর চাকুটা সে আমূল বসিয়ে দিচ্ছে মাটিতে। কখনও তুলে এনে কাফিলা গাছের কাণ্ডে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই এক হিংস্র খেলা তার এখন। জাফরি ওর দিকে তাকিয়ে তেমনি জাবর কাটছে। সে জানে, এখন কোথাও ঘাস নেই। তবু কোথাও জাফরির খোঁটা পুঁতে দিয়ে বের হবে। কখন ফিরবে ঠিক কি!

তখন সোনা উঠোনের চার পাশটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মানুষজন আসছে তো আসছেই। সে কোথাও যেতে পারছে না। তাকে সকলের সঙ্গে ধরে রাখতে হবে। ধরাধরি করে অর্জুন গাছটার নিচে নিয়ে যাবার সময় সেও সবার সঙ্গে এক পাশে ঠাকুরদার মৃতদেহ ধারণ করবে। মনজুর কাঠ কাটার তদারক করছে। হাজিসাহেবের বড় বেটা এসেছে। মেজ আসেনি। সে গেছে আকালুর খোঁজে। আকালুর ঘরে বিবি আছে। তিন বাচ্চাকাচ্চা। এ-সব ফেলে সে ফেলুর বিবিটাকে নিয়ে যে কোথায় গায়েব হয়ে গেল! হাজি সাহেবেরও মন ভালো না। তবু একবার দেখে চলে গেছেন। দীনবন্ধু কাঠ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুকুর পাড়ে।

ঠাকুরদার মুখ ঢাকা। ঠাকুমা পায়ের কাছে বসে রয়েছে সেই থেকে। একেবারেই নড়ছে না। জেঠিমার সংসারে যত কাজের চাপ। সকালের দিকে ঝিল কে কাটবে এই নিয়ে বচসা হয়ে গেছে নরেন দাস এবং আড়াই হাজারের রাইমশাইর সঙ্গে। ঝিল কেটে পুণ্য সঞ্চয় করবে নরেন দাস। কাল থেকেই ছোটকাকার পিছনে পিছনে ঘুরছে। তাকে যেন ঝিলটা কাটতে দেওয়া হয়। নরেন দাসের চোখেমুখে আর কোনও অপমানের চিহ্ন ভেসে নেই। মালতী নিরুদ্দেশে চলে গেছে—গিয়ে তাকে বাঁচিয়েছে। সে আবার নতুনভাবে ফসল ফলাচ্ছে, ঘরের চালে শণ দিয়েছে এবং রাতে তাকে আর জেগে থাকতে হয় না। যা কিছু পাপ অবশিষ্ট আছে ঝিল কাটতে পারলেই শেষ হয়ে যাবে।

সোনা সকাল থেকেই ভীষণ আফসোসে কষ্ট পাচ্ছে। সে ভেবেছিল বসে বসে ঠাকুরদার মৃত্যু দেখবে। কিন্তু তার যা ঘুম, ঠাকুরদাকে বাইরে বের করে আনলে সে দেখল তিনি আবার আগের মতো ভালো হয়ে যাচ্ছেন। ভালো হয়ে যাচ্ছেন বলেই ওর ঘুম পেয়ে গেল। বাবা, মেজ জ্যাঠামশাই পায়ের কাছে ভুলুণ্ঠিত হলেই তিনি কেমন সহসা ভালো হয়ে যাচ্ছিলেন। ভালো হয়ে যাবেন বুঝি, তবে আর বসে থেকে কী হবে। বড় জ্যাঠামশাইও বসে নেই। তিনি আগেই উঠে চলে গিয়েছিলেন, মেজ জ্যাঠামশাইকে ঠাকুরদা শ্রাদ্ধের ভার দিলে তিনি সটান উঠে পুবের ঘরে চলে গেলেন। এবং শুয়ে পড়েছিলেন। সোনাও পাগল জ্যাঠামশাইর শরীরে ঠ্যাঙ তুলে দিয়ে আশ্চর্য গভীর ঘুমে ডুবে গেল। কিন্তু খুব সকালে বড় জ্যেঠিমা ডাকলেন, এই, ওঠ সোনা, তোর জ্যাঠামশাইকে তুলে আন, তোর ঠাকুরদা আর বেঁচে নেই। শুনে ধড়মড় করে সে উঠে বসেছিল। নেমে এসেছিল উঠানে। সবাই কাঁদছে। লণ্ঠনের আলো জ্বলছে চারপাশে। সকাল হয়ে যাচ্ছে।

তবু লণ্ঠনগুলি নেভানো হচ্ছে না। ঠাকুরদার মুখ ঢাকা। পাখিরা তেমনি কলরব করছে চারপাশে, কামরাঙা গাছে ফল নেই, তবু ক'টা টিয়াপাখি উড়ে এসে বসেছে। এমন এক আশ্চর্য সকালে যেখানে আবার হাত ধরে নাতিদের নিয়ে সূর্যোদয় দেখার কথা, তিনি কিনা সে সব না করে সোনাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। ওর ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল চাদরটা তুলে বুড়ো মানুষটার মুখ দেখে—কী বাসনা আর তাঁর ছিল, কোনও গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বড় মাঠের ফসল কাটার গান শোনার ইচ্ছা যদি থাকে তবে যেন সে বলবে, এবার আপনি সোজাসুজি সব দেখতে পাবেন ঠাকুরদা। আমাদের মতো উঁকি দিয়ে আর কিছু দেখতে হবে না। বলেই সে চাদরটা তুলে মুখ দেখল। চোখ খোলা। তুলসীপাতা চোখে। ঠাকুরদার প্রাণপাখি তবে চোখ দিয়ে বের হয়েছে। কোথায় আছে সে। কোনও গাছের ডালে বসে মজা দেখছে না তো বা, বেশ তুমি শুয়ে আছ চিৎপাত হয়ে, আমি গাছের ডালে বসে আছি। পাখি হয়ে বসে আছি। মাঝে মাঝ কোউর্ কোউর ডাকছি। সে ভাবল পাখিটা হয়তো নীলবর্ণের পাখি হৰে। মহীরাবণের পাতাল প্রবেশের মতো ঘটনা যদি হয়, সে তো পাখি না হয়ে একটা মাছি হয়ে যেতে পারে। ঠাকুরদার সাদা চাদরে একটাই মাছি এখন উড়ে উড়ে বসছে। সে মাছিটাকে খপ্ করে ধরে ফেলতে চাইল। প্রায় সেই ফেলুর মতো সবই খপ্ করে ধরে ফেলা। কিন্তু মাছির নাগাল পেল না। মাছিটা উড়ে উড়ে কামরাঙা গাছের ও-পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ডালে অদ্ভুত একটা পাখি, নীলবর্ণের পাখি। নীলবর্ণ মানেই পবিত্র কিছু। ওর মনে হল তখন গাছের ডালে যে পাখিটা বসে আছে, ওটাই ঠাকুরদার আত্মা। ওটাই ওঁর কামনা-বাসনার ঘর।

পাগল মানুষ দেখলে বলতেন, ওটাই হচ্ছে নীলকণ্ঠ পাখি। সারাজীবন মানুষকে ঘুরিয়ে মারে। কোথাও সে আছে, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, সে তোমার জন্য গাছের ডালে বাসা বানাচ্ছে, তুমি ভাবছ ঠিকঠাক ঘুরে মরছ, তোমার কেবল ইচ্ছা আশ্বিনের ভোরে জয়ঢাক বাজুক, তুমি সারাজীবন বরণডালা হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে, মনে হবে সামনের মাঠ পার হলেই নদী, নদীর পাড়ে গ্রাম। সব মরীচিকার মতো তোমাকে জন্ম থেকে জীবনের সব ক'টা দিন ঘুরিয়ে মারবে সে।

সোনা তখন দেখল পাগল জ্যাঠামশাইও চাদর তুলে বাপের মরামুখ দেখছেন। তারপর প্রাণটা এখন কোন গাছের ডালে পাখি হয়ে বসে আছে চারপাশে খুঁজছেন।

তখন সবাই ধ্বনি দিল, বল হরি, হরি বোল।

পীতাম্বর মাঝি পায়ের কাছে বসে কাঁদছে। —আপনে জীবন সাঙ্গ কইরা চললেন ঠাকুর। আপনে জীবনে একটা বাদে মিছা কথা কইলেন না।

সবাই বিছানার চার পাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরদাকে তুলে ধরছে। কেমন দুলছে শরীরটা। সব আত্মীয়স্বজন যে যেটুকু পারছে ছুঁয়ে রাখছে। সোনা শিয়রের দিকে আছে। ওরা কাঠবাদাম গাছটা পার হয়ে তেঁতুলতলায় এল। তারপর বড় জাম গাছ, এবং বাঁ দিকে গেলে দুটো খেজুর গাছ পড়বে। দক্ষিণের পাড়ে সেই অর্জুন গাছ। সেখানে ঝিল কাটা

শেষ। ওরা গাছটার নিচে ঠাকুরদাকে রেখে চারপাশে ঘিরে বসে থাকল। আশ্চর্য, সোনা দেখছে সেই নীল রঙের পাখিটা আবার এসে অর্জন গাছটায় বসেছে। সেই ঘরটা নীল, যেখানে অমলা তাকে নিয়ে গিয়েছিল, মায়ের মুখ ব্যথায় নীল, ছোট্ট বোনটা তার তখন জন্ম নিচ্ছে। মার মুখ আর অপবিত্র মনে হয় না। এই পাখিটাও নীল। সে দেখল আকাশ নীল, স্বচ্ছ জল নীল রঙের। এ-পাখি ঠাকুরদার আত্মা না হয়ে যায় না। সে চারপাশে লক্ষ রাখছে পাখিটা কীভাবে থাকছে। ওর মনে হল ঠাকুরদার চিতা যতক্ষণ না জ্বলবে ততক্ষণ পাখিটা অর্জুনের ডালে বসে থাকবে।

ওর ইচ্ছা হচ্ছিল লালটু পলটুকে সব ঘটনাটা খুলে বলে। দাদা ঐ যে দেখছিস পাখিটা, ওটা ঠাকুরদার আত্মা। চিতা জ্বলে উঠলেই পাখিটা আকাশে উড়ে যাবে।

এত বেশি লোকজন যে সে উঠতে পারছে না। গোপাটের ও-পাশে হাজার লোক কী তারও বেশি হবে। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ অর্জন গাছটার কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! বাপের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। মুখটা শুকনো, দাঁত নেই। একটা শুকনো কঙ্কালের ওপর চোখ দুটোতে তুলসীপাতা, দুটো মাছি চোখের পিচুটি শুষে খাচ্ছে। সোনা হাত দিয়ে মাছি দুটোকে তাড়িয়ে দিল। এই মৃত চোখ কি বিমর্ষ! মরে গিয়েও ঠাকুরদা দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে রেখেছেন। এত যে আয়োজন, এত যে হরিসংকীর্তন এবং ঘি, তেল, বিশ্বপত্র, চন্দনের কাঠ—সবই এই মানুষকে দাহ করা হবে বলে। শৈশবে এই মানুষ সোনার মতো নদীর চরে নামতে গিয়ে ভয় পেয়েছেন, যৌবনে এই মানুষ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ছিলেন—বামুনের চক নিলামে উঠেছে। নিলাম ডাকছে পীতাম্বর মাঝি, শুধু সামান্য কথা ঘুরিয়ে বললে এত দামী জমি নীলামে ওঠে না। হস্তান্তর হয় না। তবু অবিচল অটল। অথচ সামান্য এক প্রেম, পলিন নামে এক ইংরেজ যুবতী পুত্রবধূ হয়ে থাকবে—সংসার বড় কঠিন। মিথ্যা তাঁর ধর্ম, মানুষটাকে অযথা মিথ্যায় জড়িয়ে দিল। তাঁর এমন সোনার টুকরো ছেলে পাগল হয়ে গেল। পীতাম্বর মাঝি এ-সব মনে করে হাউ হাউ করে কাঁদছে। সে-ই মিথ্যা দলিল করেছিল, এই মানুষের বিরুদ্ধে।

ঠিক যজ্ঞের হবির মতো এর দেহ এখন। ঠাকুরদাকে একেবারে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। সোনা কেমন ভয়ে তাকাতে পারছে না। হাত-পা কাঠি কাঠি, শক্ত। জ্যেঠিমা ওর হাতে সামান্য তেল দিলেন। সবাই এখন ঠাকুরদার শরীরে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। সবাই ঘড়া করে জল তুলে এনে ঠাকুরদাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। তাকেও জল আনতে হবে, তেল মেখে দিয়ে ঠাকুরদাকে স্নান করাতে হবে। অথচ কেন যে সে ভয় পাচ্ছে অথবা মনে হচ্ছে, যেন মানুষটাকে সে আর চেনে না। এ মানুষ তার ঠাকুরদা নয়। সেও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। জ্যেঠিমা বললেন, সোনা তেল মেখে দাও। শেষ কাজ। দাঁড়িয়ে থেকো না।

সোনা তবু দাঁড়িয়ে থাকল।

তখন সেই নীলবর্ণের পাখিটা উড়ে উড়ে এসে শিয়রে বসছে। বোধ হয় এটা একটা চড়াই পাখি। চড়াই পাখি নীলবর্ণের হয় না তবু আকার দেখে তাই মনে হয়। পাগল জ্যাঠামশাই পাখিটাকে দেখছেন। এ-ভাবে যদি কোনওদিন সোনা মরে যায়, সোনার আত্মা পাখি হয়ে যাবে। ওর ভাবতে ভালো লাগছে, পাখিটা ডালে ডালে অথবা এই ঘাসে এবং মাটিতে সারা কাল বেঁচে থাকবে। মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয় না। আত্মাটা আবার কারো নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যাবে। তখন জন্ম হবে আর একটা মানুষের। এভাবে ঠাকুরদা তাদের ভিতর ফের ফিরেও আসতে পারেন। সে তো চিনতে পারবে না— ঠাকুরদা যে ফিরে এসেছেন। সে কীভাবে যে তখন তার ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলবে!

এই মৃত্যু সম্পর্কে সোনা নানাভাবে ভেবে দেখছে—তবু সব ভাবনাগুলির ভিতর ঠাকুরদা যদি আকাশের নক্ষত্র হয়ে থাকে তবে যেন সেই ভালো। সে মনে মনে এখন এমনই চাইছে। সে মনে মনে বলল, পাখি, তুমি আর উড়বে না। এবারে ঠাকুরদার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাও। ঠাকুরদা পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না। তিনি আকাশের নক্ষত্র হয়ে থাকবেন।

—যা সোনা, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। শশীভূষণ সোনাকে তাড়া লাগালেন। কপালে তেলটা মেখে দে।

সোনা কপালে তেল মেখে দিল। ওর হাতটা যেন শিরশির করে কাঁপছে। অদ্ভুত অনুভূতি। ঠাকুরদার শরীরে প্রাণ নেই। ভাবা যায় না। এ-ভাবে মানুষ মরে যায়! কেমন রুক্ষ এবং কঠিন চামড়া ঠাকুরদার। সে তাড়াতাড়ি এক ঘড়া জল এনে ঢেলে দিল শরীরে। হাতের আঙুল যেন এখনও শিরশির করে কাঁপছে। একজন মরা মানুষকে ছুঁয়ে দিয়ে সে কেমন অপবিত্র হয়ে গেছে। স্নান না করা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। অথচ একটা কষ্টও প্রাণে। ঝিল কাটা হয়ে গেছে। দীনবন্ধু এবং মাস্টারমশাই কাঠ সাজিয়ে রাখছে। নানাবর্ণের ছবি এখন। ফুলের পাশে আতপ চাউল, তিল তুলসীপাতা। ঠাকুরদার শরীরে রাশি রাশি ঘি মাখানো হচ্ছে। থেকে থেকে মেজ-জ্যাঠামশাই, বাবা বাবা বলে হতাশ গলায় কেঁদে উঠছেন। কেবল নিষ্ঠুর চোখ-মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন পাগল জ্যাঠামশাই। তাঁকে জোর করে ধরে আনা হল। তাঁকে জেঠিমা তেল দিলেন হাতে। জল এনে দিলেন। তিনি নিজে কিছুই করতে চাইছেন না। তেল, জল ঢেলে আবার তিনি অর্জন গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। পায়ের কাছেই চিতা সাজানো হচ্ছে। তিনি কেমন নিষ্ঠুর চোখমুখ নিয়ে এ-সব দেখছেন। যেন অর্জুন গাছের নিচে আগুন জ্বলে উঠলেই, চিতায় তিনি বাপের সঙ্গে আরোহণ করবেন। জ্যাঠামশাইর চোখমুখ দেখে সোনার ভয় ধরে গেছে প্রাণে। সবার অলক্ষ্যে জ্যাঠামশাই চিতায় ঝাঁপ দিলে কী যে হবে!

কুশ তিল তুলসী মন্ত্রপাঠ তাকে কিছুতেই আজ অন্যমনস্ক করে দিতে পারছে না। সে সবসময় পাগল জ্যাঠামশাইকে চোখে চোখে রাখছে। ঠাকুরদাকে ছুঁয়ে দেবার পর ওর মুখে থুতু জমে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলতে পারছে না। অশুচি শরীর নিয়ে সে কিছু গিলে

ফেলতে পারে না। সে বার বার তাই থুতু ফেলছে। এবং যেই না মনে হচ্ছে ঠাকুরদাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে—মাংস পোড়া চামসে গন্ধ বের হবে—-আগুন, ধোঁয়া, একটা আস্ত মানুষ পুড়বে, কী ভয়াবহ দৃশ্য—সে সেই সকাল থেকে এই দৃশ্যটা চোখের ওপর কীভাবে যে দেখবে—ঠিক সেই মোষ বলির মতো তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এখনও সে-সবের কিছুই হচ্ছে না। জ্যেঠিমা পাগল জ্যাঠামশাইকে ধরে এনেছেন ফের। সাতপাক ঘুরে ঘুরে মুখাগ্নি। তারপর সেই দৃশ্য—কি কঠিন এবং নিষ্ঠুর যে মনে হচ্ছে না! সবাই কোলে তুলে নিয়েছেন ঠাকুরদাকে। সে পা ছুঁয়ে রেখেছে মাত্র। সেও সবার সঙ্গে সঙ্গে সাত পাক ঘুরছে। সাতবার প্রদক্ষিণ করছে চিতা। কোলে তুলে ছোট্ট শিশুকে মা যেমন বিছানায় শুইয়ে দেন, তেমনি সবাই ঠাকুরদাকে চিতার কাঠে দক্ষিণের দিকে মাথা, উত্তরের দিবে পা, মুখ মাটির দিকে রেখে শুইয়ে দিল। এবং একটা সাদা কাপড়ে ঢেকে দিল। সে এতক্ষণ কাঁদে নি। তাঁর কাঁদতে ইচ্ছা হয়নি। পাগল জ্যাঠামশাই কাঁদেননি। তিনি এতক্ষণ সব দেখে যাচ্ছেন। কিন্তু যেই না সবাই শুইয়ে দিয়ে সাদা কাপড়ে শরীর ঢেকে দিল, পাটকাঠির আগুন ঝিলে ঢুকিয়ে দিল, পাগল জ্যাঠামশাই আকাশফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, বাবা.......। সোনাও ঠাকুরদাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে কাঁদছে। জ্যাঠামশাইর কান্না দেখে কেউ আর স্থির থাকতে পারেনি। এই চিতার পাশে যত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এমন দৃশ্য দেখে কেউ না কেঁদে পারল না। প্রায় যেন কান্নার রোল পড়ে গেল। আগুন তখন চিতার চারপাশটা গিলে ফেলেছে। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে আগুন দাঁত বের করে দিচ্ছে। অর্জুনের ডাল, শাখাপ্রশাখা এমনকি পাতায় আগুনের হল্কা গিয়ে লাগছে। আর পাগল মানুষ তেমনি শিশুর মতো উপুড় হয়ে চিতার পাশে পড়ে কাঁদছেন। ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শশীভূষণ ওঁকে ধরে বসে আছেন। পায়ের কাছে সোনা বসে আছে। আগুন ক্রমে দাঁত বের করে চারপাশে হল্কা ছড়াচ্ছে।

মেজ জ্যাঠামশাই চন্দনের কাঠ ফেলে দিলেন কিছু চিতায়। কিছু ধূপ। ঠাকুরদার গলার দু'পাশ দিয়ে আগুন উঠে গেছে। উপুড় করে শোয়ানো শরীর। মুখ দেখা যাচ্ছে না। চামড়া পুড়ে প্রথম কালো হয়ে গেল, তারপর সাদা রঙ। আস্ত মানুষ, এ-ভাবে পুড়ে যাচ্ছে। সোনা মরে গেলে ওর শরীরও সবাই পুড়িয়ে দেবে। সোনা মরে গেলে সবাই ঠিক এ-ভাবে ধরে তুলে দেবে চিতায়। পাগল জ্যাঠামশাই মরে গেলে ঠিক এ-ভাবে আগুন জ্বেলে দেবে তারা। মা মরে গেলে—সে আর ভাবতে পারল না। কেমন এক হতাশা ভাব তার। এবং জীবন সম্পর্কে সে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ল।

পাগল জ্যাঠামশাই এখন গাছের কাণ্ডে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। কিভাবে এক অমৃতময় শরীর যজ্ঞের হবির মতো জ্বলে যাচ্ছে দেখছেন। চামসে মাংসপোড়া গন্ধ বের হচ্ছে। সোনার ভিতর থেকে থেকে বমিবমি পাচ্ছে। কিন্তু সে কিছুতেই ওক দিতে পারছে না। ওর ভয় করছে বড়। সে এখন চিতার দিকে তাকাতে পারছে না। কী শরীর কী হয়ে যাচ্ছে! আর আগুন কীভাবে একটা মানুষকে গিলে খাচ্ছে। গাছের নিচে যারা বসে আছে

ওরা কীর্তন করছে। ধোঁয়া উঠে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। এঁকেবেঁকে সোনালী বালির নদীর চর পার হয়ে কেমন বহুদূরে ঠাকুরদা অসীমে মিশে যাচ্ছেন।

সোনার মনে হল সে চিতার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বরং পাগল জ্যাঠামশাইকে নিয়ে অন্য কোথাও তার চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরদার শরীর পুড়ে গেলে চিতায় জল ঢেলে দিতে হবে। সে, পাগল জ্যাঠামশাই একসঙ্গে জল ঢেলে দেবে। বরং সে এখন ভাবল, অর্জুন গাছের ও-পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে থাকবে। কী অপলক তিনি দেখছেন!

বোধ হয় পাগল মানুষ ভাবছিলেন তখন—এই শরীর অমৃতময়, এই শরীরে আমার জন্ম। আপনার রক্ত এ-ভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে। আপনার ধর্ম এভাবে সারা জীবন এবং শতবর্ষ পার হলেও এক অমৃতময় ধ্বনি ভেবে অন্ধকারে পথ হাঁটবে। আমরা কিছুই জানি না। এই যে জগতে, দিন মাস কাল, মৃত্যু এবং সৌর আবর্তন সবই এক নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘোষিত হচ্ছে; কত ছোট সেখানে আপনি, আপনার এই কোষাকুষি, তিল তুলসী বিশ্বপত্র। বাবা, আমরা বড় বেশি নিজেকে নিয়ে বাঁচি। আমাদের সবকিছু যত তুচ্ছই হোক, তাকে অপরিসীম মূল্যবান মনে করে সংসারের যাবতীয় সত্যকে অস্বীকার করি।

সোনা এখন পাগল জ্যাঠামশাইর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাঠামশাই একবারও ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। আগুনের আঁচ ওদের শরীরে এসে সামান্য লাগছে। সোনা হাত ধরে টানছে, একটু দূরে নিয়ে যেতে চাইছে। শশীভূষণ আর একটু আগে দাঁড়িয়ে আছেন। দীনবন্ধু লক্ষ রাখছে সব। বড়বৌ ভূপেন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছে, ওঁকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবেন না। সোনাকে বলুন ওঁকে এদিকে নিয়ে আসতে।

শশীভূষণ বললেন, আমি আছি। এখানেই থাকুক। এই শেষ দেখা। কাছে থাকলে ওঁর মন শান্তি পাবে।

কিন্তু ভয় এমন অপলক তিনি এই আগুনে কী দেখছেন! চোখে এসে প্রতিবিম্ব পড়ছে আগুনের।

সোনা দেখল জ্যাঠামশাইর চোখদুটোয় চিতা জ্বলছে আর গাছের নিচে এক চিতা। তিন চিতায় সে, জ্যাঠামশাই এবং ঠাকুরদা ক্রমাগত যেন জ্বলে যাচ্ছেন। সে ভয়ে জ্যাঠামশাইকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল।

সোনা ডাকল, জ্যাঠামশয়, জ্যেঠিমা আপনাকে ডাকছে।

পাগল মানুষ এবার সোনার দিকে তাকালেন। —ঐ দ্যাখেন জ্যেঠিমা দাঁড়িয়ে আছে।

দূরে জামগাছটার নিচে গ্রামের সব মেয়েরা দাঁড়িয়ে এই বুড়ো মানুষের দাহ দেখছে। সকলেই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দেখছে মাটি এবং মানুষের এক চিরন্তন ইচ্ছা এভাবে শেষ হয়ে যায়।

পাগল মানুষকে সোনা কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারল না। তিনি এখন হাসছেন। তবে আর ভয় নেই। সোনার এখন মনে হল ঠাকুরদার সব অহঙ্কার আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। সে জন্য জ্যাঠামশাই হাসছেন। সব পৌরুষ জ্বলে যাচ্ছে, সে-জন্য জ্যাঠামশাই হাসছেন। মিথ্যা ধর্মবোধ জ্বলে যাচ্ছে, সে জন্য তিনি হাসছেন।

সে বলল, জ্যাঠামশয়, আপনার চক্ষে ঠাকুরদার চিতা জ্বলতাছে।

মণীন্দ্রনাথ সোনার দিকে তাকালেন। যেন বলতে চাইলেন, তুমি নিজের চোখ দেখ সোনা।

সে লালটুকে বলল, দাদা রে, আমার চক্ষে কিছু জ্বলতাছে? লালটু উঁকি দিল। বলল, হ'। সোনা তর দুই চক্ষুতে ঠাকুরদার চিতার আগুন।

—সত্যি?

—হ রে, সত্যি।

সোনা তাড়াতাড়ি বড়দাকে ডাকল। —দ্যাখি, তর চক্ষু। চিতার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সবার চোখে, প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সে বলল, বড় কষ্ট না রে দাদা। আমরা সবাই মইরা যামু। ভাবতে কষ্ট লাগে, না?

তখন শশীভূষণ বললেন, অত কাছে যাবে না। এদিকে সরে এস। মাথা ফুটে ঘিলু ছিটকে আসতে পারে।

—মারেন বাড়ি। শশীভূষণ ভূপেন্দ্রনাথকে বললেন।

—মাথাটা হেলে পড়ে যাচ্ছে। সোনা লালটু সবাই তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল। ভূপেন্দ্রনাথ বাঁশের খোঁচায় মাথাটা ফাটিয়ে দিতেই ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল। সোনা দেখল আগুন ক্রমে কমে আসছে। এখন আছে শুধু সামান্য মাথার খুলি, নাভি এবং কোমরের দিকটা। ভূপেন্দ্রনাথ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেটা আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন।

ঠাকুরদার নাভিটা একটা পোড়া ব্যাঙের মতো দেখাচ্ছে। ব্যাঙের লেজ খসে শরীরটা কিম্ভুতকিমাকার হয়ে গেছে। ঠাকুরদার এমন চেহারা দেখে ওর ভারি মজা লাগছিল। সোনা যেমন আয়নায় মুখ দেখে, ঠাকুরদা যদি আয়নায় এখন তেমনি মুখ দেখতে পেতেন!

সে ঠাট্টা করে বলল, বুড়োকর্তা, আয়না দিমু আইনা। আয়নায় যদি নিজের মুখটা দ্যাখেন। সে পলটুকে বলল, বড়দা রে, ঠাকুরদা একবারও ভাবছিলেন শরীরটা ওঁর ব্যাঙের মত হইয়া যাইব?

পলটু ধমক দিল। —খাড়, ধনকাকারে কইতাছি।

সোনা এবার চুপ করে গেল। এমন মহাপার্বণের দিনে সে কী আজেবাজে ঠাট্টা করছে। সে বিধর্মী হয়ে যাচ্ছে কেন। মানুষের জীবন কত ছোট, কত অপরিসীম তুচ্ছ। এই বয়সেই এসব ভাবায় বলে সোনা মাঝে মাঝে এই পৃথিবী বিচরণশীল মানুষের জন্য নয় এমন ভাবে! যুদ্ধের বর্ণনা সে শুনেছে। শশীভূষণ নানাভাবে কোথায় কীভাবে মহাযুদ্ধ হয়েছে, দুর্ভিক্ষ এবং দাঙ্গার কথা বর্ণনা করেছেন। সোনা সে-সব শুনে মাঝে মাঝে এক সুন্দর সুদৃশ্য জগৎ নিজের মনে তৈরি করে নেয়। সেখানে ঈশমদাদা তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে হয়। সেই ঈশমদাদাই আজ এমন মহাপার্বণে কাছে আসতে পারছে না। সে দূরে দূরে অপরিচিত মানুষের মতো থাকছে।

তখন ভূপেন্দ্রনাথ অবশিষ্ট নাভিটুকু সামান্য একটা টিনের কৌটায় পুরে রেখে মাথায় করে জল নিয়ে এলেন। তখন নদীর চরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কী গরম আর এই দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখন বৃষ্টির দরকার। কালবৈশাখীর ঝড়ে আমের কুসি ঝরে পড়বে। বৃষ্টিপাত না হলে ধরণী শান্ত হবে না। ভূপেন্দ্রনাথ, পাগলঠাকুর মানুষের দিনগত পাপক্ষয়ের পর শান্তি আসুক, এই ভেবে সারাক্ষণ ঘড়া ঘড়া জল এনে চিতার আগুনে ঢেলে দিতে থাকলেন।

জলে চিতা নিভে গেলে ওরা বাড়ি ফিরে গেল। সোনা ফেরার সময় পিছনে তাকাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই এক কলসি জল চিতার উপর রেখে পিছন ফিরে কলসি ফুটো করে দিয়েছেন। কেউ আর তাকাচ্ছে না পিছনে। দাহ কাজ সেরে ফিরে যাবার সময় পিছন ফিরে দেখতে নেই। দেখলে পাপ হয়। সোনার মনে হল, পিছনে তাকালেই সে তার ঠাকুরদাকে দেখে ফেলবে! তিনি যেন পদ্মাসনে শ্মশানের উপর বসে আছেন। সেখানে আর শ্মশান নেই। সুজলা সুফলা ধরণী। তিনি সেখানে বসে মধুপান করছেন। মৃত্যুর পর মানুষের মধুপান দেখতে নেই। সোনা সে জন্য আর তাকায়নি। তাকালে পাপ হবে সে জানে। অথচ খুব দেখার ইচ্ছা তার। সেই শ্মশানে কী হচ্ছে এখন। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হলে অস্পষ্ট অন্ধকারে কোনও কুকুর অথবা শেয়াল আসতে পারে। কোনও কুকুর অথবা শেয়াল দেখতে পেলেই বুঝতে পারবে ঠাকুরদা শেয়াল-কুকুরের বেশ ধারণ করে ফিরে এসেছেন। নীলবর্ণের পাখি আর থাকছেন না। কিন্তু সে তাকাতে পারল না ভয়ে। ঠাকুরদা রাগ করতে পারেন তার উপর। তুমি সোনা যা নিয়ম নয়, যা করতে নেই, সে-সব করার বড় শখ তোমার! তুমি তাকালে কেন? আমি আর বড় বটগাছের মাথায় নক্ষত্র হয়ে থাকব না। আমি কিছুই দেখব না তোমাদের। তোমাদের বাগে পেলে ঘাড় মটকে দেব।

সোনা সেজন্য খুব সুবোধ বালকের মতো পিছনে না তাকিয়ে সবার সঙ্গে পুকুরে ডুব দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। এবং অন্ধকার নামলেই ওর কেমন ভয় ধরে গেল। সে দক্ষিণের ঘরে শশীমাস্টারের পাশে গিয়ে বসে থাকল। এমনকি যখন একটা গণ্ডগোল উঠেছিল গোপাটে—ফেলুর শরীরে কী জ্বলছে, ফেলুর ঘা ফুটে এখন আগুনের মতো জ্বলছে নিভছে এবং হাতে তার কোরবানীর চাকু, ভয়ে কেউ কাছে যাচ্ছে না, সে কী যেন খুঁজে

বেড়াচ্ছে, আবার সে কার গলা যে হ্যাৎ করে কেটে ফেলবে-কেউ বুঝতে পারছে না, বাতাসে যেন সেই নরহত্যার আতঙ্ক চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছে, সবাই সাবধান হয়ে যাচ্ছে, ওকে দেখলে গোপাটে আর কেউ নেমে যেতে পারছে না তখনও সোনা শশীমাস্টারের পাশে বসেছিল।

কেবল নির্ভীক এক ষণ্ড। সে চারপা শক্ত করে ভিটাজমিতে দাঁড়িয়ে আছে। কতদুরে ফেলু আছে বাতাসে গন্ধ শুঁকে টের পাচ্ছে।

হাওয়া কেটে রাতের অন্ধকারে হাত তুলে গোপাটে ফেলু ছুটছে। ফেলু গোপাট পার হয়ে এদিকে আসছে। কী তুমি এমন একখানা মানুষ, তোমার চিতার চার পাশে মানুষ ভেঙে পড়েছে। তুমি মশাই মরেও গরব তোমার যায় না। আগুনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাক আর লোকে দেখে হায় হায় করে, আমি এক ফেলু, বিবি ঘরে নেই, আমার দুঃখে কেউ কাঁদে না। দ্যাখি কি আছে মাটিতে। তুমি কোনখানে আছ, তোমার পাগল ছাওয়ালে আমারে কানা কইরা দিছে। বলেই সে সেই শ্মশানের উপর এসে কেমন উত্তেজনায় কোরবানীর চাকুটা দুলিয়ে দুলিয়ে নৃত্য করতে থাকল।

কেউ দেখে ফেললে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী যে হতো! কেবল শশীমাস্টার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছেন দূরে পুকুর পাড়ে অর্জুন গাছের নিচে একজন মানুষের অবয়ব। তার শরীর থেকে আগুন বের হচ্ছে। শশীমাস্টার বললেন, সোনা আয়। মজা দেখবি। মানুষ মরে কোথাও যায় না। এ পৃথিবীতেই থাকে। শুধু আমরা দেখতে পাই না এই যা। ঐ দ্যাখ।

সোনা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল, সত্যি সেই মহাশ্মানে তার ঠাকুরদা ফিরে এসেছেন। কী সব অলৌকিক ঘটনা। ওরা দেখল কিছুক্ষণ সেই আত্মা সেখানে ঘোরাঘুরি করে শেষে মাঠের দিকে নেমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কালো শরীর বুঝি সেই বিদেহীর। সারা শরীরে আগুন ফুটে ফুটে বের হচ্ছে। অদ্ভুত সব চোখ আগুনের—আতঙ্কে সে আর্তনাদ করে উঠল। তখন শশীমাস্টার বললেন, ভয় পেতে নেই সোনা। আমরা সবাই এভাবে মরে যাব। মরে গিয়ে আবার এখানেই ফিরে আসব।

সোনা কিছু বলতে পারছে না। ওর ভয়ে জ্বর আসছে।

কম্প দিয়ে জ্বর আসছে সোনার। সেই আগুনে পোড়া মানুষটার শরীরে অজস্র আগুনের ফুলকি জ্বলছে নিভছে। সোনা হি হি করে মাঘমাসের শীতের মতো কাঁপছে। সে মাস্টারমশাইর বিছানায় একটা কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়ল। মনে হল বুঝি তার পালা। এবার বুঝি সেও ঠাকুরদার মতো মরে যাবে। পোড়া শরীরে আগুন ফুটে বের হবে। জ্বালাযন্ত্রণায় ছটফট করবে সে। সে সবাইকে দেখতে পাবে, তাকে কেউ দেখতে পাবে না। ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সে কাথার ভিতর কেবল ছটফট করছিল।

শশীভূষণ সহসা চিৎকার করে উঠলেন ধনবৌদি, তাড়াতাড়ি আসুন। সোনা কেমন করছে, এসে দেখুন।

পাগল মানুষও সোনার সঙ্গে পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এসেছিলেন। লালটু পলটু ডুব দিয়ে উঠে এসেছিল। লালটু পলটু ডুব দিয়েছিল, এক ডুব। ওরা বাড়ি এসে নিমপাতা মুখে দিয়ে আগুনে শরীর সেঁকে ঘরে উঠে গেল। বাড়ির সবকিছু এখন সাফ করা হচ্ছে। চার পাশে গোবরছড়া এবং উঠানে সব বিছানাপত্র বের করা হয়েছে। সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। পাগল মানুষ উঠানের উপর ভিজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হারান পাল দন্দির বাজার থেকে নতুন কাপড়, ফল-মূল, সাগু সব ঈশমের মাথায় নিয়ে এসেছে। নতুন মাটির সরা। মাটির গ্লাস, পাতিল সব এসেছে।

শশীবালা বসে নেই। গোলা থেকে ধান বের করে দিচ্ছেন। মুড়ি-চিড়ার ধান। মাথায় করে মনজুর নিয়ে যাচ্ছে। সময় কম, দেখতে দেখতে দশ রাত্রি পার হয়ে যাবে। এতটুকু আর অন্যমনস্ক নন শশীবালা। অদ্ভুত একটা কষ্ট বুকের ভিতর বাজছে। খাটজোড়া মানুষটার দিনমান পড়ে থাকা। এখন ঘরটা বড় খালি খালি, ফাঁকা ফাঁকা। ঘরের ভিতর ঢুকলেই বুকটা তাঁর হাহাকার করছে। কতদিন আগে মানুষটা তাঁকে এ-সংসারে নিয়ে এসেছিলেন! এখন আর সব মনে করতে পারেন না। তবু মনে আছে শশীবালা বড় অবোধ বালিকা তখন। তাঁর বাবা মেয়ে পণ নিয়েছিলেন বলে আদর বড় বেশি তাঁর। মানুষটার বয়স অনেক। বড় ভয় করত দেখলে। সে মানুষটাকে প্রায় বাপের মতো সমীহ করতেন। এবং বড় হতে হতে এই সংসারেই শশীবালা কৈশোর কাল যৌবন কাল কাটিয়ে দিলেন। বয়সের তফাত মানুষটার সঙ্গে ত্রিশের উপর। ছেলেরা জন্মেছে আরও পরে। তিনি তো জানতেন না কিছু। মানুষটা তাঁকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন। বাপের কথা মনে আসে না। মার কথাও মনে নেই। এই মানুষই তার সব ছিল। বাপ-মায়ের স্নেহ দিয়ে এই সংসারে এক অখণ্ড প্রতাপশালী মানুষ তাঁকে বড় করে তুলেছিলেন। বড় করতে করতে মানুষটা কখন তাঁর অতি আপনার এবং নিজের হয়ে গেলেন! যেন তাঁর অঙ্গের শামিল। এখন সেই মানুষ যত বয়সেই হোক চলে গেলে বুকের ভিতরটা বড় ফাঁকা লাগে।

বড়বৌ এসে এসব দেখে ধমক দিল। —কী দরকার মা আপনার এসব করার। আজকের দিনটা অন্তত চুপচাপ বসে থাকুন। বলে সে ঈশমকে ডাকতেই দেখল উঠোনে

কেউ নেই। পাগল মানুষ ভিজা কাপড়ে তখন দাঁড়িয়ে আছেন।

সে বলল, যাও, ভিতরে যাও। বলে তাকে ধরে নিয়ে গেল পুবের ঘরে। নতুন কাপড় দু'ভাগ করে খোঁট করে দিল। একটা খোঁট পরিয়ে দিল। আর একটা খোঁট গায়ের চাদর করে দিল। ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ পুরোহিতদর্পণ দেখছিলেন। ওঁরা খেয়াল করেন নি বড়দা তখনও উঠোনে। আকাশে তারা না উঠলে ওঁরা ফলমূল খেতে পারবেন না। এখনও সন্ধ্যার অন্ধকার উঠোনে নামেনি। লালটু পলটু এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়েরা উত্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। কে আগে তারা দেখতে পাবে। তারা দেখতে পেলেই বাবা, জ্যাঠামশাই খেতে পাবেন। ওরা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশে তারা খুঁজছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, শ্যামা দাদারে খবর পাঠা।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, কাইল যাইব ঈশম।

পাগল মানুষের গলায় চাবির সঙ্গে কাচা ঝুলছে। তিনি এখন একটা কুশাসনে চুপচাপ বসে আছেন। একটা খোঁট গায়ে। উত্তরের মাঠে ছেলেদের কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন। দক্ষিণের পুকুরে বাবাকে দাহ করা হয়েছে। এ কথাটা মনে হল তাঁর!

ওরা মাঠে কী করছে! ওঁর বড় জানার ইচ্ছা হল। এখন অন্ধকার নামছে। বড়বৌ এদিকে নেই।

ছেলেরা কী করছে! মাঠে ওরা এমন কোলাহল করছে কেন! তিনি উঠবেন ভাবলেন।

তখন বড়বৌ বলল, কোথাও এ ক'দিন যাবে না। যেতে নেই।

পাগল মানুষ বড়বৌর এমন কথায় আবার বসে পড়লেন। শশীমাস্টার জানালা দিয়ে এসব লক্ষ করছেন। সোনা বসে আছে ওঁর পাশে? সেও উত্তরের মাঠে কোলাহল শুনছিল। ওরা কী করছে সবাই!

তিনি জানালা থেকে বললেন, বড়বৌদি, লালটু পলটুকে দেখছি না।

—ওরা তারা খুঁজছে আকাশে।

—তারা!

—তারা না দেখলে জল খেতে পাবে না

—এখনও কী তারা আকাশে ওঠেনি। তিনি বের হয়ে যাবার সময় দেখলেন সোনা শুয়ে আছে। ওর জ্বর গায়ে। অবেলায় ডুব দিয়ে জ্বর হতে পারে ভেবে তিনি নেমে গেলেন উঠোনে। ঘরে আরও মানুষ-জন রয়েছে। সোনা ভয় পাবে না। একা থাকলে ভয় পাবার

কথা। ওকে তিনি একটা অদ্ভূত দৃশ্য দেখিয়েছেন। এখন ওর মনে হচ্ছে, কে সে! কে সেই শ্মশানে আবছা অন্ধকারে এমন নৃত্য করে গেল! কে সে মানুষ!

তিনি উঠোনে নেমে এসে দেখলেন পাগল মানুষ তেমনি বসে আছেন। তিনিও কি আকাশের কোথাও তারা উঠেছে কি-না লক্ষ রাখছেন! শশীমাস্টার দক্ষিণের পুকুরে যাবেন ভাবলেন, এবং যেতে গিয়ে তিনি দেখলেন আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিমে কালপুরুষ উঠে বসে আছে। উত্তরের মাঠ থেকে ওরা দেখতে পাবে না। কারণ গ্রামের গাছপালা উত্তরের মাঠ থেকে এই কালপুরুষকে ঢেকে রেখেছে। তিনি যেতে যেতে ভাবছিলেন, সেই বিদেহী কে, সে কেন এখানে এসেছিল, কী তার কাজ! আর কেনই বা সোনাকে সে এমন একটা মজা দেখাল এখন ভেবে পাচ্ছেন না। সোনা ভয় পায়নি তো। ভয় পেলে কম্প দিয়ে জ্বর আসতে পারে। তিনি তবু এখন এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামালেন না। কেবল বড়বৌর সঙ্গে দেখা হলে বললেন, বৌদি, সোনার মনে হয় জ্বর এসেছে।

—সে কোথায়?

—আমার বিছানাতে শুয়ে আছে।

—থাকুক। ওর মা তো কাজ করছে। ঘরদোর সাফসোফ হচ্ছে। আভা এসে সব পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এখন ও আপনার ঘরেই শুয়ে থাকুক।

শশীমাস্টার এবার বললেন, লালটু পলটু আকাশে তারা খুঁজছে। অথচ এখানে দেখুন কত তারা!

বড়বৌ আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

—তাই তো!

—এটা কি বলুন তো?

—কোনটা?

—ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন না সাতটা তারা!

—ও, ওটা তো কালপুরুষ!

—আপনি তবে জানেন?

—জানব না!

—লালটু-পলটু আকাশে এত তারা থাকতে কেন যে উত্তরের মাঠে তারা খুঁজছে বুঝি না!

—আপনি যান। ওদের নিয়ে আসুন। পড়াশুনা নেই বলে তারা দেখবার নাম করে মাঠে নেমে গেছে।

শশীভূষণ মাঠে নেমে দেখলেন ওরা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আট-দশটি ছেলেমেয়ে। এদের এখন বয়স হয়েছে। লালটু পলটু প্রায় সাবালক হতে চলেছে। এই মৃত্যুর দিনে কিছু আত্মীয়স্বজনের মেয়ে নিয়ে নক্ষত্রের খোঁজে চলে আসা শশীভূষণের ভালো লাগল না।

তিনি মাঠে নেমে বললেন, তোমরা এত দূরে কেন? এদিকে এস।

পলটু বলল, মাস্টারমশাই, আমরা আকাশে তারা খুঁজছি।

—দেখতে পাচ্ছ না?

—না

—এদিকে এস।

ওরা ছুটে চলে এল। —ঐ দ্যাখো। কত তারা। দ্যাখছো সাতটা তারা?

—দেখতে পাইছি।

—ওর নাম কালপুরুষ

পলটু ছুটে বাড়ি উঠে এল। চন্দ্রনাথকে বলল, ধনকাকা তারা দেখেন আইসা।

—কই?

—ঐ দ্যাখেন কালপুরুষ।

চন্দ্রনাথ দেখলেন এখন আকাশে অনেক তারা। বললেন, তোমরা তারা চেনো?

—হ্যাঁ, সে ঘাড় কাৎ করল এবং ছুটে নেমে এল মাঠে। যেন সে কত তারা চেনে।

তখন শশীভূষণ বলছিলেন, তোমরা সবাই উত্তরের দিকে তাকাও।

সবাই মুখ তুলে সোজা উত্তরের আকাশে তাকাল। পলটু ছুটে এসেছে। সে জানে মাস্টারমশাই নিশ্চয়ই মাঠে দাঁড়িয়ে এখন এই গাছ ফুল মাটি সম্পর্কে কিছু বলছেন। সে আর কালপুরুষ দেখল না। সে মাঠে নেমে এসে দেখল, সবাই উত্তবের আকাশে কী দেখছে।

পলটু বলল, মাস্টারমশয়, কি দ্যাখছেন?

—ওটাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে।

লালটু দেখল এখন এখানে সবাই আছে। কেবল সোনা নেই। এমন একটা আশ্চর্য সন্ধ্যায় উত্তরের আকাশে যখন মাস্টারমশাই ওদের নক্ষত্র চেনাচ্ছেন, তখন সোনা নেই ভাবা যায় না! সে বলল, মাস্টারমশয় সোনাকে ডাইকা আনি? কারণ লালটু জানে সব বলে দিলে সোনা এলে মাস্টারমশাই আবার প্রথম থেকে বলবেন। বরং সোনা এলেই আরম্ভ হবে। সোনা এই সময়ে কাছে থাকবে না, আর ওরা ঠাকুরদার মৃত্যুর দিনে আকাশের সব নক্ষত্র চিনে ফেলবে সে হয় না। সোনা এমনিতেই বড় চঞ্চল স্বভাবের ছেলে। ওর কৌতূহলের শেষ নেই। বার বার সে নানাভাবে প্রশ্ন করবে।

শশীভূষণ লালটুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, ছোট ভাইটি কাছে নেই বলে কষ্ট হচ্ছে তার। লালটু এমনিতে সোনাকে খেলায় অথবা মাঠে নেমে গেলে, কিংবা ওরা যখন ভলিবল খেলে, সঙ্গে নিতে চায় না। সোনা বেহায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়। লালটু মাঝে মাঝে তেড়ে আসে। সোনা ছুটে যায়, আবার কিছুদূব গেলেই সে ওদের দিকে হাঁটতে থাকে। এমন কতদিন দেখেছে শশীভূষণ। কোনওদিন ওঁর চোখের উপর এসব হয় না। চোখের উপর করতে সাহস পায় না লাল। কিন্তু আজ ঠাকুরদার মৃত্যুতে কেমন সব অনিত্য ভেবে ছোট ভাইটির জন্য তার কষ্টবোধ হচ্ছে। শশীভূষণ খুবই ম্রিয়মান, কেমন উদাস গলায় বললেন, সে আসবে না লালটু। ওর জ্বর এসেছে। আমার বিছানাতে কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে।

লালটুর মুখ কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল। শশীভূষণ দেখলেন আকাশে তখন জ্যোৎস্না। আকাশে তখন ছায়াপথ আপন মহিমায় দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত। তিনি বললেন, ঐ যে জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সাতজন ঋষির নামে প্রতিটি নক্ষত্রের নাম। তুমি কাল্পনিক রেখা টানলে দেখতে পাবে ওদের অবস্থান ঠিক একটি জিজ্ঞাসাচিহ্নের ওপর। তুমি যদি সেখান থেকে আরও একটি বড় লম্বা রেখা টেনে উপরে তুলে দাও দেখতে পাবে একটা খুব বড় উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেখতে পাচ্ছ?

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠল।

—ওটা কী হবে বলতো?

—ওটা ধ্রুবতারা, না স্যার? দীপালি বলে মেয়েটি এমন বলল।

—তুমি তবে চেন?

—আমার বাবা আমাকে মাঝে মাঝে আকাশের নক্ষত্র দেখান। নাম বলেন। কিন্তু স্যার, আমি ভুলে যাই। মনে রাখতে পারি না।

লালটু বলল, হ্যাঁ মাস্টারমশয়, তারপর?

সে আরও জানতে চায়। এই ধ্রুবলোকের রহস্য তার জানার বড় ইচ্ছা।

—এরা কিন্তু সবই নক্ষত্র। নক্ষত্র আর গ্রহে কী তফাত বলতো? শশীভূষণ বললেন।

—নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে, গ্রহের নিজস্ব আলো নেই।

—ঠিক। খুব ঠিক জবাব। তোমার নাম কি?

—আমার নাম দীপালি। দীপালি চ্যাটার্জি।

—নামের আগে শ্রীমতী বলতে হয়।

দীপালি জিভ কাটল।

খুব ভালো হয়েছে। লালটু এমনই চেয়েছে। বড্ড পাকা। আগে আগে কথা। শহরে থাকে বলে সব জানে এমন একটা ভান সব সময়ে। সে এই মেয়ের মুখ থেকে কিছুই শুনতে চায় না। সে বলল, তারপর মাস্টারমশয়?

—ঐ দ্যাখো পশ্চিমের দিকে তাকাও। কী দেখতে পাচ্ছ?

—অনেক তারা মাস্টারমশয়।

—দ্যাখো, বড় একটা তারা জ্বলজ্বল করছে।

—বড় বড়, হ্যাঁ হ্যাঁ বড়।

দীপালি বলল, ওটা শুকতারা, না স্যার?

আবার? এই মেয়ের জ্বালায় এখানে থাকা যাবে না। লালটু বলল, স্যার, আমাদের মাথার উপর উত্তর-দক্ষিণে ছায়াপথ আছে, না?

—আজ জ্যোৎস্না উঠেছে। ছায়া পথ ভালো দেখতে পাবে না। একদিন অন্ধকার আকাশে তোমাদের ছায়াপথ দেখাব। নিজেরাও দেখতে পার। কী বিচিত্র লীলা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের।

—স্যার, ও-সব গ্রহে আমাদের মতো মানুষ থাকে?

—হ্যাঁ থাকে। তোমার মতো মেয়েরা থাকে। লালটু আব বিরক্তি চাপতে পাবল না। এমনিতে মনে ওর ভীষণ একটা দুঃখ বাজছে। সোনা নেই। ওর জ্বর হয়েছে। ঠাকুরদা নেই। বাড়ির বড় ঘর খালি। মাস্টারমশাই নক্ষত্র দেখাচ্ছেন, তার ভিতর ফড়ফড়ি! এসব ফড়ফডি তার একেবারে ভালো লাগে না। সে মনে মনে বলল, দিমু ঠাস কইরা গালে এক চড়। ফড়ফড়িটা ভাইঙা যাইব।

শশীভূষণ বললেন, এইভাবে আমরা এক বড় সৌরজগতে বসবাস করি। বড় ক্ষুদ্র এ- পৃথিবী। মানুষ আরও কত ছোট, কত কিঞ্চিৎ সে। তোমরা এই মাঠে দাঁড়িয়ে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অণু পরিমাণ জগৎ দেখতে পাচ্ছ তার ভিতর রয়েছে লক্ষ কোটির মতো সূর্য, আপন দাবদাহে নিরন্তর জ্বলছে। হিলিয়াম গ্যাস। বায়ুশূন্য আকাশ। এবং আমরা যা-কিছু নীল দেখছি সে অন্তহীন সাম্রাজ্যের স্বরূপ। তুমি আমি সেখানে অতি তুচ্ছ। আমাদের জন্ম-মৃত্যু আরও তুচ্ছ। তবু একটা নিয়ম আছে জেনে রাখ, যেমন আপন মহিমায় এই সৌরজগৎ আবর্তন করছে, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করছে, রাত দিন বৎসর এবং কাল তারপর মহাকাল, এ-সবের ভিতর একটি অতি নিয়মের খেলা আছে। সে হচ্ছে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসা। শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তের মতো আমরা আবার ফিরে ফিরে আসি। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শেষ হয়ে যাই না।

শশীভূষণ আজ এই মৃত্যুর ব্যাপারে কি একটা যেন আবেগ বোধ করছেন। তিনি, সংসার অনিত্য এমন ভাবছেন। এক পাগল মানুষ আছেন, নিত্যদিন সংসারে চুপচাপ, কোনও কথা বলেন না, বেশ আছেন, যেন কথা না বললে বেশ থাকা যায়, সংসারের সারবস্তুটি তিনি জেনে ফেলেছেন— কী হবে দুঃখ নিয়ে বেঁচে থেকে, যে ক'দিন আছ, থাক খাও, পাখি দ্যাখো—তিনি কেবল পাখি দেখছেন, শশীভূষণ ওদের নক্ষত্র দেখাচ্ছেন। শ্মশানে যে বিদেহী এসে গেল, সে কে! সে কী মানুষের আত্মা! কেবল কষ্ট পাচ্ছে! কেবল ঘুরছে ফিরছে, কোথায় গেলে একটু শান্তি মিলবে!

তিনি এবার সবাইকে ডেকে বললেন, এবার তোমরা বাড়ি এস। মাঠে বেশি সময় দাঁড়াতে নেই। তিনি এখন আমাদের চার পাশেই আছেন। পারলৌকিক কাজ শেষ না হলে তিনি মুক্তি পাবেন না।

সবার এমন কথায় খুব ভয় ধরে গেল। প্রাণে ভয় ওদের সব সময়ই ছিল। তবুও ওরা আকাশে তারা দেখতে এসেছিল মাঠে। দলবল নিয়ে এসেছে। এই দিনে একা মাঠে নেমে আসে কার সাধ্য।

কিন্তু শশীভূষণের এমন কথায় সবাই ওঁকে ঘিরে থাকল। মাস্টারমশাই বাড়ি উঠে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ওরাও উঠে যাবে।

শশীভূষণ বললেন, তোমরা এদিকে কোনও কালো রঙের মানুষ দেখেছ?

ওরা মাস্টারমশাই কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারছে না। ওরা তাকিয়ে থাকল।

—এই একজন কালো রঙের মানুষ। শরীরে আগুন জ্বলছে নিভছে?

ওরা এমন কথায় একেবারে শশীভূষণকে ভয়ে জড়িয়ে ধরল।

—তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন! আমি দেখেছি। আমার এখন দেখা দরকার তিনি তোমাদের ঠাকুরদার আত্মা, না অন্য কিছু।

ওরা কথা বলতে পারছে না। একা উঠে যেতে পারলে বাড়ি উঠে যেত। তাও পারছে না। এক অবলম্বন এই মানুষ। ওরা ওঁকে ঘিরে খুব কাছে কাছে থাকছে। যেন সেই প্রেতাত্মা ওদের ছুঁয়ে দেবার জন্য চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। ভয়ে লালটু পলটু গায়ত্রী জপ করছিল।

—মানুষের গায়ে আগুন জ্বলে নেভে এ আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

–আমাদের শরীর আগুনে পুড়ে গেলে কি হয়! আমরা ছাই হয়ে যাই। আর কি থাকে!

শশীভূষণকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।—ওটা দক্ষিণের মাঠে নেমে গেছে। আমি তোমাদের কী বলব, এত যে সাহস আমার, কিছুতেই আজ দক্ষিণের মাঠে যেতে সাহস পাইনি।

—ভয় মানুষকে কী করে রাখে! ভয় মানুষকে অদৃশ্য অলৌকিক কিছু আছে যা ছোঁয়া যায় না, যা অনুভূতিগাহ্য নয়, তেমন এক জগতে বসবাস করতে প্রেরণা দেয়। তিনি বললেন, এই হচ্ছে আমাদের ভগবান, লালটু। যার কোনও ব্যাখ্যা চলে না, তাকে আমরা ভগবান ভাবি। তোমার ঠাকুরদা এখন কালো রঙের শরীর নিয়ে নানারকম আগুনের গর্ত সৃষ্টি করে নিজেই ভগবান হয়ে গেছেন। বলতেই ভয়ে ওঁরও কেমন শরীরটা কাটা দিয়ে উঠল। তিনি বললেন, এস, আর মাঠে নয়। তারা তোমাদের দেখতে হবে না।

তারপর ছুটে এসে প্রায় সবাই উঠোনে উঠে এল। দক্ষিণের ঘরে এত লোকজন, তবু কেন জানি শশীভূষণের ভয় কাটছে না। সোনা মাথায় মুখে কাথা ঢেকে শুয়ে আছে। নিচে পড়ার টেবিলে নরেন দাস শ্রীশ চন্দ্র আরও গ্রামের কিছু মানুষ বসে বসে গল্পগুজব করছে ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি তাদের কিছু বললেন না। যেখানে সোনা শুয়ে আছে তার পাশেই বসলেন। জ্বরটা বেড়েছে কিনা দেখার সময় মনে হয়, সোনা শক্ত হয়ে আছে। একি, এত শক্ত কেন! তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, আপনারা আসুন। সোনা কী হয়ে গেছে!

বড়বৌ তখন সাদা পাথরে সাগু ভিজাচ্ছিল। ফলমূল কাটছিল। ওরা তারা দেখে ফলজল খাবে। কাঁচা দুধ, মধু এবং তরমুজ। আর সাগু কলা। এই খাদ্য। রান্নাঘরে ওদের আত্মীয় পবন কর্তার বৌ আছে। ধন, রান্নার সবকিছু বের করে দিচ্ছিল। তখনই ওরা শুনল সেই অসহনীয় চিৎকার।

সবাই ছুটে গেল। মণীন্দ্রনাথ সবাইকে এমন ছুটে দক্ষিণের ঘরে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেছেন।

ফেলু মাঠে নেমে এসে তখন কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। হালার কাওয়া। হালার ভগবান তুমি ঠাকুর! তোমার ভগবানগিরি ভাইঙ্গা দিমু। বলে, সে যেমন

তার কোরবানীর চাকু হাওয়াতে দোলায়, তেমনি দোলাতে দোলাতে সে দেখল, ওর গায়ে অজস্র জোনাকি। সেই যে গতকাল মধুর সঙ্গে সব লেপ্টে আছে শরীরে, তারা আর উড়ে যেতে পারেনি।

ভীষণ মজা পেয়ে গেল ফেলু। সে ভাবল এখন একবার সেই ধর্মের ষণ্ডটাকে দেখলে হয়। কোথায় আছে সে। তাকে চিনতে পারলেই শালা লেজ তুলে পালাবে। সে ভাবল সব শালাকে আজ ভয় দেখাবে। এই যে মাঠ আছে, সাদা জ্যোৎস্না আছে, আহা, অন্ধকার হলে খুব ভালো হতো, লোকে দেখত কেবল কাঠের মতো একটা মানুষ নিরন্তর ছুটছে আর তার গায়ে অজস্র দেব-দেবীর চোখ। চোখ জ্বলছে। সে ফের কিংবদন্তী হয়ে যেতে পারে। মানুষের ভগবান হয়ে যেতে পারে।

সে বলল, আমি ভগবান, আমি আল্লা। আমি না পারি কী। কেয়ামতের দিনে আমি রসুলের পাশে বসে থাকব। বলব, হা রসুল আমার বিবিরে যে নেয় কাইরা তার ধর্ম কী? আমার যে অন্ন নাই আমার ধর্ম কী! জালালি যে পানিতে ডুইবা মরল তার ধর্ম কী!

এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেলে মানুষের আর থাকে কী! সে যে কী চায় নিজেও জানে না। সে মনে সুখ পাবে না, বেঁচে থেকে সুখ পাবে না, তবে কী ধর্মের নামে সুখ! সে সুখ সুখ করে বিবি বিবি করে পাগল হয়ে গেল। সে বলল, আন্নুরে, তুই কই গ্যালি! তরে কই পামু! শহরে আমি যাই কী কইরা! তুই ব্যারামি নাচারি মানুষটার কষ্ট বুঝলি না! তাজা ষণ্ড দেইখা পালাইলি! আমি আর মানুষ নাই রে আন্নু। আমি যে কী হইয়া গ্যাছি নিজেই জানি না। আমার চোখে পানি ঝরে না।

সে নৃত্য করে সেই সৎ মানুষটার শ্মশান অপবিত্র করে দিয়ে এসেছে। সারাদিন সবাই করজোড়ে ছিল, আর সে লাথি মেরে শ্মশানের কলসি ভেঙে দিয়েছে। জল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল আর তার হা-হা করে হাসতে ইচ্ছা হচ্ছিল। সে জানে কেউ আজ আর পুকুর পাড়ের দিকে তাকাবে না। কেউ আজ আর এ-মাঠে নেমে আসবে না। সবারই এক ভয়। মানুষ মরে গেলে শেষ হয়ে যায় না। আকাশে-বাতাসে সে ঘুরে বেড়ায়। সে ডাকল, ঠাকুর, তোমার পোলারে সাবধানে রাইখ। তুমি ত মইরা গিয়া শক্তিধর হইছ। পার কিনা দ্যাখ আমার লগে। আমি তোমার পোলা, আকালু, যারে আমি পামু খুন করমু। আমি কোনখানে যামু না। এই শরীরে বনে-জঙ্গলে ঘুইরা বেড়ামু। ফাঁক পাইলেই হ্যাৎ। হালার কাওয়া। যেন মনে হয় বাতাসে ঠাকুরের আত্মাটা এখন ভাসছে। সে জোনাকি ধরার মতো মাঠে আত্মা ধরার বাসনাতে ছুটছে। হালার কাওয়া। হ্যাৎ। সে হাত বাড়িয়ে বাতাস থেকে ঠাকুরের আত্মা ধরতে চাইল।

এভাবে ঘুরে ঘুরে যখন বোঝা গেল মৃত আত্মা বাতাস থেকে ধরা যায় না অথবা সে ঘুরে মরছে মাঠে, অকারণ এই আত্মা খুঁজে মরা, তার চেয়ে বরং ভালো, গিয়ে বসে থাকা আকালুর ঘরের পিছনে। সে যদি রাতে তার ঘরে ফিরে আসে।

তখন ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, মাথায় জল ঢালো বেশি করে।

গোপাল ডাক্তার এসেছে। সে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে বসে আছে। জ্বরের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেছে এমন বলছে। খুব বেশি জ্বর। এত জ্বরে মাথা ঠিক থাকে না। রক্ত উঠে গেছে মাথায়। সকলে চারপাশে বসে রয়েছ। কে আর কী খাবে! বড়বৌ সব ফেলে চলে এসেছে এ-ঘরে। আশ্বিনের কুকুর পাহারায় আছে। সে ঘরে ঢোকে না। সে কেবল চারপাশে লক্ষ রাখে কেউ ঘরে ঢুকে যাচ্ছে কিনা। মাথায় এত জল ঢালা হচ্ছে যে মেঝে ভেসে গেছে জলে। সোনা চোখ বুজে আছে। হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল। এখন হাত খোলা নরম। দাঁত লেগে ছিল, এখন দাঁত খোলা। বড়বৌ মাঝে মাঝে ডাকছেন, সোনা সোনা! ভাল লাগছে? সে চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে দিচ্ছে। কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছে না। চোখদুটো এখনও লাল আছে। মাথায় রক্ত উঠে এমন হয়েছে। পাঁচের ওপর জ্বর। সে বিড়বিড করে কী বলছে যেন। চন্দ্রনাথ মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন। বললেন, জল দিমু? বড়বৌ কাছে এসে বলল, জল খাবি সোনা? হাঁ কর। তুই এমন করছিস কেন! কী হয়েছে, কী কষ্ট! এই তো আমরা, কী ভয় তোর!

শশীভূষণ কেমন বোকা বনে গেছেন। তিনি কেন যে বলতে গেলেন, আয় সোনা মজা দেখবি। বলে তিনি কেন যে পুকুরপাড়ে শ্মশানের দিকে হাত তুলে দেখালেন। ভয়ে তার এমন হয়েছে। এ সব বলে দেওয়া ভালো। তিনি বলে দিলেন, আমি যে কী করলাম বড়বৌদি! ওঁরও যেন ভয়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসছে।

—কী বলব আপানাদের, শ্মশানে এক আশ্চর্য ব্যাপার। আপনারা সবাই যখন বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন, আমি সোনাকে নিয়ে এ-ঘরে বসে রয়েছি। আমার উচিত ছিল জানালা বন্ধ করে রাখা। তবে আর এ-সব দেখতে হতো না। বলেই কেমন তিনি জানালাটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন।

দেখলে মনে হবে শশীভূষণেরও যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসছে। তিনি বলতে পারছেন না। তিনি ঢোক গিলছেন। তিনি বললেন, পাঁজি এনে দিনটা দেখলে হতো। কী দিনে তিনি গেলেন।

—কেন কী হয়েছে! বড়বৌ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল। ধনবৌ অনবরত জল ঢেলে যাচ্ছে। ওর হাত ধরে গেছে, তবু কিছু বলছে না। সে অপলক তাকিয়ে আছে সোনার দিকে। দাহ করার সময় কাছে থাকতে না দিলেই হত এমন ভাবছে।

শশীভূষণ বললেন, আমি বললাম মজা দেখবি? সোনাকে আঙুল তুলে দেখালাম। সোনার কৌতূহল বেশি জানি। সে বার বার আমাকে নানাভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। মানুষ মরে কোথায় যায়, কী হয়, কোথাও সে জন্ম নিলে আমরা চিনতে পারব কিনা—এই আমাদের ঠাকুরদা। নাকি জন্ম কোথাও কেউ নেয় না, বাতাসে আত্মাটা মিশে যায়। আমি বললাম, সোনা, কেউ মরে শেষ হয়ে যায় না। ঐ দ্যাখো। দেখলাম বৌদি,

পোড়াকাঠের মতো একজন মানুষ সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকারে শ্মশানে এসে নৃত্য করছে। গায়ে ফুলকি দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। ঠিক যেন আধপোড়া একটা মানুষ শ্মশানে ফিরে এসেছে ফের। আমার ভারি কৌতূহল হল। সোনাকে বললাম, ঐ দ্যাখ। মানুষ মরে কোথাও যায় না। এ-পৃথিবীতেই সে থাকে।

গোটা ঘর চুপচাপ। কোনও শব্দ নেই। কেবল জল পড়ার শব্দ। গোপাল ডাক্তার বলল, এখানে এসব আলোচনা করা ঠিক না।

সবারই হুঁশ হল। এ সম্পর্কে আর কোনও কথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। রাম রাম। সবাই মনে মনে রাম নাম উচ্চারণ করল।

এই বাড়িতে আর কিছু নেই এখন মনে হয়। সবাইকে কেমন এক অশরীরী এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে। সবাই ভয়ে ভিতরে ভিতরে ফুলে যাচ্ছে। কেবল মণীন্দ্রনাথ ঘরের দাওয়ায় বসে হাঁকছেন, গ্যাৎচোরেৎশালা। ওঁকে কেউ খেতে দিচ্ছে না। সারাদিন না খেয়ে তাঁর খিদে বেড়ে গেছে।

কুকুরটাও হাই তুলল। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। গোপাল ডাক্তার ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে আজ গেল না। সাইকেলে সে আজ আসেনি। হেঁটে এসেছে। ওকে ঈশম দিতে যাবে তার গ্রামে। সে একা একা ফিরে আসবে আবার। সে যেমন সোনার জন্মকালে হাতে লণ্ঠন, বগলে লাঠি নিয়ে বের হয়েছিল, তেমনি নিশীথে গোপাল ডাক্তাবকে দিতে চলে গেল।

সোনা তখন বাতাসে বুঝি দুলছিল। সে হাতটা ওপরে তুলে বাতাসে কী খুঁজছে। সে কী খপ করে ধরতে চাইছে?

ধনবৌ এমন দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। সারারাত এই করতে করতে কখন সকাল হয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। তারিণী কবিরাজের জন্য আবার লোক পাঠানো দরকার। ঈশমই সকালে এসে খবর দিল, একজন ওঝা আসছে। সে সোনাকে দেখবে। সকালে যে ওঝা এসেছিল তার বর্ণবহুল চেহারা বড়বৌকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। সে চুল বড় করে রেখেছে। হাতের নোখ কাটে না, পায়ের নোখ কাটে না। চোখ লাল। গাজার কল্কে হরেক রকমের গলায় বাঁধা। সে বলল, মরা দোষ পাইছে। সহজে নিস্তার নাই।

তা নিস্তার না থাকুক, সোনা কিন্তু সকালের দিকে কেমন একটু নিদ্রা গেল। ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, এবারে তুমি যাও, দরকার পড়লে ডাইকা পাঠামু।

ওঝা বলল, কর্তা, ভূত বাড়িতে পাড়া দিতে না দিতেই পালাইছে। আমার বিদায়!

—বিদায় আর কী। কী চাও তুমি?

—দুই কাঠা ধান। আর পাত পাইতা দই-চিড়া।

—তা শ্রাদ্ধের দিন আইস। খাইবা।

ওঝা চলে গেল। যাবার সময় বলল, কর্তা বাড়ি বাইন্দা দিয়া গ্যালাম। কোন ডর নাই।

সবাই শুনল কথাগুলি। লালটু পলটুর শুনে সাহস ফিরে এল। শশীভূষণ পর্যন্ত কথাটা বিশ্বাস করলেন। এবং বাড়িতে যে এক অদৃশ্য ভয় সবসময় ঝুলে ছিল বাতাসে এক সামান্য ওঝা এসেই কেমন তা উড়িয়ে দিয়ে গেল।

মণীন্দ্রনাথ তখন সোনার শিয়রে বসেছিলেন। সোনা বস্তুত মণীন্দ্রনাথকে শিয়রে দেখেই কেমন সাহস পেয়ে গেল। ওর ভিতরে যে ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য, তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কারা, পুড়িয়ে মারার জন্য চিতার কাঠে তুলে দিচ্ছে, অমলা কমলা কাঁদছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আগুনের ভিতর ওর সুন্দর চোখ মুখ পুড়ে যাচ্ছে, সে কালো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পুড়ে যেতে যেতে সে একটা লেজ খসে পড়া ব্যাঙ হয়ে যাচ্ছে, অথচ আত্মাটা তার সেই ব্যাঙের ভিতর আছে, সে টের পাচ্ছে সব, কষ্ট যন্ত্রণা টের পাচ্ছে, সে আর এ-পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারছে না সোনা হয়ে, সে একটা অন্য জীব হয়ে গেছে—তাকে কেউ চিনতে পারছে না, সে, মেলায় হারিয়ে যেমন ভেউভেউ করে ছেলেমানুষ কাঁদে সে তেমনি যখন কাঁদছিল তখনই দেখল পাগল জ্যাঠামশাই ওর শিয়রে এসে বসেছেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাকে একমাত্র তিনিই চিনতে পেরেছেন। বলছেন যেন, সোনা তোর ভয় নেই, আমি তোর সঙ্গে যাব। সোনার সঙ্গে যদি পাগল জ্যাঠামশাই থাকেন তবে আর কি ভয়! ওর চোখে নির্ভয়ে ঘুম এসে গেল।

পাগল মানুষ তারপর বের হয়ে এলেন। কেমন একটা অভিমান কাজ করছে। কাল রাতে কেউ তাঁকে খেতে দেয়নি। বাবা তাঁকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে অনুমতি দিলেন না। তিনি ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর অভিমানে ক্ষুব্ধ। যেদিকে এখন দু'চোখ যায় বের হয়ে যাবেন। তিনি ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে হাঁটতে থাকলেন।

কেন যে আজ সকালে এমন কুয়াশা হল! পাগল মানুষ গোপাটে নেমে পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এটা গ্রীষ্মের দিন। তিন-চার দিন মাঝে আকাশ মেঘলা গেছে। কিন্তু ঝড়জল কালবৈশাখী কিছু হয়নি। দু'দিন খাঁ খাঁ রোদ। কাল রাতে জ্যোৎস্না ছিল। আজ সকালে কুয়াশা। তিনি পথে নেমে এলে কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। হাসান পীরের দরগায় তিনি আজ যাবেন। কতদিন তিনি যান নি। কতদিন তাঁর হাসান পীরের সঙ্গে দেখা হয়নি। সেই কবে একবার বর্ষার শেষে হাসান পীরের দরগায় তিনি গিয়েছিলেন। হাসানের উক্তি মনে পড়ছে তাঁর।—তর যা চক্ষু মণি, চক্ষুতে কয়, তুই পীর হইবি, না হয় পাগল বইনা যাইবি।

—আচ্ছা পীরসাহেব, আমার সেই চক্ষুতে কোন দুরাশা জেগে আছে?

—দুরাশা সবারই থাকে মণি, তরও আছে। দুরাশা না থাকলে মানুষ বাঁচে না।

—আমার কি দুরাশা?

—তর দুরাশা তুই পাইবি না, তার জন্য ঘুইরা মরবি।

—কেন পাব না! আমার কি কসুর? সে পীরসাহেবের ভাষায় কসুর কথাটা ব্যবহার করেছিল।

—তর কসুর তুই বড় বেশি সাদাসিদা মানুষ। সাদাসিদা মানুষের বেশি দুরাশা ভাল না।

—আমি ঠিক চলে যাব। এখানে থাকব না। ওর কাছে চলে যাব। আমাকে কেউ খেতে দেয়নি কাল পীরসাহেব। বাবা আমাকে মন্ত্রপাঠ করতে দিল না। আমার কী আর আছে! সারাদিন আপনার কাছে আজ বসে থাকব। তার পর হেঁটে হেঁটে পলিনের কাছে চলে যাব। কেউ আমার নাগাল পাবে না। ঠিক না পীরসাহেব?

কুয়াশার ভিতর তিনি হাঁটছেন আর হাঁটছেন। দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন। তিনি বড়বৌকে উদ্বিগ্ন করে তুলবেন। সে বের হয়ে গেলে খোঁজাখুঁজি হবে, সে না থাকলে সবাই ফল জল খাবে না। তাঁকে কাল বড়বৌ খেতে দেয়নি। তিনি সারাক্ষণ আশ্বিনের কুকুরের পাশে চুপচাপ বাইরে বসেছিলেন আর দেখেছেন সব মানুষের ভিড় দক্ষিণের ঘরে। কী হয়েছে সোনার! তাঁকে কেউ ডাকছে না। কেউ বলছে না, তুমি এস। তিনি যেন এ-বাড়ির কেউ নন। তিনি যেন এ-বাড়িতে অপরিচিত মানুষ। না পেরে তিনি ভোর রাতের দিকে নিজেই উঠে গেছেন সোনার কাছে। তিনি শিয়রে গিয়ে বসেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন, এখন মনে হয় একটু ভালোর দিকে। মণীন্দ্রনাথ চুপচাপ কেবল সোনার মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন। ওঁর কেন জানি বার বার ইচ্ছা করছিল, একেবারে সাপ্টে কোলে তুলে নিতে। বুকের পাশে জড়িয়ে নিলেই সব গ্লানি সোনার মুছে যাবে। অথবা এই যে কুয়াশা, এই কুয়াশায় সোনাকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে হেঁটে গেলে এক জলাশয় পাওয়া যাবে, এক বড় মাঠ পাওয়া যাবে, তারপর হাসান পীরের দরগা, দরগাতে গিয়ে শুইয়ে দিতে পারলেই সে নিরাময় হয়ে যাবে।

ওঁর আজকাল বড়বৌর ওপর অভিমান হলেই কোথাও গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। কোনও কিছুর অভাব হলে অভিমানে খুব দূরে গিয়ে আজকাল বসে থাকেন না। ধারেকাছে থাকেন। যেন সোনা অথবা লালটু পলটু গিয়ে খুঁজে আনতে পারে। তিনি লালটু পলটু গেলে আসেন না। সোনা গেলে কখনও কখনও উঠে আসেন। আর বড়বৌ গেলে অনেকক্ষণ সাধাসাধি। এক অবোধ বালকের মতো হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর আর দূরে যেতে ইচ্ছা হয় না। কেমন স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যাচ্ছেন। তবু আগে একটা দুর্গের ছবি, র‍্যামপার্ট এবং বড় একটা নদী দেখতে পেতেন। মাঝে মাঝে কী যেন একটা প্রতিমার মতো মুখ উঠেই মিলিয়ে যেত। মাঝে মাঝে তিনি একটা সিলভার ওকের গাছ দেখতে পেতেন। তার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে ওঁর জন্য অপেক্ষা করছে। এখন আর তেমন ছবি

কিছুই ভাসে না। ক্রমাগত এক নিষ্ঠুর যাত্রা তাঁকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। কাল সময় তাঁকে বড় একাকী করে রাখছে। কেবল এই বড়বৌ এবং সোনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণই ওঁর প্রতীক্ষা, ততক্ষণই তিনি বসে থাকেন এবং মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকান, কেউ ওঁকে খুঁজতে আসছে কিনা। আজ তিনি বেশ দূরে চলে যাচ্ছেন। দেখুক সবাই কেমন মজা। খেতে না দিয়ে সব ভুলে থাকার মজা দেখুক বড়বৌ।

ঘন কুয়াশার ভিতর পথ চিনে যেতে কষ্ট হচ্ছে। তবু উত্তরের দিকে ক্রমান্বয়ে হেঁটে গেলে সেই দরগা মিলে যাবে। তিনি কুয়াশার ভিতর কেবল হেঁটে যেতে থাকলেন।

কেবল হেঁটে যেতে থাকল আরও একজন মানুষ, সে ফেলু। কুয়াশার ভিতর তাকে মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না, যেন একটা বড় গজার মাছ জলের নিচে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। বিলের জল কালো, তার নিবাসে কে এসে মজা লুঠছে, সে জলের ভিতর ডুবে ডুবে শ্যাওলার অন্ধকারে তা লক্ষ রাখছে। সে কখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। দু'হাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে যে কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না। সে সারারাত আকালুর বাড়ির পাশে যে জঙ্গলটা আছে সেখানে বসেছিল। যদি আকালু রাতে ফিরে আসে। যদি আকালু শেষপর্যন্ত কিছু ভুলে যায় নিতে, সে রাতে ফিরে আসতে পারে; কিন্তু সারারাত ফেলু মশার কামড় খেয়েছে। শরীর তার ফুলে গেছে। ওর শরীর এখন আর শরীর নেই। যেন সে এই কুয়াশার ভিতর এক অশরীরী হয়ে কেবল ছুটছে।

সকালবেলাতে বড়বৌর মনে হল কেউ রাতে ফল-জল খায়নি। সবাই সোনাকে নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে, খাবার কথা কারও মনে আসেনি। এখন সোনা ঘুমোচ্ছে। খুব আলগোছে চন্দ্রনাথ তাকে পশ্চিমের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। এবং শুইয়ে দিচ্ছেন। কাঁথা-বালিশ সব টেনে নেওয়া হচ্ছে পশ্চিমের ঘরে। কপালে হাত দিয়ে দেখল বড়বৌ। মনে হল ওর জ্বরটাও কমে এসেছে। সে পুবের ঘরে গিয়ে দেখল, তেমনি পড়ে আছে সব। কুকুরটা দাওয়ায় শুয়ে আছে। তার মানুষ কোথাও নেই। তাঁকে ওর রাতে খেতে দেওয়া উচিত ছিল। ওর যে এমন মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং শচীন্দ্রনাথের মুখচোখ এত বেশি বিষণ্ণ ছিল যে, খাবার কথা বড়বৌ বলতে সাহস পায়নি। ওরা খেতে আসছে না, ওর মানুষ একা-একা বসে খাবে, ওর কেমন স্বার্থপরতার কথা মনে হয়েছিল। একসঙ্গেই খাবে। সোনা হয়তো কিছুক্ষণের ভিতরই স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এই আশায় আশায় সবাই রাত ভোর করে দিয়েছিল।

পাগল মানুষই নেই। কুযাশা ঘন বলে কোথায় আছে মানুষটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। খুব দূরে যখন আজকাল যান না, তখন হয়তো অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে বসে রয়েছেন। তার অনেক কাজ। সে সকাল-সকাল ঘরে ঢুকে সব ফলমূল বের করে দিল। আর একটু বেলা হলে সেই ফলমূল ছেলেদের ভাগ করে দেবে। মনটা কেন যে খচখচ করছে বড়বৌ বুঝতে পারছে না। ভীষণ একটা হাহাকার বাজছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, শ্বশুরমশাই মারা গেছেন, এতদিন সে মানুষটাকে সেবা- শুশ্রূষা করেছে, হয়তো এজন্য এমন হবে। কিন্তু পরে মনে হল, এত গভীরে সেই হাহাকার বাজবে কেন! কেমন শূন্য-শূন্য মনে হচ্ছে সব! তিনি কতদিন কাছে থাকেন না, দশ-বার দিন ক্রমান্বয়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ান, বাড়ি ফিরে এলেই নাপিতবাড়ির হরকুমারকে ডেকে দাড়ি কামানোর ব্যবস্থা করা হয়, প্রতিদিন হরকুমার আসে না, দু'দিন অন্তর-অন্তর তার এ-বাড়ি ঘুরে যাবার কথা, সে না এলে এক মুখ দাড়ি নিয়ে মানুষটা থাকবেন বলে বড়বৌর খারাপ লাগে। গতকাল সে বার বার করে বলেছে, তুমি এ ক'দিন কোথাও যেও না। এ-সময় কোথাও যেতে হয় না। তবু যে মানুষটা কোথায় গেলেন! সে পলটুকে ডেকে তুলল, এই, ওঠতো। যা দেখ উনি আবার কোথায় গেলেন।

মার এতটা উদ্বেগ পলটুর ভালো লাগল না। সে পাশ ফিরে শুল।

—কত বেলা ঘুমাবি! যা না বাবা। দেখ, উনি কোথায় গেলেন। ধরে নিয়ে আয়।

পলটু চোখ বুজে ছিল। মার এই বার বার তাগাদা ওর ভালো লাগছিল না। ঠাকুরদা মারা গেছেন এ ক'দিন ওদের পড়া থেকে ছুটি। সে খুব ঘুমাবে এক'দিন। অন্য সময় সকাল হতেই দরজায় শব্দ, পলটু ওঠ। বেলা হয়ে গেছে, গোপাটে যাবি। মাস্টারমশাইর জন্য ওরা ঘুম থেকে কিছুতেই বেলা করে উঠতে পারে না। ওর মনে হয় তখন, মাস্টারমশাই রাতে ঘুমান না। কেবল জেগে থাকেন। যদি ভোর হয়ে যায়, বেলা হয়ে যায় তবে তিনি ওদের নিয়ে গোপাটে যেতে পারবেন না, মটকিলার ডাল ভেঙে দিতে পারবেন না, মাঠে সব প্রাতঃকৃত্যাদির কাজ, যেন তাঁর শুধু ওদের পড়ানোই কাজ নয়, ওদের স্বাস্থ্যবিধি লক্ষ রাখাও তাঁর কাজ। পলটুর মনে হয় তখন, কে যে তাঁকে এ-সব দায়িত্ব দিল, কেন যে তিনি সারা রাত না ঘুমিয়ে ওদের ডেকে তোলার জন্য বসে থাকেন! সে মাস্টারমশাইর ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সব সময়। ওর কিছুতেই পড়া মুখস্থ হয় না। সে বার বার পড়েও পড়া মনে রাখতে পারে না। মাস্টারমশাই তাকে খুব মারেন। লালটুকে খুব একটা মারতে পারেন না। একদিন খুব মেরে ছিলেন মাস্টারমশাই। ...পড়াশুনা না করলে বড় হয়ে করবি কি? খাবি কি?

লালটু একটু বেয়াড়া ধরনের, জেদি, একগুঁয়ে। সে মার খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে বলেছিল, আমি তরকারি বেইচা খামু।

সেই থেকে শশীভূষণ যেন লালটুকে আর তেমন মারেন না। বরং তিনি যেন কেমন একটু ওকে সমীহ করতে শুরু করেছেন। পলটু শুয়ে শুয়ে ভাবল, তাকে মারলে সেও একদিন এমন বলে দেবে। কিন্তু সে দেখেছে, পারে না। খুব রেগে গেলে মাস্টারমশাই মারেন। তারপর আবার চুপচাপ মাথা ঠাণ্ডা করে কেমন দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে রাখেন। বলেন, তোরা বড় হলে এই দেশ বড় হবে। অর্থাৎ যেন শশীভূষণের বলার ইচ্ছা, দেশ মানেই হচ্ছে দেশের মানুষ। তাদের প্রকাশই হচ্ছে দেশের প্রকাশ। স্কুলে পলটু দেখেছে সারাটা সময় মাস্টারমশাই কী ব্যস্ত থাকেন। কোথায় কী হবে, তিনি নানারকম ফুলের গাছ এনে স্কুলের মাঠে লাগিয়েছেন। নানারকম খেলার ব্যবস্থা করেছেন। সবার ছুটি হয়ে গেলেও তাঁর ছুটি হয় না! ওরা তখন স্কুলের মাঠে মাস্টারমশাইর জন্য বসে থাকে।

বড়বৌ আবার ডাকল, কী রে, তুই উঠবি না!

সে বলল, না। আমার ভাল লাগে না।

দেখ বাবা, উনি এই সকালে কোথায় আবার বের হয়ে গেলেন। একটু উঠে গিয়ে দেখ।

—তুমি দ্যাখ। আমি পারমু না।

বড়বৌ ছেলের মাথার কাছে বসল—সোনার শরীর ভাল না। কত কাজ আমার। তোরা এখন বড় হয়েছিস। ওকে যদি দেখে না রাখিস তবে কে দেখবে?

পলটুর ভারি বিরক্ত লাগছিল। সে সাধারণত মায়ের সঙ্গে আগে শুত না। এই সেদিন থেকে মায়ের পাশে শুচ্ছে। সে শুত ছোটাকাকার সঙ্গে। কিন্তু এই দেশে কী যে হল! রাতে নানারকম অত্যাচার এবং অবিচারের ছবি ভেসে উঠলে মা ভয় পান। সারারাত কোনও কোনও দিন ওদের জেগে থাকতে হয়েছে। বর্ষাকালটাই ভীষণ মনে হয়েছিল। শীতকালটা ভালই গেছে। কোথায় কোন অঞ্চলে আবার দাঙ্গা বেধে গেছে। এই গ্রীষ্মে আবার নানা রকমের খবর। এসব কারণেই পলটু মায়ের সঙ্গে থাকছে। মার এমন কথায় সে বলে ফেলল, আর তোমার লগে শুমু না। ছোট কাকার লগে শুধু।

বড়বৌ ভারি কষ্ট পেল ওর কথায়। পলটু খুব একটা জেদি ছেলে নয়। তবু কেমন যেন সে তার বাবার সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা পুষে রেখেছে। সে যেন বুঝতে পারে, সে তার মা এবং বাবা এই পরিবারের গলগ্রহ। এবং তার বাবা কত বড় কাজ করতেন। সে এবং মা। কত সুন্দর সে একটা ছবি দেখতে পায় মাঝে মাঝে। বড় শহরে তার মা তার হাত ধরে কোনও একটা বড় রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার পরনে প্যান্ট-কোট। বাবা চকচকে জুতো পরেছেন। মাথায় কেন্ট ক্যাপ। ওর বাবা সাহেব বনে যেতে পারতেন। যেমন সে দেখেছে মুড়াপাড়ার সেই মানুষ, মেজবাবু, যাঁকে সে দেখেছে প্যান্ট-কোট পরলে অন্য মানুষ হয়ে যান। সারা পরিবারে যতই মেজবাবু সম্পর্কে নিন্দা হোক, ভিতরে ভিতরে মেজবাবুকে সবাই কেমন সমীহ করত।

পলটুর ভারি খারাপ লাগে ভাবতে, তার বাবা পাগল। সেজন্য যখনই কোথাও ওর বাবার কথা ওঠে, সে সেখানে থাকে না। কারণ, ভিতরে ভিতরে ওর এই এক কষ্ট। এবং সেইজন্যই বুঝি কোনও পড়া মনে রাখতে পারে না। কেমন এক হীনমন্যতায় সে সব সময় ভোগে। বড়বৌ ওকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে পারে না। তখন যদি ধন এসে বলত, পলটু, ওঠ, তোর বাবাকে খুঁজে নিয়ে আয়, পলটু এক লাফে উঠে পড়ত। এবং সে তার বাবাকে খুঁজতে বের হতো।

এসব জেনেও বড়বৌর পলটুকে কেন জানি বার বার বলতে ইচ্ছা হয়, তুই তোর বাবাকে দেখে না রাখলে কে রাখবে? তোর বাবার জন্য কষ্ট হয় না পলটু? তুই আমার একমাত্র ছেলে! তুই আমার দুঃখ বুঝবি না?

মার এমন চোখ-মুখ পলটু সহ্য করতে পারে না। সে ভয়ে তাকাচ্ছে না। যত কষ্ট মার এই চোখে-মুখে। কেমন দুঃখী মুখ নিয়ে মা মাঝে মাঝে তার শিয়রে বসে থাকে। তখন সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। বাবাকে সে খুঁজতে বের হয়। কাউকে সে কিছু বলে না। কেউ যদি ওকে জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুর তুমি এই জঙ্গলে। অথবা মাঠে। সে বলে, এমনি। সে যে তার বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছে কিছুতেই কাউকে বলবে না। বরং সে নিজে, যত জায়গা আছে, যেখানে যেখানে তিনি বসে থাকতে পারেন, সব জায়গায় ভীষণ

ছুটোছুটি করেও যখন খুঁজে পায় না, তখন এক অসহ্য অভিমানে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে কাঁদে। যেন তার বলার ইচ্ছা, বাবা, তুমি এটা বোঝ না কেন, তোমার জন্য মা চোখ-মুখ বুজে সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে। তুমি ভালো হলে আমাদের কোনও দুঃখ থাকত না।

আর সোনা যদি খুঁজতে বের হয় তার পাগল জ্যাঠামশাইকে তখন সে সবাইকে জিজ্ঞাসা করবে, কই গ্যাছে দ্যাখছেন? আমার জ্যাঠামশয়রে দ্যাখেন নাই? সকাল থাইকা বাড়ি নাই।

—না রে ভাই দ্যাখি নাই।

সোনা লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। বাড়ি-বাড়ি সে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায় কখনও কখনও কেউ খবর দেয় তিনি বসে আছেন ট্যাবার পুকুরপাড়ে। তখন সোনা এমন ছুটতে থাকে রোদ মাথায় করে যে কে বলবে এই ছেলে সোনা। ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলে, কোথায় যে এখন যাচ্ছে কেউ টের পাচ্ছে না। কেবল জানে সে যেখানেই যাক, যাচ্ছে পাগল মানুষকে খুঁজে আনতে।

আর যদি পলটু খুঁজতে বের হয় মনে হবে, সে বাড়ি থেকে না বলে না কয়ে বের হয়ে এসেছে। একা একা বনে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন উদ্দেশ্য নেই। কেবল কাজে ফাঁকি দেবার জন্য, অথবা পড়াশোনা না করার জন্য সে বাড়ি বাড়ি হেঁটে যাচ্ছে। কেবল একজন মানুষ বুঝতে পারে পলটু যাচ্ছে তার বাবাকে খুঁজতে, সে কিছু বলে না, কেবল খুঁজে বেড়ায়। সে হচ্ছে ঈশম। সে তখন বলবে, কর্তা না জিগাইলে পাইবেন কি কইরা?

—কারে জিগামু?

—যারে সামনে পাইবেন তারেই।

পলটু তখন কোনও জবাব দেয় না। সে তার বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছে টের পেলেই সে যেন সকলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। পলটুর মুখ দেখলেই তখন টের পাওয়া যায় বাবার জন্য সেও কম দুঃখী নয়। সে কোনও কথা না বলে কেবল হাঁটে। এই মাঠে-ঘাটে সে চুপচাপ বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় তার বাবা ভালো হয়ে গেছেন। তিনি বারদির স্টিমার ঘাটে এসে নেমেছেন। কত লটবহর। মার জন্য ট্রাঙ্ক ভর্তি শাড়ি এনেছেন। ধনকাকীমার জন্য সুন্দর ছাপাশাড়ি, সোনা লালটুর দামি প্যান্ট জুতো এবং সঙ্গে দু'জন দারোয়ান, ওরা পলটু কে কাঁধে তুলে নিয়েছে। সাহেবের ছেলে, ওরা ওকে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। অথবা ওর মনে হয় এক রাতে জেগে গেলে সে দেখতে পাবে বাবা বলছেন, আমি কলকাতায় যাচ্ছি চাকরি করতে। তোমরা ভালো হয়ে থেকো। সে, ঈশমদা, সোনা, লালটু সবাই মিলে বাবাকে নদীর চর পার করে দিয়ে আসবে। বাবাকে স্টিমারঘাটে তুলে দিয়ে আসবে। বাবা রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে

ওদের বিদায় জানাবেন। স্টিমারটা মাঝ গাঙে ভেসে গেলে, বাবাকে যখন আর সে দেখতে পাবে না, তখন সকলের অলক্ষ্যে ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে।

মার চোখ-মুখ দেখে পলটু কেমন বিরক্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। বড়বৌ এখন আর কাউকে বলতে পারে না, বিশেষ করে শচীন্দ্রনাথ অথবা চন্দ্রনাথকে, একবার দেখুন তো মানুষটা এত সাতসকালে যে কোথায় গেলেন! বরং নিজেরই কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। কে তার জন্য এত করবে। পলটু বড় হয়েছে। লালটু বড় হয়েছে। সে এখন ওদের পিছু-পিছু ঘোরে। লালটু জ্যেঠিমার এই দুর্বলতা বোঝে। মাঝে মাঝে সে তার পরিবর্তে নারকেলের নাড়ু চায়। তিলের নাড়ু, তক্তি এসব চায়। সে কাজের পরিবর্তে এসব না পেলে জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে যায় না। সোনাকে সব সময় পাঠানো যায় না। সে ওদের মতো বড় হয়নি। একবার পাঠালে কিছুতেই আর আবিষ্কার না করে ফিরবে না। একবার সারাদিন ঘুরে ওর চোখ-মুখ বসে গিয়েছিল। দুপুরে খোঁজ পড়লে ভয়ে ভয়ে বড়বৌ বলতে পর্যন্ত পারেনি সে তাকে পাঠিয়েছে পাগল মানুষটাকে খুঁজতে। বিকাল হয়ে গেছিল সোনার ফিরতে। তার কি ভয়! ফিরে এলে চুপি চুপি বলেছিল, তুই কিন্তু বলিস না সোনা, তোর জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গিয়েছিলি।

সে বলেছিল, বলব না জ্যেঠিমা।

আর সোনা কেন জানি সেই দিন থেকেই দুটো-একটা মিথ্যা কথা বললে কিছু হয় না এমন ভেবেছিল। বাবা বলেছে তাকে, বিদ্যাসাগরমশাইর মতো হতে হবে। সদা সত্য কথা বলিবে। ওর কেন জানি মনে হয় বিদ্যাসাগরমশাই সারা জীবন সত্য কথা বলেননি। কেউ সারা জীবন সত্য কথা বলে না। ঠাকুরদা সারাজীবন সত্য কথা বলেছিলেন এও তার বিশ্বাস হয় না। সে তো নিজে অনেক কিছুই গোপন করেছে মায়ের কাছে। সে তো কত কিছু শিখে ফেলেছে। মা তার মুখ দেখে কী করে টের পাবেন, মাঝে মাঝে রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। অমলা কমলাকে স্বপ্নে দেখলে ঘুম ভেঙে যায়। শরীরে কেমন যেন একটা কষ্ট হয় তখন। সেকথা মাকে সে বলতে পারেনি। বিদ্যাসাগরমশাই তাঁর মাকে অনেক কিছু বলতে পারেননি। এসব কথা মাকে তো বলা যায় না, মায়ের কাছে এসব গোপন রাখতে হয়। তিনিও গোপন রেখেছিলেন। কেউ সারা জীবন মিথ্যা কথা না বলে থাকতে পারে না। সেও পারবে না। জ্যেঠিমার জন্য মিথ্যা কথা বলে কোনও অনুশোচনা তার হয়নি। বরং একটা কাজের মতো সে কাজ করেছে। মা আজকাল বড় জ্যেঠিমাকে কেন যে অযথা এই নিয়ে হেনস্তা করে। তাকে পাঠালেই মা রাগ করে।

যেন এটা নিয়ম হয়ে গেছে সংসারে, কেউ তো আর বসে নেই। একজন পাগল মানুষের সঙ্গে সবসময় কে আর ঘুরে বেড়াবে! সোনা এসব বোঝে বলেই সে যখন যায় চুপি চুপি বের হয়ে যায়। এমনকি কোনও কোনওদিন সে জ্যেঠিমাকে বলে যায় না। সে ফিরে এলে নানাভাবে প্রশ্ন করে মা। কোনও জবাব না দিলে ছোটকাকাকে বলে মার খাওয়ায়। সে তখন জেঠিমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

বড়বৌ তখন বলল, দ্যাখ, তোর ঠাকুরদার শ্মশানে বসে আছেন কিনা!

পলটু ঘুরে এসে বলল, মা অর্জুন গাছের নিচে নাই।

বড়বৌর ছেলের এমন কথায় কান্না আসছিল। গাছের নিচে নেই, না থাক, অন্য কোথাও হাঁটছেন তিনি। মাঠে নেমে খোঁজ করলেই হবে। কিন্তু পলটুর ভিতরে যে কি রাগ বাপের ওপর সে বোঝে না। কিছুতেই সে বলল না, মা বাবা অর্জুন গাছের নিচে নেই। বলল শুধু নেই। তোর অভিমানের এত কি আছে! আমি সারাজীবন এমন একজন মানুষকে নিয়ে ঘর করলাম, আমার কোনও নালিশ নাই, আর যত নালিশ তোদের। তুই এত স্বার্থপর পলটু?

—তবে দেখ টোডারবাগের বট গাছটার নিচে বসে আছেন কিনা।

সে আবার বের হল। আজ পড়তে হবে না। সে ভেবেছিল, ঘুম থেকে বেলায় উঠবে। বেলায় উঠে ঠাকুরদার শ্মশানের চার পাশটা সাফ করবে। সেখানে ধনকাকা বলেছে একটা তুলসীগাছ লাগাবে। সে এবং বাড়ির আর যারা আছে তাদের নিয়ে একটা বড় তুলসীমঞ্চ করবে। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় আলো দেবার কথা। এখন এমন একটা কাজ ফেলে তাকে যেতে হচ্ছে টোডারবাগের বটগাছটার নিচে। সে বলল, এবারই শেষ। আমি আর যেতে পারব না।

কুয়াশা তখন কেটে যাচ্ছিল। ক্রমে হাল্কা রোদ উঠছে।

বড়বৌ ঘাটে স্নান করার সময় দেখল পলটু ফিরে আসছে। সে এসে বলল, না নেই।

বড়বৌর ভিতরটা আবার হাহাকার করতে থাকল। সে কিছুতেই যেন স্থির থাকতে পারছে না। বুকের ভিতরটা এমন কেন করছে সে বুঝতে পারছে না।

স্নান সেরে এসে বড়বৌ একটা লালপেড়ে শাড়ি পরল। চুল ভিজা। কপালে এ ক'দিন সিঁদুর দিতে নেই বলে আর আয়নার সামনে দাঁড়াল না। তা'ছাড়া অশৌচের সময় আয়নায় মুখ দেখতে নেই। সে, বড়বৌ বলে, তাকে হবিষ্যান্নের আয়োজন করতে হবে। এত করে মানুষটাকে বলেও সে ঘরে রাখতে পারল না। বাসি ফলমূল যা বের করে দিয়েছিল, তা সবাইকে ডেকে ডেকে ভাগ-ভাগ করে দিয়ে দিল। ঘরের এক কোনায় তিনটে কচার ডাল পুঁতে রাখল। কাজগুলি যত সে নিবিষ্ট মনে করবে ভাবছে, অথচ তত পারছে না। ভিতরটা কেবল তার ছটফট করছে। এবং মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা খালি করে শ্বাস নিচ্ছে। মনে হচ্ছিল তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমন যে কেন হচ্ছে! সে একবার ঘরের বাইরে এল, দেখল শশীভূষণ লালটু পলটুকে নিয়ে পুকুর পাড়ে যাচ্ছেন। এবং এই ফাঁকে সে একবার ধনবৌর ঘরে ঢুকে কপালে হাত রাখল সোনার। মনে হয় জ্বরটা কমে গেছে। কপালে হাত রাখতেই সোনা চোখ মেলে তাকাল। তারপর তাকিয়ে

দেখল, ওর শিয়রে জ্যেঠিমা দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যেঠিমার এমন চোখ দেখলেই সোনা টের পায় জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই।

সে বলল, আমি ভালো হয়ে নিয়ে আসব।

বড়বৌ বলল, তুই এখন ঘুমো। উনি ঠিক চলে আসবেন।

বড়বৌ জানে তিনি চলেও আসতে পারেন। প্রায় সময় তো নিজেই ফিরে আসেন। কোনও কোনওদিন ফিরে না এলেই কষ্ট হয়। আগের চেয়ে তিনি ভালো হয়ে গেছেন। প্রায় তিন সালের ওপর তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথাও দু'একদিনের বেশি থাকেন না। যদি কেউ সেদিন খুঁজে না পায় পরদিন সকালে অথবা দুপুরে তিনি ফিরে আসেন। খুব ক্ষুধা লাগলে আখের দিনে আখ, আনারসের দিনে আনারস মাঠ থেকে তুলে খান। সুতরাং মানুষটাকে কেউ ডেকে না আনলেও যখন ফিরে আসেন, তখন ব্যস্ততার কী আছে এমন ভাবে সংসারের অন্য সবাই। কেবল বড়বৌ জানে যত তার বয়স বাড়ছে, তত এই মানুষের জন্য তার মায়া বেড়ে যাচ্ছে। সে কিছুতেই আজকাল আর দু'দণ্ড চোখের আড়াল করতে পারে না তাঁকে।

কী যে ভুল হয়ে গেল! লজ্জার মাথা খেয়ে কেন যে সে তাকে খেতে দিল না! এখন তো সংসারের সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে, যারা আত্মীয়-স্বজন এসেছে, তারা দু'একবার খবর নিয়েছে, পাগল মানুষ সম্পর্কে, তাদের কোন মায়া-মমতা নেই। এত লোক বাড়িতে অথচ কেউ একবার মুখ ফুটে বলছে না, যাচ্ছি আমি খুঁজে আনতে।

বড়বৌ বলল, কি খাবি সোনা?

—মা বার্লি করতে গেছে।

—তা হলে বার্লি খা।

—ভাল লাগে না জ্যেঠিমা।

—একটা কমলালেবু দেব। পেট ভরে বার্লি খেলে একটা কমলা পাবি।

—সত্যি?

—সত্যি। তুই যা দেখালি কাল! বলতেই সোনা কেমন আবার মুখ কালো করে ফেলল। সে তার দুঃস্বপ্নের ভিতর দেখেছে সেই অশরীরী যেন কার পিছনে কেবল ছুটছে। সে বলল, জ্যেঠিমা, জ্যাঠামশয়কে কেউ খুঁজতে যায় নাই?

—পলটু গিয়েছিল। পায়নি।

—জ্যাঠামশাই কোনদিকে গেছে কেউ দেখে নাই?

—না। খুব কুয়াশা ছিল, কেউ লক্ষ করেনি।

সোনার মনে হল তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাওয়া উচিত। সে কেমন অবোধ চোখ নিয়ে তাকাল। বলল, আমি কবে ভাত খামু জ্যেঠিমা?

—জ্বর ছাড়লেই ভাত খাবে।

—এখন কত জ্বর হবে! বলে সে মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে জ্যেঠিমার দিকে তাকাল।

—দাঁড়া দেখছি। বড়বৌ থারমোমিটার বের করল, ঝেড়ে নামালো তারপর বগলের ভিতর দিয়ে সোনার পাশে চুপচাপ বসে থাকল।

সোনা বলল, জ্যেঠিমা, আমি কাল ভাত খাব?

—না। কাল তোমাকে ভাত দেওয়া হবে না! যদি আজ জুর না থাকে, তবে পরশু ভাত পাবে।

—আমার তো কিছু হয়নি। ভয় পেয়ে গেছিলাম।

—কেন এমন ভয় পেলি?

—জানি না। কী যে হল, কী যে দ্যাখলাম শ্মশানে!

—-এ-সব মিথ্যা।

—কী?

—এই যে কাল তুই দেখলি।

—না জ্যেঠিমা সত্যি।

—চোখের ভুল।

—মাস্টারমশায় পর্যন্ত দেখল।

—চোখের ভুল।

—একসঙ্গে দু'জনের চোখের ভুল কী করে হবে?

—হয় বাবা। হয়। দেখি। বলে থারমোমিটার বের করে চোখের ওপর তুলে ধরল। জ্বর এখনও বেশ আছে।

সোনা বলল, কত?

জ্বর বেশ আছে বললে, সোনার মন খারাপ হবে। বড়বৌ এই ভেবে বলল, বেশি নেই। খুব অল্প। মনে হয় বিকেলের দিকে জ্বর রেমিশান হবে।

সোনা জ্বর আছে জেনেই উঠে বসল। —দেখি কত জ্বর।

বড়বৌ ততক্ষণে থারমোমিটার ঝাঁকাতে শুরু করেছে। সে বলল, এই দেখ।

—আটানব্বই তিন পয়েন্ট। সোনা থারমোমিটার দেখতে দেখতে বলল।

আরও বেশি জ্বর। কিন্তু সোনা সঠিক জ্বর দেখতে পেল না। ওর কেমন এখন ভালো লাগছে। কেবল মাথাটা একটু ভারি। সে বলল, আমি আর শোব না। বারান্দায় বসব।

বড়বৌ বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার পেতে দিল। ঘরের ভিতর শুয়ে থাকলে কিছু ভালো লাগে না। বারান্দার চারপাশ খোলামেলা, আত্মীয় কুটুমে ভর্তি, পাখ-পাখালিও কম না—সে একা একা শুয়ে থাকলে সব পাখির ডাক আলাদা আলাদা চিনতে পারে। গাছের কোন ডালে অথবা পাতার আড়ালে এবং কত দূরে সব ঘুঘু পাখির ডাক অথবা ডাহুক পাখিরা যে পুকুরের জলে এখন কীটপতঙ্গ খেতে খেতে ডাকছে সে এই বিছানায় শুয়ে থাকলেও তা ধরতে পারে। তার কেবল মনে হচ্ছিল বাইরের পৃথিবীতে অনন্ত সুখ। অযথা তাকে এই বেলা পর্যন্ত জোর করে ঘরের ভিতর আটকে রাখা হয়েছে।

ধনবৌ বারান্দায় এলে বলল, মা আমার জ্বর নাই। জ্বর আমার আটানব্বই তিন পয়েন্ট। জ্যেঠিমা থারমোমিটারে দ্যাখছে!

ধনবৌকে বড়বৌ ইশারায় কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সোনার গায়ে রোদ নেই। টিনের চালে রোদ। সে আজ ভাত খেতে পাবে না। জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই। বাবা, মেজ জ্যাঠামশাই দক্ষিণের ঘরে কিসের ফর্দ তৈরি করছেন। ছোটকাকা ঈশমকে পাঠিয়েছেন বড় ঘোষকে ডেকে আনতে। দাদা বড়দা ঠাকুরদার শ্মশানের চারপাশটায় যত আগাছা আছে কেটে ফেলছে। সে এই বারান্দায় বসে সব খবরই পাচ্ছে, সে কেবল এমন দিনে উপবাসী এবং কিছু খেতে পাবে না। সে হাতে একটা হলুদ রঙের কমলা নিয়ে বসে রয়েছে। ছোট বোনটা তার বারান্দায় ফ্রক গায়ে ঘুরছে ফিরছে। দাদার অসুখ এই ছোট্ট মেয়ে কী করে বুঝবে। সে একবার দাদাকে খামচে দিয়ে গেছে। এবং কমলা কেড়ে নিয়ে ছুটছে রান্নাঘরে।

তখন পাগল মানুষ ছুটছেন হাসান পীরের দরগায়।

তখনও ফেলু শেখ হাঁটছে।

ক্রমান্বয় এই হাঁটা। কে কোথায় যায়, কী যে করণীয় এই ধরণীতে যেন জানা নেই। আক্রোশের বশে হাঁটা। কার বিবি এখন কার ঘরে। ধরণীতে ফুল ফোটে। মানুষের আহার

নিমিত্ত বাঁচা। এই বাঁচার জন্য সংগ্রাম। দান দয়াশীল, ধর্ম বড় বেমাফিক কথাবার্তা। সব নিজের জন্য নিজে করে যাচ্ছ মিঞা। তা মিঞা তুমি একখানা মানুষ বটে! তোমার শরীরে এত দুর্গন্ধ, তবু মিঞা তোমার বাছুরটার নিমিত্ত প্রাণে কষ্ট। কারণ কি? কারণ ধর্ম। কারণ ইজ্জত। তা কী যথার্থই বাছুরটাকে কোরবানী দিয়া আল্লার বেহেস্তে একটু জায়গা করে নিতে চাও!

আর জ্যোৎস্না রাতে এত অন্ধকার কেন! চারপাশে মৃত্যুর বিভীষিকা। আকাশে এক প্রবল প্রতাপান্বিত মোষের মতো কালো মেঘ গর্জাচ্ছে। বিদ্যুতের শিখা আকাশকে মাঝে মাঝে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। কড়কড় করে কোথাও বজ্রপাত হল। পাগল মানুষ টের পাচ্ছেন না মৃত্যু তাঁর পিছনে এসে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। তিনি পলাশ গাছের নিচে বসে নিভৃতে তখনও কীটসের কবিতা আবৃত্তি করছেন।

বিদ্যুতের আলোয় ওঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল। বড় সরল এবং অমায়িক মুখ। সারাদিন কিছু খান নি। গতকাল বাতে হবিষ্যান্ন করার কথা, তা পর্যন্ত করেননি। চোখেমুখে শুকনো একটা ভাব! ম্লান জ্যোৎস্না ছিল প্রথম রাতের দিকে। তিনি, ওরা কেউ আসবে খুঁজতে, এই আশায় বসে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এখন জেগে গেছেন। কেউ আসেনি। ঈশান কোণে সেই কালো কঠিন মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কোথাও আর বিন্দুমাত্র আলো নেই। আকাশে কোনও নক্ষত্র জ্বলছে না। বিদ্যুৎ চমকালেই ওঁর মুখ দেখা যাচ্ছে। বিষণ্ণ মুখ। কবিতার ভিতর কী যে এক জাদু অথবা বলা যেতে পাবে মায়া আছে, যার আবৃত্তিতে সব গভীর দুঃখ ভিতর থেকে মুছে যায়— আহা, এমন সুন্দর সাবলীল এবং ভরাট সৌন্দর্য নিশীথে দেখা যায় না। প্রায় দেবদূতের শামিল তিনি পলাশ গাছের নিচে কুশাসনের ওপর দু'পা ছড়িয়ে বসে রয়েছেন। আকাশের ঘনঘটা দেখে সামান্য হাসছেন। ধরণীর এত উত্তাপ, ক্রমে অঝোরে বৃষ্টিপাত ঘটলে কমে যাবে। তখন ফেলু দেখে ফেলেছে তাঁকে। এমন একটা সময়ে হাতের কাছে সেই জীব চলে আসবে ফেলু কল্পনাই করতে পারেনি। ফেলুর নিষ্ঠুর মুখ দেখলে আত্মা উবে যাবে। চোখ-মুখ ওর দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে এত বেশি গাছপালা এবং অন্ধকার যে তাকে দেখা যাচ্ছে না। কেবল দেখা যাচ্ছে একই জায়গায় সরল বৃক্ষের মতো মৃত কাঠে কিছু জোনাকি জ্বলছে নিভছে। সচল জোনাকির একটা মৃত কাঠ মনে হয় ফেলুকে। এখন অন্ধকারে সে ঘোরাফেরা করছে। সে এসেছিল এখানে আকালুর খোঁজে। আকালু কোনও ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে, অথবা ওর তো অনেক লোক হাতে। লোকলজ্জার ভয়ে সে এখানে আছে, খাবার দিয়ে যায় কেউ। ফেলু এসেই এমন একজন মানুষকে গাছের নিচে বসে আছে দেখতে পাবে— ভাবতে পারেনি। তার এখানে আসতে আসতে বেশ রাত হয়ে গেছে। কারণ সে নানা বর্ণের ছবি ঝুলিয়ে রেখেছিল শরীরে। সে গ্রামে গ্রামে যত গরিব দুঃখীজন আছে তাদের বলে এসেছে, আমাদের কেউ নাই। আপনেরা সাক্ষী থাকলেন, আকালু আমার বিবিবে নিয়া ভাগছে। আমি খোঁজ পাইলে অর মুণ্ডু ছিড়া ফালামু।

তার যে কোনও কসুর থাকবে না, সে দুঃখী ফেলু, সে এ বাদে আর কিছু জানে না, কবরের সময় তার সব দুঃখের কথা ভেবে যেন সে ইবলিশ কি মানুষ এটা ঠিক করা হয়। কেয়ামতের দিনে অন্তত দুঃখীজনেরা যেন আল্লার কাছে সাক্ষী থাকে—সে ইবলিশ ছিল না, সে মানুষ ছিল। সে তার বিবিকে খুব ভালোবাসত। অভাবে অনটনে বিবিকে সে ভাত দিতে না পারলে কষ্ট পেত। বিবি তার জানের মতো। সেই জান নিয়ে আকালু পালিয়েছে।

সে এখানে এসে ভেবেছিল আকালুকে পাবে। পাবার কথা নয়, কেন আকালু আসবে বনেবাদাড়ে! সে তো সোজা স্টিমারে উঠে চলে গেছে। তার এখন ময়ফেল শহরে। সে কিছুদিন রমনার মাঠে বিবিকে বোরখা পরিয়ে ঘুরাবে। শহর দেখাবে, সদর-ঘাটে র কামান দেখাবে। সে কেন মরতে আসবে হাসান পীরের দরগায়! কিন্তু হলে হবে কী, ফেলুর এত দূরে যাবার পয়সা নাই। সে শহরে যাবার আগে সব গ্রামগঞ্জ খুঁজে যাবে। যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে সে যাবে।

তার কারণ এখন ফেলু আর ফেলু নেই। মাথায় তার গণ্ডগোল। কেবল মনে হয়, তার বিবি আর আকালু বনেবাদাড়ে ঘুরে মরছে। বিবি তার আস্ত একটা মুরগি বনে গেছে। আকালু ঝুঁটিয়ালা মোরগ। বনের এক প্রান্ত থেকে মুরগি ডেকে উঠছে, অন্য প্রান্তে মোরগ ডাকছে ককর অ কো। মাঝখানে বুঝি বসে আছে এই পাগল মানুষ। পাগল মানুষ ফেলুর কাছে এখন আর একটা মোরগ হয়ে গেছে।

পলাশ গাছের অন্ধকারে বোঝাই যাচ্ছে না একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসছে। উত্তেজনায় ফেলুর হাত-পা কাঁপছে। উত্তেজনায় উন্মত্ত ফেলু কী যে করতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না।

পাগল মানুষ দেখলেন অন্ধকারে একটা ইস্পাতের ফলা ভেসে ভেসে এদিকে চলে আসছে। চারপাশে তার জোনাকি। অন্ধকারে কিছুই চেনা যাচ্ছে না। সব কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য এসব হচ্ছে। তিনি ভয় পাবেন কেন! তিনি আর সেদিনের মতো ভয় পাবেন না। কাটা মুণ্ড সুতোয় ঝুলিয়ে রেখেছিল ঈশ্বর। তাকে ভয় দেখাবার জন্য তিনি এসব করেছিলেন। ঈশ্বরের কাণ্ডকারখানা বোঝা দুষ্কর। বড় গোজামিলের ব্যাপার। তিনি সেজন্যে মনে মনে হাসলেন। তারপর চোখ বুজে ফের কবিতা আবৃত্তিতে মন দিলেন।

ইস্পাতের ফলাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তো আসছেই। একটা ব্যাঙ তখন গর্ত থেকে ক্লপ ফ্লপ করে ডাকল।

একটা কাঠবিডালী তখন লাফিয়ে পড়ল মাথায়। কিন্তু মানুষটা বড় নিবিষ্ট কবিতা আবৃত্তিতে। তাঁর এখন কিছু খেয়াল নেই। কাঠবিড়ালীটা তাঁর গা বেয়ে ঘাসের ভিতর নেমে গেল।

বিকেলের দিকে সোনার জ্বর আবার বেড়ে গেল। ওর ভীষণ শীত করছিল। কম্প দিয়ে জ্বর আসছে। সে ভেবেছিল জ্বর না এলে কাল ঠিক জ্যেঠিমাকে ধরে দুটো ভাত খাবে। ভাত না খেলে কী যে কষ্ট! যেন সে কতদিন না খেয়ে আছে। মুখ বিস্বাদ। কেবল জল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। মাথা ধরেছে ভীষণ। মাথা ধরার জন্য সে খুব চিৎকার করছিল। জ্যেঠিমা এসে ওর মাথাটা কাপড়ে বেঁধে দিয়ে গেছে। খুব চাপ দিয়ে বাঁধা। বেশ তার আরাম বোধ হচ্ছে। সে এখন জানালা দিয়ে পালেদের ডুমুর গাছ দেখতে পাচ্ছে। ডুমুর গাছে সেই নীলবর্ণের পাখি। সে দেখে চোখ বুজে ফেলল। কারণ কেবল মনে হচ্ছে এই অসুখে যদি সে মরে যায়। আর ভালো না হয়। তবে সেই নীলবর্ণের পাখিটার সঙ্গে আর একটা ডালে গিয়ে বসবে। তাকে কেউ আর দেখতে পাবে না। সে সব দেখতে পাবে—এবং দেখেও মাকে বলতে পারবে না, মা আমি গাছের ডালে বসে আছি। কারণ, এমন বললেই মা তাকে ভয় পাবে। সে তো আর সোনা থাকবে না, সে মায়ের কাছে তখন একটা অশরীরী আত্মা হয়ে যাবে। এসব ভাবলেই তার কষ্টটা বাড়ে। সে যেন দেখতে পায় সে মরে গেছে মা তার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদছে। সে একটা নীলবর্ণের পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। তার শরীরটা উঠোনে ফেলে রেখেছে অথবা ঠাকুরদার পাশে আর একটা চিতা জ্বলছে, সেই চিতায় ওর এমন নরম শরীর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ধনবৌ কী একটা কাজে ঘরে এলে সোনা বলল, মা জানালাটা বন্ধ কইরা দ্যাও।

—ক্যান রে।

—আমার ভয় করে।

ধনবৌ বুঝল সোনার ভয় কাটেনি। সে জানালা বন্ধ করে দেবার সময় বলল, কোন ভয় নেই। ঠাকুরদা তোমার মরে গিয়ে স্বর্গে গেছেন। সেখান থেকে কেউ কখনও ফিরে আসে না।

—আচ্ছা মা, আমি মরে গেলে ঠাকুরদার সঙ্গে আমার দেখা হবে?

ধনবৌর বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। বলল, এমন বলতে নাই।

—আচ্ছা মা, তুমি কাঁদবে আমি মরে গেলে?

—জানি না।

সোনা বুঝল সে মাকে রাগিয়ে দিচ্ছে। সে বলল, মা, বড় জ্যাঠামশায় আসেন নাই?

—না।

—কেউ গেছে খুঁজতে?

—না।

—ঝড় উঠবে, না মা? আকাশটা কি কালো!

—চুপচাপ শুয়ে থাক। কথা বলো না।

সোনা কাঁথার ভিতর মুখ টেনে নিল। সে সারা গায়ে কাঁথা টেনে চুপচাপ শুয়ে থাকল। মাথার কাছে জল। ঘরের চারপাশে ট্রাঙ্ক, কাঠের আলমারি। উপরে কাঠের সিলিঙ। অন্যদিন এঘরে শুয়ে থাকলেই একটা পরিচিত গন্ধ পায়। কিন্তু আজ সে কেমন একা পড়ে গেছে। বড় জ্যাঠামশাই বাড়ি থাকলে ওর শিয়রে হয়তো এখন বসে থাকত। সে এমন জ্বরের ভিতরও জ্যাঠামশাইর জন্য কেমন ছটফট করছে। ভেবেছিল তার জ্বর সেরে যাবে। সে তবে খুঁজতে যেতে পারত। কিন্তু আবার কম্প দিয়ে জ্বর আসায় তার কান্না পাচ্ছিল। মা ঘরে নেই। সে তার ছোট বোনের নাম ধরে ডাকতে থাকল!

বোনের সে সাড়া পেল না। মাথা থেকে কাঁথা সরিয়ে সে উঠোনের দিকে মুখ ফেরাল। নানা কাজে সবাই ব্যস্ত। সে দেখল হেঁটে হেঁটে হারান পালের বৌ চলে গেল। যাবার আগে উঁকি দিল দরজায়, কি গ, কর্তা, কেমন আছেন? সম্মান্দির জ্যেঠিমা এসেছেন। তিনি চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। ঠাকুমা বোনকে কোলে নিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। সে ডাকলে শুনতে পাবে না বলে ডাকল না। কেউ তার কাছে আসছে না। ওর কষ্ট হচ্ছে। বাইরের পৃথিবী তার কাছে কী সুন্দর এখন, সে এই ঘরে চুপচাপ শুয়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে, পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের কী অনন্ত সুখ, সে কেবল একা দুঃখী মানুষ এই ঘরে অসুখে কষ্ট পাচ্ছে। এবং রাতের দিকে তার কেমন শ্বাসকষ্ট হতে থাকল।

আর এক দুঃখী মানুষ তখন ফেলুর পায়ের তলায়। হাসান পীরের দরগাতে তখনও একটা শকুন আর্তনাদ করছে। মরা পলাশের ডালে কিছু শকুনের চোখ নিচের দিকে। চোখ মেলে তাকাচ্ছে। এক অতিকায় মানুষ পায়ের নিচে পড়ে আছে ফেলুর কেমন চুপচাপ অসীম নীরবতা চারপাশে। ফেলু মুখটা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকালে সে মাঝে মাঝে দেখতে পায়, চোখদুটো খোলা। গলা কাটা, চারপাশে রক্তপাত, এবং বৃষ্টি পড়ছে একফোঁটা দু'ফোঁটা। কড়াৎ করে মেঘ ফেটে গেলে সে দেখতে পেল

জলের প্লাবন নেমেছে এই পৃথিবীতে। পাতা থেকে জল পড়ছে। সবুজ পাতা থেকে নির্মল জল গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। ফেলু সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখতে পাচ্ছে, এক হাতে ষণ্ডের গলা সে জবাই করেছে। তার কাছে মানুষটা ঠিক হাজিসাহেবের খোদাই ষাঁড়টার মতো। সে এতটুকু মায়া বোধ করল না। সে এমন কী হাহা করে হাসতেও পারল না। পায়ের নিচে ষণ্ড পড়ে আছে। গভীর রাত। এবং চারপাশে কোনও লোকালয় নেই বলে, সে জানে এখানে আর কে আসে! তার ভালো লাগছিল। হাতি তার হাত ভেঙে পার পেয়ে গেল। জালসা ভেঙে দিল। কেউ কিছু বলতে পারল না। ভাঙা মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ পেল না— সেই এক মানুষ ভূপেন্দ্রনাথ, সবাই ভয় পায়, এখন কে তোমারে রক্ষা করে! বলে সে পা দিয়ে মুখটা মাড়িয়ে দিল। শক্ত হয়ে গেছে। ঘাড়টা শক্ত। মুখ হাঁ করা। কত অনায়াস সে পিছন থেকে গলাতে নিমেষে পোঁচ মেরে দিয়েছিল। ঠিক হালার জবাই করা য্যান একটা মুরগি। টেরও পেল না মানুষটা, পিছনে তার দুশমন। চোখের পলকে গলা হ্যাৎ করে দিল। দিল কী দিল না, সে চাকুটা কত অনায়াসে টেনে দিয়ে আবার লুকিয়ে পড়েছিল। অন্ধকার এত তীব্র, এত ঘন যে সে দেখতে পেল না ঠাকুরের মুখটা ব্যথায় কতটা নীল হয়ে যাচ্ছে। সে কেবল দেখল যেন একটা জবাই করা মুরগি উড়ে উড়ে বনের ভিতর লাফাচ্ছে।

আকাশে এত যে মেঘ, এবং এমন যে বৃষ্টি এবং গাছপালা অঝোরে ভিজছে, বাতাসে ঝড় আর ডালপালা ভেঙে পড়ছে চারপাশে, ফেলু খেয়াল করতে পারছে না।

জল পড়ছে বলে একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। নানা রকমের কীট-পতঙ্গ এখন ডাকছে। কী বিচিত্র তার আওয়াজ। ফেলু কান পাতল। ভাঙা পাঁচিলে সাপের গর্ত থাকতে পারে, সেখানে সাপেরা যেন হিসহিস করছে। এমন প্রচণ্ড উত্তাপের পর এই জল সব পথঘাট ভাসিয়ে দিচ্ছে। সাপেরা

এবার বের হয়ে পড়বে। ওর এবার যথার্থ ভয় করতে থাকল। শকুনের সহসা আর্তনাদে ফেলু বলল, কর্তা আমারে ডর দ্যাখায়! আমার নাম ফেলু। শকুন আমারে ডর দেখায়!

মনে হল এবার কে যেন এই বনে হাসছে।

ফেলু বলল, কেডা হাসে?

আবার হাসে।

ফেলু বলল, আমার নাম ফেলু। তিন খণ্ডের এক ষণ্ড শেষ। আর আছে দুই ষণ্ড। কিন্তু বড় যণ্ডটা যদি সিং বাগিয়ে রাখে তবে তার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। সে বলল, কেউ আপনারা আমার বিবিরে দেখেছেন?

নানা রকমের শব্দের ভিতর, কারণ, প্রথম বর্ষা নেমেছ, ধরণী শান্ত শীতল হচ্ছে, মাটির নিচে জল ঢুকে যাচ্ছে, নানারকম পোকা-মাকড় তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছিল এতদিন, এরা এই জল ওদের তৃষ্ণা নিবারণ করছে। ওরা আনন্দে ডাকছিল। তা'ছাড়া আছে কত জীব এই পৃথিবীতে আর অঝোরে বৃষ্টিপাতে জল নেমে যাবার শব্দ। সেই শব্দের ভিতর বড় বড় ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ছে! ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। কোনও ধূর্ত শেয়াল মৃতের গন্ধ পেয়ে চারপাশে হয়তো হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওদের পায়ের শব্দও উঠতে পারে। আর সব শুকনো ঘাস পাতা যা এতদিন শুকনো খড়খড়ে ছিল, তারা জল পেয়ে সব জল শুষে নিচ্ছে। মাটি জল শুষে নিচ্ছে। কতরকমের সব গর্ত মাটিতে। কত পোকা-মাকড় ভিন্ন ভিন্ন আবাস সৃষ্টি করে মাটির পৃথিবীতে বেঁচে আছে। তারাও জল শুষে নিচ্ছে। ফলে কী যে বিচিত্র শব্দ, সেই শব্দের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ পেলে ফেলুর আর দোষ কী! ওর মনে হচ্ছিল, কেউ হাসছে, আবার মনে হচ্ছে, হাসান পীরের দরগায় বসে কেউ কাঁদছে। সেই যে মরা অশ্বত্থ গাছ আছে, যেখানে সব শকুনের নিবাস, তারা এমন ঝড়ে কঁকিয়ে উঠতে পারে—সুতরাং ওর মনে হল, কেউ গাছের ওপরে উঠে গিয়ে শোকে আকাশফাটা আর্তনাদ করছে। কী যে মনে হচ্ছে না, সেই সব প্রাচীন গর্ত থেকে কিছু সা পখোপ বের হতে পারে. এখানে কোনও আলো জ্বলছে না যে সে দেখতে পাবে আলোর ভিতর আকালু আল্লুকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। সে পাগলের মতো চারপাশে এইসব বিচিত্র শব্দের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করে দিল। বলল, কারে ডর দ্যাখাও মিঞা? আমারে ডরাই না। দুনিয়ার এক আল্লা বাদে কারে ডরাই! এই বলে যেই না সে ভেবেছে এখান থেকে এবার ছুটে পালাবে, নয়তো ধরা পড়ে গেলে জেল ফাঁসি, তখনই মনে হল সে যেভাবে পোঁচ চালিয়েছে গলায়, এ পোঁচ যেন দারোগাসাবের চেনা। এমন আর হাতসাফ কার হবে! ফেলুর। সুতরাং ফেলুকে ধরার জন্য আবার দারোগা-পুলিশ। ঘায়ের ওপর ঘা। সে সেজন্য আর দ্রুত ছুটে নেমে যেতে পারল না! এই লাশ নিয়ে তার এখন ঝামেলা। সে এমন একটা লাশকে গায়েব করে না দিতে পারলে ওর এবার নির্ঘাত গলা যাবে। সে তাড়াতাড়ি ফের উঠে এল। জল পড়ছে তো পড়ছেই। নিবারণ হচ্ছে না বৃষ্টিপাতের। রক্ত জলে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। একবিন্দু রক্ত কোথাও লেগে থাকছে না। যা রক্ত এখনও গলাটা ওগলাচ্ছে, বৃষ্টির জলে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এবং এই ধরণী সব শুষে নিচ্ছে। সব কষ্ট যন্ত্রণা নিমেষে মুছে দিয়ে আবার ঘাস পাতা পাখি পোকা-মাকড় সব সজীব। লাশ তুলে নিলে কে বলবে এখানে কিছুক্ষণ আগে এক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে গেছে ফেলু।

বাগের ভিতর ঢুকে লাশটাকে সে যেখানে রেখে গেছে ঠিক সেখানে এসে ফের দাঁড়াল। পুব দিক ফর্সা হয়ে আসছে। সে বুঝল আর দেরি করলে চলবে না। সে তাড়াতাড়ি হাসান পীরের কবরের কাছে এগিয়ে গেল। বৃষ্টিপাতের জন্য জল চারপাশে। মাঠে জল জমে গেছে। খুব জোর বর্ষণের ফলে চারপাশটা খাল বিলের মতো হয়ে গেছে। কবরের ভিতর জল জমে গেছে। যে বড় শানটার নিচে হাসান পীরের কঙ্কাল এখনও পড়ে আছে, যেখানে পাগল ঠাকুর আসত মাঝে মাঝে, এবং বলশালী মানুষ বলে যে মাঝে মাঝে শান তুলে কথা বলত পীরের সঙ্গে, সেই শানের নিচে সে ভাবল চাপা দিয়ে রেখে দিলে

কেউ টের পাবে না। জল জমে গেছে কবরে। জলের ভিতর লাশটা পড়ে থাকবে। ওপরে শান চাপা। সুতরাং দু'দিন যেতে না যেতেই পচে মাটির সঙ্গে জলের সঙ্গে মিশে যাবে। এবং যেমন হাঁ করে হাসান পীরের কঙ্কালটা তাকিয়ে আছে ফেলুর দিকে, তেমনি পরে এসে সে একবার দেখে যাবে এই মানুষের কঙ্কাল কী খুবসুরত মুখ নিয়ে উকি দিয়ে থাকে। তখনই যে সে বলতে পারবে, আমার নাম ফেলু। হালার কাওয়া।

অর্থাৎ আমি মানুষ একখানা মিঞা। ভয় ডর নাই। সুখ সখ সব গেছে। বিবি আমার পলাতক। আমি মরেও মরি না। আমার বাঁচার বড় সখ। আমারে তোমরা কেউ বাঁচতে দিতে চাও না। আমার মরণ হাঁকবা ঠাকুর, তোমার কী আস্পর্ধা? আমি জানি তুমি আমারে হাতির পায়ের নিচে রাইখা মারতে চাইছিলা। পাগলা ঠাকুর! সে এবার একটা ঠ্যাঙ ধরে টানতে গিয়ে দেখল ভীষণ ভারি। তার এক হাতে কত আর শক্তি! সে এক হাতে টানাটানি করে লাশ এতটুকু হেলাতে পারল না। সে ডানদিকের পা টা ওর ডান বগলে ফেলে কপিকলের মতো আটকে দিল। তারপর টানতে থাকল। কিছুটা নড়ছে। নড়ছে! সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পাশেই জল জমে আছে। জলের ভিতর নিয়ে ফেলতে পারলে এত ভারি লাগবে না। এবং এই ভেবে সে টেনে সে লাশ জলের ভিতর ভাসিয়ে দিল। তারপর ঠেলে ঠেলে যেখানে সেই কবর এবং নানারকমের গাছগাছালির ছায়া সেখানে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে শানটা তোলার চেষ্টা করছে। ওর পক্ষে শান তোলা ভারি কষ্টকর। একমাত্র এ অঞ্চলে এই পাগল মানুষ পারতেন এত ভারি শান তুলে পীর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। আর কেউ পারত না। ফেলু এমন গল্প শুনেছে। সে তখন যথার্থ ফেলু, হা-ডু-ডু খেলোয়াড় ফেলু, তখন এমন বীরগাঁথা শুনে একবাব এই হাসান পীরের দরগায় চলে এসেছিল। অনেক চেষ্টা করেও বলশালী ফেলু দু'হাতে শানটা নাড়াতে পারেনি। আজ সে কীভাবে যে পারবে! তা'ছাড়া কী উপায়! আছে এক উপায়। কবরের উপর বৃষ্টির জল জমে প্রায় হাঁটুজল। জলের নিচে এখন শানটা পাতলা হবে খুব। ওকে খুশি খুশি দেখাল। সে বলল, আমার নাম ফেলু। হালার কাওয়া।

এক হাতে সে অনায়াসে লাশটাকে জলের ওপর ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিল। জল খুব অল্প। তবু যেখানে গর্তমতো জায়গা সেখানে খাল বিলের মতো জল। সে জলে টেনে এনে একেবারে ঠেলে ফেলে দিতেই ওর মুখ-চোখ শরীর সব কর্দমাক্ত হয়ে গেল। জোনাকিরা যা আটকে ছিল, মরে গেছে বোধ হয়। জলে ধুয়ে গেছে। সে আর জীব নেই। সে অশরীরী নয়। সে ফেলু। বার বারই তার মনে হচ্ছিল সে ফেলু। ফেলু শেখ।

শানটা তুলে কবরে ফেলে দিতেই মনে হল একদিকে ঠ্যাং বের হয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি জলের ভিতর ঠ্যাংটা ঢুকিয়ে দিল। পুব দিকটা এবার যথার্থই ফর্সা হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি লাফ মেরে মাজারের ওপাশে চলে গেল। সে এখানেও হাঁটু গেড়ে বসল। শানটা জলের ভিতর থেকে তুলল।

তারপর পা-টা ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে বুঝল আর কিছু পড়ে নেই। সব অদৃশ্য। কেবল সে একা জেগে আছে। আর গাছগাছালি। শকুনেরা উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু লাশটাকে শানের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া মানেই ওদের আহার থেকে বঞ্চিত করা। মনে হল, সেই রাজা শকুনটা এবার ফেলুকে তেড়ে আসবে। সে মাঠে নেমে গেলেই দলবল নিয়ে শকুনগুলি ওকে তেড়ে আসবে। সে এবার কিন্তু সত্যি ভয় পেয়ে গেল। গাছপালার নিচে থেকে সে বের হচ্ছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে। এবং গাছের ফাঁক দিয়ে উকি দিয়ে দেখছে সেই রাজা শকুনটা ওকে উঁকি দিয়ে দেখছে কি-না। এই দেখতে দেখতে সে দেখল পুবের দিকে সূর্য উঠে গেছে। গাছের নিচে সকালের রোদ। আকাশ একেবারে পরিষ্কার নীল। কেবল প্রথম প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন চষা জমিতে জল জমে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। সে হয়তো এই গাছের নিচে হাসান পীরের দরগায় আরও অনেকক্ষণ ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, কারণ, সেই এক ভয়, যেন মাঠে নেমে গেলেই শকুনেরা ওকে তাড়া করবে, যেমন এক দঙ্গল মাছি সব সময় ওকে তাড়া করছে, ওর ঘায়ের ওপর বসার জন্য ভনভন করে উড়ছে সঙ্গে সঙ্গে! যেখানে সে যায়, মাথার উপর সেই ভনভন করে মাছিদের ওড়া। সে কতদিন এই মাছি খপ করে ধরে ফেলে মেরে ফেলেছে। তালুতে চিপে প্রতিশোধের চোখে তাকিয়ে থেকেছে। ওর ঠিক এই মাছিদের মতো মনে হচ্ছে, এই শকুনেরা ওর দিকে এবার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসবে। এবং সে যেখানে যাবে, তাকে তাড়া করবে। এমন সব আজগুবি ভয় ওকে মাঝে মাঝে এমন পেয়ে বসে যে সে আর স্থির থাকতে পারে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। পাষাণের মতো কেবল দাঁড়িয়ে থাকে। সে হয়তো এই কবরে তেমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু সহসা ওর মনে হল সে তার বাগি গরুটার খোঁটা মাঠে পুঁতে দিয়ে এসেছে গতকাল সকালে। ওটা না খেয়ে আছে। এক খোঁটায় সে ঘুরে ঘুরে মরছে। অথবা হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। কেউ নাই তার। না আন্নু, না ফেলু কাছে। ভিতরে ভিতরে ফেলু গরুটার জন্য কেমন মমতা বোধ করল। সে তার নিজের জানের কথা মনে রাখতে পারল না। এই যে এখন এত শকুন মাথার উপর উড়ছে, মাঠে নেমে গেলেই তেড়ে আসতে পারে ভেবে সে যে নেমে যাচ্ছিল না মাঠে, এ সময় আর তা মনে থাকল না। সে বিহনে গরুর চোখ অন্ধকার। সে গতকাল বের হবার আগে গরুর চোখদুটো দেখেছে। দেখে ভুলতে পারছে না। একমাত্র পৃথিবীতে এই বাগি গরুটাই ওর ভিতরের দুঃখটা টের পেয়েছে। সেই গরুটা এখন তার কাছে, জানের মায়া বড় না ভালোবাসা বড় বুঝতে দিচ্ছে না। সে এবার চোখ বুজে সোজা চষা জমির ওপর দিয়ে জল কাদা ভেঙে ছুটতে থাকল।

সে চোখ বুজে ছুটছে। ভয়ে সে পিছনে তাকাচ্ছে না। তাকালেই যেন সে দেখতে পাবে শকুনেরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে তাড়া করছে। এমন পুষ্ট খাবার সে লুকিয়ে রেখেছে শানের নিচে। পচে যাবে, মাটিতে মিশে যাবে, তবু সে খেতে দেবে না। না কী সেই ঠাকুর, পাগল ঠাকুর যাঁর প্রাণ নিশীথে ভুবনময় ঘুরে বেড়ায়, ওর পিছনে শকুন লেলিয়ে দিয়েছেন! মানুষজন ভাবত, এই মানুষ সামান্য মানুষ নন, পীর মানুষ, সে মানুষ প্রাণ ফিরে পেতে কতক্ষণ।

সে ভয়ে কতক্ষণ যে এভাবে ছুটেছিল তার হুঁশ নেই। বেশ বেলা হয়ে গেছে। এখন আর শকুনেরা নাগাল পেতে পারে না। সে তার গায়ে উঠে এসেছে প্রায়। পাশে সেই গ্রাম। ঠাকুরবাড়ির দিকে সে তাকাল। মানুষজন লেগেই আছে। বাড়িটিতে মানুষের যে কী কাম এত! সে বুঝতে পারে না। সে দেখল হাসিমের বাপ দুধ নিয়ে যাচ্ছে। ইসমতালি নিয়ে যাচ্ছে এক টিন গুড়, কেউ মধু দিয়ে আসছে, কেউ বাঁশ মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। কত কাজ সে-বাড়িতে। সবাইকে কেমন কেনা গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তা রেখেছে। সে যে এমন একটা মজার কাজ করে ফেলেছে, যেন সে কোনও মানুষ হত্যা করে নাই, সে হত্যা করেছে আজব একটা জীবকে, যার কোনও হুঁশ নেই। সে যেমন ডাল কেটে, ঘাস কেটে ধার দেখে তেমনি সে আকালুকে জবাই করার আগে ধার দেখে এসেছে কোরবানীর চাকুটার। আর তখনই সে দেখল পয়মাল সেই ষণ্ড। বাগি গরুটার পিছনে লেগেছে। গরুটা দুপা এমন ছুঁড়েছে যে লাথি খেয়েও নড়ছে না। হালার কাওয়া। তুমি এক ষণ্ড। আমার জীবের লগে পীরিত তোমার। সে সহ্য করতে পারছে না, ওর ভিতরে আগুন দপ করে জ্বলে উঠেছে। আবার পায়ের রক্ত মাথায়। আকালু তার বিবি নিয়ে পালায়, ধর্মের ষণ্ড ওর জীবকে জোর করে পাল খাওয়াতে চায়, এত বড় আস্পর্ধা! এত বড় ষণ্ডের সঙ্গে পারে কী করে তার জীব। সে ফের টেনে ধরল চাকুটা। এবং বাতসে আবার ইস্পাতের ফলাটাকে খেলাতে থাকল।

ষণ্ডটা ফেলুকে দেখতে পাচ্ছে না। বাগি গরুটার পাছা মোটা এত বেশি যে সেখানে মুখ লুকালে ফেলুকে দেখা যায় না। ফেলুর কাছে শালা ষণ্ড এখন আকালু বনে গেছে। সেই তাজা চেহারা। রোদের ভিতর চকচকে ফেজ টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অভাগা গরুটা তার বিবি। যেন আন্নুর কোনও ইচ্ছা ছিল না। সারা জীবন সে এই বাগি গরুর মতো পিছনে পা ছুঁড়ছে, আর আকালু সে-সব তুচ্ছ করে নাক উঁচু করে রেখেছে বিবির পিছনে। মেয়েমানুষ কত পারে! সে পারেনি বলে মানসম্মান নিয়ে শেষপর্যন্ত ভেগে গেছে। আন্নুর মতো ওর বাগি গরুটার জোরজার করে পাল খাওয়া মুখ দেখে সে তার রোষ সামলাতে পারল না। চাকুটা তুলে সে জানের মায়া না করে যণ্ডটার গলার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবং অতর্কিতে গলকম্বলটা ফাঁক করে দিতেই যণ্ডের হুঁশ হল, গোত্তা খেয়ে পড়ে যেতে যেতে চার পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল। সবটা টেনে দিতে পারেনি। চার পায়ের ওপর শক্ত করে দাঁড়াতেই যণ্ডটা দেখল ওর গলায় চাকু চালিয়ে দুশমনটা ছুটছে। গলগল করে রক্ত ও গলাচ্ছে নালিটা। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মহাজীবটা এবার ছুটতে থাকল। ফেলুও পড়িমড়ি করে বাড়ির দিকে উঠে যাচ্ছে।

ষণ্ডটা মাঠের ওপর দিয়ে ফেলুকে মেরে ফেলার জন্য তেড়ে যাচ্ছে।

লোকজন দেখতে পাচ্ছে ফেলু ছুটছে মাঠের ওপর দিয়ে আর ষণ্ডটা ছুটছে পিছনে। ধর্মের ষণ্ড সামান্য এক মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

গেল গেল রব। সবাই যেখানে যত মানুষ আছে ফেলুর চিৎকারে ছুটে আসছে। আমারে বাঁচান, আমারে বাঁচান। এক হাত ওপরে তুলে সে ছুটছে। সে জানে তার রক্ষা নেই। সে ষণ্ডের চোখের ভিতর তার মরণ দেখে ফেলেছে। মহারোষে ছুটছে। জীবের শেষ সময়। চোখের ওপর নীল রঙের পর্দা। এবং দুশমনটা সেই নীল রঙের একটা দৃশ্যের ভিতর কেবল ছুটে যাচ্ছে। সেও ছুটে যাচ্ছে। ফেলু পিছনে তাকাচ্ছে, আহা, এ-যে উঠে এল। আমারে বাঁচান। কেডা আছেন, আমারে বাঁচান গ, আমারে রক্ষা করেন।

মানুষজন কেউ এগোচ্ছে না। সবাই দাঁড়িয়ে বুঝি তামাশা দেখছে। না এমন মনে হল না। কিছু লোকজন ছুটছে। বড়বৌ রাতে ঘুমাতে পারেনি। সেও এই চিৎকার শুনে মানুষের সোরগোল শুনে ছুটে এসেছিল পুকুরপাড়ে। কে আর যাবে সামনে! মানুষে আর ষণ্ডে লড়াই। মরিয়া হয়ে ফেলু যেই না রুখে দাঁড়াবে ভাবল এবং ফাঁক বুঝে আর একটা চোখ গেলে দেবে ভাবল তখনই ষণ্ডটা কেমন অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর চোখের ওপর থেকে। বস্তুত যণ্ডটা তখন ওর যে চোখটা নেই সেদিকে আছে। মুখ ঘুরালেই সে দেখতে পেত কী রোষ জীবের। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কেবল চার পায়ের ওপর লাফাচ্ছে। আহা সে যদি সবটা টেনে দিতে পারত! সে আর পারল না! ষণ্ডটা ওর উপর এসে দ্রুত লাফিয়ে পড়েছে। ওর যদি দুটো চোখ থাকত! আহা দুটো চোখ। ধর্মের ষণ্ডের মতো সে একচক্ষু জীব হয়ে গেছে। সবটা দেখতে পায় না। কিছুটা দেখতে পায়। কিছুটা দেখে, কিছুটা জানে, কিছুটা বোঝে এবং শেষপর্যন্ত ফেলুর মতো একটা বাগি বাছুর মাঠে ছেড়ে দেয়। সে বলল, আল্লা এডা কি হইল! কারণ যণ্ড তার প্রবল প্রতাপান্বিত দুই শিঙ নিয়ে এমন জোরে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে যে সে জানে না পিছনে এক বড় কাফিলা গাছ আছে. নরম গাছ এবং সে তার সামনে দাঁড়িয়ে যণ্ডের সঙ্গে লড়াই করার জন্য শেষবার প্রস্তুত হচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে কেউ ছুটে আসছে না। সে হায় হায় করে বাতাসে ছুরি শান দিতেই প্রবল প্রতাপান্বিত ষণ্ড শিং ঢুকিয়ে একবার গাছের সঙ্গে গেঁথে নিজে চার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পেটের ভিতর শিঙ ঢুকে কাফিলা গাছ ফুঁড়ে ওপাশে শিঙ বের হয়ে গেছে। সে কেমন একটা দীনহীন মানুষের মতো শেষবার ডাকল, আল্লা আমার এই আছিল কপালে! বলতে বলতে সে দেখল, তার পেটের ভিতর থেকে সব রক্ত উপছে ষণ্ডের মুখ রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। ষণ্ডের গলকম্বল ছিঁড়ে গেছে বলে গরম রক্ত এবং শ্বাসনালীর ভিতর থেকে রক্ত প্রবলবেগে বের হয়ে ফেলুকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

দুই জীব এখন দুই পরম আপনজনের মতো কাফিলা গাছের নিচে পড়ে আছে। ষণ্ডের প্রাণ নেই, ফেলুর প্রাণ নেই। আহা ফেলু তুমি একখানা মানুষ। তোমার জয় দিবার কেহ নাই হে। আমি লেখক তোমার হয়ে জয় দিলাম। ফেলু তুমি বড় মানুষ হে। তুমি জান লড়াই করতে। তোমাকে এভাবে মরতে দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।

সব গ্রাম ভেঙে পড়েছে তখন এই মাঠে। ফেলুর বাড়ির সামনে। কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ ষণ্ডটা এমন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কেন বুঝতে পারছে না। সবার ধারণা যণ্ড ফেলুর পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে, তারপর বাগে পেলে যে সামনে পড়বে

তারই পেট ফাঁসাবে। ষণ্ড ক্ষেপে গেছে। ওরা সবাই লাঠি বাঁশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুকে ফেলে দিয়েছে এবং এবার এদিকে ছুটে আসবে। ধর্মের ষাঁড়। ওকে কিছু করতে নাই। তা একটা জান গেছে তো কী হয়েছে। তা ছাড়া ফেলুর তো এ-ভাবেই যাবার কথা। সুতরাং যাতে অন্যদিকে ছুটে না যায়, এবং তেড়ে গিয়ে অন্য কাউকে আঘাত না করে সেইজন্য ওরা চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। অথচ বেশ সময় পার হয়ে গেছে, কেন ষণ্ডটা উঠে আসছে না! দু একজন এবার পা পা এগুতে থাকল। আরে এডা কি হইল! ষণ্ডটার গলা কাটা। ফেলুর চোখ খোলা। পেটের নাড়ি সব বের হয়ে আসছে। শিঙের ভিতর জড়িয়ে গেছে। ফেলু এক হাতে তখনও কোরবানীর চাকুটা শক্ত করে ধরে আছে।

লোকগুলি বলল, হা আল্লা।

ফেলু আর ধর্মের যণ্ড এখন জড়াজড়ি করে পড়ে আছে কাফিলা গাছটার নিচে। আকাশে সূর্য তেমনি কিরণ দিচ্ছে। ঠাকুরবাড়িতে তেমনি কেউ মধু, দুধ, দই এবং বাঁশ নিয়ে যাচ্ছে। বড়বৌ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখছে। মানুষটা ফিরে আসেননি। মাঝরাতে সোনার কী যে আবার হয়েছিল। আবার আগের রাতের মতো ভয়ে নীল হয়ে গেছিল। জ্বর। সে কেবল বলছে, আমি মরে গেলাম। জ্যেঠিমা আমাকে কারা মেরে ফেলছে। জল। জল। ঐ ঐ আসছে, আসছে।

সবারই বিছানা থেকে উঠতে বেলা হয়ে গেছে। সাদা পাথরে ফলমূল কেটে রেখে দিয়েছিল বড়বৌ। যদি তিনি আসেন। আসেননি। সকালে উঠে সবাইকে ডেকে, বড়বৌ এখন পাগল মানুষের জন্য রাখা ফলমূল বিতরণ করে দিচ্ছে। তখনই এ-গায়ে খবর এল যণ্ডটা ফেলুর পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে।

ঈশম এসে তখন বলছিল, ঠাইরেন একটা কথা কই।

বড়বৌ সব ফলমূল ততক্ষণে বিলিয়ে দিয়েছে। হাতে তার খালি সাদা পাথরের থালা। সে, ঈশম কী বলবে, কোনও গোপনীয় কথা নিশ্চয়ই, সুতরাং সে সবাইকে চলে যেতে বলল, কিছু বলবে?

—ফেলুডা না-পাক মানুষ। দাফনের টাকা অর জাতভাইরা কেউ দিব না কয়।

বড়বৌ বুঝতে পারল ঈশম দাফনের জন্য কিছু টাকা চায়। সে গোপনে এই টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এবং দাফনের নিমিত্ত যা কিছু করণীয় সে করবে।

বড়বৌ তার যা সঞ্চয় ছিল, তা থেকে কিছু দিয়ে দিল। বলল, সারাটা জীবন ফেলুর বড় কষ্ট গেছে।

—তা গেছে বড়মামি।

—অথচ দ্যাখো ফেলুর কী না ছিল। সেই চেহারা। এখনও আমার চোখে ভাসে, ফেলু গোপালদি থেকে যে-বার হা-ডু-ডু খেলে শীল্ড নিয়ে আসে। গাঁয়ের লোকে ওকে নিয়ে কত বড় উৎসব করেছিল। আর আজকে ওর দাফনের টাকা কেউ দিচ্ছে না।

ঈশম চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সহসা কী মনে হতেই বলল, বড় মামা ফিরা আইছেন?

—না। আসেননি।

শশীভূষণও এ-সময় উঠোনে কি কাজে চলে এসেছিলেন। তিনি বললেন, শুনেছেন বড়বৌদি, ফেলুর পেটে খোদাই ষাঁড়টা শিং ফুড়ে দিয়েছে।

—শুনেছি।

—বড় হারমাদ ছিল।

বড়বৌ কিছু বলল না।

—কর্তা ফিরেছেন আপনার?

বড়বৌ মাথার ঘোমটা টেনে দিল। বলল, না।

—আজ ঠিক ফিরে আসবেন। আজ নিয়ে দু'দিন হল না?

—দু'দিন। বলে শশীভূষণকে সে অনুরোধ করল, আপনি একবার যাবেন বিকেলে খুঁজতে? লালটু পলটুকে পাঠাবেন? ওরা তো আপনার কথা শোনে।

ঈশম বড়মামির চোখ দেখলেই সব টের পায়। সে বলল, বড়মামি আমি যামু। বিকালে কোন কাজ হাতে রাখুম না। কেবল মাঠেঘাটে বড়মামারে খুইজা বেড়ামু।

শশীভূষণ বললেন, ঠিক পেয়ে যাবে। দেখ গিয়ে হয়তো কোন ঢিবিতে উঠে বসে রয়েছেন। সেখান থেকে কী করে নামবেন বুঝতে পারছেন না। একমাত্র তুমি অথবা সোনা তাকে নামিয়ে আনতে পার। কী বলেন বড়বৌদি ঠিক না?

বড়বৌ এমন কথায় ম্লান হাসল।

কেউ আর এখন বড়বৌর কথার গুরুত্ব দিতে চায় না। তিনি নিরুদ্দেশে গেছেন, চলে যান বার বার, তাঁকে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না, তিনি নিজেই চলে আসেন। সুতরাং শশীভূষণ বললেন, আপনি অযথা ভাবছেন বড়বৌদি। ভেবে তো কিছু হবে না।

ঈশম চলে গেল তখন। শশীভূষণ বললেন, কখন বের হয়েছে, আপনি দেখেননি বের হতে?

—না দেখিনি। কি যে কুয়াশা করল!

—কোনদিকে নেমে গেছেন কেউ বলতে পারে?

—তাও জানি না। সোনাকে নিয়ে এত বেশি সবাই ব্যস্ত ছিলাম যে ওঁদের হবিষ্যান্ন পর্যন্ত করাতে পারিনি। মানুষটা না খেয়ে কোথায় যে বের হয়ে গেলেন!

—আসবেন। চলে আসবেন ঠিক।

—সে তো আমিও জানি চলে আসবেন। কিন্তু মন যে মানে না। না খেয়ে কোথায় যে উপবাসী মানুষটা বসে রয়েছেন! বলতে বলতে বড়বৌর চোখ থেকে টপটপ করে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

শশীভূষণও বড়বৌর এমন চোখমুখ দেখলে বড় কষ্ট পান। যেন বোঝ প্রবোধ দেবার মতো বললেন, আচ্ছা পাঠাচ্ছি লালটু পলটুকে। আমি নিজেও খুঁজতে যাব। আপনি অযথা কাঁদবেন না।

কান্না ভালো নয় বড়বৌও জানে। কাঁদলে মানুষের কোনও শুভ হয় না। সে চোখ আঁচলে মুছে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিচ্ছিল তখনই শচীন্দ্রনাথ এসে বললেন, বড়দা রাতে ফিরা আইছেন?

কারণ শচীন্দ্রনাথ জানেন রাতে তিনি প্রায়ই ফিরে আসেন। সকালে অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। হয়তো পুকুরপাড়ে কিংবা চুপচাপ ঘরেই বসে রয়েছেন। সুতরাং বড়বৌদি ওকে ঠিক খবর দিতে পারবে! সেজন্য প্রশ্ন করে জেনে নিলেন, তিনি এসেছেন কিনা। আসেননি। শচীন্দ্রনাথকে আদৌ উদ্বিগ্ন দেখাল না। এখন কত নিয়মকানুনের ভিতর থাকতে হয়, তা না করে তিনি মাঠে ঘাটে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যে যা দিচ্ছে খেয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এটা ভালো লাগছে না। না খেলে মানুষটা এমন অনিয়মের ভিতর এত বলশালী থাকেন কী করে! কিন্তু বড়বৌর মনে হয় তিনি হাঁটছেন, হাঁটছেন। চারপাশে যা কিছু রয়েছে, এই যে নীচতা হীনতা, সব অবহেলা করে হেঁটে যাচ্ছেন। কোথাও কিছু তিনি খাচ্ছেন না। কেবল উপবাসী থেকে সন্ন্যাস জীবনযাপন করছেন।

তখনই মনে হয় বড়বৌর, কোথাও গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। একটা নীল মতো মরুভূমি জায়গা। চারপাশে ধুধু বালুরাশি। কোনও গাছপালার চিহ্ন নেই। একজন মানুষ নিয়ত তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। দূরে অতি দূরে গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনি। প্রায় কোনও মহামান্য সন্ন্যাসীর মতো এই মানুষ তখন মরুভূমি পার হয়ে দুঃখী মানুষের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছেন। বলছেন, ঐ দ্যাখো আকাশে কত আলো, পৃথিবীর গাছপালার ভিতর অথবা এই যে মরুভূমি তার ভিতর ঈশ্বরের কী অপার করুণা! তিনি হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ করছেন। ঘাস ফুল পাখিকে বলছেন, অনন্তকাল এই পৃথিবীতে তোমরা বিচরণ কর। তোমরা সুখে থাকো।

যখন তিনি এমন মানুষ তখন তাঁর পৃথিবীতে আর কে শত্রু থাকবে! কে তাঁর অনিষ্ট করবে! সুতরাং বড়বৌ লালপেড়ে একটা নতুন কোরা শাড়ি পরে বড় আয়নার সামনে দাঁড়াল। বড়বৌ বলে তাকে হবিষ্যান্ন করতে হচ্ছে। সে সিঁদুর দিতে পারছে না কপালে। চুল আঁচড়াতে পারছে না। চুলে তেল দিতে পারছে না। সেও কেমন ধীরে ধীরে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা ফিরে এলে সে আবার বড় করে কপালে সিঁদুর ফোঁটা দেবে। যা কিছু অলঙ্কার আছে পরবে। তখন মাথা নেড়া থাকবে মানুষটার। পরনে নতুন কোরা ধুতি। সে মৎস্যস্পর্শের দিন এমনভাবে সেজে আসবে যে মানুষটা তাকে দেবদাসী ভেবে চোখ বুজে ফেলবে। মানুষটা ফিরে এলে কী যে করবে না এবার! তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে থাকলে তাঁকে ঠিক কপিলাবস্তু নগরের সেই সন্ন্যাসী রাজকুমারের মতো মনে হবে। সে যশোধরা। এমন মনে হতেই কেন জানি বড়বৌর আর কোনও দুঃখ থাকল না। সে এখন এ-ঘর ও-ঘর ছুটে ছুটে কাজ করছে।

সোনার কপালে হাত রেখে বলছে, কীরে তুই ভালো হবি না! কবে হবি! কবে যাবি আনতে তোর জ্যাঠামশাইকে? তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠ। কত লোকজন আসবে কত বড় কাজ হবে বাড়িতে আর তুই শুয়ে থাকবি, আমার ভালো লাগে!

আবেগের বশেই এসব বলে গেল বড়বৌ। তার ভালো লাগছে—সেই মুখ, সন্ন্যাসী রাজকুমারের মুখ তার চারপাশে এখন এক অদৃশ্য ছবি হয়ে আছে। তার চারপাশে ঘুরছে ফিরছে। মনে মনে বড়বৌর সঙ্গে তার সঙ্গে তাঁর মানুষ কথা বলছেন। তার আর ভয় কী। সে কাঁদবে কেন! অতীতের সেই কপিলাবস্তু নগর, তার প্রাসাদ, রাজা শুদ্ধোদন এবং সেই সুন্দর স্বপ্ন মায়া দেবীর—মহারাজ রাতে এক সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম। একটা ছোট্ট সাদা হাতি আস্তে আস্তে আমার কোলে নেমে এল। তারপর ধীরে ধীরে সে কোথায় মিলিয়ে গেল দেখতে পেলাম না। বৈশাখী পূর্ণিমায় রাজকুমারের জন্মের দিনটি কল্পনা করতে বড়বৌর আজ খুব ভালো লাগছিল।

মনে হল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ঈশমকে কেউ ডাকছে। সে খুব ব্যস্ত ছিল বলে প্রথমে খেয়াল করে নি। সে একাই আজ একশো। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আবেদালি! সে আর কাউকে সঙ্গে পাবে আশা করেনি। হ্যাঁ, আর একজনকে সে পেয়েছে, সে মানুষের নাম অলিমদ্দি। অলিমদ্দি মুড়াপাড়ার ফর্দ অনুযায়ী ধারে পাঁচটা মুনিষ নিয়ে বাজার করে ফিরছে। সুতরাং সে ছিল। আর আছে এখন যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ইশারায় তাকে ডাকছে।

চোখে খুব একটা আজকাল ঈশম ভালো দেখে না।

আবেদালিই তার নজরে এনে দিল। চাচা ঐ দ্যাখেন আপনারে ডাকতাছে।

—কেডা আমারে ডাকে?

—মনে হয় হাজিসাহেবের মাইজলা বিবি।

ওরা দুজন আরও কাছে এগিয়ে গেল। বটগাছটা পার হলেই হাজিসাহেবের অন্দরের পুকুরের ও-পাড়ে কদম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। সে কাছে গিয়ে বুঝল, ফেলুর সেই ছলচাতুরি করে ধরে আনা বিবি। উজানে হাজিসাহেব গেছিলেন। ফেলু তার যৌবন দেখিয়ে তুলে এনেছিল বিবিকে। এ-সব এখন কত অতীতের কথা। কে আর এ-নিয়ে বাকবিতণ্ডা করে। সবই মানুষের ধর্ম ভেবে ঈশম সন্তর্পণে ও-পাড়ের ঘাটে চলে গেল। ঈশম বুড়োমানুষ বলে এ-গাঁয়ে সে প্রায় সবার কাছে আপনার জনের মতো। সে কাজে গেলে মাইজলা বিবি কোমর থেকে এ কটা ঘুনসি বের করে বলল, টাকা কটা দিলাম চাচা। অর কবরে দিয়েন।

ঈশম দেখল, একটা দুটো টাকা নয়। প্রায় পাঁচ কুড়ি টাকা। সে বলল, এত লাগব না।

মাইজলা বিবি চারদিকে তাকাচ্ছে। কেউ আবার দেখে ফেলছে কিনা। সে গোপনে টাকাটা দিতে এসেছে ঈশমকে। সে কাফিলা গাছটা পর্যন্ত যেতে পারেনি। তাকে হাজিসাহেব যেতে দেন নি। সবাই দেখে এসেছে ষাঁড়টা এবং ফেলু অদ্ভুত এক দৃশ্য তৈরি করেছে কাফিলা গাছের নিচে। মাথাটা ফেলুর ঢলে পড়েছে ষাঁড়টার ঘাড়ে। ষণ্ডের মুখ কাত হয়ে আছে। এবং ষণ্ডের চোখ মরে গিয়ে নীল কানা চোখটা দেখা যাচ্ছে না। ফেলুরও কানা চোখটা আড়ালে পড়ে গেছে। ষণ্ডের গলা কাটা আর ফেলুর পেট ফেঁসে গেছে। মাইজলা বিবি আড়ালে দাঁড়িয়ে মানুষটার জন্য চোখের জল ফেলেছে। কেউ যাচ্ছে না দাফনে। সে-ই ডেকে এনেছিল ঈশমকে। খবরটা দিয়েছিল। তারপর মানুষটার দাফনের টাকা হবে না ভেবে প্রথম দাফনের জন্য কিছু টাকা, এবং পরে মনে হল মাইজলা বিবির, এই তো তার মানুষ, যার রঙ্গরসে ভুলে উজানি নৌকাতে পা দিয়েছিল। হাজিসাহেব ফেলুকে দিয়ে ফাঁদ পাতিয়ে ছিলেন। ফেলুর সে-সব দুষ্কর্মের কথা এখন আর মনে হয় না। ফেলু তার কাছে বড়-মানুষ। সে তার সামান্য এই সঞ্চিত কটা টাকা দিয়ে কী করবে! সে বলল, রাখেন।

ঈশম বলল, না এত লাগব না। বলে সে হিসাব করল মনে মনে তারপর মাত্র গোটা পাঁচেক টাকা রেখে ফিরিয়ে দিল।

কিন্তু মাইজলা বিবি টাকা আর ফেরত নিল না। বলল, আমি যাই চাচা। সব টাকা রাইখা দ্যান। টাকায় অর কবরে একটা মাজার বানাইয়া দিবেন। বলে বিবি আর দাঁড়াল না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর ঠিক না। দেখতে পেলে হাজিসাহেব আবার পাঁচন নিয়ে তেড়ে আসবে সে বলল, মর্জিতে যা লয় করবেন চাচা।

ঈশম এই মেয়ের মুখের দিকে আর যথার্থই তাকাতে পারছিল না। সারাজীবন, সারাজীবন বলতে প্রায় বিশ সালের ও পর হবে এই এক হাজিসাহেবের ঘরে নিঃসন্তান বিবি, দু'কুড়ির কাছাকাছি বয়স। যা কিছু সঞ্চয় তার, সবই বোধহয় এটা-ওটা বেচে। যেমন দু কাঠা খেসারি কলাই গোলা থেকে বেচে দিলে কেউ টের পায় না। সারাজীবন,

জীবন বিপন্ন করে যা কিছু সে পেয়েছে সব দিয়ে গেল। তাকে ইটের বায়না দিতে হবে তবে। এখানে তো এখন ইঁট পাওয়া যাবে না। কখন যে সে কি করে!

তবু সবাই দেখল, অদ্ভুত একখানা কাণ্ড, পরদিন নদীতে একটা ইঁটের নৌকা লেগে রয়েছে। এবং যেখানে জালালিকে কবর দেওয়া হয়েছে তার পাশে আর একটা কবর। কবরের চার পাশে ইট গেঁথে দিচ্ছে। কোথায় যে এত পয়সা পেল ঈশম, ঈশমকে বললে সে হাসে। সে বলল, মানুষ কখনও না-পাক হয় না। সে খুব ধর্মাধর্ম বোঝে না। সে কোরানশরিফ পাঠ করতে পারে না বলে বড় আফসোস। সময় পেলে মসজিদে বসে সেই অর্থহীন শব্দ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়। তার কাছে অর্থহীন এই জন্য যে আরবী ভাষায় সব আয়াতের অর্থ সে বুঝতে পারে না, কেবল এক যেন ফকির ওকে হাত ধরে কোন নদীর পাড়ে নিয়ে যান। তারপর নদী সমুদ্রের মতো মনে হয়। অনন্ত জলরাশি, এবং একটা বড় নৌকা সে দেখতে পায়। সেই নোয়ার নৌকা। সেই নবি মানুষটা সবাইকে ডাকছেন, যারা পুণ্যবান মানুষ, গরু, ঘোড়া, হাতি, মোষ, পাখি, কবুতর কত জীব নিয়ে সে নৌকায় তুলছে। ঈশম কখনও কখনও সেই নবির মতো চরে দাঁড়িয়ে থাকে — যেন সে একটা বড় নৌকা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমে সে নৌকায় তুলে নেবে পাগল ঠাকুরকে, তারপর সোনাবাবুকে, ফেলু বেঁচে থাকলে সে বুঝি তাকেও নিত। কেয়ামতের দিন মনে হলে মহাপ্লাবনের কথা তার মনে আসে। সে তখন আর কিছু মনে করতে পারে না।

ফেলুর ইট দিয়ে বাঁধানো কবরটা দেখে হাজিসাহেব ছেলেদের ডাকলেন। বলল, তোমরা আমার কবর ইট দিয়া বান্দাইয়া দিয়। আর তার মাইজলা বিবি ঘাটে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

মাজারে রাতে মোমবাতি জ্বালাতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু সে সন্ধ্যায় পারে না। পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ যেন জেগে রয়েছে। ওকে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু যখন এই অঞ্চল নিশুতি রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, কোনও কাকপক্ষী ডাকে না, কেবল মাঝে মাঝে সে ঝোপে-জঙ্গলে কীট-পতঙ্গের আওয়াজ পায়, তখন ধড়ফড় করে উঠে বসে। শিয়র থেকে ম্যাচ বাতিটা তুলে নেয় হাতে। একটা মোমবাতি তুলে নেয় এবং নিশীথে কালো বোরখা পরে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সে এই কবরে নেমে আসে। কবরের মাজাবে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। সে ডাকে মিঞা আমি আইছি। মোমবাতি জ্বালাতে আইছি। সে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। ফেলুর হয়ে সে শোক করে। কেউ জেগে নেই বলে সে মাথা নুইয়ে রাখে কবরের পাশে। এবং নামাজের ভঙ্গিতে বসে থাকে। যেন সে নামাজই পড়ছে।

সারারাত্রি ধরে কেউ কেউ খবর পায় এক বোরখা পরা বিবি এই কবরে হাঁটাহাঁটি করে। হাতে তার মোমবাতি। সবাই আবার কোন অশরীরীর গন্ধ পায় চার পাশে। এটাই রক্ষা করেছে মাইজলা বিবিকে। সে বের হয়ে যায়। কারণ, সে এক ঘরে একা থাকে।

ঝাঁপ বন্ধ থাকে। হাজিসাহেব ছোট বিবির বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকেন। পাঁচ ওক্ত নিয়মিত নামাজ পড়েন। ধর্মাধর্মে তাঁর কোনও ফাকি নেই।

আর মাইজলা বিবি কেমন নিশুতি রাতে কবরের গন্ধে পাগল ব'নে যায়। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জ্বালাতে পারলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। কবরের পাশে বসলেই মনে হয় মানুষটা কবর থেকে উঠে এসেছে। এবং ওর সেই মুখ চোখ, একেবারে যৌবনকাল তার। সে যৌবনকালের ফেলুকে নিয়ে তখন একেবারে একা। মাইজলা বিবির চোখে জল, অস্ফুট গলায় বলে, আমি আর পারি না মিঞা! বাইচ্যা থাকতে তোমারে পাইলাম না মিঞা। আমার যে কি কসুর!

হাজিসাহেব ফেলু মরেছে জেনেই মাইজলা বিবির পাহারা তুলে দিয়েছে। হাজিসাহেবের আর কোন ডর নাই। মাইজলা বিবি শোক করতে করতে আবার সেই গানটা গায়, সখি সখি গলায় দড়ি ওলো সখি ললিতে!

বড়বৌ তখন আশায় আশায় রাত জাগে। মানুষটা যেমন সহসা ফিরে আসেন তেমনি আসবেন। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঠের দিকে তার অপলক দৃষ্টি। জ্যোৎস্না রাত বলে অনেক দূর সে অস্পষ্ট কিছু দেখার চেষ্টা করে। মেঝেতে ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ এখন ঘুমুচ্ছেন।

ওঁরা জানেন বৌদি ঘুমাবে না। ওঁদের রাতের হবিষ্যান্ন করিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আলাদা পাথরে দাদার জন্য সব রেখে দিয়েছে। তিনি ফিরে না এলে সকালবেলা সবাইকে হাতে হাতে বিলিয়ে দেবে সব। সোনাকে দিতে পারে না। ওর অসুখ এখনও নিরাময় হয়নি। বড়বৌ বলে রেখেছে সোনাকে, ওর অসুখ নিরাময় হলেই, সে অসুখের যে কদিন যা কিছু খেতে পায়নি সব তাকে খাওয়াবে। সোনা সেজন্য সকালে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে দেখতে পায় জ্যেঠিমা পাগল জ্যাঠামশায়ের জন্য যা রেখেছিলেন, যেমন নারকেল, বাঙ্গি, কমলা, তরমুজ সব হাতে হাতে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছেন। ওকে দুটো একটা কমলার কোয়া দিয়ে যান। সোনা চাদরের নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। ওর শুধু রসটা খাবার কথা। কিন্তু সে চুরি করে সবটাই খেয়ে ফেলে। জ্যেঠিমা কাছে এলেই ওর কেবল জানতে ইচ্ছা হয় জ্যাঠামশাইকে কে কে খুঁজতে বের হয়েছে।

ঈশম কাজের ফাঁকে দিনমান খুঁজছে। সে বস্তুত সময়ই পাচ্ছে না। আত্মীয়-কুটুম সব একে একে চলে আসছে। ওদের থাকবার জন্য বাঁশ পুঁতে বড় বড় লম্বা লম্বা চালা ঘর তুলতে হচ্ছে। চোয়াড়ি হবে। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। দান ধ্যান হবে সামান্য। পরগণার যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সব নিমন্ত্রিত হবে। সুতরাং ঈশম বলতে গেলে সময়ই দিতে পারছে না। কেবল সকালের দিকে শশীভূষণ লাঠি হাতে বের হয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের ডেকে বলেছিলেন, তোরা খবর দিতে পারিস কিনা দেখ। পাগল কর্তা নিখোঁজ। তা তিনি তো এমনই ছিলেন। না বলে কয়ে বের হয়ে যান। দু'চার দিন পর ফিরে আসেন। কখনও দশ পনের দিনও হয়ে যায়। একবার মাসাধিককাল কোন খোঁজ ছিল না। তবু চিন্তার

কারণ। আজ বাদে কাল বুড়ো কর্তার এত বড় কাজ! তখন মানুষটা কাছে থাকবেন না কী করে হয়! তোরা খোঁজ নিতে পারিস কিনা দ্যাখ।

মাস্টারমশাইকে খুশি করার জন্য সবারই ভীষণ উৎসাহ। ওরা ওদের গাঁয়ে গায়ে মাঠে মাঠে এমন কী যত ঝোপজঙ্গল আছে সেখানে খুঁজে খুঁজে দেখেছে। এবং দু'ক্রোশের মতো পথ হেঁটে কেউ কেউ খবর দিতে এসেছে, স্যর পাইলাম না। কোনওখানে নাই। ওরা এলে বড়বৌদিকে শশীভূষণ ডাকলেন, বললেন, দেখতে বলেছিলাম। জানেন বৌদি ওর নাম করুণা। ওদের বাড়ি ব্রাহ্মন্দী। ওকে খুঁজে

—তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?

—রায়বাড়ির। আমি অর্জুন রায়ের ছেলে।

শশীভূষণ বললেন, সবাইকে বলেছি। আমার তো ছাত্র কম নয়। কী রে তুই!

—আমি সার খবর দিতে আসলাম। আমার বা'জি কইল, কেউ দেখে নাই এমন মানুষ।

বড়বৌ বলল, তখন খুব কুয়াশা করেছিল।

—আমার চাচার মাঠে আছিল। ওদিক দিয়া গ্যালে এমন মানুষ নজরে না আইসা যায়!

—ওর নাম আবদুল, বৌদি।

বড়বৌ ওদের দুজনকেই দেখল। অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছে। আবদুল সোনার সঙ্গে পড়ে। বয়স খুব বেশি নয়। তবু ছুটে এসেছে মাস্টারমশাইকে খবর দিতে। বড়বৌ বলল, তোমরা কাল আসবে। আমার শ্বশুরের শ্রাদ্ধ। কাল তোমরা খাবে। আমি ওর হয়ে তোমাদের নিমন্ত্রণ করলাম।

তারপর শশীভূষণ বললেন, কী রে তুই! কী খবর। তোদের গাঁয়ের পাশে যে বড় গজারি বন আছে সেখানে খুঁজেছিস?

—সব খুঁইজা দেখছি। কেউ খবর দিতে পারে নাই সার। সবাই কয়—এমন মানুষ হাঁইটা গেলে না চিনে কে! তাইন আমাদের দিকে যায় নাই। কেউ দেখে নাই।

সবাই একই খবর দিয়ে গেল। আবদুল যাবার সময় বলল, সোনা কৈ! তার নাকি অসুখ হইছে স্যর?

—দেখা করবি? যা ভিতর বাড়িতে যা।

আবদুল খুব সন্তর্পণে এমন বড় বাড়ির ভিতর ঢুকে বলল, কী

—তুই! তুই যে!

ঠাকুর অসুখ হইছে তোমার?

—আমি বুঝি কিছু খবর নিয়া আসতে পারি না?

সোনা বলল, কী খবর?

—মাস্টারমশয় পাগল কর্তারে খুঁইজা আনতে কইছিল।

—পাইলি? সোনার মুখ প্রত্যাশায় ভরে উঠেছিল।

—না পাইলাম না। কত খোঁজলাম।

সোনাকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কাতর সে। অসুখে ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। কথা বলতেও ওর কষ্ট হচ্ছিল। তবু বলল, আমার মনে হয় মাস্টারমশয় ঠিক কইছে! তাইন উঁচু একটা ঢিবিতে বসে আছেন। নামতে পারছেন না। তোদের বাড়ির পাশে কোন টিলা আছে?

আবদুল ওর লুঙ্গি দিয়ে মুখ মুছে কিছুক্ষণ কী ভাবল। গরমে সে ঘেমে গেছে। সোনা ওকে বসতে বলতে পর্যন্ত পারছে না। এই বারান্দায় আবদুল উঠলে সব অশুচি হয়ে যাবে। আবদুল এটা টের পায় বলেই উপরে উঠছে না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওর শরীরে এসে রোদ পড়েছে। সামনে এমন একটা জায়গা নেই যে ছায়া আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আবদুল কথা বলতে পারে, ঘামতে হয় না। সোনার বড় অস্বস্তি লাগছিল।

কিন্তু আবদুলের ওসব খেয়াল নেই। সে সোনার পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কার কার বাড়ি, কোন মাঠে, অথবা গাছের ছায়ায় যদি তিনি বসে থাকেন সে সারা বিকেল তার চারপাশে যতকিছু আছে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। এবং বা'জিকে বলে সে ছুটে এসেছে খবর দিতে, না পাওয়া গেল না।

সোনা বলল, আমি ভাল হলে খুঁজতে বের হব। ঠিক তাকে পেয়ে যাব দেখবি।

আবদুল বলল, আমারে সঙ্গে নিবা?

সোনা রখন আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না বলে আবদুলই বলল, কাইল দই চিড়া খাইতে আইতাছি। তোমার জ্যেঠিমা খাইতে কইছে।

সোনা যেন এতক্ষণে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে। সে বলল, ঠিক আসবি কিন্তু। তা নাহলে জ্যেঠিমা খুব কষ্ট পাইব।

আবদুল আর কিছু বলল না। ওর চার পাশে ছোট ছোট কাচ্চাবাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ছুঁয়ে দেবে বলে সে বলল, যাই ঠাকুর। কারণ সে জানে, ওর আর বয়স কত, তবু

জেনে ফেলেছে।

সে এই ছোট ছোট শিশুদের ছুঁতে পারে না। কী সব সুন্দর ডলপুতুলের মতো মুখ। ওর এইসব শিশুদের বড় আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। বিশেষ করে সোনার বোনটিকে। ফ্রক গায়ে, ববকাট চুলে ঢলঢলে মুখে আবদুলকে দেখছিল আর সোনার দিকে তাকিয়ে বলছিল দাদা ও তোমার স্কুলে পড়ে? তোমার বন্ধু? কতটুকু মেয়ে, কি সুন্দর কথা বলছিল।

সোনা বলল, আমার ছোট বোন।

আবদুল বলল, কি গ বইন আমার কোলে উঠবা? বলেই সে আবার কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। বলল, নারে ঠাকুর যাই। বেলা বাড়ছে। বাড়ি তাড়াতাড়ি না ফিরলে চিন্তা করব।

—কিছু খাইলি না?

বড় জ্যেঠিমাকে সে ডেকে বলল, অরে কিছু খাইতে দ্যান। কতদূর থাইকা আইছে।

ছিঃ ছিঃ কী যে ভুল হয়ে গেল। বড়বৌ তাড়াতাড়ি দক্ষিণের ঘরে ছুটে গিয়ে শশীভূষণকে বলল, ওদের একটু খেতে দিচ্ছি, ওদের বসতে বলুন, ওরা কতদূর থেকে আসছে খবর দিতে।

আরও সব দলবল আসছিল। দুজন তিনজন একসঙ্গে। ওরা এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কারণ, কেউ কোনও খবর আনতে পারেনি। পাঁচ দশ ক্রোশ জুড়ে যে অঞ্চলে, পাগল মানুষ সবার কাছে পীরের মতো অথবা তিনি যখন হেঁটে যান, পুণ্যবান মানুষেরা ভাবে ধরণী ক্রমে শীতল হচ্ছে, কোন পাপবোধ আর জেগে থাকবে না। সেই পয়মন্ত হাতির মতো, লক্ষ্মীরূপা। করুণা বর্ষণ করবেন তিনি। পাগল মানুষ হেঁটে গেলেই সবাই এমন টের পেয়ে যায়।

বড়বৌ সব ছাত্রদের জন্য দু'কাঠা মুড়ি বের করে দিল। নারকেল কোরা করে দিল এক গামলা। আর এক হাঁড়ি গুড় বের করে দিল। প্রায় বাল্য-ভোগের মতো ব্যাপারটা দাঁড়াল। ওদের বার- বাড়িতে ডালায় ডালায় সাজিয়ে দিল। লালটু-পলটু এসেছে। ওরাও ছুটে গেছে, এবং জল, যা ওরা চাইছে এনে দিচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, কোথায় যে গেলেন তিনি!

শশীভূষণ বললেন, সকালে বড়বৌদি দেখেছিলেন তিনি দরজার পাশে বসে আছেন। তারপর এত মানুষের চোখে ধুলা দিয়ে কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

বড়বৌ সব শুনেও কোন কথা বলছে না। যখন গেছেন আবার ফিরে আসবেন। যে-বারে হাতিতে চড়ে নিখোঁজ হলেন, কেউ এসে কোনও খবর দিতে পারেনি। অথচ এক

বিকেলে সোনা এসে খবর দিয়েছিল হাতিটা উঠে আসছে। সব মানুষ এসে জড় হয়েছিল অর্জুন গাছটার নিচে। আশ্বিনের কুকুর ঘেউঘেউ করে ডাকছে। একবার হাতিটার দিকে ছুটে যাচ্ছে আবার উঠে আসছে বাড়িতে। প্রথমে হাতিটা বিন্দুবৎ ছিল। চোখের নজরে আসে না। এত বড় মাঠের ওপারে কড়া রোদের ভিতর একটা বিন্দু ক্রমে বড় হচ্ছিল, হতে-হতে কখন যে হাতি হয়ে গেল!

সুতরাং যেন এ-বাড়িতে একজন মানুষ এই অসময়ে নিখোঁজ হয়ে গেছেন বলেই যা কষ্ট। এবং এত খোঁজাখুঁজি। অন্য সময় হলে কেউ এত ভাবত না। বড়বৌ জেগে থাকত শুধু। যেমন সে প্রতিবার জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। কখনও-কখনও কিছু চিঠি, বিয়ের পরই যে-বার মণীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে কিছু চিঠি দিয়েছিলেন বড়বৌকে সেই সব চিঠি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। পড়তে-পড়তে কোনও-কোনও দিন রাত কাবার করে দেয়। বড়বৌর এতটুকু কষ্ট হয় না তখন।

তিনি আসবেন। ফিরে আসবেন। কাজের বাড়ি। এখন আর এ-নিয়ে ভেবে লাভ নেই। শুধু এমন একটা দিনে তিনি বাড়ি নেই ভেবে ভিতরটা বড়বৌর ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

শশীভূষণ পরদিন সকালে সকালে স্নান করলেন। ওঁর কাজ শুধু আপ্যায়ন। সবাই এসে এ- সংসারে যার খোঁজ প্রথমে করে— সে মণীন্দ্রনাথ। শশীভূষণ সকাল থেকেই টের পাচ্ছিলেন, একটা কথাই তাঁকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার-বার বলতে হবে। না তিনি বাড়ি নেই। নিরুদ্দেশে গেছেন। যেমন যান মাঝে-মাঝে তেমনি গেছেন।

এবং এই এক প্রশ্নের উত্তর সারাদিন ওঁকে দিয়ে যেতে হবে।

—কখন গেলেন?

—সকালের দিকে।

—কেউ দেখেনি কোন দিকে গেছেন?

—না। কুয়াশা ছিল।

—এদিকে জানতাম তিনি বাড়িতেই থাকতেন। বেশীদূরে যেতেন না।

—যেতেন না?

—অন্য কিছু কী হয়েছিল?

—অন্য কিছু কী আর হবে! তবে পাগল মানুষ তো আর শ্রাদ্ধে বসতে পারবেন না। বুড়ো কর্তা মেজ ছেলেকে শ্রাদ্ধের মালিক করে গেছেন।

—পাগল মানুষ কাছে ছিলেন তখন?

—তা ছিলেন।

—এই তো গণ্ডগোলের ব্যাপার। উনি তো পাগল বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তা ছিলেন না। সব বুঝতেন। হয়তো খুব কষ্ট হয়েছে মনে।

—হয়তো তাই।

—শুনেছি সংসারে এই বুড়ো মানুষটার ওপরই যত রাগ ছিল।

—তাও শোনা যায়।

—হয়তো সে-জন্য শ্রাদ্ধে বাড়ি থাকলেন না। অভিমানে দূরে সরে রয়েছেন। সব কাজকাম চুকে গেলেই আবার বাড়ি ফিরে আসবেন!

—আমারও তাই মনে হয়।

কোনও রকমে দায়সারা উত্তর দিয়ে আবার যারা গোপাট ধরে উঠে আসছেন তাঁদের দিকে ছুটে যাওয়া।

—কবে বের হয়ে গেলেন?

—বুড়ো কর্তা মারা গেলেন রাতে। সারাদিন সবার সঙ্গে শ্মশানেই ছিলেন। বিকেলের দিকে দাহ শেষ। রাতে সোনার ভীষণ ভয় পেয়ে জ্বর! তিনি সারা রাত ঘরের পৈঠায় বসে। ভোরের দিকে বড়বৌদি দেখেন, নেই। পলটু খুঁজতে গেল লালটু গেল। কাছে কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি জবাব শেষ করতে হবে। কারণ, বোধ হয় পাঁচদোনার বড় শরিকের ছোটকর্তা দলবল নিয়ে উঠে আসছে।

—মণি এখন কেমন আছে?

—ভাল আছে।

—ডাকেন একবার মণিরে দেখি।

—উনি বাড়ি নেই। এদিকে আসুন। ফরাস পাতা লম্বা চালাঘরে।

—না, এখানে বসব না।

—ঈশম, ঈশম এদিকে এস। ওঁদের নিয়ে যাও যেখানে শ্রাদ্ধ হচ্ছে সেখানে ওঁদের নিয়ে যাও। চোয়াড়ির পাশে চেয়ার পেতে দাও।

—মহাভারত কে পড়ছে?

—সূর্যকান্ত।

—মহামহোপাধ্যায় সূর্যকান্ত। না কাঠালিয়ার সূর্যকান্ত?

—মহামহোপাধ্যায় সূর্যকান্ত।

ঈশম ষাঁড় বাছুর নিয়ে যাচ্ছে। বৃষকাঠে ষাঁড়টা সে বেঁধে রাখবে। সে কাছে এসে বলল,

আসেন কর্তা।

—যাক বাঁচা গেল। আবার দক্ষিণের মাঠে সারি-সারি মানুষ। ওরা কারা! শশীভূষণ কপালে হাত তুলে, দূবের মানুষ লক্ষ করার চেষ্টা করলেন। তিনি এ-অঞ্চলে চার-পাঁচ বছরের উপর রয়েছেন নানা কারণে এ-অঞ্চলের মানুষেরা তার কাছে এসেছে। বেশির ভাগ বিদ্যালয়-সংক্রান্ত ব্যাপারেই ওরা আসত। তিনি প্রায় সবাইকেই চেনেন। হাতে মোটামুটি সবার একটা লিস্ট আছে। লোকজন খাবে প্রায় হাজার হবে। তারপর আছে অলিক ভোজন। গরিব দুঃখী মানুষেরা এখনও উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ওরা গোপাটে সারি সারি মাদার গাছের নিচে কলাপাতা কেটে বসে রয়েছে কর্তাবাবুদের খাওয়া হলে ওরা খাবে।

শশীভূষণ বললেন, ভিতরে যান।

যাঁদের ভিতরে পাঠাবার তিনি তাঁদের ভিতরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যারা ফরাসে বসবে তিনি তাদের ফরাসে বসাচ্ছেন। যাদের দাঁড়িয়ে থাকার কথা, তিনি তাদের দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

শশীভূষণও সারাদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন। বসার বিন্দুমাত্র সময় পাননি সকাল থেকে দই। ক্ষীরের ভাঁড় আসছে-তো আসছেই। সার বেঁধে।

ঠিক, সেই পালকি কাঁধে বেহারা যায় হুঁ হোম না—তেমনি ওরা দই অথবা ক্ষীরের ভাঁড় নিয়ে মাঠের উপর দিয়ে সারি সারি চলে আসছে। শশীভূষণ বার-বাড়িতে দাঁড়িয়ে লাঠি তুলে ইশারা করছেন শুধু। কোথায় গিয়ে নামানো হবে তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন।

শ্যামাজ্যাঠা এসেছেন লাধুরচর থেকে। তিনি এসেই প্রথম খবরটা দিলেন। বললেন চন্দ্রনাথের মেলায় ত্রিকট পাহাড়ের নিচে পাগল ঠাকুরকে কারা দেখে এসেছে। গৈরিক বসন পরনে। একটা বড় বটগাছের নিচে তিনি বসে রয়েছেন। সামনে ধুনি জ্বলছে। পাশে কীর্তন করছে কিছু লোক। যে দেখেছে সে কাছে যেতে পারেনি। তাকে যেতে দেওয়া হয়নি। সে দূরে দাঁড়িয়ে প্রণিপাত সেরেছে।

একটু থেমে শ্যামাজ্যাঠা বললেন, সে ভেবেছিল এসেই খবর দেবে তোমাদের। ফাল্গুন মাসের মেলায় সে যেতে পারেনি। পরে তীর্থ করতে বের হয়ে ফেরার পথে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গেছে।

লোকজনের ভিড় কমেনি। কিছু সাধুসজ্জন ব্যক্তি তখনও গাছের নিচে কুটির বানিয়ে বসে আছেন।

শশীভূষণ বললেন, সে কবে ফিরে এসেছে?

—কাইল ফিরা আইছে।

—ওর নাম কি?

তারে আমি চিনি না। আমাদের গাঁয়ে মহাদেব সাহা আছে, ও শুইনা আইছে।

শশীভূষণ বললেন, ঠিক দেখেছে তো?

—না দেখলে কয়? মণির মতই হুবহু দেখতে।

—কবে দেখেছে?

—চাইর পাঁচ দিন আগে। কাইল আইছে। মণি কত জায়গায় যায় গিয়া, এবারে হয়তো চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চইলা গেল। কথাটা মুহূর্তে সারাবাড়ি রটে গেল। বড়বৌ শুনে মাথার ঘোমটা আরও টেনে শ্যামাজ্যাঠার সামনে এসে গড় হয়ে প্রণাম করল।

শ্যামাজ্যাঠা বললেন, ভাল আছ বৌমা?

মাথায় ঘোমটা বড়বৌর। কথা বলতে পারছে না। শুধু মাথা সামান্য নিচু করে রাখল। এসময় ভালো থাকার কথা! তবু বলতে হয় বলে যেন বলা, মণি ত আর মানুষ না বৌমা। মনুষ্যকুলে দেবতার জন্ম। সে কেন তোমার ঘরে আটকা থাকব!

বড়বৌ এবার লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, অত দূরে তো উনি কখনও যেতেন না।

—গেল। ইচ্ছা হইল, চইলা গেল।

বড়বৌ জানে, তিনি না ফিরে পারবেন না। যেখানে যত পাহাড়-পর্বত থাকুক, দেবতার নির্দেশ থাকুক, সন্ত মানুষের আড্ডা থাকুক, মানুষটা যখনই বড়বৌর মুখ মনে করতে পারবেন তখন সব ফেলে ফিরে না এসে পারবেন না।

বড়বৌ বলল, একবার ভালো করে খোঁজ নিলে হতো না?

—আমি কাইল মহাদেবকে নিয়া যামু ভাবছি। নিজের কানে না শুনলে মন মানব ক্যান। পরশু তোমারে খবর দিয়া যামু!

ভূপেন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ সবাই জড় হয়ে বললেন, ঈশম যাউক খবর আনতে। আপনে মহাদেবের কাছে একটা চিঠি লিখা দ্যান। একেবারে য্যান খবর ঠিক পাইলে নারাণগঞ্জে চইলা যায়। সেখান থেকে চাঁটগাঁ মেলে। এসব কাজে দেরি করা ভালো না। তাইন ত এক জায়গায় বেশি দিন থাকেন না।

শশীভূষণ বললেন, ঈশমের পক্ষে এ-কাজ একা করা কঠিন। বরং আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, তবে ত খুব ভাল হয়!

এমন সময় লালটু এসে খবর দিল শশীভূষণকে, জ্যেঠিমা আপনারে ডাকে।

—বল যাচ্ছি। তিনি এই বলে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেলেন। বেতের একটা বড় লাঠি আছে ঘরে। কবে একবার ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের মেলায় গিয়েছিলেন, মোটা হলুদ রঙের বাঁকানো লাঠি নিয়ে এসেছিলেন এক আঁটি। শশীভূষণ পছন্দ মতো একটা চন্দ্রনাথের লাঠি নিয়ে রেখেছিলেন। যাবার সময় এটা সঙ্গে নেবেন ভাবলেন। কিন্তু লাঠিটা ঠিক জায়গায় আছে কি-না দেখার জন্য দক্ষিণের ঘরে ঢুকতেই দেখলেন, বড়বৌ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

—আপনি যাচ্ছেন?

—ঈশম এত কথা বলতে পারবে না। আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

—আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, ওঁর হাতে কিছু কালো-কালো দাগ আছে; তা সে দেখেছে কি-না।

—কালো দাগ!

—কেন, লক্ষ করেননি?

—না তো!

—হাত কামড়ে ফালা ফালা করে ফেলত একসময়। হাতে সে-সব বড়-বড় দাগ আছে। সব মিলে গেলেও ওটা দেখে নেবেন।

শশীভূষণ বললেন, ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না। পেলে একেবারে ধরে নিয়ে আসব। আপনি কান্নাকাটি করবেন না।

—না রে তাই। আমার কান্নাকাটি কবেই শেষ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এখন শুধু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমি মানুষটার জন্য আর কাঁদি না। তারপরই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে-যেতে বলল, ধনকে বলছি আপনাদের খাবার দিতে! আপনারা খেয়ে নিন।

সোনা দেখল বড়জ্যেঠিমা লম্বা ঘোমটা টেনে ওর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ এ- বাড়িতে এসেছে যিনি জ্যেঠিমার গুরুজন। মার মতো লম্বা ঘোমটা বড় জ্যেঠিমাকে দিতে দেখে ভারি কৌতূহল হল সোনার। সে ডাকল, জ্যেঠিমা।

—এখন ডাকে না বাবা। কত কাজ! তোর জ্যাঠামশাইকে আনতে যাচ্ছেন মাস্টারমশাই। ওঁদের এখন খাবার দিতে হবে।

তোর মা কোথায় রে?

জ্যাঠামশাই এত দূরে যেতে পারেন ওদের ফেলে — সোনার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে বলল, মা কোথায় জানি না জ্যেঠিমা। আমার খিদে পেয়েছে। খাব। কেউ আমাকে খেতে দিচ্ছে না।

বড়বৌ জানে সোনা কী খেতে চায়। দই ক্ষীর খেতে চায়। বড় অভাগা মনে হয় সোনাকে। সে দই-ক্ষীর কিছুই খেতে পাবে না। সে-ঝোল-ভাত খাবে। সকালে হেলাঞ্চার ঝোল দিয়ে ভাত দেওয়া হয়েছে। ওর খিদেটা চোখের খিদা। সে জ্যেঠিমার কাছেই একটু যা অনিয়ম করার অধিকার পায়। বড়বৌ তাকে লুকিয়েচুরিয়ে এটা-ওটা খেতে দেয়। আজ সে একটু মুড়ি দিয়ে ক্ষীর খাবে। সবাই যেমন খাচ্ছে। কিন্তু তাকে কে দেয়! বাড়িতে উৎসব হলেই ওর কোনও না কোনও অসুখ হয়। সে তখন চুপচাপ বসে থাকে। কখন জ্যেঠিমা আসবে অপেক্ষায় থাকে। জ্যেঠিমা এলেই যে সে খেতে পাবে।

বড়বৌ বলল, না বাবা, আজ খাবে না। আজ তোমাকে আমি কিছু দেব না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। বলেছি তো ভালো হলে সব পাবে।

তবু সোনা ঘ্যানঘ্যান করছে দেখে বড়বৌ আর দাঁড়াল না। বড্ড খাই-খাই হয়েছে সোনার। সে এতটা দায়িত্ব নিতে পারছে না। ক্ষীর-দই দু-ই সোনার পক্ষে অপকারক। সুতরাং সে আর দাঁড়াল না। ধনকে খোঁজার জন্য বড় ঘরে উঁকি দিল।

আর তখনই সোনা অবাক চোখে দেখল ফতিমা আস্তে আস্তে এদিকে পা টিপে টিপে আসছে। ওর নানী আসছে লাঠি ভর দিয়ে। ওর নানী সোজা হতে পারে না। একেবারে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। বুড়োকর্তার কাজকাম হচ্ছে, মানুষজন খাবে, সামসুদ্দিনের মা কিছুতেই বাড়িতে বসে থাকতে পারছিল না। অলিজান বার-বার বলেছে, আপনে, এই শরীর নিয়া যাইবেন কি কইরা?

—যামু ঠিক চইলা যামু। সে ফতিমাকে বলল, বইন, আমার লগে ল।

ফতিমা এসেছে গতকাল। ওদের গ্রীষ্মের ছুটি হয়েছে কবে। কথা ছিল গাঁয়ে আসবে না কিন্তু ফতিমা বাড়ি আসার জন্য কান্নাকাটি করেছে; নানীকে দেখার ইচ্ছে ওর যে কত! বস্তুত ফতিমার সেই বাবুটির জন্য বড় মায়া। সে যত বড় হচ্ছে, বাবুটির জন্য কোমল ভালোবাসা বুকের ভিতর গড়ে উঠছে। সে নিজেও বুঝতে পারে না, মাঝে-মাঝে তার বাড়ি

ফিরে আসতে এত ইচ্ছা হয় কেন, শহর ভালো লাগে না কেন! কতক্ষণে সে রেলগাড়িতে চড়ে নারায়ণগঞ্জে চলে আসবে। তারপর স্টিমারে বারদী এবং তিন ক্রোশের মতো পথ হেঁটে আসতে হয়। ওর তখন যেন পথ ফুরায় না! চারপাশের গাছপালা পাখি ফেলে সে ছুটে আসে, আসতে-আসতে যখন সেই অর্জন গাছটা দেখতে পায় তখন সে ছুটতে থাকে। এবারেই প্রথম সে ছুটতে পারছে না। সে যে বড় হয়ে যাচ্ছে, সে যে ফতিমা, শাড়ি পরেছে সুন্দর করে, কপালে কাচের টিপ, দুই বিনুনি বাঁধা মেয়ে, একেবারে কচি কলাপাতা রঙের যেন সবুজ ধান্য অবুঝ হয়ে আছে। সে ধীরে-ধীরে হেঁটে-হেঁটে বাড়ি ফিরছে। সকালে সে পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়েছে, সোনাবাবুকে অর্জুন গাছের নিচে দেখা যায় কি-না দেখলেই সে মাঠে নেমে আসত কিছুটা। হাত তুলে ইশারা করত। তারপর সেই গাঁয়ের ছোট্ট নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু গল্প করা। কী যে এত গল্প, ফতিমা নিজেও বোঝে না। ঢাকা শহরে সোনা কবে যাবে মাঝে-মাঝে এমন বললে, সোনা চুপ করে থাকে, কবে সে যেতে পাবে জানে না। ফতিমার দুঃখ বার-বার এক দুঃখের প্রকাশ, ওর একা-একা ভালো লাগে না। সে একদিন স্বপ্ন দেখেছে, বড় একটা ঢিবির মাথায় সে, সোনা, এবং পাগল জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছেন।

ফতিমাকে দেখেই সোনার মনে হল ফতিমা ঠিক অমলা-পিসির মতো বড় হয়ে গেছে। সে আর সোজা তাকাতে পারছে না।

সোনা বলল, ফতিমা, তুই বড় হয়ে গেছিস?

—যান। ফতিমা ফিক করে হেসে ফেলল।

—হ্যাঁরে, দিদিকে বলে দেখ। সোনা সামসুদ্দিনের মাকে সাক্ষী মানল।

ফতিমা ওসব কথায় গেল না। বলল, আপনের অসুখ। কি হইছে সোনাবাবু? আপনারে দেখতে আইছি।

—জ্বর। টাইফয়েডের মতো হয়েছিল।

—আপনি বড় রোগা হয়ে গেছেন।

—তাই বুঝি! তুই কতদিন থাকবি?

—বা'জি কইছে দুই-চার দিন পর আসব।

—তুই তখন চলে যাবি?

—পাগল! আমি কমু অসুখ হইছে আমার। যামু না। বলেই আবার বোকার মতো ফিক করে হেসে দিল।

—তোদের পরীক্ষা হয়ে গেছে?

—হবে। স্কুল খুললেই হবে।

—ইংরেজিতে কত পেয়েছিস?

—বাষট্টি।

অন্যান্য বিষয়ের কথাও সে বলল। প্রায় যেন এখন সোনা ওর সমবয়সী নয়! অনেক বড়। আর ফতিমাও ছোট্ট মেয়ের মতো জবাব দিয়ে যাচ্ছে। কোনও কুণ্ঠা নেই। বস্তুত ফতিমা বাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলেই খুশি। সোনা বলল, আরবিতে কত পেয়েছিস?

—আমি সংস্কৃত নিয়ে পড়ছি সোনাবাবু।

—কত পেলি?

—আটানব্বই।

—বলিস কি!

—আমি ফার্স্ট হয়েছি সোনাবাবু। বা'জি আমারে এই শাড়িটা কিনা দিছিল। বা'জি কইল তুই কী নিবি ফতিমা, কী চাই? ফার্স্ট হইলে তরে যে কইছিলাম কিছু দিমু। আমি কইলাম, আমাকে একটা শাড়ি কিনে দিবেন। আমি শাড়ি পরমু। এই শাড়িটা, পইরা আইছি। আমায় ভাল লাগছে না দেখতে! বলে কেমন এক শিশু-সরল মুখ নিয়ে সোনার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন সে বাবুরে খুশি করার জন্য শাড়ি পরে এসেছে। খুশি করার জন্য ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে।

সোনা বলল, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ফতিমা। তুই দেখছি আস্তে-আস্তে জ্যেঠিমার মতো কথা বলতে শিখে যাচ্ছিস। তোকে দেখতে অমলা-পিসির মতো লাগছে। বলেই সোনার মনে হল শহরে থাকলে বুঝি সবাই অমলা-পিসির মতো হয়ে যায়। ফতিমাও হয়ে গেছে। সে তো এখন কত কিছু জেনে ফেলেছে। সে বলল, আমি ভালো হলে একদিন তোদের বাড়ি যাব। তারপর তুই আমি জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে বের হব।

—জ্যাঠামশাই বাড়ি নাই?

— না।

—সোনাবাবু, আপনি কবে ভাল হবেন? মা চলে যাবে। বা'জি এসে মাকে নিয়ে যাবে। নানীকে বলে আমি থেকে যাব। আপনি কবে ভাল হবেন? আমি ঠিক যাব। কেউ টের পাবে না।

সোনা চুপ করে থাকল। মা এদিকে আসছে। মা এসেই বলল, কী রে ফতিমা, তুই! তোর নানী! বস। তুই কত বড় হইয়া গ্যাছস। কী গ পিসি, তোমার নাতনী ফুলপরী সাইজা আইছে দেখছি।

—ভাবছি, আপনেগ বাড়ি রাইখা যামু নাতনীরে। তাই ফুলপরী সাজাইয়া আনছি। কী গ সোনাবাবু, পছন্দ লাগে?

সোনা বলল, মারব তোমাকে বলে দিচ্ছি দিদি।

ধনবৌ বলল, কি কও সোনা। এমন কথা কইতে নাই।

—তবে দিদি আমারে ক্ষেপায় ক্যান?

এত সব কথায় ফতিমা ভারি লজ্জা পাচ্ছিল। সে মাথা নিচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ফতিমা সোনাবাবুর দিকে আর কিছুতেই তাকাতে পারছে না। তাকালেই যেন সে সোনাবাবুর কাছে ধরা পড়ে যাবে। সে যে সবুজ ধান্য অবুঝ হয়ে আছে, তা ধরে ফেলবে সোনাবাবু।

দিন-দশেক পর শশীভূষণ এবং ঈশম ফিরে এল। ওরা মহাদেব সাহার লোককে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এত বড় মানুষকে দেশ- দেশান্তরে খুঁজতে যাওয়া ভাগ্যের কথা। ওরা এসে খবর দিল, না পাওয়া গেল না।

বড়বৌ, শচীন্দ্রনাথ, এমন কী বাড়ির সবাই, ওরা ফিরে আসছে দেখতে পেয়েই পুকুর পাড়ে নেমে গেল। সে খানেই শশীভূ ষণ সবাইকে বললেন, না, তিনি সেখানে নেই। যাঁকে সন্দেহ করে খুঁজতে যাওয়া তিনি ছ-সাত দিন আগে কামাখ্যা দেবী দর্শনে চলে গেছেন।

—তিনি কে? বড়বৌ সহসা লোক-লজ্জার মাথা খেয়ে একদল লোকের সামনে এমন প্রশ্ন করে বসল।

—কেউ এমন কিছু খবর দিতে পারল না। বিশ্বনাথের মন্দিরে কিছু পাণ্ডাদের কথাটা বললাম। ওরা বলল, তিনি তো মৌনী-বাবা। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। প্রথম দিন এসেই পিপুল গাছের নিচে বসেছিলেন। ওঁর কি চেহারা! রাজপুরুষের মতো চেহারা। সংসারবৈরাগ্যে যেন তীর্থে চলে এসেছেন।

—ওঁর হাতে কোন কালো কালো দাগ ছিল?

শশীভূষণ বললেন, ওরা কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল, ত্রিকূট পাহাড়ের নিচে তিনি চুপচাপ পিপুল গাছের নিচে বসেছিলেন। পরনে যতদূর মনে পড়ে লালকাপড়।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, ওঁর গালে অশৌচের দাড়ি থাকার কথা।

—না, তেমন কোন অশৌচের দাড়ি ছিল না। মাথা মুণ্ডন করা। রাশি-রাশি লোক ওঁকে দেখেই ভিড় করেছিল। বোধ হয় তিনি এত মানুষের ভিড় দেখেই সেখান থেকে পালিয়েছেন।

—কিন্তু বললেন যে, কামাখ্যা দর্শনে গিয়েছেন?

—ওটা ওদের অনুমান। কেউ কিছু ঠিক বলতে পারছে না।

সবাই বাড়ি উঠে এল। মানুষটার খোঁজ পাওয়া না গেলে যা হয়, বড়বৌ আবার সেই সংসারের কাজের ভিতর ডুবে গেল। তিনি ফিরে আসবেন। যখন নিরুদ্দেশে গেছেন তখন ফিরে আসবেন।

তার পর এলেন ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন এক বড় তান্ত্রিক। তান্ত্রিক নখের উপর এক মায়া দর্পণ সৃষ্টি করবেন। তাতে মানুষটা কোথায় বসে আছেন অথবা হাঁটছেন দেখা যাবে। সবচেয়ে যে প্রিয় মানুষ তাঁর নখে সবচেয়ে ভালো ছবি ফুটে ওঠে। তিনি আরও কিছু খবর নিয়ে এলেন এ সময়। দেশভাগের খবর। শরৎ বসু মশাই ময়মনসিং-এ মিটিং করে গেছেন। তিনি এই দেশভাগের বিরুদ্ধে। পণ্ডিতজী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল খুব এগিয়ে গেছেন। কেবল এখন মহাত্মাজীর উপর সব নির্ভর করছে।

তান্ত্রিক থাকবেন দু'দিন। তাঁর খাদ্যদ্রব্যের বিরাট তালিকা। নিশি রাতে তিনি তন্ত্র আরাধনায় বসবেন। সুতরাং তন্ত্রাচারের যা যা দরকার তার একট ফর্দ করতে করতে বললেন, তবে মহাত্মাজী বাইচা থাকতে দেশভাগ হবার নয়। যা কিছু আশা এখন আমাদের তাঁর ওপর।

শশীভূষণ বললেন, যেভাবে চার পাশে দাঙ্গা হচ্ছে, কী যে হয় কিছু বলা যায় না।

তান্ত্রিকমশাইর জটা খুলে দিলে মাটিতে এসে পড়ছে। সোনা, লালটু এবং শোভা আবু অথবা কিরণ এবং গ্রামের ছেলেরা ভয়ে আর ওদিকে যাচ্ছে না। চোখ বড়-বড়। টোপা কুলের মতো লম্বা চোখে কাজল এবং ভস্মমাখা শরীর। লাল রঙের আলখাল্লা এবং বড় কমন্ডুল, হাতে ত্রিশূল। ওঁর মুখে বম্-বম্ ভোলানাথ শব্দ। শশীভূষণের বড় রাগ হচ্ছিল। কারণ এই মানুষটা তাঁর ঘরে রাত কাটাবে আজ। ওঁর কেমন ভয় ধরে গেল প্রাণে। অথচ মুখে কিছুই বলতে পারছেন না। ভূপেন্দ্রনাথের উপর মনে-মনে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছেন। ভূপেন্দ্রনাথ যে দেশভাগের ব্যাপারে এত কথা বলে যাচ্ছেন তাঁর কথার আর একটাও জবাব দিচ্ছেন না। দিলেই যেন বলতে হয়, এগুলো যে আপনার কী হয় করে! যত সব আজে-বাজে লোক ধরে আনা।

ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, বোঝলেন মাস্টারমশাই, এবার ঠিক দাদার খোঁজ পাইয়া যামু।

শশীভূষণ একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। তিনি সেটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। এখন নানা রকমের তিনি কথা বলবেন। এই জটাজুটধারী তান্ত্রিক মানুষ সম্পর্কে এমন

ইমেজ তৈরি করবেন যে, তাঁর আর শোনার ধৈর্য থাকবে না। মাথা তাঁর গরম হয়ে যাবে। সেজন্য তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে দিয়ে গোপাটের দিকে বের হয়ে গেলেন।

—একেবারে ম্লেচ্ছ। লেখাপড়া শিখলে এই হয়। যেন ভূপেন্দ্রনাথের এমন বলার ইচ্ছা।

তান্ত্রিকের কথামতো বড়বৌ সকাল-সকাল স্নান করেছে। হোমের বিবিধ-ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়েছে। লালপেড়ে শাড়ি এবং কপালে বড়বৌ আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বড় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছে। তাকে সেই মানুষের সামনে চুপচাপ বসে থাকতে হবে। হোমের নানাবিধ আচারের পর বড়বৌর বাঁহাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখে ঘি মেখে আগুনের উপর কিছুক্ষণ ধরে তিনি বললেন, নখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন মা?

—না।

—ভাল করে দেখুন। বুড়ো আঙ্গুলটা চোখের আরও কাছে নিয়ে আসুন—এবারে নখে মায়া দর্পণ সৃষ্টি হবে।

—না, কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

খুব গম্ভীর গলায় হেঁকে উঠলেন, ভালো করে দেখুন।

দর্পণের উত্তর দিকটায় ছায়ামতো কিছু ভেসে উঠছে কিনা দেখুন।

সবাই গোল হয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। উঠানে সব গ্রামের লোক ভেঙে পড়ছে। বড়বৌ ঘামছে। রোদ এসে ওর কপালে পড়েছে। সিঁদুর গলে গিয়ে সারা মুখ লাল। বড়বৌ কাপছিল! দেখতে পাচ্ছেন?

দেখতে পাচ্ছি।

—কী দেখতে পাচ্ছেন?

—তিনি হেঁটে যাচ্ছেন।

—কোন দিকে?

—উত্তরের দিকে?

—তারপর কী দেখছেন?

—একটা গাছের নিচে বসলেন।

—এখন কী করছেন?

—কিছু না।

—কিছু দেখতে পাচ্ছেন আর?

—কিছুই না। হ্যাঁ, একটা আমবাগান মনে হচ্ছে।

—আর কিছু?

—চারপাশে কত লোক বসে রয়েছে।

—আর কিছু?

—সবাই ওঁর কাছে কিছু চাইছে।

—কাউকে কিছু বলছেন না?

—না।

—এবারে দর্পণের পশ্চিম দিকে তাকান। কেউ ওঁর দিকে হেঁটে আসছে মনে হয় না?

—একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

—সে কে?

—আপনার মতো মুখ।

—না-না, আমার মতো মুখ হবে কেন? ভাল করে দেখুন। বড়বৌ কিছু আর বলতে পারল না। মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। সবাই ধরাধরি করে ওকে তুলে নিয়ে পুবের ঘরে শুইয়ে রাখল।

সোনার মনে হল, এক লাথি মারে সবকিছুতে। সে সন্তর্পণে ভিড়ের ভিতর থেকে ওর কমন্ডুল চুরি করে নিয়ে ঘাটের জলে ডুবিয়ে রাখল। খোঁজ এবার। দেখাও বাবু তোমার কত হিম্মৎ, নিরুদ্দেশে গেছে কমণ্ডুল। বের কর খুঁজে।

বিকেলের দিকে কমন্ডুল খুঁজতে গিয়ে তান্ত্রিক মানুষ দেখে ওটা ওর থলের ভিতর নেই। কে নিল! সারা বাড়ি হৈচৈ খোঁজাখুঁজি। সারা বাড়িতে কেউ বলতে পারল না কমন্ডুল হেঁটে-হেঁটে কোথায় চলে গেছে। সোনা বলল, আমি বলতে পারি মাস্টারমশয়।

—কোথায়?

—দাঁড়ান। বলে সে নিজের নখ নিজে দেখে বলল, মনে হয় কমন্ডুল হেঁটে যাচ্ছে।

—কোনদিকে?

—পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে।

—তারপর?

—টুপ। জলে ডুবে গেল।

মাস্টারমশাই এবং সোনা উভয়ে হেসে উঠল। যা, বের করে দিয়ে আয়। নয়তো আবার তোকে ছোটকর্তা মারবে। তান্ত্রিক ব্যাটা বড় ফাঁপরে পড়ে গেছে।

সোনা বলল, আমার একা যেতে ভয় লাগে।

—কোথায় ডুবিয়ে রেখেছিস?

—আমগাছটার গোড়ায় যে ঘাট তার ডান দিকে শ্যাওলার নিচে।

শশীভূষণ কমন্ডুল তুলে এনে তান্ত্রিকমশাইর সামনে রেখে চুপি-চুপি বললেন, ভড়ংবাজি ছাড়ুন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছাল চামড়া তুলে নেওয়া হবে।

তান্ত্রিক মানুষটি মুখ গম্ভীর করে ফেলল।

পরদিন সকালে সবাই দেখল মানুষটি নেই। দুপুররাতে চলে গেছে কাউকে না বলে।

ভূপেন্দ্রনাথ ভয় পেয়ে গেলেন। কোথায় কী অনিয়ম হয়েছে, তিনি রেগে গেছেন। তিনি না বলে চলে গেলেন! এসব মানুষের রোষে পড়লে নানাভাবে অমঙ্গল দেখা দিতে পারে সংসারে। সেজন্য সারাদিন ভূপেন্দ্রনাথ বড়ই বিমর্ষ থাকলেন।

তার কিছুদিন পরই সোনা বের হল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে। সবশেষে সে একবার চেষ্টা করে দেখছে।

সে সকাল-সকাল দুটো খেয়ে নিল। মাকে সে কিছু বলল না। সে দুটো বড়শি নিল। নদীর জলে মাছ ধরতে যাচ্ছে বলে বের হয়ে গেল। কারণ, এখন নদীতে জল কম। সোনা বড়শিতে ভালো মাছ ধরতে পারে। এখন বেলে মাছেরা বর্ষার জল পেলেই উঠে আসবে। খুব বড় নয়। ছোট-ছোট বেলে। সে বড়শি এবং একটা ঘটি সঙ্গে করে মাঠে নেমে গেল। ওর শরীরের সেই রুগ্‌ণ ভাবটা কেটে গেছে। এখন সে খুব তাজা। সামনে সব মাঠ আছে। মাঠে পাট গাছ ওর বুকসমান। দু'দিন যেতে না যেতেই সব পাট ওর মাথার উপর উঠে যাবে। উঠে গেলে তাকে কেউ আর দেখতে পাবে না। তাজা পাট গাছের নিচে সোনার রুগ্‌ণ ভাবটা একেবারে মুছে যাবে।

গোপাটে নেমেই মনে হল ফতিমা এখনও ঢাকায় যায়নি। ফতিমাকে সে সঙ্গে নিতে পারে। কিন্তু ফতিমা হয়তো যাবে না। সে বড় হয়ে গেছে। ফতিমা বড় হয়ে গেছে। সে একা-একা কোথাও এখন চলে যেতে পারে, কিন্তু ফতিমা পারে না। তবু কেন জানি সে

যে জ্যাঠামশাইকে মাছ ধরার নাম করে খুঁজতে বের হচ্ছে সেটা একবার ফতিমাকে না জানালে যেন নয়। কারণ, কেন জানি সোনার অসুখের ভিতর বার বার মনে হয়েছে সে না গেলে জ্যাঠামশাই ফিরে আসবেন না। তাকে দেখলেই জ্যাঠামশাই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে উঠে আসবেন। এই যে সোনা, আমি। এতদিন সবার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি, কিন্তু তোকে দেখে আর থাকতে পারলাম না। চল, বলে তিনি সোনার কাঁধে হাত রাখবেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখবে, সোনা জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ফিরছে। জ্যেঠিমা সোনাকে নিশ্চয়ই তখন আশীর্বাদ করবে। সোনা, তুমি বড় ভালো ছেলে, তুমি দীর্ঘজীবী হও। সোনাকে কেউ আদর করে বললে সে সবকিছু তার জন্য করতে পারে। আর এ তো তার পাগল জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাইকে সে বন-জঙ্গলে ঢুকে ডাকলে তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন না। ঠিক হাসি-হাসি মুখটি নিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। এসে গেছিস! আমি তোর জন্যই বসেছিলাম। আর কত কিছু ভাবে সোনা। মনে হয় তার জ্যাঠামশাইকে কেউ তেমন করে খোঁজেনি। খুঁজলে একটা মানুষকে পাওয়া যায় না এটা তার বিশ্বাস হয় না। সে থাকতে না পেরে একা-একা ট্যাবার পুকুরপাড়ে চলে যাচ্ছে। কারণ সোনার বার-বারই যে ঝোপ-জঙ্গলের কথা মনে হয়েছে সেটা ট্যাবার পুকুরপাড়ে, সেই বৃক্ষ, বৃক্ষ তুমি কার? রাজার। এখন কার? তোমার। আমার হলে তুমি বল আমার পাগল জ্যাঠামশাই কোথায় বসে আছেন? তাকে তুমি খুঁজে আনো। চল, তুমি আমার সঙ্গে তাঁকে খুঁজবে।

সেই গাছটির কথা মনে হল, গাছ তো নয়, বৃক্ষ। বড় ডালপালা মেলে দিয়েছে আকাশে। আর সেই অজস্র শকুন কোনওটা উড়ছে, কোনওটা মগডালে বসে ঘুমোচ্ছে। কোনওটা শিকার কোন দিকে, বাতাসে গন্ধ আসছে কি-না, এই ভেবে গলা বার করে বসে আছে। সোনার দৃশ্যটা মনে হলেই ভয় হয়। কত বড়-বড় সব হাড়, মানুষের অথবা মাছের। সে হাড় ঠিক চিনতে পারে না। বড় হাড় হলেই মানুষের মনে হয়। সেই সব হাড়, মরা ডাল ডিঙিয়ে যেতেই তার যা ভয়। ফতিমা সঙ্গে থাকলে কিছুতেই ভয় থাকে না। সারা মাঠে পাট গাছ। এদিকের জমিতে আগে চাষ করা হয়েছে বলে সে কখন টুপ করে ডুবে গেল পাটের জমির ভিতরে। এবং গিয়ে যখন দাঁড়াল অন্য পাড়ে, ঠিক সামনে সেই পেয়ারা গাছ ফতিমাদের। সে কারও সাড়া পাচ্ছে না। কেমন নিঝুম বাড়িটা। নিঝুম থাকারই কথা। ওর নানী চলাফেরা করতে পারে না। ঘরের ভিতর চুপচাপ বসে থাকে। চোখে ভালো দেখে না। অথবা সারা বিকেল মাদুরে শুয়ে ঘুমায়। ধনু শেখ সারাদিন মাঠে থাকে। ওদের বাড়িটার পরে হাজিসাহেবের বাড়ি। কেউ বড় আসে না এ-বাড়িতে। কারণ, সংসারে যে মানুষ থাকলে কথাবার্তা বলা যায় তেমন মানুষ বলতে এক ফতিমা। সে সারাক্ষণ বই নিয়ে একটা আলাদা ঘরে শুয়ে থাকে, পড়ে। কখনও কখনও ডাকলে সে নানীকে সাড়া দেয়। আজকাল আবার সে পড়ায় এত মনযোগী হয়ে উঠেছে যে নানী ডাকলেও বিরক্ত হয়। আমি তো নানী এ-ঘরে বসে আছি। তুই আমারে বারে বারে ডাকলে পড়া হয়! ফলে নানী তাকে ডাকে না। সোনা সে-ঘরটা চেনে। সে চুপি-চুপি ডাকল, এই ফতিমা।

ফতিমা চিত হয়ে পড়ছিল। ওর এই বয়সে চুল কত বড়! সে বুকের ওপর বই রেখে পড়ছে। স্কুল খুললেই পরীক্ষা। সে পড়ায় ফাঁকি দেয় না। কিন্তু সোনাবাবুর মুখ জানালায় উঁকি দিতেই বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। সে তার পড়ার কথা ভুলে গেল।

ফতিমা বলল, আপনে, সোনাবাবু!

—আমি ভাবলাম তর লগে একবার দেখা করে যাই।

—কই যাইবেন?

—জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে যাচ্ছি।

—একলা?

—কে আর যাবে সঙ্গে। সবাই খুঁজে দেখেছে, পায়নি। এবার আমার পালা।

—আমাকে সঙ্গে নেবেন?

—যাবি তুই! তোর নানী বকবে না?

—টের পাইলে ত। বলেই খড়ম পায়ে নেমে এল। ফতিমার এটা শহরে থেকে হয়েছে। সারা দিন লাল রঙের খড়ম পরে থাকে। নীল রঙের স্ট্র্যাপ খড়মে। সে হাঁটলেই কেমন খট খট শব্দ হয়। সোনার এটা কেন জানি পছন্দ হয় না। মেয়েরা জুতো পরে সে সেটা মুড়াপাড়ায় দেখেছে। অমলা কমলা জুতো পরত। সেবারই যে গেল ওরা, আর ওদের যাওয়া হল না। কী যে কারণ সোনা জানে না। আর নৌকা আসত না মুড়াপাড়া থেকে। ওরা যেতে পারত না। পরে সে যা শুনেছে তা সত্যি নয়—কারণ, সে বিশ্বাসই করতে পারে না। এত বড় বাড়ির আদায় পত্র কমে গেছে। মহালে তেমন আদায় পত্র নেই। বাবুদের বড় বড় কারবার ছিল ঋণসালিশি বোর্ড ওদের আদায় পত্র কমিয়ে দিয়েছে সে বিশ্বাস করতে পারত না। ওর কেন জানি মাঝে মাঝে অমলাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে এতটুকু ছেলে অমলার কাছে কী লিখবে! কিছু লিখতে গেলেই মা বকবে। এসব কী পাকামি তোমার সোনা। তুমি চিঠি লিখছ অমলাকে।

ফতিমা বলল, এদিক দিয়া আসেন।

ফতিমা খালি পায়ে পা টিপে টিপে একবার নানীর ঘরে উঁকি দিল। দেখল নানী একটা মাদুরে কাঁথা পেতে শুয়ে আছে। সূর্য মাথার উপর না উঠতেই নানী খেয়ে নেয়। সেও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছে। ওর সামনে তারপর থাকে অফুরন্ত সময়। সে মাঝে-মাঝে পেয়ারা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। দূরে অর্জুন গাছের নিচে কোনও ছায়া-ছায়া কিছু দেখা দিলেই তার মনে হয় সোনাবাবু দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন আর স্থির থাকতে পারে না। জন্মাষ্টমীর মিছিলে সোনাবাবুর জন্য যা-যা কিনে রেখেছিল, সেইসব দিতে চলে আসে।

এবার সে কিছু আনতে পারেনি। কেবল ঢাকা থেকে ফিরে এসেছিল সোনাবাবুকে দেখতে পাবে এই ভেবে। ফতিমা যত বড় হচ্ছে কেন জানি এই গাছপালা পাখির ভিতর সোনাবাবুর সুন্দর নীল রঙের জামা, লম্বা-লম্বা হাত-পা বড় তার ভালো লাগে। আর চন্দনের গন্ধ শরীরে শহরে চলে গেলেও তার মনে হয় নাকে গন্ধটা লেগে রয়েছে। এমন পবিত্র গন্ধ সে যেন আর কোথাও পায় না। সুতরাং সে এই সুযোগ ছেড়ে দিলে আর সময় হবে না, মনে মনে সেও জানে বড় হয়ে গেলে আর মাঠে-ঘাটে একা নেমে আসতে পারবে না।

ওরা মাঠে নামতেই পাট গাছের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। জমি আলে ওরা ছুটছে। শাড়ি পরায় ফতিমাকে সোনার চেয়েও লম্বা মনে হচ্ছে। পাট গাছের নিচে থাকলে তারা টের পাবে না কোন দিকে যাচ্ছে। সুতরাং মাঝে মাঝে গাছ ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে ওরা ঠিকমতো যাচ্ছে কি-না। সেই খাল। দালানবাড়ির খাল তারপর কিছু ধানের জমি। ধানের জমির ওপর দিয়ে গেলে ওরা ধরা পড়ে যাবে, ওরা একটু ঘুরে আলে-আলে পাটের জমি ভেঙে উঠে যেতে থাকল।

ফতিমা ডাকল, এই সোনাবাবু।

সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ফতিমা ধীরে ধীরে হাঁটছে। আয়। দেরি করিস না?

—এত তাড়াতাড়ি ছুটছেন ক্যান?

—ফিরতে দেরি হলে মা বকবে।

—কেউ বকবে না। কি সুন্দর পাটগাছ, না সোনাবাবু?

—খুব সুন্দর। তুই আয়!

—আপনের লগে আমি হেঁটে পারি। আপনে পুরুষমানুষ না?

সোনা এবার দাঁড়াল। সত্যি ফতিমা কেন পারবে? সে বলল, তুই নাকে নথ পরে থাকিস না কেন?

—নথ পরলে আমাকে দেখতে ভাল লাগে?

—খুব ভাল লাগে না। তবে না পরলে খারাপ লাগে। তোর পায়ে মল নেই। ঝুমঝুম শব্দ হয় না আগের মত।

—এখন বড় হয়েছি না! ঝুমঝুম বাজলে লোকে টের পাবে সোনাবাবুর লগে ফতিমা যায়। লোকে পাপ ভাবতে পারে।

সোনা বলল, অঃ পাপ! তা চলে আয়। পাপ ভাবলে পাপ। আমরা তো কিছু পাপ করছি না।

—আমার হাত ধরবেন সোনাবাবু?

—তোর হাত! দেখি কেমন?

সোনা হাতটা নিয়ে দেখল। এগুলো লাল-লাল কি মেখেছিস ছিট-ছিট?

—মেহেদি পাতার রং।

—মাখলে কি হয়?

—কি আবার হবে! বাড়ি এলেই মাখতে ইচ্ছা করে।

—সোনা বলল, তোর বাবা বকে না?

—বকবে কেন?

—তুই চোখে বড় লম্বা কাজল দিয়েছিস। তোর চোখ ছোট। বড় চোখে কাজল মানায়। ছোট চোখে মানায় না!

ফতিমার কেমন ভিতরে-ভিতরে অভিমান হল। অভিমানে সে বলল, হাঁটেন, তাড়াতাড়ি ফিরতে হইব। বলেই ওরা দেখল সেই গাছের নিচে এসে গেছে। গাছের নিচটা পার হয়ে যেতেই যা ভয়। তারপর লতা-পাতার ঝোপ। বৃষ্টি হওয়ায় ঝোপজঙ্গল সবুজ হয়ে গেছে। ওরা দু'জনই জোরেজোরে ডাকল, জ্যাঠামশয় আছেন? আমি সোনা।

ফতিমা বলল, জ্যাঠা আছেন! আমি ফতিমা। আপনাকে নিতে এসেছি।

কোনও সাড়াশব্দ নেই। ঘুরে-ফিরে ওরা কোথাও ডেকে-ডেকে সাড়া পাচ্ছে না। ওরা দু'জন দু'দিকে খুঁজছে। এই অঞ্চলে খুঁজে আবার ওরা ছুটতে আরম্ভ করবে। কারণ, যদি হাসান পীরের দরগায় ওঁকে পাওয়া যায়। ওখানে গেলেই দরগার ভিতর অথবা যেসব ভাঙা মসজিদ এবং পাঁচিলঘেরা কবরের ঘর আছে সেখানে খুঁজে দেখলে পাওয়া যেতে পারে। ফতিমা ডাকতে-ডাকতে পুকুরের উত্তর পাড়ে চলে গেছে। সোনাবাবুর ডাক সে এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে না। সে ভাবল ডাকবে, সোনাবাবু আপনে আর বেশি দূর একা-একা যাইয়েন না। কিন্তু অভিমান ওর ভিতর বাজছে। কেবল অবহেলা। সে সুন্দর করে আজকাল চুল বাঁধতে শিখেছে। সে কপালে সেই কাঁচপোকা পরে থাকে। যা সোনাবাবু এক বর্ষায় ওর জন্য ধানখেত থেকে তুলে রেখেছিল। এখনও সেই কাঁচপোকা কী উজ্জ্বল। সে যে এমন সুন্দরভাবে সেজে বসে থাকে তার জন্য কোন টান নেই সোনাবাবুর। একবার বলল না, কী রে ফতিমা, সেই কাঁচপোকাটা তুই যত্ন করে রেখে

দিয়েছিস? সে ভাবল, না আর ডাকবে না। অথবা কথা বলবে না। সে এসেছে পাগল মানুষটাকে খুঁজতে। তাকে খুঁজেই চলে যাবে।

কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল কোনও সাড়াশব্দ নেই সোনাবাবুর। কী ব্যাপার! কোনও ডাক শুনতে পাচ্ছে না। কেমন নিঝুম হয়ে গেছে বনটা! বনের ভিতর সোনাবাবু হারিয়ে গেছে ভেবে ফতিমার বুক কেঁপে উঠল।

এখন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের গরম। সাপ-খোপের খুবই উপদ্রব এই প্রাচীন বনে। কতকালের সেই সব বনজঙ্গল কে জানে! বড় কড়ুই গাছের নিচে কত সব মৃত ডাল। আর চারপাশে এত বেশি লতাপাতা যে, একটু দূরে গেলেই কিছু দেখার উপায় নেই। সে এবার অভিমানের মাথা খেয়ে সামনের যত ডালপালা ফাঁক করে ডাকতে থাকল, সোনাবাবু, আপনে কোনদিকে?

না, কেউ উত্তর দিচ্ছে না। কারও কোনও সাড়া নেই।

ফতিমা আরও দক্ষিণে ছুটতে থাকল, সোনাবাবু আপনি কথা বলছেন না কেন?

সব নিঝুম এমন কী পাতার খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এত যে শকুন বসে রয়েছে মগডালে ওরা পর্যন্ত পাখা নাড়ছে না। কেবল কক্কক্ একটা শব্দ হচ্ছে। তক্ষকের ডাকের মতো শব্দটা ওকে চারপাশ থেকে গিলতে আসছে।

—সোনাবাবু, আমি এখন কী করি!

কক্কক্ শব্দটা থেমে গেছে। অন্য এক দ্রুত শব্দ। সে দৌড়াচ্ছে। যেন বালিকা বনে পথ হারিয়ে ফেলেছে। পাগলের মতো ডাকছে, আমি সোনাবাবু আপনার উপর রাগ করিনি! এই দেখুন, আমাকে দেখুন। আপনি কেন যে ওদিক খুঁজতে গেলেন!

না, সে আর পারছে না। ছুটে ছুটে ক্লান্ত। এ-পাশের ঝোপটা নড়ছে। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। না কিছু নেই। দুটো ছোট্ট বানর বসে রয়েছে ডালে। ওরা লাফালাফি করছে।

—আমি মরে যাব সোনাবাবু। আপনি কাছে না থাকলে আমি মরে যাব। বলে শিশুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকল ফতিমা।

সোনা আর পারল না। সে ঝোপ থেকে উঠে এসে ফতিমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল।

—তুই বোকার মত কাঁদছিস?

—আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন? বলতে বলতে হেসে ফেলল।

ওরা দু'জন এত কাছাকাছি, আর কী সুন্দর উভয়ের চোখ—এখন মনেই হয় না যাবতীয় পৃথিবীতে কোনও গণ্ডগোল আছে। ওরা পরিশ্রান্ত হয়ে একটা গাছের নিচে বসল। তারপর ধীরে-ধীরে সোনা বলল, আমার জন্য তোর খুব মায়া না?

ফতিমা বলল, আপনাকে বেশি দিন না দেখলে মনটা আমার কেমন করে। বলে আবার হাত দুটো ঘাসের ওপর বিছিয়ে দেখাল, দু'হাতে দুটো পদ্মফুল এঁকেছি সোনাবাবু। দেখেন কী রকম দেখতে।

—বাড়িতে বসে-বসে বুঝি এই করিস?

—নোখে লাল রং দিয়েছি আপনি দেখবেন বলে।

কী অকপট আর সরল ওরা। ওদের এই ভালো লাগার ব্যাপার গাছের নিচে দুটো ছোট্ট পাখির মতো, অবিরাম কাছাকাছি থাকা, একটু দেখা, তারপর ছোটা, ছুটে-ছুটে সেই মানুষটাকে খোজা, যে বনের ভিতর ভালোবাসার খোঁজে নিখোঁজ হয়ে গেছে।

সোনা বলল, এ বনে জ্যাঠামশাই নেই। হাসান পীরের দরগায় যাবি?

—চলেন।

—ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

—তা হউক।

ওরা দরগার মাটিতেও পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজেছিল। কোথাও কেউ সাড়া দিচ্ছে না। সে কবরের পাশে পাশে ডেকে গেল, না কোনও সাড়া নেই। ওরা দেখল তখন কিছু কালো মেঘে আকাশ সহসা ছেয়ে গেল। এবং বৃষ্টি পড়তে থাকল। বর্ষা এসে গেছে এদেশে। একটা লোক দূর দিয়ে যাচ্ছে। সে বলতে-বলতে যাচ্ছে, বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ওর মাথায় এক অদ্ভুত রঙের নিশান। সে একা। সে বলতে-বলতে যাচ্ছে, আমরা বাংলাদেশের মানুষ এবার আলাদা হয়ে যাব।

সোনা বলল, কী বলছে রে লোকটা?

ফতিমা এ-সব ব্যাপারে সোনার চেয়ে বেশি খবর রাখে। সে অসহায় চোখে সোনার দিকে তাকিয়ে থাকল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। ওরা সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে আর অনবরত একজন মানুষকে খুঁজছে—যিনি এক অদ্ভুত ভালোবাসার মায়ায় এই সব গাছপালা পাখির ভিতর নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়াতেন।

সোনা সেই রাতে বাড়ি ফিরে এসে সব শুনেছিল। শশীভূষণ কাগজ পড়ে সবাইকে শোনাচ্ছেন। ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়া থেকে কা গজ নিয়ে এসেছেন—তাতে লেখা, লর্ড

মাউন্টব্যাটেনের বেতার বক্তৃতা—আমার আলোচনার মধ্যে প্রথম প্রচেষ্টা ছিল, মন্ত্রী মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা। ঐ প্রস্তাবটিকে অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মেনে নিয়েছেন এবং আমার মনে হয়, ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে এরচেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মন্ত্রী- মিশনের কিংবা ভারতের ঐক্যরক্ষার অনুকূলে অন্য কোনও পরিকল্পনা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। কিন্তু কোনও একটি বৃহৎ অঞ্চল, যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে অঞ্চলে তাদের বল প্রয়োগে অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যবিশিষ্ট গভর্নমেন্টের অধীনে বাস করতে বাধ্য করবার কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। বল প্রয়োগে বাধ্য না করবার যে উপায় আছে, সেটা হল অঞ্চল বিভক্ত করে দেওয়া।

শশীভূষণ বললেন, শেষপর্যন্ত পার্টিশানই ঠিক হল?

শচীন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন, কিছু বললেন?

—তা হলে কপালে পার্টিশান আমাদের!

—তাই মনে হয়। শচীন্দ্রনাথকে বড় ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

সোনা যে সারাদিন বাড়ির বাইরে ছিল কারও খেয়াল নেই। কারণ, দুপুরেই এসব খবর নিয়ে এসেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ বাড়ি ছিলেন না। শচীন্দ্রনাথ বাড়ি এলে শশীভূষণ পড়ে-পড়ে শোনালেন। সারাটা দিন বাড়িতে এ-নিয়ে একটা উত্তেজনা গেছে। ঈশম বসে বসে কেবল শুনছে। সে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। সে এইটুকু বোঝে, দেশ ভাগ হলে, এ-দেশটার নাম পাল্টে যাবে। পাকিস্তান হবে। বাংলাদেশের নাম পাকিস্তান—ঈশমের কষ্ট হয় ভাবতে। আর একটা অংশ হিন্দুস্থানে চলে যাবে। এটাও ওর মনে কেমন একটা দুঃখের ছাপ বহন করছে। এত বড় বাংলাদেশের নিজস্ব বলতে কিছু থাকবে না। এটা সামু করছে। ওর সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হলে যেন সে বলত, কী লাভ তর, দেশটারে ভাগ করে দুই দেশের কাছে ইজারা দিলি!

বিষয়টা সোনা ঠিক বুঝতে না পেরে সে কিছুটা শুনে উঠে গেল। ওর এ-সব শুনতে ভালো লাগে না। ছোটকাকার মুখ কী গম্ভীর। মেজ জ্যাঠামশাই সারাদিন কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন বিছানায়। গ্রামের লোকজন সব আসছে যাচ্ছে। ওদের মুখ ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে।

মা বলল, সোনা, তর বঁড়শি কই? মাছ পাইলি?

সে বঁড়শি নিয়ে গেছে, সঙ্গে একটা পেতলের ঘটি ছিল মাছ রাখার—সে এখন এসব কোথায় ফেলে এসেছে মনে করতে পারে না। তবু যতটা মনে পড়ছে ফতিমাদের বাড়িতে সে ঘটি এবং বড়শি রেখে গল্প করছিল। ওদের বাড়িতে থাকতে পারে। কাল সকালে সে

অথবা ঈশম গিয়ে নিয়ে আসবে। সে মাকে বলল, মা, মাছ পাই নাই। ফতিমাদের বাড়ি গেছিলাম। ওর নানীর খুব অসুখ। দেখতে গেছিলাম। সোনার আজকাল কারণে-অকারণে দুটো একটা মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস হয়েছে। ধনবৌ সোনাকে আর কিছু বলল না। কারণ তারও মনটা ভালো নেই।

পরদিন ফতিমা নিজেই এসেছিল ঘটি এবং বড়শি নিয়ে। সোনা ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অর্জুন গাছটার নিচে চলে গেছে। সে বলল, দেশ ভাগ হলে আমরা চলে যাব।

—কোনখানে যাইবেন?

—তা জানি না। মাস্টারমশয় কইছে ওদের দেশটা হিন্দুস্থানে পড়বে। বাবা জ্যাঠামশাই কেউ থাকবেন না।

—কেন থাকবেন না! ফতিমার বুকটা কেমন কেঁপে উঠল।

—জ্যাঠামশাই খেতে বসে বলেছেন, এদেশে থাকলে নাকি আমাদের মান-সম্ভ্রম থাকবে না।

ওরা আর উভয়ে কোনও কথা বলতে পারল না। গাছের নিচে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সামনে সেই ফসলের জমি, জমিতে শুধু পাট গাছ—কী সজীব! আর এই পরিচিত পুকুর, শাপলা ফুল, অর্জুন গাছ, ঠাকুরদার চিতার উপর শানবাঁধানো বেদী এবং বর্ষাকালে নদীর জল সোনাবাবুর বড় প্রিয়। শীতের মাঠ, তরমুজের জমি সব ফেলে চলে যেতে পারবেন সোনাবাবু! কষ্ট হবে না! মায়া হবে না এসব ভালোবাসার সামগ্রী ফেলে যেতে! ফতিমার চোখ দেখলে এখন শুধু এমনই মনে হবে। সে এমনই যেন সোনাকে বলতে চায়।

সোনার ইচ্ছা করছিল না কথা বলতে। সোনার ভারি অভিমান হচ্ছে ফতিমার উপর। দেশভাগের জন্য ফতিমার বাবাই যেন দায়ী। সে বলল, আমার কেবল জ্যাঠামশাইর জন্য কষ্ট হবে। তিনি এখনও এলেন না। কোথায় যে গেলেন। তাঁকে ফেলে আমরা কোথায় যাব! আমরা চলে গেলে যদি তিনি আসেন, তুই বলে দিস আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। বলবি ত?

ফতিমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। কেবল জ্যাঠামশাইর জন্য সোনাবাবুর কষ্ট হবে। ওর জন্য কষ্ট হবে না সোনাবাবুর। কিন্তু চোখ ঝাপসা বলে সে সোনাবাবুর দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়লে তিনি নির্বিকার থাকবেন। খুব বেশি বললে হয়তো বলবেন, তোর আবার কান্নার কি হল! সুতরাং সে মুখ ফিরিয়ে রাখল। এবং নদীর জল পাটের জমি দেখতে দেখতে বলল, জ্যাঠামশাই ফিরে এলে আমরা তাঁকে ঠিক পৌঁছে দেব সোনাবাবু। তাঁকে আমরা আটকে রাখব না।

তার পরই দেশভাগের ছবি চার পাশে ফুটে উঠতে থাকল—বর্ষাকাল এসে গেল। চারপাশে সব বড় বড় নৌকায় লাল নীল রঙের পতাকা, কত রঙ বেরঙের চাঁদমালা, কাগজের ফুল, নতুন লুঙ্গি পরে, নতুন জামা গায়ে মাথায় ফেজ টুপি পরে ছেলেরা, মেয়েরা নাকে নোলক পরে, নদীর চরে নৌকা ভাসিয়ে সারি সারি চলে গেল—ওরা চলে গেল। সোনা মার হাত ধরে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। মেজদা বড়দা চুপচাপ খেজুর গাছটার নিচে বসে দেখছে। জ্যেঠিমা দাঁড়িয়ে আছেন তেঁতুলগাছের নিচে। নরেন দাস, শোভা আবু, দীনবন্ধুর দুই বউ এবং হারান পাল সবাই নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ বেজার। শচীন্দ্রনাথ বাড়ির ভিতর। তিনি এই উৎসবের দিনে চুপচাপ শুয়ে আছেন। মাস্টারমশাই বসে বসে দুঃখী মানুষের মতো একটা দেশাত্মবোধক গান গাইছিলেন—বঙ্গ আমার জননী আমার। মনে হয় তিনি বসে বসে বাংলাদেশের জন্য গানটা গাইতে গাইতে শোক করছিলেন। সোনা চোখ বুজে গানটা শুনছিল আর মাস্টারমশাইর মুখ, বড় জ্যাঠামশাইর মুখ মনে পড়ছিল। এবং বাংলাদেশ ভাবতে সে বোঝে ঈশম, ফতিমা, পাগল জ্যাঠামশাই আর সে নিজে, এই দেশ যখন বাংলাদেশ, তবে ভাগ কেন। সোনার চোখেও জল এসে গেল।

ঈশম দাঁড়িয়েছিল। সে নির্বিকার। সে সকাল থেকে কোনও কথা বলছে না। সারা সকাল আশ্বিনের কুকুর ঘেউঘেউ করে ডাকছে। কুকুরটা কেন জানি সকাল থেকেই ঈশমের সঙ্গ ছাড়ছে না। কুকুরটা এর ভিতর কিছু টের পেয়ে গেছে।

আর মাটির নিচে দুই মানুষ। জলের নিচে দুই মানুষ। পাগল মানুষ আর ফেলু। ওরা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ওদের কঙ্কাল মাটিতে ঢেকে গেছে। কী সাদা আর ধবধবে কঙ্কাল এই মানুষের। বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই টের পাওয়া যায় না। বড়বৌ জানালা খুলে এখনও দাঁড়িয়ে থাকে। নিরুদ্দেশ থেকে মানুষটা তার আজ হোক কাল হোক ফিরবেনই।

দেশভাগের কিছুদিন পর মুড়া পাড়া থেকে ভূপেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। সেটা ছিল এক আশ্বিনের সকাল। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এলেই এ-সংসারের জন্য কিছু-না-কিছু চাল ডাল তেল নুন সবজি মাছ আসে। বড় মাছ নিয়ে আসেন ভূপেন্দ্রনাথ। আখের দিন আখ, আনারসের দিন আনারস। বাড়ির ছেলেপেলেরা নৌকা এলেই ঘাটে চলে যাবার স্বভাব। সব কিছুর ভিতর তাদের চোখ সেই আখ অথবা আনারসের দিকে। সুতরাং এই ভেবে সবাই ছুটে গেলে দেখল ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা থেকে ধীরে ধীরে নামছেন। কিছুই তিনি এবার সঙ্গে আনেন নি। খালি নৌকা। তিনি নেমেই বললেন, তোমরা ভাল আছ? কেমন রোগা দেখাচ্ছে তাঁকে। ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ মুখ। জীবনের সব শান্তি যেন কারা কেড়ে নিয়েছে। দুশ্চিন্তার ছাপ চোখে মুখে এবং বিষণ্ণ মুখ দেখলেই বোঝা যায় দিনের পর দিন মানুষটা অনিদ্রায় ভুগছেন।

তিনি এসে সকাল সকাল স্নান করে সন্ধ্যাআহ্নিক করলেন। তারপর সামান্য জলযোগ করার সময় শচীকে ডেকে পাঠালেন।

শচী এলে বললেন, তোমারে একটা কথা কই। বাবুগ লগে পরামর্শ করলাম। তারা বলল, যত তাড়াতাড়ি পার দেশ ছাইড়া পালাও। তোমার কী মনে লয়?

শচী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তিনি জানেন তাঁর মানসম্ভ্রম, পারিবারিক মানসম্ভ্রম আর থাকছে না। তবু এই দেশ এবং মাটির জন্য সবার মতো ভিতরে একটা ভীষণ হাহাকার আছে। ছেড়ে যেতে যে কী কষ্ট! ভূপেন্দ্রনাথ শচীর মুখ দেখে সব টের পাচ্ছেন। তিনি বললেন, তোমার কষ্ট হইব জানি। বিদেশবিভুঁইয়ে কী কইরা আহার সংগ্রহ করবা সেটাই বড় চিন্তা। তবে কী জান, গঙ্গার পারে অনাহারে মরলেও শান্তি। তোমরা অন্তত এই শরীরটা গঙ্গার পারে দাহ করতে পারবা।

শচী বললেন, মাস্টারমশাই বলেছিলেন, ওদের দেশে জমি জায়গা কিছু রাইখা দিতে।

সুতরাং ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, তবে তোমার মত আছে দেখছি। চন্দ্রনাথের মতও তাই। দুশ্চিন্তা নিয়া বেশিদিন বাঁচা যায় না। হাজিসাহেবের বেটাদের খবর দ্যাও। জমি জায়গা বাড়ি-ঘর সব বিক্রি কইরা দিমু।

খুব স্থির গলায় এসব বলছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। গলা এতটুকু কাঁপছিল না। গলা কাঁপলে ভিতরে ভিতরে তিনি যে কত দুর্বল হয়ে পড়ছেন ধরা পড়ে যাবেন। ধরা পড়ে গেলেই যেন তিনি আর ভূপেন্দ্রনাথ থাকবেন না। সোনার মতো বালক হয়ে যাবেন। তাঁর কথার তখন কেউ দাম দেবে না। তিনি নিজেকে খুব শক্ত করে রাখলেন।

এই বিক্রিবাট্টার খবর শুনে দীনবন্ধু ছুটে এল। মাইজাভাই, আপনারা চইলা যাইবেন হিন্দুস্থানে?

—আর কি করা!

—আমরা-অ তবে যামু।

—তুই যাইবি! ল তবে।

—এখানে থাকলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হইব। জাত-মান থাকব না।

ভূপেন্দ্রনাথ বললেন, আমরা যাইতাছি নবদ্বীপ। শশীমাস্টার সব ব্যবস্থা করব। নবদ্বীপ যাইতে তর অমত নাই ত?

দীন বন্ধু এসেই হাঁকডাক করতে থাকল—আর অমত। এখন পালাতে পারলে বাঁচি। নরেন দাস শুনে ছুটে এল। সে বলল, আপনারা চইলা গেলে আমরা থাকি কি কইরা?

মাঝিবাড়ি থেকে এল শ্রীশ চন্দ। প্রতাপচন্দের দুই ছেলে ছুটে এসে বলল, দেশ ছাইড়া গিয়া কি ভাল হইব?

দীনবন্ধু বলল, থাকতে গেলে হিন্দু হইয়া থাকন যাইব না।

মুসলমান হইতে হইব। যদি তা পার থাক।

এ ভাবে প্রায় বার্তা রটি গেল গ্রামে—সবাই এসে খবর নিল। জলের দরে জমি বিক্রি কবে দিচ্ছে ঠাকুরবাড়ির ভূপেন্দ্রনাথ খবর পেয়ে যারা কিনবে তারা চলে এল। প্রতাপচন্দের ছোট ছেলে এসে বলল, আপনে জমিজমা যারে খুশি বিক্রি করেন, বাড়িটা কইরেন না! যা দাম হয় আমরা কিনা রাখমু। শত হলেও বামুনের বাড়ি। বাড়িতে জাগ্রত বিগ্রহ—এ-বাড়ি মুসলমানরে বেইচেন না।

শচীর তাই ইচ্ছা। দাম কম হলেও এ-বাড়ি তিনি কখনও মুসলমানের কাছে বিক্রি করতে পারেন না। যেন বিক্রি করলেই যেখানে ঠাকুরঘর সেখানে মসজিদ উঠবে, যেখানে মাঘ-মণ্ডলের ব্রতকথা বলত ছোট ছোট বালিকারা সেখানে কোরবানী হবে—এইসব ভাবতেই তার চোখমুখে এক তীব্র আক্রোশ ফুটে উঠল। তিনি বললেন, তাই হবে। হলও তাই! প্রতাপচন্দ ওদেব বাড়ি পুকুর এবং সেরা দশ বিঘা জমি হাজার পনের টাকায় কিনে নিল। কিছু টাকা সঙ্গে দেবে—বাকি হুণ্ডি করে পাঠাবে। বর্ডারে বড় কড়াকড়ি। এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে না। ভূপেন্দ্রনাথ তাতেই রাজী হয়ে গেলেন।

সোনা দেখল এক সকালে কিছু মানুষজন এসে ঘর গুলির ওপর উঠে টিনের স্ক্রু খুলে দিচ্ছে। আর টিনগুলো রাখছে আলাদা করে। ওর বার বার মনে হয়েছে জ্যাঠামশাই শেষপর্যন্ত তার মত পাল্টাবে। কিন্তু যখন দেখল টিনগুলি খুলে নেওয়া হচ্ছে, একটা ঘরে সব আসবাবপত্র নিয়ে আসা হয়েছে, কিছু কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে তখন সে নিজেও কেমন একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল বাড়িটার চারপাশে। অর্জুন গাছটা তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘর ভাঙা হচ্ছে বলেই গরিব কিছু মানুষজন সকাল থেকে বাড়ির চারপাশে ভিড় করে আছে। যা পারছে ফাঁক পেলে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারছে না। ঈশমদা ধরে আনছে ঘাড় ধরে। চোখে মানুষটা কম দেখে আজকাল, অথচ একটা সামান্য জিনিস কেউ না বলে নিয়ে গেলে ঠিক ধরে আনছে। এতসব যখন হচ্ছে, মা যখন বড় বড় বস্তার ভিতর তার সব প্রিয় জিনিস ভরে ফেলছে, যে কোনওদিন মুড়াপাড়া থেকে নৌকা চলে আসতে পারে বড় বড়, এবং সব সামগ্রী নিয়ে রওনা দিতে পারে—তখন সে সারাটা সকাল খেয়ে না খেয়ে সেই অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

হাতে ওর একটা ধারালো ছুরি। সে প্রথম ঠিক ওর বুক সমান উঁচু জায়গায় গাছের কাণ্ডের ছালবাকল কেটে কেটে তুলে ফেলল। প্রথম ফোঁটা ফোঁটা কষ বের হচ্ছে। সাদা বঙের দুধের মতো কষ গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে। বাবা, জ্যাঠামশাই পুকুরপাড়ে বসে আছেন। উত্তরের ঘর দক্ষিণের ঘর এক এক করে, ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কেউ দুটো জানালা কিনে

মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ একটা দরজা কিনতে এসেছে। আলাদা আলাদা দাম দিয়ে যাচ্ছে সবাই। কেবল মনজুর পুবের ঘরটা আস্ত কিনেছে। দরজা জানালা এবং টিন-কাঠের বেড়া এইসব সে একসঙ্গে কিনছে বলে খাবারদাবার এবং অন্যান্য তৈজসপত্র সে ঘরে তুলে রাখা হয়েছে। ওরা বাড়ি ছেড়ে দিলে কথা আছে মনজুর ঘরটা ভেঙে নিয়ে যাবে।

এক একটা টিন যখন খুলছে তখনই মনে হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের এক একটা পাজর বুক থেকে কেউ তুলে নিচ্ছে। ওঁরা সেদিকে তাকাতে পারছেন না বলেই পুকুরপাড়ে এসে বসে আছেন। ঈশমই সব দেখাশোনা করছে। এবং দরদাম করে গুনে গুনে টাকা দিয়ে যাচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি টাকা গুনে নিচ্ছেন না। গুনতে তার ভালো লাগছে না। গ্রামের কেউ কেউ চার পাশে গোল হয়ে বসে আছে। অন্যমনস্ক হবার জন্য তাদের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলার গল্প করছেন।

আর সোনা সেই সকাল থেকে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কী যে করছে কেউ টের পাচ্ছে না। লালটু তাকে দু'বার খেতে ডেকেছে, সে খেতে আসেনি। সে নিবিষ্ট মনে কিছু করে যাচ্ছে।

ভূপেন্দ্রনাথও ব্যাপারটা লক্ষ করছেন। যখন বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলে সবাই বিমর্ষ হয়ে আছে তখন সোনা অনবরত গাছের কাণ্ডে খুঁটে খুঁটে কী লিখে যাচ্ছে। শশীভূষণ খড়ম পায়ে বাইরে বের হয়ে এলেন। তিনি স্কুলে যাবেন আজ একবার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। সেক্রেটারিকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে। এখন আশ্বিন মাস বলে পূজার বন্ধ। জল চারপাশে। পাট কাটা হয়ে গেছে সব। আর কিছুদিন পরই যখন হেমন্তকাল আসবে সব জল নেমে যাবে মাঠ থেকে। মাঠে জল থাকতে থাকতে এদেশ থেকে রওনা হতে হবে। শশীভূষণ ডাকলেন, লালটু আছিস!

লালটু এলে বললেন, একটু তেল নিয়ে আয়। নাখি। আজ তিনি সবার সঙ্গে স্নান করলেন না। রান্না হতে দেরি হবে। তিনি স্কুল থেকে এসেই খাবেন। ঘাটে স্কুলের নৌকা লেগে রয়েছে। তিনি সোজা সেক্রেটারির কাছে গিয়ে চার্জ বুঝিয়ে আসবেন। শশীভূষণ মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

এ সংসারে শুধু একজন একেবারেই কোনও কথা বলতে পারছে না। সে সবার অলক্ষ্যে কাঁদছে। সে হচ্ছে বড়বৌ। এই দেশ ছেড়ে চলে গেলে মানুষটা যদি ফিরে আসেন তখন তিনি কোথায় যাবেন। এসে চিনতেই পারবেন না—এই বাড়ি তাঁর। ঘরবাড়ি কিছু নেই। শুধু কিপরিচিত গাছ। অর্জুন-গাছটা দেখলেই চিনতে পারবেন তিনি ঠিকমতো পথ চিনে উঠে এসেছেন। কিন্তু যখন দেখবেন ঘর বলতে কিছু নেই, পুবের ঘর বলতে শুধু মাটি আর একটা কামরাঙা গাছ তখন তিনি।নশ্চয়ই ভাববেন কোন জাদুবলে তিনি এসব দেখছেন। যেমন তিনি স্মৃতির ভিতর মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত জাদুবলে দেখতে পান শূন্য এক র‍্যামপার্ট এবং কিছু ইংরেজ সৈন্য কুচকাওয়াজ করছে মাঠে, তিনি তেমনি দেখতে পাবেন সেই পুবের ঘর, ঘরের দরজায় বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে বড়বৌ,

বাড়িতে পিঠে-পায়েস হয়েছে যত্ন করে বড়বৌ সব ভিন্ন ভিন্ন পাথরের থালায় রেখে দিয়েছে। দেখতে পাবেন তসরের জামা গায়ে দিয়ে দিচ্ছে বড়বৌ, ধুতি কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছে এবং নাভির মতো কোমল অংশে হাত রাখতে রাখতে চোখ বুজে ফেলছেন। এসব দেখলেই তিনি এই বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াবেন.. কোথাও তাঁকে যে যেতে হবে সে কথা মনে থাকবে না। তখন এই মাঠে এবং ঘাসে অথবা ফুলে মানুষটা বুঝি বন্দী হয়ে যাবেন।

সোনা তখনও লিখছিল। কী যে লিখছিল তখনও কেউ জানে না। সে বড়-বড় টান দিচ্ছে ছুরির ধারালো ডগা ধরে তারপর খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলছে কাঠ। সে গাছটায় ক্রমান্বয় সব গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতের মতো কষ নেমে মাটি এবং ঘাস ভিজিয়ে দিচ্ছে। এই ক্ষতস্থান ঝড়-বৃষ্টি অথবা কোনও মানুষ শত চেষ্টা করেও যেন মুছে না দিতে পারে। ওর হাত লাল হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় হাত ওর সামান্য কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে হাত দিয়ে। সে কিছু ভ্রুক্ষেপ করছে না। গাছের মাথায় এক সেই নীলবর্ণ পাখি। মেজজ্যাঠামশাই সেই নীলবর্ণের পাখির সন্ধানে যাচ্ছেন সীমান্তের ওপারে। ওখানে গেলেই সব তিনি পেয়ে যাবেন। যা তিনি এদেশে হারিয়েছেন বর্ডার পার হয়ে গেলেই তিনি আবার বুঝি তা খুঁজে পাবেন। কিন্তু সোনার মনে কী যে এক অহেতুক ভয়। পাগল জ্যাঠামশাই ফিরে এলে তারা যে এখানে নেই জানবেন কী করে! জ্যাঠামশাই ফিরে এলে কী করে বুঝতে পারবেন ওরা হিন্দুস্থানে চলে গেছে। তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেন না। কারও কথা তিনি বুঝতেও পারেন না। একমাত্র সে জানে সে অথবা বড় জ্যেঠিমা কিছু বললে তিনি বুঝতে পারেন। সেজন্য সে সেই সকাল থেকে লিখে চলেছে। কপালে ঘাম। মুখে এসে সূর্যের তাপ লাগছে। মুখ লাল হয়ে গেছে। সে সেই এক নীল রঙের জামা গায়ে দিয়ে আছে। নীল রঙের জামা ওর খুব পছন্দ। আর এক নীলবর্ণ পাখি মাথার ওপর দেখছে, সোনা লিখছে, সুন্দর হস্তাক্ষরে, কত মায়ায় সে তার ভালোবাসার কথা লিখে যাচ্ছে। সে বড় বড় করে লিখে রাখছে। জ্যাঠামশাই উঠে এলে যখন দেখতে পাবেন বাড়ি বলতে কিছু নেই, সব খালি, শূন্য খাঁখা করছে উঠান, যেন কোনও প্লাবন এসে সব ধুয়ে-মুছে নিয়েছে তখন তিনি নিশ্চয় একবার এই অর্জুন গাছের নিচে এসে দাঁড়াবেন। দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন—বড়-বড় হস্তাক্ষরে লেখা। সোনা লিখে রেখে গেছে—জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি, ইতি সোনা। নিরুদ্দিষ্ট জ্যাঠামশাইর জন্য সে অর্জুন গাছের কাণ্ডে তাদের ঠিকানা রেখে গেল।

ঈশম অনেক উঁচুতে ডাঙায় দাঁড়িয়েছিল। সামনে মেঘনা নদী। আশ্বিনের আকাশ উপরে। আশ্বিনের কুকুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে সেই নৌকাগুলি—বিন্দু বিন্দু হয়ে ভাসছে। ঠিক কাগজের নৌকার মতো ছোট হয়ে গেছে। সে খুব উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এগোবার আর পথ নেই। সে নদীর পাড়ে পাড়ে এতদূর এসেছে। ছোট নদী থেকে বড় নদীতে। ভূপেন্দ্রনাথ বার বার ওকে ফিরে যেতে বলেছেন ইশারায় সে ফিরে যায়নি। সে পাড়ে পাড়ে হাঁটছে। কুকুরটা পাড়ে পাড়ে হাঁটছে। কুকুরটা এখন একমাত্র অবলম্বন ঈশমের। ঈশম আর আশ্বিনের কুকুর ওদের এগিয়ে দিতে যাচ্ছে। যেন সঙ্গে সঙ্গে যতদূর যাওয়া যায়। ঘাটে নৌকা ভাসালে পাশাপাশি গ্রামের অনেকে এসেছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই এসেছে। তারপর ওরা দাঁড়িয়ে থেকেছে পাড়ে। ওরা আর নৌকা জলে ভাসলে এদিকে আসেনি।

ঈশমেরও আসার কথা নয়। ভূপেন্দ্রনাথ ওকে হিসাবপত্র করে যা প্রাপ্য সব দিয়েছেন তার। সঙ্গে আরও একশত টাকা দিয়েছেন। যে ক'দিন সে একটা কাজ দেখে না নিতে পারছে সে ক'দিন অন্তত এই দিয়ে তার চলে যাবে। তরমুজের জমিটা হাজিসাহেবের মেজ ছেলে কিনে নিয়েছে। ঈশমের ভিতরে ভারি কষ্ট এই তরমুজের জমির জন্য। সে একটা কথাও বলতে পারেনি। যা দিয়েছেন ভূপেন্দ্রনাথ, যত্ন করে আঁচলে গিট বেঁধে কোমরে গুঁজে রেখেছে। ঘাটেই ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তর আর কষ্ট করে নারাণগঞ্জে গিয়ে কী হবে। সে তাতেও কিছু বলেনি। কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আর নৌকা জলে ভাসলে অনেক দূরে সহসা দেখল শশীভূষণ গাছপালার ফাঁকে কে হেঁটে আসছেন নদীর পাড়ে পাড়ে। শশীভূষণের নৌকা আগে। তিনটে বড় বড় নৌকায় সব নিয়ে এদেশ থেকে রওনা হয়েছেন ওঁরা। শশীভূষণ সোনা ধনবৌ বড়বৌ আগের নৌকায়। শশীভূষণই প্রথম দেখেছিলেন পাড়ে পাড়ে-পাড় স্পষ্ট নয়, তবু কে যেন ওঁদের নৌকা অনুসরণ করে এগুচ্ছে। শশীভূষণ সোনাকে ডেকে বলল, কে হাঁটছে রে পাড়ে পাড়ে?

সোনা ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল।—ঈশমদা। আমাদের কুকুরটা সঙ্গে।

শশীভূষণ এবার পিছনের নৌকায় ভূপেন্দ্রনাথকে বললেন, দেখছেন?

—কী? ভূপেন্দ্রনাথ চারপাশে তাকাতে থাকলেন। চারপাশে নদীর চর এবং ধানখেত। মাঝখানে নদীর জল টলটল করছে। আশ্বিন মাস বলে জল নেমে যাচ্ছে মাঠ থেকে। নানারকম পাখি নদীর চরে। তিনি বিলের এক ঝাঁক পাখি দেখতে দেখতে বললেন, কী বলছেন?

—ঈশম এখনও আসছে পিছু পিছু।

ভূপেন্দ্রনাথ পাটাতনে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর সতর্ক নজর রাখতেই বুঝলেন ঈশম নদীর পাড়ে পাড়ে যে গ্রাম অথবা বালির চর আছে তার উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। তিনি ঈশমকে এবার ইশারায় বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। ঈশম হাত তুলে যেন বলছে, ঠিক আছে। সে সময় হলেই ফিরে যাবে। সুতরাং ভূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, ঈশম যতক্ষণ পারে ততক্ষণ হাঁটবে। এবং ঠিক দামোদরদির মঠ পার হলে সে আর এগুতে পারবে না। সামনে বড় বাঁওড় পড়বে। সে জল ভেঙে ওপারে যেতে পারবে না। ওকে তখন ফিরে যেতেই হবে। ভূপেন্দ্রনাথ সেজন্য আর কিছু না বলে যেমন ক্লিষ্টমুখে বসেছিলেন তেমনি আবার বসে থাকলেন।

সোনার ভারি কষ্ট। ওর ঈশমদা এতদূরে যে সে চিৎকার করে ডাকলেও শুনতে পাবে না। এখান থেকে সে যত জোরেই কথা বলুক শুনতে পাবে না। এঁরা সবাই সব নিয়ে যেতে পারছেন, শুধু সে পারছে না পাগল জ্যাঠামশাই, ঈশম আর ফতিমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। ওদের নিয়ে যেতে পারলেই আর কোনও কষ্ট থাকত না। কিন্তু তারপরই সোনার মনে হল সে যা কিছু ফেলে যাচ্ছে, তা আর ফিরে পাবে না। আবার এদেশে সে আসতে পারবে কবে জানে না। সে বড় হলে ঠিক চলে আসবে। কারণ যত দূরেই থাক, সে তরমুজের জমি, নদীর জল, মালিনী মাছ ভুলে বেশি দিন থাকতে পারবে না কোথাও। পাটাতনে দাঁড়িয়ে কেন জানি সোনার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হল ঈশমদাদা আপনি ফিরে যান। আমরা আবার ফিরে আসব।

কিন্তু সে জানে তার কথা অতদূরে পৌঁছাবে না। সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকল। বৈঠার জল ছপছপ শব্দ করছে। সামান্য হাওয়া লেগেছে পালে। আর ক্রমে নদীর দু'পাড় উঁচু হয়ে যাচ্ছে। উঁচু হতে হতে সে দেখল অনেক উঁচুতে একটা মানুষ স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এক বিন্দু ঘাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না।

ঈশম জানত না সেই বিন্দু বিন্দু নৌকা থেকে এখনও একজন ওকে দেখছে! যতক্ষণ দেখা যায় দেখছে। এত উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে যে সোনার মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছিল তিনি না নিচে পা হড়কে পড়ে যান। পড়ে গেলে অনেক নিচে পড়ে যাবেন। মেঘনা নদী বর্ষায় পাড় ভাঙতে ভাঙতে ভাঙে নি। ফাটল চারপাশে। আগামী বর্ষার জল যখন বেগে নেমে যাবে এই সব গ্রাম মাঠ ভেঙে নদীর অতলে হারিয়ে যাবে। ফলে পাড় এত খাড়া যে তাকাতেই সোনার ভয় হচ্ছিল।

আর তখন সামনে সেই নদীর বাঁওড়। ওঁরা বাঁওড়ে পড়ে গেলে ঈশম আর কিছু দেখতে পেল না। ওঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তবু সে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মাথার উপর সূর্য উঠে গেছে। ফিরতে ফিরতে তার রাত হয়ে যাবে। একমাত্র সঙ্গি তার এই আশ্বিনের কুকুর। সকাল থেকে না খেয়ে আছে। সে বাজারে ঢুকে কিছু মুড়কি কিনে নিজে খেল এবং কুকুরটাকে দিল। এখন সে কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না। ঘরে যে পঙ্গু বিবি আছে সে-কথা পর্যন্ত তার মনে নেই। নদীর পাড়ে সে কিছুক্ষণ একা বসে থাকল, একা একা হাঁটল। এ-ভাবে সে ওঁদের বিদায় দিয়ে নদীর পাড়ে একা দাঁড়িয়ে থাকবে ভাবতে পারেনি। সে এখন আবার হাঁটছে।

তরমুজের জমিতে ফিরে মনে হল কারা ভাঙা ছইটা আলের কিনারে ফেলে রেখেছে। ওর ভীষণ রাগ হল। মাথার উপরে আকাশ। অজস্র নক্ষত্র এবং বালিয়াড়িতে নদীর জল বাতাসে খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে ভেবেছিল এসেই এখানে বসে এক ছিলিম তামাক খাবে। কিন্তু সে যখন দেখল ওর সেই ভাঙা ছই একপাশে পড়ে আছে, আর হুঁকা কলকে, আগুন রাখবার পাতিল, কিছু খড় সবই গাদা মারা তখন রাগে হতাশায় ওর বুক ফেটে গেল। সে বলল, হায় আল্লা! তারপরই মনে হল এ-জমি তার নয়। এ-জমি হাজি সাহেবের মেজছেলের! ওদেরই কাণ্ড! ওরা এসে ঈশমের যা কিছু ছিল সব ফেলে দিয়েছে। সে এখানে আর কোনওদিন নেমে আসতে পারবে না, তরমুজের জমিতে দাঁড়িয়ে আল্লার করুণা দেখতে পাবে না ভাবতেই চোখ ফেটে জল এসে গেল। সে খুব কম চোখের জল ফেলেছে। সে মনে মনে নিষ্ঠুর। কিন্তু আজ প্রথম তার এটা কী হল! ওর একমাত্র বিবি, যে যৌবন ভালো করে আসতে না আসতেই পঙ্গু অসাড় হয়ে গেল, অথবা ঝড়ে জলে তার যে জীবন গেছে, দুঃখ ছিল অনন্ত, কোনওদিন সে এমনভাবে মুষড়ে পড়েনি। সে হাঁটতে পর্যন্ত পারছে না। শরীর তার অসাড় হয়ে গেছে। এই জমির ভিতর তার পা যেন গেঁথে যাচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে জমিটার শোকে আকুল হচ্ছে। এ-জমি আর তার নয়—এ-জমিতে আর সে তরমুজ ফলাতে পারবে না।

এই তরমুজের জমি বড় ভালোবাসার জমি। বিবির চেয়ে প্রিয় এবং নিঃসন্তান ঈশম এই জমিকে প্রায় সন্তান বড় করার মতো উর্বরা করে তুলেছে। সে চুপচাপ বসে থাকল জমিটার উপর।

এখন রাত বাড়ছে। বিন্দু বিন্দু আলো যা জ্বলছিল ক্রমে নিবে আসছে। ঠাকুরবাড়ির কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ আর পাওয়া যাবে না। ঈশম এই আওয়াজের সঙ্গে রাত কত হল টের পেত। সে বুঝতেই পারছে না রাত এখন ক'প্রহর। সে জমিটার ভিতর বসে মুঠো মুঠো মাটি তুলে আবার ফেলে দিচ্ছে, কখনও চোখের সামনে এনে দেখছে—এই মাটি কার? এই ভালোবাসার মাটি কার? সে কে? কেন সে এখানে বসে রয়েছে?

যেমন শেয়ালেরা ডাকে প্রহরে প্রহরে তেমনি ডেকে গেল। যেমন প্রতি রাতে পাখিদের শব্দ সে পেত নদীর চরে আজও তেমনি পাখিরা উড়ে এসে বসছে। সে এমন

কি খরগোশের শব্দ, ইঁদুরের শব্দ সব টের পাচ্ছে। এই জমিটার প্রতি সবার লোভ ছিল। মায় টিয়াপাখির। কচি ডগা কেটে ওরা উড়ে যেত আকাশে। নির্জন রাত্রির অন্ধকারে বসে ঈশম সব টের পাচ্ছে। কিছুই পরিবর্তন হয়নি। কেবল সে নিজে কী ভাবে প্রথম ভূমিহীন হয়ে গেল! সে যে এতদিন ভূমিহীন ছিল টেরই পায়নি। আজ প্রথম জমির আলে ওর সেই প্রিয় ছই পড়ে থাকতে দেখে ভাবল, তার সব গেছে।

সে সবকিছু হারিয়েছে।

এ-ভাবে সে উঠে গেল অর্জুন গাছের নিচে। চোরের মতো সে এ-গ্রামে ফিরে এসেছে। এত বড় বাড়িটা নিশ্চিহ্ন। কেবল পুবের ঘরটা এখনও আছে। দু'-চারদিনের ভিতর এটাও ভেঙে নিয়ে গেলে প্রতাপ চন্দের ছেলেরা বেগুনখেত করবে। সে বাড়িটার চারপাশে ঘুরতে থাকল। ঘুরতে ঘুরতে ওর খেয়াল নেই কখন সকাল হয়ে গেছে। সকাল হলেই মনে হল তার পঙ্গু বিবি ঘরে আছে। গতকাল সারাটা দিন তার ভীষণ কষ্টের ভিতর গেছে। সে আনমনা থেকেছে। নিজের ভিতর ডুবে ছিল। এত সহজে এক কথায় ওরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে ঈশম কল্পনাও করতে পারেনি। কেমন একটা ধুন্ধুমার লেগে গিয়েছিল ওর মনে। সে বেহুঁশের মতো কেবল ছুটাছুটি করেছে। সকাল হলেই সে টের পেল—ওর পঙ্গু বিবিকে গতকাল খাবার দিতে ভুলে গেছে। এমন একটা ভুলের জন্য সে আল্লার কাছে দোয়া চাইল। এবং গোপাট ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন সে ছোট কুঁড়েঘরটায় ঢুকে গেল, দেখল বিবি তার কেমন শক্তভাবে তাকিয়ে আছে।

সে বলল, আমি আইছি। তবে দুইডা চাইল ডাইল সিদ্ধ কইরা দেই। তুই খা।

বিবি তার দিকে তাকিয়েই আছে, কথা বলছে না। ঈশম সে সব লক্ষ করল না। সে আপন মনে হাঁড়ি-পাতিল খুঁজছে। এই প্রথম তাকে বাড়িতে দুটো চাল-ডাল সিদ্ধ করতে হবে। বিবিটা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে বলে কথা বলতে পারছে না। সারাটা শরীর অসাড় তার। খাইয়ে দিতে হয়। শুকনো ক'খানা হাড় ছেঁড়া কাঁথার ভিতর ঢাকা থাকে। সব, সে একবার এসে দিনে পরিষ্কার করে দিয়ে যেত। সে না থাকলে জোটন, মনজুরের মা অথবা জালালি করত। ওরা বেঁচে নেই! জোটন পীরানি হয়ে গেছে। কতবার সে ভেবেছে একবার ফকিরসাবের দরগায় যাবে। কিন্তু এত কাজ তার সে সময়ই করে উঠতে পারেনি। এবারে সে সব করবে। নিজের খুশিমতো ঘুরে বেড়াবে। তার কোনও বন্ধন থাকল না। বিবি একমাত্র বন্ধন। তার মায়া কাটাতে পারলেই ঈশম মুক্তপুরুষ। হাজিসাহেবের মেজ বিবিকে বলে দিলে পঙ্গু বিবির কাজকাম করে দিয়ে যায়। কাল হয়তো সে-ই দুটো খাইয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু বিবি রাগে কথা বলছে না। ঘরটার দরজা খুব ছোট। জানালা নেই। ভিতর সব সময়ই অন্ধকার থাকে। আর ঘরের ওপর বড় এক আতা ফলের গাছ। গাছের ছায়া বড় ঠাণ্ডা। ঘরে ঢুকলেই কেমন শীত শীত করে। সে একা এ-ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

সে বলল, কাইল মাইজলা বিবি আইছিল? তুই কিছু খাস নাই?

কোন জবাব নেই বলে, সে হাসল। কারণ বিবির এই রাগ দেখলেই ওর যৌবনের কথা মনে হয়। বড় বালিকা ছিল সে। ঈশম তাকে মেলা থেকে পুঁতির মালা এনে দিলে এমন রাগ করে থাকত। সে হাঁড়িতে জল এনে রাখল। নোংরা শাড়িটা ধুতে গেল ঘাটে। এবং ঘাসের ওপর শুকোতে দেবার সময় মনে হল, বিবিটা কিছুতেই কথা বলছে না।

সে ঘরে ঢুকে বলল, বেশি সময় লাগব না। দ্যাখ, কত, তাড়াতাড়ি তরে ভাত পাকাইয়া দেই।

কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য না। বিবির গলা এমনিতেই অস্পষ্ট। সে হয়তো ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে এবার মাদুরের পাশে বসে আগুন জ্বালাবার সময় বলল, দিয়া আইলাম তাইনগ। নদীর পাড়ে ছাইড়া দিয়া আইলাম।

ঈশম তবু একা একা কথা বলছে, কী সুখ হে পারে জানি না আল্লা। এমন সোনার দ্যাশ ফালাইয়া পাগল না হইলে কেউ যায়।

ঈশম আবার নিজেই মনকে বুঝ-প্রবোধ দেয়। গ্যাছেন বইলা আমার কষ্ট হইছে! আরে আল্লা আমি কি কাম কাজ জানি না! আমার খাওয় নের অভাব আছে! আল্লার দুনিয়ায় কেউ না খাইয়া থাকে না। বলেই সে এবার মাথায় হাত রেখে যেমন আদর করে মাঝে মাঝে তেমনি বলল, ভাল হইলে তরে লইয়া নদীর হে পারে যামু। এই দ্যাশে আর থাকমু না।

বিবির শরীর বড় ঠাণ্ডা মনে হল। হিম ঠাণ্ডা। শক্ত। আরে তুই এমন ঠাণ্ডা মাইরা আছস ক্যান? কি হইছে তর?

কিন্তু না কোনও কথা না। সে তাড়াতাড়ি মাথাটা কোলের ওপর তুলতে গিয়ে দেখল একেবারে শক্ত। প্রাণ নেই। সে আবার ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। সে কাউকে ডাকল না। এ-ঘরে আলো আসতে পারে না। সে ঘরের সব বেড়াগুলি খুলে ফেলল। এখন কী আলো ঢুকছে ঘরে! নীল কাঁথার নিচে বিবি। সেই প্রথম পঙ্গু হয়ে যাবার পর দীর্ঘদিন তাকে একা অন্ধকারে ফেলে—সে যেন নিরুদ্দেশে ছিল। আর কী আশ্চর্য, ফিরে আসার পর সে যেন এই প্রথম আলোতে মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে বিবি। ঠোঁটের কোণে সামান্য মিষ্টি হাসি! বয়স আর বাড়েনি বিবির। সেই শৈশবের মুখ। সে শরীরে পঙ্গু হয়েছিল। মুখে যে লাবণ্য ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। মুখ তার বিন্দুমাত্র জরাগ্রস্ত হয়নি। কাল, বিন্দুমাত্র মুখে থাবা বসাতে পারেনি। তার সুন্দর মুখচোখ এত বেশি তাজা ছিল ঈশম জানত না। ওর অন্ধকারে মনে হতো বিবি তার শুকিয়ে যাচ্ছে। বিবি তার মরে যাবে। ঘরের দরজা এত ছোট যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। জল-ঝড়ে যাতে বিবির কষ্ট না হয় তেমনি করে ঘরটা ঈশম তুলেছিল। এখন মনে হচ্ছে একবার আলো জ্বেলে সে কেন দেখল না—বিবির বয়স বাড়েনি। এমন আশ্চর্য ঢলঢলে মুখ দেখে বিবির জন্য মায়া

পড়ে গেল। সে কোন ও লোক ডাকল না। ডাকলেই সে আর বিবির পাশে বসে থাকতে পারবে না। ওর মুখ দেখতে পাবে না। তাকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে।

আবেদালি যাচ্ছিল মাঠে। সে মাঠে যেতে দেখল ঈশমচাচা ঘরের সব বেড়া খুলে চাচির পাশে বসে রয়েছে। এখন ধান পেকে গেছে মাঠে। মাঠে কোথাও কোথাও জল-কাদা। চারপাশে আবার সেই সোনালী ধান। ধানের গন্ধ সর্বত্র। আর এ-সময় চাচা চুপচাপ পাশে বসে রয়েছে! কাজকামের মানুষ। কর্তারা সব চলে গেছে। গেলেও মানুষটার কাজের শেষ নেই। চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নয়। সে কোন কৌতূহল বোধ করল। তা ছাড়া কর্তাদের সে নারাণগঞ্জে তুলে দিয়ে এসেছে— ওদেব যেতে রাস্তায় কোনও অসুবিধা হয়েছে কি-না, বিলের দু'বিঘা জমি কাকে দিয়ে গেল, ঈশমচাচা কী পেল। এতদিনের পুরানো বিশ্বস্ত মানুষ ঈশম, তাকে কিছু না দিয়ে কর্তারা যাবে না। সে এতসব জানার জন্য যখন ঘরটার পাশে উঠে গেল তখন দেখল পাগলের মতো চাচা চাচিকে কোলে নিয়ে বসে আছে। আবেদালিকে দেখেও কোনও কথা বলছে না। চাচিকে সে কাঁথা দিয়ে শিশুর মতো ঢেকে রাখছে।

এমন ঘটনায় আবেদালি তাজ্জব বনে গেল। দিনদুপুরে মড়া কোলে নিয়ে বসে রয়েছে, কথা বলছে না! সে সবাইকে ডেকে আনল। চাচির ইন্তেকাল। সবাই প্রায় জোর করে বিবিকে টেনে নামাল ঈশমের কোল থেকে। ঈশম আর দাঁড়াল না। সে হেঁটে একা একা কবরখানায় চলে গেল। সারি সারি কবর। শেষ দুটো কবর জালালি আর ফেলুর। পাশেই ওর বিবির কবর হবে। জায়গাটা এত নির্জন যে পাশাপাশি মাটির নিচে সবাই মিলে সুখেই থাকবে। সে মনে মনে আল্লার কাছে তার বিবির জন্য দোয়া মাগল। আবার কাশফুল ফুটেছে চার পাশে, মসজিদে আবার সেই তিন সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। মনজুর ইমামের কাজ করছে। এবং সেই সব পাখি তেমনি আকাশে উড়ছিল। শরতের আকাশ আর কবরের ওপর কাশের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। সে বিবিকে মাটির নিচে রেখে কিছুদিন আর এ-দেশে থাকল না। থাকতে ভালো লাগল না। সহসা সব কিছু কেন জানি অর্থহীন হয়ে গেছে।

সে যেতে যেতে উত্তরে চলে গেল। উত্তরে যেসব মেমানদের বাড়ি আছে তার, তাদের বাড়ি উঠে নিজের পরিচয় দিল যৌবনে সে একবার এ অঞ্চলে এসেছিল। যারা যারা তাকে চিনত, তাদের অনেকেই বেঁচে নেই। কেউ বুড়ো অথর্ব হয়ে গেছে। কেউ তাকে চিনতে পারল না। এতদিনে ঈশমের মনে হল তার সত্যি বয়েস হয়েছে। একটা কাজকামের দরকার —কিন্তু কোথায় করে! তেমন সে বাড়ি পাবে কোথায়! সে ঠাকুরবাড়ির বাঁধা লোক ছিল বলে তার অঞ্চলের জাতি ভাইরা ওকে বিধর্মী ভাবত। তা'ছাড়া সে তো আর যেখানে সেখানে কাজ করে নিজের মান খোয়াতে পারে না। এ-ভাবে যে তার কতদিন চলে যায়। একটা তো পেট, কোনওরকমে ঠিক চলে যাবে। আসার আগে মনজুর, হাজিসাহেবের বড় বেটা ইসমতালি সবাই ওকে থাকতে বলেছিল। কাজের মানুষ। এমন মানুষ পাওয়া ভার। সে সবাইকে বলেছে, আর না। আর কাজ না। এই বলে সে সবাইকে

দূরে সরিয়ে রেখেছে। বস্তুত ঈশম আর প্রাণে সাড়া পাচ্ছে না। কেবল মনে হয় তার জীবনের সব ঐশ্বর্য ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। এখন একটু ঘুরে-ফিরে মাঠে চুপচাপ একা বসে আল্লার মর্জির কথা ভাবা। তবু কাজের মতো কাজ পেলে সে করতে পারত। তেমন কাজ তাকে আর কে দেবে!

সে একদিন দেখল, কিছু লোক সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছে। পাশাপাশি কোথাও মেলা থাকতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই মেলা! সে প্রশ্ন করে জানতে পারল, ওরা মেলায় যাচ্ছে না, ওরা যাচ্ছে সদরে। সদরে জিন্নাহ সাহেব আসছেন বক্তৃতা দিতে। দূর দূর গ্রাম থেকে নাস্তা গামছায় বেঁধে মানুষ যাচ্ছে জিন্নাহসাহেবকে দেখতে। ঈশম যেতে যেতে ভাবল, একবার সেও চলে যাবে নাকি! এত বড় মানুষ আসছেন, তিনি দুঃখী মানুষের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখেছেন। আলাদা দেশ করে দিয়েছেন। এবারে তোমরা বাপুরা নিজেদের মতো করেকর্মে খাও। তারও ভারি ইচ্ছা সেই মানুষকে দেখে। সদরে গেলে সে সামসুদ্দিনের বাসায় থাকতে পারবে। কিন্তু সামসুদ্দিন কোথায় থাকে, ঠিকানা তার জানা নেই। শহরে গেলে নিশ্চয়ই সে মানুষটার নাগাল পাবে না। সে আর একা একা অতদূর যেতে সাহস পেল না।

ফতিমারও ভারি ইচ্ছা ছিল যায়। কত লোক দূর দূর থেকে শহরে আসছে। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে দেখা যায় অজস্র অগণিত মানুষ, মাথার উপরে ফেস্টুন উড়ছে, লাল-নীল পতাকার মতো সব রঙ-বেরঙের ইস্তাহার, যেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে মানুষের মাথার উপর। সকাল থেকে অগণিত মানুষ যাচ্ছে আর যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। আল্লাহু আকবর। কায়েদ-ই-আজম-জিন্দাবাদ। রাস্তায় রাস্তায় তোরণ, গাছে গাছে আলো এবং মিনারে মিনারে অপরূপ লাবণ্য—ফতিমা দুপুর থেকে সাজছে। সেও যাবে। কিন্তু কী যে হল, সে তার বা'জানের মুখের দিকে তাকাতেই কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সকালে সে বা'জানের যে উল্লাসের মুখ দেখেছে, এই বিকেলে তার বিপরীত। সামসুদ্দিনের মুখ থমথম করছে। সে কী যেন টের পেয়ে গেছে। টের পেয়েই সে বলেছে ফতিমাকে, তোমায় যেতে হবে না। মেয়েরা কেউ যাবে না। ফতিমার এত ইচ্ছা যাবার অথচ যেতে পারছে না। সে তার বাবাকে অন্তত একবারের জন্য অনুরোধও করতে পারছে না। সে যাবে আর আসবে। একবার দেখেই সে চলে আসবে। কিন্তু বাপের মুখ দেখে ফতিমা সেটুকু পর্যন্ত বলতে সাহস পাচ্ছে না।

সামসুদ্দিন সকাল থেকে নানাভাবে এই মহান দেশকে কীভাবে সামনে নিয়ে যেতে হবে এবং তার বক্তৃতায় কতটা বাংলাদেশ থাকবে, কতটা সারা পাকিস্তান থাকবে, সে কতটা কার হয়ে বলবে, বলা উচিত—এসব যখন ভাবছিল, তখন হক চৌধুরী গোপনে একটা খবর দিয়ে গেল। সে পাগলের মতো হক-চোধুরীর মুখের ওপরই না না করে উঠেছিল। তার সামনে বড় আয়না! গায়ে আচকা। সে নিজেকে আয়নায় প্রথমে চিনতে পারল না। চিনতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। সে কেমন বিষণ্ণ গলায় ডাকল, ফতিমা।

ফতিমা বলল, যাই বা’জান।

ফতিমা কাছে এলে বলল, একবার ফোন করে দেখ তো, কাদেরসাহেব আছেন কিনা?

ফতিমা ডায়াল ঘোরাল সে দু'বারের চেষ্টায় কাদেরসাহেবের বাড়ির সঙ্গে সংযোগ করতে পারলে বলল, তিনি বাড়ি নাই বা’জান।

—ঠিক আছে। বলেই সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে দেখল পত্রিকার তরফ থেকে একজন রিপোর্টার এসে নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে ইশারা করে উপরে চলে আসতে বলল।

—কি চাই বল?

—কায়দ-ই-আজম এইমাত্র ঢাকায় এসেছেন। এ-মুহূর্তে আপনার কী মনে হচ্ছে?

—কী যে মনে হচ্ছে বলতে পারছি না।

—কিছু অন্তত বলুন।

—আজ বলব না। কাল আসবে, বলব।

পত্রিকার রিপোর্টারটি কাল যখন এল সামসুদ্দিন তাকে চা খেতে বলল। তারপর কথা প্রসঙ্গে যেন বলা, তুমি কাল আমাকে কিছু বলতে বলেছিলে?

রিপোর্টারটি চিনি গুলতে গুলতে বলল, বলেছিলাম সামুভাই।

—আজ কী শোনার ইচ্ছা আছে?

রিপোর্টারটি যেন জানতো, সামুভাই এবারে কী বলবে। সে বলল, আমি জানি আপনি কী বলবেন।

—কী বলব?

—যে দেশের হাজারে মাত্র পঁচিশজন লোক উর্দুভাষায় কথা বলে, সে-ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয় কী করে?

—শুধু তাই নয়। আমরা হাজারে চারশ' বারো। চারশ' বারোজন বাংলা ভাষায় কথা বলি। তার চেয়ে বড় কথা বাপ-দাদার ভাষা বাদে অন্য ভাষা আমাদের জানা নেই। আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলাভাষা।

রিপোর্টারটি বলল, ছাত্রলীগের বৈঠক শেষ করে ফিরতে আপনার নিশ্চয়ই রাত হয়েছিল?

—তা হয়েছিল। কেন বল তো?

—সাবধানে থাকবেন। আপনাদের আন্দোলন দানা বাঁধুক সরকার তা চাইছে না।

সামসুদ্দিন এ কথায় সামান্য হাসল। সেই ছোট্ট হাসি। অথচ কী বলিষ্ঠ এবং দৃপ্ত সে হাসি। সে বলল, তোমাদের আজকের রিপোর্ট চমৎকার হয়েছে। বুঝতে পারছ এ-ব্যাপারে এখন থেকে কিছু মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকবে। হিন্দুস্থানের চর, দালাল এবং কম্যুনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করবে।

—তা করবে।

—গতকাল তুমি কোন্ দিকে বসেছিলে? প্রেস গ্যালারিতে তোমাকে দেখিনি তো!

—আমি ঠিকই ছিলাম। আপনি এত বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে লক্ষ করেননি।

—ভাল কথা। তোমার আতাউরসাহেবকে একটা কথা বলবে আমার হয়ে?

রিপোর্টারটি তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু সামসুদ্দিন যেন কী মনে করার চেষ্টায় বসে আছে। ঠিক মনে করতে পারছে না বলে বলতে পারছে না। এবং মুখের উপর নানারকম রেখা খেলা করে বেড়াচ্ছে। মনের গহনে ডুবে গিয়েও যেন সে যা খুঁজছে পাচ্ছে না। সে বিব্রত বোধ করতে করতে ডাকল, ফতিমা ফতিমা।

—যাই বা'জান।

—তর বন্ধু আনজুর দাদার কী নাম যেন?

—সফিকুর।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ছেলেটি উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। ওর বোনটা পড়ে ফতিমার সঙ্গে। তোমাদের কাগজের কিছু কাজটাজ যদি ওকে দেওয়া যায়, তবে তো কলেজের পড়াটা চালিয়ে যেতে পারে। কোনখানে অগ বাড়ি য্যান ফতিমা?

—মুর্শিদাবাদে। গাঁয়ের নামটা মনে নেই।

—মনে করে আতাউরকে বলবে। আমি একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেব। মনে থাকবে তো। তুমি ভাই বলো মনে করে।

রিপোর্টারটি হাসল। মাঝে মাঝে সামুভাই কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যান কথা বলতে বলতে। সে বলল, এটা যাহোক নতুন কথা শুনালেন জিন্নাহ্-সাহেব। লাহোর রেজুলেশনের অদ্ভুত ভুল বের করেছেন এতদিন পরে—পাকিস্তান হচ্ছে ইনডিপেণ্ডেট স্টেটস্ নয়। লাহোর রেজুলেশনের স্টেটস্ শব্দের শেষের 'এস'টি টাইপের ভুল। একটি মাত্র ‘এস' বাদ দেওয়ার ফলে পাকিস্তান হয়ে গেল এক রাষ্ট্র। এক ভাষা, এক সংস্কৃতির দেশ

—দিনে দিনে আরও কত কিছু হবে। তারপর সহসা মনে পড়ে যাবার মতো বলল সামু, আমি আর বসব না। তুমি আবার এস। সময় পেলেই এস, কথা বলা যাবে। আজ আবার কার্জন হলে সুধী সমাবেশ হচ্ছে। জিন্নাহসাহেব বক্তৃতা করবেন। আজ কী বলেন আবার দেখা যাক।

জিন্নাহ টুপির ছড়াছড়ি। গেটের মুখে সামসুদ্দিন এবং ছাত্রলীগ নেতা নাইমুদ্দিন দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আজ সামু শেরোয়ানি আচকান পরেনি। পরলেই ওর নিজেকে কেন জানি জনতার মানুষ বলে মনে হয় না। সে যেমন চিরাচরিত পোশাক পরে থাকে, পাজামা, ঢোলা পাঞ্জাবি, আজও সে তাই পরেছে। এখন সে নিজেকে সহজে চিনতে পারে। আয়নায় দাঁড়ালেও সে যে সামসুদ্দিন, ফসলের খেতে সে এবং মালতী বড় হয়েছে, মালতীর কথা মনে আসতেই এই সুসময়ে তার চোখ কেমন চিকচিক করে উঠেছে। সে ভুলতে চাইছে, যা সে ফেলে এসেছে। তার দিকে আর ফিরে তাকাবে না। অথচ কেন যে সে এমন কষ্ট পায়, কেন যে সে বাড়ি যাবার পথে দেখে ফেলেছে, ঠাকুরবাড়ির ঘর-দরজা কিছু নেই। খালি খাঁখাঁ করছে পাড়াটা। দীনবন্ধু নেই, নরেন দাস চলে গেছে। সব খালি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে—ওর এসব মনে পড়লেই কষ্টটা বাড়ে। ফতিমা আর যায় না। সে বড়দিনের বন্ধে। কিছুতেই তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেনি। গ্রাম থেকে ফিরে এসে যখন সে অলিজানকে বলত, দেখা যায় না। খাঁখাঁ করছে। হুহু করে বাতাস বইলে ঠাকুরবাড়ির পাইক খেলার কথা মনে হয়। তখন ফতিমা কিছুতেই কাছে থাকে না। ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। মেয়েটা সফিকুরকে ভারি পছন্দ করছে। সফিকুরের কথা শুনলে ছুটে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায়। আনজু এলে ও যে এত ফিসফিস করে কী কথা বলে! চোখের সামনে তার মেয়েটা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল। এ বয়সে সাদি না দিলে গাঁয়ে এতদিনে মুখ দেখাতে পারত না। কিন্তু সামু এখন দেশের বড় নেতা। তার মেয়ে বড় ইস্কুলে পাঠ নেয়। কত রাজ্যের কাগজ আসে বাড়িতে। দেশ বিদেশ থেকে লোক আসে দেখা করতে- সে সময়ই পায় না। মেয়েটা কখন কোন ফাকে যে বড় হয়ে যাচ্ছে এত। সে বলল নাইমুদ্দিনসাহেব, আমরা একসঙ্গে আজ উঠে দাঁড়াব।

নাইমুদ্দিন সামুকে ভালই চেনে। সামুভাই কী যেন ভাবছিল এতক্ষণ। এমন দৃঢ়চেতা বাঙালী, মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালী ক'টা আছে হাতে আঙুল গুনে যেন বলা যায়। সে বলল, ডর নাই সামুভাই। আপনার পিছনে আমরা আছি। সারা বাংলাদেশ আছে। আপনার তবে ডর কি?

সামু বলল, আসেন। ভিতরে গিয়া বসি।

সামুর ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সে গাড়িতে বসে চারপাশ থেকে যেন কেবল শুনতে পাচ্ছে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উর্দুই হবে... উর্দুই...।

সে হলের ভিতরও এমন এক সুধীসমাজের মধ্যে বসেছিল যারা জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা আবেগভরে শুনে যাচ্ছে। ওরা কেবল শুনে যাচ্ছে। কিছু বলছে না। আর জিন্নাহসাহেবও সময় বুঝে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা, যেন তাঁর মুখে অন্য কোনও কথা নেই, তিনি যেন বাঙালীকে সেই সুদূর সিন্ধু দেশের উপত্যকা থেকে ছুটে এসেছেন কেবল বলতে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সে আর পারল না। সে চিৎকার করে বলে উঠল—না! তা হবে না। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।

থমথম করছে সারা হল। কে, কে এমন কথা বলছে! মানুষটার দিকে তাকিয়ে সুধীসমাজ মাথা নিচু করে রাখল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কেউ আর বলতে পারছে না। গভর্নর-জেনারেলের মুখের ওপর এমন কথা কে বলতে পারে!

সামু আর দাঁড়ায়নি। সে মনে মনে জানে এটা হতে পারে না। সে কিছুক্ষণ বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর দেখাদেখি কাদেরসাহেব বের হয়ে এলেন। এবং কিছু তরুণ এসে তাকে ঘিরে ধরল। বলল, আমরা আছি সামুভাই, আপনার ভাবনার কিছু নাই।

তারপর সামু জানে চুপচাপ বসে থাকার সময় আর হাতে নেই। দেশের স্বাধীনতার পর আর এক সংগ্রাম গ্রামে মাঠে আরম্ভ হয়ে গেছে। সে দেখল জিন্নাহসাহেব যখন বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন চারপাশ থেকে অযুতকণ্ঠে গলা মিলিয়ে কারা যেন বলছে, না না না। উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে না।

সামুর মুখের ও পর লাইটপোস্টের আলো এসে পড়েছে এতক্ষণে। কিছু বোগেনভেলিয়ার পাতা ডাল মাথার উপর। সেই আলোর ভিতর থেকে সে যেন সংগ্রামের অন্য আলোর সন্ধান পেল। সে আবার গ্রামে মাঠে চলে যাবে—বাংলার জনতার রায় নেবে। সে যখন গভীর রাতে ফিরল হাতের কাজ সেরে, তখন দেখল মেয়েটা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুমোয়নি। বাপের জন্য জেগে বসে আছে।

ফতিমা বলল, বা'জান, ফিরতে এত দেরি হয় ক্যান?

সামু খেতে বসে মেয়েকে বলল, কাজ আম্মা অনেক। আজ কী তারিখ রে ফতিমা?

ফতিমা বলল, এগার তারিখ! সারাটা জীবন কাজ কাজ কইরাই গ্যালেন।

—কী করি ক! কাজ থাকলে তারে ফেলতে নাই। বলে সে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বাড়ি যামু। তুই যাইবি?

বাড়ি যাবার নামে প্রতিবার সে যেমন মুখ উদাস বাখে, আজও তেমনি বাপের দিকে উদাসভাবে তাকাল। সে কিছু বলল না। যেন সে খুব মনোযোগ দিয়ে বাপের খাওয়া দেখছে—আর কিছু শুনছে না, শুনলে পাপ, দুঃখ তার বাড়ে, যতটা পারল অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করল।

—কাদেরসাহেবের গাড়িতে যামু। গাড়ি নদীর পার পর্যন্ত যায়। বাড়ির কাছে পাকা রাস্তা গেছে।

ফতিমা দেখল বা'জান কেবল কথাই বলছে। কিছু খাচ্ছে না। মা সব গরম করে দিয়েছে। তবু খাচ্ছে না। ভাত নাড়াচাড়া করছে শুধু। এত রাতে কেউ খেতেও পাবে না। ফতিমা এসব দেখে বলল, কিছুই ত খাইলেন না?

ক্যান! বেশ ত খাইলাম!

—কি আর খাইলেন। এভাবে খাওয়ন কয়!

সামু একটা সানকিতে মুখ কুলকুচা করে উঠে গেল। সামু উঠে গেলে থালাটা নিয়ে ফতিমা টেবিলে গিয়ে বসল। অলিজান ফতিমাকে কিছু লাগবে কি-না জিজ্ঞাসা করে নিজেও খেতে বসে গেল। ওরা ফরাসের ওপর বসে খাচ্ছে। ফতিমাব, বা'জানের যা অবশিষ্ট ছিল ভাতই পেট ভরে গেল। ফতিয়া মাছ খেতে ভালোবাসে বলে অলিজান আরও একটুকরো মাছ বেশি দিয়েছে। সে মাছ খাচ্ছিল নিবিষ্ট মনে। সে বা'জানের দিকে তাকাতে পারছে না। তাকালেই আবার বা'জান বলবে -কী বে ফতিমা কিছু কইলি না। সে না তাকালেও জানে, বা'জান খেয়ে উঠালেই বলবে, ফতিমা যাইবি ত! সুতরাং যখন জবাব দিতেই হবে, সে মাছের কাঁটা মুখে রেখেই বলল, আমি যামু না বাজান, আমার শরীর ভাল না।

মেয়েটার এই এক স্বভাব হয়ে গেছে। বাড়িতে কিছুতেই যেতে চায় না। বাড়ির কথা, সোনালী বালির নদীর চরের কথা বললেই ফতিমা এ-কথা সে-কথা বলে এড়িয়ে যায়। এবং সব সময়ই পড়া, স্কুল, খাতাপত্র, গল্পের বই এসবের ভিতর ডুবে থাকে। কথা ফতিমা এমনিতেই কম বলে, যত বড় হয়ে উঠছে, তত যেন ওর উচ্ছ্বাস আরও কমে যাচ্ছে। কথা তার সঙ্গে অথবা বিবির সাঙ্গে -এ বাদে একজন এলে আজকাল মনে মনে খুশি হয় ফতিমা। ওর নাম সফিকুর। ওর বোন আনজু ফতিমার সঙ্গে পড়ে। অথচ কেন জানি মেয়েটা যত বড় হয়ে যাচ্ছে, তত কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে সামুর। দু'দিন পরই মেয়েটাকে কেউ নিয়ে যাবে—তার তখন বড় একা মনে হবে—বাপের প্রাণ বড় আনচান করে। সেজন্য সামু মেয়েটা যত পড়ছে, যত ভাল ছাত্রী হয়ে উঠছে তত সে উৎসাহ পাচ্ছে। শাদিসমন্দের কথা ভাবছে না। যেন মেয়েটা পড়ুক—এখনই কী শাদিসমন্দের কথা! সে বলল, গ্যালে দেখতে পাবতি ঠাকুরবাড়ির অর্জুন গাছটা কত বড় হইয়া গ্যাছে। তর মালতীপিসির কথা মনে পড়ে?

ফতিমা মুখে সুপুরির কুচি ফেলে বলল, খুব। একটা পান সে বা জ্ঞানকে সেজে দিন। পাল্টা বা'জানের হাতে দেবার সময় বলল, পিসির আর কোন খোঁজখবর হইল না।

মালতীর কথা বলে সামু কেন জানি সহসা বিমর্ষ হয়ে গেল! এই এক যুবতী তাকে বারেবারে কোথাও টেনে নিয়ে যায়—বুঝি সেই শৈশবকাল ধানখেত এবং পাটখেতের আল

অতিক্রম করে বকুল ফুল কুড়াতে যাওয়া। সে আজকাল বাড়ি গেলে কে যেন তার পাশে থাকে না—হিন্দুপাড়া খালি খাঁখা করছে। এসব ওকে পীড়ন করলে নিজের কাছেই যেন কোন কৈফিয়ত পায় না। সে কেন যে সহসা তার মেয়েকে মালতীর কথা বলতে গেল। মেয়ে বড় হয়েছে, তার। সে সব বোঝে। মালতী সম্পর্কে সে একটা দুর্বলতা সারাজীবন বয়ে বেড়াচ্ছে, মেয়েটা বড় হতে হতে বুঝি তা জেনো ফেলেছে। সামু সেজন্য বলে ফেলেই একটা গোপন দুর্বলতা ফাস করে দিয়েছে এমন চোখেমুখে তাকালে, ফতিমা হোসে বলল, এখন আর পড়াশোনা করতে হইব না। শুইয়া পড়েন!

সামু যেন কত বাধ্য সন্তান ফতিমার। সে চাদরটা টেনে আরো পড়তে পড়তে শিশুসরল মুখ করে ফেলল। এখন দেখলে চেনাই যাবে না কার্জন হলে এই মানুষই সিংহের মতো গর্জন করে উঠেছিল, না হতে পারে না। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। কেবল ফতিমা বোঝে, যতই বা'জান হাসিখুশি মুখ করে রাখুক, ফতিমা বুঝতে পারে, চোখের ভিতর দিয়ে তাকালে বুঝতে পারে-বা 'জান আবার অস্থির হয়ে উঠেছে। দেশভাগের ঠিক আগে যেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত পীড়ন বোধ করছে। ভিতরে মানুষটার কি হচ্ছে না হচ্ছে অলিজান পর্যন্ত টের পায় না। বরং যতক্ষণ বাড়ি থাকে মানুষটা ততক্ষণ এই সংসারই যেন তার সব। অলিজানের সুবিধা অসুবিধা, ফতিমা পাস করলে কোন কলেজে ভর্তি হবে, সংস্কৃত নিয়ে পড়ার ইচ্ছা মেয়েটার, ওদের সুখদুঃখ এই সার মানুষটার, সেই মানুষটাই কেমন অভিমানী মন নিয়ে বলে ফেলল ফের, তর মালতীপিসি কী এ দ্যাশে আছে! হিন্দুস্থানে গেছে গিয়া। সোনার দ্যাশ, সোনার সিংহাসনে রাজরানী হইয়া বইসা আছে।

আর তখন মালতী বুঝি সোনার সিংহাসনে দুলে দুলে পাল্কি কাঁধে বেহারা যায় হোঁ হোম না, তেমনি যেতে যেতে হাঁক পেল, আপনেরা সকলে নামেন গ মাজননীরা। স্টেশানে আইসা গ্যাছি, নামেন।

দলটা হুড়মুড় করে স্টেশনে নেমে পড়ল। এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে প্ল্যাটফরমের বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

স্টেশনের বড়বাবু হাসলেন। নিত্য এমন হচ্ছে। কোত্থেকে হতচ্ছাড়া সব রিফুজি এখানে চাল চোরাচালানের জন্য চলে আসছে। এই যে দলটা স্টেশনে নেমেই ছড়িয়ে পড়েছে, ছুটছে এলোপাথাড়ি—এরা সবাই চাল চোরাচালানের। স্টেশনে স্টেশনে এই দলটা ট্রেন থামলেই লাফিয়ে পড়বে। আর সতী-সাবিত্রীর মতো মুখ ঢেকে পালাবে। ছুটবে যতক্ষণ না প্ল্যাটফরম পার হওয়া যায়। মালতীও দেখাদেখি ছুটছিল। সে নতুন এই কাজে। সে হারুর বৌর পিছনে পিছনে ছুটছে। অভিনয়টা মালতী ধরতে পারেনি।

তখন বেলা দুপুর। তখন হাটে সবে দূর থেকে করলা এসেছে, ঝিঙে এসেছে। হাটে গরু-মহিষ এসেছে। রাস্তার চারপাশে বড় ভিড়। বড় বড় ট্রাক দাঁড় করানো আছে রাস্তার

উপর। শহরের জন্য সব্জি বোঝাই হচ্ছে। এবং সব্জির নিচে কর্ডন এলাকা থেকে চাল বোঝাই হচ্ছে। কেউ টের পাচ্ছে না। সব্জির নিচে মিহি চাল শহরে চলে যাচ্ছে।

মালতী কতদূর পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে জানে না। হারুর বৌ দেখল মালতী সীমানা ছাড়িয়েও ছুটছে। সে হিহি করে হেসে দিল। অতটা ছোটার কথা নয়। বাবুরা অতদূর যেতে বলেনি ছুটে কেবল প্ল্যাটফরম পার হয়ে কিছুদুর ছুটে যেতে হবে। যেন বাবুদের কোনও দোষ নেই। দোষ থাকার কথা নয়। বাবুরা জানে সব। নিতাইর বাপ সব ব্যবস্থা করে রাখে।

হারুর বৌ হাসতে হাসতে ডাকল, আর কৈ যাস! ইবারে থাম

মালতী বলল, পুলিশে ধরলে। বিনা টিকিটে এতদূর এসে পড়েছে। জেলহাজত হতে কতক্ষণ?

—আ ল তর যে কথা! নিতাইর বাপ বাবুগ খুশি করতে গেছে।

—তবে স্টেশনে তোরা সবাই ছুটলি ক্যান?

দ্যাখাতে হয় না ল, দ্যাখাতে হয়। বাবুরা দাঁড়াইয়া থাকেন। অগ করণের কিছু নাই য্যান, অবলা জীবের মত মুখ কইরা রাখে। কিছু জানে না মত দাঁড়াইয়া থাকে। যাত্রা দেখছস মালতী, কেষ্টযাত্রা।

মালতী হাঁপাতে হাঁপাতে দেখল ওরা একটা ভাঙা বাড়ির সামনে সবাই জড়ো হয়েছে। সে হারুর বৌকে বলল, যাত্রা দেখি নাই আবার!

—এডা হল যাত্রার সঙ। আমরা যাত্রা করলাম। বাবুরা দাঁড়াইয়া থাকল—অবলা জীব সব ছুইট্যা যাইতাছে, অরা কী করতে পারে! নিতাইর বাপের লগে বাবুগ লগে সলা পরামর্শ কইরাই এডা আমাগ করণ লাগে।

মালতী বুঝতে পেরে পায়ের নিচে মাটি পেল। ভাঙা বাড়িটার পাশে বড় একটা আমলকী গাছ। গাছে ফল নেই। গাছটা সামান্য ছায়া দিচ্ছিল। মালতী ছায়ার নিচে বসল। দলে ওকে নিয়ে আঠারজন। একমাত্র নিতাইর বাপ এ-দলে পুরষমানুষ। সেই বাবুর হয়ে কাজ করে। সে রেলের পয়সা বাদেও মহাজনের কাছ থেকে আলগা কিছু পয়সা পায়। সে দলের মোল্লা।

নিতাইর বাপ সবাইকে কেমন শাসনের গলায় বলল, এখানে বস। কেউ কোথাও যাবে না। সবাই জিরিয়ে নাও। আজ হাটবার। তোমরা ইচ্ছা করলে কিছু কেনাকাটা করে খেয়ে নিতে পার। আমরা রাত দশটার ট্রেন ধরব। বড়বাবু বলেছে, তখন চক্রবর্তীমশাইর দলের ডিউটি। ওরা লালগোলা থেকে আসবেন। নিতাইর বাপ আর কিছু বলল না। সে হাটবার বলেই হাটে ঘুরতে ফিরতে চলে গেল। মালতী এখান থেকে স্টেশনের মালগুদাম

দেখতে পাচ্ছে। বড় বড় খাঁচায় মুরগি। শয়ে শয়ে মুরগি খাঁচার ভিতর। এই সব মুরগি শহরে চালান হচ্ছে। একটা মানুষ পরনে লুঙ্গি মাথায় পাকা চুল — মানুষটা মুরগির ঝুড়িগুলির ভিতর খাবার ফেলে দিচ্ছে। মুরগিগুলি মাঝে মাঝে বড় বেশি চিৎকার করছিল —এখানে বসে মালতী সব শুনতে পাচ্ছে। ট্রেনে রাত জেগে আসতে হয়েছে বলে মালতীর এইসব দেখতে দেখতে ঘুম পাচ্ছিল। আমলকী গাছের ছায়া বড় ঠাণ্ডা। মালতী সামান্য সময়ের জন্য চোখ বুজল।

গঞ্জের মতো এই জায়গায় জেলার বড় হাট। হাটের ভিতর মানুষের শব্দ গমগম করছিল। দুপুর বলে রোদের তাপ ভয়ঙ্কর আর দীর্ঘদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না। শীত পড়ার আগে একবার এ- অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে। তারপর থেকে বড় মাঠের ভিতর বৃষ্টির জন্য কৃষকদের হাহাকার ভেসে বেড়াচ্ছিল। সুতরাং অভাব-অনটনের জন্য চাষা মানুষেরা শেষ সম্বল মুরগির আণ্ডা পর্যন্ত বেচে দিচ্ছে। গরু-বাছুর বলতে আর চাষার ঘরে কিছু নেই। অনটনের জন্য ওরা ওদের শীর্ণ গরু-বাছুর নিয়ে হাটে এসেছে। গাই-গরু-বলদের হাট পার হলে মোষের হাট — নিতাইর বাপ হাটটা ঘুরেফিরে দেখছিল। এবং বাজারে চালের দাম কত, আর মহাজনেরাই বা কত দামে নিচ্ছে—সে হেঁটে হেঁটে সব যাচাই করে নিচ্ছিল।

মালতী কিসের শব্দে চোখ খুলে তাকালে দেখল, একটা আমলকী ঠিক ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে। সে আমলকীটা তুলে তাড়াতাড়ি আঁচলে বেঁধে ফেলল। তার পাতানো বাপ নিশীথের কথা মনে পড়ছে। নিশীথের কথা মনে এলেই রঞ্জিতের কথা মনে আসে। জোটনের কথা মনে আসে। সেই দুঃসময়ের কথা তার মনে হয়। রঞ্জিত এদেশে এসেই কি এক অসুখে ভুগে ভুগে মরে গেল। মরে গেল না কেউ মেরে ফেলল ওকে, সে বোঝে না। মানুষটা তার আদর্শ ছেড়ে দিতেই আর বড়মানুষ থাকল না। ক্ষীণকায় হয়ে গেল। বাঁচার সব উৎসাহ নিভে গেল। তবু সে মানুষটাকে সারাক্ষণ স্বামীর মতো আদবযত্ন করেছে। রঞ্জিত কেমন নিরুপায় মানুষের মতো তাকাতো তখন। তুমি আমাকে মুক্তি দাও মালতী। এমন একটা চোখমুখ ছিল তার। মুক্তি তাকে দিতে হয়নি। রঞ্জিত নিজেই এ-পারে এসে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেল। অথবা কখনও কখনও মনে হয় বিধবা মালতীর এ-সব ভালো নয়, স্বামীর শখ, স্বামীর শখ হলেই মানুষটা আর তার বাঁচে না। তখন মনে হয় সে রঞ্জিতকে নিজেই মেরে ফেলেছে। ভাগ্যে যার স্বামী বাঁচেনা তার কেন আবার স্বামী সোহাগিনী হওয়া! আর যার কথা মনে হয় সে সামু। সামুরে, তর কথাই ঠিক। দেশ তুই পাকিস্তান কইরা ছাড়লি। এসব মনে হলেই মালতীর কষ্টটা বাড়ে। সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তার একা থাকতে ভয় করে। সে নিশীথকে ধরে এনেছে। এখন থেকে নিশীথ তার বাপও বটে। নিশীথ বড় দুর্বল মানুষ। অলস প্রকৃতির। ঠিক গাভিন ছাগলটার মতো। ছাগলটা আজকালই বাচ্চা দেবে। সুতরাং ওর তাড়াতাড়ি চাল নিয়ে ট্রেনে উঠে বাড়ি ফেরা দরকার। সে ডাকল, অ বৌ।

হারুর বৌ জিলিপি কিনে এনেছিল হাট থেকে। সে বাড়িটার ভাঙা সিঁড়িতে বসে জিলিপি খাচ্ছিল। একটা জিলিপি উঠে এসে মালতীর হাতে দিল।

মালতী জিলিপি খেতে খেতে বলল, আমার মনটা ভাল না বৌ।

—ক্যান ভাল না। সেই ভদ্দরলোকের কথা মনে পড়ছে? মালতী থুথু ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সিংহের দুই চোখ যেন। শুধু খেলা দেখানো বাকি। চোখে মালতীর নীল রঙের উজ্জ্বল এক আভা। তীক্ষ্ণ রোদের তাপে চোখের মণিদুটো বড় হিংস্র দেখাচ্ছিল।

—অ মালতী, তুই এমন করতাছস ক্যান?

—আমার কী ইচ্ছা হইছিল বৌ জানস?

—কী কইরা জানমু?

—ইসছা হইছিল তার গলাটা কামড়ে ধরি।

হারুর বৌ কুসুম বুঝতে পারল রাতে সেই বাবুর অন্ধকারে চুরি করে ইতরামো করার বাসনা মালতীকে এখনও কষ্ট দিচ্ছে। অসম্মান ভেবে মালত। সারা পথ আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি। ওর চোখ দেখলে এখন মনে হয় হিংস্র এক প্রতিশোধের আশায় সে আছে।

কুসুম বলল, গরিবের আবার মানসম্মান! গরিবের আবার ছোট-বড়!

কুসুম গম্ভীর গলায় কথাটা বলল। কুসুম গম্ভীর গলায় কথা বললে বাবুমানুষের মতো কথা বলে। এবং এই কথার দ্বারা সে নিজের সম্মানের ওপর নির্ভরশীল থাকতে চায়—অসম্মান সেও সহ্য করতে পারছে না—কিন্তু দু'বেলা অনাহার আর সহ্য হচ্ছিল না। কুসুম গর্ভবতী, কুসুম চাল চোরাচালানের জন্য বের হয়ে পড়েছে।

কুসুম, গর্ভবতী কুসুম পা ছড়িয়ে বসল। ওর ছোট্ট ব্যাগ থেকে পান সুপাবি বের করে একটু পান, চুন এবং সাদাপাতা খুব আয়াস অথবা আরামের মতো মুখে ফেলে দিতে থাকল। এতটুকু সুখ—চারদিকে যখন রোদে খাঁখাঁ করছিল, চারদিকে যখন অভাব-অনটন—তখন কুসুমেব এইটুকু সুখ। মালতী জিলিপিটা আলগা করে মুখে দিয়েছিল। সে কুসুমের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এক টুকরো সুপারি দ্যা বৌ। তারপর ওরা পরস্পর মুখ দেখে এক সময় চুপ করে গেল।

বিকেলের দিকে সেই মহাজন মানুষটি এসে সকলকে বড় আদর করে গদিতে নিয়ে গেল। নিতাইর বাপ দলটার মোল্লা। সুতরাং নিতাইর বাপ আগে আগে হাঁটছিল। মাছ এবং আনাজের হাট পার হয়ে সরু এক গলি। আশেপাশে গেবস্থ মানুষের সংসার। ব্যবসা আছে

বলে বোঝা যায় না। মালতী, কুসুম এক এক করে চাল নিয়ে সেই আমলকী গাছটার নিচে এসে বসল।

মালতীর তিনটি থলে। কাঁখের থলেটা বড় এবং ডানহাতের থলেটা মাঝারি তা প্রায় ত্রিশ সেব হবে তিন থলে মিলে। কুসুম এত চাল বইতে পারবে না। সে কিছু কম নিয়েছে। শরীর ওর আর দিচ্ছে না। পাগুলি হাতগুলি ক্রমশ শীর্ণ হয়ে আসছে। মালতী খলের ভিতর হাত রাখল—চালের উত্তাপ আছে—সে চালের ভিতর থেকে দুটো একটা আবর্জনা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল যেন এই চাল কত ভালোবাসার জিনিস, এই অন্ন বড় দামী এবং সোনার মতো ভালোবাসা এই অনের জন্য সে ভিতরে-ভিতরে পুষে রেখেছে। অন্যান্য সকলে চাল আগলে বসে আছে। এখন আর এই চাল ফেলে কেউ কোথাও যাবে না। সকলে ভালো করে বেঁধে নিচ্ছিল যেন ওরা সকলে জেনে ফেলেছে ওদের ট্রেনে চড়ে যাবার সময় নানা প্রকারে ব হুজ্জতি হবে—যেন এদের সেই নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে দিলে গলায় সোনার হার পবা এক বাবু পান চিবুতে চিবুতে এসে সকলের থলে গুনে গুনে চাল ওজন করেন, সেব প্রতি দু ছটাক চাল মেপে দিয়ে তিনি চলে যাবেন। নিতাইর বাপ পিছনে চাল চোরা চালানের হকার হয়ে লাঠি ঘুরাবে। সে বাবুর বরকন্দাজের মতো এই চালের পিছনে কত নাচবে-কাঁদবে।

সুতরাং নিতাইর বাপ দলটার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ক'টা থলে গুনল। ওর মুখে বড় একটা আব, চোয়াল বসানো, দাড়ি কামানো নয় বলে মুখ অমসৃণ—সে এ দলের মোল্লা, তার কত দায়িত্ব—সে প্রায় সারাক্ষণ স্টেশন এবং এই আমলকী গাছ, পুরানো জীর্ণ বাড়ির সিঁড়িতে ছোটাছুটি করেছে। লালগোলা থেকে যদি চক্রবর্তীবাবু না আসেন তবে মুশকিল—যার যার দল নিয়ে যার যার খেলা। অপরের হাতে পড়ে গেলেই—পুলিশ, থানা এবং কিছু অবিবেচক মানুষের মতো মাঠে-ঘাটে সংগ্রাম —সুতরাং নিতাইর বাপ সকলকে প্রথমে বলল, হ্যা গ মা-মাসীরা—বাড়তি পয়সা কত রাখলে?

মালতী বলল, আমার হাতে কিন্তু নাই নিতাইর বাপ।

—নাই ত বাবুদের পূজা দিমু কি দিয়া?

—আমারে আগে কইতে হয়। সব টাকায় চাল কিনা ফেলছি।

—ভাল করছ। নিতাইর বাপের ও একটা কপিলা গাই আছে।

—তোমার কপিলা গাই আছে আমি কইছি। মাঙ্গতা রুখে উঠল।

নিতাইর বাপ মদন মালতীর দিকে এবার ভয়ে তাকাতে পাবল না। ট্রেনেব সেই মালতী পথ ঘাট চিনে সেয়ানা হয়ে গেছে। মালতীকে বাবুযাত্রীর সঙ্গে বচসা করার সময় মদন বড় বেশি সতর্ক করে দিয়েছিল। এখন সতর্ক করতে গিয়ে ফের অনর্থ, কারণ মালতীর বড়-বড় চোখ— যেন সিংহের খেলা দেখানো বাকি, এবারে সে ট্রেনের ভিতর

অথবা অন্য কোনও মাঠে সিংহের খেলা দেখাবে। মালতী দড়ি দিয়ে খালের মুখ শক্ত করে বাঁধছিল। এর শক্ত শরীর এবং পিঠের নিচু অংশটা দেখা যাচ্ছে। সাদা ধানের ভেতরে ছিট কাপড়ের সেমিজ। মালতী সাদা থানের ভিতর ঘাড় গলা মসৃণ রেখেছে এখনও। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল বলে আমলকীর ছায়া হেলে পড়েছে। কিছু কিছু মানুষ হাট-ফেরত গাঁয়ে ফিরছে। চাষা-বৌ মুরগি বগলে ফিরছে। ঝুড়িতে আণ্ডা নিয়ে ফিরছে পাইকার। মালতী গলা তুলে এসব দেখল। তারপর উঠে গিয়ে বলল হারুণ বৌকে— আমারে একটা টাকা দে বৌ। নিতাইর বাপের (গোলামের) কথা শুনলে গা জুইলা যায়।

কুসুম কাপড়ের খুট থেকে টাকা খুলে দিল মালতীকে। তখন অন্য এক বৌ পারেন বাচসা করছিল

আর তখন হাটের মাঠে বড় বড় হ্যাজাক জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে।

মালতীব ক্ষুধা পেট জ্বলছিল। সুতরাং মুখে গন্ধ। দুর্গন্ধের মতো। সুতরাং মুখে বারবার থুথু ফেলছে। দশটার ট্রেনে উঠলে পৌঁছাতে ভোর হয়ে যাবে। মদন আর একবার এসে সকলকে বলল তোমরা মা মাসীরা কিছু খেয়ে নাও। চিড়া-মুড়ি যা হোক কিছু। কেন আসতে লেট হবে।

মালতী কিছু ছোলার ছাত এনেছিল সঙ্গে। সে বাটিতে জল দিয়ে ছাতুটা ভিজিয়ে খেল। বাটিটার গায়ে নিশীথের নাম। ছাতু খাবার সময় নিশীথের মুখ মনে পড়ছিল এবং ছাগলের মুখ পাশাপাশি। বাচ্চা ছাগলটা ঘরে এনে রেখেছে কিনা, পাতানো বাপ নিশীথ বড় বুড়ো মানুষ, ছাগলটা বাচ্চা হবার সময় চিৎকার করবে —মালতী একটা ছোট্ট ছাতুর দলা কুসুমকে দেবার সময় বাপের মুখ মনে করতে পাবল। রঞ্জিতের মুখ মনে পড়ছে।

মদন ছুটে ছুটে আসছিল। সাতটা বাজে এখন। তোমরা মা-মাসীরা সকলে চলে এস চক্রবতীরার সাটার গাড়িতে চলে আসছেন। বড়বাবু তাড়াতাড়ি করতে বলছেন তোমাদের।

স্টেশনের বড় বাবু বেলিঙের ধারে এসে উকি দিয়ে দেখলেন দলটা নিয়ে মদন বেললাইনের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। কুসুম সকলের পিছনে যাচ্ছিল। ওরা কাপড় দিয়ে কাঁধের থলেগুলি ঢেকে রেখেছে। ওরা সকলে ভয়ঙ্কর লম্বা কাপড় এবং সেমিজ পরে সকল চাল প্রায় পোশাকের ভিতর আড়াল দেবার চেষ্টা করছিল। কুসুম ছুটতে পারছিল না। সকলে প্ল্যাটফরমে উঠে গেছে। কুসুমের জন্য মালতীও পিছনে পড়ে থাকল। এবং মাল তাঁর শক্ত শরীর, সে ইচ্ছা কবলে কুসুমকে বুকে নিয়ে স্টেশনে উঠে যেতে পারে। মালতী নিজের বাঁ হাতের ছোট্ট থলেটা কুসুমকে দিয়ে, ওর বড় থলেটা ডান কাঁধে নিয়ে ছুটতে থাকল।—তুই আয় বৌ। আস্তে আস্তে আয়। আমি উইঠা যাই।

কুসুম একটু হাল্কা হওয়ায় প্রায় মালতীর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে পারছিল। হাতে-পায়ে শক্তি কমে যাচ্ছে। ওর ছুটতে গিয়ে হাত-পা কাঁপছিল। তবু কোনওরকমে সে টেনে টেনে পা দুটোকে প্ল্যাটফরমের উপরে নিয়ে তুলল। ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এই ছোটাছুটির

জন্য হাঁফ ধরছিল বুকে এবং পেটের ভিতর খিল ধরত মাঝে মাঝে। কুসুন আর প্রায় নড়তে পারছিল না। সে মালতীর আশায়, মালতী তাকে তুলে নেবে এই আশায় এবং ট্রেন এলে পুলিশেরা মহব্বতের গান গেয়ে হুইসল বাজাবে, মালতী কুসুমকে তুলে নেবে-- মালতী যথার্থই কুসুমের বোঁচকাকুঁচকি সব ভুলে দিল কামবার ভিতরে।

আর ভিতরে মানুষ জনে ঠাসাঠাসি। ও বা একা নয়, প্রায় শয়ে শয়ে মানুষ। পিলপিল করে হাটের ভিতর থেকে সব উঠে আসছে। কোন এক জাদুমন্ত্রের মতো যেন— সকলে বুঝে গেছে এই ট্রেন ওদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে — কেবল এক চক্রবর্তী, রাজা মানুষ, তাদের নিয়ে যাবেন--- তাদের কাছে তিনি দেবতার মতো। বড়বাবু ছোটাছুটি করছিলেন। ট্রেনের যাত্রীরা দেখল পিলপিল করে ছোট-বড় মানুষ বোঁচকাবুচকি নিয়ে বান্ধের নিচে ঢুকে যাচ্ছে। কামরার ভিতরটা অন্ধকার।

আলো জ্বালা হচ্ছে না। ভিতরটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার লাগছিল মালতীর। সে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে আন্দাজে কুসুমকে ঠেলে দিল বাঙ্কের নিচে। ওর বোঁচকাবুঁচকি কুসুমের মাথার কাছে ঠেলে দিল, তারপর নিজে মেঝের উপর পা মুড়ে শুয়ে পড়ল। বুকের কাছে সব বোঁচকাকুঁচকিসন্তানের মতো লেপ্টে থাকল। যাত্রীরা হৈচৈ করছিল। ওদের পায়ের তলায় জলজ্যান্ত এক যুবতী মেয়ে এবং আরও সব কত বুভুক্ষু মানুষের দল ঠাসাঠাসি করে শুয়ে বসে আছে। দরজা পর্যন্ত দলটা এমনভাবে শুয়ে-বসে ছিল অন্ধকারের ভিতর, মানুষের এত ঠাসাঠাসি যে, যাত্রীরা দরজা পর্যন্ত এসে ভয়ে ভিতরে ঢুকতে সাহস করল না। ভিড়ের ভিতর দেখল অন্ধকারে শুধু মানুষের পিঁজরাপোল। ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে ভিতরে এবং হা-অন্নের জন্য অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছে—সুতরাং ভিতরটা মানুষের নরক যেন এবং ওরা সব অন্নের মতো পরম বস্তু অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে— মালতী দুর্গন্ধের ভিতর পড়ে থেকে নিজের চাল এবং কুসুমের চাল আগলাচ্ছিল। এ-পাশ ও পাশ হওয়া যাচ্ছে না, হাত পা মেলা যাচ্ছে না—সর্বত্র এই অপহরণের দৃশ্য, পা পিঠ অথবা পাছা কিছুই সরানো যাচ্ছে না। সরলেই কারও না কারও গায়ে লেগে যাচ্ছে। মালতী তবু ঠেলেঠুলে কুসুমের পা মেলার জন্য একটু জায়গা করে দেবার সময় মনে হল বাঙ্কের ওপর কিছু যাত্রী শুয়ে-বসে আছে। নিচে মালতীর সিংহের মতো চোখ, শুধু খেলা দেখানো বাকি—মালতীর চোখ জ্বলজ্বল করছিল -- সে তার পাছা সাপের মতো ঘুরিয়ে দিল সহসা। মনে হল বাবুটি, সেই বাবুটি, ওর পাছার কাছে বসে এই অপহরণের দৃশ্য দেখে রসিকতা করতে চাইছেন। সেই বাবুটি, যে আসার পথে হারামজাদি বলে গাল দিয়েছিলেন। বাবুটি ফেরার পথে এখানে কেন, বাবুটিকে আসার পথে কোন এক স্টেশনে নেমে যেতে দেখেছিল যেন। ফের সেই বাবু মানুষটি ঠিক বাঙ্কের ওপর পদ্মাসন করে নিমীলিত চোখে বসে আছেন। মালতী বুঝল কপালে আজ বড় দুঃখ আছে। ওর উপায় থাকল না একটু সরে বসতে, শুয়ে পড়তে, অথবা সরে অন্য কোথাও স্থান করে নিতে। একবার এই আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হলে রক্ষা নেই—তাকে একা পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং সে কুসুমেব পিঠে হাত রাখল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনের চাকায় এখন কারা যেন দুঃখের গান গাইছে। এই গান শুনতে শুনতে বোধ হয় কুসুম ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। এক পুকুর জল, বড় বড় সরপুঁটি জলের ভিতর খেলা করছে, শাপলা শালুকের জমি—বর্ষার দিনে ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ এবং তালের মালপোয়া অথবা বর্ষার জন্য মানুষের এক পরিণত ভালোবাসা, মালতী ওর দেশের ছবি ট্রেনের চাকায় দেখতে পাচ্ছিল বোধ হয়। সেই ভালোবাসার ছবি আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মালতী অনেক চেষ্টা করেও কুসুমকে জাগাতে পারল না। কুসুম ভোঁসভোস করে ঘুমুচ্ছে।

ট্রেন চলছিল, পাশাপাশি কেউ কোনও শব্দ করছে না। মাঝে মাঝে স্টেশনে ট্রেন থামছিল। কিছু হকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর ক্রমশ ট্রেন এবং স্টেশন কেমন নিঝুম হয়ে আসতে থাকল। শুধু মাঝে মাঝে দলের মোল্লাদের হাঁক শোনা যাচ্ছিল —মা-মাসীরা বড় সাবধানে— কোন হল্লা করবেন না, যাত্রীদের কোন অসুবিধা ঘটাবেন না। যাত্রীদের পায়ের নিচে পড়ে থাকবেন।

ওদের সুখসুবিধা দেখবেন। এবং এই বাবুর জন্য মালতীর ভয়, সুখ-সুবিধা বাবুর অন্য রকমের। এত অন্ধকার যখন, এবং মানুষে মানুষে এই ঠেসাঠেসি যখন, কোথায় কার হাত পড়ছে, পা পড়ছে অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছে না যখন-তখন বাবুর পোয়াবারো। এইসব ভেবে মালতী ক্রমশ গুটিয়ে আসছিল। এবং ছাগলটার কথা মনে পড়ছে, ছাগলটার হয়তো চারটে বাচ্চা হবে। বাপ নিশীথ ছাগলটা বেচে দেবার মতলবে ছিল। বাপের লালসা বড় বেশি। কেননা সারাদিন বড় খাব খাব করে। এই বয়েস — বয়েস আর বাড়ছে না যেন নিশীথের— মালতীর ফেরার জন্য সে নিশ্চয়ই এখন দাওয়ায় বসে তামাক টানছে।

রাত বাড়ছে, মালতী ফিরছে না—নিশীথ হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এসে দেখল স্টেশনে পুলিশ; আর্মড পুলিশ সব। এ লাইনে কিছুদিন থেকে চাল চোরাচালান বড় বেশি হচ্ছে।

কেউ পুলিশকে ভয় পাচ্ছে না। ওরা ট্রেনে চাল এনে শহরে-গঞ্জে বেশি দরে বিক্রি করছে। দুপুরে স্টেশন পার হলে পুলিশের সামনেই চেন টেনে বুভুক্ষু নরনারী চাল মাথায় করে ছোটে। ভাগে বনিবনা না হলে এমন হয়। জনতা পুলিশে সংগ্রাম। এখানে পুলিশের মাথা ভেঙে দিয়েছিল মানুষেরা। পুলিশের তরফে এবার কিন্তু খুব কড়াকড়ি। নিশীথ শুনল আজ খবর আছে—পরের ট্রেনটিতে প্রচুর চাল আসছে, চোরাই চাল। পুলিশেরা রেডি, ট্রেন আটকে এইসব চাল উদ্ধার করবে ওরা। নিশীথ প্রমাদ গুণল।

কামরার ভিতর মালতীও প্রমাদ গুণল। বাবু বড় বেশি ছটফট করছেন। বড় বেশি হাই তুলছেন। এবং হাত পা এদিক ওদিক ছোঁড়ার বড্ড বেশি বদঅভ্যাস। সবই অন্যমনস্কতার জন্যে হচ্ছে এমন ভাব। ট্রেন চলছিল। ভিতবে প্রচণ্ড গরম। জানালা খোলা বলে সামান্য হাওয়া ভিতরে ঢুকতে পারছে। আর এই সামান্য হাওয়ায় বাবু মানুষটা কিংবা সামান্য যাত্রী যারা বাঙ্কে শুয়ে বসে হাত পা ছড়িয়ে নিশীথে নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে অথবা যারা

নিজের রসদ আগলাবার জন্য ঘুমোতে পারছে না—এই সামান্য হাওয়া তারাই শুষে নিচ্ছিল। ঘামে মালতীর সেমিজ এবং কাপড় ভিজে যাচ্ছে। হাত পা একটু খুলে ও-পাশ হতে পারলে শরীর সামান্য আসান পেত—কিন্তু মালতীর কোনও উপায় নেই—শুধু অন্ধকার সামনে, পিছনে মাঠ ফেলে ট্রেন দ্রুত ছুটছে। রাত এখন গভীর হয়ে আসছে এবং মাঝে মাঝে সেই মাঠের ভিতর দ্রুত ট্রেনটা ভয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল যেন। আর ঠিক তখনই মনে হল ঘাড়ে কে যেন মৃদু সুড়সুড়ি দিচ্ছে মালতীর।

প্রথমে মনে হল একটা নেংটি ইঁদুর ঘাড়ের নিচ দিয়ে সেমিজের ভেতর ঢুকে গেল। মালতী চুপ করে অন্ধকারে ঘাড়ে হাত রেখে বুঝল, নেংটি ইঁদুরটা ভীষণ চালাক। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা রাখে। সে ঘাড় গলাতে নেংটি ইঁদুরটাকে খুঁজে পেল না। শুধু বলল, মরণ!

মালতীর ঠিক ওপরে বাবু মানুষটা বাঙ্কে বসে আছেন। একজন লম্বা মতন ক্ষীণকায় মানুষ, মনে হচ্ছে পিলের রুগী, বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। পাশের বাঙ্কে বৃদ্ধ মতন মানুষ। এবং প্রায় বোবার শামিল। ছোট কামরা বলে আর যাত্রী উঠছে না। শুধু নিচে অন্ধকারে ঠাসাঠাসি করে বুভুক্ষু মানুষের নিঃশ্বাস পড়ছে। ওরা সকলে নিতাইর বাপ মদনের মতো এক মানুষের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুতরাং অন্ধকারের ভিতর ইজ্জতের ব্যাপার বলে কোনও বস্তু ছিল না। মালতী গত রাতের মতো চিৎকার করতে পারত, ফোঁস করতে পারত, অথবা চোখে সিংহের খেলা দেখানো বাকি—সে সিংহের মতো গর্জন করে উঠতে পারত। সে কিছুই না করে দম বন্ধ করে শুয়ে থাকল। ট্রেন মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। স্টেশনে এলে একটু আলো জ্বলবে—ওর ইচ্ছা তখন খুঁজে পেতে সেই নেংটি ইঁদুরকে বের করা অথবা মানুষ বা বাবুমানুষ,—মানুষটা রহস্যজনকভাবে ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকছেন। গত রাতে এই বাবু মানুষটাই ওকে হারামজাদি বলে গাল দিয়েছিলেন—আর যাত্রী সেজে খুব সাফ-সুতরো যুবকের মতো চলাফেরা করেছেন। মালতী এবার সাহসের সঙ্গে অন্ধকারেই পরিহাস করল।

—কী! কী বললে! বাবুমানুষটির গলার স্বরে অভিনয় ফুটে উঠল।

—বাবু, আমি মালতী। আমি নিচে শুয়ে আছি বাবু।

—তুমি কোন মালতী বাছা? কাল রাতে যাকে যেতে দেখেছি ট্রেনে করে?

—হ্যাঁ বাবু কাল রাতে যেতে দেখেছেন। আজ রাতে ফিরছি।

—সঙ্গে আর কে আছে?

—হারুর বৌ আছে, নিতাইর বাপ আছে।

—মাঠ পার হতে পারবা?

—ভয় কি বাবু?

হারুর বৌ জেগে গিয়েছিল ওদের কথায়।—আমরা কোনখানে মালতী?

—সামনে ধুবুলিয়া স্টেশন। তুই ঘুমো।

—হ্যাঁ ল তুই কার লগে কথা কস?

—বাবুর লগে।

—বাবুর চোখে ঘুম আসে না?

—বলছে, আপনার চোখে ঘুম আসে না? আপনি রাতে ঘুমোবেন না?

বাবু মানুষ বলেন, অদৃষ্ট, ঘুম আসে না রাতে। অদৃষ্ট।

মালতী বলল, ট্রেনে ট্রেনে কি করেন বাবু:

বাবুটি এবার হাই তুলে বলল, তোমার দলে কতজন? আঠারজন বুঝি?

—বাবু সব গুনে-গেথে রেখেছেন দেখছি।

বাবুটি এবার বিজ্ঞের মতো অন্ধকারেই হাসলেন।

কুসুম কুঁকড়ে ছিল নিচে। ধুলোবালি কাপড়ে সেমিজে কাদার মতো লেগে আছে—ঘামে নিচটা জবজব করছিল। বাবুর বিজ্ঞের মতো হাসি উপরে এবং বাঙ্কের নিচে কুসুম-ওর পিরীতের কথা মনে পড়ছিল। কুঁকড়ে থাকার জন্য এবং মালতী লেপটে থাকা জন্য কুসুম নড়তে পারছিল না। সে কোনওরকমে হাতটা ডানদিকে এনে মালতীকে একটা চিমটি কাটল।

—বৌ, ভাল হইব না।

—হ্যা ল, বাবুব লগে পিরীতের কথা ক্যান?

মালতী পায়ের নিচ পর্যন্ত বাঁ হাতে কাপড় টেনে ফিসফিস করে বলল, মানুষটারে ভাল মনে হইতেছে না। পুলিশের লোক। চুপ কইরা থাক।

কুসুম যথার্থই ভয় পেল। স্টেশনে পুলিশ অথবা হোমগার্ডের লোক আছে। সেখানে নিতাইর বাপ আছে, বড়বাবু আছেন স্টেশনের, চক্রবর্তীবাবু আছেন। কিন্তু যে মানুষটা গা ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে—তাকে বড় ভয় কুসুমের। সে এবার বলল, বাবুরে কইয়া দ্যাখ না, বিড়ি খায় কিনা?

মালতী বলল, তুই বলে দ্যাখ।

কুসুম বাঙ্কের নিচ থেকে বলল, নিতাইর বাপেরে ডাকুম নাকি?

মালতী বলল, ডাকলে অনর্থ বাড়বে বৌ। ওরা এত ফিসফিস করে কথা বলছিল যে বাবুমানুষটি কান খাড়া করেও বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারছেন না। তিনি তবু বিচক্ষণ পুরুষের মতো বসে থাকলেন। তিনি কাশলেন, হাত-পা নাড়লেন এবং মুখ জানালায় বের করে স্টেশনে পৌঁছাতে কত দেখি দেখলেন। তাঁকে দেখে এসময় মনে হচ্ছিল তিনি কোথাও কোনও খরব পৌঁছে দিতে চান।

বাবু স্টেশনে নেমে একটা কার্ড দেখাল স্টেশনের বড়বাবুকে, আপনাদের ফোনটা দেবেন বলে তিনি তাঁর কার্ড বের করে ধরলেন।

—হ্যালো? কে? স্যর আছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। হিসাব করে দেখলাম প্রায় চারশতের মত লোক যাচ্ছে চাল নিয়ে।

—তা'হলে বড় দল একটা আনতে হয়! আমার সঙ্গে মাত্র দশজন আছে।

—ওতে হবে না স্যর। মাঠের ভেতর দিয়ে সব তবে নেমে যাবে পিঁপড়ের মতো।

—ত হলে বড় একটা এনকাউন্টার হবে বলতে চাও?

মনে তো হচ্ছে। বলে মানুষটা ফের গা ঢাকা দিয়ে এসে বাঙ্কে বসে পড়লেন। আসার আগে বড়বাবুকে বলে এনে খুব গোপন রাখতে হবে স্যর। তা না হলে আপনার আমার দু'জনের মুশকিল।

আর মদন এবং সব মোল্লারা হেকে হেকে যাচ্ছিল তখন—মা-মাসীরা বড় দুর্যোগ। মা-মাসীরা আমরা স্টেশন পর্যন্ত যাবনা। তার আগে ভাঙা পোলের কাছে—সেই বড় পুরানো বাড়িটার কাছে চেন টেনে নেমে পড়ব। আপনারা মা মাসীরা ভয় পাবেন না। আমর আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য চাল নিয়ে যাচ্ছি।

মা মাসীরা কোন চুরি করছি না। জানালায় জানালায় মুখ বাড়িয়ে দলের মোল্লা হেকে গেল আমরা যা করছি সন্তান সন্ততিগণের প্রতিপালনের জন্য করছি।

আমরা চুরি করছি না, চুরি এটাকে বলে না।

কুসুম বলল, নিতাইর বাপ কী কইল, মালতী?

—কইল, আমরা আগে নাইমা যামু। চেন টাইনা গাড়ি থামাইয়া দিমু।

কুসুমকে চিন্তিত দেখাল! অন্যান্যদিন ওরা স্টেশনে নেমে কাঁচা পথ ধরে ছোটার অভিনয় করে। অভিনয় রসের। স্টেশনের মাস্টারবাবু তখন হাসেন। না ছুটলে বড় গালমন্দ করেন। একেবারে চোখের উপর চুরি। চুরিতে আরাম হারাম। তোরা ছুটলে অন্তত আমরা থেমে থাকতে পারি। আজ গাড়ি তার আগেই থেমে যাবে। চক্রবর্তীবাবুর

হাতে আর কোন কৌশল নেই কুসুম ভাবল, আর কোন কৌশল নেই যার সাহায্যে তিনি ট্রেনটাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারেন। সেই ভাঙা পোলের পাশে থাকলে অনেকদূর তাকে এই বোঁচকা কুঁচকি টেনে নিয়ে যেতে হবে। না গেলে অনাহার। শিশু সন্তানেরা বাড়িময় হাঁসের বাচ্চার মতো কেবল প্যাক প্যাক করছে। জননী ফিরলে হাঁসের বাচ্চাগুলি শান্ত হবে। কুসুমের এতটা পথ হাঁটার কথা ভেবে চোখে জল আসতে চাইল। কারণ পেটের ভিতর নতুন বাচ্চাটাও প্যাঁক প্যাঁক করে কুসুমকে মাঝে মাঝে জ্বালাতন করছে। সুতরাং সে পেটের উপর হাত রেখে বার বার বাচ্চাটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। অনাহার কুসুমের দিনমান—সুতরাং ভিতরের বাচ্চা কেবল খাই খাই করছে। কুসুম রাগে দুঃখে স্বামীকে মনে মনে গাল পাড়তে থাকল—মানুষটা মরে না ক্যান। মরলে হাড় জুড়ায়। দেশ ছাইড়া মানুষটার মান ইজ্জত সব গেছে।

মালতী বলল, কার কথা কস?

—আর কার কথা! বলে কুসুম বুঝতে পারে না মনের ভিতর কথা রাখার অভ্যাস তার কবে শেষ হয়ে গেছে।

মালতী দেখল বাবু সামনের স্টেশনেও নেমে গেলেন।

—হ্যালো, স্যর আছেন? তিনি ফোন তুলে অনুসন্ধানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি।

—ওরা চেন টানবে বলছে।

—চেন টানবে? ওরা ভাঙা পুলের কাছে চেন টানবে বলছে

—ওখানে শালগাছের বড় বন আছে না?

সঙ্গে সঙ্গে জানালায় মোল্লাদের সকলের মুখ দেখা গেল। আপনারা চেন টানার সঙ্গে সঙ্গে মা-মাসীরা বের হয়ে পড়বেন। আপনারা আর শুয়ে থাকবেন না। আমাদের সামনেই নামতে হবে। বোঁচকাবুঁচকি সব কাঁধে হাতে নিয়ে রেডি থাকেন।

বাবুটি মালতীর ঘাড়ে শেষবারের মতো নেংটি ইঁদুরগুলি অন্ধকারে ছেড়ে দিতে চাইলেন। মালতী অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বার বার সেই ইঁদুরটাকে মালতী ঘাড় গলা থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শেষবার সে কিছুতেই পারছে না। বাবুর হাতটা ক্রমশ শক্ত হয়ে মালতীর শরীরের উপর থাবা পেতে বসছে। মালতীর চোখে সিংহের খেলা দেখানো বাকি-সে শক্ত হাতে এবার ছুড়ে ফেলে দিতেই বাবুটি বললেন, কোথায় নামবে বাছারা! ভাঙা পোলের কাছে নামবে?

কুসুম জানতো না অন্ধকারে বাবুমানুষটি মালতীর মতো যুবতীর সঙ্গে রঙ্গ তামাশা করছেন। মালতী, অসহিষ্ণু মালতী মোল্লাদের ভয়ে এই যাত্রী মানুষটাকে কিছু বলতে পারছে না, সে রাগে দুঃখে এবং অসম্মানের ভয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বুভুক্ষু মানুষের এখন নেমে যাবার তাড়া। তারা উঠে অন্ধকারেই নিজের নিজের বোঁচকা ঠিক করে নিচ্ছে। এবং অন্ধকারে ট্রেনটি ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেলে মানুষটি বললেন, কোথায় নামবে বাছারা। পুলিশের বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? বন্দুকের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে আসছে না।

কুসুম হাউমাউ করে কেঁদে দিল, আমাদের কি হবে বাবু।

বাবুটি বিজ্ঞের মতো হাসলেন—যেখানে আছ সেখানে থাকো। এক পা নড়বে না।

মালতী বলল, ওদের যেতে দেন বাবু। আপনি পুলিশের লোক, আমাদের মা-বাপ।

বাবুটি বললেন, কেউ নামবে না বাছারা। বাবুটি এবার সাধারণ পোশাক খুলে ব্যাগের ভিতর থেকে হুইসিল বাজালেন।

তখন নিতাইর বাপ চিৎকার করে জানালায় জানালায় ছুটে যাচ্ছিল।

—তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না। মাঠের ভিতর নেমে যাও। অন্ধকারে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাও। পুলিশ ট্রেনটাকে ঘিরে ফেলেছে।

মালতী বলল, বৌ, তুই নেমে যা। আপনারা যারা আছেন নেমে যান। বাবুটি বললেন, না, কেউ নামবে না।

—তোমরা নেমে যাও মা-মাসীরা বলে সে বাবুটির কাঁধে মাথা রাখল অন্ধকারে

পুলিশের দলটা জানালা দিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ছে। অন্য দরজা দিয়ে কুসুম নেমে গেল। অন্ধকারের ভিতর মালতী টের করতে পারছে। মালতী এবার নিজের বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর নেমে যেতে চাইলে পেছন থেকে বাবুটি ধরে ফেলল।

মালতী চাল ফেলে অন্ধকারে ছুটতে চাইলে বাবুটি দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু অন্য দরজায় পুলিশ—বাবুটি ভালো মানুষের মতো দরজা খুলে বললেন, দেখ এখানে কিছু চাল আছে। তুলে রাখ।

মালতী বোঁচকাকুঁচকি ফেলে ছুটছে। যেদিকে কুসুম চলে গেছে সেদিকে ছুটছে। বাবুটি মালতীকে অনুসরণ করছে।

সামনে মস্ত শালের জঙ্গল। চাঁদের আলোতে এই বন এবং সামনের প্রান্তর বড় রহস্যময় লাগছিল। মানুষের সোরগোল। কান্নাকাটি এবং চিৎকার শোনা যাচ্ছে। মাঝে

মাঝে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ট্রেনটা একটা বড় জন্তুর মতো একা পড়ে চিৎকার করছিল যেন। মালতী ছুটে ছুটে কুসুমের কাছে চলে গেছে। সে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়ছিল—দেখল এদিকটা ফাঁকা। সামনের মাঠে কিছু মানুষের সোরগোল পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে পুলিশের দলটা কিছু লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাবার জন্য সেখানেও একধরনের হায় হায় রব। পুরানো ভাঙা বাড়ি দেখা যাচ্ছে দূরে। সে যাবার পথে এক বৃদ্ধকে এই পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে পড়তে দেখেছিল। বোধ হয় সেই মানুষ এখনও সেখানে আছেন। দেয়ালের ফাকে তার ভাঙা হারিকেন জ্বলছিল– সেই আলো দেখে সে কুসুমকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

কুসুম চলতে চলতে বলল, পেটে কামড় দিছে!

মালতী ওর সব চাল বোঁচকা কাঁধে হাতে নিয়ে বলল, ইবারে হাট বৌ।

তখন পিছন থেকে বাবুটি বললেন, কোথায় যাবে বাছা! কুসুম হাউমাউ করে বাবুর পা জড়িয়ে ধরল।

এদিকটা ফাঁকা এবং নিঃসঙ্গ। সামান্য দূরে শালের জঙ্গল।

এবং প্রান্তরের ভিতর শুধু ইঞ্জিনের আলোটাকে দেখা যাচ্ছে। এই পোড়ো বাড়ির দিকে কেউ ছুটে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। শুধু সেই বাবুটি দাঁড়িয়ে আছেন। খুব বলিষ্ঠ মনে হচ্ছিল দেখতে, সেই উঁচু লম্বা মানুষ দারোগাবাবুর পায়ে কুসুম পড়ে পড়ে কাঁদছিল।

বাবুটি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, চাল নিয়ে কোথাও যেতে দেব না বাছা। আমরা পুলিশের লোক। আমরা আইন অমান্য করলে সরকারের চলবে কী করে?

মালতী বলল, যেতে দিন বাবু। আমিও আপনার পায়ে পড়ছি।

বাবুটি হাসলেন, আইন অমান্য করলে কারো রেহাই নেই। তুমি ত মালতী। যাবার পথে তুমি আমাকে কী বলে গালমন্দ করেছিলে ভুলে গেছ?

হায়, সিংহের খেলা দেখানোর চোখ মালতী ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। বলল, বাবু আমরা অবলা জীব, আমাদের কথা ধরতে নেই।

—অবলা জীবের মতন দেখতে মনে হচ্ছে না।

মালতী কুসুমকে এবার ঠেলা দিল, এই তুই করছিস কী বৌ, হাঁটতে পারছিস না। নে, বলে চালের বোঁচকা কুসুমের কাঁধে দিয়ে বাবুটিরে বলল—কত বড় মাঠ দ্যাখছেন বাবু!

—দেখছি।

—আমার সঙ্গে আসেন। দেখবেন কত লোক সেখানে চাল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। একটা বোঁচকার জন্য একশটা বোঁচকা চলে যাচ্ছে।

বাবুটি বললেন, কী করে জানলে?

—আপনাদের হুজুর পুলিশের লোক তো সব রাস্তা চেনে না

—তা ঠিক বলেছ।

মালতী কুসুমকে বলল, এই বৌ, তুই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারস না!

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি হাঁট বাছা।

—কী করে হাঁটবে বলুন। আট মাসের পোয়াতি। মালতী হাঁটতে থাকল।

—তা বটে। তুমি কোথায় চললে মালতী?

—মাঠে চলেছি বাবু। মালতী পথ দেখিয়ে চলল।

—আর কতদূর নিয়ে যাবে!

মালতী বুঝল কুসুম ভাঙা পুল পার হতে পারেনি। আরও কিছু সময় বাবুটিকে ধরে রাখতে হবে। নতুবা কুসুমের চাল যাবে—কুসুম ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। ওর বাচ্চাগুলি প্যাঁক প্যাঁক করবে।

বাবুটি যেন ওর চাতুরি ধরে ফেললেন, এবং বললেন, চালাকি করার জায়গা পাস না। দুম করে পাছার ওপর লাথি মেরে দিল।

মালতী রাগ করল না। সে ভাবল, আহা, ছাগলটা আমার চারটা বাচ্চা দেবে। সে বাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবং বলল, হুজুর একবার দ্যাখেন আমাকে।

বাবুটি এবার পিছন ফিরে মালতীকে দেখল। এত বড় প্রান্তর, ঠাণ্ডা বাতাস নেই প্রান্তরে। দূরে শালবনের ভিতর থেকে পোড়ো বাড়ির আলোটা শুধু এক চক্ষু খোদাই ষাঁড়ের মতো মনে হচ্ছে। কোথাও এতটুকু প্রাণের উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড় বড় ফাটল—দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয়নি—ধরণী ফেটে চিরে একাকার। জ্যোৎস্নারাতের জন্য ভয়। এই মাঠে বাবুটি মালতীর নগ্ন দেহ দেখে এতটুকু নড়তে পারলেন না। মালতী এই শস্যবিহীন মাঠে পাথরের মতো শুয়ে থেকে বলছে, হুজুরের ইসছা হয়?

—হয়!

সেই হবার মুখে মালতী জীবনের সব অত্যাচারের গ্লানি দূর করার জন্য শক্ত দাঁত দিয়ে বাবুটির কণ্ঠনালী কামড়ে ধরল। এবং এ সময় দেখা গেল দূরে, এক চক্ষু খোদাই

ষাঁড়ের মতো আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। আলোটি নিভে গেল। শালের বন এবং শস্যবিহীন এই প্রান্তরে সিংহের খেলা দেখানো বাকি এমন এক চোখের বেদনা টপটপ করে এই প্রথম অসতী হবার জন্য চোখের জল ফেলছিল। আর মনে হল দূরে সেই নিঃসঙ্গ প্রান্তর থেকে কারা যেন খালি ট্রেনটিকে ঠেলে ঠেলে স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রেন ঠেলে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য মালতী দলের মধ্যে ভিড়ে গেল। ওর দাঁতে মুখে রক্তের স্বাদ লেগে ছিল। ট্রেন ঠেলে নেবার সময় সেই নোনা রক্তের স্বাদ চেটে চেটে চুষে নিচ্ছিল মালতী!

এভাবে বাংলাদেশে কিছু সময় কেটে গেল। এভাবে বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুআরি চলে এল একদিন।

সারারাত জেগেছিল বলে সফিকুর এখন হাই তুলছে। বড় খাটুনি গেছে। সারারাত সে এবং তার কলেজের বন্ধুরা মিলে শহরময় পোস্টার মেরেছে। ঘরে মেয়েরা পোস্টার লিখে দিচ্ছে আর ওরা দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিয়ে এসেছে। কলেজের মেয়েদের উপর ছিল পোস্টার লেখার ভার। ওদের কাজ সেগুলি সকাল না হতে মেরে দিয়ে আসা। সকাল হলেই শহরের মানুষেরা দেখবে কারা যেন রাতারাতি এই শহরকে ২১ শে ফেব্রুআরির জন্য নানা রঙের ফেস্টুনে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। উৎসবের মতো এই শহর—প্রায় ঈদ মুবারক।

সফিকুর এইমাত্র ঘরে ফিরেছে। ফিরেই হাতমুখ ধুয়েছে। অন্য দিনের মতো সে সাইকেলটা বারান্দায় তুলে রাখেনি। কারণ সে আবার সাইকেলে দেখতে বের হবে রাতে রাতে ওরা কতদূর পর্যন্ত পোস্টার মেরে আসতে পেরেছে। সুতরাং সাইকেলটা বাইরে রেখে নিত্যদিনের মতো একটু টেবিলে গিয়ে বসা।

সকালে সে দুটো একটা কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসে। অথবা আজ যেন সারাটা দিন শুধু কবিতা আবৃত্তি আর গান। মাঠের ভাষা, বাংলা ভাষা। মানুষের ভাষা, বাংলা ভাষা। এমন দিনে সে কবিতা পড়বে না তো কবে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুল থেকে সে কবিতা পড়তে ভালোবাসে। ফতিমা এলে সে জীবনানন্দ আওড়ায়। ফতিমা কাছে থাকলে তার অন্য কবিতা আর ভালো লাগে না—সে তখন ফতিমার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে, তারপর ধীরে ধীরে কেমন এক অসীমে ডুবে যাবার মতো সে ফতিমার কাছে ঘন হয়, যেন চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে তার মুগ্ধ স্বভাবের ভিতরে ডুবে যাবে এবার, বলবে, কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড় ফসলের নাল ভাঙেছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ জানি নাকো, তবু যেন মরি এই মাঠঘাটের ভিতর...। এই দেশ, বাংলাদেশ, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—ফতিমার ছোট ছোট কালো বেথুন ফলের মতো চোখ দেখতে দেখতে সফিকুরের এমন মনে হলে বলে, আমি যাব তোমার দেশে। সোনালী বালির চরে সূর্য ওঠা দেখব। তরমুজের জমিতে

ঈশমনানার ছই দেখব। আর দেখব সেই অর্জুন গাছ। গাছে গাছে এখন কত না ডালপালা। তুমি আমি তার নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের বাংলাদেশ দেখব। ফতিমা এসব শুনলে কেমন চুপ হয়ে যায়। চোখমুখ বড় ভারি, গম্ভীর এবং কথা বলতে চায় না। তখন সফিকুর অকারণ হাসে। ফতিমাকে রাগিয়ে দিতে না পাবলে সে মজা পায় না। ফতিমা কথা না বললে সে জানে একটু খোঁচা দিলেই সে কথা বলবে। রাগাবার জন্য তখন সে বলবে, ওডা আবার একটা দ্যাশ নাহি! সফিকুর ফতিমার মতো বাঙাল টান রাখবে গলায়। তখন ফতিমা আরও ক্ষেপে যায়। রাগে অভিমানে মুখ ভার করে থাকে। চায়ের কাপ হাতে থাকলে সেটা ফেলে ভিতরে চলে যায়। মাঝে মাঝে সফিকুর এর কথা নিয়ে বড় বেশি ব্যঙ্গ করে। সে আর রাগ চাপতে পারে না। আর রাগের কথা বললে ওর মুখে তখন আরও বেশি বাঙাল কথা বের হয়ে আসে। সফিকুরের সঙ্গে ফতিমা কিছুতেই বাঙাল কথা বলতে চান না। যতটা সে পারে ধীরে ধীরে বইয়ের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। কঠিন কাঠ কাঠ গলা না করে খুব সুন্দর এক জলতরঙ্গ আওয়াজের মতো গলা করার চেষ্টা করে। এবং তখনই যত দুষ্টবুদ্ধি সফিকুরের। ওর ইচ্ছা কেবল ফতিমা ওর সঙ্গে বাঙাল কথা বলুক। এমন সুন্দর করে সে যে কী করে কথা বলে; প্রাণের ভিতর কেমন মায়া জাগানো ওর গলার স্বর। ফতিমাকে বাঙাল কথার ভিতর যতটা চেনা যায়, ওর মতো কথা বললে তেমন চেনা যায় না!

আঞ্জুর সঙ্গে সাধারণত সফিকুর ফতিমাদের বাড়ি যায়। ফতিমাকে যে সফিক ভাই অকারণ রাগিয়ে দিতে ভালোবাসে বাব বার বলেও সে তা ফতিমাকে বোঝাতে পারে না। তখন তার সোজাসুজি বাংলা কথা—আর কইয়েন না। ঠিক নিয়া যামু একবার আমাগ নদীর চরে। দ্যাখবেন দ্যাশ কারে কয় একখানা! আপনেগ দ্যাশ আবার দ্যাশ নাহি? দুধ-মাছ পাওযা যায় না। মানুষগুলাইন গঙ্গার পানি খাইয়া থাকে। ইলিশ মাছ মিলে না গণ্ডায় গণ্ডায়। আছে কিডা তবে?

—কেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছে। বিদ্যাসাগর, নজরুল আছে।

—ছাড়ান দ্যান। আমাগ নাই কিছু বুঝি মনে করেন চিত্তরঞ্জন দাশ, হকসাহেব, জীবনানন্দ অগ বাড়ি কলকাতায় আছিল, না!

—আমি বলেছি ওদের বাড়ি কলকাতায় ছিল?

—তবে মুর্শিদাবাদে

সফিকুর মুর্শিদাবাদের ছেলে। কথায় কথায় ফতিমা রেগে গেলে বলবে, মীরজাফরের দেশের মানুষ ভালো হবে কী করে? বিশ্বাসঘাতক। এ দেশের নুন খাবে এ দেশটাকে বলবে—এডা আবার দ্যাশ নাহি। কোনটা দেশ। এমন পলাশফুল শীতে কোথাও ফোটে? এমন শিমুলের বন আপনি নদীর পাড়ে পাড়ে আর কোথাও দেখেছেন? কী বলুন। চুপ করে কেন? তারপব চুপচাপ যেন বলার ইচ্ছা, বাংলাদেশের মানুষ আমার সোনাবাবুকে

পৃথিবীর আর কোথাও গেলে পাবেন? কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সোনাবাবুর কথা মনে হলেই গলার স্বর ভারি হয়ে আসে।

কত অকারণ এই ঝগড়া। অথচ এমন না হলে ভালো লাগে না সফিকুরের। এমন না হলে ফতিমাকে সে ঠিক চিনতে পারে না। অভিমানে তখন ফতিমা আর তার বাড়ি আসে না। সেও যায় না। কিন্তু কতদিন! ফতিমা নিজেই পারে না। আঞ্জুর সঙ্গে চলে আসে। যেন সে সফিকুরের কাছে আসেনি। সফিকুরের সঙ্গে কোনও দরকার নেই। যত দরকার তার মায়ের সঙ্গে। যত গল্প তার মায়ের সঙ্গে। যাবার সময় দেখাও করে যেত না বোধ হয়। কেবল আঞ্জু টেনে নিয়ে আসে বলে দেখা না করে পারে না। সফিকুর তখন এই অকপট মেয়ের কাছে ধরা দিতে ভালোবাসে। সে আর তাকে অবহেলা করে না।

রাস্তা পার হলেই ফতিমাদের সুন্দর কাঠের রেলিং দেওয়া বাড়ি। নানারকম ফুলের গাছ মাঠে। একটা দেবদারু গাছ আছে। তার নিচে ছোট্ট কাঠের চেয়ার। ঘাস মসৃণ। সামসুদ্দিনসাহেব শীতের দিনে সেখানে বসে রোদ পোহান। ফতিমা যখন বাবাকে চা দিয়ে আসে সফিকুর তার দোতলা ঘর থেকে দেখতে পায়। সুন্দর একটা নীল রঙের শাড়ি পরতে ফতিমা ভালোবাসে। যখন সদর পার হয়ে টুক করে ওদের বাড়িতে ঢুকে যায়, কী অকারণ তখন ফতিমার ভয়। সবাই দেখে ফেলল এই ভয়। সে বার বার আঁচলে মুখ মুছতে থাকে। কেন যে মুখে ঘাম, সফিকের কাছে যেতে গেলেই ঘাম আঁচলে বার বার মুছেও মুখের প্রসাধন সে ঠিক রাখতে পারে না। ফতিমা সফিকের কাছে এলে সেজন্য প্রসাধন করে আসে না। কারণ, সে জানে সফিকের কাছে এসে সে তার প্রসাধন ঠিক বাখতে পারবে না। ফতিমা ঘামলে কপাল না মুছে পারে না। ভিতর ভিতরে এভাবে সফিকের জন্য কী একটা মায়া গড়ে উঠেছে। সফিকও সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পায় না। সামসুদ্দিন সাহেব ওর জন্য খুব করেছেন। এই শহরে সে রিফুজি। সামসুদ্দিন সাহেবের আপ্রাণ চেষ্টা না থাকলে সে তার সংসার চালিয়ে পড়াশোনা চালাতে পারতো না। আর এই এক মেয়ে যে তাকে আরও সব নতুন উদ্যমের কথা শোনাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে একা একা শীতের রাতে টের পায় কোথাও এই মেয়ের প্রাণে বড় একটা ক্ষত আছে। ফতিমা কেন যে মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ হয়ে যায়। তখনই দেয়ালের বিচিত্র পোস্টার, সেই পোস্টারে বুঝি নতুন সংগ্রামের কথা লেখা হচ্ছে। সফিক সেই সংগ্রামের শরিক হতে চায়। ওরা রাত জেগে তখন পোস্টার লেখে।

সফিকুর বই সামনে রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকল। ওর মা কখন চা রেখে গেছে সে টের পায়নি। সে জানালায় শীতের সূর্য উঠতে দেখছে। সূর্যের আলোতে শত শত পোস্টার দেয়ালে সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে। বার বার সেইসব পোস্টারের লেখাগুলি ওর চোখের উপর ভেসে যাচ্ছে। পোস্টারে ফতিমা, আঞ্জু আরও সব মেয়েরা সারারাত লিখে গেছে, বড় বড় অক্ষরে লিখে গেছে—মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলাভাষা। কোনও পোস্টারে ফতিমা ওর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছে—একুশে ফেব্রুআরি পালন করুন। আঞ্জু লিখেছে—নাজিম-নুরুল চুক্তি রোখো, নইলে সুখের গদি ছাড়।

দেয়ালে দেয়ালে এমন সব বিচিত্র পোস্টার। সে জানালা খুলে, সারারাত যেসব পোস্টার মেরে এসেছে, যা সে দাঁড়িয়ে দেখার সময় পায়নি, এখন কেমন ভরে উঠেছে। তার হেঁটে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। যেনে হেটে গেলে অজস্র পোস্টারের ভিতর কোনটা ফতিমার হাতের লেখা সে চিনতে পারবে। এমন নিবিষ্ট হয়ে কে আর রাতের পর রাত পোস্টার লিখে গেছে। সে তার পোস্টারে বার বার বাংলাদেশ কথাটা নিচে লিখে দিতে চেয়েছে। কখনও বোঝা যাইয় রাগে অথবা বড় অভিমানে সে একটা গাধার লম্বা মুখ এঁকে দিয়ে নাজিম নুরুলের ছবি আঁকতে চেয়েছে। এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। কে যে তাকে এমনভাবে প্রেরণা দিচ্ছে সফিক বুঝতে পারছে না। একটানা ফতিমা উপুড় হয়ে কাজ করে গেছে। আজ ভোর রাতে শুধু সে একবার গিয়ে দেখেছে যারা লিখছে তাদের ভিতর ফতিমা নেই। ফতিমাদের নিচের বারান্দায় কাঠের রেলিঙের ধারে মোমের আলোতে সবাই লিখে চলেছে। শেষ রাতের দিকে শহরের আলো নিভে গিয়েছিল—ওরা অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকেনি। মোমের বাতি জ্বালিয়ে নিয়েছে। তুলির এক-এক টানে ওরা এক-একটা পোস্টার শেষ করেছে।

সফিকুর ফতিমাকে না দেখে কেমন অবাক হয়ে গেছিল। সে নেই, এটা সে ভাবতে পারছে না। সে গিয়ে ওয়ে আছে, আর সবাই লিখছে এটা ভালো দেখাচ্ছে না। সে ভিতরে ভিতরে রুষ্ট হয়ে উঠেছে। পোস্টারগুলি একসঙ্গে করে বড় প্যাকেট করল একটা। কেরিয়ারে বেঁধে নেবার সময় ভাবল আঞ্জু অথবা রমাকে বলবে, ফতিমা কোথায়? কিন্তু যে মেয়ে ওকে না বলে ভিতরে শুতে চলে যায় তার সম্পর্কে খোঁজখবর করতে ইচ্ছা হয় না। কী ভীষণ ঠাণ্ডা। হাত-পা শীতে সাদা হয়ে গেছে। ফতিমার এ সময় এটা ঠিক হয়নি। মনে মনে সে ফতিমার হয়ে কার কাছে যেন ক্ষমা চাইছে। আর তখনই সে দেখল দোতলার রেলিঙে চুপচাপ একা ফতিমা। অস্পষ্ট আলোতেও সফিকুর চিনতে পারে সব। মাথার উপর শীতের আকাশ। বুড়িগঙ্গা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। কিছু পালের নাও হয়তো এখন উজানে বৈঠা মারছে। সে এ-ভাবে একা দাঁড়িয়ে আছে কেন, শীতের রাতে ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিতর দাঁড়িয়ে আছে কেন—এই সব জিজ্ঞাসা করতে সাইকেল ফেলে উপরে উঠে গেল। ডাকল, এই ফতিমা।

ফতিমা পিছন ফিরে তাকাল না। বুঝি সে শীতের আকাশ দেখছে। রাত ফর্সা হতে দেরি নেই। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবার প্রভাতফেরিতে বের হবে। ফতিমা বুঝি ওদের মুখে বাংলাদেশের গান শুনতে পাচ্ছে। সকাল হলেই একুশে ফেব্রুআরির ডাকে মা-বোনেরা জেগে উঠবে।

সফিক ফের বলল, ফতিমা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ! শরীর খারাপ লাগছে? তারপর সফিক কী বলবে ভেবে পেল না। তা'ছাড়া এখানে এ সময়ে বেশি সময় দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। কেউ দেখে ফেললে সামসুদ্দিন সাহেবের কানে উঠতে পারে। যতবারই সে ফতিমার সঙ্গে থাকে প্রায় দল বেঁধে থাকে। একবার সে আর ফতিমা

মধুর ক্যান্টিনে একা বসে থাকলে, ফতিমা ভীষণ অস্বস্তিতে বিরক্ত বোধ করেছিল। বলেছিল, সফিক ভাই, আমি বাড়ি যাব।

সফিকুর বুঝতে পেরেছিল সেদিন, ফতিমা চায় না ওরা দু'জনে এভাবে একা পালিয়ে পালিয়ে দেখা করে। নিজের মানুষ চুরি করে দেখতে যাওয়া বড় অপমানের। সে সেই থেকে কখনও ফতিমাকে আর কোথাও একা দাঁড়িয়ে থাকতে বলেনি। এখানেও সে আসত না। তবু কেন যে এমন শীতের রাতে ওকে এভাবে একা দেখে সফিকুর বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে চুপি চুপি উঠে এসেছে। ফতিমা ওর কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না। ফতিমা হয়তো এভাবে আসা তার পছন্দ করছে না। সফিকুরের ভিতরটা দুঃখে কেমন ভার হয়ে গেল। বলল, আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি শেষবারের মতো এগুলি সেঁটে বাড়ি চলে যাব। তোমরা সাবধানে থেকো।

ফতিমার কেমন চমক ভাঙল। সে ঘাড় ফেরাল, দেখল সে আর সফিক বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ওর গায়ে সেই বাদামী রঙের পাঞ্জাবি, খোপকাটা লুঙ্গি আর পায়ে এক জোড়া স্লিপার। চোখমুখ দেখলেই মনে হচ্ছে হাত-পা শীতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সফিক কাশছে। এ সময় ওকে একটু চা করে দিলে বড় ভালো হতো। ওকে কাশতে দেখেই যেন বলল, প্যাকেটগুলি রেখে দিন। অন্য কাউকে দিয়ে ওগুলি দেয়ালে সেঁটে দেব। আপনি বরং বসুন। চা করে আনছি। দেরি হবে না।

—আরে না না। এখন আর ঝামেলা বাড়িয়ো না। রাত ফর্সা হতে না হতে হাতের কাজ সব সেরে ফেলতে হবে। আমি যাচ্ছি। বলেই সে দু'পা গিয়ে আবার ফিরে এল। বলল, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে? এখানে একা দাঁড়িয়ে আছ!

ফতিমা হাসল। —না না। কে কী বলবে?

—কী জানি কত রকমের কথা উঠতে পারে। এ ক'দিন যেভাবে বেহুঁশ হয়ে আমরা পোস্টার লেখা, সাঁটা এবং দল বেঁধে কাছাকাছি থেকেছি, কথা উঠতে কতক্ষণ।

—আজ এমন বলতে নেই। তুমি সাবধানে থেকো। এই প্রথম সে সফিককে তুমি বলে লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার জন্য তুমি ভেবো না।

সফিকের মনে হল সারা উপত্যকায় ফুল ফুটে আছে। সে ফতিমাকে নিয়ে উপত্যকায় কেবল ছুটছে। শীতের রাতে যে সামান্য উষ্ণতা তার দরকার ছিল ফতিমার এমন কথায় সে তা ভুলে গেল। বলল, যদি খোঁজ করতে চাও মেডিক্যাল হোস্টেলে যেও। আমাকে সেখানে পাবে। আমরা সেখান থেকেই ১৪৪ ধারা ভাঙব ভাবছি।

ফতিমা বলল, তোমার সঙ্গে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারলে কী যে ভালো লাগত সফিক। এমন দিন তো আর আমাদের আসবে না।

সফিকের মনে হল শীতে যেন কাঁপছে ফতিমা। সে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আর ঠাণ্ডা লাগাবে না। ভিতরে যাও।

ফতিমা অনুগত ছাত্রীর মতো নেমে যেতে থাকলে ফের ডাকল, আচ্ছা, তুমি এখানে এই ঠাণ্ডায় চুপচাপ কেন দাঁড়িয়েছিলে? এভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেন জানি ভয় হয়।

বলল, এমনি। মনের ভিতর কী যে কখন হয় কেউ তা বলতে পারে না। সারারাত ফতিমা আর একজন মানুষের চোখমুখ ভেবেছ এবং গভীরে ডুবে গেলে শরীরে তার চন্দনের গন্ধ টের পায়। সে যেন তার পাশেই দাঁড়িয়ে বলছে, ফতিমা তুই কী ভাল ভাল কথা লিখে যাচ্ছিস রে। আমি কী লিখব? আমাকে তোর পাশে বসে লিখতে দিবি?

—কেন দেব না!

—কী জানি, যদি না দিস। যদি বলে দিস, তুমি স্বার্থপর। তুমি বাংলাদেশের মানে জান না। তোমার কোন অধিকার নেই লেখার।

—যা, এমন বলব কেন! আমি তো বাপু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই লিখে যাচ্ছি। আমি যে এত করছি কার জন্য?

—তোমার জন্য!

—আচ্ছা, তোর ঐ সফিক কে হয় রে?

—সফিক বড় ভালো ছেলে। আমি তাকে ভালোবাসি। আমার বাবাও সেটা টের পেয়েছে। আমি ওকে না পেলে এখন বুঝতে পারছি বাঁচব না।

—তা হলে আমি তোর কে?

—তুমি যে আমার কে, বুঝতে পারি না। তুমি আমার কী যে নও মাঝে মাঝে আবার তাই ভাবি যখন আমি মরে যাব, কবরের নিচে চলে যাব বুঝি তখন দেখব তুমি আমার কবরের পাশে বসে আছ। তুমি আছ আমার পাশে পাশে। তুমি বাদে আমি এ-বাংলাদেশে সব থাকলেও একা।

—যা! তুই সব বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলছিস!

—তুমি চলে যাবার পর আমার এটাই মনে হয়েছে। তুমি এমন বলবে জানতাম। তবে তুমি যেখানে যে ভাবেই থাক, তুমি আমার। আমার মাটির, আমার কাছের মানুষ।

তখনই ওর পাশে এসে সফিকুর দাঁড়িয়েছিল। ফতিমা টের পায়নি সফিকুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরে টের পেলে সে যেন ধরা পড়ে গেছে এমনভাবে তাকিয়েছিল। সে

সফিককে বলল, আমি আমার মনের মানুষকে ভাবছি সফিক। সে আমাকে ফেলে দূরে চলে গেছে। আর এদেশে আসবে কিনা জানি না। আর দেখা হবে কিনা জানি না। এমন দিনে তাকে না ভেবে থাকতে পারিনি। তুমি বিশ্বাস কর সফিক, আমার মনে হয়েছে শুধু আমি আর তুমি সারারাত জেগে পোস্টার লিখিনি, সেও আমাদের সঙ্গে লিখে গেছে। তাকে ভালো করে দেখার জন্য কতদিন পর এখানে একাকী এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি এ-সব না-ই জানলে।

ফতিমা সফিকুরকে উত্তরে কিছু না বলে অন্য কথায় চলে গিয়েছিল, তুমি আর ঠাণ্ডা না লাগিয়ে সকাল সকাল একটু ঘুমিয়ে নাও। কিন্তু সফিকুরকে তখন ভারি বিমর্ষ দেখাল, ফতিমা আবার না বলে পারল না; ভয়ের কী আছে সফিক? সে তো আমাদেরই মানুষ।

সফিক বলল, কে সে?

ধরা পড়ে গেল বুঝি। তবু সে কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়েছিল সফিকের দিকে। তারপর বলেছিল, সোনাবাবুর কথা বলছি।

—অ, তোমার সেই সোনাবাবু যে আমার মতো নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ফতিমা সোনাবাবু সম্পর্কে আর কোনও কথা বলল না। সে বলল, আর দেরি করো না। রাত ভোর হয়ে আসছে।

সফিক বলল, সাবধানে থেকো।

সফিক কেন যে বার বার একই কথা বলছে! ফতিমা বলল, ভয়ের কী আছে সফিক! আজকের দিনে আমরা তো আর একা নই। সারা বাংলাদেশ যখন আছে সোনাবাবু যখন আছে তখন আর ভয় কী। সে তো আমাদের সব সময় আরও সাহসী হতে বলছে। তোমাদের সঙ্গে আমরাও মার্চ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে যাব। আজকের দিনে অন্তত তুমি আমাকে ঘরে থাকতে বলো না।

সফিক বলল, আমি বারণ করব না। এমন দিনে বারণ করতে নেই জানি। যা কিছু কাজ সব সেরে ফেলতে হবে। এই শীতের ভোরে এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারি না।

টেবিলের সামনে বসে তার ভোর রাতের সব কথা মনে হচ্ছিল। জানালা বন্ধ ছিল বলে ঘর অন্ধকার। সে জানালা খুলে দিলে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। শীতের রোদ লম্বা হয়ে নামছে মাটিতে। সে বইয়ের পাতা পর পর উল্টে গেল। যেখানে চোখ আটকে গেল—কী সুন্দর সেই সব পঙ্ক্তি। যেন ওর সামনে ফতিমা দু'হাত তুলে ভালোবাসা মেগে নিচ্ছে। সে চোখ বুজে ওর সেই কথাগুলি যেন বলে গেল—স্থির জেনেছিলাম, পেয়েছি তোমাকে, মনেও হয় নি তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা। তুমিও মূল্য কর নি দাবি।

রোদটা তখন আবও লম্বা হয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। শীতের রাস্তায় কাবা তখন মার্চ করে চলে যাচ্ছে। ওদের বেয়নেটে নবম রোদ তীক্ষ্ণ ফলাব মতো কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। সফিকুর যেন সেইসব শূন্য দেয়ালে বার বার আঘাত হানার জন্য পড়ছিল জোরে জোরে সে পড়ছে—তোমার কালো চুলের বন্যায়—আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে—তোমাকে যা দিই, তোমার রাজকর তার চেয়ে বেশি—আরো দেওয়া হল না—আরো যে আমার নেই!

শহরের বড় রাস্তায় মার্চ পাস্টের দৃশ্য। রাইফেলের বাঁটে রোদ পিছলে যাচ্ছে। কলের পুতুলের মতো দম দেওয়া মনে হচ্ছে ওদের। দম ফুরিয়ে গেলেই যেন সব জারিজুরি ওদের শেষ হয়ে যাবে। সফিকুর এবার জানালাটা বন্ধ করে দিল। কুচকাওয়াজের দাপটে এমন যে প্রেরণার কথা শোনাতে চেয়েছিল, তারা তা শুনতে পেল না। এবার সে রাস্তায় তাদের হাঁক দিয়ে বলে যাবে, বলে গেলেই শীতের মাঠে আবার পাখিরা এসে বসতে পারবে। কলের পুতুলের ভয়ে ওরা আজ মাঠ ছেড়ে কোথাও যাবে না। সফিকুর তাড়াতাড়ি নাকে মুখে দুটো গুঁজে রাস্তায় বের হয়ে গেল।

সেই শীতের সকালে সোনাকেও দেখা গেল কলকাতার বড় রাস্তা ধরে হাঁটছে। চোখে-মুখে ভীতির ছাপ। এই বড় শহর দেখে গাড়িঘোড়া দেখে সে কেমন আড়ষ্ট হয়ে হাঁটছে। যারা বাবুমানুষ, তাদের সে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে ভয় পাচ্ছে, কোথায় সেই নির্দিষ্ট বাসটি পাওয়া যাবে। ওরা ভর ওপর রাগ করতে পাবে। সে ভয়ে ভয়ে ঠেলা ওলা অথবা যাদের দেখলে তার ভয় লাগে না, যারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনার তেমন মানুষকে খুঁজছিল। সে দু'জন ভদ্রলোককে কিছু বলতে গিয়ে দেখেছে-ওরা এত ব্যস্ত যে তার কথা শুনতেই পাচ্ছে না। হাত তুলে কোনও রকমে ওর সঙ্গে দয়া করে দায়সারাভাবে কথা বলে ছুটে যেন পালাচ্ছে। ওর মনে হল ওরা পালাচ্ছে, ওরা ওর কথা কেউ শুনতে চাইছে না। তবু কেন জানি একজন বুড়োমতো মানুষ তাকে খুব যত্নের সঙ্গে বুঝিয়ে দিল, ঐ যে মনুমেন্ট দেখছ, তাব নিচে তুমি বাস পাবে।

কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। তবু ওর ভিতরে শীত ভাবটা বড় বেশি জাঁকিয়ে বসেছে। হালকামতো কুয়াশা চারপাশে। সামনের রাস্তাটা যে চৌরঙ্গি, ডান দিকে যে বাড়ি সিংহের ছবি সদর দরজায় এবং ওটা যে লাটভবন, সোনা তাও জানে না। বড় মাঠ দেখলেই গড়ের মাঠ মনে হয়, সে কেবল বুঝতে পেরেছিল, সামনের মাঠটাই গড়ের মাঠ। এবং মাটি, গাছপালা আর মনোরম শীতের সকালে কোথা ও র‍্যামপার্ট থাকতে পারে, কোথাও এই মাঠে র‍্যামপার্ট আছে ভাবতেই সে একটু সাহস পেল।

সকালের রোদ তেমন জোরালো নয়। শীতের হাওয়া কার্জন পার্কের গাছপালায়। সে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে শীতে কাপছে। সে শুনে এসেছিল-কলকাতায় তেমন শীত পড়ে না। সুতরাং ওর শীতের জামা না থাকলেও কলকাতায় সে শীতে কষ্ট পাবে না ভেবেছিল। একটা পাতলা পাজামা, কিডস ব্যাগ কাঁধে, পায়ে কতদিনের পুরানো কেড্‌স

জুতো। কলকাতায় শীত নেই সে শুনে এসেছিল, কিন্তু এসে তক দেখছে সারাক্ষণই শীত। সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাস ধরার জন্য হাঁটছে।

বাসের ভিতর উঠেও সে খুব নড়ছিল না। চুপচাপ বসে আছে। বেশি নড়াচড়া করলে ওকে কনডাকটার নামিয়ে দিতে পারে। কোথাকার গ্রাম থেকে ভূত এসে কলকাতা নগরীতে হাজির। কী করে যে সোনা এমন ভীতু মানুষ হয়ে গেল! চার বছরে সে আগের সোনা নেই, অন্য সোনা হয়ে গেছে। সেই যে সে ভেবেছিল, এই দেশে এসেই ওরা সবাই রাজার মতো হয়ে যাবে, কত সমারোহ থাকবে জীবনে, দেশ ভাগের নিমিত্ত ওরা শহিদ হয়ে গেছে—সুতরাং সর্বত্র ওদের জন্য বিজয় পতাকা উড়বে। ওরা রাজার মতো হেঁটে হেঁটে শহর নগর পার হয়ে যাবে। সহসা সোনা এবার নিজেকে বাসের ভিতর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছো রাজা? ভালো আছো? শীত করছে খুব? খুব খিদে পেয়েছে? কাল রাত থেকে কিছু খাওনি? আর বেশি দেরি নেই। যেখানে যাচ্ছি, দেখবে কত কিছু খেতে পাবে তুমি। কোন কষ্ট থাকবে না তোমার।

হালিশহরের ক্যাম্পজীবন, রাইট লেফট আর মার্চপাস্ট করে কল্যানী ক্যাম্পে যাওয়া এসবের ভিতর কতকালের একটা জীবন নির্ভয়ে কেটে গেছে! সে নিজেও জানত না আজ তাকে এখানে আসতে হবে। সে জানত না, এই শহর ছেড়ে, বাংলাদেশ ছেড়ে তাকে কোথাও চলে যেতে হবে। চিঠিতে কী লিখেছে মজুমদারসাহেব তার জানার কথা নয়। তবু এই চিঠিই তার সব। মজুমদারসাহেব তার হয়ে এই চিঠি দিয়েছেন। ভদ্রা জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারকে লেখা। সে চিঠিটা দেখালেই তাকে নিয়ে নেবে। তার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টিয়ার ফোর্সের ট্রেনিং নেওয়া আছে। ট্রেনিং থাকলে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ওর হয়ে মজুমদারসাহেব আর কী লিখেছেন সে জানে না।

বাসের ভিতর শীতের সকাল, তার পাশে গঙ্গানদী। সে বসে বসেই নদী এবং নদীতে জাহাজ দেখতে পেল। এবং বাসটা মোড় ঘুরতেই সব আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ দেখতে পেল। এখানে এক র‍্যাম পার্টের পাশে বড় জ্যাঠামশাই এসে বসতেন। এই নদীর পাড়ে এবং কোনও গাছের ছায়ায় তার পাগল জ্যাঠামশায়ের মুখ ভেসে উঠলে সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল!

মেজ জ্যাঠামশাইর বড় প্রিয় এই গঙ্গা নদী। নদীর পাড়ে তিনি তাঁর দেহ রাখবেন এখন কেবল এই আশা তাঁর। আর কিছু তিনি চান না। শীতের সকালে হেঁটে হেঁটে এক ক্রোশের মতো পথ চলে যান গঙ্গাস্নান করতে। নদীর নামেই তাঁর যত পুণ্য। সংসারের প্রতি এখন মনে হয় মায়া মমতা তাঁর কম। এখানে এসে যে এই বয়সে কী করবেন ভেবে না পেয়ে কেবল বাড়িটার চারপাশে নানারকমের গাছ এনে লাগাচ্ছেন। বাবা দুইমাস পর পর ফেরেন। এখানে আসার পর সে আর বাবাকে হাসতে দেখেনি। মা রাতে কাঁথার ভিতর শুয়ে কষ্ট পান। শিয়রে একটা কুপি জ্বলতে থাকলে সোনা টের পায় মার চোখমুখ কতটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখানে এসে তার পর পর আরও দুটো ভাই হয়েছে। জমি-

জায়গা বলতে চারপাশের বন জঙ্গল সাফ করে বসতি করা। জঙ্গল সাফ করতে করতে বড়দার হাঁটু শক্ত হয়ে গেছে। ছোটকাকা আর এখানে থাকেন না। নিজের মতো করে তিনি আলাদা শহরে বাস তুলে নিয়ে গেছেন। কাকিমা এসেই এ ব্যবস্থা করে নিয়েছে। বড় জ্যেঠিমা যেদিন সবাই উপবাস থাকে, অর্থাৎ যেদিন সংসারে কিছু জোটে না, পেঁপে সিদ্ধ অথবা শুধু মিষ্টি কুমড়ো সিদ্ধ খেয়ে থাকতে হয় সেদিন রাতে ভাঙা বাক্স থেকে যত চিঠি আছে বের করে পড়েন। রাত জেগে কুপি জ্বালিয়ে জ্যেঠিমা সারারাত বুঝি চিঠি পড়েন। জ্যাঠামশাইর চিঠি বিয়ের পর পরই যেবার তিনি কলকাতায় শেষবারের মতো কাজ করতে গিয়ে ছ'মাস ছিলেন, তখনকার কিছু চিঠি। জ্যেঠিমা সকালেই স্নান করে একটা ভাঙা আয়নার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন। কপালে সিঁদুর পরেন বড় বড় ফোঁটায়। এবং তখন জ্যেঠিমাকে দেখলে মনে হয় না সংসারে গতকাল সবার হা-অন্ন গেছে। জ্যেঠিমার এই মুখ দেখলে সোনা চোখের জল রাখতে পারে না। মা না খেয়ে শীতের কাঁথায় শুয়ে থাকলে তার পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না। ওরা সবাই আশায় আশায় বসে থাকে বাবা ফিরে আসবেন। যা কিছু অর্থ ছিল বছর তিনের ভিতর শেষ এখন আছে তিনটে কুঁড়েঘর আর কিছু অন্নহীন প্রাণ। কেউ আর টাকা নিয়ে আসে না। প্রতাপ চন্দের ছেলে লিখেছে তারা দেশ ছেড়ে চলে আসছে। তার কাছে কিছু প্রাপ্য টাকা ছিল। সব খোয়া গেলে সোনা বুঝতে পারে না বাবা এবারে কী করবেন। বাবার চোখমুখের দিকে তাকানো যায় না। ক্রমে বাবা কেমন হয়ে যাচ্ছেন। তবু বাবাই একমাত্র মানুষ যিনি বাড়ি ফিরে এলে ওরা ক'দিন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায়। আবার চলে গেলে সারা সংসারে অন্ধকার। অন্নহীন এই সংসারে সোনার নিজেকে বাড়তি লোক বলে মনে হয়। তখন মনে হয় সকাল হলেই সে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, পাগল জ্যাঠামশাই এসে গেছেন এদেশে। তিনি দ্বার পাগল নন। তিনি বড় মানুষ, তাঁর অর্থবল অনেক। কোথাও তিনি এক রাজবাড়ি কিনে রেখেছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি এখন সেখানে যাবেন। সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বলছেন।

বাসটা যাচ্ছে। সোনা এত অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল যে সে কতদূর চলে এসেছে জানে না। সে বার বার কণ্ডাকটারকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—কে, জি, ডক। তিন নম্বর গেট। সে সেখানে নামবে। তাকে বেশিদূর নিয়ে গেলে সে চিনে ফিরে আসতে পাববে না। পকেটে তার এই বাসভাড়াই সম্বল। তার আর কিছু নেই। এবং এজন্য সোনার বার বারই মনে হচ্ছে সে বড় অকিঞ্চিৎকর মানুষ। তার কথা কণ্ডাক্টার মনে নাও রাখতে পারে। মনে না রাখলে সে খুব বিপদে পড়ে যাবে।

সহসা মনে হল, সোনার বাসের লোকগুলি ওর প্রতি খুব দয়ালু হয়ে উঠেছে। বুড়োমতো একজন লোক বলল, এখনো অনেক দূর। তুমি বোসো। ঠিক তোমাকে নামিয়ে দেবে। তখন ওর মনে হল তবে বুঝি বেশ দূরই হবে। সে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পারে। সে বেশ চুপচাপ বসে এবার জানালার পাশের সব দালানকোঠা লাইটপোস্ট এবং রেলব্রীজ দেখতে দেখতে ভাবল এই শহরেই কোথাও অমলা কমলা থাকে। সে একবার দেখা

করবে ওদের সঙ্গে। সে একটা চিঠি লিখবে, কোনওদিন সে কাউকে চিঠি দেয়নি। সে জাহাজে যখন চড়ে বসবে তখন সবাইকে চিঠি লিখবে। লিখবে, অমলা আমি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অথবা যদি সে অমলার সঙ্গে দেখা করতে যায়, ওকে চিনতে নাও পারে। সে কত বড় হয়ে গেছে। বরং সে চিঠিই লিখবে। সে কী কাজ নিয়ে যাচ্ছে জাহাজে তা লিখতে পারবে না। কাজটার কথা লিখতে ওর ভারি লজ্জা লাগবে।

এমন সময় কণ্ডাক্টারের গলা শুনতে পেল সোনা। এই যে কে নামবে কে. জি, ডকে। তিন নম্বর গেটে তুমি নামবে বলেছিলে? বলে কণ্ডাক্টর সোনার দিকে তাকাল। আশ্চর্য সোনা। সে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে বুঝতে পারেনি। বেশ সে শহরের মানুষজন, রেলব্রীজ দেখছিল। ওর শীত করছিল না তেমন। সে ট্রেনিংশিপের সেকেণ্ড অফিসারের কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। এবং চিঠিটা দেখলেই ওকে ডেকে পাঠাবেন তিনি। কড়া মেজাজের মানুষ, ধমক দিয়ে কথা বলার অভ্যাস। এবং এমন সব নিষ্ঠুর ঘটনার সংবাদ সে রাখে যা মনে হলে শরীরের শীতটা বাড়ে। সে বাস থেকে নেমেই আবার কাঁপতে থাকল। গেটের মুখে দু'জন সিনিয়র রেটিঙস্। সামনে মাঠ এবং দূরে ক্রেন, জেটি, জাহাজের আগিল তিমিমাছের পেটের মতো। সে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখে নিল সব। গেটে লেখা, ট্রেনিংশিপ ভদ্রা। নুড়ি-বিছানো পথ। দু'পাশে ফুলের বাগান, তারপর জাহাজের জেটিতে ছোট মাঠ এবং নরম দুর্বা ঘাস। খুব মসৃণ, তার পাশে সোজা রাস্তা লকগেটের দিকে চলে গেছে। ফল ইনে সে কিছু নতুন রেটিঙস্ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। পনের দিন পর পর একটা করে দল আসে। এই দিনেই সে এসেছে। ওর যতই এখন শীত করুক হাতের চিঠিটা সেকেণ্ড অফিসারের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে। আর যতক্ষণ তিনি ডেকে তার সঙ্গে কথা না বলছেন ততক্ষণ শরীর থেকে শীত যাবে না। সে রেটিঙদের কাছে চিঠিটা দিল। অনুমতি না পেলে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

চিঠি নিয়ে ওদের একজন ডাবল মার্চ করে জাহাজের দিকে চলে গেল। সে ঠিকমতো পৌঁছে গেছে। সে যত কঠিন ভেবেছিল এখানে আসা, ঠিক ততটা কঠিন নয়। তার বড় ইচ্ছা করছিল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রেটিঙদের সঙ্গে গল্প করতে। চিঠিটা পৌঁছে গেলেই তাকে ডেকে পাঠাবে। তার নাম লিস্ট করে নেবে। যারা তখন ফল-ইনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে দাঁড়াতে বলবে। দাঁড়াবার আগে যা যা শুনে এসেছে কতটা তা ঠিক বড় জানার ইচ্ছা তার। জাহাজের মাস্তুলে নিশান উড়ছে। এবং সে এখানে দাঁড়িয়েই দেখল মাস্তুলের মাথায় একটা কাক বসে আছে।

সে ভিতরে ঢুকে গেলে কাকটা ওর মাথার উপর এসে কা-কা করে ডাকল। ওর ভিতরের শীতটা এবার আরও বেড়ে গেল। ওর দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা বাতাস এত বেশি জোরে বইছে যে, সে বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। রোদে যেন কোনও তাপ উত্তাপ নেই। মরা রোদের ভিতর ওর চোখদুটো আরও মরা দেখাচ্ছে। যারা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে অথবা টুইন ডেকে ডিউটি করছে তাদের শরীরে শুধু গেঞ্জি ওরা শীতে কাঁপছে না। ওদের দেখে সোনা এতক্ষণে বুঝতে পারছে সে শীতে কাপছে না, ভয়ে

কাঁপছে। তাকে কারা যেন বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই দালানকোঠার ভিতর বলির মোষটার মতো। সে দেখতে পেল চোখের সামনে ঢাকঢোল বাজছে, ধূপধুনোর গন্ধ উঠেছে, চোখ জ্বালা করছে। কচি মোষটাকে টেনে টেনে নিয়ে আসছে। সকাল থেকে বড় শীতে কাঁপছিল ঘোষটা।

বিউগিল বাজলে সোনা টের পেল সেও ফল-ইনে দাঁড়িয়ে গেছে। ডেকের উপর কাপ্তান। সামনে চিহ্ন, সেকেণ্ড এবং থার্ড অফিসার। সেকেণ্ড অফিসার দু'কদম সামনে এসে কমাণ্ড দিচ্ছেন।

সোনা শুনতে পেল, ঠিক সেই পুরোহিতের মতো গলা, জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণের মতো হেঁকে ওঠা—ট্রেনিজ বলে তিনি যেন দম নিলেন, তারপর গলার দু'পাশের রগ ফুলে উঠতে উঠতে যখন মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে আসছে—তখনই তিনি হেঁকে উঠলেন, থার্টিফোর ব্যাচ, অ্যাটেনশান।

সবার সঙ্গে সোনা অ্যাটেনশান হয়ে গেল। ঠিক সেই কল লাগানো পুতুলের মতো। ওর যা কিছু নিজস্ব, এই যেমন ওর ইচ্ছা, ভালোবাসা এবং বড় হওয়ার স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা সব সে ঝেড়ে ফেলে এখন ওরা যা যা বলবে তাই করবে। যদি ওকে ওরা ক্লাউন সাজিয়ে ছেড়ে দেয় সে সারাজীবন একটা ক্লাউন হয়েই থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার ডেকের ওপর হেঁকে উঠলেন, ট্রেনিজ, দি থার্টিফোর ব্যাচ—স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ। সোনা সহজ হয়ে দাঁড়াতে পেরে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বোট-ডেকের ওপাশে সূর্য কিরণ দিচ্ছে। জাহাজের ওপাশে বড় বড় সব গাদা বোট। এবং দূরে ওপারের জেটিতে ক্ল্যানলাইনের জাহাজ। জাহাজের মাস্তুল পার হলে জেটি এবং শেড আর বড় বড় সব ক্রেনগুলি দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে লম্বা ছায়া ফেলেছে জেটির জলে। অথচ এরই ভিতর সে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে পেল। কোথাও এখানে তবে ঝোপজঙ্গল আছে যেখানে এই শীতের সময়েও ঘুঘু পাখি বাস করতে পারে। ঘুঘু পাখির ডাক শুনলেই বাংলাদেশের কথা মনে হয়। ফতিমার কথা মনে হয়। প্রিয় অর্জুন গাছটার নিচে কেউ দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। গাছটা একাকী নিঃসম্বল মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে নেই, জ্যাঠমশাই নেই। ফতিমা শহরে থাকে। ফতিমা, জ্যাঠামশাই না থাকলে গাছটারও থাকার কোনও মানে নেই। কিন্তু সেই গাছটার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলে দেখল ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুরেফিরে আবার তার তরমুজের জমিতে নেমে যাচ্ছে। সে এই গাছ এবং তরমুজের জমি ফেলে কোথাও গিয়ে শান্তি পাচ্ছে না। আর এমন সময়ই সে শুনতে পেল, ট্রেনিজ, দি থার্টিফোর স্ট্যাণ্ড ইজি।

ওরা ফল-ইনে দাঁড়িয়ে হাত-পা হেলাতে পারছে। এমনকি ওরা এখন পরস্পর গা চুলকেও নিতে পারে। সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারায় সোনা কেমন সাহস পেল। শীতের সূর্য জাহাজের ও পাশ থেকে মাথার ওপর এপাশে উঠে আসছে। শীতের সূর্য ওকে উত্তাপ দিচ্ছে। সে বাঁচতে পারবে এই উত্তাপে। সে এখানে হাতখরচ পাবে সাত টাকা। দু'বেলা

পেট ভরে খেতে পাবে। এটা যে ওর কাছে কী মহার্ঘ ব্যাপার, ক্ষুধায় সে কাতর এবং দুপুর হলেই বোট-ডেকে বড় বড় লাইকরা থালাতে ভেড়ার মাংস আর ভাত। সূর্যটা যত তাড়াতাড়ি মাথার ওপর উঠে আসবে তত তাড়াতাড়ি সে খেতে পাবে। সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাই সূর্য দেখে। সূর্য দেখলে কী হবে, সে তো জানে তাদের এখন নিয়ে যাওয়া হবে বোট-ডেকে। তাদের ডেকের কাঠে ক্রমাগত দুঘণ্টা হলিস্টোন মারতে হবে। এই দু ঘণ্টায় কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে বিদায় করে দেওয়া হবে, তাকে ভেড়ার মাংস- ভাত খেতে দেওয়া হবে না। এমন ভাবতে সোনার বুক গলা শুকিয়ে গেল। সে আজ খেতে না পেলে মরে যাবে। খাবারের জন্য সে আর যাই হোক অজ্ঞান কিছুতেই হবে না।

বোট-ডেকে সে সবার সঙ্গে উঠে গেল। সারাটা ডেক কারা জল মেরে গেছে। লাইফ-বোটের পাশে দু'জন সিনিয়র ট্রেনিজ ওদের উঠে আসতে দেখে ভারি মজা পাচ্ছিল। ওদের হাতে হোস পাইপ। ওদের আরও চার-পাঁচজন জটলা করছে মেসরুমের পাশে। ওদের হাতে বালি। ওরা ডেকের কাঠে বালি ছড়িয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন এসেছে, সারি সারি তারা হলিস্টোন মারতে বসে গেল। সাদা রঙের চৌকো পাথর। কিভাবে বসবে, কিভাবে দু'হাতে হলিস্টোন ধরবে, সব একজন সিনিয়র ট্রেনি সামনে বসে দেখিয়ে দিচ্ছে। বসার এদিক-ওদিক হলে পিছন থেকে পাছায় লাথি খেতে হবে। সোনা সব ভাল করে লক্ষ করছে।

সে দু'পায়ের ওপর ভর করে আলগা হয়ে বসল। দু'হাতে চেপে হলিস্টোন ধরে রাখল। এমন ঘষামাজা ডেক, ফের ঘষতে হবে। কাঠ পাতলা হয়ে গেছে ঘষতে ঘষতে। কোথাও ছোবড়া বের হয়ে পড়ছে। তবু ঘষতে হবে। উপুড় হয়ে বাটনা বাটার মতো ক্রমান্বয়ে ঘষা, ডেক ঘষে যাওয়া। ফল মারছে হোস পাইপে। জলে ওদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। বালি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘষে ঘষে হাত-পা গরম। তারপর দু'হাতে পায়ে যেন খিল ধরে আসছে। সেকেণ্ড অফিসার পোর্টহোলে চোখ রেখে সব দেখছেন। হলিস্টোন মারতে মারতে কে হেলে যাচ্ছে, কার হাত শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কার হাতে ফোসকা পড়ে ছাল চামড়া উঠে যাচ্ছে, দেখে আরও চালিয়ে যাবার জন্য অর্থাৎ যতক্ষণ ওরা বাপরে মারে ডাক না ছোটাবে, যতক্ষণ দু-কষে ফেনা উঠে না যাবে, এবং কেউ কেউ শরীর খিল মেরে অজ্ঞান হয়ে না যাবে ততক্ষণ চালিয়ে যাবে। সিনিয়র ট্রেনিদের এটা একটা বড়দিনের উৎসবের মতো। প্রথম দিনে ওরাও এমন একটা দৃশ্যের ভিতর পড়ে গেছিল। এখন ওরা সোনাদের দেখে মজা পাচ্ছে। চারপাশে ঘসঘস শব্দ। সোনা কানে এখন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। পাশের ছেলেটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কেউ আসছে না। সে উঠে ওকে ধরবে ভাবল, কিন্তু সে জানে সহসা উঠে দাঁড়ালেই পড়ে যাবে। ঠিক উপনয়নের দিনের মতে। নানারকমের মন্ত্র উচ্চারণের ভিতর চারপাশে নানারকমের মজা। মানুষের শরীরে নতুন এক পরিমণ্ডল তৈরি করা। সোনা তুমি এক মানুষ, তোমার এইদিনে মানুষের জন্য আর মায়া থাকছে না, তোমার হাতে ফোসকা পড়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। হাত খুলে আর দেখো না। দেখলে তুমিও অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু হলে কী হবে, সোনা তো এসব পারে

না। সে ছেলেটাকে ধরে তুলতে গেল। আর আশ্চর্য, সে দেখলে দু'জন রেটিঙস্ ওর মুখের ওপর হোস পাইপে জল মারছে। তাকে প্রায় লাথি মেরে পাশে ঠেলে ওরা আরও মজা দেখার জন্য ছেলেটার মুখে হোস পাইপ ছেড়ে দিল। এমন নিষ্ঠুর ঘটনায় সোনার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল। কিন্তু পারল না। আর কিছুক্ষণ সময় পার করে দিতে পারলেই বোট-ডেকে বসে ভেড়ার মাংস-ভাত কলাইকরা থালায় সে ভেড়ার মাংস-ভাত খাবে। সে কিছুতেই প্রতিবাদ করতে পারল না। চোখের উপর দেখল, চ্যাঙদোলা করে ওরা ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে। টেনে হিচড়ে বোট-ডেকের উপর দিয়ে নিয়ে গেলে সোনা চোখ ফিরিয়ে নিল। ছেলেটার হাতে পায়ের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে, তার দেখতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে হুইসল বেজে উঠলে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। হলিস্টোন শেষ। কেউ আর ঠিকমতো দাড়াতে পারছে না। ওরা টলছে। সোনা দু'পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে কিছুতেই পড়ে যাবে না। পড়ে গেলেই ওরা ওকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে—সে মানুষ, পড়ে গেলেই মানুষ না। তাকে নিয়ে যা খুশি করা। সেকেণ্ড অফিসার আসছেন। বুটের শব্দে সোনা চোখ তুলে তাকাল। পরনে সাদা হাফপ্যান্ট সাদা হাফশার্ট এবং মাথায় জাহাজী টুপি চোখমুখ কী ভীষণ কঠিন! তিনি যে বাঙালী, তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন কখনও কখনও, এখন মুখ দেখে তা কিছুতেই বোঝা গেল না। সব কমাণ্ড তাঁর হিন্দিতে, সব কথা হিন্দিতে। সোনার মনে হল তিনি রাতে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন হিন্দিতে। তিনি যে পোর্টহোলে মুখ রেখে প্রতিটি রেটিঙসের ওপর কড়া নজর রেখেছিলেন, এবং যাদের ওপর কোনও সংশয় আছে তাঁর, তাদের কাছে গিয়েই দাঁড়াচ্ছেন, তারা তা বুঝতে পারছে না। সূর্য যখন মাথার উপর উঠে গেছে—আর তখন তিনি বেশি দেরি করবেন না। ছেড়ে দেবেন এবার। হাতে ফোসকা গলে রক্ত পড়ছে, ক্ষুধার জ্বালায় সোনা তা পর্যন্ত টের পাচ্ছে না। যারা হাতে এখন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে সে তাদের কিছু বলবে ভাবল। কিন্তু বলতে পারল না। সেকেণ্ড অফিসার এবার ওর দিকে আসছেন।

সেকেণ্ড অফিসারের কঠিন মুখ দেখে সোনা বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভয়ে সে কিছুতেই তাকাতে পারছিল না। তিনি এসে ওর সামনে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। সে এবার বুঝি সত্যি পড়ে যাবে। সে বলল, ঈশ্বর আপনি আমাকে আর একটু শক্তি দিন। এই দুপুর পর্যন্ত। পড়ে গেলে আমার ভেড়ার মাংস-ভাত আর খাওয়া হবে না। শীতের রোদ, ক্রমান্বয় দু'ঘণ্টা হলিস্টোন, সোনার মুখে যে আশ্চর্য এক সুষমা আছে তা নষ্ট করতে পারেনি। ক্লান্ত অবসন্ন মুখে তার কোথায় যে এক আশ্চর্য দীপ্তি! কেন যে সেকেণ্ড অফিসার এদিকে আসছেন, কিভাবে যে সোনা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন ভাবতেই তিনি সোনার শরীর টিপে টিপে দেখলেন। প্রায় হাট থেকে গাই গরু কেনার মতো খোঁচা দিয়ে দেখা। যেন হাত-পা টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঝড়, সারেঙের অত্যাচার এবং সফরের কঠিন নিঃসঙ্গতা সে সহ্য করতে পারবে কি-না। না পারলে এক্ষুনি বিদায় করতে হবে। সুন্দর চোখমুখ দেখলেই সেকেণ্ড অফিসারের এমন

ভয় হয়। তারপর সহসা ভয় পাইয়ে দেবার মতো চিৎকার করে বললেন, অ্যাটেনশান। সোনার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিকসে খাড়া রহো। হিলতা কিও?

সোনা সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—তোমার নাম কেয়া হ্যায়?

কাকে বলছে সোনা বুঝতে পারছে না। সে তো সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, সে কী করে বুঝবে সেকেণ্ড অফিসার তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।

এবার তিনি ওর চুল টেনে বললেন, তোমার নাম কেয়া হ্যায়?

সে সামনের দিকে তাকিয়েই বলল, শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক।

—মজুমদারসাহাব কাহাসে এক জংলি আদমি ভেজারে! বলেই তিনি সোনার গালে ঠাস ঠাস দু'চড় বসিয়ে বললেন, ঠিকসে বাত বলনে হোগা!

সোনার মনে হল দাঁত ক'টা উড়ে গেছে। দাঁতের কষ চিরে যে রক্ত পড়ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে! রক্তের নোনতা স্বাদ লালার সঙ্গে জিভ দিয়ে সে চেটে নিল। পেটে তবু যা হোক কিছু যাচ্ছে। সে কাঁদতে পারত আজ। অথচ অদ্ভুত, ওর কান্না পাচ্ছে না। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে অ্যাটেনশান হয়ে আছে। গালে সে নিজের হাত তুলে দেখতে পারছে না, কটা দাঁত আছে কটা গেছে। কারণ গোটা মুখ কেমন ভোঁতা মেরে গেছে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না শুধু নোনতা স্বাদে সে বুঝতে পারছে রক্ত বের হচ্ছে। ক্ষুধার সময় নিজের রক্ত চুষে খেতে মন্দ লাগছে না। সে নিজের রক্ত চেটে খেতে খেতে ভয়ঙ্কর সেই কঠিন মুখ দেখে ফের শীতল হয়ে গেল। কেন যে তিনি তাকে এমন কষ্ট দিচ্ছেন, সে তো তার নাম ঠিকই বলেছে। সে এতদিন ধরে তার এই নামই জেনে এসেছে। এখানে এলে নতুন নামকরণ হয় কি-না সে এখন তা জানে না। জানলে সে এমন বলত না। যখন সে কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না অথচ সেকেণ্ড অফিসার ওর কান টেনে সামনে পিছনে মাথা দোলাচ্ছেন। এখন ওর বলতে ইচ্ছা হল, স্যার, আমাকে যে নামেই ডাকুন, যে ভাবেই মারুন, আমি জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছি না। আমি আর একটু বাদে ভেড়ার মাংস-ভাত খাবই।

তিনি কান ছেড়ে দেবার সময় বললেন, বাত কা পিছু মে স্যার বলনে হোগা, মেরা নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক স্যার, বলনে হোগা।

সোনা সোজা দাঁড়িয়ে বলল, মেরা নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক স্যার।

—ঠিক হ্যায়। তারপর তিনি সোনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। —জাহাজ মে বহুত তকলিফ হ্যায়। জাহাজ কা নোকরি বহুত

খতরনাক হ্যায়। সারেঙ লোক দুশমনি করেগা। বহুত লেড়কা লোগ আতা হ্যায়, ট্রেনিং লেতা হ্যায়, এক দো সফর বাদ ভাগতা হ্যায়। তুমকো ভি ভাগনে পড়ে গা!

—না স্যার, আমি ভাগব না।

—সাকগে তুম?

—পারব স্যার। সোনা আর কিছু না বলে সোজা তাকিয়ে থাকল। তিনি চলে যাচ্ছেন। সোনার এত কষ্টের ভিতরও মনে হল যাক, তবে এতদিনে একটা তার হিল্লে হয়ে গেল। কিন্তু একি! তিনি যে আবার ফিরে আসছেন! প্রায় কুইক মার্চের মতো মনে হচ্ছে। এসেই মুখের ওপব শক্ত হয়ে বললেন, তুম বিফ খানে সাকতা?

বিফ! আমি বিফ খাব কেন! আমি হিন্দুর ছেলে, হিন্দুস্থানে চলে এসেছি। আমি আবার বিফ খাব কেন! যারা পাকিস্তানে আছে তারা বিফ খাবে। বিফের ভয়ে আমার জ্যাঠামাশাই গঙ্গার পাড়ে ঝোপজঙ্গলে বাড়ি করেছেন। আমার বাবা মাঝে মাঝে আসেন। বড় জেঠিমা খেতে না পেলে চিঠি নিয়ে বসে থাকেন, ছোটকাকা চলে গেছেন বাড়ি ছেড়ে এত হবার পর হিন্দুর ছেলে হয়ে বিফ খাব, সে কি করে হয়! ভাবতে ভাবতে সোনা ঢোক গিলে ফেলল। সোনার এত খিদে যে বিফ মটন সব এক হয়ে যাচ্ছে। তবু এক আজন্ম সংস্কার, তীব্র ঘৃণাবোধ সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠল। তীক্ষ্ম যন্ত্রণায় শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে। সে এবার মরে যাবে যেন। চারপাশে ঋষিপুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছেন। কী সব মন্ত্রগাথা তাঁরা উচ্চারণ করে চলেছেন। যেন হোমের কাঠ থেকে এক পবিত্র গন্ধ উঠে সারা শরীরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল, বলতে ইচ্ছা হল, না না আমি সব পারব। এটা পারব না। আমাকে আমার জন্ম থেকে আমার বাবা মা, আমার পূর্বপুরুষ, মাটি ফুল ফল এক আশ্চর্য পরিমণ্ডলে মানুষ করেছেন, আমি সব পারি স্যার, কিন্তু সেই পরিমণ্ডল ভেঙে দিতে পারি না। ভেঙে দিলে আমার আর কিছু থাকে না।

এত দেরি দেখে তিনি ক্ষেপে গেলেন। —জাহাজ মে নোকরি করনেসে বিফ তুমকো খানেই হোগা। বোল, সাকোগে কী নেহি?

আশ্চর্যভাবে সোনার সমনে মায়ের মুখ ভেসে উঠল।

শীতের রাতে মা কুপি জ্বালিয়ে বাবার প্রত্যাশায় বসে আছেন। উঠোনে সেই আবহমানকালের সাদা জ্যোৎস্না। উনুনে শুধু জল সেদ্ধ হচ্ছে। বাবা এলেই দু'মুঠো অন্ন সবার পাতে। কী উদ্‌গ্রীব চোখমুখ ছোট ছোট ভাইবোনদের। সে তার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছে। মা তার অন্নহীন। ভাইবোনের শুকনো চোখমুখ ভেসে উঠলে, সে বলল, আমি পারব স্যার। সে বলতে বলতে মাথা নিচু করে ফেলল। সেকেণ্ড অফিসার টের পাচ্ছেন ছেলেটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে, এই প্রথম এত যন্ত্রণার পর কাঁদছে। ওর এ সময় সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষা থাকে না। তিনি যেমন বার বার কুইক মার্চ করে যান আসেন, আজও তিনি তেমনি কুইক মার্চ করে চলে গেলেন। তিনি যেন এখন বলতে

বলতে যাচ্ছেন, আমার পিতা অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতামহের নাম হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়, তস্য পিতামহের নাম যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। তুমি চোখের জল ফেলে আমাকে কী ভয় দেখাচ্ছ হে ছোকরা!

আহা! তারপর শীতের রোদে ভেড়ার মাংস গরম ভাত। ডেকের উপর বসে পেট ভরে খাওয়া। মাথার উপর খোলা আকাশ। সামনে নদী। ওপারের কলকারখানা, কলের চিমনি এবং নীল আকাশ। কত সব পাখি মোহনার দিকে উড়ে যাচ্ছে। সোনা খেতে খেতে এই সব পাখি দেখল, ওরা উড়ে যাচ্ছে। ট্রেনিং শেষ হলে সেও চলে যাবে, জাহাজে সে বাংলাদেশ ছেড়ে সমুদ্রে চলে যাবে। কবে ফিরবে সে জানে না। আর এই বাংলাদেশে সে ফিরতে পারবে কি-না তাও জানে না।

ওর মনটা খেতে খেতে ভারি হয়ে গেল। মার জন্য, ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্য ওর কষ্ট হতে থাকল। সে কলাই করা থালা মগ ধুয়ে বাংকে রেখে এল। তারপর মাস্তুলের নিচে শীতের দুপুরে শুয়ে পড়ল। ওর এখন বিশ্রাম। ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পেট পুরে খেলেই শীতের দুপুরে ওর বড় ঘুম পায়।

সোনা যখন মাস্তুলের নিচে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, যখন বাংলাদেশের আকাশ নীল, মানুষেরা শীতের রোদে উত্তাপ নিচ্ছে তখন সামসুদ্দিন দেখল ডায়াসে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন উঠে দাঁড়িয়েছেন। সামসুদ্দিন দেখছে সকাল থেকে অগণিত ছাত্র সমুদ্র তরঙ্গের মতো ছুটে আসছে। ওরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকে যাচ্ছে। পুলিশের ব্যারিকেড তুচ্ছ করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভিতরে। সে দেখছিল। ওর গর্বের অন্ত ছিল না। অজস্র পলাশ গাছ যদি কোথাও থাকে তার লাল পাপড়ি, ওর মনে হল ওরা পলাশের পাপড়িই হবে—নতুন আকাশ এমন রাঙা হতো না, যেন লক্ষ লক্ষ পলাশের পাপড়ি বাংলাদেশের আকাশ নিমেষে ঢেকে দিচ্ছে—আকাশটা রাঙা হয়ে গেলে, মতিনসাহেব বলে উঠলেন, ভাইসাব, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমাদের দাবি বানচাল করে দেবার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

সামসুদ্দিনের সাদা রঙের শালের উপর নানারকম প্রজাপতি আঁকা। সে শালটা দিয়ে মুখ মুছল। এই শীতের দুপুরে সে ঘেমে যাচ্ছে। সে শালটা ঝেড়ে কাঁধে ফেলে রাখলে মনে হল প্রজাপতিগুলি উড়ে গেছে। প্রজাপতি উড়ে গেলে আর কিছু থাকে না। আজ এই দিনে মাঠে মাঠে যত ফুল আছে, সব ফুল থেকে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। এমনকি জালালির কবরে সে যে প্রজাপতি উড়িয়ে দেবে বলেছিল, পুলিশের অত্যাচার দেখে মনে হচ্ছে তাও সে আর বুঝি পারবে না। ফলে কবর থেকে জালালির মুখ ভেসে ভেসে চলে আসছে। জালালি যেন তাকিয়ে আছে অথবা সেই মহারাত্রির ঘটনা এই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে হুবহু মনে পড়ে গেল। জালালি ক্ষুধায় হাঁসটার মাংস চিবুচ্ছে। কড়মড় করে হাঁসের হাড় গিলে ফেলছে। কী নিষ্ঠুর ছিল সেই ক্ষুধার্ত মুখের ছবি! এবং পেট ভরে গেলে জালালির মনোরম মুখ—সে এই বাংলাদেশে এমন সুন্দর মনোরম মুখের ছবি আঁকতে চেয়েছে। পেট ভরে

গেলেই মানুষের আর দুঃখ থাকে না। আল্লার দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। সে যে একটা শপথপত্র রেখে দিয়েছিল জালালির কবরে, সেই শপথপত্রটাও যেন কবরের নিচ থেকে উঠে এসে একটা ফেস্টুন হয়ে গেছে। বাতাসে পতপত করে উড়ছে। সে যা চেয়েছিল তা করতে পারে নি। কারা এসে সব উল্টে পাল্টে দিল। সে আর মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, এমন বলতে সাহস পায় না। কত সব নীচ হীন স্বার্থপর মানুষ এসে ওর যে শপথপত্র ছিল জালালির কবরে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। সে মতিনসাহেবের গলার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলে উঠল, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমার আপনার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।

সামসুদ্দিন এই বলে আরম্ভ করল। হাজার হাজার তরুণ, যুবা উন্মুখ হয়ে শুনছে। মহারণে যাবার আগে এই কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা ওরা শুনে যাচ্ছে। ওরা কেউ কোনও কথা বলছে না। বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা আমাদের বাংলা ভাষা, বাংলার জল, বাংলার মাটি আমাদেরই নিকনো ঘরের ছবি, তাকে ফেলে যাব কোথা! তারে ছাইড়া দিলে থাকেডা কি!

বুঝি ঈশমের হাতে সে এক মুশকিলাসানের লম্ফ দেখতে পেল! কেন যে এতদিন পর ঈশমচাচার কথা ওর মনে এল সে জানে না। যেন সেই ফকিরসাব হাতে মুশকিলাসনের লম্ফ—হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর পিছনে কে যেন বার বার তাঁকে অনুসরণ করতে বলছে। সে এতদিন ঈশমচাচার কোন খোঁজই রাখেনি। ঠাকুর বাড়ির সবাই চলে গেছে—তারপর চাচার কী হল, সে কোথায়, সে জানে না। সে জানে না ঈশম অন্নহীন ভূমিহীন। ঈশম হয়তো গভীর রাতে তরমুজের জমিতে ফিরে আসতে চায়। ঈশম হয়তো দেখতে পায় তখন তার নীলকণ্ঠ পাখিরা সব উড়ে গেছে কোথাও। হাতের তালিতে আর ওরা ফিরে আসবে না। ঠাকুরবাড়ির মানুষদের ও-পারে বুঝি এতদিনে সেই পাখিটার খোঁজ মিলে গেছে! না মিলে গেলে ওরা আবার নদী বন মাঠ পার হয়ে ছুটবে। সামসুদ্দিনের মনে হয়েছিল, তার পাখি আকাশে ওড়ে না, নদীর পাড়ে বসে থাকে। দেশভাগের পর পরই সে ভেবেছিল, তবে বুঝি এবারে সব মিলে গেল—কিন্তু হায়, যত দিন যায়—সে দেখতে পায় সংসারে সবাই পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে—আবার খুঁজে বেড়ায়। পেলে মনে হয় পাখি মিলে গেছে, দুদিন যেতে না যেতেই মনে হয় পাখিটা আর নীলরঙের নয়, কেমন অন্য রঙ হয়ে গেছে। সে বলল, এটা আমাদের জীবন-মরণের শামিল। থামলে চলবে না আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।

সামসুদ্দিন একটু দম নিল।

বড় রাস্তায় সব পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। দোকানপাট বন্ধ। সারা শহর থমথম করছে। পুলিশেরা মাঝে মাঝে কোথাও টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাচ্ছে। অথচ বার বার কেন যে একজন মানুষ, আজ সবচেয়ে বেশি তাকে ইশারায় ডাকছে বুঝতে পারছে না। সে এবার বলতে চাইল, আমি আবার যাব আপনার কাছে। তার আজ সবার কথা মনে

হচ্ছে। সেই ছোট ছেলে সোনার কথা মনে হচ্ছে। সে যখন সোনার মতো ছিল তখন ঈশমচাচা গভীর রাতে এসে ডাকতেন, সামু ঘুমাইলি?

—না ঘুমাই নাই!

—তর লাইগা আনছি।

—কী আনছেন চাচা? সে ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসত। দশমীর বাজনা বাজছে না। বিসর্জন হয়ে গেছে ঠাকুরের। দশমীর মেলা থেকে সে ফিরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টেরই পায়নি। উঠে দেখত চাচা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ঝকঝকে টিনের তলোয়ার।

সামু ঝকঝকে তলোয়ার দেখে চাচাকে জড়িয়ে ধরত। সে দুগ্‌গাঠাকুরের তলোয়ারটা বালিশের নিচে রেখে দিত। সকাল হলে সে রাজা সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আসত। মাথায় তার আমপাতার মুকুট।

সামুর মনে হল ওর সেই আম-জামপাতার মুকুট এখনও কে যেন মাথায় তার পরিয়ে রেখেছে। সে যতই হিন্দুবিদ্বেষের কথা বলুক মাথার আম-জামপাতার মুকুট সে ফেলে দিতে পারেনি। ফেলে দিতে গেলেই দেখেছে ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠেছে। মালতীর কথা মনে আসতেই আবেগে সে বলে উঠল, আজ আমাদের আন্দোলনের দিন, মায়ের ঋণ শোধ করার দিন। আমাদের মা, বাংলামার চেয়ে বড় কিছু নেই। যতদিন ঋণ শোধ না হবে, ততদিন আমাদের রেহাই নেই।

ধীরে ধীরে ছাত্ররা এবার বের হয়ে গেল। ওরা বন্দুকের নলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। আমাদের মা, বাংলা মার চেয়ে বড় কিছু নেই। দশজন করে এক একটা দল এগিয়ে যাচ্ছে। কী শান্ত নীল আকাশ! মাথায় সবার আম-জামপাতার মুকুট, রাজার মুকুট। মা তাদের যেন পরিয়ে দিয়েছেন। তারা যেতে যেতে গান গাইছে, ওগো মা জননী, আমাগো মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়, আমরা কি করি!

সফিকুর দশজনের একটা দল নিয়ে হাঁটছে। হাতে পোস্টার। তাতে লেখা—চলো যাই চলো, যাই চলো যাই—চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে, চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে। কারও পোস্টারে অথবা কণ্ঠে লেখা—ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে, ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাঙালীর বুকে, ওরা এদেশের নয়, দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয় ওরা মানুষের অন্নবস্ত্র শান্তি নিয়েছে কাড়ি, একুশে ফেব্রুআরি, একুশে ফেব্রুআরি। সব শেষে দোহারের মতো সফিকুর সবার সঙ্গে গায়, আমরা কি যে করি।

ফতিমা যাচ্ছে দশজনের একটা দল নিয়ে। ওদের শাড়িতে জমিনের রঙ সাদা, পাড়ের রঙ নীল। ওরা বুকে ব্যাজ এঁটে নিয়েছে—একুশে ফেব্রুআরি। শীতের রোদে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। তারাও গাইছে সমস্বরে—আমরা কি যে করি!

এ-ভাবে যাচ্ছে। একের পর এক দশজনের একটা দল বের হয়ে যাচ্ছে। হাতে নানা রঙের ফেস্টুন। মুখে গরিমা। তারা বন্দুকের নলের সামনে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা বাংলার জল, বাংলার বায়ু বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। শহরবাসীরা জানালা দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে। ভয়, কখন দাবানলের মতো বিদ্রোহী ছাত্ররা আগুন জ্বালিয়ে দেবে ব্যারাকে ব্যারাকে। ওরা শার্শির ফাঁকে দেখল, কী নির্ভীক ছাত্ররা! ছাত্ররা পুলিশ কর্ডনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর অনবরত গাইছে, আমরা কি যে করি!

আর এই কী করি, কী করি করতেই রাইফেল গর্জে উঠল। মেডিক্যাল কলেজের শেডের নিচে ছাত্ররা এসে জমায়েত হচ্ছিল—তখন এমন এক কাণ্ড। কাণ্ড আর কাকে বলে। মানুষেরা চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখতে পর্যন্ত পারছে না। দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। শার্শির ফাঁকটুকু পর্যন্ত রাখেনি। কি জানি ফাকে ফোকরে যদি গুলি ঢুকে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে কে তখন বলে উঠল বেইমান। এমন হিংস্র ছবির ভিতরও ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, ওরা ওদের বুকের বল হারাচ্ছে না, ওরা গাইছে, আমরা কি যে করি! ওরা হাত তুলে যেন পারলে আকাশ থেকে সূর্য উঠ পড়ে আনে—ওরা সমস্বরে বলছিল—আমাদের ভাষা, বাংলা ভাষা। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

তাজা রক্তে তখন বাংলার ঘাস মাটি ফুল ভেসে যাচ্ছে। যা কিছু রঙ নীল অথবা সবুজ সবই কেমন লালে লাল হয়ে গেল। মনে হচ্ছে সারা আকাশটাই একটা শিমুলের গাছ, ডালে ডালে অজস্র লাল ফুল, ফুলের পাপড়ি এবার এই রাজপথে, মিনারে, গম্বুজে ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামে, মাঠে, শহরে, গঞ্জে বাংলার মানুষ আকাশে এ তসব শিমুল ফুলের পাপড়ি উড়তে দেখে যেন হা-হুতাশ করছে—এ-ঋণ শোধিবে কে! এই যে হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো—এ ঋণ শোধিবে কে! কে মানুষ এমন আছে বলতে পারে, খামু দামু ঘরে যামু তাজা রক্ত মায়েরে দিমু। আর কি দিমু তোমারে, দিমু আমার জান প্রাণ! সফিকুর হাইকোর্টের সামনে তার জানপ্রাণ দিয়ে মায়ের সম্মান রক্ষা করেছে। ওর দু'হাতে শক্ত করে ধরা পোস্টার। সে পড়ে গেলে পোস্টারটা ওর নিচে না পড়ে যায়, মায়ের জন্য তার মাথার কাছে পাতা আছে আসন, সে মাথার কাছে বিছিয়ে রেখেছে পোস্টার—আমার মুখের ভাষা অরা কাইড়া নিতে চায়! সফিকুরের রক্তে পোস্টার ডুবে আছে। পোস্টারের নীল অথবা সবুজ রঙ আর চেনা যায় না। রক্তের এক রঙ। লাল রঙ। নীল রঙের পোস্টারে অজস্র নক্ষত্রের মতো রক্তবিন্দু লেগে এই মহাকাশকে ব্যঙ্গ করছে।

সফিকুরের চোখ বোজা, যেন সে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে। শিশুর মতো মুখখানি নরম সাদা নীল চোখের মণিকোঠায় একটা মাছি উড়ে উড়ে বসছে।

ফতিমা পাশে স্থির। সবাই মুহূর্তের জন্য কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সে দাঁড়িয়ে সফিকুরের মুখ দেখছিল। মাছিটা কী নির্ভয়ে ওর চোখের ওপর বসে রয়েছে। সে পাশে বসল। চোখ থেকে মাছিটাকে তাড়াল। তারপর কপালে হাত দিয়ে দেখছে—সেই আম-জামপাতার মুকুট ওর মাথায় আছে কিনা। হাত দিতেই সে অনুভব করল, বড় সুন্দর সেই

মুকুট, শিশু বয়সের সেই পাতার মুকুট। সবাই পাতার মুকুট পরে যেন রাজা-রানী খেলতে যাচ্ছে! সেও সফিকুরের সঙ্গে নদীর চরে। কোন তরমুজ খেতে বুঝি রাজা-রানী খেলতে নেমে যাচ্ছে। সে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকল। ফিনকি দিয়ে যে রক্তটা উপচে এসে মুখের চারপাশে পড়েছে—আঁচল দিয়ে সেটা বড় ভালোবাসায় মুছিয়ে দিল। বলতে ইচ্ছা হল, তুমি খেলবে না আমাদের রাজা-রানীর খেলা? সফিকুর বুঝি হাসছে। কেন, আমাকে রাজার মতো লাগছে না? তুমি মাথায় হাত দিলে টের পাবে আমি পাতার মুকুট পরে আছি।

এবার সে সফিকুরের বুকে হাত রাখল। সামনে ভীরু কাপুরুষের মতো পুলিশের দলটাকে আজ ভীষণভাবে উপেক্ষা করতে ভালো লাগছে। বুকে উত্তাপ আছে এখনও। ভালোবাসার উত্তাপ। সে জানে, বেশি সময় বসে থাকতে পারবে না। ওরা ছুটে এসে এক্ষুনি সফিকুরকে ঘিরে ফেলবে। তাড়াতাড়ি সে নীল রঙের পোস্টার মাথার উপর ভুলে নিল। ওদের আসবার আগেই এই পোস্টার নিয়ে কোথাও পৌঁছে যেতে হবে। সে সফিকুরকে পিছনে ফেলে এবার হেঁটে যাচ্ছে। ভয় লাগলে সাহস ফিরে পাবার জন্য সে কবিতা বলছে মহাকবির কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড় ফসলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিকের প্রাণ জানি নাকো—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর ...।

এই মাঠ ঘাটের ভিতর তখন আর একজন মানুষ হাঁটছিল। সে ফিরে যাবে তার তরমুজের জমিতে। সে কতদিন হল বের হয়েছে দেশ থেকে। তার যেন সহসা মনে পড়ে গেছে, সে এই যে ঘুরে ঘুরে না খেয়ে না দেয়ে কেমন এক ভবঘুরে মানুষের মতো গাছের নিচে বসে থাকছে, কেউ ডেকে খেতে দিলে খাচ্ছে, নয়তো খাচ্ছে না, কেউ বলে না দিলে সে হাঁটছে না—তাকে তরমুজের জমিতে ফিরে যেতে হবে। সে বুঝি বুঝতে পারছে তার মাটির নিচে নিজের জন্য সে একখণ্ড সামান্য আশ্রয় চাই। সারা দেশ চষে চষে জমি পছন্দ করতে পারল না। নদীর চর, তরমুজের খেত মনে হলেই সে বুঝতে পারে ভিতরে তার একটা ভীষণ কষ্ট। অভিমান করে যে সে দেশ ছেড়ে বের হয়ে ছিল, সে-পোড়া দেশে আর সে থাকবে না, শেষ সময়ে মনে হয়েছে সে পৃথিবীর অন্য কোথাও গিয়ে মরে শান্তি পাবে না। সুতরাং অন্নহীন ভূমিহীন ঈশম ফের তার তরমুজের জমিতে গিয়ে বসবে বলে হাঁটছে। গ্রাম মাঠ পর হায় সে চলে যাচ্ছে। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সে সোজা হেঁটে যাচ্ছে। না পারলে কোনও গাছতলায় শুয়ে থাকছে। আবার শরীরে সামান্য বল ফিরে এলেই সে হাঁটছে। তার বিরাম নেই বিশ্রাম নেই হাঁটার। তাকে শেষ সময়ে সেখানে যেতেই হবে।

তারপর একদিন সে তরমুজের জমিটার পাশে যখন দাঁড়াল—কে বলবে তখন এই সেই ঈশম। ছেঁড়া তফন। গায়ে জামা নেই। নাকে সর্দি। চোখে পিচুটি। শীর্ণকায়। ক্ষুধায় থরথর করে কাঁপছে। সে দাঁড়াতে পারছে না। কুকুরটা ওর পায়ে পায়ে ঘুরছে। জমির পাশে এসেই মনে হল, এ-জমি তার নয়। জমিটা যে হাজিসাহেবের বেটাদের দিয়ে গেছেন ছোটঠাকুর, এতদিন পর কথাটা ফের মনে হতেই ওর ভারি হাসি পেল। ওর মাথায় কী

কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে! কী করে যে ভুলে গেল, জমিটা তার নয়, অন্যের! অথচ সে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে জমিটা নিজের ভেবে। রাতের আঁধারে ফিরে এসেছে বলে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে সবাই কী হাসাহাসি করত! আরে মিঞা তুমি! কই আছিলা এদ্দিন! শরীরের দশা এমন ক্যান! য্যান কেউ নাই তোমার? রাইত বিরাতে একা ঘুরলে তোমায় কেউ মনুষ্য কইব না। ঝোপে-জঙ্গলে পালাইয়া থাক। কে কখন কামড়াইব টের পাইবা না।

কী এক ভালোবাসা এই জমির জন্য তার সে নিজেও জানে না, বোঝে না কেন এই ভালোবাসা। সে কেন যে আবার তার জমিতে ফিরে এল! সে ক্ষুধায় কাতর। অন্ধকার বলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। না কী সে বছরের পর বছর ঠিকমতো আহার না পেয়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওর বড় ইচ্ছা দেখার এই জমিতে হাজিসাহেবের বেটারা কত বড় তরমুজ ফলিয়েছে। এই জমিতে শুয়ে থাকার ইচ্ছা। সে ভাবল এখানেই আজ রাত কাটিয়ে দেবে। ওর এই মাটি, কত যত্ন করে সে মাটিতে চাষাবাদ করত, কত কষ্ট করে অনাবাদী জমি সে আবাদী জমি করে তুলেছিল। আর সেই দিনের কথা মনে হলে ওর এখনও চোখে জল আসে। সবার কী ঠাট্টা-তামাশা, ঠাকুরের বড় ছেলের মতো ঈশমটাও পাগল। উরাট জমিতে চাষ। কিছু ফলে না জমিতে, কেবল বেনা ঘাস আর বালি। ঈশম বড় যত্নে এবং ভালোবাসায় আবাদ করে কী যে করেছিল জমির জন্য মনে করতে পারে না, কেবল মনে হয় সে আলে দাঁড়িয়ে সব তৃষ্ণার্ত মানুষদের তরমুজ কেটে খাইয়ে ছিল। সে আবার ফিরে এসেছে। তরমুজের পাতার নিচে সে শুয়ে থাকবে। শুয়ে থাকলেই শান্তি। সে শান্তির জন্য পাতা ফাঁক করে উবু হয়ে অন্ধকারে বসল। মাটিতে হাত দিল। থাবড়ে-থাবড়ে সে মাটিটার সঙ্গে কথা বলছে। আবার ফিরা আইলাম মা জননী। তর কাছে ফিরা আইলাম। সে মুঠো মুঠো মাটি তুলে গায়ে মুখে মেখে নিচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কোনও তরমুজ ফলে আছে কি-না হাত দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করছে। যেন পেলেই সে একবার পাঁজাকোলে তুলে নেবে। কত ওজন, কত বড়, মা-জননীর সেবা-যত্ন ঠিক না হলে ফসল ফলে না, সে তরমুজ ওজন করে যেন বলতে পারবে হাজিসাহেবের বেটারা কেমন যত্ন-আত্তি নিচ্ছে। কম ওজনের হলে মনে হবে শালারা বেইমান।

সে খুঁজে খুঁজে একটাও তরমুজ পাচ্ছে না। বেশি দূর সে খুঁজতে পারছে না। এখানে এসেই শরীরটা তার ক্রমে কেন জানি স্থবির হয়ে আসছে। হাত পা অসাড়। কেবল কুকুরটা ওর পাশে সেই থেকে আছে। কুকুরটা সেই থেকে কতকাল, এতকাল কুকুর বাঁচে না, তবু কোনও ভালোবাসার আকর্ষণে কেন যে এখনও বেঁচে আছে! কুকুরটাও আর কুকুর নেই, বড়মানুষদের কুকুর কামড়ে সারা শরীরে তার ঘা করে দিয়েছে। সুতরাং কুকুরটার জন্য তার ভারী মায়া। সে কুকুরটাকে ফেলে কোথাও যায়নি, কুকুরটাও তাকে ফেলে কোথাও যাচ্ছে না। এখন একটা তরমুজ পেলে সে কামড়ে একটু রস খেলে আবার কিছুদিন বুঝি বাঁচতে পারত। আবার সে তরমুজের জমিতে বসে নামাজ পড়তে পারত। আর তখনই হাতের কাছে ছোট একটা তরমুজ পেয়ে গেল। তরমুজটাকে টেনে সে কাছে

আনতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে সে তরমুজটার কাছে যাচ্ছে। দু'হাতে ভর করে সে যেতে চেষ্টা করছে। তরমুজটাকে সে কাছে আনতে পারছে না। হাত থেকে হড়কে যাচ্ছে। ওর ক্ষুধার্ত মুখ জ্বলছিল। কোনও রকমে সে তরমুজটাকে মুখের কাছে এনে কামড় দেবে, কোনওরকমে একটু তৃষ্ণার জল পান করবে, করলেই গলা ভিজে যাবে, ওর যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সেটা আর থাকবে না। সে কামড়ে দেখল তরমুজটাতে রস নেই। ওর গলা ভিজছে না। সে ক্রমে চোখে ঘোলা ঘোলা দেখছে। মাটির উপর সে দু'হাত বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কুকুরটা বুঝতে পারছে না কেন তার মানুষ এমনভাবে পাতার নিচে লুকিয়ে পড়ছে। মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে উবু হয়ে আছে। নড়ছে না। মানুষটা যে মরে যাচ্ছে কুকুরটা তা বুঝতে পারছে না। রাতে গাছের নিচে ঈশম ঘুমালে সে যেমন পাহারায় থাকে —আজও মানুষটা ঘুম যাচ্ছে বলে শিয়রে জেগে বসে থাকল। সে আর ঈশম, মাথার উপর আকাশ, অজস্র নক্ষত্র এবং অন্ধকার, সোনালী বালির নদী, নদীর জল এবং অর্জুন গাছ মাঠের পাশে। কুকুরটা দূরে শেয়ালেরা উঠে আসছে টের পেল। সে সেই অন্ধকার তরমুজের জমিতে বসে সব লক্ষ রাখছে। সে দু'বার মাটি শুঁকে ঈশমের চারপাশটা একবার ঘুরে এসে শিয়রে বসল। ভয় পেয়েই কুকুর এমন করছে। ভয় পেয়েই কুকুরটা শিয়রে বসে ঘেউঘেউ করে ডাকছে। সারারাত সে সতর্ক থাকছে। শেয়াল-কুকুর ঈশমকে খাবে ভেবেই সে থাকছে। ঈশম তার মাটির কাছে তরমুজের পাতার নিচে মহানিদ্রায় মগ্ন। আশ্বিনের কুকুর এটা টের পেয়ে আর বসে পর্যন্ত থাকতে পারল না। শত্রুপক্ষ সবদিকে। সে শিয়রে আর বসে থাকছে না, সারাক্ষণ ঘুরছে ঈশমের চারপাশে। কোন দিক থেকে শেয়াল-কুকুরেরা উঠে এসে দাঁত বসাবে কে জানে!

হাজিসাহেবের বেটারা সকালে তরমুজ তুলতে এসে টের পাবে একজন ভিখারি মানুষ তরমুজ পাতার নিচে মরে পড়ে আছে। প্রথমে ঈশমকে ওরা চিনতেই পারবে না। এই ঈশম। ওর কাঠা দুই ভুঁই ছিল বাড়ির পাশে। সেটাও তারা কাঁচা বাঁশের বেড়ায় নিজের করে নিয়েছে। চিনে ফেললেই ভয়। যদি ওটা আবার সে ফিরে চায়! তবু ঈশম এ-পোড়া বাংলাদেশে আবার ফিরে আসতে চায়। আবার জন্ম নিতে চায়। যেন একটা লাঠি দিলে সে এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবে। মাথায় পাগড়ি হাতে লণ্ঠন নিয়ে রাতের আঁধারে সে খবর দিতে ছুটবে, ধনমামা, আপনের পোলা হইছে। আমারে কিন্তু একটা তফন দিতে হইব।

অথচ সকালে অঞ্চলের মানুষেরা দেখল নদীর পাড়ে বড় রাস্তায় ঝকঝকে একটা মোটরগাড়ি। এ- গাড়ি দেখলে সবাই টের পায় সামসুদ্দিনসাহেব শহর থেকে এসেছে। সে নদীর পাড়ে গাড়ি রেখে সোজা নিজের গ্রামের দিকে উঠে গেল না। হিন্দু পাড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে। খুব কম আসে সামসুদ্দিন। যাদের বয়স বেড়েছে তারা জানে সামু আজকাল সময়ই পায় না। বাড়িতে ওর এখন কেউ নেই। জমিজায়গা দেখার জন্য শুধু একজন লোক আছে। তবু সে বছরে একবার অন্তত আসে। একদিন দু'দিন থাকে, তারপর আবার শহরে চলে যায়। সে কতবারই এসেছে। ভুলেও হিন্দু পাড়ার দিকে উঠে যায়নি। কী যে ভিতরে ছিল কে জানে! সে ওদিকে একেবারেই মাড়াত না। কার কাছে যেন ধরা পড়ে

যাবে, কার কাছে বুঝি তার কী ফেরত দিতে হবে! সে ভয়ে গোপাটে পর্যন্ত নেমে আসত না। কিন্তু আজ এত সকালে সে এদিকে না এসে ওদিকে যাচ্ছে। ওদিকে কিছু নেই। খালি। পাড়াকে-পাড়া খালি। খাঁ-খাঁ করছে সব। সে একা যাচ্ছে না। সঙ্গে দুই যুবতী মেয়ে। ওরা দেখে চিনতেই পারল না, যে মেয়েটা ভোর হলে বটগাছের নিচে ছাগল দিয়ে আসত, যে মেয়ের নাম ফতিমা, নাকে নোলক ছিল, পায়ে মল ছিল, এখন সে মেয়ে কত ডাগর, কী সুন্দর চোখ-মুখ—গাছের পাতার মতো হাওয়ায় কাঁপছে। ফতিমার সুন্দর লতাপাতা আঁকা শাড়িতে প্রায় যেন এই অঞ্চলের দৃশ্য আঁকা রয়েছে। সামু তার মেয়েকে নিয়ে নীরবে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে সেদিকে। যারা ছোটাছুটি করে ওর কাছে গেছে তাদের সঙ্গে কিন্তু সামু কোনও কথা বলছে না। নীরব। বুঝি ওর শৈশবের কথা মনে পড়ে গেছে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে মালতী বুঝি তাকে ডাকছে, সামু যাবি না চুকৈর আনতে। যাবি না নদী সাঁতরে ও-পার। তুই ডুব দিয়া নদীর অতল থাইকা আমার লাইগা মাটি তুলবি না? নদীর অতলে মাটি এঁটেল এবং পুতুল তৈরি করতে এমন মাটি আর নেই। সামুর বুঝি মালতীর পুতুলের জন্য মাটি তোলার কথা মনে হচ্ছে।

এখন আর একজন এমন ভাবছে। ফতিমা আনজুর পিছনে। সে বাবার সঙ্গে কতদিন পর দেশে ফিরে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমেই সে কেবল শুনতে পাচ্ছে—কেউ তাকে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সফিকুরের মৃত্যুর পর সে বড় হাহাকারে ভুগছিল। তার কিছু ভালো লাগত না। সে চুপচাপ জানালায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসত। সফিকুর তাকে কী কী বলেছে সব মনে করার চেষ্টা করত। কবে প্রথম দেখা, কিভাবে ফতিমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার সহসা নামিয়ে নিয়েছিল সে-সব মনে করার চেষ্টা করত। এসবের ভিতর ফতিমা জানত না সে ক্রমে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে জানত না, ওর চোখ বসে যাচ্ছে। সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। এবং সে কথা কম বলছে। আম্মা, বা'জান, যখন যে কেউ ওর সঙ্গে কথা বলেছে, সে-কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বার বার প্রশ্ন করেও জবাব পাওয়া যায়নি। সামু মেয়ের মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেছে। সফিকুরের মৃত্যুর পরই মেয়েটা কেমন শোকে পাষাণ হয়ে গেল। সে কিছু করতে পারছে না। মেয়েটা কখনও কাঁদে কি-না চুপি চুপি দেখার চেষ্টা করেছে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে জেগে থেকেছে রাতের পর রাত। ফতিমা রাতে সংগোপনে যদি কাঁদে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস ওরা এমন লক্ষ করতে করতে দেখল মেয়েটা সারারাত না ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু কাঁদে না। ভিতরে যে অসহ্য কষ্ট চোখ-মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়। হাত-পা ছড়িয়ে যদি ফতিমা কখনও মহাশোকে কাঁদতে পারত। সে তবে নিরাময় হতো। সামুর ডাক্তার বন্ধু শেষপর্যন্ত এমন বলেছে। তুমি ওকে কোথাও নিয়ে যাও! পার তো দেশে নিয়ে যাও। সেখানে গেলে ওর শৈশবের কথা মনে হবে। মনে হলে বুঝতে পারবে, কিছুই থেমে থাকে না। এভাবেই মাটি মানুষ এবং নদীর জল বয়ে যায়! শৈশবের ভিতর ফিরে গেলে মানুষের শোক-দুঃখ অনেকাংশে লাঘব হয়।

কথাগুলি সামুর ভালো লেগেছে। সে তার বন্ধুর পরামর্শ মতো এসেছে এই দেশে, বাংলাদেশে। নদীর চরে, তরমুজ খেতে, অর্জুন গাছের ছায়ায়, হাসান পীরের দরগায় সে যাবে। মেয়েকে বলবে, মা, এই আমার দেশ, তোর দেশ, সবার দেশ,। এখানে তুই জন্মেছিস, আমি, মালতী, সোনা, ঈশমচাচা, ফেলু সবাই জন্মেছি। মা, এই দেশ বাংলাদেশ, আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। তুই একজনের জন্যে পাষাণ হয়ে থাকবি সে ঠিক না। আয়। বলে সে মেয়ের হাত ধরে, শৈশব বলতে সে যা জেনে এসেছে সেই সোনাবাবু, অর্জুন গাছ এবং লটকন ফল, কচুর পাতায় প্রজাপতি এসবের ভিতর মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, যেতে যেতে সে সবকিছু ভুলে গেছে। মেয়ের হাত ছেড়ে সেই শ্যাওড়া গাছটার নিচে সে কেন একা একা চলে যাচ্ছে! এখানেই প্রথম মালতী কোটা দিয়ে ওর ইস্তাহারটা নামিয়ে এনেছিল, এখানেই মালতী প্রথম শোকে ভেঙে পড়েছিল। সেই থেকে কেন যে অভিমান করে মালতীর ওপর বার বার সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। সে দেখল—সেই ইস্তাহার এখন সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছে। ছিঁড়ে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। কাগজের সেই হাজার হাজার টুকরো এখন বাতাসে উড়ছে। কে ক'টা সংগ্রহ করতে পারে এমন বাজি রেখে মালতী এবং সে ছুটছে। ওরা প্রজাপতির মতো একটা একটা ধরে কোঁচড়ে রাখছে—এমন একটা খেলা চোখের উপর জমে উঠলে ওর মনে হল দূরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কেউ হাউহাউ করে কাঁদছে। কে এমনভাবে কাঁদতে পারে!

এতক্ষণে ওর খেয়াল হল যে, সে মেয়ের হাত ধরে আসছিল, অথচ মেয়েটা তার পাশে নেই। সামু এখানে এসেই এমন প্রসন্ন সকাল দেখতে পাবে আশা করেনি। জুন মাসের আকাশ। মেঘ-বৃষ্টি থাকার কথা। অথচ একবিন্দু মেঘ নেই আকাশে, মাঠে ছোট ছোট পাটের চারা। ঠাকুরবাড়ির বড় বড় টিনের ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে না, আর কেউ কোনওদিন দেখতেও পাবে না। ওর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ঠাকুরবাড়ির কোথায় কবে লাঠি খেলা হতো, কবে বাপ আসত সামুর হাত ধরে এবং লাঠি খেলা হলে ঈশমচাচা বাবাকে কিভাবে জড়িয়ে ধরত, মেয়েকে এমন বলতে বলতে আসছিল। যেন এভাবে দেশের কথা শৈশবের কথা ক্রমান্বয়ে বলে যেতে থাকলে মেয়েটা তার আরোগ্যলাভ করবে। ফতিমা তার মহাশোক ভুলে যাবে এবং তখনই সামুর মনে হল, মেয়েটা এইসব শুনতে শুনতে হঠাৎ হাত ছেড়ে বালিকার মতো ছুটেছিল। সে মেয়েটাকে ছুটে যেতে দেখেছে। ছুটে গিয়ে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ফতিমা তার শৈশবের জগতে ফিরে গেছে, সেও তার শৈশবের জগতে ফিরে যাবার জন্য মেয়েকে ফেলে এই গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং সে কী সব ভাবছিল, ওর পাশে যে গ্রামের কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তা পর্যন্ত খেয়াল নেই। তখন কেউ কাঁদছে শুনেই স্থির থাকতে পারল না। ওর বুক চিরে যাচ্ছে। ফতিমা কাঁদছে এটা সে বুঝতে পারেনি। কারণ, সে যে শিশু বয়সে একবার কী কারণে সেই মেয়েকে মারতে গিয়ে পিঠে দাগ বসিয়ে দিয়েছিল, তারপর আর সে মারেনি। কসম খেয়েছে, সে আর কোনওদিন মেয়ের গায়ে হাত তুলবে না। মেয়েটা তারপর কোনদিন কাঁদেনি। কেবল হেসেছে। ফতিমা হাসলে সে টের পেত ফতিমা হাসছে। কিন্তু কাঁদলে সে টের পায় না—কারণ, ফতিমা এখন বড় হয়ে গেছে। বড়

হলে কান্নার নিয়মকানুন বদলে যায়। সে তবু এর ভিতর টের পেল কেউ কাঁদছে, বাংলাদেশের জন্য কাঁদছে।

সুতরাং সে অস্থির হয়ে উঠল। যেদিক থেকে কান্না ভেসে আসছে সেদিকে সে ছুটল। শৈশবের মতো সে মাঠঘাট পার হয়ে যাচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে কেউ বাংলাদেশের জন্য কাঁদতে পারে সেখানে সে চলে যাবেই। সে পৌঁছেই দেখতে পেল—ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আনজু দু'হাতে আগলে রেখেছে ফতিমাকে। বোবার মতো আনজু দেখছে সব বড় বড় অক্ষর গাছে লেখা। সে অক্ষরগুলি পড়ছে। গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় অক্ষরগুলি আরও বড় হয়ে গেছে। যেন দেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই অক্ষরগুলি যতদিন যাবে তত বড় হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ বড় বড় হরফে পড়বে, জ্যাঠামশয়, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি—ইতি সোনা।

বড় বড় অক্ষর কী গভীর ক্ষত নিয়ে এই মহাবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্যে সামু নিজে বড্ড বেশি অভিভূত হয়ে গেল। মনে হল তার, এই দেশ বাংলাদেশ। এই দেশে অন্য কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই, সে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষা পেল না। মেয়ের মাথায় হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

তখন মাঠ থেকে কিছু লোক ছুটে আসছে। ওরা এসে খবর দিল ঈশম তরমুজের জমিতে মরে পড়ে আছে। কখন সে মরেছে কেউ বলতে পারে না। জমিতে তরমুজ এবার ভাল হয়নি। শুধু পাতা সার! দু'দিনের ওপর হবে জমিতে কেউ তরমুজ তুলতে যায়নি। কেউ জানে না কখন থেকে ঈশম পাতার নিচে মরে পড়ে আছে।

এই জমির এক অংশে ঈশমের জন্য একটু মাটি চেয়ে নিল সামু। এই জমির নিচে ঈশম চুপচাপ শুয়ে থাকবে আবহমান কাল। নানারকম ঘাস জন্মাবে কবরে। ফুল ফুটবে ঘাসে। ঈশমের এই কবর থেকেই বাংলাদেশের ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ঈশমের কবরে সামু এবার নতুন একটা ইস্তাহার লিখে রেখে দিল। ইস্তাহারটার নাম বাংলাদেশ। তারপর ওকে শুইয়ে দিল। নতুন পাজামা পাঞ্জাবি। সাদা দাড়ি ঈশমের। সে লম্বা হয়ে কবরে শুয়ে আছে। ভূমিহীন অন্নহীন ঈশমের কানে কানে মাটি দেবার আগে বলার ইচ্ছা হল, কিছুই করতে পারিনি এতদিন। স্বাধীনতার মানে বুঝিনি। আপনাকে দেখে মানেটা আমার পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর সে ঈশমের কবরে মাটি দিতে দিতে বলল, যার মাটি পেলে আপনি সবচেয়ে খুশি হতেন চাচা, সে নেই। সে থাকলে তাকে বলতাম, তুমি এসে একটু মাটি দিয়ে যাও বাবু। ওঁর আত্মা বড় শান্তি পাবে। সে, বেইমান চাচা। আপনাকে ফেলে সে চলে গেছে। লিখে গেছে জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। যেন জ্যাঠামশাই ছাড়া তার বাংলাদেশে কেউ নেই।

তারপর থেকেই মাঝে মাঝে আশ্বিনের কুকুর ঈশমের কবরের পাশে ঘোরাফেরা করলে টের পাওয়া যায় মহাবৃক্ষে সেই ক্ষত ক্রমে আবার মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

অর্জুন গাছটা আরও বড় হচ্ছে। ডাল পালা মেলে সজীব হচ্ছে।

‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’—সিরিজের প্রথম পর্ব সমাপ্ত

বিনীত নিবেদন

এই ইবইটি বইবিন্দু টিমের স্বেচ্ছাশ্রমের প্রয়াসে তৈরি। আমাদের লক্ষ্য বাংলা ভাষার সেরা বইগুলো বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়া। এখানে লেখক প্রকাশকের কোনরূপ ক্ষতিসাধন নয় বরং বইয়ের প্রচার ও সংরক্ষণই মুখ্য উদ্দেশ্য। পড়ে ভাল লাগলে পাঠকরা নিজেদের সংগ্রহের জন্য বইটি কিনবেন এবং প্রিয়জনদের উপহার দেবেন, এই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।

—টিম বইবিন্দু

এরকম আরও **বই পেতে** বা ইবুক তৈরির জন্য **বই পরামর্শ দিতে** বা ইবুক তৈরির কাজে **সাহায্য করতে চাইলে** বা বইয়ের যে কোন **ভুল-ভ্রান্তি রিপোর্ট** করতে এই লিঙ্কে ভিজিট করুন– https://linktr.ee/boibindu

অথবা স্ক্যান করুন নিচের QR কোডটি